তৃতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে এত অধিক বিলম্ব হওয়ায়, আমরা গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহাশয়ের তীর্থভ্রমণ ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য, এবং নিয়মিত প্রুফ দেখার অসুবিধার জন্যও এত দেরী হইয়া গেল।

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক-দীপিকা পূর্ব্ব পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি শ্লোকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রথমেই মোটা অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। ছাপার ভুল যতদূর সম্ভব শুদ্ধ করিয়া শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হইল।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী ভাগবদ্‌ভূষণ মহাশয় প্রুফ দেখিয়া আমাদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এই গীতার বিষয়-সূচী ও শুদ্ধিপত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মানসী প্রেসের শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গীতা প্রকাশে তাঁহার সহৃদয়তা ও আন্তরিক যত্নের জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দোল পূর্ণিমা
সন ১৩৪৬ সাল।

প্রকাশক

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধপাঠ
২	১২	প্রকৃতিদ্বয়মুত্তং	প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং
৮	১০	আত্মায়	আত্মার
২৭	৮	একগ্রতা	একাগ্রতা
৩৪	১	বস্তু	বস্তু
৪৭	৫	ব্যবস্থা	অবস্থা
৫০	২	মদ্ভাবয়োপপদ্যতে	মদ্ভাবায়োপপদ্যতে
৭৬	১৮	শব্দর	শব্দের
৭৮	৭	অগম্যা	অগম্য
৮১	৩০	সূত্রর	সূত্রের
৮৩	২	কিছ ুই—কিছ ু	কিছুই—কিছু
৮৩	২৩	ঈশ্বয়	ঈশ্বর
৮৬	২১	গুরুবক্ত	গুরুবক্ত্র
৮৫	৯	সহস্রায়ে	সহস্রারে
৯৪	৬	পয়স্পরের	পরস্পরের
৯৫	২	স্থত্রাত্মা	সূত্রাত্মা
৯৫	৩	সম্পাদন	স্পন্দন
৯৬	২	ইত্যাদিধৈবতং	ইত্যাধিদৈবতং
১০৫	৪	অণুভোহংণ্ চ	অণুভ্যোহংণ্ চ
১০৫	৩২	আত্বসাক্ষাৎকারের	আত্মসাক্ষাৎকারের
১০৬	১৬	শুদ্ধালু	শ্রদ্ধালু
১০৮	৭	মনে নানা স্থানে	মন নানা স্থানে
১১৭	২০	অবস্থার	অবস্থায়
১১৬	৭	কিছ ুই	কিছুই
১২৬	১৬	থাকে	থাকে
১২৯	৯	বিক্ষুদ্ধ	বিক্ষুব্ধ
১৩৯	২৩	তরোহিত	তিরোহিত
১৪৪	২১	মূঢ়ত্বং	মূঢ়ত্বং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধপাঠ
১৪৫	১০	ফলাকাঙ্ক্ষরে সহিত	ফলাকাঙ্ক্ষারহিত
১৪৮	৪	অন্য	অন্যং
১৪৮	৭	মন্তাবঃ	মন্তাবং
১৫০	১৯	পর অবস্থার	পর অবস্থায়
১৫৯	৯	পাককরূপী	পাবকরূপী
১৬৪	৮	ভিততে	ভিতরে
১৬৬	১০	অব্যাক্তের	অব্যক্তের
১৭১	২৭	অবস্থা	অবস্থা
১৭৩	৪	কর্ম্মানুবন্ধানি	কর্ম্মানুবন্ধীনি
১৮০	২০	যায়া	যায়
১৮০	২[illegible]	কাটিয়	কাটিয়া
১৮৪	২৬	আত্মাব	আত্মার
১৮৪	২৭	ব্রহ্মা	ব্রহ্ম
১৮৭	২৫	কি	কিন্তু
১৮৯	২০	বিড়ম্বনা	বিড়ম্বনা
১৯২	২২	অক্ষয়	অক্ষর
২০[illegible]	১২	[illegible]	অক্ষর
২০৭	২৬	[illegible]-রূপ	প্রণব-রূপ
২২৫	১	[illegible]	লোকেঽস্মিন্দ্বিব
২২৫	১৩	কেহ	কেহই
[illegible]	[illegible]	(দান করব).	(দান করিব), মোদিষ্যে (আনন্দিত হইব
২৩৬	৮	[illegible]	[illegible]
২৪০	১২	[illegible]	[illegible]
২৪৪	১৭	বেদিতব	বেদিতব্যং
২৪৫	১৭	বক্ষা	ব্রহ্ম
২৪৮	৩	বায	বায়ু
২৫৩	৩	[illegible]	যচ্ছন্দঃ
২৫৭	৯	তাবে	ভাবে
২৬৪	১৫	কেরিবে না	করিবে না
২৬৯	১২	সহিভ	সহিত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধপাঠ
২৭০	২	সৌমত্ব্যং	সৌম্যত্বং
২৭৪	৩১	যাঁহার জন্য	জন্য যাঁহার
২৭৬	৩১	দণ্ডয়েন্দ্রাজা	দণ্ডয়েন্দ্রাজা
২৭৭	১৫	এবম্ভূতং	এবম্ভূতং
২৭৯	৯	চৈতন্যযৃক্ত	চৈতন্যযুক্ত
২৮৬	১	কৃতঃ	কৃতং
২৯৩	১১	জন সমজ্ঞে	জন সমাজ্ঞে
২৯৪	২৯, ৩০	না না হইয়াও	না হইয়াও
২৯৮	২১	করিয়	করিয়া
৩০২	১৮	যজ্ঞার্থ	যজ্ঞার্থ
৩০৫	১৪	ক্রিয়াযোগগুলি	ক্রিয়াযোগগুলি
৩১৫	২৮	কর্ম্ম লেপ হয় না	কর্ম্মলেপ হয় না
৩১৬	২২	ক্রিয়ার	ক্রিয়ার
৩১৭	৭	পঞ্চমঃ	পঞ্চমম্
৩১৯	২৪	বিপরীতং ব	বিপরীতং বা কর্ম্ম
৩২২	২	কর্ত্তারমাত্মানাং	কর্ত্তারমাত্মানং
৩২৮	৬	তথই	তথনই
৩২৮	১১	মায়াদ্বায়া	মায়াদ্বারা
৩২৮	২০	তখন জীব	জীব
৩৩৭	১৮	তখন বুদ্ধির তখন	তখন বুদ্ধির
৩৩৯	১৯	দ্বৈতপ্রপঞ্চে	দ্বৈতপ্রপঞ্চ
৩৪৭	১৭	ক্রিয়াবান	ক্রিয়াবান
৩৫১	১০	হাইবে	যাইবে
৩৫৩	২৫	সুত্রাত্মরূপে	স্বত্রাত্মারূপে
৩৬৪	২২	মরে	করে
৩৬৫	৯	মুক্তঃ	মুক্তং
৩৬৬	২৪	যইতে	হইতে
৩৬৭	৩২	ধাকে	থাকে
৩৭৮	২০	উচ্চভবের	উচ্চভাবের
৩৭৮	২৫	ভৃগুসংহিত	ভৃগুসংহিতা
৩৮০	৮	স্থির প্রাণেই	স্থির প্রাণই
৩৮২	২	কিন্তু	কিন্তু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধপাঠ
৩৮২	৯	কল্যণকামী	কল্যাণকামী
৩৮২	৩০	বলাৎকারে	বলাৎকারেণ
৩৮৩	২০	এবম্ভুতেন	এবম্ভুতেন
৩৮৩	২২	ত্যাগেন	ত্যাগেন
৩৯৭	৭	দ্বায়া	দ্বারা
৪০৩	৮	হৃদয়মধ্যে	হৃদয়মধ্যে
৪০৮	২০	শাশ্বত স্থানং	শাশ্বতং স্থানং
৪১২	১৯	হইাতে	হইতে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

(প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক যোগঃ)

অর্জ্জুন উবাচ।

[প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব॥]

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। কেশব ! (হে কেশব) প্রকৃতিং পুরুষং চ এব (প্রকৃতি ও পুরুষ) ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান ও জ্ঞেয়) এতদ্ বেদিতুম্ (ইহা জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি॥

[শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন নাই। শুধু শ্রীধর স্বামী কেন আচার্য্য শঙ্কর ও প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যেও অনেকেই এই শ্লোকটি গীতার অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং ব্যাখ্যাও করেন নাই। পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত গীতাতেও এই শ্লোকটী নাই। এই অধ্যায়ে যে তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইবে তাহাই অর্জ্জুনের মুখ দিয়া এই শ্লোকটিতে প্রশ্নরূপে বলানো হইয়াছে। ভগবান কেন এ তত্ত্বগুলি এখানে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, কাহারও কাহারও নিকট ইহা একটু আকস্মিক মনে হইতে পারে, তাই এ শ্লোকটি হয়তো কেহ পরে রচনা করিয়া দিয়া থাকিবেন। যখন প্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে কেহই এ শ্লোকটির ভাষ্য বা টীকা লিখেন নাই, তখন এ শ্লোকটিকে গীতার অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা আসে। প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ আলোচনার অবতারণাও আকস্মিক নহে। প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগবান পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন একটু বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনার আবশ্যকতা আছে। সুতরাং এরূপ আলোচনা আকস্মিক নহে। ইহা অপ্রাসঙ্গিকও নহে, কারণ ভগবান পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে তিনি ভক্তদিগকে শীঘ্রই জন্মমরণরূপ-সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে এই উদ্ধার সম্ভবপর নহে, তাই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ এই অধ্যায়ে আরম্ভ করিলেন।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) ইদং শরীরং (এই শরীরকে) ক্ষেত্রম্ ইতি (ক্ষেত্র বলিয়া) অভিধীয়তে (অভিহিত করা হয়)। যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত্তি (অনুভব করেন) তং (তাঁহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ববেত্তৃগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ইতি প্রাহুঃ (এইরূপ বলিয়া থাকেন)।১

শ্রীধর। ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥

'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ'—ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং। তচ্চ আত্মজ্ঞানং বিনা সংসারাদুদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাধ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমেঽধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োঃ অবিবেকাৎ জীবভাবম্ আপন্নস্য চিদংশস্য অয়ং সংসারঃ। যাভ্যাং চ জীবোপভোগার্থম্ ঈশ্বরঃ সৃষ্ট্যাদিষু প্রবর্ত্ততে। তদেব প্রকৃতিদ্বয়ম্ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যং পরস্পরং বিবিক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে, সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। এতদ্ যো বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ, কৃষিবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ। তদ্বিদঃ - ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃবিবেকজ্ঞাঃ ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। "আমি ভক্তদিগকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি" এই কথা যিনি (দ্বাদশাধ্যায়ে) বলিয়াছেন, এখন তৎসিদ্ধ্যর্থ (অর্থাৎ ভক্তগণ কি ভাবে উদ্ধার হয়) সেই তত্ত্বজ্ঞান এই ত্রয়োদশাধ্যায়ে কথিত হইতেছে।

['জন্মমরণ রূপ সংসার হইতে তাহাদিগকে আমি শীঘ্রই উদ্ধার করিয়া থাকি'—ভগবানের প্রতিজ্ঞাত এই সংসারোদ্ধারণ আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে, তাই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশার্থ এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাধ্যায় আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরারূপ প্রকৃতিদ্বয় যাহা উক্ত হইয়াছে এবং যে প্রকৃতিদ্বয়ের বিবেকাভাব হইলে জীবভাব-প্রাপ্ত চিদংশের এই সংসার প্রাপ্তি হয়; আর যে প্রকৃতিদ্বয় দ্বারা জীবের উপভোগার্থ ঈশ্বর সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হন, সেই পরস্পর বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-পদবাচ্য প্রকৃতিদ্বয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য] —শ্রীভগবান বলিলেন, হে কৌন্তেয়, এই ভোগায়তন শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে, যেহেতু ইহা সংসারের প্ররোহভূমি অর্থাৎ সংসাররূপ শস্যের উৎপত্তির ভূমি। এই শরীরকে যিনি জানেন অর্থাৎ আমি ও আমার মনে করেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকিগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। কারণ কৃষকের ন্যায় এই ক্ষেত্রজ্ঞই সেই ক্ষেত্রের ফলভোক্তা। তদ্বিদঃ শব্দের অর্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেকজ্ঞগণ ॥ ১

[এই শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য:—"সপ্তমে অধ্যায়ে সূচিতে দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য। ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা ভিন্না অপরা সংসার হেতুত্বাৎ, পরা চান্যা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণেশ্বরাত্মিকা চ। যাভ্যাং

প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। তত্র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ—প্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বারেন তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে। অতীতানন্তরাধ্যায়ে চ—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরিসমাপ্তিঃ তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানিনাং সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্ত্তন্তে ইত্যেতদুক্তং, কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্ত ধর্ম্মাচরণাৎ ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তি, ইত্যেবমর্থশ্চায়মধ্যায় আরভ্যতে।"—সপ্তমাধ্যায়ে ঈশ্বরের দুইটি প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। সংসারের হেতুভূতা ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টধা বিভক্তা যে প্রকৃতি তাহাই "অপরা," এবং অন্যটি "পরা প্রকৃতি"—যিনি জীবরূপা এবং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণান্বিতা ঈশ্বররূপা। এই দুইটি প্রকৃতির সাহায্যে ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকেন। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়ের তত্ত্বনিরূপণ দ্বারা সেই প্রকৃতিদ্বয়সম্পন্ন ঈশ্বরের তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থ এই ক্ষেত্রাধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে। অতীতান্তরাধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বাদশাধ্যায়ে—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণের নিষ্ঠা অর্থাৎ যেভাবে তাঁহারা থাকেন বা আচরণ করেন তাহা বলা হইয়াছে। পুনরায় কিরূপ তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়া যথোক্ত ধর্ম্মসমূহের আচরণ দ্বারা তাঁহারা ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন ইহাও বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে।

"প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা—সর্ব্বকার্য্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থকর্ত্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে সোঽয়ং সংঘাতঃ ইদং শরীরম্। তদেতৎ—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, ঐ প্রকৃতি সর্ব্বকার্য্য, করণ ও বিষয়াকারে পরিণত হইয়া পুরুষের ভোগ ও অপবর্গসিদ্ধির জন্য দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আকারে সংহত হইয়া থাকে—সেই সংঘাতই এই শরীর, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিতেছেন "ইদং শরীরং কৌন্তেয়!" "ইদমিতি সর্ব্বনাম্নোক্তং বিশিনষ্টি শরীরমিতি। হে কৌন্তেয় ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবদ্ বা অস্মিন্ কর্ম্মফলনির্বৃত্তেঃ ক্ষেত্রমিতি। ইতি শব্দঃ এবং শব্দপদার্থকঃ। ক্ষেত্রম্ ইত্যেবম্ অভিধীয়তে কথ্যতে। এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যো বেত্তি—বিজানাতি আপাদতলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি—স্বাভাবিকেন ঔপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ তং বেদিতারং প্রাহুঃ কথয়ন্তি ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবমাহুঃ। কে? তদ্বিদঃ তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি তে তদ্বিদঃ"—"ইদং" এই সর্ব্বনাম পদের দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে উহা শরীর। হে কৌন্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন? কারণ ইহা ক্ষত হইতে ত্রাণ করে, অথবা ইহার ক্ষয় হয়, কিংবা ক্ষেত্রবৎ (ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়) এই দেহকৃত কর্ম্মেরও ফলভোগ হয়—এই জন্যও এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে। ইতি শব্দের অর্থ "এবং" অর্থাৎ এই প্রকার—এই শরীরকে ক্ষেত্র এই প্রকারে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে যিনি জানেন—অর্থাৎ পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত জ্ঞানের বিষয় যিনি করিয়া থাকেন, স্বাভাবিক অথবা উপদেশজনিত অনুভবের বিষয় করিয়া থাকেন, দেহ হইতে পৃথক সেই দেহবেত্তাকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাহারা এই কথা বলিয়া থাকেন? যাঁহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইটি পদার্থকেই জানেন, তাঁহারাই 'তদ্বিদঃ'।]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—এই শরীর ক্ষেত্রের স্বরূপ ইহাতে চাষ যিনি করেন, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়া।—শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন ? আচার্য্য শঙ্করের মতে ইহার তিন প্রকার কারণ হইতে পারে।

(১) প্রথমতঃ ইহা ক্ষত হইতে ত্রাণ করে; (২) যেহেতু ইহার ক্ষয় হয় এইজন্যও ইহাকে ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে; (৩) ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, এই দেহকৃত কর্ম্মের ফল ভোগও সেইরূপ জীবকে করিতে হয়।

সংসারের চিন্তায় জীব ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ে, বিনা সাধনে সে ক্ষত শুকায় না, সুতরাং জ্বালাও নিবৃত্তি হয় না। এই শরীর না থাকিলেও সাধনা হয় না, সাধন না করিতে পারিলে বার বার জন্ম যাতায়াত নিবৃত্ত হয় না। কর্ম্মায়তন এই দেহ যেমন কর্ম্ম দ্বারা জীবকে সুখে দুঃখে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অপবর্গ প্রদানেও কৃতার্থ করে।

ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফলোৎপত্তি হয়, এবং ক্ষেত্রকর্ত্তা সেই ফলভোগ করেন, এই শরীররূপ ক্ষেত্রে সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম করিয়া জীবকেও সেইরূপ নিজকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু ভাল চাষী হইতে পারিলে জীবকে আর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। ভাল চাষী কিরূপে হওয়া যায় শুনিবে? (১) চাষীকে ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইবে। (২) উত্তম বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং (৩) শস্যোৎপত্তির বিঘ্ন সকলকে দূর করিতে হইবে। চাষী যদি ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ না করে বা তাহাতে অমনোযোগী হয় বা অবহেলা করে তবে ভাল বীজ বপন করিলেও সুফল হয় না। এতদ্ব্যতীত দৈবানুকম্পাও প্রয়োজন, কারণ সময়মত বৃষ্টি না হইলে ফসল ভাল হয় না, যদি বা সুবৃষ্টি হয়, কিন্তু ভাল করিয়া পাহারা দিতে না পারিলে, শস্যের বহুভাগ কীট পতঙ্গ, পশুপক্ষী খাইয়া ফেলে।

ক্ষেত্রকর্ষণের জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন,—ক্ষেত্র, কর্ষণযন্ত্র ও পশু। আধ্যাত্মিক চাষে আমাদের এই শরীর হইল ক্ষেত্র, কর্ষণযন্ত্র হল হইল প্রাণক্রিয়া বা শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং এই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ হলকে চালনা করিবে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-পশুরা। এইরূপ প্রাণায়ামাদি প্রাণক্রিয়া করিয়াই জনক রাজা সীতা নাম্নী যজ্ঞ-দেবতা বা সাধনের ফলস্বরূপ সাধনলক্ষ্মী ব্রহ্মবিদ্যাকে লাভ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা উত্তম সাধন প্রণালী পাইয়াও সাধনে অবহেলা করেন বা মন দিয়া সাধন না করেন তাঁহারা সাধনার সুমিষ্ট ফল যে শান্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না। দৈবানুকম্পাও প্রয়োজন অর্থাৎ যাঁহাদের পূর্ব্ব জন্ম হইতেই সাধন সাধা আছে, বর্ত্তমান জন্মে তাঁহারা পরিশ্রম করিলেই উপযুক্ত ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু তবুও সাধককে সতর্ক থাকিতে হয়, বৈরাগ্যবান হইতে হয়, নচেৎ বহু তপস্যার ফল ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ চোরেরা অপহরণ করিয়া লয়। সাধকের তীব্র সাধনা ও তাহার ফল দেখিয়া বহুলোকে তাঁহাকে সম্মান করে, তাঁহার খ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া যায়, তাহার ফলে যদি ঐ সকল প্রতিষ্ঠার প্রতি সাধকের লোভ আসে, তাহা হইলে ক্ষেত্রে ভাল ফল জন্মিলেও, সে ফল অভিমানরূপ পশু, পক্ষী, কীটেরা নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা অপদেবতার ভোগ্য হয়—দেবতার ভোগে আসে না।

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২

এই ক্রিয়া করেন কে? ক্ষেত্রজ্ঞ জীব বা ক্রিয়াবান সাধক। বদ্ধজীবও ক্ষেত্রজ্ঞ, কারণ এই দেহরূপ ক্ষেত্র যে তাঁহার তাহা জীবের জানা আছে। এইজন্য দেহটীকে সাজান-গুজান এবং দেহটিকে সুস্থ ও পুষ্ট করিবার ইচ্ছা জীবের স্বতঃই হইয়া থাকে, কিন্তু দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যিনি আপনাকে দেহপাশ হইতে মুক্ত করিতে প্রযত্ন করেন তিনি সর্ব্বতাপহর দেহাতীত (বিদেহ) অবস্থা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই দেহাতীত ভাবই দেহীর নিজভাব। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই জীবের জীবত্ব মোচন হয়। যিনি এই দুই ভাবকেই (দেহবদ্ধ ও বিদেহ) অবগত আছেন তিনিই "ক্ষেত্রজ্ঞ" ॥ ১

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই) মাং চ (আমাকেই) ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও); ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ জ্ঞানং (যে বিভেদ জ্ঞান) তৎ জ্ঞানং (তাহাই জ্ঞান) মম মতং (ইহাই আমার অভিমত) ॥ ২

শ্রীধর। তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপম্ উক্তম্। ইদানীং তস্যৈব পারমার্থিকং অসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞম্ ইতি। তং চ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষু অনুগতং মামেব বিদ্ধি, "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপস্য উক্তত্বাৎ। আদরার্থমেব তজ্জ্ঞানং স্তৌতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ মম জ্ঞানং মতম্। অন্যৎ তু বৃথা পাণ্ডিত্যম্। বন্ধহেতুত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—

"তৎকর্ম্ম যন্নবন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্" ॥ ইতি ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞের সংসারী-স্বরূপ কথিত হইল, সম্প্রতি সেই ক্ষেত্রজ্ঞের অসংসারি-স্বরূপের বিষয় বলিতেছেন অর্থাৎ জীবের ব্যবহারিক স্বরূপ সংসারী হইলেও পরমার্থতঃ তিনি যে অসংসারী সেই বিষয় এইবার বলিতেছেন)—সেই যে ক্ষেত্রজ্ঞ সংসারী জীব বস্তুতঃ আমাকেই জানিবে, আমিই সমুদয় ক্ষেত্রে অনুগত অর্থাৎ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি। কারণ "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিবাক্যের উপলক্ষিত যে চিদংশ তদ্দ্বারা মদ্রূপের বিষয়ই বলা হইয়াছে। আদরার্থ এই জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে বিলক্ষণ (বা পৃথক) জ্ঞান, তাহা মুক্তির হেতু বলিয়া আমার মতে উহাই প্রকৃত জ্ঞান। আর অন্য জ্ঞান যাহা তাহা বৃথা পাণ্ডিত্য মাত্র, কারণ তাহা বন্ধের হেতু। তাহাতেই বলা হইয়া থাকে—"তাহাই কর্ম্ম যাহা বন্ধনের হেতু, তাহাই বিদ্যা যাহা মুক্তির হেতু ; অন্যান্য কর্ম্ম কেবল পরিশ্রমের নিমিত্ত এবং অন্যরূপ বিদ্যা শিল্প-নৈপুণ্য মাত্র" ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি নাভিদেশেতে আছেন তিনি আমারই রূপ—গুরু বাক্যের দ্বারা লভ্য—তিনি সব শরীরে আছেন।—যিনি দেহে অহং-মম অভিমানযুক্ত হইয়া দেহের সুখ-দুঃখকে আমার বলিয়া অভিমান করেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ,

কিন্তু ঐটুকু মাত্র জানিলেই ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে সব জানা হইল না। সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি তিনিই ভগবান তাহা বুঝিতে হইবে। এখন যাহাকে দুঃখ শোকগ্রস্ত জীব বলিয়া মনে হইতেছে সেই জীব পরমাত্মা হইতে পৃথক বস্তু নহে। যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার, জীবেরও স্বরূপ তাই। কিন্তু এই জীব কত অজ্ঞ এবং ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং জীবে ও ঈশ্বরে যে বিরাট ভেদ রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিব কিরূপে? ভেদ রহিয়াছে সত্য কিন্তু এ ভেদ ঔপাধিক, নিত্য সত্য নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—নানাত্ব নাই, সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ যদি পরমাত্মা না হন তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই পৃথক পৃথক ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞের বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা কিন্তু বেদাদি-শাস্ত্রসম্মত হয় না এবং অনুভবেরও বিরুদ্ধ হয়। সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে তাই সনৎকুমার বলিতেছেন—

"দোষো মহানত্র বিভেদ যোগে
হ্যনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ।
তথাস্য নাধিক্যমপৈতি কিঞ্চি-
দনাদি যোগেন ভবন্তি পুংসঃ।"

বিভেদযোগে অত্যন্ত দোষ আছে; কারণ মায়াপ্রভাবে তিনি জীবরূপে নিত্য অবস্থান করিতেছেন। সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর মায়া হেতু বহুত্বে পরিণত হইলেও তাঁহার আধিক্য কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না (শ্রীগুরুপদ হালদার কৃত অনুবাদ)। তবে জীব কেন ও কিরূপে অল্পজ্ঞ হইলেন এবং কিরূপেই বা জীব বর্ত্তমান অবস্থা হইতে নিজ স্বরূপে পৌছিতে পারেন সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি। অবিদ্যা উপাধিবশতঃ জীব দেহের সহিত তাদাত্ম্য ভাবে মিলিত হইয়া নিজের স্বরূপকে বিস্মৃত হয়। প্রাণের বহির্ম্মুখী গতি দ্বারাই জীবের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে। তখনই তাহার বাহ্য দৃষ্টি স্ফুরণ হয়। কঠোপনিষদ বলিতেছেন—"যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতির্দেবতাময়ী', গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈতৎ।" সর্ব্ব দেবতারূপী যে অদিতি (অর্থাৎ বিষয়ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞ) প্রাণেন অর্থাৎ প্রাণ শক্তির সহিত প্রকাশিত হন এবং যিনি ভূতগণের সহিত অর্থাৎ পঞ্চভূত-সমন্বিত হইয়া উৎপন্ন হ'ন তিনিই জীবের হৃদয় গুহায় (কূটস্থের অভ্যন্তরে) অবস্থিতা, সেই চিৎশক্তিকে যিনি দর্শন করেন তিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।" পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়-সকলকে বাহ্য পদার্থদর্শী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেইজন্য জীব শব্দাদি বাহ্য পদার্থ জানিতে পারে, অন্তরাত্মাকে জানিতে পারে না।

বাহ্যজ্ঞান স্ফুরণের সহিত জীব নিজেকে দেহমাত্র (প্রকৃতি) মনে করে এবং দেহ যেরূপ জড় সেইরূপ তাহার বুদ্ধিও জড়ভাবাপন্ন হইয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়, আবার এই বহির্ম্মুখী গতি রুদ্ধ হইলেই জীব যে শিব ছিল সেই শিবই হইয়া যায়।

"ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে॥" কঠ

তিনি এই প্রাণের ঊর্দ্ধগতি ও অপানের অধোদিকের গতি "অস্ততি" নিক্ষেপ করেন (অর্থাৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রাণাপানের গতি চলিতেছে,) এই প্রাণাপানের সন্ধিস্থলে অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা দুই বায়ু হৃদয়ে স্থির হইলে, সেই স্থিতির মধ্যে বামন দেবকে বুঝিতে পারা যায়, এবং বুঝিতে পারা যায় ইঁহাকেই বিশ্বের সমস্ত দেবতা উপাসনা করিতেছেন। "স উ প্রাণস্য প্রাণঃ"—তিনিই প্রাণের প্রাণ অর্থাৎ এই প্রাণ যাঁহা হইতে শক্তিলাভ করিতেছে। সেই স্থির প্রাণকে উপাসনা করিতে করিতেই সাধক ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। এইরূপে নিজেকে নিজে জানিতে পারিলেই অজ্ঞান কাটিয়া যায়, সব ধাঁধা মিটিয়া যায়। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বুঝিলে আর তাহাতে সর্পভ্রম হইবার আশঙ্কা থাকে না, তদ্রূপ আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলে আর এই কল্পিত অজ্ঞানের (জীবভাব) জন্য বিড়ম্বিত হইতে হয় না।

* * * * *

প্রাণের যে বহির্ম্মুখবৃত্তি দ্বারা এই মহা অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, নিজের স্বরূপাবস্থায় ফিরিতে হইলে যে পথ দিয়া বাহিরে আসা হইয়াছে আবার সেই পথ দিয়াই ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে। গীতা ব্যাখ্যায় বহুস্থানেই আলোচিত হইয়াছে যে ইড়া-পিঙ্গলায় যতদিন শ্বাস বহিতে থাকে ততদিন এই জগদ্দর্শন নিবৃত্ত হয় না এবং ভগবানের ঘোর রূপ দর্শনও বন্ধ হয় না। সেইজন্যই আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সাধনায় সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তৃতীয় পাদ সুষুম্নায় ক্রিয়া করিতে করিতে উর্দ্ধে মহৎকে স্থিতিরূপ এক অবস্থা বা পুরুষের উদয় হইয়া থাকে। সেই স্থিতি পদে থাকিতে থাকিতেই বিশ্বদর্শন লোপ পায়। স্বভাবতঃ বিক্ষিপ্ত মন ক্রিয়ার দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় যত দীর্ঘ স্থিতি লাভ করিবে ততই বহু একের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। যখন সব এক হইয়া যায় তখনই পুরুষোত্তম ভাব। এই পুরুষোত্তমকে দেখিবার উপায়ই হইল ক্রিয়া। এই পুরুষোত্তম অবস্থায় যিনি ব্রহ্মানন্দরূপ, জীবরূপে তিনিই আবার বিষয়ানন্দে বিভোর হইয়া আছেন।

যিনি বিশ্বাতীত তিনিই আবার বিশ্ব। পুরুষ সূক্তে আছে—"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ, পাদস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"। প্রাণরূপী নারায়ণের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই তিনটি পদ। এই তিন পদ যখন সুষুম্নায় এক হইয়া যায় তখনই স্থির পদ বা ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে পরব্যোমের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেই "সর্ব্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়া যায়। সেই পরব্যোম বা ব্রহ্মই মহৎব্রহ্ম হন, তখন তিনি কূটস্থ জ্যোতিঃ রূপে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেন। ঐ মহৎ ব্রহ্মই প্রাণরূপ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে প্রকাশিত করেন। সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই প্রাণের দ্বারা প্রকাশিত হয় বলিয়া তৎসমুদায়কে প্রাণী বলা হয়। এই প্রাণ সূক্ষ্ম বায়ুরূপে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই রহিয়াছেন। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বায়ুরূপই স্থূলভূতে পরিণত হইয়াছে। স্থূলভূতের এই স্থূল অণু যাহার জন্য স্থূল ভাব দর্শন হয়, আবার বায়ু দ্বারাই তাহার স্থূলত্ব নাশ হয়। এই জন্য প্রাণক্রিয়া (বায়ুর ক্রিয়া) করা প্রয়োজন। মন স্থূল চিন্তা করিতে করিতে একেবারে স্থূল হইয়া যায়, তখন আর সূক্ষ্ম চিন্তা

করিতেই পারে না। প্রাণক্রিয়ার দ্বারা মনের এই স্থূলতা নষ্ট হয়। এই প্রাণই রুদ্ররূপে নাভিতে আছেন, উহা তেজঃ স্থান, এ স্থানের শক্তি হইতে বাক্য স্ফুরিত হয়। এই বাক্যের যত বিস্তার হইবে ততই প্রাণের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইবে। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন, এই চঞ্চল মনই জীবকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করে। যজুর্ব্বেদে আছে—"মরুতঃ শিবঃ, মরুতঃ ব্রহ্ম"। মরুত যখন স্থির হইলেন তখন শিব এবং সেই মরুতই চঞ্চল হইয়া মন রূপে সংসার রচনা করিতেছেন। তাই বেদ বলিতেছেন—"নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, তন্মামবতু"— হে বায়ু, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাকে রক্ষা কর, অর্থাৎ আমার এই সংসার গতিরোধ কর। আমাদের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই আত্মার মহিমা। কিন্তু উহা সমস্তই বাহ্য মহিমা। ক্রিয়া করিয়া সাধক যত স্থির হইতে থাকেন ততই আত্মার ভিতরের মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বুঝিতে সমর্থ হন। এই স্থির পদের অনুভবের সহিত আমার (আত্মার) সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তার অনুভব হইতে থাকে। এখন যে জীবকে অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ মনে করিতেছি সে সব তখন উল্টাইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার দ্বারাই তাঁহার "জ্যায়াং" অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ অনুভব হয়। উহাই উত্তম পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই অনুভব পদ বা আপনাতে আপনি। এইরূপ অবস্থা যে সাধকের প্রাপ্তি হয়, তাঁহার নিকট আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য বোধ থাকে না। উহার নামই জ্ঞান।

সেই জন্য জীব ও পরমেশ্বর বিভিন্ন এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে দোষযুক্ত বলিয়াছেন। কারণ জীব অন্যবস্তু নহে, মায়া হেতু পরমাত্মাই জীবরূপে নিত্য বর্ত্তমান। জীব ও পরমেশ্বরে বা জীবের সহিত জীবের যে ভেদ তাহা ঔপাধিক, তাত্ত্বিক নহে। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত"—ইন্দ্র অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়া দ্বারা বহু রূপ ধারণ করিয়া আছেন। সুতরাং অসংখ্য যে জীবভাব তাহা পরমাত্মারই রূপভেদ মাত্র। এই মায়া পরমেশ্বরের শক্তি রূপে নিহিত থাকে। পুরুষের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, প্রকৃতিও সেইরূপ আদ্যন্ত-রহিত। ভগবান এই অধ্যায়েই বলিয়াছেন— "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"—প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই অনাদি। জীবের ভোক্তৃত্ব এবং তাহার ভোগ ও ভোগ্য এ সমস্তই মায়া হেতু কল্পিত হয় মাত্র, উহা পারমার্থিক সত্য নহে। মায়া হেতু যে ভেদ দৃষ্ট হয় সেই মায়া-সংযোগ ছিন্ন হইলেই ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। অখণ্ড আকাশের ঘটাকাশ উপাধি মাত্র, ঘটোপাধি নাশের সহিত ঘটাকাশের পৃথক প্রতীতি থাকে না, তদ্রূপ অখণ্ড পরমাত্মার কোন একটু অংশ মায়াচ্ছন্ন হইলে সেই অংশটুকুর জীব উপাধি হয়। এই উপাধি সর্ব্বাবস্থায় থাকে না, উপাধি তিরোহিত হইলেই তখন তাহা পরমাত্মার সহিত অখণ্ড অভেদ রূপে প্রতীয়মান হয়। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—"আমুক্তের্ভেদ এব স্যাৎ জীবস্য চ পরস্য চ। মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ"—মুক্তি পর্য্যন্তই ভেদ ব্যবহার, মুক্তির পর ভেদ হেতুর অভাববশতঃ ভেদজ্ঞান থাকে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন— "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"—নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে, জীবও জ্ঞানের দ্বারা পরাৎপর পুরুষে মিলিত হইয়া তাহার সমস্ত নামাদি ভেদ চিহ্ন হইতে বিমুক্ত হয়।

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩

দেহ দৃষ্টি হেতুই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেহাদিসংঘাত হইতে জীব যখন পরম পুরুষে মিলিয়া এক হইয়া যায় তখন ভেদের কোন পারমার্থিকতা থাকিতে পারে না। জীব দেখিতে যদিও অসংখ্য এবং প্রত্যেক জীবই পরমাত্মার অংশ, তথাপি উহাতে পরমাত্মার পূর্ণত্ব ও একত্বের হানি হয় না, কারণ এই জীবভাব অবিদ্যাকল্পিত, পারমার্থিক সত্য নহে। প্রতিবিম্ব অসংখ্য হইলেও প্রকৃত সূর্য্যের যেমন তাহাতে ক্ষয় বা হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ জীব যতই অসংখ্য ও অগণ্য হউক পরমাত্মার তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য ভগবান স্বেচ্ছায় বা স্বমায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া যখন বহুরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন তখনও তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হয় না। সুতরাং সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষবাদ সত্ত্বেও পরম পুরুষে নানাত্ব নাই, তিনি এক অখণ্ড-ভাবেই চির বর্ত্তমান। ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ ভগবান মায়া দ্বারাই জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হন, এবং মায়া হেতুই এই প্রপঞ্চের বোধ হয়, বাস্তবিক তাঁহাতে বিকার নাই। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জাগ্রদাবস্থায় যেরূপ অস্তিত্ব থাকে না তদ্রূপ মায়া নিবৃত্ত হইলেই এই দৃশ্যমান জগতেরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। নাভিদেশেতে সমান বায়ুর স্থান, ঐখানেই ক্ষেত্রজ্ঞের অবস্থান। তিনিই এই ক্ষেত্রকে চালনা করিতেছেন, তেজঃরূপে। মৃত্যুর সময় এই তেজের যত অভাব হয় ততই শরীরের ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হইতে থাকে। সমান বায়ু ঢিলা হইলেই আর প্রাণকে দেহে ধরিয়া রাখা যায় না। নাভিস্থ শক্তিই কূটস্থের তেজঃ বা শক্তি; এইজন্য উভয়ে উভয়ের সখা। ইঁহাকে অবগত হইতে হইলে গুরুবাক্য-গম্য সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক॥ ২

অন্বয়। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা অর্থাৎ যেরূপ জড় দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত), যাদৃক্ চ (যেরূপ অর্থাৎ যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মযুক্ত) যদ্বিকারি (যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত), যতঃ (যেরূপ প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন), যৎ চ (স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে যেরূপ বিভিন্ন), সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ), যঃ (যৎস্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপতঃ যাহা), যৎপ্রভাবঃ (যেরূপ অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত) তৎ (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ৩

শ্রীধর। অত্র যদ্যপি চতুর্ব্বিংশতিভেদৈঃ ভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রং ইত্যভিপ্রেতং তথাপি দেহরূপেণ পরিণতায়ামেব তস্যাং অহংভাবেন অবিবেকঃ স্ফুট ইতি। তদ্বিবেকার্থং ইদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাদি উক্তম্ তদেতৎ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া তৎ ক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদি স্বভাবং। যাদৃগ্—যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্ম্মকং। যদ্বিকারি—যৈঃ ইন্দ্রিয়াদি-বিকারৈঃ যুক্তং। যতশ্চ—প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ ভবতি। যদিতি—যৈঃ স্থাবর জঙ্গমাদিভেদৈঃ ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো, যঃ—স্বরূপতঃ, যৎ প্রভাবশ্চ—অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ। তৎসর্ব্বং সংক্ষেপতঃ মত্তঃ শৃণু॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [এখানে যদিও চতুর্ব্বিংশতি প্রকার ভেদে ভেদবিশিষ্ট প্রকৃতিই ক্ষেত্র বলিয়া ভগবানের অভিপ্রেত, তথাপি দেহরূপে পরিণত সেই প্রকৃতিতেই অহংরূপে অবিবেকটি পরিস্ফুট, এই নিমিত্ত সেই প্রকৃতির বিবেকার্থ এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তাহাই বিস্তৃত করিয়া বুঝাইবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিতেছেন]—মৎকর্ত্তৃক উক্ত যে ক্ষেত্র তাহা (১) "যৎ" অর্থাৎ যেরূপ জড় দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত, এবং (২) যাদৃক্ অর্থাৎ যাদৃশ ইচ্ছাদি ধর্ম্মক, (৩) "যদ্বিকারি" যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, এবং (৪) "যতঃ" যেরূপে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, (৫) "যৎ" যে প্রকারে স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন হয়। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ (৬) "যঃ" অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা, এবং (৭) "যৎ প্রভাবঃ" অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য যোগদ্বারা যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন—তাহা সমস্ত সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই শরীর যাহা যেরূপ এবং তাহার বিকার হইয়া যাহা যেরূপে সংসারে—সকল লোকে আবৃত আছে অর্থাৎ ক্রিয়া—সর্ব্বদা আত্মাতে থাকা—ইহার নাম কার—বিকার অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করা তাহার দ্বারায় মনের বিকার ও প্রকাশ—তাহা সমুদয় শুন।—
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য ভগবান এইবার তাহা বলিবেন, এবং অর্জ্জুনকে উহা ভাল করিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইতে বলিতেছেন। শরীরটা যেরূপ জড়দৃশ্যস্বভাবযুক্ত এবং উহা যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া সকলের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহা হইতে কিরূপ বিচিত্র কার্য্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। আত্মা যখন আপনাতে আপনি থাকেন তখন এই দেহাদির কার্য্য কিছুই থাকে না, তখন সকল কাজই বন্ধ। নাইও কিছু এবং সেই জন্ত আসক্তিও কিছুতে নাই, যেমন সুষুপ্তিতে হইয়া থাকে। আবার মন যেমনই জাগিয়া উঠে, আসক্তিপূর্ব্বক চারিদিকে দৃষ্টি করে, অমনি পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। যাহা ছিল না সেই সংসার আবার চারিদিক হইতে ফুটিয়া উঠে। অব্যক্তের মধ্যে যাহা প্রবিষ্ট ছিল তাহা যখন আবার ব্যক্ত হইতে থাকে তখন একেবারেই স্থূলতম ভাব প্রাপ্ত হয় না, আগে কারণ, পরে সূক্ষ্ম, তাহার পরে স্থূলের বিকাশ হয়; এই সকল বিকার বা প্রকাশের কথাই ভগবান বলিবেন। এবং এই সকল যাহা কিছু বিকাশ তাহা সমস্তই যে অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগসম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞের শক্তি, সেই "ক্ষেত্রজ্ঞ" বিশেষভাবে আলোচনীয়। এই দেহেন্দ্রিয়াদি মন লইয়াই সংসার এবং এই সমগ্র সংসার সেই স্বরূপাবস্থারই বিকার। তাঁহা হইতেই হইয়াছে, আত্মা না থাকিলে এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইতেই পারিত না। গৃহাদি বস্তু আকাশকে বেষ্টন করিয়াই উৎপন্ন হয়, আকাশ ব্যতীত তাহাদের প্রকাশ কেহই দেখিতে পাইত না, তদ্রূপ এই জগৎ প্রপঞ্চ প্রকৃতির পরিণাম, এবং প্রকৃতি তাঁহার, সুতরাং সবই তিনি। দেহেন্দ্রিয়াদির উপর সোয়ার হইয়া মন কত না বাহ্য চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে, তাহার বাসনার আর অন্ত নাই। বহির্ম্মুখ জীব একেবারে নিজ নিকেতনের কথা ভুলিয়া যায়! সংসার তাপে তাপিত হইয়া জীব অবিরত হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কিসে শীতল হওয়া যায়, কোথায় গেলে সে জুড়াইতে পারে, সে সব কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। নিজের ঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে আশ্রয় পাইবার জন্ত কাঁদিয়া বেড়াইতেছে! এ ভ্রান্তি কেন

ঋষিভির্ব্বহুধা গীতং ছন্দোভির্ব্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্ব্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

হয়? প্রকাশশীল স্থির আত্মায় এক দিন সঙ্কল্পের ঝটিকা উত্থিত হইল, সেই ঝটিকাবেগ স্থির সমুদ্রকে যেন বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল, তখন মনোরূপ তরঙ্গরাশি তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিল এবং সমস্ত দিগদিগন্ত তরঙ্গাভিঘাতজনিত অসংখ্য জলকণায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। জলকণা আপনাকে বিস্মৃত হইল, তাহার মূল কারণকে ভুলিয়া গেল, আপনাকে অন্য কিছু মনে করিয়া তাহার অহং অভিমান জাগিয়া উঠিল—

"দেহাভিমান যুক্ত হয় যবে "আমি" এই
বিশ্ব হ'তে ভিন্ন "আমি" বোধ তার হয় সেই।
নানাত্বের খণ্ডজ্ঞান তখনই স্ফুরিত হয়
উহাই অজ্ঞান-সিন্ধু জীব তাহে মগ্ন রয়॥"

তখন ক্ষুধার্ত্ত ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে উপভোগ করিবার জন্য সে উন্মত্ত হয়। কে ভোগ করিবে, কাহাকে ভোগ করিবে এবং কেন ভোগ করিবে এ সব কথা একবার আলোচনাও করে না। ইহাই বিকৃতির লক্ষণ। সর্ব্বত্রই তখন আসক্তির সহিত দৃষ্টি করে। আবার গুরুকৃপায় যখন নিজ নিকেতনের কথা, নিজের কথা মনে পড়ে, তখন সে ব্যাকুল হইয়া সাধনাভ্যাস করে। সাধন করিতে করিতে ভিতরের কপাট উন্মুক্ত হয়, তখন সে আপনার স্থান ও আপনাকে চিনিয়া লইয়া আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তাহার আর অন্য কিছুতেই আসক্তি হয় না। আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে আসক্ত হইলে জীবের যে কি দুর্গতি হয় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এ সমস্তই দেহাসক্তিবশতঃ হইয়া থাকে। এই দেহই প্রকৃতি, প্রকৃতিই জীবকে সংসারে টানে। যিনি ক্রিয়া করিয়া পরাবস্থায় থাকেন তাঁহাকে আর এই বিকৃত ভাবের মধ্যে পড়িতে হয় না॥ ৩

অন্বয়। ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্ত্তৃক) বহুধা গীতং (বহু প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ গীত অর্থাৎ নিরূপিত হইয়াছে), বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (ঋগাদিবেদ চতুষ্টয়ে—মন্ত্রে ও ব্রাহ্মণে) পৃথক্ (ভিন্ন ভিন্ন পূজনীয় দেবতারূপে) [গীতং—এই তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে]; বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়রহিত) হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চ এব (ব্রহ্মসূত্রপদের দ্বারাও) [গীতং—ব্যাখ্যাত হইয়াছে]॥ ৪

শ্রীধর। কৈঃ বিস্তরেণোক্তস্য অয়ং সংক্ষেপঃ? ইতি অপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভিরিতি। ঋষিভিঃ—বশিষ্ঠাদিভিঃ যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং—নিরূপিতম্। বিবিধৈঃ বিচিত্রৈশ্চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যবিষয়ৈঃ। ছন্দোভিঃ—বেদৈঃ। নানা যজনীয় দেবতারূপেণ গীতম্। ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ। ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি। তথা চ ব্রহ্ম পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং

জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্। কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্রং আসীৎ", "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি, "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ, প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্য্যাদিতি শ্রুতিপদয়োঃ অর্থঃ। বিনিশ্চিতৈঃ—উপক্রমোপসংহারৈঃ একবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবম্ এতৈর্ব্বিস্তরেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতঃ তুভ্যং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণু ইত্যর্থঃ। যদ্বা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে, তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিরিতি পদানি তৈঃ হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানং ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [কোন্ সকল ব্যক্তি-কর্ত্তৃক এই বিষয় বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে, যাহার ইহাই সংক্ষেপোক্তি ? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ-কর্ত্তৃক যোগশাস্ত্রে বৈরজাদিরূপে ধ্যান-ধারণাদির বিষয় বলিয়া বহু প্রকারে যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং বিচিত্র নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদি বিষয় যাহা (ছন্দঃ) বেদ নানা যজনীয় দেবতারূপে নিরূপণ করিয়াছেন ; এবং ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা (অর্থাৎ যাহা দ্বারা ব্রহ্ম সূচিত হন, যেমন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" অর্থাৎ যাহা হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ বাক্য দ্বারা ; এবং পদ যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জানা যায়, যেমন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম—অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি স্বরূপলক্ষণপর শ্রুতি দ্বারা তাঁহারা যাহা নানারূপে নির্ণয় করিয়াছেন ; এবং যুক্তিযুক্ত শ্রুতিবাক্য যেমন—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ"—হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ মাত্র ছিল, "কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত"—অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ? যদি এই আকাশে (হৃদয়ে) আনন্দস্বরূপ আত্মা না থাকিতেন, তবে অপানের কর্ম্ম বা প্রাণের চেষ্টা কে করিত, এই আত্মাই প্রাণিগণকে আনন্দিত করেন ইত্যাদি হেতুমৎ শ্রুতির দ্বারা গীত হইয়াছে। "অন্যাৎ" পদ দ্বারা অপান চেষ্টা কে করিত, "প্রাণ্যাৎ" পদ দ্বারা প্রাণ ব্যাপার কে করিত—ইহা উক্ত শ্রুতিমধ্যস্থ পদেরই অর্থ। "বিনিশ্চিত" শব্দের অর্থ উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত এক বাক্যে অসন্দিগ্ধ প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত শব্দ দ্বারা যাহা বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে সেই দুঃসংগ্রহ (যাহার সার সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য) তত্ত্ব আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর।

অথবা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—সাধন চতুষ্টয়ের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে ইত্যাদি বেদান্তসূত্রসমূহ "ব্রহ্মসূত্র" শব্দে গৃহীত হইয়াছে, আর সেই সকল সূত্র দ্বারা ব্রহ্ম 'পদ্যতে' অর্থাৎ নিশ্চয়ীকৃত হয় বলিয়া তাহারা পদ, সেই সকল হেতুমৎ ও বিনিশ্চিতার্থক পদ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছে। অপর অংশের অর্থ পূর্ব্বের মত।

[স্বরূপ ও তটস্থ এই দুইটি লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন। যাহা নিজেই নিজের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ—তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ—যেমন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' —এগুলি তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয়। ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের কারণ—ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি] ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সমুদয় কালী প্রভৃতি রূপ—ইহারা এই কূটস্থের মধ্যে দৃশ্যমান হয়েন—ইহারাই ঋষি—ইহার প্রমাণ তন্ত্রেতে কালিকা ঋষি—ছন্দ নানা প্রকার কূটস্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মের সূত্র মেরুদণ্ডেতে আছেন-যাঁহার অন্তর্গত বিশ্বসংসার—তাহাও ক্রিয়ার দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যায়—যিনি মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কূটস্থ স্বরূপে বিরাজমান তিনিই এই শরীরের হেতু-সুন্দর ও নিশ্চিত-রূপ সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বহু শাস্ত্রে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডেও ইহার আলোচনা আছে, উপনিষদাদিতে ও বেদান্তসূত্রে এবং সিদ্ধান্তবাদিগণের সিদ্ধান্তে এই অতীব সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আলোচিত হইয়াছে সত্য কিন্তু কেবল আলোচনায় ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না। এজন্য তপস্যার প্রয়োজন। প্রাণায়ামাদি তপস্যার দ্বারা নাড়ী শুদ্ধ হইলে তবে সত্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ঐ প্রকাশ আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। সেই প্রকাশই কূটস্থ জ্যোতিঃ, তাহার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখা যায়। তখন এক শুদ্ধ নির্ম্মল রশ্মির প্রকাশ হয়, যাহার মধ্যে কোন রং নাই, উহা দেখিতে দেখিতে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া যান। সাধন করিতে করিতে সাধকের শরীরে এক বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, ঐ শক্তিই অনির্ব্বচনীয়া ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী। গায়ত্রীর প্রথমে ওঁকার ধ্বনি আপনা আপনি শুনিতে পাওয়া যায় এবং নানাপ্রকার অনাহত শব্দই শুনিতে পাওয়া যায়। তখন অন্নময় কোষও ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়, প্রাণ অন্নব্রহ্মে মিলিত হয়। প্রাণ সমস্ত ভূতের মধ্যে আছে বলিয়াই সমস্ত ভূতাদির প্রকাশ হইয়া থাকে; সেই প্রাণ ব্রহ্মেতে মিলিলে, সমস্ত ভূতও ব্রহ্মে মিলিয়া যায়—এই জ্ঞানের নাম বেদ। ইহা জানিতে হইলে ত্রয়ীবিদ্যা জানিতে হয় অর্থাৎ প্রাণ, অপান ও ব্যানের ক্রিয়া করিতে হয়। প্রাণ অপানের ক্রিয়া দ্বারা শ্বাস স্থির হইলে তখন সত্যব্রহ্মের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ এক পরমানন্দময় অবস্থার প্রকাশ হয়। এই স্থিতিই ব্যানের ক্রিয়া, যাহাকে তুরীয় অবস্থা বলে এবং ইহা জানার নামই বেদ। "ভূর্ভুবস্বঃ" এই ত্রিপদা গায়ত্রী, এই তিন লোক এক হইলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। অর্থাৎ যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এক হইয়া যায়। যখন মস্তকে বায়ু স্থির হয়, তখন প্রথম পদ, বায়ু বাহুতে স্থির হইলে দ্বিতীয় পদ, আর সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইলেই বায়ু চরম স্থির অবস্থা লাভ করে, উহাই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ। প্রাণায়াম দ্বারা অনিল স্থির হইলে স্থিতি পদ প্রকাশ পায়। এই স্থিতিই অমৃত পদ। এই অমৃত পান করিতে পারিলেই সাধক আনন্দ স্বরূপ হইয়া যান।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে "কালিকাঋষি"—এখানে ঋষির অর্থ—"যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হ'ন" (প্রকৃতিবাদ অভিধান); ইনিই চিদাকাশ, আদ্যাশক্তি বা কালিকাঋষি—"আধার-রূপা জগতস্তমেকা" ইনি সর্ব্ব বস্তুর আধাররূপে থাকিয়াও কোন পদার্থে লিপ্ত হন না। অনেক দেব দেবী ও সিদ্ধগণ কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়।

"ছন্দ"—নানাপ্রকার সাদা কাল বুটি কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়, যাহা হইতে বীণার ন্যায় ধ্বনি শোনা যায়—এই আদ্যাশক্তি ঋষি বা চিদাকাশের বিষয় শাস্ত্রে বহুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

ব্রহ্মসূত্র-পদের দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ বিনিশ্চিত হয়। ব্রহ্মসূত্র মেরুদণ্ডস্থিত সূক্ষ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্র পদ অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা রহিত হইয়া প্রাণ যখন কেবল সুষুম্নায় থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, যেখানে থাকিলে সমুদয় ব্রহ্মময় হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগীর ব্রহ্মসূত্র ধারণা সুনিশ্চিত হইয়া যায়। উহাই মুখ্যবায়ু প্রাণ স্বরূপ, প্রাণরূপা প্রকৃতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, আবার স্থির প্রাণ হইয়া ব্রহ্মরূপ হইতেছেন, সুতরাং জীবই শিব এবং শিবই ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি—তাহাই আবার—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ
ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ ॥" কঠ ২য় অঃ

"বৃদ্ধাঙ্গুলির পরিমাণ এক নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় পুরুষ, যিনি মস্তকে ভ্রূমধ্যে আছেন, তিনি দেহমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন এবং সকল শরীরকে পালন করিতেছেন, ইনি আত্মা স্বরূপ সর্ব্বদা শরীরে বাস করেন। তিনিই জগতের আদি কারণ স্বরূপ ঈশ্বর ব্রহ্ম। (লাহিড়ী মহাশয়ের বেদান্তব্যাখ্যা)।

কূটস্থ না থাকিলে ব্রহ্মসূত্র থাকে না, এবং ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত এই শরীর টিকিতে পারে না। যাঁহারা সাধনা করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই সব রহস্য কথা ভাল করিয়াই জানেন। যাঁহারা বাহিরে বাহিরে চোট দেন তাঁহাদের ভিতর খোলে না। যাঁহারা অন্তরে অন্তরে ঘা দিতে পারেন অর্থাৎ সাধন দ্বারা মনকে অন্তর্মুখ করিতে পারেন তাঁহারা বাহিরের নামরূপে ভুলেন না, তাঁহাদের ভিতরের আবরণ সরিয়া যায়, তাঁহারা তখন সত্য স্বরূপের নিরাবরণ মুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হ'ন ॥ ৪

অন্বয়। মহাভূতানি (পঞ্চব্যাপকভূত অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত সমূহ, যাহা স্থূল পঞ্চভূতের কারণ), অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার—সূক্ষ্মভূত নিচয়ের যাহা কারণ—অহং প্রত্যয় লক্ষণ অর্থাৎ "আমি" এই প্রকার বৃত্তিই যাহার লক্ষণ—[শঙ্কর]), বুদ্ধিঃ (অহঙ্কারের কারণ এবং অধ্যবসায়াত্মিকা বৃত্তিই যাহার লক্ষণ), অব্যক্তম্ এব চ (এবং মূল প্রকৃতি—বুদ্ধিরও যাহা কারণ) দশ ইন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) একং চ (আরও একটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মন) পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ (এবং শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়) ॥ ৫

শ্রীধর। তত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানিতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারঃ তৎকারণভূতঃ। বুদ্ধি বিজ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বং অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ। ইন্দ্রিয়াণি বাহ্যানি দশ—শ্রোত্রত্বগ্ঘ্রাণ দৃগ্ জিহ্বা বাক্ মেঢ্র অঙ্ঘ্রি পায়ব ইতি। একং চ মনঃ। ইন্দ্রিয় গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব। শব্দাদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ। তদেবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বানি উক্তানি ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [দুইটি শ্লোকে সেই ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছেন]—মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, আকাশ এই পঞ্চ ; তাহাদের কারণ স্বরূপ অহঙ্কার এবং বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ব, আর অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি ; দশটি বাহেন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচ) এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), আর এক হইল মন। ইন্দ্রিয় গোচর অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্ররূপ যে শব্দাদি—আকাশাদির বিশেষ গুণরূপে ব্যক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়াছে—এইভাবে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কথিত হইল॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত অতি সূক্ষ্মস্বরূপ পঞ্চতত্ত্বের অণু ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া "সোঽহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান ক্রিয়াদ্বারা অনুভব হয় তাহাতে স্থির করিয়া ক্রিয়ার দ্বারার অব্যক্ত পদেরও অনুভব হয়। তাহা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশের দ্বারা সমুদয় বস্তু লক্ষ্য হয়।—যদিও পঞ্চ মহাভূত বিশ্বের কারণ বটে, কিন্তু ব্রহ্ম-অণু হইতেই সকল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূত পঞ্চকের সমষ্টিই দ্রব্যরূপে প্রকাশিত হয় ; যেমন শালগ্রামে স্বর্ণরেখা মিলিত থাকে, তদ্রূপ আত্মার সহিত ভূতপঞ্চক পৃথক পৃথকভাবে মিলিত থাকে, ইহাদের উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অন্য দিকে মন দেওয়া। আত্মা ব্যতীত অন্য দিকে মন দিলেই জগতপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়া থাকে, আত্মাতে মন সংলীন হইলে আর প্রপঞ্চের প্রকাশ থাকে না। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন অন্য দিকে মন যায় না সেই অবস্থাই বিজ্ঞান পদ, তখন মন অন্য দিকে যায় না, সুতরাং অন্য বস্তুরও অনুভব থাকে না। সেই স্থিরাবস্থাই ব্রহ্মের স্বরূপ যাহা ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায় অনুভব হয়। এই অবস্থায় সকল বস্তুর মধ্যেই ব্রহ্ম দর্শন হয়। বস্তু ও অনন্ত ব্রহ্মও সেইজন্য অনন্ত। কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র তন্মধ্যে গুহা, সেই গুহায় প্রবেশ করিলে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই আকাশের অণুর মধ্যে সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজমান, সেখানে সবই আছে অথচ কিছুই নাই—এই অনুভব প্রথমে আমার হয়, শেষে আমিও থাকে না, অনুভবও থাকে না, তখন সব একাকার, ইহাই সমস্ত কারণের কারণ— অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় থাকার নামই জ্ঞান। "য একোঽবর্ণঃ বহুধা শক্তি যোগাদ্ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি" ইনি এক অদ্বিতীয় ও অবর্ণ অর্থাৎ জাতিশূন্য ; তাহা হইলেও তাহাতে নানা প্রকার শক্তি আছে, তিনি সেই সকল নানাবিধ শক্তি দ্বারা অনেক প্রকার বর্ণের বিধান করিতেছেন —কূটস্থের মধ্যে বহু শক্তি (যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই দেখা যায়) ও বহু মূর্ত্তির প্রকাশ হইতেছে। সেখানে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমস্তই নিরোধভাবাপন্ন হইলেও, সেই কূটস্থের শক্তিতেই সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ হয় এবং বহুদূরে গমনাগমন করিয়া যাহা দেখা যায় তাহাও সংকল্প মাত্রেই উপস্থিত হয়। যাহা কিছু দৃশ্যাদি হইতেছে বা হইবে তাহা সমস্তই কূটস্থ পটে প্রতিবিম্বিত হয়, এবং ইহার অতীত অব্যক্ত পদেরও অনুভব হয়। এই অব্যক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থাই সকলের মূল, অথচ সেখানে কিছুই নাই, সব শূন্য। কূটস্থই ক্রিয়ার পরাবস্থার ব্যক্তরূপ—তাহাতে অনন্ত অনন্ত বস্তুর রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। যেরূপ সমুদ্র হইতে বুদ্বুদ উঠিতেছে এবং তাহা

সমুদ্রেই লয় হইতেছে, সেইরূপ অব্যক্ত ব্রহ্ম সমুদ্র হইতে চরাচরের উৎপত্তি হইতেছে এবং সে সকল সেই ব্রহ্ম সমুদ্রেই আবার লয় লইতেছে। পরমাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিনিই ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইয়া সমস্ত প্রজার উপাদান স্বরূপ হইতেছেন, যাহাকে কূটস্থ বলে। উহাই বৈশ্বানর স্বরূপ "জাগ্রত" স্থান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই কূটস্থকেও আর দেখা যায় না॥ ৫

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৬

অন্বয়। ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং (ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ) সংঘাতঃ (দেহেন্দ্রিয়াদির সংহতি—এক কথায় যাহাকে দেহ বা শরীর বলে), চেতনা (চিত্তের জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি), ধৃতিঃ (ধৈর্য্য অর্থাৎ মনঃপ্রাণের ক্রিয়া যে শক্তি দ্বারা স্থির থাকে) এতৎ (ইহাই) সবিকারং ক্ষেত্রং (বিকারযুক্ত ক্ষেত্র) সমাসেন উদাহৃতম্ (সংক্ষেপে কথিত হইল) [অর্থাৎ ইহাই ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়]॥ ৬

শ্রীধর। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতি ধৈর্য্যম্। এতে ইচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বাৎ ন আত্মধর্ম্মা, অপি তু মনোধর্ম্মা এব, অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব। উপলক্ষণং চ এতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিঃ অধৃতিঃ হ্রীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি। অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারম্ ইন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়া উক্তম্। ইতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। ইচ্ছাদির অর্থ—ইচ্ছাদি অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ ইহারা প্রসিদ্ধ [অর্থাৎ পরিচয় অনাবশ্যক]। সংঘাত অর্থাৎ শরীর এবং চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি, ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য—ইহারা দৃশ্যত্ব হেতু মনোধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম নহে, সুতরাং ইহারা সঙ্কল্পাদির উপলক্ষণস্বরূপ অতএব ক্ষেত্রান্তঃপাতী। শ্রুতিও বলেন—কামনা, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়—ইহারা সমস্তই মন। এই কথা দ্বারা এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে "ক্ষেত্র যাদৃক" বলিবেন বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রধর্ম্ম সকল প্রদর্শিত হইল। ইন্দ্রিয়াদির বিকার সহিত এই ক্ষেত্র বিষয়ক কথা সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহাই ক্ষেত্র বর্ণনার উপসংহার॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তৎপরে কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে ইচ্ছা হয়-সেই ইচ্ছা [পূর্ণ] না হইলে দ্বেষ হয়—দ্বেষ করিবার ইচ্ছা কেবল সুখাভিলাষের নিমিত্ত-তাহা না হইলেই দুঃখ—দুঃখেতে মৃত্যু—মৃত্যু হইলেই জন্ম—জন্ম হইলেই কিছুদিন থাকা—এই শরীরের বিকারের সহিত সমুদয় বলিলাম।—শরীর কেন হয়, শরীর কি? শরীরের ধর্ম্মগুলি বলিয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব উপসংহার করিতেছেন। জগতপ্রপঞ্চ কেন ব্যক্ত হয়? ইহাই অনাদি ঈশ্বর ইচ্ছা বা সঙ্কল্প। জগৎ-দেহের যাহা কারণ এই ব্যষ্টি দেহেরও কারণ সেই ইচ্ছা। কোন বস্তুর প্রতি যখন আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করা যায় তখনই তদ্বিষয়ক ইচ্ছা সমুদ্ভূত হয়। তখনই আত্মার

স্বক্ষেত্র (স্থিরাবস্থা) হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে বহির্দ্দিকে অবতরণ উহার নামই সঙ্কল্প বা মন। তখনই যে বস্তুবিশেষকে আমাদের মনের ভাল লাগে, তাহাকে পাইবার জন্য মনের ঝোঁক বা বেগ হয়—উহাই ইচ্ছা। সেই স্বাভিলাষ পূর্ণ না হইলে বা তাহার সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে ক্রোধ বা বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পূর্ব্ব সংস্কার অনুরূপ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ কতকগুলি বিষয় মনের অনুকূল এবং কতকগুলি বিষয় মনের প্রতিকূল রূপে বেদন হয়। অনুকূল বিষয়গুলি সুখজনক এবং প্রতিকূল বিষয়গুলি দুঃখদায়ক ভাবে মনে প্রতীত হয়। জীবের জীবন সুখ দুঃখের কতকগুলি অনুভব মাত্র। ঈপ্সিত বস্তু পাইবার আশা ও অনভিলষিত বস্তুর ত্যাগেচ্ছা—এই দ্বন্দ্বভাব লইয়াই জীবের জীবন। এই দ্বন্দ্বভাব দ্বারাই সংসার পরিপূর্ণ—ইহারাই সংসার-সিন্ধুর বিশাল তরঙ্গমালা। এই দ্বন্দ্বভাব শেষ হইতে না হইতেই জীবন সমাপ্ত হয়। জীবনের কত আশা, কত ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকিতে থাকিতেই যবনিকা পড়িয়া যায়। কিন্তু এই মৃত্যুতেই জগৎ লীলা শেষ হয় না, সেই অসম্পূর্ণ ইচ্ছার পূর্ত্তির জন্য আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুর পরপারেও কিছু দিন ভোগময় দেহ পাইয়া সেখানেও স্বর্গ নরকাদির ভোগ হয়, ভোগান্তে আবার এই জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। আবার জন্ম আবার মৃত্যু। এ যাতায়াত আর কিছুতেই মিটিতে চায় না। এ ভ্রম কেন হয় কে বলিবে? কি জানি কিরূপে জীব নিজ নিকেতন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বহির্ম্মুখ হইয়া আসিল। সে যে আত্মা, সে যে চিরস্থির, জন্মমৃত্যুর অতীত, আসিয়াই তাহা ভুলিয়া গেল। বহির্দ্দিকে আসিয়া দেহের সহিত মিলিয়া গিয়া নিজে যে কি তাহা ভুলিয়া গেল। দেহের ধর্ম্মকে নিজধর্ম্ম মনে করিয়া দেহের জন্মমৃত্যুর সহিত আপনাকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল! দেহপ্রকৃতি জন্মমৃত্যুরূপ বিকারের অধীন, সেই দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। দেহদৃষ্টি থাকিতে জন্ম মৃত্যুর ভয় ঘুচিবার নহে, ভোগ লালসার আশা মিটিবার নহে, তাই দেহের ক্ষণিক সুখের লোভে লুব্ধ হইয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া জীব অনাত্মায় আত্মসমর্পণ করিল। জন্মাবধি জীব এই দেহ লইয়া অস্থির, দেহের অতিরিক্ত নিজ চিন্ময় স্বরূপের সন্ধান নাই, তাই দেহের সুখকেই সুখ মনে করিয়া সেই কল্পিত সুখের পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করিয়া বার বার দেহগ্রহণ ও দেহত্যাগের অভিনয় চলিতে লাগিল। দেহের ভোগ যে সুখ নহে এ কথা এখন তাহাকে কে বুঝাইবে, কে তাহাকে নিজ নিকেতনের পথ দেখাইয়া দিবে? কে তাহার মিথ্যা "আমিকে" ভুলাইয়া সত্য "আমিকে" চিনাইয়া দিবে? ওরে মূর্খ! "আমি" "আমি" করিতেছ, "আমিকে" কি কভু দেখিয়াছ? তোমার এ "দেহ-আমি" যে তোমার প্রকৃত "আমি" নয়,—সে যে দেহাতীত। দেখ দেখি দেহের উপর সোয়ার হইয়া কে বসিয়া আছেন? তাঁহার দিকে কি একবারও নজর পড়ে না? ওরে সেই যে তোমার "আমি"—সে যে নিত্য সত্য অব্যয় বস্তু, তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই। খেলিতে খেলিতে তন্ময় হইয়া অন্তঃপুর হইতে এত সরিয়া আসিয়াছি যে এখন আর মনেই পড়ে না কে আমি, কোথাকার আমি, কোথা হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি! হে জীব, তোমার নিজ গৃহ পানেই আবার তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, যে রাস্তা ধরিয়া

আসিয়াছ ঠিক সেই রাস্তা ধরিয়াই স্বগৃহে ফিরিতে হইবে,—আর অন্য পথ নাই। আমরা আসিয়াছি কোথা দিয়া জান? সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে—সেই শিবশক্তি-সমরস ভাব হইতে হটিতে হটিতে ক্রীড়োন্মত্তা বালিকার মত একবারে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। ঘরের ভিতর যতটা আলোকাকীর্ণ, ঘরের বাহিরটা তেমনই ঘন অন্ধকারে ভরা। তাই বাহির হইতে ঘরের পথের কোন ঠাহর পাইতেছি না, কেবলই অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। ঘরের কথা মনে হইতেছে আর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতেছে। পথহারা একাকী আমি এই অন্ধকারের মধ্য দিয়াই ছুটিতেছি, কিন্তু ঘরের সন্ধান পাইতেছি না। আমি একক আশ্রয়হীন, তাই দেখিয়া বহু দস্যু বন্ধুর বেশে আমাকে সময়ে সময়ে আগুলিয়া বসিয়া থাকে, পাছে তাহাদের গণ্ডী পার হইয়া যাই! পথের বার্ত্তা আমায় কে বলিয়া দিবে, কে করুণহৃদয় আমাকে আমার নিজ ঘরের পথটী ধরাইয়া দিবে, আমি সেই পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে নিজ নিকেতনে পৌছিতে পারিব। ব্যথিত চিত্তে ক্লান্ত দেহে যখন তটিনীর কূলে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছি, তখন আমার ব্যথার ব্যথী, আমার দরদী, আমার ভবপারের কাণ্ডারী, আমার শ্রীগুরুদেব আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন "উঠ বৎস, এই তরী খানিতে, এই পথ অনুসরণ করিয়া নিজেই বাহিয়া চল, তুমি নিজ নিকেতনে পৌছিতে পারিবে—"ডর নাহি কুছো ডহরা না পুছো, বাঁশরী শুনত কবীরা বাঢ় যাঙ্গ"। পথের কথা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না, কোন ভয় নাই, ঐ যে তিনি তোমার হৃদয়ে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন, ঐ বাঁশী শুন আর তরী বাহিয়া চল। তাঁহার স্নিগ্ধ শান্ত মুখমণ্ডলে যে করুণার দীপ্তি ফুটিয়াছে তাহা দেখিয়া বুঝিলাম স্বগৃহে আবার ফিরিয়া যাইতে পারিব বোধ হয়। তিনি অভয় দান করিয়া পথের সমাচার বলিয়া দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন পথে যাইতে যাইতে সেইখানেই পৌছিবে—এ রাস্তা সেইখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। এই রাস্তা "চলতা চলতা তাঁহা চলা যাঁহা নিরঞ্জন রায়"। আমি কত আশা করিয়া ভবনদীর সেই পথ ধরিয়া ধরিয়া মার্গ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কিন্তু যত সহজে যত অনায়াসে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম, এখন আর তত সহজে তত দ্রুত গৃহ পানে যাইতে সমর্থ হইতেছি না। কাহারা যেন প্রতি পাদক্ষেপে কত আমাকে বাধা দিতেছে!! আর নদী ত আঁকিয়া বাঁকিয়া কত বন্ধুর পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নদীর মাঝে মাঝে কত বাঁক, কত আবর্ত্ত, যত কাছে আসিতেছি, তত পথ যেন বিকট বলিয়া মনে হইতেছে, অগ্রসর হওয়া ক্রমে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। নদী যেন কত পথ ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, আমি এখন কোন পথ ধরিব? একই পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই একই স্থানে আসিয়া মিলিতেছে। যতবার এই বাঁকটা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস করি, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই বাঁকের মুখেই আসিয়া পড়িতেছি। আমাকে ভীত সন্দিগ্ধ দেখিয়া আবার গুরু আসিয়া বলিয়া গেলেন—"পথ দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ? সোজা পাড়ি দাও। সোজা পাড়ি দিতে দিতে তোমার তরণী আপনা আপনিই বাঁক অতিক্রম করিয়া ঠিক পথ দিয়া চলিয়া যাইবে, দূর হইতে যত আঁকা বাঁকা দেখিতেছ, চলিতে চলিতে তাহার সে বক্র-গতি আর থাকিবে না, মার্গ সরল হইয়া আসিবে।" এইবার পাড়ি দিবার কৌশল বলিয়া

(জ্ঞানের সাধন)

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭

দিতেছি—উহাই হৃদয় গ্রন্থিভেদের সাধনা, সেই প্রাণের পথ দিয়া মনের তরী চালাইয়া যাও তাহা হইলেই সেই তে-মোহানার (সত্ত্ব, রজঃ, তমগুণের, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার) বাঁক অতিক্রম করিতে পারিবে। এইরূপে নিম্ন হইতে (মূলাধার হইতে) উর্দ্ধে (আজ্ঞাচক্র) তথা হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে ঘা (ঠোকর) দিয়া একবারে বেগে যথা হইতে আরম্ভ করিয়াছিলে তথায় পৌছিতে পারিলেই—সেই বেগই গুরুকৃপায় জানাপথ দিয়া উপরের দিকে আপনা আপনি পৌছাইয়া দিবে। তখন সেখানে পৌছিয়া তুমি নিজ নিকেতনের চন্দ্রকেতন লক্ষ্য করিতে পারিবে। তখন তুমি কোথা দিয়া কেমন করিয়া নিজ নিকেতনে পৌছিয়া গিয়াছ দেখিয়া বিস্মিত হইবে। শরীরের বিকার, ইন্দ্রিয়ের বিকার, মনের ও প্রাণের বিকার সব তখন নীচে পড়িয়া থাকিবে। তখন নদীর পথ ছাড়িয়া গগন পথে চলিতে চলিতে এমন স্থানে পৌছিয়া গিয়াছ দেখিবে, যেথান হইতে আর দস্যুগণ তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইতে কোন কালেই সক্ষম হইবে না—"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে"। তখন উচ্চস্থান অধিকার করিয়া নিম্নতলের কথা আর মনে পড়িবে না—এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন—সব শুষ্ক জীর্ণ কাষ্ঠের মত তলদেশে পড়িয়া আছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইবে। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের সব বিকার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মত অসত্য ও অলীক হইয়া যাইবে। তখন সবই যেন স্বপ্নের খেলা মত কি এক ব্যাপার হইয়া গেল মনে হইবে। এই সমস্ত দেহেন্দ্রিয়ের খেলা শেষ পর্য্যন্ত থাকে না বলিয়া ইহাদিগকে শাস্ত্র অনাত্ম পদার্থ অর্থাৎ অসত্য বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও এগুলি (ক্ষেত্র পর্য্যায়ে যাহা কিছু) সবই অলীক, শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, তথাপি এই মিথ্যা প্রপঞ্চকে অবলম্বন করিয়াই প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় পৌছিতে হয়। সেই জন্য সাধকাবস্থায় এগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং সংঘাত (শরীর) চেতনা (চিদাভাস) ও ধৃতি (প্রযত্ন বিশেষ দ্বারা যে স্থিরতা জন্মে) এ সকলগুলিও আত্মপদার্থের মত নিত্য সত্য না হইলেও—ইহারাই আত্মজ্ঞান লাভের অবলম্বন, নিজ নিকেতনে পৌছিবার পথ ॥ ৬

অন্বয়। অমানিত্বম্ (আত্মশ্লাঘারাহিত্য), অদম্ভিত্বম্ (দম্ভরাহিত্য), অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জন), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জ্জবম্ (সরলতা), আচার্য্যোপাসনং (গুরু সেবা), শৌচং (পবিত্রতা, সদাচার), স্থৈর্য্যম্ (স্থিরতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (দেহেন্দ্রিয়াদির সংযম— "দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সন্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন'—শঙ্কর) ॥ ৭

• **শ্রীধর।** ইদানীম্ উক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাৎ অতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তৎ জ্ঞানসাধনানি আহ—অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্। অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্। ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্। আর্জ্জবম্ অবক্রতা। আচার্য্যোপাসনং সদ্গুরুসেবনং। শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরং চ—তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনম্। তথা চ স্মৃতিঃ—

"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্" ॥ ইতি

স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা। আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত জ্ঞেয় যে শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবেন বলিয়া "অমানিত্বাদি" পঞ্চশ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন সমূহ বলিতেছেন]—(১) অমানিত্ব—স্বগুণের শ্লাঘা অর্থাৎ প্রশংসারাহিত্য, (২) অদম্ভিত্ব—দম্ভরাহিত্য, (৩) অহিংসা—পরপীড়াবর্জ্জন, (৪) ক্ষান্তি—সহিষ্ণুতা, (৫) আর্জ্জব—অবক্রতা (অর্থাৎ সরলতা), (৬) আচার্য্যোপাসন—সদ্গুরু সেবা, (৭) শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, মৃজ্জলাদির দ্বারা বাহ্য শৌচ হয় আর রাগদ্বেষাদি মলক্ষালন (ভাবশুদ্ধি) দ্বারা অভ্যন্তর শুদ্ধি হইয়া থাকে। (৮) স্থৈর্য্য—সন্মার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তদেকনিষ্ঠতা (৯) আত্মবিনিগ্রহঃ—শরীর সংযম। "ইহারা জ্ঞানের সাধন, ইহার যে বিপরীত তাহা অজ্ঞান"—এই পঞ্চম শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয় ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মানরহিত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে হয়—দম্ভ অর্থাৎ বড়াই দর্প বুক চাড়া দিয়া চলা—অভিমান অর্থাৎ অন্যের দ্বারায় শুনিয়া আপনা আপনি মান করা কিম্বা মানের হানি হইলে আপনা আপনি অপমান বিবেচনা করা—দম্ভরহিত—অহিংসা হিংসা নাই—ক্ষান্তি—ঋজু অর্থাৎ সরল হওয়া—আর্জ্জবং সরল অর্থাৎ যাহা মনে থাকে তাহাই বলে—গুরুর উপাসনা অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে স্থির হওয়া আত্মা ব্রহ্মেতে রাখা।—শরীরদৃষ্টি হইতে (১) আত্মশ্লাঘা হয়, তখন নিজেকে জ্ঞানী, মানী, ধনী, বিদ্বান কত কি মনে হয়—নিজেকে সকলের অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়, যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় শরীরের উর্দ্ধে থাকেন তাঁহার শরীর বোধ না থাকায় শরীরজনিত অভিমানও তাঁহার থাকে না। (২) দম্ভ অর্থাৎ সর্ব্বদা নিজের বড়াই করা, আমাকেই যেন একমাত্র সর্ব্বগুণান্বিত মানুষ করিয়া ভগবান পাঠাইয়াছেন; ইহারা নিজ নিজ শক্তির বড়াই তো করেই, আবার নিজের কুটুম্ব কেহ বড়লোক আছে তাহারও বড়াই করিয়া থাকে। নিজের মঙ্গলের জন্য উপাসনা করিয়া থাকে তাহারও বড়াই করিতে ছাড়ে না—"আমি ছয়ঘণ্টা করিয়া সাধনভজন প্রত্যহ করি" ইত্যাদি। ইঁহাদের এত অভিমান যে পান থেকে চুণ খসিবার উপায় নাই। কোথায় এতটুকু মানের হানি হইল সে লক্ষ্য ইহাদের সর্ব্বদাই থাকে—এইরূপ দম্ভের অভাবই অদম্ভিত্ব। (৩) অহিংসা—প্রাণিমাত্রকেই পীড়া না দিবার আগ্রহ, সর্ব্বদাই বিপন্ন ব্যক্তিকে নিজজন বোধে সাহায্য করিবার চেষ্টা। সকলের সুখকেই নিজের সুখ মনে করা—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "যম"। এই অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে বুঝা যায় যে সাধক সর্ব্বাত্মবোধের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। হিংসা মনে থাকিতে ভগবদ্‌কৃপার কণামাত্র লাভ করাও অসম্ভব। এই অহিংসা ভাব যখন নিজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইতর প্রাণীরাও আর তাহার হিংসা করিতে পারে না। আপনাকে আপনি কেহ হিংসা করে না, সেইরূপ সর্ব্বত্র যাঁহার আত্মদর্শন হইয়া থাকে তিনি

আর কাহাকেও হিংসা করিতে পারেন না। যেখানে আত্মপ্রেমের বিস্তার সেখানে হিংসা কোথায়? (৪) ক্ষান্তি—কেহ অপকার করিলেও যিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন অর্থাৎ অন্য হইতে ক্লেশ পাইয়াও যিনি বিকারশূন্য হইয়া সব সহ্য করিতে পারেন। শিশুপুত্র পিতাকে প্রহার করিলে পিতা যেমন শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়া হাস্য করেন, এইরূপ অন্যকৃত অপকার যিনি গায়েই মাখেন না, সামর্থ্য থাকিলেও তাহার অনিষ্ট করেন না—ইহাই প্রকৃত ক্ষমা। তারপর সাধক যখন সাধনার সমস্ত ক্লেশ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করেন, এতদিনেও কিছু হইল না বলিয়া যাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, যিনি আপনার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন তাঁহার সহিষ্ণুতাই যথার্থ ক্ষান্তি। এইরূপ সহিষ্ণুতা সহকারে যাঁহারা সাধন করেন তাঁহাদের চিত্ত একদিন সমাধিসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইবেই। (৫) আর্জ্জব—ঋজুভাব, অকৌটিল্য; যে খুব সরল—তাহার ভিতর বাহির খোলা। যাহা মনে উদয় হয় তাহাই বলে, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানে না। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে প্রকৃত সরল হওয়া যায় না। এই সকল লোক কাহারও মন রাখিয়া কথা বলে না, কাহারও খাতির রাখিতে গিয়াও বক্রতা প্রকাশ করে না। লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া কি মনে করিবে এ চিন্তা তাঁহার মনে আদৌ উদয় হইতেই পারে না। এত অকুতোভয় এবং সেইজন্য এত সরল বা অবক্র হইতে পারেন। সাধনায় মত্ত পুরুষ বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিই দিতে পারেন না, তাঁহার লক্ষ্য পড়িয়া থাকে একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মে। কাহারও নিকট কিছু পাইবার আশাও করেন না, তাই কাহারও মন রাখিবার চেষ্টা করিবার তাঁহার প্রয়োজন হয় না। যে যত অবক্র বা সরল সে তত ভগবানের প্রিয় হয়। অসরল ব্যক্তির পরম পদ লাভের সম্ভাবনা কোন কালেই থাকে না। (৬) আচার্য্যোপাসনা—সদ্গুরু ও সাধু উপদেষ্টার শুশ্রূষা করা। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'—মুণ্ডক, ১।২—মোক্ষার্থী পুরুষ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে।

যাহারা অসদাচারী এবং অহঙ্কারী তাহারা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল নহে, সুতরাং তাহারা সদ্গুরুর নিকট যাইবার আবশ্যকতা অনুভব করে না, যদি বা যায় গুরুকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। যাঁহারা শাস্ত্রাভ্যাসী তাঁহারাও যদি গুরুর শরণাগত না হন, তবে তাঁহারাও পরমার্থ লাভে বঞ্চিত থাকিবেন, কারণ শাস্ত্রার্থ যথাযথ অবধারণ করিতে পারা সাধন ব্যতীত সম্ভব নহে। গুরু যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ না হন, তবে তাঁহার উপদেশেও শিষ্যের অন্তরগ্লানি বিদূরিত হইবে না, এই জন্য সাধনশীল তত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রের উপদেশ এই যে শিষ্যকে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট সমিৎপাণি হইয়া অর্থাৎ যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া যাইতে হইবে। গুরুর নিজের প্রয়োজন না থাকিতেও পারে, কিন্তু শিষ্য যদি শ্রদ্ধালু চিত্তে আপনার যথাসর্ব্বস্ব গুরুর চরণে সমর্পণ করিবার শিক্ষালাভ না করিয়া থাকেন, কোনরূপ ত্যাগে যিনি অনভ্যস্ত, তিনি সদ্গুরু প্রদর্শিত পথে চলিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। শিষ্য শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট আপনার যাহা কিছু সমস্ত অর্পণ করিলে সেইরূপ ত্যাগের

দ্বারাই তাঁহার আত্মবিষয়িণী নির্ম্মল বুদ্ধির বিকাশলাভ হইয়া থাকে এবং এই ত্যাগ যাহার যত বেশী তাঁহার পরমার্থদৃষ্টি তত পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আসলে গুরুর উপাসনা ক্রিয়া করা, যে সাধন করিতে চাহে না তাহার গুরু উপাসনা হয় না। গুরু বাহ্য বস্তুকে গ্রাহ্য করেন না, তিনি সেই শিষ্যকেই ভালবাসেন যিনি সাধননিরত। গুরুই আত্মা, এই আত্মার নিকটে কে থাকিতে পারে? যে সর্ব্বদা ক্রিয়া করে। সর্ব্বদা ক্রিয়া করিলে চিত্ত স্থির হয়, মনের সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্প সেই স্থিরে লয় হইয়া যায়—ইহাই যথার্থ গুরুপদে আত্মসমর্পণ। এইরূপ আত্ম-সমর্পণে যে অভ্যস্ত সে নিজগুরুকে সর্ব্বস্ব দিতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

(৭) শৌচ—শরীর এবং মনের পবিত্রতাই শৌচ। বাহ্য এবং আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। মৃত্তিকা, জল ও শুদ্ধ আহার দ্বারা শরীরের বাহ্যমল এবং রাগ-দ্বেষাদি দমন দ্বারা আভ্যন্তর মল প্রক্ষালন করিতে হয়। যাঁহারা বাহ্যশৌচাদিকে মনের দুর্ব্বলতা মনে করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি নাও করিতে পারেন, কিন্তু আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তির এরূপ শৌচাদিকে অনাবশ্যক মনে করা উচিত নহে। অসাধারণ পুরুষের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে অন্তঃকরণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ থাকে, তাঁহাদের শৌচাচারের আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে নিজেকে বিপন্ন ও বঞ্চিত করিবে। শুদ্ধবাস, শুদ্ধাহার, শুদ্ধকথা ও শুদ্ধসঙ্গ সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়; ইহাদের অভাবে আধিব্যাধি দ্বারা জীবনে বহু ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব পুণ্যফলে সাধনভজনে সদাভ্যস্ত তাঁহারাও যদি এই শুদ্ধাচারের দিকে লক্ষ্য না রাখেন তবে এই সকল মালিন্য তাঁহার সাধন বিষয়ে বহু বিঘ্ন আনয়ন করিবে ইহা যেন মনে থাকে। তবে বাহ্য শৌচাচার অতিরিক্ত মাত্রায় করিতে গিয়া যাহা শৌচাচারের উদ্দেশ্য তাহা হইতে অনেকে স্খলিত হইয়া পড়েন। এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(৮) স্থৈর্য্য—সন্মার্গ ও সাধনপথ যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মার্গ হইতে কখনও বিচ্যুত না হওয়াই স্থৈর্য্য। সাধন পথে সময়ে সময়ে বহুল বিঘ্ন আসিয়া সাধনের গমন পথ অবরোধ করে। বিঘ্ন হইতে মোক্ষমার্গে প্রযত্নের শিথিলতা আসে—যাহাদের চিত্ত সাধন বিষয়ে একনিষ্ঠ, তাহাদের চিত্ত এই সকল বিঘ্ন দ্বারা সাধন পথ হইতে স্খলিত হয় না। যে মনোভাব হইতে সাধন বিষয়ক প্রযত্নের শৈথিল্য না ঘটে—সেইরূপ মনোভাবকেই "স্থৈর্য্য" বলা যাইতে পারে। বাহিরের চেষ্টায় এই প্রকার স্থৈর্য্য কিছু কিছু লাভ হইলেও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা সম্ভব নহে। প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সাধন দ্বারাই প্রকৃত মন-প্রাণের স্থৈর্য্য লাভ ঘটে। যিনি এইরূপ প্রযত্নে সদাভ্যস্ত তাঁহার ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুদ্ধি আপনা আপনি স্থির হয়। যাহারা ক্রিয়া করে না অর্থাৎ অযুক্ত তাহাদের এই প্রকার বুদ্ধি স্থির হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়া করিতে করিতে যাহাদের বুদ্ধি স্থির হয় তাহারাই উপরাম লাভ করে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি আর তাহাকে বিচলিত করিয়া তাহার ব্রত ভঙ্গ করিতে পারে না, উহাই যথার্থ স্থৈর্য্য। অনেক সময় ক্রিয়া করিয়াও ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতিলাভ হয় না। ইহাও নিজেরই পূর্ব্বকর্ম্মের ফল জানিয়া আরও তীব্রতর বেগে ক্রিয়াতে প্রযত্ন করা উচিত। এই প্রযত্নের ফলে ক্রিয়ার পর অবস্থায়

স্থিতি সুদীর্ঘ হয়, কিন্তু এই স্থিতি লাভ পর্য্যন্ত সাধনায় লাগিয়া থাকিতে না পারাই জীবনের পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোচন করা সাধকের নিজের হাতেই রহিয়াছে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া ভাল করিয়া মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই মন ব্রহ্মে আটকাইয়া যায়। ভাগবতে রাসলীলার সময় ভগবানের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরত"—সুরত অর্থে রতি ক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ও বিষয়াসক্তি। এই সুরত জন্য যে আনন্দ তাহার নাম সৌরত। সেই বিষয়ানন্দ আত্মায় নিত্যই অবরুদ্ধ থাকে অর্থাৎ প্রবেশই করিতে পারে না। যাহার মন আত্মাতে আটকাইয়া থাকে তাহার বিষয় বাসনার উদয়ই হইতে পারে না। এইরূপ অবরুদ্ধ বা স্থৈর্য্যই সাধনার ঐকান্তিক লক্ষ্য।

(৯) আত্মবিনিগ্রহ—দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সন্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন করিতে না পারিলে সাধনমার্গে বহু বিঘ্নই আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য একদিকে অভ্যাসপটুতা ও অন্যদিকে বাহ্য বিষয়াদির প্রতি অনাবশ্যক আসক্ত না হওয়া সাধন-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

আত্মবিনিগ্রহের অর্থ হইল "আত্মা ব্রহ্মেতে রাখা।" অর্থাৎ মনকে অন্য বিষয়ে যাইতে না দিয়া কেবল আত্মস্থ করিয়া রাখা। শ্রীমৎ স্বামী রামানুজের ব্যাখ্যাতেও এই কথার প্রতিধ্বনি আছে—"আত্মস্বরূপব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো মনসো নিবর্ত্তনং"—আত্মস্বরূপ ব্যতীত অন্য বিষয় হইতে মনকে নিবর্ত্তিত করাই—"আত্মবিনিগ্রহ"। মধুসূদন বলিয়াছেন—"আত্মনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য স্বভাবপ্রাপ্তাং মোক্ষপ্রতিকূলে প্রবৃত্তিং নিরুধ্য মোক্ষসাধন এব ব্যবস্থাপনং"—দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের স্বভাবপ্রাপ্ত মনের যে মোক্ষবিষয়ে প্রতিকূল প্রবৃত্তি তাহাই নিরোধ করিয়া মোক্ষসাধনে ব্যবস্থাপিত করাই "আত্মবিনিগ্রহ।" এখন দেখা যাক মনকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিরূপে? আপনাতে আপনি—এই ভাবের স্থিতি হইলেই আত্মবিনিগ্রহ হয়। জোর করিয়া এই মনকে নিগ্রহ করা যায় না। আত্মবিনিগ্রহ শব্দে কেহ কেহ শরীর সংযম কেহ কেহ বা মনঃসংযম বুঝিয়াছেন। উভয়ের কথাই আংশিক সত্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় উভয়কেই সংযত করিতে হইবে, নচেৎ চিত্তকে আত্মাভিমুখ করা কঠিন। প্রথমতঃ বিষয়ের প্রতি চিত্তের বেগকে হ্রাস করিয়া আনিবার জন্য ভোগ্য বিষয়ের (শরীর ও ভোগ্য বস্তুর) অনিত্যতা চিন্তা করা আবশ্যক, পরে দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমের জন্য "আসন ও প্রাণায়াম"—এই দুইটার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যোগীরা সেই জন্য সাধনের মধ্যে আসন ও প্রাণসংযমকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। হঠযোগাদিগ্রন্থে স্বস্তিক, পদ্মাসনাদি বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজন, তথাপি তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃত "আসন" যে কি তাহা ভগবান পতঞ্জলি যোগদর্শনে উল্লেখ করিয়াছেন—"স্থিরসুখমাসনম্।" এমন ভাবে আসন করিতে হইবে যাহাতে দেহের কষ্ট না হয়, দেহের কষ্ট হইলেই মন চঞ্চল হইবে। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর অপরোক্ষানুভূতিতে বলিয়াছেন—

"সুখেনৈব ভবেদ্যস্মিন্ অজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়াৎ নেতরৎ সুখনাশনম্॥"

যে অবস্থায় সুখপূর্ব্বক অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হইতে থাকে, তাহাকেই প্রকৃত আসন বলিয়া জানিবে, অন্য আসনাদি সুখ-নাশের জন্য।

কিন্তু এই অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হইবে কিরূপে? একে তো মনের ছুটাছুটি আছেই, তাহার উপর দেহ বাঁকিয়া বসে, এই জন্য দেহটাকে ঠিক করিবার জন্য হঠযোগীরা বহুবিধ আসনের উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে দেহ ও দৈহিক বিকারের উভয়েরই শান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু দেহকে ঠিক করিতে করিতে ওদিকে যে আয়ু ফুরাইয়া যায়, আর অজস্র ব্রহ্মচিন্তন কিরূপে করিব? তাই কেবল আসনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক আধটা আসন যাহা অভ্যাস হয় তাহার উপরই নির্ভর করিয়া মনকে স্থির করিবার প্রযত্নই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়া করা আবশ্যক। "স্থির সুখমাসনম্" স্থিরতা-জনিত যে সুখ সেই স্থিরত্বে যাঁহার চিত্ত উপবিষ্ট থাকে তাঁহারই আসন-সিদ্ধি হইয়াছে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের প্রভাবে চিত্ত যখন প্রাণসহ হৃদয় দেশে অবস্থান করিতে পারে, তখন সে চিত্তে আর কোন তরঙ্গ উঠে না। এই স্থির প্রশান্ত চিত্তই ভগবানের বসিবার স্থান। নিরালম্বোপনিষদে আছে—"ব্রহ্মৈব স্বপ্রকৃতিশক্ত্যভিলেশমাশ্রিত্য লোকান্ দৃষ্ট্বান্তর্য্যামিত্বেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরঃ"—ব্রহ্ম স্বয়ং নিজ প্রকৃতিশক্তির লেশকে আশ্রয় পূর্ব্বক সকল লোক দৃষ্টি করিয়া অন্তর্য্যামী (অন্তরে গমন করিব) এতদ্রূপ চিন্তনান্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক জগতস্থ তাবৎ ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তাই ঈশ্বর। তাই চিত্ত যাহার যত অন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে প্রবিষ্ট তাহার ঈশ্বর-সান্নিধ্য তত অধিক। হৃদয়দেশে চিত্তকে স্থাপিত করিতে পারিলে তবে এই চঞ্চল চিত্ত স্থিরত্বের আনন্দ ও প্রশান্তভাবের আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। গীতাতেও "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ" বলিয়াছেন। এই শুচিদেশই হইল হৃদয়াকাশ, সেই হৃদয়াকাশেই যোগীকে আসন পাতিতে হইবে। এই আসন যাহার যত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ঈশ্বরের সহিত তত যোগযুক্ত হইতে পারিয়াছেন। এই আসনের যাহা ফল, তাহা যোগদর্শনে যেরূপে উল্লিখিত আছে তাহা বলিতেছি। ঋষি বলিয়াছেন—

"প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।" যোগদর্শন. সাধন পাদ।

আসনসিদ্ধি তখন হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে যখন "প্রযত্ন শৈথিল্য ও অনন্ত সমাপত্তি" এই দুইটী লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে যে স্বাভাবিক কর্ম্মোন্মুখতা দৃষ্ট হয়, তাহার শিথিলতার নামই "প্রযত্ন শৈথিল্য", অর্থাৎ যে সময় চিত্তের এরূপ স্থৈর্য্য হয় যে তখন আর দেহাদি অবয়ব অথবা চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় আর কোন ব্যাপারের মধ্যে ধাবিত হইতে চাহে না, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মচেষ্টা হইতে তাহাদিগকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখে, তখনই "প্রযত্ন শৈথিল্য" অবস্থা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "অনন্ত সমাপত্তি" তখনই হয় যখন চিত্ত অসীম ভাবে ভাবিত হয়, চিত্ত তখন আর সসীম ভাব লইয়া থাকিতে পারে না। অনন্তের ভাসা ভাসা উপলব্ধিও (যাহা কবিদের হয়) তাহা সম্যক্ প্রাপ্তি বা সমাপত্তি নহে। আমরা সন্ধ্যাদি পূজাকালে যে আসনশুদ্ধি করিয়া থাকি, তাহার উদ্দেশ্যও এই অসীমভাবে

চিত্তকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া। আসন মন্ত্রের তাই সুতলং ছন্দ, কূর্ম্ম দেবতা এবং মেরুপৃষ্ঠ ঋষি। মেরুদণ্ডই সেই দেবতার পীঠস্থান, তন্মধ্যস্থ শক্তিই তাহার ঋষি, ইহার ছন্দ সুতল অর্থাৎ পদতল হইতে মূলাধার ও নাভি পর্য্যন্ত বায়ু স্থির, তখন যে ভাব বা দেবশক্তির প্রকাশ হয়,—তাহাই কূর্ম্ম দেবতা। কূর্ম্ম যেমন অঙ্গ সকলকে ভিতরে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে তদ্রূপ যাঁহার মন প্রাণের মধ্যে এবং প্রাণ মহাপ্রাণ স্থিরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারই প্রকৃত আসন সিদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই আসন সিদ্ধি হইলে "ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ"—অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব জনিত চিত্তের যে ক্লেশ তাহা আর থাকিতে পারে না। এতদবস্থায় অনুকূল বা প্রতিকূল কোন ভাবের দ্বারাই চিত্ত মথিত হইতে পারে না। যে সুখস্বরূপ ব্রহ্মেঃ স্থিত হইলে অন্য কোন চিন্তার লেশও উদয় হয় না, সেই ত্রিকালস্থায়ী ব্রহ্মই আসন, সাধকের বসিবার স্থান।

দ্বিতীয় বিষয়টী প্রাণসংযম—যাহা প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা হইয়া থাকে। প্রাণের স্থিরতা না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের স্বরূপ অনুভব হয় না। প্রাণের সাধনাতেই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়। প্রাণই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রবাহিকার মধ্য দিয়া গিয়া নানাস্থানে গ্রন্থি উৎপন্ন করিয়াছে। যেমন নদীর মধ্যে আবর্ত্ত হয় সেইরূপ প্রাণধারা এই এক একটি গ্রন্থির মধ্যে সন্নিরুদ্ধ হইয়া তথায় প্রাণ-প্রবাহকে আবর্ত্তময় করিয়া তুলিয়াছে, সেই গ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মুক্তি হয় না। কারণ যাহা মুক্তির পথ তাহাই আবর্ত্তবহুল হইয়া স্বাভাবিক গতিকে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। এই আবর্ত্তকে আবর্ত্তহীন সরল করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তি সহজ পথ পাইয়া স্বস্থানে অবিলম্বে পৌছিতে পারিবে। কুণ্ডলিনীর পথকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই মুদ্রাদি সাধনের উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ হইতেই প্রাণের নিরোধ-ভাব উপস্থিত হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় আমার "অহং"-ভাবও প্রাণসত্ত্বা হইতে অভিন্ন।

এই প্রাণায়ামের ফল যোগদর্শনে আছে—"ধারণাসু যোগ্যতামনসঃ"—যোগ ধারণা বিষয়ে মনের যোগ্যতা লাভ হয়। আমাদের সময়ে সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি ভাল লাগে, কোন কোন সময়ে আকস্মিক অনেক আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধিও হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভাবগুলিকে মনের অক্ষমতা হেতু ধারণা করিয়া রাখা যায় না। সুতরাং সেই সকল অত্যুত্তম ভাবনিচয়ের স্মৃতিধারা অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাই উচ্চভাবে ভাবিত হইলেও মনের সে ভাবকে স্থায়ী করিয়া রাখা শক্ত। জলের বুদ্বুদ যেন ক্ষণপরে জলেই মিশিয়া যায়। ইহাতে স্থায়ী কল্যাণ হয় না, স্মৃতি ধ্রুবা না হইলে চিত্তশুদ্ধির বিঘ্ন করে। এই জন্য যাহা ধারণার ব্যাঘাতক ও আত্মপ্রকাশের আবরণ স্বরূপ তাহার ক্ষয় হওয়া আবশ্যক। এই আবরণ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনার উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাতেও প্রাণায়ামের কল্যাণকারিণী শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইল না। অপরোক্ষানুভূতিতে প্রাণায়ামের এই লক্ষণ করিয়াছেন—

"চিত্তাদি সর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥"

চিত্তের সমস্ত ভাবকে ব্রহ্মময়ী করিতে পারিলেই আর তাহা অন্যাকারে উপলব্ধি না হইলেই সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হয়, উহার নামই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম যতদিন সহজভাবে বোধ্য না হয় ততদিন দৃষ্টিকে ব্রহ্মময়ী করিয়া জগৎকে ব্রহ্মময় বোধ করা যায় না। কিন্তু প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের বিস্তৃতি হইলেই উহা সহজ বোধ্য হয়। প্রাণ এই দেহরূপ আধারের মধ্যে পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে, এই দেহটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহটাকে প্রাণময় করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অনন্ত বিস্তৃতি যেন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবৃত্তি রোধ হইলেই স্থিরপ্রাণের যে অনুভব হয় তাহা অনন্তব্যাপী বলিয়া মনে হয়। ব্যাপ্তির এই অসীমত্বই ব্রহ্মভাব। প্রাণ তখন সর্ব্বব্যাপী আকাশের মত হইয়া যায়—ইহাই প্রাণায়াম বা প্রাণের বিস্তার। কিন্তু মননের দ্বারা এই বিস্তার সহজ সম্পাদ্য নহে, এইজন্য দেহের মধ্যে প্রাণের যে স্পন্দন রহিয়াছে, ঐ প্রাণেতে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা নিরুদ্ধ করিতে হইবে। প্রাণের নিরন্তর স্পন্দন হইতেই অসংখ্য মনোবৃত্তি স্পন্দিত হইতেছে, সেই প্রাণের স্পন্দন রোধ করিতে পারিলেই মনকে নিরোধ করা সহজ হইবে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণের সূত্রাত্মপ্রস্তাবে বর্ণিত আছে—"যেহেতু প্রাণ ও মন একসঙ্গেই স্পন্দিত হয় বলিয়া প্রাণের সংযমে মনেরও সংযম হইয়া থাকে"। মনে ব্রহ্মবৃত্তি অখণ্ডাকারে প্রবাহিত করা কঠিন, কারণ মনের বৃত্তি রোধ করা সহজ নহে। সেইজন্য বিদ্যারণ্য মুনি স্বকীয় 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"অতি প্রবলতা হেতু যদি বাসনাসমূহকে পরিত্যাগ করিতে পারা না যায়, তবে প্রাণস্পন্দ নিরোধই উপায়।" হঠযোগ প্রদীপিকায় আছে—

"কন্দোর্দ্ধ্বং কুণ্ডলাশক্তিঃ সুপ্তা মোক্ষায় যোগিনাম্।
বন্ধনায় চ মূঢ়ানাং যস্তাং বেত্তি স যোগবিৎ॥"

কন্দের উপরিভাগে কুণ্ডলিনী শক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা সেই কুণ্ডলিনীর উত্থাপন করেন তাঁহারাই মোক্ষপ্রাপ্ত হন। আর যে মূঢ়গণ তাহা করে না, তাহারা বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সেই কুণ্ডলিনীকে যাঁহারা জাগ্রত করিবার উপায় বিদিত আছেন তাঁহারাই প্রকৃত যোগবিৎ। সুষুম্না নাড়ীর দ্বার সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে, এজন্য প্রাণবায়ু সুষুম্না মার্গে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাণায়ামাদি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইলে সুষুম্নার অবরোধ খুলিয়া যায়, তখন প্রাণবায়ু অতি সহজে সুষুম্না মধ্যে প্রবেশ করে। মধ্যপথে সুষুম্নায় প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করিলেই সাধকের উন্মনী অবস্থা লাভ হয়। স্থায়ীভাবে উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়। সুষুম্নায় প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইলে মনের যে নাশ হয় তাহা সুষুপ্তি অবস্থার মনোলয়ের মত নহে। সুষুপ্তিতে মন সুপ্ত থাকে, বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু উন্মনী অবস্থায় যোগীদের মন অমনে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বলিয়া কিছু আর তখন থাকে না।

"নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তি বিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ॥" অপরোক্ষানুভূতি

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৮

অন্তঃকরণে যখন কোন বৃত্তির স্ফুরণ থাকে না, তখন তাহাকে নির্ব্বিকার অবস্থা বলে—উহাই ব্রহ্মাকারা বৃত্তি—সেই অবস্থায় বৃত্তির সম্যক্ বিস্মরণ হয়—তাহাকেই সমাধি বলে—তাহা অজ্ঞানরূপা নহে।

প্রাণের স্পন্দনেই মনোবৃত্তি সমূহ স্পন্দিত হইয়া উঠে, যোগাভ্যাস দ্বারা সেই প্রাণ নিরুদ্ধ হইলেই মনোবৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়। উহাকে সমাধি বলে। বুদ্ধিতে বাহ্য বস্তু প্রতিবিম্বিত হইলেই বুদ্ধির একগ্রতা নষ্ট হয়। কিন্তু যে বুদ্ধি সর্ব্বদা সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহাতে অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না, সুতরাং সে বুদ্ধি তখন আত্মাকারাকারিত হয়। এই আত্মাকারাকারিত বুদ্ধিই ব্রহ্মাকারা বৃত্তি, উহাই মুক্তির হেতু। যোগকল্পক্রমে আছে—

"ধ্যেয় স্বরূপোপগতং যদা মনো, বিস্মৃত্য চাত্মানমথাবতিষ্ঠতে।
সঙ্কল্পপূগাপগতং তমন্তিমং যোগস্য সন্তোঽবয়বং প্রচক্ষ্যতে॥"

ধ্যেয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া যখন মন আপনাকে ভুলিয়া গিয়া আত্মাতেই অবস্থান করে তখন সকল প্রকার সঙ্কল্প অপগত হয়, সেই অবস্থাকেই সাধুরা যোগের চরম অবয়ব অর্থাৎ সমাধি বলিয়া থাকেন॥ ৭

অন্বয়। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ (ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য) অনহঙ্কারঃ এব চ (এবং নিরহংকারিতা), জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির মধ্যে দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা)॥ ৮

শ্রীধর। কিঞ্চ—ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষুদুঃখদোষয়োঃ অনুদর্শনং—পুনঃপুনঃ আলোচনম্। দুঃখরূপস্য দোষস্য অনুদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। জন্ম, মৃত্যু জরা, ব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আলোচনা।' অথবা জন্মাদিতে যে দুঃখরূপ দোষ রহিয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা। অপরাংশ স্পষ্ট॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়ের নিমিত্তে কোন বিষয় ইচ্ছা না করা—মনে অহঙ্কার করা, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের অনুসন্ধান।—(১০) ইন্দ্রিয়ে বিষয়ভোগে অস্পৃহা। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় দুই প্রকার—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। মন ইন্দ্রিয়দের সহিত মিলিত হইয়া সেই সকল দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় ভোগ করে এবং আসক্তিবশতঃ আবদ্ধ হয়; সুতরাং বিচার দ্বারা বিষয়ের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে আর তাহাতে স্পৃহা থাকিবে না। (১১) অনহঙ্কার অর্থাৎ অহঙ্কার শূন্যতা। (১২) জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ দোষানুদর্শন—জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতিতে যে দুঃখ রহিয়াছে তাহার আলোচনা করা। জন্ম হইলেই গর্ভবাস এবং গর্ভ হইতে যোনিদ্বার দিয়া নিঃসরণ, মৃত্যুর সময় বিবিধ ক্লেশ, মর্ম্মস্থান ছিন্ন করিয়া প্রাণের

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

উৎক্রমণ এবং নিরাশ্রয় হেতু মনের ভয়, অত্যন্ত স্থবিরাবস্থাই জরা, তাহাতে হস্ত পদাদি ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং মনেরও শক্তি কমিয়া যায়, বুদ্ধির প্রাখর্য্যেরও ব্যতিক্রম ঘটে ; এ অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর, এ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা কেবল কষ্টভোগ মাত্র। ইহার উপর ব্যাধি, নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক দৈহিক পীড়া—এই সকল দুঃখভোগের কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে দেহ ধারণের বাসনা এবং দেহজনিত বিবিধ ভোগ-বাসনা ক্ষীণ হইতে থাকে। সুতরাং এতদালোচনা যে জ্ঞান লাভের অনুকূল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

[শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদিদুঃখান্তেষু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্"—জন্ম, মরণ, বার্দ্ধক্য, ব্যাধিসমূহ ও অন্যান্য দুঃখ সমূহ—এই কয়টি বস্তুর প্রত্যেকটিতেই দোষদর্শন অর্থাৎ আলোচনা করা। অথবা—"দুঃখান্যেব দোষঃ দুঃখদোষস্তস্য জন্মাদিষু পূর্ব্ববদনুদর্শনম্। দুঃখং জন্ম, দুঃখং মৃত্যু, দুঃখং জরা, দুঃখং ব্যাধয়ঃ, দুঃখনিমিত্তত্বাৎ জন্মাদয়ো দুঃখং। ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখমিতি। এবং জন্মাদিষু দুঃখ দোষানুদর্শনাৎ দেহেন্দ্রিয় বিষয়ভোগাদিষু বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তি করণানামাত্মদর্শনায়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্"—অথবা দুঃখ সমূহই দোষ এই অর্থে দুঃখদোষ শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই 'দুঃখদোষ' শব্দটি জন্মাদি শব্দগুলির সহিত অন্বয় করিতে হইবে। যথা জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিসমূহও দুঃখ। জন্ম প্রভৃতি স্বরূপতঃ দুঃখ নহে, কিন্তু উহারা দুঃখের কারণ, এইজন্য দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। এই প্রকার জন্ম প্রভৃতিতে দুঃখ দোষানুদর্শনের দ্বারা দেহেন্দ্রিয় ও বিষয়-ভোগ সমূহে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর পরমার্থদর্শনের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জন্মাদিতে দুঃখ দর্শন ও জ্ঞানের হেতু বলিয়া উহা জ্ঞান শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় ক্লেশকর চিন্তা করিতে করিতে ভোগ-বাসনা হ্রাস হইয়া আসে এবং দেহ ধারণের জন্যও বলবতী স্পৃহা থাকে না—এইজন্য জন্মমৃত্যু প্রভৃতির দোষানুসন্ধান আত্মজ্ঞান লাভের পরম সহায় ॥ ৮

অন্বয়। পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র স্ত্রী গৃহাদিতে) অসক্তিঃ (প্রীতিবর্জ্জন), অনভিষ্বঙ্গঃ (তাহাদের সুখদুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ (এবং ইষ্টলাভে বা অনিষ্টপাতে) নিত্যং সমচিত্তত্বং (সর্ব্বদা চিত্তের সমভাব) ॥ ৯

শ্রীধর। কিঞ্চ—অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষু অসক্তিঃ—প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষ্বঙ্গঃ—পুত্রাদীনাং সুখেদুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী চ ইতি অধ্যাসাতিরেকাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়োঃ উপপত্তিষু—প্রাপ্তিষু, নিত্যং—সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—পুত্রাদিতে অসক্তি অর্থাৎ প্রীতিত্যাগ। অনভিষ্বঙ্গ অর্থাৎ পুত্র প্রভৃতির সুখে বা দুঃখে আমিই সুখী বা দুঃখী এইরূপ অধ্যাসের যে আধিক্য তাহার অভাব। ইষ্ট এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমচিত্ততা ॥ ৯

মরি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত পুত্রদারগৃহাদির সহিত সঙ্গ—সমান রকম চিন্তা ভাল মন্দ দুয়েতে।—(১৩) অসক্তি—স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে জীবের মমতা স্বভাবতঃই অধিক হইয়া থাকে, এবং সেইজন্য তত্তৎ বিষয়ে কতই সঙ্কল্প বিকল্পের ঢেউ উঠিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করে। তাহাদের সুখদুঃখে আপনাকে সুখী দুঃখী, তাহাদের জীবন মরণে নিজের জীবন মরণ এইরূপ ভাবই হইল অভিষ্বঙ্গ, এই সকল বিষয়ে মনোযোগের অভাবই (১৪) অনভিষ্বঙ্গ। যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান হয় তাঁহার স্ত্রী পুত্র গৃহাদির প্রতি কোন আসক্তিই থাকে না। ঐ সকল বস্তুর সঙ্গলাভেও তাঁহার প্রীতি উৎপন্ন হয় না, তাহাদের সঙ্গের অভাবেও তাঁহার কোন দুঃখ বা অভাব বোধ হয় না। (১৫) সমচিত্তত্ব—তাহাদের সুখ দুঃখাদিতেও তাঁহার চিত্তের সমতা নষ্ট হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় যাঁহারা বিভোর এসব সাংসারিক কোন কথাই তাঁহাদের মনে উদয় হয় না ॥ ৯

অন্বয়। ময়ি চ (আর আমাতে) অনন্যযোগেন (অনন্যযোগ দ্বারা) অব্যভিচারিণীভক্তিঃ (ঐকান্তিক ভক্তি), বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জ্জন স্থানে বাস) জনসংসদি (জন সঙ্গে) অরতিঃ (বিরাগ) ॥ ১০

শ্রীধর। কিঞ্চ — ময়িচেতি। ময়ি — পরমেশ্বরে। অনন্যযোগেন — সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা। অব্যভিচারিণী — একান্তা ভক্তিঃ। বিবিক্তঃ—শুদ্ধঃ চিত্তপ্রসাদকরঃ, তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্। প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি—সভায়াম্, অরতিঃ—রত্যভাব ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—পরমেশ্বর স্বরূপ যে আমি সেই আমাতে অনন্যযোগ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মদৃষ্টি দ্বারা একান্ত ভক্তি, শুদ্ধ এবং চিত্তপ্রসাদকর যে দেশ সেইরূপ দেশেই অবস্থান করা যাঁহার স্বভাব তাঁহার ভাবই 'বিবিক্তদেশসেবিত্ব' আর প্রাকৃত লোকদিগের সভায় থাকার অনিচ্ছা ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই আপনা আপনি হইবে—ক্রিয়াতে মন রেখে অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া থাকা উচিত—আসক্তিপূর্ব্বক অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেই সুতরাং ব্যভিচারী দোষগ্রস্ত সকলেই যাহারা আত্মাতে নেই—সদা আত্মক্রিয়া, আত্মচিন্তা, আত্মমনন, ও আত্মজ্ঞান ও কাজে কাজেই হইলেন। সকল ন্যাংটার মধ্যে এক কাপড় পরা—সেই অগ্রাহ্য; নির্জ্জন অর্থাৎ কোনদিকে আসক্তিপূর্ব্বক মন না দেওয়া এবং কোন লোকের প্রতি আসক্তিপূর্ব্বক না দেখা।—পরমেশ্বর স্বরূপ যে "আমি" সেই আমি বা আত্মাতে অনন্যযোগের সহিত (১৬) অব্যভিচারিণী ভক্তি হওয়া চাই। অনন্যযোগ কাহাকে বলে? একান্ত চিত্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ। শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"ন অন্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরোঽস্তি, অতঃ স এব নো গতিরিত্যেবং নিশ্চিতা অব্যভিচারিণী বুদ্ধিঃ অনন্যযোগঃ, তেন ভজনং ভক্তিঃ। ন ব্যভিচরণশীলা অব্যভি-

চারিণী সা চ জ্ঞানং”—ভগবান বাসুদেব হইতে অন্য কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, অতএব তিনিই আমাদের একমাত্র গতি এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধিকেই অনন্যযোগ বলা যায়। সেই অনন্যযোগের সহিত যে ভক্তি বা ভজন তাহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। সেই ভক্তিও জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়। আবার ক্রিয়ার পর অবস্থাই প্রকৃত “জ্ঞান,” সেই জ্ঞান লাভ হয় যদি ফল কামনা রহিত হইয়া অবিচলিতভাবে ক্রিয়া করা যায়। এইভাবে ক্রিয়া করিতে করিতে আর অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তির সহিত দৃষ্টি থাকে না, লক্ষ্য সর্ব্বদা আত্মাতেই থাকে। আত্মাতে লক্ষ্য না থাকিলেই মন ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সাধক যখন অনুভব করেন যে “ভগবান বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই,” সুতরাং তিনি আমার সর্ব্বস্ব, তখন তিনি তাঁহাকে ভজন না করিয়া অন্য বস্তুর প্রতি আসক্তি দেখাইবেন কেন? সাধকের অব্যভিচারিণী ভক্তি এখানে জ্ঞানের অন্যতম লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করা হইল। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য কোন বোধ না থাকায়, সেই অবস্থায় যে ভজন তাহাই অনন্য ভক্তি। অর্থাৎ তাহাতে স্থিতি; তাহাই প্রকৃত ভক্তি।

এই বোধ ভজন করিতে করিতেই হয় বটে, কিন্তু কখন হয়? যে বিশ্বব্যাপী আত্মা সর্ব্বত্র ও সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, যখন তাঁহাকে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এইরূপ আত্মদর্শন আমাদের সকলের হয় না কেন? কারণ আমাদের মন বহির্ম্মুখ হইয়া নিজ কল্পনাবলে অবস্তুতে (যাহা প্রকৃত কোন বস্তু নহে) বস্তু দর্শন করে এবং তাহাই সত্য ভাবিয়া সেই সকল কল্পিত বস্তুকে ভোগার্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদি সংগ্রহে সমর্থ হয় তখন তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না, আর যদি সংগ্রহে অসমর্থ হয় তাহা হইলে শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হয়। কিন্তু উহা যে আকাশের গায়ে মূর্ত্তি কল্পনার ন্যায় অলীক তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সামর্থ্য তখন তাহার থাকে না, তজ্জন্য তাহাদের চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে ও নিরানন্দে ভরিয়া যায়। এই মিথ্যা কল্পনার কবল হইতে মুক্তি না পাইলে জীবের শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? জীবের গতি মুক্তি যে সেই চির স্থির চিদানন্দময় আত্মা। তিনি যে পরম শূন্য, কারণ সেখানে মনও নাই, কল্পনাও নাই, ভোক্তা ভোগ্য সম্বন্ধও সেখানে নাই, সুতরাং বস্তুর প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সেই সুখময়ী শান্তি নিদ্রার কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই সুখময় শান্তিময় অবস্থা পাওয়া যায় কিরূপে? সর্ব্বদা আত্মক্রিয়া, আত্মচিন্তা ও আত্মমননের দ্বারা মনের নিবিড় কল্পনা মেঘ কাটিয়া যায়, কল্পনা তিরোহিত হইলেই আত্মজ্ঞানের উষাস্নিগ্ধ-কিরণে মন-প্রাণ ও দেহ ভরিয়া যায়। তখন কোন দিকে আসক্তি নাই, কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি নাই—তখন মন জনশূন্য অরণ্যের মত নিস্তব্ধ কোলাহল শূন্য। সে কি সুন্দর অবস্থা! এই অবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, অন্য দিকে দৃষ্টি না দিয়া মন দিয়া কেবল ক্রিয়া করিতে পারিলে এই অপূর্ব্ব অবস্থাকে আয়ত্ত করা যায়। আত্মা ব্যতীত অন্য বিষয়ে আসক্তি হইলেই চিত্তের পবিত্রতা নষ্ট হয়, চিত্ত তখন ব্যভিচারদোষগ্রস্ত হয়। মনের বিষয়রতি থাকিতে ঐকান্তিকভাবে আত্মায় যোগস্থাপন হয় না। সেই জন্য সর্ব্বদা আত্মক্রিয়া ও আত্মমননে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সাধক তীব্র চেষ্টাশীল ও যাঁহার চিত্ত তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত তাঁহার

এ অবস্থা লাভ করিতে বিলম্ব হয় না। এই অবস্থা পাইলে তাঁহার জগৎ-বিস্মৃতি ঘটে, তখন "আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে" এইরূপ ভাব হয়। ইহাই মনের অব্যভিচারী ভাব। এই অবস্থাতে আত্মার সহিত অনন্যযোগ হওয়ায় ভগবানে অকপট প্রেম সংস্থাপিত হয়। ইহাই অবিচলিত স্থির ভাব বা ভক্তি। এই অবস্থা লাভের জন্য (১৭) বিবিক্তদেশসেবিত্ব ও (১৮) জনসংসদিতে অরতি আবশ্যক। বিবিক্ত দেশ কাহাকে বলে? "বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বা অশুচ্যাদিভিঃ সর্পব্যাঘ্রাদিভিঃ চ রহিতঃ, অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদি বিবিক্তো দেশঃ"—যে স্থান স্বভাবতঃ পবিত্র অথবা যে স্থান সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ এবং যে স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরা বিচরণ করে না. সেই স্থানকে বিবিক্ত দেশ বলা যায়, যেমন অরণ্য, নদীপুলিন বা দেবমন্দির প্রভৃতি। নির্জ্জন স্থানে বা বিবিক্তদেশে বাস করিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। এই জন্য আত্মহিতেচ্ছু সাধকগণ মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া দৃঢ়ভাবে সাধনায় মনোনিবেশ করিবেন। যে স্থানে লোকসমাগম হয় সেইখানে বহু কথাবার্ত্তায় কেবল বিষয়ের সংশ্রব হইতে থাকে, বিষয়-সংশ্রব হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবচ্চিন্তন হইতে পারে না। অবিচ্ছিন্ন ভগবচ্চিন্তন না হইলে মন বিক্ষেপশূন্য ও শুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত নির্জ্জন স্থানও পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, কেহ না থাকিলে আমার মন তো থাকিবেই। মন যে একাই একশো, সে একাই সমস্ত গণ্ডগোল টানিয়া আনিবে। অতএব মন বাঁচিয়া থাকিতে নির্জ্জন হইবার আশা নাই। বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তিই যাবতীয় কোলাহলের হেতু; সেই মন যদি আসক্তিপূর্ব্বক কোন কিছু স্মরণ না করে তবেই মন অসঙ্গ হইতে পারে, মন অসঙ্গ হইলেই জনশূন্য স্থানে বাস ঠিক হয়। যাঁহার চিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অসঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আর লোককল্পিত ব্যবহারে মন যাইবে কেন? তিনি কোন লোকের সহিত আসক্তিপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে অসমর্থ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাঁহার মন শ্মশানের মত শূন্য হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তিনি আর তেমন করিয়া লোকব্যবহার করিতে না পারায় লোকেও আর তাঁহার নিকট ঘেঁসে না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত মন লইয়া নির্জ্জন হিমাদ্রিশৃঙ্গে বাস করিলেও বিষয়-সংস্কার বিদূরিত হয় না এবং বিষয়-সংস্পর্শ থাকিলেই কোন না কোন সময় বুদ্ধির বিকলতা ঘটিবেই ঘটিবে এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইলে কল্যাণমার্গ হইতে নিশ্চয়ই বিভ্রষ্ট হইতে হইবে। অবশ্য সাধনার স্থান উপদ্রববর্জ্জিত না হইলে সাধনার ঠিক অনুকূল হয় না বটে, কিন্তু এ সব বাহিরের উপদ্রব অনায়াসে বর্জ্জন করা যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপদ্রব করে আমার দেহেন্দ্রিয় ও মন। তাহাদের সঙ্গত্যাগ সহজে হইবার নহে, এবং উহাদের সঙ্গ থাকিতে নিরুপদ্রব হওয়া অসম্ভব। উহারা থাকিতে চিত্তপ্রসন্নতা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বাহিরের বিবিক্ত স্থানে সাময়িক ভাবে চিত্তের প্রসন্নতা হয়তো হইতে পারে, এইজন্যই সাধনার স্থানটী উপদ্রবরহিত হইয়া যাহাতে সাধনার অনুকূল হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য দিতেই হইবে, কিন্তু শুধু উপদ্রবশূন্য স্থান হইলেও চলিবে না। যাহারা গোলযোগ বাধায় সেই দেহেন্দ্রিয়াদি মনকে নিরস্ত করিতে হইবে। তাহা কিরূপে করিতে হইবে? প্রাণায়াম দ্বারা। প্রাণায়াম-রূপ পরম তপস্যার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মশূন্যতা অবস্থা আসে। কর্ম্মই অজ্ঞানের

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

প্রাণস্থানীয় সুতরাং কর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইলে অজ্ঞানও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান ক্ষীণ হইলে মনের চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না, মন অচঞ্চল হইলে দেহেন্দ্রিয়াদিকৃত কর্ম্মে জীবাত্মার অভিমান আসিবে না। অতএব মন দিয়া ক্রিয়া করা আবশ্যক, মন দিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে এক প্রকার নেশার মত বোধ হয়, তখন বাহ্য উপদ্রবাদি মনকে আর বিষয়ের পানে টানিয়া আনিতে পারে না। সাধক তখন সেই নেশায় ভোর হইয়া আপনাকে ও আপনার বহিস্থ বিষয়কে ভুলিয়া যান। এইজন্যই আত্মজ্ঞানলাভে সদা উদ্যোগ চাই। কূটস্থদর্শনও অধ্যাত্মজ্ঞান বটে কিন্তু তাহাও চরম জ্ঞান নহে। চরম জ্ঞান ক্রিয়ার পরাবস্থায় উদিত হয়। তখন দৃশ্যদর্শন লোপ পায়। ভগবানও বলিয়াছেন—"যদ্দৃষ্টং বিশ্বরূপং মে মায়ামাত্রং তদেবহি তেন ভ্রান্তোঽসি কৌন্তেয় স্ব স্বরূপং বিচিন্তয়"। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্বস্বরূপের জ্ঞান হয়। জনসমাগমে অনিচ্ছা ও কোন লোকের বা বস্তুর প্রতি আসক্তি তখন সম্ভবই হয় না। বাহিরের সঙ্গ ত্যাগ তো কঠিন নহে, কিন্তু মনের দ্বারা বিষয়ালোচনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। বাহিরের দুঃসঙ্গ ত্যাগও তত কঠিন নহে, কিন্তু পুত্র, কলত্র, বিত্ত, গৃহাদির প্রতি যে অত্যধিক আসক্তি রহিয়াছে তাহার বন্ধনই সর্ব্বাপেক্ষা দুশ্ছেদ্য। এইজন্য বাহিরের ও ভিতরের সর্ব্ব প্রকার সঙ্গই বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু জনসঙ্গ অপ্রয়োজনীয় হইলেও সাধুসঙ্গ সাধনার সময় বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সদ্ভাব পরিপুষ্ট হয় না, মনে সাধুভাবের অভাব হইলে অসৎ কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি আসিবে না ॥ ১০

অন্বয়। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞানে সদা নিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা ফল-সম্বন্ধে আলোচনা) এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ (এই সকলকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বলা হয়)। অতঃ (ইহা হইতে) যৎ অন্যথা (যাহা বিপরীত) অজ্ঞানম্ (তাহা অজ্ঞান) ॥ ১১

শ্রীধর। কিঞ্চ—অধ্যাত্মেতি। আত্মানং অধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ। ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বং ইত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ—প্রয়োজনং মোক্ষঃ তস্য দর্শনম্ মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টতালোচনমিত্যর্থঃ। এতদ্ অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্ ইত্যাদি বিংশতি সংখ্যকং যদুক্তং এতদ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানসাধনত্বাৎ। অতোঽন্যথা—অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যৎ এতৎ অজ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভিঃ জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন] আত্মাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া বর্ত্তমান যে জ্ঞান সেই অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যভাব অর্থাৎ "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থ শুদ্ধির জন্য নিষ্ঠত্ব অর্থাৎ তাহাতে বিশ্বাস। তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বা প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার আলোচনা। অমানিত্ব, অদম্ভিত্বাদি জ্ঞানের সাধন বলিয়া বশিষ্ঠাদি এই বিংশতি সংখ্যককে

জ্ঞান বলিয়াছেন। ইহার বিপরীত মানিত্ব প্রভৃতি অজ্ঞান, কারণ ঐগুলি জ্ঞানের বিরোধী এইজন্য সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাতেই সর্ব্বদা ক্রিয়া করা যাহা গুরু বাক্যের দ্বারায় লভ্য—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ কিনা রূপ কূটস্থের ক্রিয়ার দ্বারায় জানা দেখা—ইহারই নাম জ্ঞান—ইহা ব্যতীত অন্যদিকে আসক্তি পূর্ব্বক দেখার নাম অজ্ঞান।—(১৯) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব (২০) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—আত্মজ্ঞান লাভে সদা উদ্যোগ। আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যে জ্ঞান তাহাই অধ্যাত্মজ্ঞান, সেই অধ্যাত্মজ্ঞানই সত্য, আর যাহা কিছু সমস্ত মিথ্যা এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া আত্মজ্ঞানের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা বা চেষ্টাই "অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব"। আত্মাকে অধিকৃত করিয়া জ্ঞান এবং দেহকে অধিকৃত করিয়া জ্ঞান—এই দুই প্রকারেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। দেহকে অধিকৃত করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নিত্য সত্য নহে। কারণ দেহাদি প্রাকৃত বস্তু সুতরাং তাহার ধর্ম্ম নিত্য হইতে পারে না, আত্মবিষয়ক জ্ঞানই পরম সত্য—তাহা অপরিবর্ত্তনীয়, উহার অনুভবের চেষ্টার নামই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা। গুরূপদেশ মত সর্ব্বদা সাধন অভ্যাস করিতে করিতে সাধনার ফলরূপ স্থিরতা লাভ হয়। স্থিরত্বের অনুভব হইলেই আনন্দ লাভ হয়, তখন বুঝিতে পারা যায় এতদপেক্ষা অন্য সকল লাভই যৎসামান্য, তখন অন্য বস্তুর জন্য চিত্ত লালায়িত না হইয়া এই আত্মক্রিয়া করিতেই মনের একমাত্র আগ্রহ হয় উহার নামই আত্মনিষ্ঠা। এইরূপ আত্মনিষ্ঠা হইতেই তত্ত্বজ্ঞানের যাহা যথার্থ স্বরূপ সেই কূটস্থকে দেখিতে পাওয়া যায়। কূটস্থকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে সেই কূটস্থই তোমার প্রকৃত "আমি"। আবার এই কূটস্থ যখন "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং" রূপে সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন দেখিতে পাইবে তখন তুমি ও অন্য ব্যক্তি যে পৃথক সেই পার্থক্য জ্ঞান তিরোহিত হইবে, তখনই তোমার জ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখনই "তৎ" অর্থাৎ কূটস্থই যে "তুমি" এই জ্ঞান প্রকাশ পাইতে থাকিবে। এই জ্ঞান লাভের জন্য সর্ব্বদা উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে তোমার আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা হইয়াছে। জ্ঞানের স্বভাব বস্তুকে প্রকাশ করা এবং অজ্ঞানের স্বভাব বস্তুর স্বরূপকে আচ্ছাদন করা। প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরেই সেই বস্তু রহিয়াছে, কিন্তু দেহাবরণ তাহা জানিতে দেয় না, এই জন্য এই দেহটাই জ্ঞানের অবরোধক। যে এই দেহ ব্যতীত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না তাহার জ্ঞানই প্রকৃত অজ্ঞান। দেহের মধ্যে যিনি সেই প্রকৃত আমার "আমি" কূটস্থ জ্যোতিঃকে দর্শন করেন, তাঁহার দেহাত্মবোধরূপ যে অজ্ঞান তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞানের স্বভাব বস্তুকে আবরণ করা এবং তাহাকে অন্য কিছু বলিয়া বোধ জন্মাইয়া দেওয়া। চঞ্চল প্রাণের মধ্যেই সেই অবিদ্যার বীজ নিহিত থাকে। প্রাণ চঞ্চল হইয়া স্পন্দিত হইলেই কল্পনার প্রবাহ বা মনের অভ্যুদয় হয় এবং এই চঞ্চল মনই বিরাট সংসাররূপ কুহক রচনা করে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাণের

(জ্ঞেয় বস্তুই ব্রহ্ম)

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২

স্থিরতার সহিত মন স্থির হইলেই আর এই বিশ্বকৌতুক পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং অজ্ঞানে যাহা থাকে জ্ঞানের প্রকাশে তাহা থাকে না বলিয়া ইহাকে মায়া বা অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি বলা হয়। এই মায়া এবং মায়ার অতীত যে বস্তু রহিয়াছেন তাহা জানিতে পারার নামই বেদ বা জ্ঞান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই জানার অন্ত হয়, সেই "পরাবস্থার" সাক্ষাৎ না হইলে বেদান্তের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে না। আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে যত দিন আসক্তি থাকিবে ততদিন অজ্ঞান ছুটিবে না। অনাত্মজ্ঞান তিরোহিত করিবার উপায়ই হইল ক্রিয়া, যাহার এই ক্রিয়াতে নিষ্ঠা নাই, তাহার অনুভব পদ লাভ হইবার নহে॥ ১১

অন্বয়। যৎ জ্ঞেয়ং (যাহা জ্ঞেয়) তৎ প্রবক্ষ্যামি (তাহা বলিব), যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) অমৃতম্ অশ্নুতে (অমৃত বা মোক্ষলাভ হয়), তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম (তাহাই আদিহীন পরব্রহ্ম), তৎ (তাহা) ন সৎ ন অসৎ (সৎও নহে অসৎও নহে), উচ্যতে (বলিয়া উক্ত হয়)॥ ১২

শ্রীধর। এভিঃ সাধনৈঃ যজ্‌ জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্‌ভিঃ। যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুঃ আদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি। যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং—মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ? অনাদিমৎ—আদিমৎ ন ভবতি ইতি অনাদিমৎ। পরং—নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। অনাদি ইতি এতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি, পুনর্মতুপঃ প্রয়োগঃ ছান্দসঃ। যদ্বা অনাদি ইতি মৎপরঞ্চেতি পদদ্বয়ম্। মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষং রূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ। ন সৎ ন চাসৎ উচ্যতে। বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সৎ শব্দেন উচ্যতে। নিষেধস্য বিষয়ঃ তু অসৎ শব্দেন উচ্যতে। ইদং তু তদুভয়বিলক্ষণম্, অবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [এই সকল সাধনার দ্বারা যাহা জ্ঞেয় তাহা ছয়টি শ্লোকে বলিতেছেন] —যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি। শ্রোতার আদরসিদ্ধ্যর্থ (শ্রোতার শ্রবণে যত্নাধিক্য হয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থকে জানিবার জন্য অধিকতর উৎসাহ হয় এই নিমিত্ত) জ্ঞান ফল যে কি তাহাই দেখাইতেছেন। যে বক্ষ্যমাণ বিষয় জানিলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা কি? তিনি অনাদিমৎ অর্থাৎ আদিমৎ নহেন। তিনি পরং অর্থাৎ নিরতিশয় ব্রহ্ম স্বরূপ। অনাদি পদটীতে (নাই আদি যাহার) বহুব্রীহি সমাস করিলেই অনাদিমৎ পদের উক্ত যে অর্থ তাহা সিদ্ধ হয়, তবে যে অনাদিমৎ (আদিমৎ যাহা নহে) এই নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাসসিদ্ধ পদের প্রয়োগ করা হইল তাহা ছান্দস। অথবা অনাদি এবং মৎপর এইরূপ দুইটী পদ। মৎপর শব্দের অর্থ আমি যে বিষ্ণু, আমার পর অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ রূপ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম যে কি তাহাই বলিতেছেন—"ন সৎ ন অসৎ"—সেই ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন। বিধিমুখে যাহা প্রমাণের বিষয় তাহাই "সৎ" শব্দ বাচ্য, এবং যাহা নিষেধের বিষয়

তাহাই "অসৎ" শব্দ বাচ্য। কিন্তু জ্ঞেয় স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি উভয় হইতে বিলক্ষণ, কারণ ব্রহ্ম অবিষয়। [ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু হয় "সৎ" অর্থাৎ অস্তি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আছে, নচেৎ "অসৎ" নাস্তি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম অবাঙ্‌মানসগোচর, সেজন্য অস্তি কি নাস্তি এই দুইটী বুদ্ধির কোনটীকেই আশ্রয় করিয়া নাই] ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যে বস্তু—কূটস্থ ব্রহ্ম—তাহা ভালরূপে বলিতেছি—যাহা জানিলে আমার পদকে পায়—যাহার আদি নাই অর্থাৎ কোন সময়ে নেশা—ক্রিয়ার পর অবস্থার—সুরু হইল তাহা অনুভব হয় না; তখন আমাতে আমি নাই, তিনি পরব্রহ্ম, সকলের পর ধ্রুব নিশ্চিত—তখন সৎ অসৎ দুইই—বর্জ্জিত অর্থাৎ দৃশ্য ও দ্রষ্টা কেহই নাই।—কূটস্থ ব্রহ্মই জ্ঞেয় বস্তু। এই কূটস্থকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। এই দেহটা মরিয়া যায়, কূটস্থের তো আর মৃত্যু নাই, এই কূটস্থকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর খেলা শেষ হইয়া অমরত্ব লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞেয় বলিলেই মনে হয় জ্ঞাতার যিনি জ্ঞানের বিষয়, তাহা হইলেই জ্ঞেয় পদার্থ সাধারণ বস্তুর মত হইয়া গেল। চক্ষুর জ্ঞেয় যেমন দৃশ্য বস্তু উহা কিন্তু সেরূপ জ্ঞেয় নহে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি সেই জ্ঞেয় সম্বন্ধে বলিতেছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—অর্থাৎ তিনি বাক্য মনের অতীত। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তখন আমাতে আমি থাকে না, সে অবস্থায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা কিছুই থাকে না। বুদ্ধির অতীত সেই পরমাত্মাকে বুদ্ধিরও জানিবার সামর্থ্য নাই। সেই জন্য বলা হইল তিনি সৎ অসৎ কিছুই নহেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৎ পদার্থ নহেন, তাই বলিয়া তিনি যে নাই তাহাও নহে, তাহার ঝলক বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়। পরে বুদ্ধিও যখন থাকে না, তখন বোদ্ধাও থাকে না, কিন্তু তিনি থাকেন, সেই যে থাকা বা অস্তিত্ব মাত্র সত্তাকেই জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। বেদ বলিতেছেন—"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমপরো যদিতি"—(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল)—সৃষ্টি বিকাশের পূর্ব্বে অসৎ বা শূন্য, সৎ বা ব্যক্ত প্রভৃতি কিছুই ছিল না। যাহা দ্বারা জানা যায় সেই করণ সমূহ ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। বরং মন ইন্দ্রিয়াদি সহ বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না। অগাধ সিন্ধুর তলদেশে যে অসীম আকাশ বর্ত্তমান তাহা যেমন সলিল রাশির ভিতর হইতে দেখা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা যায়, তদ্রূপ মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিরূপ তরঙ্গ ভঙ্গের মধ্যে চিরস্থির নিত্য সত্য পরমাত্মাকে অনুভব করা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায়। কিন্তু তখনই ঠিক ধরা যায় যখন বুদ্ধিও থাকে না অর্থাৎ তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এক হইয়া যায়। এ অবস্থায় কিছুই থাকে না, সুতরাং সে অবস্থাকে লক্ষ্য করিবে কে? এই অবস্থা হইতে অবতরণ করিলে যখন বুদ্ধি জাগ্রত হয় তখন সেই বুদ্ধির মধ্যে আত্মার কিছু প্রকাশ অনুভব হয়, এই জন্য উহাকে "বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবটীও পরিলক্ষিত হইতে পারে না যদি বুদ্ধি স্থির ও নির্ম্মল না হয়। এই জন্য যাঁহারা আত্মার পরিচয় পাইতে চাহেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিকে অসীম স্থিরতার মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু প্রাণের চাঞ্চল্য তিরোহিত করিতে না পারিলে উহাদের চাঞ্চল্য

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

থামিবে না। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রাণকে নিরোধ করিতে হইবে। প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে তৎসহ মনোবুদ্ধিও নিরুদ্ধ হইবে—সেই নিরস্তকল্পনা স্থিরবুদ্ধির অভ্যন্তরে জ্ঞেয় আত্মাকে বুঝা যাইতে পারে। উহাই কূটস্থ ব্রহ্ম অর্থাৎ বুদ্ধির অভ্যন্তরে স্থিত যে আত্মপ্রতিবিম্ব এই পর্য্যন্ত জ্ঞানগম্য, পরে বুদ্ধিও বিলীন হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা বলিয়াও কিছুই থাকে না—উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা শব্দ দ্বারা লক্ষিত। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেখানে আমিও নাই, আমারও নাই, অথচ যাহা পরম ধ্রুব—যাহা না থাকিলে আর কিছুই থাকিতে পারিত না—তাহা নিত্য বর্ত্তমান, কখনও তাহার অভাব হয় না—ইঁহাকে অনুভব করিলেই অমর পদ লাভ হয়, চিরদিনের জন্য জন্ম মরণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ হয়। যেমন বিশেষ্য বা সংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় বিশেষণ থাকে, তদ্রূপ সেই সদসদ্বর্জ্জিত অথচ পরম ধ্রুব আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ প্রকটিত হইতেছে। এই ব্যক্তাব্যক্ত বা সদসদ্ভাব যতদিন বর্ত্তমান থাকে ততদিন দ্রষ্টা দৃশ্যও থাকে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন বিশেষ ভাবই থাকে না, তখন পরমাত্মা কেবল স্বমহিমায় বিরাজমান, তখন দৃশ্যও থাকে না, কেহ তাহার দ্রষ্টাও থাকে না। দৃশ্য পদার্থ থাকিলে দ্রষ্টার কল্পনা করা যায়, এবং দ্রষ্টা থাকিলে কিছু দৃশ্যও আছে মনে করা যাইতে পারে—কিন্তু উহা এরূপ বিচিত্র অবস্থা যে তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য সমস্তই বিলুপ্ত কিন্তু তথাপি সেই মহান্ অস্তিত্বের তখনও কোন অভাব হয় না। ইহা যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তাই শ্রুতি বলিলেন

"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥"

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সোপাধিক ভাবে এবং ইন্দ্রিয়াতীত নিরুপাধিক ভাবে অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়াদির অতীত চিন্মাত্ররূপে আত্মা সত্য সত্যই রহিয়াছেন ইহা নিশ্চয় উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। আত্মসত্তার এইরূপ উপলব্ধিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার নিত্য চৈতন্য ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১২

অন্বয়। তৎ (তাহা) সর্ব্বতঃ পাণিপাদং (সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং (সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট) [হইয়া] লোকে (লোকমধ্যে) সর্ব্বম্ আবৃত্য (সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছে) ॥ ১৩

শ্রীধর। নম্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ বিরুদ্ধ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মতাং তস্য দর্শয়ন্ আহ—

সর্ব্বতঃ ইতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ। সর্ব্বতঃ অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সৎ লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্ব্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিঃ উপাধিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [যদি ব্রহ্ম সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ হইলেন, তাহা হইলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্—ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—এই ব্রহ্মের শক্তি বিবিধ প্রকার এবং তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান বল ও ক্রিয়ার কথাও শ্রুতি প্রসিদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তিনি সর্ব্বাত্মক, তাহাই পাঁচটী শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন] —সর্ব্বত্রই হস্তপদ যাঁহার তিনি, এবং সর্ব্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখ যাঁহার এবং সর্ব্বত্রই শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া তিনি সকল লোককে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তি ও হস্ত পদাদি উপাধি দ্বারা সকল ব্যবহারের আস্পদ হইয়া তিনিই বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই অবস্থাতেই যেখানে ইচ্ছা হয় যাইতে পারে—সূক্ষ্মশরীরে অষ্টপ্রহর নেশা থাকিতে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা মনের দ্বারায় দেখিয়া গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পায়—অগম্যস্থানে গিয়া দেখিতে পারে-সকল অনুভব করিতে পারে—সকলের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে—কোন দ্রব্যেতে কত অংশ (মিশ্রিত) আছে তাহা বুঝিতে পারে—কারণ তখন সে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়—ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আবৃত অথচ সে একস্থানে বসিয়া থাকে।—ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তি বোধের বিষয় নহে। তাই তাঁহার তটস্থ শক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তাহা বুঝিতে গিয়া দেখা যায় ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি অসীম। সেই ক্রিয়াশক্তি বা শক্তির কার্য্য জড় হইলেও উহার মূলে কিন্তু চৈতন্য রহিয়াছেন। চৈতন্য না থাকিলে তত্তৎ বস্তুর প্রকাশ অসম্ভব হইত। তাই প্রত্যেক কার্য্যশক্তি এবং কার্য্যশক্তির ক্ষেত্র পাণি, পাদ, প্রভৃতির মূলে তিনিই কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, পাণি, পাদাদির ব্যবহার যে সিদ্ধ হইতেছে তাহা ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়াই সম্ভব হয়, কারণ তাঁহার সত্তায় সত্তাবান হইয়াই মন ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের অনুভব করে। সকল প্রাণীর সব ইন্দ্রিয়ই তাঁহার অধিষ্ঠান, তাহারা তাঁহার শক্তিতে কাজ করে বলিয়া সকলের চক্ষু কর্ণ দ্বারা যেন তাঁহারই দেখা শুনা কাজ চলিতেছে। মনসমন্বিত অহঙ্কারই কর্ত্তা, ইন্দ্রিয়গুলি তাহার করণ, এই করণ গুলি থাকিলে ক্রিয়ার বোধ থাকিবেই। এবং বোধ থাকিলেই অহঙ্কার বশতঃ তত্তৎ বিষয়ে জীবের অভিমান হইবেই, সেইজন্য করণগুলিকে অকরণ করিয়া ফেলা ব্যতীত উপায় নাই। এই ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারাই করণগুলিকে অকরণ করিয়া ফেলা যায়। তখন দৃশ্যপ্রপঞ্চ থাকিলেও আর তাহার বোধ হইবে না। তখনই সব হইতে আত্মা যে পৃথক তাহার বোধ হয়। আবার এই অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িলে আবার যে একপ্রকার "অস্তি"র বোধ হয়—সেই অস্তিত্বভাবই সর্ব্বত্র তাঁহাকে

পাণিপাদশিরোমুখ দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ করাইতেছে। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞান হইতে পৃথক নহে। যখন কিছুই ছিল না তখনও একটী বোধ ছিল, সেই বোধের মধ্যে সর্ব্ব বস্তু মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, আবার যখন সর্ব্ব বস্তুর বোধঃ ফিরিয়া আসিল তখনও বোধটাই সর্ব্ববস্তুরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান মাত্র তখন ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ ও সঙ্কোচের দ্বারা অনুভবের পার্থক্য হইলেও উহা প্রকৃত পৃথক বস্তু নহে। যখন নানাত্বের বোধ হয়, তখনও তাহা মন ইন্দ্রিয়ের বিলাস মাত্র উহা নূতন কোন বস্তু নহে।

এই "তৎ" বস্তুটী যে সর্ব্বত্র পাণিপাদ যুক্ত, সর্ব্বত্র চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট তাহা আরও সূক্ষ্মভাবে বুঝা যায় যোগাভ্যাসের দ্বারা যে শক্তির বিকাশ হয় তাহা হইতে। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, স্থান ও কাল দ্বারা তাহা বাধিত হয় না, তাই যোগী যখন স্থিরপদ লাভ করিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হন, তখন কেবল মন বা সঙ্কল্পের দ্বারাই সকল বস্তুর আদান প্রদান হইয়া থাকে। যাহা তিনি ভাবিতেছেন তাহাই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইয়া থাকেন; মনে উদয় হইবা মাত্রই বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও উপস্থিত হইতে পারেন বা তথাকার সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সহস্র সহস্র ক্রোশের ব্যবধান থাকিলেও তত্তৎ স্থানে কে কি বলিতেছে ইচ্ছা করিলে শুনিতে পান, কোন দ্রব্যের মধ্যে কি কি গুণ রহিয়াছে তাহা ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারেন; ব্রহ্ম দ্বারা সকল বস্তুই আবৃত, তিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তাই একস্থানে বসিয়াই ব্রহ্মাণ্ডের সব সংবাদ গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট এ স্থান বা অন্য স্থান নাই, সকল স্থানই তাঁহার নিকট একস্থানে। কিন্তু যখন নানাত্বের জ্ঞান হয় তখনও তাহা পরমাত্মারই অধিষ্ঠান ইহা বুঝিতে হইবে। ভাল করিয়া ক্রিয়া করিতে পারিলে ক্রিয়ার দ্বারা যে ধারণা হয় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত যোগী যেরূপে সংসার করেন বা যে ভাবে তিনি সংসারকে দেখেন তাহা ধারণা করিতে পারিলেই ভগবানের সর্ব্বত্র বিদ্যমানের কথা বুঝিতে পারা কঠিন হইবে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই উপবাসরূপ-ব্রত। উপ অর্থাৎ সমীপে বাস, পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের জন্য যে বিদ্যা সাধিত হয় তাহাই ক্রিয়া, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়। তখন ব্রহ্মের সমীপে বা তাঁহার সহিত এক হইয়া অবস্থান করা যায়। তখন শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বাহিরে অনুভব করা যায় না, তখন উহা এত সূক্ষ্ম ভাবে ভিতরে ভিতরে চলে যে মনে হয় না চলিতেছে, কিন্তু শ্বাসে মন দিলেই চলিতেছে দেখা যায়, যদি না চলিত তবে জীবন থাকিত না। ক্রিয়া দ্বারা উক্ত প্রকার যে স্থিতি হয় তাহাই যোগধারণা। লৌহ যেমন চুম্বক পাথরের নিকটে আসিলেই লৌহের গাত্রে সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আত্মা পরমাত্মাতে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং তাহাতেই আটকাইয়া থাকে। প্রথম প্রথম এ অবস্থায় আর অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না, কিন্তু পরে আটকাইয়া থাকিলেও যোগী সকল কর্ম্মই করিতে পারেন। এইজন্য প্রত্যহ এবং সর্ব্বদা ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য, নচেৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ হয় না এবং আত্মা (মন প্রাণ) কেমন করিয়া যে পরমাত্মাতে আটকাইয়া থাকে (অবরুদ্ধ রূপ) তাহা বুঝা যায় না। ক্রিয়া করিবার সময় মন চঞ্চল থাকে, কিন্তু পরাবস্থায় কোন সঙ্কল্প থাকে না, সুতরাং মনও থাকে না,

তখন এক প্রকার নেশার মত অবস্থা হয়। এই নেশাতে থাকার নামই ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধ্যান বা যোগ। ইহারই নাম "উপবাস" কারণ তখন পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ হয় এবং তখন শ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসহ মন আটকাইয়া থাকে বলিয়া কোন বাহ্য বস্তুর গ্রহণ হয় না। এই অবস্থায় সাধকের অসাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যাহা হইতে সমস্ত হইয়াছে, তাহাতেই মন লীন হইয়া থাকে তখনই ব্রহ্ম যে এক অদ্বিতীয় তাহার অনুভব হয়। উহা সদা একরস, কারণ নানাত্ব নাই, আনন্দঘন স্বপ্রকাশ, তিনিই সর্ব্বতোমুখ মহাদেব মহেশ্বর। রস শব্দের অর্থ স্বাদ, যখন একরস তখন অন্য কোন স্বাদ নাই, কেবল একের অনুভব, ইহাই অব্যক্ত রস, কারণ সে রসের পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু তাহা নিত্য নূতনের ন্যায় উপভোগ্য। ক্রিয়ার পর অবস্থার গাঢ় নেশাতে যে অগাধ গভীর আনন্দ হয়, তাই সে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে মনের ইচ্ছাই থাকে না। ইহাই স্বপ্রকাশ রূপ, নিজেই নিজের প্রকাশ, অন্য কিছু তাহার তুলনা নাই। তখন সব ব্রহ্মেতে সংলীন থাকে তাই পৃথক অভিমান রূপ যে "আমি" সে "আমি"ও সেখানে থাকে না। এই অবস্থায় নিজের পৃথক সত্তার বোধ না থাকায় তখন আমি সর্ব্বব্যাপক হইয়া যায়। তাহা হইলেই সর্ব্বত্র মুখ চক্ষু হইল অর্থাৎ একস্থানে বসিয়াই সব শব্দের শ্রবণ, সব দৃশ্যের দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ বোধ করিতে লাগিল। চেষ্টা করিয়া এ অবস্থাকে আনা যায় না, উহা আপনি আপনি হয়। তখন যোগী যে স্থানে বসিয়া আছেন তাঁহার সম্মুখে একজন লোক আসিল তাহাকে দেখিয়াই তাহার চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলেন, কেহ হয়তো বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ডাকিতেছে তাহা শুনিতে পাইলেন; কেহ ধ্যানমগ্ন হইয়া কোথায় বসিয়া আছে তাহা দেখিতে পাইলেন; কেহ সুগন্ধ বা পুষ্পের দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছে তাহার ঘ্রাণ নাসিকায় পাইয়া থাকেন, কেহ কোন দ্রব্য ভক্তি পূর্ব্বক দিতেছে তাহার স্বাদ জিহ্বায় অনুভব করেন।

বায়ুস্থিরের নামই প্রাণস্থির হওয়া। বায়ুস্থির হইয়া সর্ব্বগত হয়, তখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সাধক স্পর্শ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিয়া আছে তাহা বোধ হইবে না। ব্রহ্মও সর্ব্ব বস্তুকে স্পর্শ করিয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান কিন্তু ব্রহ্মস্পর্শ কেহ ধারণা করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হয়, তিনিও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। তখন ব্রহ্মের সূক্ষ্ম অণু সকল বস্তুতে প্রবেশ করতঃ সর্ব্বব্যাপক মহাদেব হইয়া যান। মহৎ আকাশের মধ্যে ব্রহ্মের অণু প্রবেশ করিলেই মহেশ অর্থাৎ তখন তিনি সকলের কর্ত্তা হন। তিনি তখন যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কিছুরই ইচ্ছা থাকে না। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই, নিজেও নাই, সুতরাং কেই বা ইচ্ছা করিবে এবং কোন্ বস্তুরই বা ইচ্ছা করিবে?

এই "একমেবাদ্বিতীয়ং" ভাব কিরূপে হয়? "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ কূটস্থ, যাঁহারা সুর (অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা ক্রিয়া করেন) তাঁহারা সর্ব্বদা দেখিতে পান। আকাশের মত এক চক্ষু যাহা যোনিমুদ্রায় প্রকাশ হয় তাহা ঐ সুরেরা সর্ব্বদা দেখিতে পান। সেই চক্ষুর অণুর মধ্যে

ত্রিলোক। সেই তিন লোকের মধ্যেই মর্ত্ত্যলোক, এবং সেই মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সমুদয়। সমুদয়ের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদয়, সুতরাং সমুদয়ই এক ব্রহ্ম হইয়া গেল।

এইরূপে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পাণিপাদ ও শিরোমুখ হইয়া এবং সকলকে আবৃত করিয়াও—এক হইয়া আছেন। এই একত্বকে যে জানে সেও ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়। "সোঽহং"—আমি সেই, যে "আমি" সকল "আমির" মধ্যে এক অখণ্ড ভাবে ঘটাকাশ সমূহের মধ্যে এক মহাকাশ রূপে বিরাজমান। দেহাভিমানী জীবের যেরূপ দেহযুক্ত অহং জ্ঞান হয়, উহা কিন্তু সেরূপ নহে।

"দেহতট তো নইকো আমি দেহের ওপার পরব্যোম।
সেই তো আমার আসল 'আমি' সেই তো আমির নিকেতন।"

সেই "আমি" প্রপঞ্চাতীত, তথায় মায়ার কুহক সদাকালের জন্য নিরস্ত। তাহা হওয়া যায়, কিন্তু বুঝা যায় না। বুঝিতে গেলেই জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক পৃথক ভাবে প্রতীত হইতে থাকে। তাহা প্রকৃতই "অবাঙমানসগোচর"। এই পরম অহং-এর একাংশেই লীলাবশতঃ যখন সহস্র সহস্র অহং ভাব ফুটিয়া উঠে তখনই তাঁহার নাম হয় "মায়া"। এই সর্ব্ব প্রথম অহং বোধ বা মায়া হইতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। ইঁহারই অপর নাম "প্রাণশক্তি"। কঠোপনিষদ বলিতেছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম"—এই দৃশ্যমান যাহা কিছু জাগতিক বস্তু ব্রহ্মসত্তার প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হইয়া উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রাণশক্তি বা মহামায়া যখন ব্রহ্মের মধ্যে বিনিদ্রিত থাকে, তখন তাহার ক্রিয়াশক্তি থাকে না—সেই অটল স্থিরাবস্থাই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ব্রহ্মের মধ্যে সেই শক্তি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেই "অহং অস্মি" এই বোধ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তখনও তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চ বিকাশের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না,—তৎপরে চক্ষু হইতে নিদ্রা সরিয়া যাইলে যেমন জগৎ বোধ হয়, সেইরূপ স্থিরতার মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্যের উদয় হইলেই বিশ্বপ্রকাশিকা মহাশক্তির গর্ভতল হইতে যেন অহং বোধ ফুটিয়া উঠে। সেই অহং বোধই হিরণ্যগর্ভ এবং তিনিই বিশ্বের জনিতা ও বিধাতা—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, বিশ্বস্য বীজং পতিরেকরাসীৎ।" কারণ এই অহং বোধের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত কোটি জীব ও ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া উঠে। ইহাই "অহং" এর ব্রহ্মাণ্ডরূপে স্ফুরণ বা সৃষ্টি। আবার সৃষ্টি লয়োন্মুখ হইলে অনন্তব্রহ্মাণ্ড ঐ অহং মাত্র রূপে পর্য্যবসিত হইয়া যাহা বহু ছিল তাহাই আবার এক হইয়া যায়, সেইজন্য বাস্তবিক বহু নাই, এক আত্মসত্তাই রহিয়াছেন। এই "অহং"ই নাম রূপময় অনন্ত স্ফুরণের মধ্যবিন্দু, তাই তিনি "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" এই অহংকে জানিলেই জানার শেষ হয় এবং তাহা এক হইয়াও কিরূপে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং" হইয়া আছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়॥ ১৩

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪

অন্বয়। [তাহা] সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সমস্ত ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের আভাসযুক্ত), সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং (অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত) অসক্তং (নিরবয়বত্ব হেতু সকলের সহিত সংযোগ সম্বন্ধ শূন্য সুতরাং অসঙ্গ) সর্ব্বভৃৎ (তথাপি সকলের আধারভূত) নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ (এবং স্বয়ং গুণহীন হইয়াও সত্ত্বাদি গুণের পালক)॥ ১৪

শ্রীধর। কিঞ্চ—সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসত ইতি তথা। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ান্ আভাসয়তীতি বা। সর্ব্বৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিবর্জ্জিতং চ। তথা চ শ্রুতিঃ—'অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' ইত্যাদি। অসক্তং—সঙ্গশূন্যম্। তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তি ইতি সর্ব্বভৃৎ। সর্ব্বস্য আধারভূতং। তদেব নির্গুণং—সত্ত্বাদিগুণরহিতম্। গুণভোক্তৃ চ—গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ—পালকম্॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের গুণসমূহে অর্থাৎ তাহাদের দর্শনাদি বৃত্তিতে তত্তৎরূপাকারে তিনি আভাসমান হন অথবা সর্ব্বেন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ সমূহ যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ, সেই সকল বিষয় সমূহকে যিনি প্রকাশ করেন অথচ তিনি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত। শ্রুতিতে আছে—সেই ব্রহ্ম পাদ শূন্য হইলেও গমনশীল, পাণি শূন্য হইলেও গ্রহণ করেন, চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পান, এবং কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন ইত্যাদি। ব্রহ্ম সঙ্গশূন্য হইলেও সর্ব্বভৃৎ অর্থাৎ সকলকে ভরণ করেন কিনা সকল বস্তুর আধার। তিনি সত্ত্বাদি গুণ রহিত হইয়াও গুণ ভোক্তা অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণের পালক॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশস্বরূপ—যেমত চক্ষের দৃষ্টি, কর্ণের শব্দ, নাসিকার ঘ্রাণ, জিহ্বার স্বাদ, ত্বচের স্পর্শ, এই সকল গুণেতে তিনি আছেন ইহাই তাঁহার রূপ—ইহার অনুভব যোগীরা এক এক করিয়া অভ্যাস করিয়া গুরুবাক্যের দ্বারায় জানিবেন। যাহা দিয়া দেখিলে, শুনিলে, শুঁকিলে, খাইলে, স্পর্শ করিলে তাহা বর্জ্জিত—বিশেষ রূপে—অর্থাৎ কিছুতেই আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেক না—তিনি সকলকেই ভরণ পোষণ করিতেছেন অর্থাৎ আপনার খাওয়া আপনি খাইতেছেন, খাওয়ানও তিনি খানও তিনি—আসক্তি পূর্ব্বক গুণের বর্জ্জিত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা যাহা বায়ু স্থির হইলে হয় এবং তিনি সমুদয় গুণের ভোক্তা।—ইন্দ্রিয়েরা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, নিজে নিজে কোন বস্তুকে বুঝিবার তাহাদের শক্তি নাই। আত্মা দেহমধ্যে আছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়দের বিষয় জ্ঞান হয়। তাঁহার অবস্থান হেতু জ্ঞানের প্রকাশদ্বার ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দেহটাকেই যেন তাঁহার রূপ বলিয়া মনে হয়। তাহারা স্বয়ং চেতন পদার্থ নহে কিন্তু চৈতন্য বস্তুর আধার স্বরূপ। এক সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানই পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি রূপে অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়েরা এই সকল জ্ঞানকে প্রকটিত

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

করিতে পারিত না যদি আত্মা না থাকিতেন, তাই আত্মা গুণবিবর্জ্জিত হইয়াও গুণময়। আশঙ্কা হইতে পারে যে পরমাত্মা যখন ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত তখন আমাদের কথা আমাদের প্রার্থনা তিনি শুনিতে পাইবেন কেমন করিয়া ? এ শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, তিনি স্বয়ং ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হইলেও শ্রবণ, দর্শনাদির কোন বাধা ঘটে না। সে যে কি অপূর্ব্ব শক্তি তাহা বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই, কিছু সাধন দ্বারা বায়ু স্থির হইলে যোগীরা তাঁহার এই অপরূপ অত্যদ্ভুত শক্তির আভাস পান এবং তখনই বুঝিতে পারা যায় তিনি গুণাতীত হইয়াও কিরূপে গুণভোক্তা হইয়া থাকেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অনুভব হয় সে সমস্তই আত্মশক্তি হইতে কোন পৃথক শক্তি নহে। কিছুই নাই অথচ সবই রহিয়াছে, এবং এই সর্ব্বের উপর তিনি আধিপত্য করেন বলিয়া তাঁহার নাম "ইন্দ্র" অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই দেবরাজ অর্থাৎ সকল দেবতা তাঁহার মধ্যেই রহিয়াছেন। একমাত্র তিনিই আছেন অথচ তিনিই দেবাদি বহুরূপে প্রকাশিত হইতেছেন,—যে কূটস্থে সদা লক্ষ্য রাখে, অনেকক্ষণ সেই কূটস্থের মধ্যে থাকিতে থাকিতে সকলকেই দেখিতে পায়। "তমসঃ পরস্তাৎ"—প্রথমে ময়ূরপুচ্ছের মত চারিদিকে জ্যোতিঃ পরে তমঃ—মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার শূন্যেতে দেখিতে পায়, তাহার পর উত্তম পুরুষ—যাঁহাকে সকল ঋষি, মুনি, যোগী, ও দেবতারা এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। যখন কিছু নাই তখন তিনি মহাশূন্য, আবার যখন এই ব্যক্ত জগৎ তখন তিনি জগন্নাথ, তাঁহার ভিতরেই সকল লোক রহিয়াছে, তিনিই ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও সর্ব্বব্যাপক। এই কূটস্থ রূপ চক্ষুকে যে দেখিতে না পায় সেই অন্ধ—সে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া কেবল "আমার আমার" করিয়া মুগ্ধ হইতেছে। এই মোহ হইতে উদ্ধার হইবার ক্রিয়াই একমাত্র উপায়। ক্রিয়ার দ্বারাই জগন্নাথের দর্শন পায়, পরে তাহাতে লীন হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করে, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় মগ্ন হইয়া অমৃত পান করিয়া অমর পদ বা ব্রহ্মপদ লাভ করায় তাহার সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায়। এই শরীরের মধ্যে যে কূটস্থ তাহার পর উত্তম পুরুষ—আকাশ পরব্যোম স্বরূপ। তিনি সর্ব্বব্যাপক তন্নিমিত্ত আমিও তাঁহারই মধ্যে। যখন আমি নাই, আমি বলিবারও কেহ নাই, তখন সমস্ত এক ব্রহ্ম, সুতরাং তখন আর কিছুই ইচ্ছা নাই। তখন ভোজ্য, ভোজন ও ভোক্তা সবই এক। ইহাই ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে এই অবস্থা আপনা আপনিই উদিত হয় ॥ ১৪

অন্বয়। তৎ (তিনি) ভূতানাং (সর্ব্বভূতের) বহিঃ অন্তঃ চ (বাহিরে ও অভ্যন্তরে), অচরং 'চরম্ এব চ (স্থাবর এবং জঙ্গমও—তিনি), সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্ম বলিয়া) অবিজ্ঞেয়ং (জানা যায় না), তৎ (তাহা) দূরস্থং অন্তিকে চ (দূরস্থ এবং নিকটস্থ উভয়ই) ॥ ১৫

শ্রীধর। কিঞ্চ—বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চ অন্তশ্চ তদেব—সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাং। জলতরঙ্গাণাম্ অন্তর্ব্বহিঃ জলমিব। অচরং—স্থাবরং চরঞ্চ—

জঙ্গমং চ ভূতজাতং তদেব, কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং—ইদং তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি। অতএব অবিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ। সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাৎ অন্তিকে চ তৎ নিত্যসন্নিহিতং। তথা চ মন্ত্রঃ—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

ইতি। এজতি—চলতি; নৈজতি—ন চলতি; তৎ উ অন্তিকে ইতি ছেদঃ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ [আরও বলিতেছেন]—কটককুণ্ডলাদি অলঙ্কারের অন্তরে এবং বাহিরে যেরূপ সুবর্ণ, জলতরঙ্গের অন্তরে বাহিরে যেরূপ জল, সেইরূপ তিনি তাঁহারই সৃষ্ট (কার্য্য) চরাচর ভূতসমূহের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। যেহেতু সমস্ত কার্য্যই কারণাত্মক, সেইরূপ ব্রহ্ম স্থাবর জঙ্গম অর্থাৎ সমস্ত ভূতজাত। তিনি এইরূপ হইলেও সূক্ষ্মত্ব হেতু অর্থৎ রূপাদি বিহীন বলিয়া অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞানের অযোগ্য হন। অতএব তিনি অবিদ্বানের পক্ষে লক্ষযোজনান্তরিতের ন্যায় দূরস্থই, যেহেতু তিনি সবিকারা যে প্রকৃতি তাঁহার পর অর্থাৎ অতীত। যেহেতু বিদ্বানগণের নিকট তিনি প্রত্যগাত্মা, তাই তাঁহাদের পক্ষে তিনি নিত্য সন্নিহিত। এই সম্বন্ধে ঈশশ্রুতি মন্ত্র যথা :—"তিনি গমন করেন আবার গমন করেন না, তিনি দূরে তিনি নিকটে, তিনি পরিদৃষ্টমান সমস্ত জগতের অন্তরস্থিত এবং তাহার বাহিরেও বিদ্যমান"॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সবভূতের বাহিরে এবং ভিতরে যাহা ক্রিয়াম্বিত ব্যক্তিরা দেখিতেছে—অচর এবং চরে—যাহা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নিরাবরণ হইয়া যায়—সুতরাং সকল দেখিতে পায়—বাড়ীর ভিতরে এবং বাহিরে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্রহ্মের অণু সূক্ষ্ম; তন্নিমিত্তে বিশেষরূপে জানা যায় না—তুমি দূরেও আছ ও ভিতরেও আছ।—সমস্ত বস্তুর বাহ্যেও তিনি, অন্তরেও তিনি। এই বাহ্য অন্তর ভাব হয় দেহকে লইয়া, নচেৎ বাহ্য অন্তর বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়ের জ্ঞান রহিয়াছে, ততক্ষণ দুইটি ভাব থাকিবেই। একটি ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য, আর একটি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যতদিন প্রকৃত জ্ঞান না হয় ততদিন ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুইটি অবস্থাই থাকে। অব্যক্ত অবস্থা ইন্দ্রিয়গোচর নহে, সেই জন্য প্রত্যক্ষগোচর হয় না। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় ভিতর বাহির এক হইয়া যায় তখন বাহ্য ও অভ্যন্তর কিছুই থাকে না। এই ভিতর বাহির যাঁহার এক হয় তিনিই জ্ঞানী বা মুক্ত পুরুষ। জ্ঞানীরও ইন্দ্রিয় থাকে এবং তাহার কার্য্যও থাকে কিন্তু বিষয় কখনও তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না। তিনি অনন্ত অনৈক্যের মধ্যে এক ঐক্যকে দেখিতে পান বলিয়া তাঁহার জগৎ বা নানাত্ব বোধ লোপ পায়, সুতরাং তাঁহার নিকট স্থাবর জঙ্গম বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই—একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান। সেই ব্রহ্ম বস্তুতে আমার অবিবেকী মনই সংসার কল্পনা করিতেছে, বালক যেমন

অন্ধকারে ভূত কল্পনা করে। মন চঞ্চল হইলেই বহির্দৃষ্টি হইতে থাকে, বহির্দৃষ্টি হইতেই রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মে সংসার বোধ হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পবোধ কালীনও রজ্জু রজ্জুই থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মে সংসার বোধ জাগিলেও ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন, কখনও সংসার হইয়া যান না। তবুও এই জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের নিত্যবোধের বিষয় হইয়া রহিয়াছে, এই বোধের নিরোধ না হওয়া পর্য্যন্ত জগদ্দৃষ্টি রুদ্ধ হইবে না। সেইজন্য আমাদিগকে সাধনাভ্যাসে প্রযত্ন করিতে হইবে। স্থূল জাগতিক পদার্থগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারাই অনুভব করি, কিন্তু ব্রহ্ম পদার্থ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতরাং তাহা এই সকল ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত। তাহা হইলেও সত্তা মাত্রই তিনি, সুতরাং ভিতর বাহির বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইতেছে তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নহে। ভিতরেও যে প্রকাশ বাহিরেও তাঁহারই প্রকাশ। অজ্ঞানবশতঃ যে নামরূপময় বাহ্য বস্তু রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহারও দ্রষ্টা সেই ব্রহ্মই, তিনি বাহ্য বস্তু অনুভব করিবার জন্য যেন বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে কল্পনা করিয়াছেন। সেই বাহ্যেন্দ্রিয়ের সমষ্টিই এই জীবশরীর। এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞাতা জীব স্বয়ং। জীবচৈতন্যই সেই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই, সেইজন্য ভিতর বাহির থাকিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই এই ভিতর বাহিরের ধাঁধাঁ মিটিয়া যায়। যে একটি সূক্ষ্ম কাল্পনিক আবরণ আছে, তাহাও আর তখন থাকে না, সুতরাং যোগী তখন দূরের ও নিকটের সবই দেখিতে পান। নিকটের কথা তো শুনেনই, বহু দূরের কথাও তাঁহার শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। সম্মুখে, পিছনে, দূরে, নিকটে, উর্দ্ধে, অধোভাগে সমস্ত বস্তুনিচয়কে সমভাবেই দেখিতে পান। ব্রহ্মাণু বড় সূক্ষ্ম, মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম না হইলে সেই ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। যে ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে তাহার নিকট দূরও নাই নিকটও নাই, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক। এই অবস্থাকেই বিষ্ণুভাব বলে, বিষ্ণু যেমন সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীও সেইরূপ সকলের মধ্যেই থাকেন।

"ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে স্থিতি তিনি বিষ্ণুস্বরূপ, তিনিই শূন্য স্বরূপ কারণ বারি। তিনি মায়ার বশীভূত হইয়া চঞ্চল হন, সেই চঞ্চল ভাব স্থির হইলেই সাধক শুচি অর্থাৎ পবিত্র হন। সদ্ভাবই ব্রহ্মভাব, তাহা নিত্য বিদ্যমান, তখন আমিও থাকে না আমারও থাকে না—সুতরাং জগদাদিরূপে কোন প্রকাশও থাকে না। যখনই চাঞ্চল্য তখনই জগৎরূপ বা বহুরূপ প্রকাশিত হয়, এই বহুত্বই মায়িক ভাব বা অসৎ।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা না পাকিলে এই বহুত্বের বিলোপ সাধন হয় না। সুতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহা হইতেই ব্রহ্ম যে এক ও অদ্বিতীয় এই ধ্রুব বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। তখন চন্দ্রের মত জ্যোৎস্না সদা দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বদা স্থিতিপদ অনুভূত হয়, উহাই বিষ্ণুর পরম পদ। সুষুম্নার সূক্ষ্ম বায়ু সদা বহিতে থাকে, প্রত্যূষের মত এক প্রকাশ অনুভব হয়, সেই প্রকাশের সাহায্যে সমস্তই দেখা যায়। যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন তাঁহারা প্রথমে তৃতীয় নেত্র কূটস্থে থাকিয়া শিবরূপ হইয়া যান, সেই কূটস্থ স্থির হইলেই বিষ্ণুরূপ হয়। যাঁহাদের সাধনে প্রযত্ন ও চেষ্টা থাকে, তাঁহারা সকলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। বাহিরের সামান্য ক্লেশ সহ্য করিয়া ক্রিয়া করিলেই মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬

হন। তখন হৃদয়স্থ কামাদি সমূলে উৎপাটিত হয়। সর্ব্ব প্রকার ইচ্ছা হইতেই তখন যোগী মুক্ত হন।

মনের মনন দ্বারাই একমাত্র ব্রহ্মবস্তু স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, মন না থাকিলে কোন বস্তুই থাকে না। এইজন্য মনোনাশের চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ক্রিয়া দ্বারা মন তন্মুতা ভাব প্রাপ্ত হইলেই কল্পনা ক্ষীণ হইয়া আসে, কল্পনা ক্ষীণ হইলেই মনের সহিত যাবতীয় বস্তুই বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন সমস্ত বস্তুই আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায় এবং তখন ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান না থাকায় আত্মা অবিজ্ঞেয় বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকেন ॥ ১৫

অন্বয়। ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) অবিভক্তং চ (অবিভক্ত হইয়াও) বিভক্তং ইব (যেন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া) স্থিতম্ (প্রতীত হইতেছেন) [তাঁহাকে] ভূতভর্তৃ (ভূতসকলের পালনকর্ত্তা), চ গ্রসিষ্ণু (গ্রাসকর্ত্তা বা সংহর্ত্তা) প্রভবিষ্ণু চ (উৎপাদন কর্ত্তা বলিয়া) তৎ জ্ঞেয়ং (তাঁহাকে জানিবে) ॥ ১৬

শ্রীধর। কিঞ্চ—অবিভক্তমিতি। ভূতেষু—স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু অবিভক্তং—কারণাত্মনা অভিন্নং, কার্য্যাত্মনা বিভক্তং—ভিন্নমিব অবস্থিতং চ। সমুদ্রাৎ জাতং ফেনাদি সমুদ্রাৎ অন্যৎ ন ভবতি। তৎ পূর্ব্বোক্তং স্বরূপং চ জ্ঞেয়ং। ভূতানাং ভর্তৃ চ—পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু—গ্রসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু—নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন] ভূতসকলে অর্থৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতনিচয়ে অবিভক্ত অর্থাৎ কারণরূপে অভিন্ন, কিন্তু কার্য্যরূপে বিভক্ত অর্থাৎ ভিন্নভাবে অবস্থিত। যেমন সমুদ্র হইতে ফেনাদি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে। [ফেনাসমূহের কারণ সমুদ্র, সেই কারণে কোন ভেদ নাই, কিন্তু ফেনারূপ কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যেরূপ প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ—সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরব্রহ্মে ভেদের সম্ভাবনা নাই]। সেই যে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্ম তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে গ্রসনশীল অর্থাৎ গ্রাসকারী এবং সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ নানাকার্য্যরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সব বস্তুতে এবং ভূতেতে একই বস্তু ব্রহ্ম রহিয়াছে—আবার পৃথক্ পৃথক্ও রহিয়াছে—হইতেছেন তিনি—ভরণকর্ত্তাও তিনি, নাশকর্ত্তাও তিনি, সৃষ্টিকর্ত্তাও তিনি।—ব্রহ্মবস্তু এক এবং তাহার দ্বিতীয় কিছু না থাকায় তাহা বিভক্ত হইবে কিরূপে? ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠখণ্ডে যে অগ্নি রহিয়াছে তাহা একই বটে, কিন্তু তবুও ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠে যেমন অগ্নিকে বিভিন্নবৎ মনে হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হন। যদিও পরমাত্মা সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান কিন্তু পৃথক পৃথক ঘটে ভিন্ন ভিন্ন আকাশবৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ ঘটে পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত মনে হইলেও বাস্তবিক তাহা ভিন্ন নহে। পৃথক পৃথক ঘট আকাশের উপাধি মাত্র। এই জন্য যতক্ষণ দেহঘটরূপ উপাধি থাকিবে ততক্ষণ আত্মার উৎপত্তি বিনাশ না থাকিলেও ঘটের উৎপত্তি লয়ের সহিত তাঁহার উৎপত্তি ও লয় কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে উৎপত্তি

স্থিতি লয়াদি না থাকিলেও এইরূপ কল্পিত উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ রূপে তিনি কল্পিত হইয়া থাকেন।

সেই পরমাস্থিতিরূপ ব্রহ্মই ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে চঞ্চল হন, তখন তাঁহার উপাধি হয় প্রাণ। ক্ষেত্রজ্ঞ চঞ্চল প্রাণের আকার ধারণ করিলেই জন্ম মরণ ও স্থিতি এই তিনটি ভাব উৎপন্ন হয়। কিন্তু চাঞ্চল্য ও স্থিরতা একই বস্তুর দুইটী দিক মাত্র। স্থিরত্বকে ছাড়িয়া চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না, এবং স্থিরত্ব না থাকিলে চাঞ্চল্য আসিবে কোথা হইতে? ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতির অনুভব হয় তাহা অব্যক্ত, কারণ উহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু সেই স্থিতিই ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া চঞ্চল বা ব্যক্ত হন। কিন্তু অব্যক্ত অবস্থার সহিত যোগ ছিন্ন করিয়া ব্যক্তাবস্থা প্রকাশিতই হইতে পারিত না, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে চঞ্চল ভাবটীও সেই অচঞ্চল ভাবের সহিত যোগযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই চণ্ডীতে বুঝান হইল যে জ্ঞানময়ী বিদ্যামূর্ত্তিও যাঁহার, মোহময়ী অবিদ্যা ভাবও তাঁহারই। ক্রিয়ার পরঅবস্থায় যে টান ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতেও সেই টান, আবার বিক্ষেপযুক্ত সংসারভাবের মধ্যেও সেই টান, সেই বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা, সেই সকল বস্তুকে আপনার করিবার জন্য ঐকান্তিক লালসা—এ সমস্তই সেই একমাত্র স্থিতিপদই যে পরম সত্য তাহাই প্রমাণ করিতেছে মাত্র। সেই সত্তার পানে আকর্ষণই জীবের জীবন।

আত্মার অস্তিত্বেই জগৎ ও জীবের অস্তিত্ব। যতদিন আমার "আমিটা" থাকিবে ততদিন এই বিশ্বকে এবং ইহাদের কর্ত্তা ভগবানকেও জানিবার ইচ্ছা বা সেই দিকে যাইবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু এই "আমি" ও "বিশ্বজ্ঞান" লুপ্ত না হইলে নানাত্ব যাইবে না সুতরাং অজ্ঞানও নষ্ট হইবে না। সুষুপ্তি অবস্থায় সমস্ত বিষয়াদি যেমন স্বকারণ অজ্ঞানে বিলীন হয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে 'আমি' থাকে না, 'বিশ্ব' থাকে না এবং বিশ্বের রচয়িতাও থাকে না—অহং বিশ্ব ও কর্ত্তা ভগবান সমস্তই এক হইয়া চিন্মাত্র রূপে অবস্থিত হন বা সমস্তই তখন ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জিত হইয়া নিজ নিজ পৃথকত্ব লুপ্ত করিয়া এক হইয়া যায়। সেই বিশুদ্ধ সৎভাবই যে শুদ্ধ চৈতন্য, এক অখণ্ড দ্বৈতবিবর্জ্জিত দেশকালাতীত বস্তু তখনই তাহা প্রমাণিত হয়। যতদিন দ্বৈতভাব থাকিবে ততদিন অজ্ঞান থাকিবেই, এবং এই অজ্ঞান থাকিতে দৃশ্যপ্রপঞ্চ বিলীন হইবে না। আত্মা এক অখণ্ড সত্তামাত্র, অবিদ্যা বশতঃ উহাতে নানাত্ব কল্পিত হয়, সুতরাং সেই নানাত্ব অসৎ পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। যদি নানাত্ব মনের কল্পনা মাত্র তবে দৃশ্য ভাবও কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এবং দৃশ্যের অভাবে আত্মার দ্রষ্টারূপে যে সম্বন্ধ তাহাও সত্য নহে। সমস্ত অসত্যের নিরসন হইলে যাহা থাকে তাহাই শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্ম ভাব— যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভূত হয়। এই জ্ঞান ত্রিকালে বিদ্যমান। কালের অস্তিত্ব হইতেই জ্ঞেয় বস্তুর নানাত্ব পরিদৃষ্ট হয়, তখনই সৃজন পালন ও সংহার লীলা চলিতে থাকে। কিন্তু উহা সত্য নহে। ব্রহ্মে সমস্ত খণ্ডকাল কলিত হয় বলিয়াই ব্রহ্মকে মহাকাল বা মহাকালী বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই ব্রহ্মস্বরূপে কালের কল্পনা নাই, কারণ তথায় ঘটনা নাই, ঘটনার পারম্পর্য্য নাই বলিয়া কাল বলিয়া কিছু থাকে না।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥ ১৭

ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও যখন তাহা চঞ্চল হইয়া দৃশ্যপ্রপঞ্চ ব্যক্ত করে তখন তাহাতে সাত প্রকারের ভঙ্গী থাকে। (১) স্থির, (২) চঞ্চল, (৩) স্থিরে স্থিতি, (৪) চঞ্চলে স্থিতি (৫) আছে (৬) অথচ নাই, (৭) যাহা আছে তাহা অব্যক্ত। ব্রহ্মের এই সাত ব্যবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত বস্তু এক হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়—উহাই স্থির ভাব উহাই পরব্যোম। কূটস্থের মধ্যে এবং বাহ্য জগতে যে নানাত্ব ও বহুরূপ দেখা যায় তাহা সমস্তই ঐ পরব্যোমেরই রূপ—ইহাই চঞ্চল ভাব বা সৃষ্টি। এই স্থিরেতেও স্থিতি রহিয়াছে, চঞ্চলেও স্থিতি রহিয়াছে নচেৎ চঞ্চল অবস্থা প্রকাশই হইতে পারিত না। আছে অথচ নাই—অর্থাৎ যাহা ব্যক্ত বা চঞ্চল ভাব তাহার পৃথক ভাবে অস্তিত্ব নাই, ঐ স্থিরত্বকে ধরিয়াই তাহাকে অস্তিত্ববান বলিয়া মনে হয়। যাহা প্রকৃত "অস্তি"র বিষয় তাহা চিন্মাত্র, এই ব্যক্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির গোচর নহে।

এইরূপে নানাভাবে ব্রহ্ম কখনও কত কি উৎপন্ন করিতেছেন, কখনও পালন করিতেছেন আবার কখনও বা গ্রাস করিতেছেন। ইহা বলিবার ভঙ্গীমাত্র। যোগবাশিষ্ঠে আছে—যত দিন আপনাতে আপনি না থাকে, ততদিন মৃত্যুরূপে তিনি হনন করেন, পালকরূপে রক্ষা করেন, স্তাবকরূপে স্তব করেন, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার করেন এবং ফললাভেচ্ছুকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন॥ ১৬

অন্বয়। তৎ (তাহা) জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ (সূর্য্যাদি জোতিষ্ক সমূহেরও জ্যোতি) তমসঃ পরং (তমঃ শক্তি বা অবিদ্যা অন্ধকারের অতীত বা অসংস্পৃষ্ট) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন), [তিনি] জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং (জ্ঞান ও জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (অমানিত্বাদি সাধন লভ্য) সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি ধিষ্ঠিতম্ (হৃদয়ে অবস্থিত)॥ ১৭

শ্রীধর। কিঞ্চ—জ্যোতিষামপি ইতি। জ্যোতিষাং—সূর্য্যাদীনামপি তৎ জ্যোতিঃ—প্রকাশকং, "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ", "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেন অসংস্পৃষ্টমুচ্যতে, 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তৌ অভিব্যক্তম্। তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ং চ জ্ঞানগম্যং চ। অমানিত্বাদি লক্ষণেন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি ধিষ্ঠিতম্—বিশেষেণ অপ্রচ্যুত স্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কদিগেরও তিনি জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক। শ্রুতি প্রমাণ এই—"যে তেজযুক্ত হইয়া সূর্য্য তাপ দেন" [পরমাত্মা যে স্বয়ংপ্রকাশ তাহাই বলিতেছেন]—"সেই ব্রহ্মসত্তায় সূর্য্য প্রকাশিত হয় না, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহও তথায় ভাসমান নহেন এবং বিদ্যুৎ সমূহও তথায় প্রকাশিত হয় না, এই অগ্নিই বা

সেখানে কোথায় ? প্রকাশমান আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই অর্থাৎ তাঁহারই প্রকাশে সূর্য্যাদি সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ দীপ্তি পাইতেছে।" অতএব তিনি তমঃ অজ্ঞান হইতে পর, অর্থাৎ ব্রহ্ম অজ্ঞান দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। শ্রুতিতে আছে—তিনি আদিত্যবর্ণ এবং তমের অতীত, তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত তিনিই রূপাদি আকারে জ্ঞেয়, এবং তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিত্বাদি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধন দ্বারা প্রাপ্য। জ্ঞানগম্য কিরূপ তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছেন—সকল প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে ধিষ্ঠিত কিনা বিশেষভাবে স্থিত অর্থাৎ অপ্রচ্যুত নিয়ন্তা ভাবে তিনি স্থিত। "ধিষ্ঠিত" এইরূপ পাঠ হইলে "অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আছেন" এইরূপ অর্থ হইবে॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাঁহার মত আর জ্যোতিঃ নাই—তাঁহারই পর অন্ধকার, ব্রহ্ম কূটস্থ স্বরূপ ; ইহারই নাম জ্ঞান, ইনিই জ্ঞেয় বস্তু—ইহাই জানিলে জানা যায়—সকলের হৃদয়ে স্থির হইয়া আছে।—জ্ঞেয় বস্তু ব্রহ্ম তাহা স্থিররূপ, সেখানে কোনও চাঞ্চল্য নাই, হৃদয়ের মধ্যে সেই স্থির ভাব অনুভব হয়, এই স্থিরতাকে অনুভব করিতে পারিলেই আর যাহা কিছু সমস্তই অনুভূত হয়। প্রথমে খুব জ্যোতিঃ, তাহার মধ্যে অন্ধকার অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ কূটস্থ। কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র এবং তাহার মধ্যে গুহা আছে, সেই গুহার মধ্যে বুদ্ধি স্থির হইয়া থাকে। হৃদয়ের বায়ুকে স্থির করিতে পারিলেই জীব সেইখানে স্থির হইয়া থাকে। গুরুবাক্যগম্য সাধনা জানিয়া সাধন করিতে পারিলেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। শুভ্র জ্যোতির জ্যোতিঃ তাঁহাকেই আত্মজ্ঞানীরা আত্মা বলিয়া জানেন। ইনিই জ্ঞেয়, উত্তমরূপে প্রাণায়াম করিলে প্রাণ সুষুম্নায় যায়, সেখানে যাইলে অগ্নির অপেক্ষাও প্রজ্বলিত জ্যোতিস্বরূপ কূটস্থ দেখা যায়—এইজন্য উহা জ্ঞানগম্য, ইনিই গায়ত্রীছন্দরূপা চতুর্থপাদ ব্রহ্ম। এখানে পৌঁছিলে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও শ্বেতদ্বীপনিবাসী উত্তম পুরুষে লীন হওয়া যায়। পরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উঁহাকে দেখিতে দেখিতে সাধক তদ্রূপ হইয়া যান। ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছা রহিত হইলেই ব্রহ্মপদ প্রকাশিত হয়। ঈশোপানিষদে আছে—

> "পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
> ব্যূহরশ্মীন্ সমূহতেজো।
> যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
> যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥"

পূষণ্ (হে জগৎপোষক সূর্য্য—কারণ প্রাণরূপ সূর্য্য না থাকিলে জগৎ থাকে না) একর্ষে (একাকী গমনশীল—মন আত্মমুখ হইলে তাহার বহুমুখী চিন্তা থাকে না—এক আত্মাকারা বৃত্তি হইতে থাকে) যম (সংযমকারিণ—তখন বহির্বৃত্তি সংযত হয়) সূর্য্য (রশ্মীনাং প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্য—(শঙ্কর)—প্রাণশক্তি শরীর ইন্দ্রিয়ে থাকিলে বাহ্য বস্তুর রসগ্রহণ হয় অর্থাৎ বোধ হয়—সাধন প্রভাবে যখন সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত প্রাণশক্তি মস্তকে নীত হয় তখন সূর্য্যস্বরূপ প্রকাশ সাধকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে)। প্রাজাপত্য (প্রজাপতির অপত্য—

প্রজাপতি কে ? যিনি সর্ব্বেশ্বর শাসনকর্ত্তা—'এষ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ'—(মুণ্ডক), সেই সর্ব্বেশ্বর আদি পুরুষ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিই প্রকাশ স্বরূপ তৈজসরূপ দ্বিতীয় পাদ—'তিনিই অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজসঃ দ্বিতীয় পাদঃ'—তিনিই মনোগ্রাহ্য বিষয় সমূহের জ্ঞাতা তিনি তেজোময়—তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে—'ব্যূহ' অর্থাৎ স্বান রশ্মীন্ বিগময় (শঙ্কর) অর্থাৎ স্বীয় রশ্মি সমূহ অপসারিত কর—নচেৎ তাঁহার কিরণোদ্ভাসিত বাহ্য বস্তুতে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইবে না। তেজঃ সমূহ—তেজকে সংকোচিত কর—কূটস্থের বাহিরে যে তেজ যাহা প্রথমেই দেখা যায়—তাহাও ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর—যং তে রূপং কল্যাণতমঃ—যেরূপ অতিশয় সুন্দর—সূর্য্যের মত প্রকাশ অথচ চন্দ্রকোটীসুশীতলম্। তে তৎ পশ্যামি—তোমার প্রসাদে যেন তাহা দেখিতে পাই। কারণ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে তবে তাঁহার প্রসন্নতা বুঝা যায়—উহাই আত্মার আনন্দময় বা স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ। যঃ অসৌ পুরুষ—জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী স্বরূপ যে আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ—পুরুষাকারত্বাৎ—পুরুষের মত যাঁহার আকৃতি অর্থাৎ কূটস্থমণ্ডলের মধ্যে পুরুষোত্তম নরনারায়ণ বপু। সোঽহমস্মি—আমি তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ আমিই তাই।

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥" মুণ্ডক

সোনার মত জ্যোতি, তাহার পর ব্রহ্মের রূপ, তিনি নিষ্কল ব্রহ্ম—অর্থাৎ রজঃগুণরহিত,—যিনি স্থির হইয়া আছেন, গুরু উপদেশ মত চলিলে যাহা দেখা যায়। "এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষো দৃশ্যতে ইত্যাধিদৈবতং"—এই অন্তরাদিত্য কূটস্থে হিরণ্ময় পুরুষ—চারিদিকে সোনার মত আলো—তাহার মধ্যেই পুরুষ—যাঁহারা ভালরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকেন তাঁহারা দেখিয়া থাকেন—উহাকেই "অধিদৈবত" পুরুষ বলে, সেই পুরুষই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম হইয়া যান। নিষ্কল—বাহিরের বায়ু বাহিরে থাকিবে, চক্ষু ভ্রুর মধ্যে থাকিবে, প্রাণ ও অপানকে সমান বায়ুতে অর্থাৎ নাভিদেশে স্থির রাখিতে হইবে। তখন বায়ু নাকের বাহিরে আসিবে না, নাকের মধ্যেই থাকিবে, সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত হইয়া প্রশান্ত হইবে, কথা বলিতে ইচ্ছা হইবে না—এই অবস্থাকেই "নিষ্কল" বলে। এই অবস্থা যাঁহাদের হয় তাঁহারাই মোক্ষপরায়ণ মুনি বলিয়া গণ্য হন। তখন মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সুষুম্নায় এক টানের অনুভব হয় উহাই বিষ্ণুদৈবত বা দ্বিতীয় মাত্রা। যোনিমুদ্রায় অধিকক্ষণ থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ কূটস্থের মধ্যে সকল দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, পুরুষোত্তমরূপ দর্শন হয়, উনিই নিত্য এবং পুরাণ পুরুষ—উহাই বৈষ্ণবপদ। তখন লিঙ্গমূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু স্থির থাকে। ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা যখন সমস্ত জানা যায় তাহাই ঈশান বা তৃতীয় পাদ। যিনি ঈশ্বর ও অধিপতি সেই ব্রহ্ম সকল ভূতের মধ্যেই আছেন বলিয়া তখন জানা যায়। যখন ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়, এইরূপ নিত্য ধ্যান করিতে করিতে নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ুর টান থাকে, এইরূপ ধ্যানাবস্থার মধ্যে ঈশান পদ প্রাপ্তি হইবে। কূটস্থের মধ্যে যে বিন্দু, অথবা বাহ্য বিন্দুতে (যাহা চক্ষের সামনে যেন দেখা যায়) থাকিবে—সেই অনিচ্ছার

ইতি ক্ষেত্রং তথাজ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবয়োপপদ্যতে॥ ১৮

ইচ্ছা—যাহা বোধগম্য—তাঁহারই মহিমা—তাহা দ্বারাই সমস্ত জানিতে পারিবে। আর যে অর্দ্ধমাত্রা যাহাকে চতুর্থ মাত্রাও বলে—তখন হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থিতি অনুভব হয়, যেখানে সমস্ত দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই ধ্যান করিতে হয়। গগন মণ্ডলে সেই ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহস্রদল পদ্ম নামক নিধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্বারা সর্ব্বব্যাপী আত্মার স্বরূপ বোধ হয় তাহার পর আর কিছুই নাই। এই শ্লোকে ব্রহ্ম জ্ঞানের পর পর অবস্থা বর্ণিত হইল॥ ১৭

অন্বয়। ইতি (এই প্রকারে) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (কথিত হইল), মদ্ভক্তঃ (আমার ভজনশীল) এতৎ বিজ্ঞায় (ইহা জানিয়া) মদ্ ভাবায় উপপদ্যতে (আমার ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন)॥ ১৮

শ্রীধর। উক্তং ক্ষেত্রাদিকম্ অধিকারিফলসহিতং উপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্। তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং। জ্ঞেয়ং অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতং ইত্যন্তং। বশিষ্ঠাদিভিঃ বিস্তরেণোক্তং সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণ উক্তম্। এতচ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত লক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ ভাবায়—ব্রহ্মত্বায় উপপদ্যতে—যোগ্যো ভবতি॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [অধিকারী এবং ফলের সহিত উক্ত ক্ষেত্রাদির উপসংহার করিতেছেন]—এইরূপে মহাভূতাদি হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত জ্ঞান, ও অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম হইতে বিষ্ঠিত পর্য্যন্ত জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলা হইল, যাহা বশিষ্ঠাদি কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বাধ্যায় কথিত লক্ষণান্বিত ভক্ত এই সমস্ত অবগত হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হন॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই শরীরই এবং জানিবার বস্তু সমুদয় বলিলাম। আমার যে ভক্ত অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস যাহার আছে ইহা জেনে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে আটকিয়া থাকে।—পরব্রহ্ম অবিজ্ঞাত বস্তু, উহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় না হইলেও উহা জ্ঞাতব্য। কিন্তু উহা জানিতে হইলে সাধন করিতে হইবে, শাস্ত্রালোচনাও করিতে হইবে, কিন্তু সে আলোচনা গুরুবাক্যানুসারী হওয়া আবশ্যক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলে সংসারের উপাদান স্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা এই দেহকে এবং ক্ষেত্রজ্ঞরূপা পরাপ্রকৃতি জীব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানলাভ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাই সাধককে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয় লাভ করিতে হয়। এই শরীর, এবং শরীরস্থ নাড়ী এবং নাড়ীমধ্যে প্রাণের প্রবাহ যদ্দ্বারা বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা জ্ঞানের বিষয় হইতেছে—ইহাই ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ

করিতে হইবে এবং সূর্য্যের কিরণ আসিয়া যেমন জগদাদি বস্তুকে প্রকাশিত করিতেছে, তদ্রূপ এই শরীরের মধ্যে কূটস্থ রহিয়াছেন, সেই কূটস্থ জ্যোতিঃ দ্বারাই এই বিশ্ববস্তু অস্তিত্ববান বলিয়া মনে হইতেছে ; তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, তাঁহারও পরিচয় লাভ করিতে হইবে। সাধন ব্যতীত এই প্রকৃতিদ্বয়ের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যাঁহারা সাধক তাঁহারা এই কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষ রহিয়াছেন অনুভব করিতে পারেন এবং তিনিই যে আমার "আমি" বা আমার যথার্থ স্বরূপ সেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। তিনিই পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই জগন্ময় পরিব্যাপ্ত, ইহা জানিয়াই সাধকের সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি হয়। কিন্তু ক্রিয়া না করিলে কিছু জানা যায় না। সেই ক্রিয়া করিবার আধার হইল এই শরীর। শরীরের মধ্যে ৭২০০০ নাড়ী রহিয়াছে, সেই সকল নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রাণ প্রবাহিত হইয়া এই জগৎভাবের সৃষ্টি করিতেছে এবং এই জগৎলীলা অনুভব করাইতেছে। এই অনুভব যতদিন থাকিবে ততদিন ব্রহ্মের ঘোর রূপ বা সংসার দর্শনের বিরাম হইবে না। তাই এই প্রাণক্রিয়াকে রুদ্ধ করিতে হইবে, উহার গতিকে বিপরীতগামী করিতে হইবে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসই হইল তাহার সাধনা। সেই সাধনায় কৃতকার্য্য হইলে সাধকের চক্রব্যূহ ভেদ হইবে, এবং চক্রব্যূহ ভেদ হইলেই পুরুষোত্তমকে দর্শন লাভ করিয়া সাধকের অজ্ঞানময়ী তিমির রজনীর অবসান হয়। সেই পুরুষোত্তমই জ্ঞেয় বস্তু। এই জ্ঞেয় বস্তুটীর দর্শন সাধক যখন পান তখন তিনি সদাসর্ব্বদা ঘণ্টানাদ হইতেছে শ্রবণ করেন, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। উহাতে যে আটকাইয়া রহিল সে-ই অমৃত পদ লাভ করিল। তখন হৃদয়েতে যে একশত নাড়ী রহিয়াছে তাহারও ঊর্দ্ধে যে একটি নাড়ী রহিয়াছে, প্রাণ তন্মধ্যে প্রবেশ করে। প্রাণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বিশ্ব সংসারকে ব্রহ্মময় বলিয়া অনুভব হইতে থাকে। তখন মনে কোন সঙ্কল্প থাকে না, যাহা কিছু করে অনিচ্ছার ইচ্ছায় করে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু করে না। সর্ব্বদা চন্দ্র সূর্য্যকে ভিতরে দেখিতে পায়। সর্ব্বদা আনন্দে থাকে। দূর দৃষ্টি হয়। তখন কেহ এই সাধকের অনিষ্ট করিতে চাহিলে ভগবান তাহাকে দণ্ড দেন। শরীর খুব স্নিগ্ধ থাকে। আত্মাতে ভক্তি হওয়ায় কেশ ও লোম উত্থিত হয়। সর্ব্বদা নেশার মতন মনে হয়, বিষয়ের কোন আকর্ষণ থাকে না। এই যোগী সর্ব্বদাই তৃপ্ত থাকেন, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই শূন্যে এবং দৃষ্টি সর্ব্বদা স্থির। তাহাকেই উন্মনী ভাব বলে। ইচ্ছা না করিলেও দূরের জিনিস তাঁহার চোখের সামনে ভাসে। যে বাক্য বলেন তাহা সিদ্ধ হয়, পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যের গুণ বুঝিতে পারেন।

ক্রিয়া ব্যতীত এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয় না, এই জন্য গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভক্তির সহিত ক্রিয়া করা আবশ্যক। যদি বলা যায় সাধনার দ্বারাই যখন জ্ঞেয় বস্তুটীকে বুঝিতে হইবে তখন আর ভক্তির কি প্রয়োজন? ভক্তির প্রয়োজন আছে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহ যে ভগবৎ সাধনের প্রচেষ্টা তাহার নামই ভক্তি। ভক্তি না থাকিলে সাধনা কি করা যায়? সমস্ত সাধনাই প্রবর্ত্তকের পক্ষে নীরস ঠেকে, যখন তাহা ভক্তিরসাপ্লুত হয় তখনই তাহা সাধন করা সহজ হয়। এইরূপ ভক্তির সহিত যিনি সাধনাভ্যাস করেন তাঁহার শীঘ্রই মনে একপ্রকার নেশার মত ভাব হয়, এবং এই নেশা হইতেই ক্রিয়ার পর অবস্থার উদয় হয়। এই নেশার মত ভাবই পর অবস্থা রূপ জ্ঞানের অনুজ্ঞাপক। এই

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯

ভাব হইতেই যাবতীয় বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য হয়। "জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদ্ অহৈতুকম্।" যে ক্রিয়া, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি আনিয়া দিয়া সাধককে কৃতার্থ করে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলেই ক্রিয়া করার কত আবশ্যকতা তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়॥ ১৮

অন্বয়। প্রকৃতিং পুরুষম্ এব চ (প্রকৃতি এবং পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী বিদ্ধি (অনাদি বলিয়া জানিও), বিকারাণ্ চ (বিকার সমূহ) গুণান্ চ (এবং গুণ-সমূহকে) প্রকৃতি সম্ভবান্ (প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে)॥ ১৯

শ্রীধর। তদেবং "তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ" ইতি এতাবৎ প্রপঞ্চিতং। ইদানীং তু "যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ" ইত্যেতৎ পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি পুরুষয়োঃ আদিমত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যম্ ইতি অনবস্থাপত্তিঃ স্যাৎ। অতঃ তৌ উভৌ অনাদী বিদ্ধি। অনাদেঃ ঈশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেঃ অনাদিত্বম্। পুরুষোঽপি তদংশত্বাৎ অনাদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চ অনাদিত্বং শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ অতি প্রবন্ধেন উপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যাৎ অস্মাভিঃ ন প্রপঞ্চ্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সংভূতান্ বিদ্ধি॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং "তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ" এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভাবেই বলা হইল, এখন "যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ" পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয়কেই প্রকৃতিপুরুষের সংসারহেতুত্ব কথন দ্বারা পাঁচটী শ্লোকে বিশদ্ ভাবে দেখাইতেছেন]—তাহাতে প্রকৃতি পুরুষ আদিমৎ হইলে তদুভয়ের উৎপত্তির জন্য অন্য আর এক প্রকৃতি স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ হয়, অতএব উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। অনাদি ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া প্রকৃতিও অনাদি এবং পুরুষও তাঁহার (ঈশ্বরের) অংশ বলিয়া উহা অনাদি বটেই। এই বিষয়ে পরমেশ্বরের ও তাঁহার শক্তি সমূহের অনাদিত্ব ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে বিস্তৃত প্রবন্ধ দ্বারা উপপাদিত হইয়াছে, অতএব গ্রন্থবাহুল্য আশঙ্কায় আমরা উহা বিস্তৃত-রূপে বলিলাম না। "বিকার" অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি এবং "গুণ" অর্থাৎ গুণপরিনাম সুখদুঃখ-মোহাদি প্রকৃতি হইতে সম্ভূত জানিবে॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীর এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ অর্থাৎ কূটস্থ এই দুয়েরই আদি নাই—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই ক্রিয়া দ্বারা—আসক্তি পূর্ব্বক অন্যদিকে দৃষ্টি করিয়া হইয়া থাকে—যাহা পঞ্চতত্ত্ব শরীরে থাকায় হয়।—প্রকৃতি ও তাহার অধীশ্বর পুরুষ এই দুইটী বস্তুই আছে। প্রকৃতি হইলেন শরীর, আর কূটস্থই পুরুষ। এই কূটস্থ যদি না থাকে শরীর হইতে পারে না। যেমন নদীতে ফেনা বহিয়া যায় তেমনি ব্রহ্মরূপ নদীর মধ্যে এই শরীররূপ ফেনা ভাসিতে থাকে। সেইজন্য উভয়ই অনাদি। ক্ষেত্ররূপা অপরা প্রকৃতিই ঈশ্বরের মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তম—ত্রিগুণরূপা। ইড়া,

পিঙ্গলা, সুষুম্নাই এই ত্রিগুণের খেলিবার স্থান। স্থির প্রাণই শুদ্ধসত্ত্বরূপা, তাহা স্পন্দিত হইয়া যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার মধ্যে আসিয়া খেলা করে তখনই তাহা মন ইন্দ্রিয়রূপে জগদ্ব্যাপার সম্পন্ন করে। কিন্তু স্থিরভাবটাই ঈশ্বরভাব, উহা আদ্যন্তহীন, সুতরাং ঈশ্বরের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপা দুই প্রকৃতিও অনাদি হইবেই। এই প্রকৃতিই বিকৃত হইয়া পঞ্চভূত ও তৎসহ একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন করে। তাহা হইলে মূলে হইল এক আত্মা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত আত্মা কিরূপে সর্ব্বদোষ যুক্ত শরীর হইতে পারেন ? যেমন স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ বায়ু হইয়া ধূম হয়, তাহা হইতে অভ্র অর্থাৎ ছোট মেঘ, পরে মেঘ হইতে বর্ষা হয়, বর্ষা হইতে শস্যাদি এবং শস্যাদি হইতে রেতঃ হয়, তাহাই আবার সর্ব্বভূতনিচয়। আত্মা ব্রহ্মবিজ্ঞানময় মন যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে। আকাশ বায়ু-রূপে যেমন পরিণত হয় তদ্রূপ আত্মাই চঞ্চল হইয়া মন হয়, ব্রহ্মরূপ আকাশ হইতে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া অভ্রের মত স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হয়, আবার সেই চঞ্চল মন বাসনাময় হইয়া স্থূলভূতাদি-রূপে পরিণত হয়, এইরূপে শুদ্ধ বা স্থির ভাব হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে মন এই বিশ্বরূপ পরিণাম লাভ করে। এইরূপে শুদ্ধমন হইতে ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনই আসক্তিবশতঃ কামনা করিয়া কাম্য বস্তু সকলকে সৃষ্ট করে, আবার এই মন কামনা রহিত হইলে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত ফলানুসন্ধান হেতু কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। যিনি সাধনাভ্যাস দ্বারা ইচ্ছারহিত হইয়া যান তাঁহার হৃদয়ে স্থিতি লাভ হয়, তখনই তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। জীবের যতদিন এই মোক্ষলাভ না হয়, ততদিন তাঁহার গমনাগমন থাকে, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম হইতে জীবের অদৃষ্ট বা সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয়, এবং সেই সূক্ষ্মশরীরই স্থূলশরীর রূপে প্রকটিত হয়। আত্মা নিত্য, সদা একরূপ, তাঁহার কোনরূপ বিকৃতি হইতে পারে না, তাই এই দেহ ও জগদাদি বিকারকে জ্ঞানীরা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় শূন্যমাত্র মনে করেন। জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের উদ্দেশ পাওয়া যায় না, তদ্রূপ প্রবুদ্ধ সাধকের নিকট এই জড়দেহ বা দৃশ্য জগদাদির কোন অস্তিত্বই থাকে না। অধ্যাত্মরামায়ণে ব্যাস বলিয়াছেন—"মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে। রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন।" যে সুবর্ণে কুণ্ডলরূপ মন কল্পিত হয়, রজ্জুতে ভুজঙ্গ কল্পিত হয় তদ্রূপ নির্ব্বিকল্প স্থির পরমাত্মাতে এই জগদ্রূপ কল্পিত হইয়াছে। বিচার দ্বারা এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। বিচার অর্থাৎ বিগত চরণ। যতক্ষণ মন চঞ্চল, ততক্ষণ তাহার বিষয়ানুসন্ধান থাকিবেই, যখন মনের চরণ বা চলন নষ্ট হয়, তখন আর তাহার বিষয়ানুসন্ধান থাকিতে পারে না; সুতরাং বিষয়াকারে পরিণত হওয়াও থাকে না। সৃষ্টি হয় মন হইতে, মন যতক্ষণ আছে সৃষ্টি প্রবাহ ততক্ষণ চলিবেই। মন নিরুদ্ধ হইয়া গেলে তৎসহ সৃষ্টিরও নিরোধ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্ট্যানুকূল শক্তিই তাঁহার প্রকৃতি, উহা ত্রিগুণময়ী, শাস্ত্রে তাঁহাকেই মায়া বলিয়াছেন, গুণ এই মায়ারই কার্য্য বা বিকার। প্রাণ বা শ্বাসের চাঞ্চল্য হইতেই এই জগদ্ভাব ফুটিয়া উঠে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চঞ্চল প্রাণ ও তৎসহ মন নিরুদ্ধ হইলেই ত্রিগুণের ক্রিয়া থাকে না। ত্রিগুণের অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অন্তর্গত ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে কোন কিছুর উৎপত্তি বা পরিণাম থাকে না। এই জন্য এই সকল

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০

গুণ বিকারাদি প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় প্রাণের প্রবাহ হেতুই হইয়া থাকে। সুতরাং যতদিন মনের আসক্তি থাকিবে ততদিন শরীর এবং শরীর থাকিলেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ কূটস্থ থাকিবেনই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি আমার থাকে না তখন ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রজ্ঞ কিছুই থাকে না। এই নিরোধ অবস্থা হইতে অদৃষ্ট বশতঃ যখন কল্পনার তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন কার্য্যসাধন ক্ষেত্রও উদিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাঁহার প্রকৃতিদ্বয় যাহা জগতের কারণ তাহাও অনাদি হইবে ॥ ১৯

অন্বয়। কার্য্য কারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্য—দেহ, কারণ=ইন্দ্রিয়াদি মন, বুদ্ধি ঐ কার্য্যের কারণ—ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে) প্রকৃতিঃ হেতু উচ্যতে (প্রকৃতি হেতু বলিয়া উক্ত হন); পুরুষঃ (পুরুষ) সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে (সুখ দুঃখ সমূহের ভোগ বিষয়ে) হেতুঃ উচ্যতে (হেতু বলিয়া উক্ত হন) ॥ ২০

শ্রীধর। বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসার হেতুত্বং দর্শয়তি—কার্য্যেতি। কার্য্যং— শরীরং। কারণানি—সুখদুঃখসাধনানি ইন্দ্রিয়াণি। তেষাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতিঃ হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষঃ—জীবঃ তৎকৃত সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপি অচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপি অবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি—তথাপি কর্ত্তৃত্বং নাম ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্তকত্বং। তচ্চ অচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি। যথা বহ্নেঃ ঊর্দ্ধজ্বলনং, বায়োঃ তির্য্যগ্ গমনং, বৎসাদৃষ্টবশাৎস্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বমুচ্যতে। ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনম্। তচ্চ চেতন ধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্ব-মুচ্যতে ইতি ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [বিকার সকল প্রকৃতি সম্ভূত তাহা দেখাইয়া পুরুষের সংসারহেতুত্ব দেখাইতেছেন]—কার্য্য=শরীর, এবং কারণ=সুখদুঃখ সাধক ইন্দ্রিয়গণ—তাহাদের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ তদাকার পরিণাম বিষয়ে প্রকৃতিই কপিলাদির মতে হেতু বলিয়া কথিত হয়। পুরুষ অর্থাৎ জীব দেহেন্দ্রিয়কৃত সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বের হেতু বলিয়া কথিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও অচেতন প্রকৃতির স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে এবং অবিকারী পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তথাপি ক্রিয়া সম্পাদন যে কর্ত্তৃত্ব শব্দের অর্থ তাহা চেতন জীবের অদৃষ্ট বশতঃ চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতু অচেতন প্রকৃতিরও কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয়। যেমন বহ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তির্য্যগ্ গমন, বৎসের অদৃষ্টবশতঃ স্তন্যপায়সের ক্ষরণ, তদ্রূপ পুরুষের সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব কথিত হইল। ভোক্তৃত্ব শব্দের অর্থ সুখদুঃখের অনুভব। সুখদুঃখ সংবেদন চেতন ধর্ম্ম। প্রকৃতির সান্নিধ্য হেতু পুরুষের ভোক্তৃত্ব সম্পাদিত হয়, এজন্য পুরুষের ভোক্তৃত্ব উক্ত হইল ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকার—ইহাতে থাকিলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের কারণ লক্ষ্য হয়। সেই কারণ উপলক্ষে কর্ম্ম করায় কর্ত্তা অহং ইত্যাকার বোধ হইয়া সকলে বিষয়াসক্ত অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত। মহেশ্বর যিনি স্থির হইয়া কূটস্থ স্বরূপ এই শরীরে রহিয়াছেন—যাঁহাকে স্পষ্টরূপে কূটস্থের পর ক্রিয়া ভক্তিপূর্ব্বক করিলে দেখিতে পায়—তিনি সুখ দুঃখ বর্জ্জিত—তাঁহাতে না থাকায় অর্থৎ আপনাতে আপনি না থাকায় অন্য দিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করায় প্রাপ্তি হওয়াতে সুখী বিবেচনা করে। অপ্রাপ্তিতে দুঃখ কিন্তু ইহার (সুখ দুঃখের) মূলীভূত কারণ সেই উত্তম-পুরুষই। কারণ তিনি না থাকিলে এ সকল অনুভব কে করে ? সুতরাং সুখদুঃখ ভোগের হেতু তিনি।—পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এইগুলিকে লইয়াই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ রচিত হইয়াছে, এইগুলির নামই প্রকৃতি। প্রকৃতিই চৈতন্যের লীলাপীঠ। প্রকৃতির মধ্য দিয়া চৈতন্য আপনাকে প্রকাশ করেন বলিয়াই আমরা চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। এই দেহাদিতে জীবের অভিমান ও আসক্তি বশতঃই দেহকৃত শুভাশুভ কর্ম্মে জীব আবদ্ধ হয় এবং শুভাশুভ কর্ম্ম জনিত ফল ভোগও করিয়া থাকে। এই আসক্তি বশতঃই সংসারের গতি রোধ হয় না, উহা সমভাবেই চলিতে থাকে, যেমন তাহার কর্ম্মেরও বিরাম নাই, তেমনি তাহার ফলভোগ জন্ম যাতায়াতেরও অন্ত নাই। গুণ বৈষম্য হেতু দেহাভিমানী জীবের শুভাশুভ বিবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ তাহার ফল ভোগে বাধ্য হয়। দেহাসক্তি থাকিতে এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির স্রোত রুদ্ধ হইবার নহে, এবং জন্ম জরা মরণের বশবর্ত্তী না হইয়াও থাকিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃতির অতীত একটি অপ্রাকৃত ভাব রহিয়াছে যাহা চঞ্চল নহে, জন্মজরামরণশীল নহে, যাহা চিরন্তন, যাহা নিত্য, সমুদয় ধ্বংস হইলেও যাহা ধ্বংস হয় না—তিনিই সুখদুঃখ বর্জ্জিত—চিরস্থির মহেশ্বর—যাহা এই প্রাকৃত দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহাতীত ভাবে নিত্য বর্ত্তমান—তিনিই কূটস্থ সত্য। যে সাধকের চিত্ত কূটস্থে বিলীন হইয়া যায় তিনিই পরমাত্মার এই মহেশ্বর ভাব অনুভব করিতে পারেন। ভক্তিপূর্ব্বক ক্রিয়া করিলেই যে স্থিরতা বা পরাবস্থা প্রকাশিত হয় তাহাই সর্ব্ব সুখদুঃখাতীত মহেশ্বর ভাব। যে ঐ ভাবে ভাবিত হয় তাহার আর অন্য দিকে আসক্তি থাকে না—উহাই আপনাতে আপনি থাকা। যে আপনাতে আপনি না থাকে সে সংসার দৃষ্টিদ্বারা আবদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য কত না সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এই সুখ দুঃখ ভোগও সম্ভব হইত না যদি কূটস্থ চৈতন্য না থাকিতেন। তাই এই কূটস্থ চৈতন্য পুরুষকেই সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্ব বিষয়ে হেতু বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতির মধ্যে চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই সুখদুঃখাদির অনুভব হয়। প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য বশতঃ প্রকৃতির মধ্যে স্ফুরিত সুখদুঃখাদি পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হইয়া তাঁহার ভোগ সম্পাদন করে, নচেৎ অসংলিপ্ত কূটস্থ নির্ব্বিকার পুরুষের আবার ভোগ সম্ভব হয় কিরূপে ? অধ্যাস হেতু তাঁহাকে ভোক্তা বলিয়া মনে হয়। যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ক্ষেত্রকে আমার বলিয়া অভিমান করেন, তাই সুখদুঃখাদি ক্ষেত্রধর্ম্ম ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু ॥ ২১

তপ্ত লৌহখণ্ডকে যেমন অগ্নিময় বলিয়া বোধ হয় তদ্রূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের গুণ পরস্পরের মধ্যে অধ্যারোপিত হয়। পুরুষের প্রকাশশীল স্বভাব হেতু প্রকৃতিকেও প্রকাশশীলা বলিয়া বোধ হয়, এবং প্রকৃতির অন্তর্গত অহংকার স্ফুরিত হইয়া আত্মার 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। ইহাই নির্বিকার চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের ভোক্তৃভাব। ইহাই অসংসারী আত্মার সংসার ভাব। ক্ষেত্রজ্ঞের এই অসংলিপ্ত ভাব কিছুতেই ধারণা করা যায় না যদি ক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ অবগত হওয়া না যায়। সেইজন্যই মন দিয়া ক্রিয়া করিতে হয়। ক্রিয়া মন দিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থার সাক্ষাৎ হয়। তখন আত্মা ও প্রকৃতির ভেদ এবং উভয়ের সম্বন্ধ কোথায় তাহা বুঝা যায় ॥ ২০

অন্বয়। হি (যেহেতু) পুরুষঃ (পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া) প্রকৃতিজান্ গুণান্ (প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদিগুণ সমূহকে) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন), অস্য (পুরুষের) গুণসঙ্গঃ (গুণসমূহের সহিত সংযোগই) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম ধারণের) কারণম্ (কারণ হয়) ॥ ২১

শ্রীধর। তথাপি অবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথম্? ইতি অত আহ—পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থঃ তৎকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষ। অতঃ তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে। অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গঃ—গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ—কারণ মিত্যর্থঃ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [অবিকারী ও জন্মরহিত পুরুষের তথাপি ভোক্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয় তদুত্তরে বলিতেছেন]—যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয় অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য দেহে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থান করেন, সেইজন্য প্রকৃতিজাত গুণ অর্থাৎ দেহজনিত সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। এই পুরুষের কিন্তু সৎ অর্থাৎ দেবাদিযোনিতে, আর অসৎ অর্থাৎ তির্য্যগাদি পশুপক্ষী যোনিতে যে জন্ম হয়, তাহার কারণ গুণসঙ্গ অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়-গণের সঙ্গই তাহার কারণ ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পুরুষ উপর্য্যুক্ত প্রকৃতিস্থ হ'য়ে প্রকৃতি হইতে জন্মিয়াছে যে গুণত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না তাহার ভোগ ত্রিগুণযন্ত্রে আরূঢ় হইয়া অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া ভোগ করিতেছেন। সেই প্রকৃতির গুণই সকলকে যেরূপ কর্ম্ম করাইতেছে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত, তদ্রূপ সৎ অসৎ যোনিতে ভোগ করিতেছে।—আত্মাতে না থাকিয়া অন্য দিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে যে ভোগ হয় তাহাই গুণত্রয়ে মনসংযোগ হেতু হইয়া থাকে। উহাই পুরুষের প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ সকলের ভোগ। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই ত্রিগুণ যন্ত্রে আরূঢ় হইলেই আত্মার বহির্ম্মুখ

দৃষ্টি হয়। সেই বহির্ম্মুখ দৃষ্টি হইতেই আত্মার বিষয়ভোগ হইয়া থাকে। প্রকৃতির গুণমোহিত কর্ম্ম হেতুই মনে ফললাভের আশা জাগ্রত হয়, এবং সেই ফললাভের প্রবৃত্তি হইতেই সৎ অসৎ যোনিতে জন্ম হয়। ভোগের বিচিত্রতা হইতেই বিচিত্র যোনি, এবং বিচিত্র যোনির অনুরূপ ফলভোগেরও বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। যাঁহার দৃষ্টি কেবল মাত্র কূটস্থে থাকে তাঁহাকে আর যোনির মধ্যে আসিতে হয় না। কূটস্থ সর্ব্বদেবময়, এইজন্য যাঁহাদের লক্ষ্য কূটস্থে থাকে, তাঁহাদের অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কূটস্থব্রহ্ম যিনি এই শরীরের মধ্যে ও বাহিরে আধিপত্য করিতেছেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইজন্য তাঁহাকে দেবরাজ বলে। কূটস্থের মধ্যেই সকল দেবতার অধিষ্ঠান, যিনি কূটস্থে থাকিবার অভ্যাস করিয়াছেন তিনি তন্মধ্যস্থ সকল দেবতা সকলকে দেখিতে পান। এই কূটস্থই জগন্নাথ,সমস্ত সিদ্ধ পুরুষেরা সেই জ্যোতির অন্তর্গত যে তমঃ এবং তাহার পরে যে উত্তম পুরুষ সেই উত্তম পুরুষের পানে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার ভিতরেই সব, সেইজন্য তিনিই ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়া সকলের মধ্যে সব হইয়া রহিয়াছেন। এই কূটস্থরূপ চক্ষু যাঁহার নাই অর্থাৎ কূটস্থে যাঁহার লক্ষ্য নাই তিনিই অজ্ঞানান্ধ হইয়া আমার আমার করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এই অজ্ঞান মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় হইল ক্রিয়া। কূটস্থ গায়ত্রী, তাহার মধ্যে ব্যোমস্বরূপ যে মহাদেব তিনিই আত্মা। এই ব্রহ্মপুরী শরীরের মধ্যে যে গ্রন্থিস্বরূপ গহ্বর হৃদয়েতে রহিয়াছে, বায়ু দ্বারা (প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে) আপনা আপনি কুম্ভক হইলে কূটস্থের মধ্যে যে আকাশবৎ দেখা যায়—যাহা পুণ্ডরীক নয়ন স্বরূপ—তাহার মধ্যে এক মহাকাশ আছে। সেই আকাশই আত্মা, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ গায়ত্রী, তিনিই পরব্যোম, তাঁহার নামই **শিব**। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে আটকাইয়া থাকা তাহা এই আকাশেই আটকাইয়া থাকা। ভোর হইবার সময় যে জ্যোতিঃ দেখা যায় সেইরূপ এক জ্যোতির প্রকাশ হয়। এই জ্যোতি দেখিলে সর্ব্ব আবরণ হইতে মুক্তি হয়। প্রথমে সোনার মত জ্যোতিঃ চারিদিকে দেখা যায়, তন্মধ্যে চক্ষুস্বরূপ সবিতা, সেই সবিতার অন্তর্গত যে দেবতা তিনিই **পুরুষোত্তম**। পুরুষোত্তম দর্শনের কালেও দ্বৈতহীন ভাব হয় না। যখন পুরুষোত্তমও ব্রহ্ম হইয়া যান, যখন এক বলিবারও কেহ থাকে না, তখন পুরুষোত্তম পতির পতি পরব্যোমরূপ শিবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক অদ্বিতীয় হইয়া যান। প্রাণেন্দ্রিয়াদির অবরোধে কূটস্থের যে রূপ দেখা যায় তাহাও ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে থাকিলেও মন অন্যদিকে যায় না, সুতরাং প্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মাকে পাপপুণ্য সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনি দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করেন, তখন 'আমি' থাকে না সুতরাং কোন জ্যোতিঃও থাকে না—তখন সবই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। সে এমন একটি অবস্থা যেখানে কিছু আছে বা নাই বলা যায় না। ইহাই ত্রিগুণাতীত বা ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম স্থানই পবিত্র তীর্থ—ঐ মিলনের স্থানই ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই স্থানেই ব্রহ্মেতে মনঃপ্রাণবুদ্ধি সমর্পিত হয়। "মনঃস্থং মনবর্জ্জিতং"—যখন মনেতেই মন থাকে, উহার মানেই আপনাতে আপনি থাকা—সেই মনই তখন ব্রহ্ম, তদ্ব্যতীত ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অন্য কোন রূপ নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

সত্য প্রতিষ্ঠা। ইহা ছাড়া অন্য যা কিছু সমস্তই মিথ্যা। সাধনা দ্বারা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এক হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে থাকিতে হয়। গুণময়ী প্রকৃতির মধ্যে মন থাকিলেই মন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করে, তাহাতেই অন্তর্দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন সেই সকল মনঃকল্পিত বস্তুতে আসক্ত হইয়া জীব সুখদুঃখময় বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকে। তখন ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিতে জীব স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। জীব যেমন যেমন কর্ম্ম করে তদনুরূপ তাহার বিবিধ যোনি লাভ হয়, এবং সেই সকল যোনিতে সদসৎ কর্ম্মের ফলভোগ হইতে থাকে। গুণযুক্ত বস্তুতে তাদাত্ম্য ভাবে অভিমান করিলেই জীবাত্মাকে সুখদুঃখাদি ভোগের জন্য বিবিধ দেহ ধারণ করিতে হয়। প্রকৃতির সহিত এই তাদাত্ম্যভাব নিবন্ধনই পুরুষ যখন প্রকৃতির সত্ত্বভাবে অভিমানী হইয়া থাকেন তখন তিনি দেবযোনি লাভ করেন, প্রকৃতির রজোগুণে অভিমানী হইলে মনুষ্য এবং প্রকৃতির তমোগুণে অভিমানী হইলে মূঢ়যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে। পুরুষ এইরূপ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধে যুক্ত হইলেই প্রকৃতির সহিত অভেদভাবে মিলিত হইয়া প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদি নিজের মনে করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাই নিত্যমুক্ত আত্মার বন্ধভাব। এই বন্ধভাবের খেলা খেলিবার জন্যই যেন প্রাণ ইড়া পিঙ্গলায় প্রবাহিত হইয়া পৃথক হইয়া পড়ে। আবার সাধনাদ্বারা যখন ইড়া পিঙ্গলার প্রবাহ সুষুম্নায় সঞ্চালিত হয় তখন জীবভাব রুদ্ধ হইয়া দেবভাব প্রকটিত হয়। আবার এই তিন মুখ যখন এক হইয়া যায় তখন জীব সর্ব্বভাব বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভাবাতীত কৈবল্য ভাবে যুক্ত হন। ইহাকেই জীবের মুক্তি বলে। ইহাই পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বিচ্ছিন্নভাব। এ সময়ে পুরুষের আর কিছু ভোগ হইতে পারে না। জীবের অদৃষ্টবশতঃ একবার এই মিথ্যা-ভোগ আরম্ভ হইলে গুণসঙ্গ হেতু ঐ ভোগ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। প্রকৃতির ত্রিগুণময়ীভাব ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় প্রাণের প্রবাহবশতঃই হইতে থাকে, এবং তাহারই বশে জীবের বিবিধ শরীরের উৎপত্তি হয়। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় প্রাণ প্রবাহের সহিত আত্মার যে নিমজ্জন তাহার নামই গুণসঙ্গ। এই গুণসঙ্গ হেতুই জীবের শুভাশুভ ফলভোগ। এই ভোক্তৃত্ব ভ্রম ততদিন যাইবার নহে যতদিন ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না তিন মুখ এক হইয়া না যায়। এই তিন মুখের গতি পৃথক থাকা পর্য্যন্ত অসাধক জীবের বৃত্তি বহির্ম্মুখে স্ফুরিত হইতে থাকে এবং বহির্ব্বৃত্তি স্ফুরণের সহিত জীবের ভোক্তৃত্ব জ্ঞান ক্রমশঃই বৃদ্ধিলাভ করে, ক্রমে বাসনানদী সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া জীবকে স্বখাদসলিলে ডুবাইয়া দেয় ॥ ২১

অন্বয়। অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) পুরুষঃ (আত্মা) পরঃ (স্বতন্ত্র অর্থাৎ দেহ হইতে ভিন্ন)। [তাহার কারণ তিনি] উপদ্রষ্টা (সাক্ষীস্বরূপ) অনুমন্তা (সন্নিধিমাত্রেই অনুগ্রাহক) ভর্ত্তা (ভরণকর্ত্তা—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি জড় হইলেও চেতন পুরুষের চেতন সত্তায় চৈতন্য যুক্ত বলিয়া অনুভূত হয়, ইহাই তাঁহার ভরণ) ভোক্তা (সুখদুঃখাদি, বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধি তাঁহার

জন্যই হইয়া থাকে, এই জন্য তাঁহাকে ভোক্তা বলে) মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ (·তিনিই মহেশ্বর ও পরমাত্মা) ইতি অপি উক্তঃ (ইহাও কথিত হন) ॥ ২২

শ্রীধর। তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারঃ, ন তু স্বরূপতঃ। ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব, ন তদ্‌গুণৈঃ যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—যস্মাৎ উপদ্রষ্টা পৃথগ্‌ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ। তথা অনুমন্তা—অনুমোদিতেব সন্নিধিমাত্রেণ অনুগ্রাহকঃ—"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধায়ক ইতি চোক্তঃ, ভোক্তা পালক ইতি চ। মহাংশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি, স ব্রহ্মাদীনামপি পতিরিতি চ, পরমাত্মা অন্তর্য্যামীতিচোক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ, "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপালঃ" ইত্যাদি ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত প্রকারে প্রকৃতির অবিবেক বশতঃই পুরুষের সংসার, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পুরুষের সংসার নাই—এই আশয়ে পুরুষের স্বরূপ বলিতেছেন]--এই যে প্রকৃতি কার্য্য দেহ, তাহাতে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন। তাহার কারণ এই যে তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ পৃথকভূতই, নিকটে থাকিয়া দর্শক অর্থাৎ সাক্ষী। অনুমন্তার অর্থ সন্নিধিমাত্রেই অনুগ্রাহক। শ্রুতিতে আছে—"তিনি সাক্ষী. চেতন, উপাধিবর্জ্জিত ও নির্গুণ। তিনি ঈশ্বররূপে ভর্ত্তা অর্থাৎ বিধায়ক, আর তিনি ভোক্তা অর্থাৎ পালক। তিনি মহান্ ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও অধিপতি। আর তিনি শ্রুত্যুক্ত পরমাত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই যে "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি এবং ইনি লোকপাল" ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই মহেশ্বর তিনিই গুরু ; যে দেশ লক্ষ্য হয় না তাহাকে গুরুবাক্যের দ্বারা দেখিতে পায়—সেই ব্রহ্মের অণুতে স্থিতি হইলেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জগন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপকে দেখিতে পায়। তিনিই সকলের ভরণ পোষণ কর্ত্তা অর্থাৎ আপনার ভরণ পোষণ কর্ত্তা আপনিই—ইহা লোকে জানিয়াও মূর্খের মতন হায় ভগবান ! হায় ভগবান ! কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব এইরূপে বৃথা কালযাপন করিতেছে। লোকে মনে করে যে আমি যাইতেছি উপার্জ্জন করিয়া. কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যাহা লোকে দেখিয়াও দেখে না যে মরা ব্যক্তি খায় না—আমাতে তিনি রহিয়াছেন তন্নিমিত্তে তিনিই খাইতেছেন ও যিনি খাইতেছেন তিনিই সর্ব্বত্রেতে সব জিনিষই খাইতেছেন জীব স্বরূপ হইয়া—দৃষ্টান্ত দাঁতেও পোকা ; তিনি সব ভুতেতে জীব-রূপে এক ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া মহেশ্বর, জগন্ময়, জগন্নাথ, ব্রহ্মময় কথিত সর্ব্বশাস্ত্রে হইয়াছেন। তাঁহাতে থাকিলে তিনিই হইয়া যায়—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বোধ হইয়াও কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না—তন্নিমিত্তে অব্যক্ত। কেবল ১৭২৮ বার প্রাণায়ামের পর যোগীদিগের ধ্যানগম্য। ইনিই আত্মার পর কূটস্থস্বরূপ। এই দেহেতেই কূটস্থের পর এক উত্তম পুরুষ, ক্রিয়া গুরু বাক্যের দ্বারা জানিয়া

দেখিতে পান (এই দেহে)।—যদিও পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতির পরিণাম এই দেহেই অবস্থান করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি স্বতন্ত্র, প্রকৃতির গুণে তিনি কখনও আবদ্ধ হন না। স্বরূপে এই আত্মা অসংসারী হইলেও তাঁহাকে উপদ্রষ্টা বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির সমীপস্থ তাই তাঁহাকে প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষী বলিয়া মনে হয়। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে—"জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেন সংস্থিতম্।" এই আত্মা প্রকৃতির সমীপস্থ বলিয়া প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষী মাত্র কিন্তু তিনি কখনই কর্ত্তা নহেন।

তিনি অনুমন্তা—আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপারসমূহে স্বয়ং কোন প্রকারে ব্যাপৃত না হইয়াও নিজে যেন অনুকূল ভাবে ব্যাপৃত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হয়। অথবা নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে কোন সময়ে নিবারণ করেন না বলিয়া আত্মাকেই অনুমন্তা বলা যাইতে পারে।"

তিনি ভর্ত্তা—তাঁহার সত্তা ব্যতীত দেহেন্দ্রিয়াদির সত্তার স্ফুরণ হইতে পারে না। চৈতন্যময় আত্মার চৈতন্য আভাসেই, এই জড় দেহেন্দ্রিয়বর্গ আত্মার ব্যবহারিক ভোগ সিদ্ধ করে—দেহেন্দ্রিয়াদিকে যে চৈতন্যময় করিয়া তুলেন তাই তিনি ইহাদের ভর্ত্তা।

তিনি ভোক্তা—আত্মা না থাকিলে কোন কিছুরই অনুভব হইতে পারে না। সমস্ত বস্তু বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আত্মার বোধের বিষয় হয়—তিনি বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। তাঁহার নিজের কোন ভোগ হয় না, কিন্তু তিনি প্রকৃতিকে আমার বলিয়া অভিমান করেন, সেইজন্য তাঁহাকে প্রকৃতি জাত বিষয়সমূহের ভোক্তা বলা হয়।

তিনি "মহেশ্বর"—অর্থাৎ মহান ও ঈশ্বর, কারণ তিনি সকলের আত্মারই আত্মা এবং তিনি সর্ব্ব হইতে স্বতন্ত্র সেইজন্য তিনি "মহেশ্বর।"

তিনি পরমাত্মা—এই আত্মা "পর" অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণ যে উত্তম পুরুষ তাহাই তিনি, সেইজন্য তাঁহাকে "পরমাত্মা" বলা হয়। ইনিই মূলতত্ত্ব, সকল জীবের আশ্রয়। নানা পাত্রস্থ জলে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু চন্দ্র একমাত্র, তদ্রূপ নানা দেহ মধ্যে যে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, সেই সমস্ত প্রতিবিম্বের যিনি বিম্ব স্বরূপ তিনিই পরমাত্মা।

তাঁহাকে মহেশ্বর কেন বলা হয়? "মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বায়ু স্থির রাখার নাম পূজা। সেই স্থিরাবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, সেই স্থিতি স্বরূপকেই বিষ্ণু বলে, তিনি সর্ব্ব-ব্যাপক। এমন কোন স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, এইজন্য তিনি মহেশ্বর। তিনিই গুরু—এই শরীরের রূপ হইতেছে ওঁকার। কূটস্থের ইচ্ছা হওয়াতে বিন্দু স্বরূপে প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলেই প্রাণ বায়ু স্বরূপ মহাদেবের আপনা আপনি আবির্ভাব হয়। সেই শরীরের মধ্যে ওঁকার ধ্বনি স্বরূপ নাদ সর্ব্বদা হইতেছে। সেই নাদের পরই বিন্দু, সেই বিন্দু ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, সেই বিন্দু স্থির হইলেই ব্রহ্মপদ প্রকাশ হয়। এই শরীরে ক্রিয়া করিতে করিতে যখন মন অন্তদিকে না যাইয়া স্থির হয়, তখনই অজ্ঞান অন্ধকার ভেদ করিয়া স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মারাম গুরুর প্রকাশ হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে মেরুদণ্ডের পরে মূলাধারে যে শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তি হৃদয়েতে স্থির হইলেই স্থিতিপদ লাভ হয়। এই মূলাধারস্থ শক্তিই শরীরকে ধরিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, শক্তি হৃদয়েতে স্থির হইলেও মৃণাল

তন্তুর মত হৃদয়েতে গমনাগমন করে, তখনই তাহার নাম হংস, আর যখন ভ্রূমধ্যে যায় ও বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই নাম 'রূপ'—ইহাই কূটস্থ রূপ, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে রূপ তাহাই ব্রহ্ম নিরঞ্জনের রূপ—উহাই অরূপের রূপ।"

"সোঽহং সর্ব্বময়ো ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েৎ।
পরাৎপরতরং নান্যৎ সর্ব্বমেব নিরাময়ম্॥"

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে "আমিই সব" এইরূপ হইলে পরমব্রহ্ম দর্শন হইল, উহাই অব্যক্ত পদ। ইহাই পরাৎপরতর, ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই অবস্থার উদয় হইলেই জীব সর্ব্বত্র নিরাময় হয়, অর্থাৎ আর মন অন্যদিকে যায় না।

এই ব্রহ্মই সকলের ভরণ পোষণের কর্ত্তা। তিনিই জীব, আবার জীবের কর্ম্মরূপে তাহার ফল উৎপন্ন করিতেছেন এবং জীবরূপে তাহা ভোগ করিতেছেন। সুতরাং জীব যে আমি করিতেছি আমি করিতেছি বলিয়া কর্ত্তা সাজিয়া বসে তাহা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক। কর্ত্তা একমাত্র তিনিই। সুতরাং ভাবিবার কিছু নাই! যাহাতে স্বরূপাবস্থা লাভ হয় তজ্জন্যই প্রাণপণ যত্ন করা আবশ্যক। স্বরূপাবস্থা পাইলেই বুঝিতে পারা যাইবে জগৎই বা কি জগন্নাথই বা কি? প্রাণ চঞ্চল হইলেই মন বহির্ম্মুখ হয়, তখনই জগদ্দর্শন হয়, অর্থাৎ সবই যেন চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। যখন প্রাণ স্থির হয় তখন আর কিছুই যায় বলিয়া মনে হয় না, সবই স্থির সবই অচল বলিয়া মনে হয়। সচল অবস্থা যাঁহার প্রভাবে অচল হইয়া থাকে তিনিই জগন্নাথ। ক্রিয়ার অবস্থায় ইহা বোধ করা যায় না, পরাবস্থায় ইহা অনুভূত হয় এইজন্য উহাকে অব্যক্ত পদ বলে। উহা ধ্যানগম্য পদ।

"যস্যাবলোকনাদেব সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
একান্ত নিস্পৃহশান্তস্তৎক্ষণাৎ ভবতি প্রিয়ে॥"

এই পরম ব্রহ্মের অবলোকনে সর্ব্ব সঙ্গ হইতে জীব বিমুক্ত হইয়া সকলের মধ্যে সেই একই ব্রহ্মকে দেখে। ইহারই নাম একান্ত। যখন সকলের মধ্যে একের অনুভব হইল তখন আর স্পৃহা কেন হইবে? এইরূপ যিনি ইচ্ছারহিত হইয়া যান, তিনি শান্তিপদকে লাভ করেন।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন তাঁহার স্বপ্ন দর্শন হয় না, ইহাই প্রকৃত সুষুপ্তি; এই সুষুপ্তি স্থানে থাকিতে থাকিতে নিজেও সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া এক হইয়া যায়। তৎপরে প্রজ্ঞান ঘন অবস্থা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ স্থৈর্য্য ভাব যখন অনেকক্ষণ স্থায়ী ও গাঢ় হয় এবং অধিককাল স্থায়ী ঘণ্টানাদ শুনিতে শুনিতে সেই ধ্বনিতে লয় হয় অর্থাৎ স্থিতিলাভ করিয়া আনন্দময় স্বরূপ হইয়া কেবল আনন্দই ভোগ করে। এইরূপে আনন্দস্বরূপ সুখভোগ হইতে সাধক প্রাজ্ঞ হইয়া তৃতীয়পাদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ হৃদয় গ্রন্থি ভেদ করিয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয়। সেখানে মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি ব্রহ্মেতে লীন হয়। ব্রহ্মের সহিত মিলন হইলেই পরমাত্মায় স্থিতি হয়, তাহারই নাম সন্ধ্যা বা ধ্যান যাহা ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে বুঝা যায়। এইরূপে রুদ্ধ থাকার অভ্যাস গাঢ় হইলে ধ্যানসন্ধ্যা হয়, যাহাতে কোন

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩

কায়ক্লেশ নাই। এইরূপ ব্রহ্মেতে মিলিয়া সকল ভূতে মিলিতে পারা যায়। ইহাই একদণ্ডির সন্ধ্যা। যখন সর্ব্বদা সুষুম্নায় থাকে, তখনই একদণ্ডি হওয়া যায় এবং তাহা হইলেই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ংজগৎ হয়।

বিষয়েতে থাকিয়া তাঁহাতে মন যাঁহারা রাখিয়া দিতে পারেন তাঁহারাই ঋষি। যেখানে সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থ কোটি সূর্য্যের মত প্রকাশ, তাহা অপেক্ষাও মহাজ্যোতি (অগ্নি ও বিদ্যুৎমিশ্রিত জ্যোতি), যেখানে অনেক দেবতারা রহিয়াছেন, সেই কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষ রহিয়াছেন। এবং যাহার মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব রহিয়াছে যাহা ক্রিয়া করিলে দেখা যায়, সেই কূটস্থই পূজনীয়, তিনিই গুরুব্রহ্ম, তিনিই শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্ব্বত্র রহিয়াছেন বলিয়া বিষ্ণু, ষড়ৈশ্বর্য্যবান বলিয়া ভগবান, এবং অত্যন্ত নির্ম্মল বলিয়া তিনি শিব। তিনি "পরম" অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি থাকাতে তিনি পরম। তিনি অরস এবং সকল রসের রস। তিনি বিজ্ঞান স্বরূপ, কারণ সেখানে যে থাকে সে সর্ব্বজ্ঞ হয়। তিনি সর্ব্বব্যাপক এই জন্য মহৎ, তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহাদেব, তিনি হৃদয়ে থাকিয়া সর্ব্বত্রে লোকের মধ্যে যান ও কোন লোকের বশ হন না—এইজন্য তিনি ঈশ্বর। তিনি ব্রহ্মা অর্থাৎ ইচ্ছাস্বরূপ, তিনি হইয়াছেন এই জন্য তিনি ভূত। তিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে জানেন এইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি ব্রহ্মা, হর, ইন্দ্র, কূটস্থ, বিষ্ণু স্বরূপে জগৎ ও জীবকে পালন করিতেছেন। তিনি সকলের আদি এইজন্য আদিত্য, তাঁহার জন্ম নাই এইজন্য অজ। তিনি প্রজাসমূহকে পালন করেন এইজন্য প্রজাপতি। তিনি যখন প্রজাপতি ও জগৎভর্ত্তা তখন লোকে মিথ্যা খাবার ভাবনায় ভাবিয়া মরে কেন? ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনি "কেবল"। এই দেহপুরীতে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া তিনি পুরুষ। তাঁহারই যজন করা যায় তন্নিমিত্ত তিনি যজ্ঞ, ক্রিয়ার পর অবস্থায় শান্তি পদকে পাওয়া যায় তন্নিমিত্ত তিনি শান্ত। তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই এই জন্য তিনি অদ্বিতীয়। প্রাণস্বরূপ যে অগ্নি সেই অগ্নি হিরণ্যবেষ্টিত বলিয়া তিনি হিরণ্যগর্ভ। এই প্রাণই বিশ্বম্ভর, তাঁহাকে কেহ দেখে না, কিন্তু তিনি সমস্ত করিতেছেন ও খাইতেছেন। দেখা শুনা, মনন করা সমস্ত প্রাণেরই কর্ম্ম, প্রাণই বাক্য, প্রাণই পরমাত্মার গৌণ নাম। এই প্রাণের সাধনা দ্বারা প্রাণ ও মন স্থির হইলেই এই দেহের মধ্যে যিনি উত্তম পুরুষ অথচ দেহ হইতে স্বতন্ত্র তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই অন্তর্য্যামী—তিনিই ভূতাধিপতি পরমাত্মা ॥ ২২

অন্বয়। যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (পুরুষকে) গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ (এবং গুণ সমূহের সহিত প্রকৃতিকে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বথা (সকল অবস্থায়) বর্ত্তমানঃ অপি (বর্ত্তমান থাকিলেও) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্ম গ্রহণ করেন না) ॥ ২৩

শ্রীধর। এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—য এবমিতি। এবং—উপদ্রষ্টৃত্বাদি-রূপেণ পুরুষং যো বেত্তি, প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ—সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সর্ব্বথা—বিধিম্ অতিলঙ্ঘ্য বর্ত্তমানোঽপি পুনঃ ন অভিজায়তে মুচ্যত এব ইত্যর্থঃ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপ প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানীকে প্রশংসা করিতেছেন]—এইরূপ উপদ্রষ্টা প্রভৃতি ভাবে যিনি পুরুষকে জানেন এবং যিনি গুণের অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির পরিণামের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, সেই পুরুষ সর্ব্বথা অর্থাৎ বিধিলঙ্ঘন করিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি মুক্তই হন॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ উত্তমপুরুষকে যে জানে অর্থাৎ দেখিতেছে পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, উত্তম, মধ্যম, অধমগুণ; সকলেতেই সেই ব্রহ্মের অণু স্বরূপ—সে সব সময়ে সেই পুরুষেতে না থাকিলেও তাহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না এবং হইয়াও সে হয়নি কারণ তৎব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছে।— পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যুক্ত জীব প্রকৃতি যখন উত্তম পুরুষকে জানিতে পারে তখন সে সকলের মধ্যেই ব্রহ্মের অণুকে দেখিতে পায়। সুতরাং কোন বস্তুই যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক তাহা আর মনে হয় না। শরীর, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জ্ঞাতারূপে যে সাক্ষীচৈতন্য রহিয়াছেন তাঁহারই সত্তার উপর এই বিশ্ব প্রকৃতির বিকাশ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সাক্ষীচৈতন্য ব্যতীত উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যে সাধকের মনঃ প্রাণ সাধনার দ্বারা ঐ সাক্ষীচৈতন্যের সহিত মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থা হইতে নামিয়া আসিলেও যদি সেই অবস্থার স্মৃতি জাগ্রত থাকে, তাহা হইলেও সে সাধকের পুনর্জ্জন্ম হয় না। কারণ তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন।

প্রকৃতির জন্যই অসীম কালকে খণ্ড খণ্ড বলিয়া মনে হয় এবং কালের খণ্ডত্ব হেতু সমস্ত বস্তুরই পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কিন্তু ক্রিয়া করিয়া যাঁহার ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হয় এবং ঐ অবস্থা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে থাকে, তখন সেই সাধকের বাহ্য বস্তুতে সংসক্তি লুপ্ত হইয়া শিশুর মত অবস্থা হয়। এই হাসি এই কান্না—আবার ক্ষণার্দ্ধপরে সে সকলের নাম গন্ধও স্মরণ থাকে না—এই প্রকারের জীবন্মুক্ত পুরুষ যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট কালের ব্যবধান থাকে না, ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাকে না। সমস্তই তখন তাঁহার নিকট বর্ত্তমান সদৃশ হইয়া থাকে। যাহার নিকট কাল সর্ব্বদাই বর্ত্তমান অর্থাৎ অখণ্ড, সে আর ভূত ভবিষ্যতের ধার ধারে না। কালের দ্বারাই কর্ম্মের সুখ দুঃখাদি ফল উৎপন্ন হয়, যাহার নিকট কাল সদা বর্ত্তমানরূপে অবস্থিত তাহার আর সুখদুঃখের ভোগ কোথায়? এক চিন্তা হইতে আর একটি চিন্তায় আসিতে হইলেই কালজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, যাঁহার চিত্তবৃত্তির কোন স্পন্দনই নাই তখন আর কর্ম্ম হইবে কি প্রকারে, সুতরাং কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদি ভোগের জন্য তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হওয়াও সম্ভব নহে। শরীরের মধ্যে যে কূটস্থ, তাহার পর উত্তম পুরুষ—পরমব্যোম স্বরূপে তখন তিনি সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং সব 'আমিই' তখন উহার মধ্যে। আমিত্বের জ্ঞান দ্বারাই বিষয়ের অনুভব হয়, যখন যেই "আমি" থাকে না তখন কোন বিষয়ও থাকে না, তখন সমস্তই এক ব্রহ্ম। শরীর দৃষ্টি থাকাতেই সাক্ষী চৈতন্যকে পৃথক পৃথকরূপে অনুভব হয়, কিন্তু

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৪

আত্মার সর্ব্বব্যাপকত্ব বুঝিতে পারিলে সেই এককেই সবের মধ্যে অনুভব হয়। প্রবর্ত্তক সাধকের যাহা সর্ব্বরূপে প্রতীতি হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই "সর্ব্ব" তখন একে মিলিয়া এক হইয়া যায়। প্রথমে বিশ্বের বিরাটত্ব অণুত্বে পরিণত হয়, এবং অণু ক্ষীণ হইতে হইতে শূন্যে পরিণত হয়। যাঁহারা কূটস্থের মধ্যে ব্রহ্মের অণু যাহা বিন্দুরূপে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারাই যোগী, সমস্ত বস্তু সংহত হইয়া এই বিন্দুরূপ, আবার এই বিন্দুই অনন্ত বস্তুরূপে প্রকাশ পায়—ইহা যাঁহারা প্রতক্ষ করিতে পারেন তাঁহাদেরই স্বস্বরূপে অবস্থান হয়। তখন তাঁহাদের জন্মজন্মান্তর সঞ্চিত কর্ম্মসমষ্টি যাহাকে প্রারব্ধ বলে তাহা সমূলে বিধ্বংস হইয়া যায়। তখন সাধকের জ্ঞাননেত্রের নিকট এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বর্ত্তমান থাকে না—পরে এক বলিবারও কেহ থাকে না। পরমাত্মা যাহা প্রকৃতই এক এবং অদ্বিতীয় যাঁহাকে মায়া প্রভাবে বহু বলিয়া বোধ হয়; দেহ বোধ নিরুদ্ধ হইলে সেই মায়াও মায়ীর মধ্যে সংপ্রবিষ্ট হয়, তখন এক আত্মাই বর্ত্তমান থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"ইদন্তু বিশ্বং ভগবাননিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ"

যে ঈশ্বর হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে সেই ঈশ্বর এবং এই বিশ্ব এবং যাহা জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে সমস্তই ভগবান অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময়॥ ২৩

অন্বয়। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনি (বুদ্ধির অভ্যন্তরে) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন); অন্যে (অপর কেহ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগদ্বারা), অপরেচ (আবার অন্য কেহ কেহ) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগদ্বারা) [আত্মদর্শন করেন]॥ ২৪

শ্রীধর। এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পান্ আহ—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেন —আত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা, আত্মনি—দেহে এব আত্মনা—মনসা, এনম্—আত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি। অন্যে তু সাংখ্যেন—প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্য আলোচনেন, যোগেন - অষ্টাঙ্গেন, অপরে চ কর্ম্মযোগেন পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাং চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগ্যং ক্রম-সমুচ্চয়ে সত্যপি তত্তন্নিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রকার বিবিক্ত আত্মজ্ঞানের সাধন বিষয়ে যে নানা বিকল্প আছে তাহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—(১) ধ্যান অর্থাৎ আত্মাকারপ্রত্যয় আবৃত্তি দ্বারা "আত্মনি" দেহে "আত্মনা" মন দ্বারা কেহ কেহ আত্মাকে দর্শন করেন। (২) অপর কেহ সাংখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য (ভেদ) আলোচনা দ্বারা ও অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। (৩) অপর কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। (এস্থলে "পশ্যন্তি" এই পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার সর্ব্বত্র অনুষঙ্গ জানিবে)। এই সকল ধ্যানাদির যথাযোগ্য ক্রম সমুচ্চয় থাকিলেও নিষ্ঠার বিভিন্ন অভিপ্রায় দেখাইবার জন্য পৃথক ভাবে উক্ত

হইল। [যদিও আত্মদর্শনের জন্য ধ্যান, সাংখ্য, কর্ম্ম প্রভৃতির সমুচ্চয় অর্থাৎ পরস্পর মিলিত ভাবে অনুষ্ঠান করাই প্রয়োজন, তথাপি নিষ্ঠাভেদ দেখাইবার জন্য ভগবান এইরূপ বিকল্প উক্তি করিলেন।] ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে পর আত্মা নির্ম্মল ব্রহ্ম স্বরূপ অণু দেখিতে পায়। কেহ অসংখ্য প্রাণায়াম করিতে করিতে আপনা আপনি আত্মাকে দেখিতে পায়, অন্য লোকে সকল হইতে রহিত হইয়া আসক্তি পূর্ব্বক কোন দিকে মন না দিয়া কেবল আত্মাতে থেকে আত্মাকে আপনা আপনি দেখে—যাহাকে সাংখ্যযোগ কহে—তাহারও তাৎপর্য্য এই ক্রিয়া; অপর লোকে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ধারণা ধ্যান সমাধি যুক্ত হইয়া এই ক্রিয়া করিয়া (যাহা গুরুবক্তৃগম্য) সেই আত্মাকে আপনা আপনি দেখে।—বাহ্য বিষয়গুলি মনে আসিতেছে ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া, আবার বাহিরের বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়া বাসনারূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে—এইভাব যতক্ষণ ততক্ষণই সংসার। প্রাণধারা স্পন্দিত হইয়া মনরূপে এই সকল সঙ্কল্প বিকল্পের তরঙ্গ উঠায়। ইহাই জীবভাব, এইরূপেই জীবের সংসার ভাব ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আত্মার মধ্যে এই সকল তরঙ্গোচ্ছ্বাস নাই। সূর্য্য হইতেই কিরণসমূহ উৎপন্ন হইয়া যেমন বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ আত্মা চঞ্চল হইয়া প্রাণরূপে এই বিশ্বসংসারকে উৎপন্ন করে এবং বাসনা সহযোগে তাহার সহিত যুক্ত থাকিয়া কেবল সংসার তরঙ্গই অবলোকন করে, যখন ভাগ্যবশে সদ্‌গুরু কৃপায় এই সংসার চাঞ্চল্য তাহাকে ক্লিষ্ট করে, তখন আবার তরঙ্গাকারা মনোবৃত্তিগুলি নিজ কেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়; যখন বাসনাসমূহ আত্মকেন্দ্রে মিলিত হইয়া শান্ত হইয়া যায় তখনই চঞ্চল প্রাণ অব্যক্ত শান্ত প্রাণে মিশিয়া এক আত্মাকারাভাবে ভাবিত হইয়া থাকে—

"ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি" ॥ শ্বেতা, ৩।৭

আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগৎ, তদপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ, কারণরূপে তিনি জগৎ প্রপঞ্চের মধ্যেও বর্ত্তমান, এবং সেই জগদাত্মক বিরাট পুরুষের অতীত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্মা অপেক্ষা উত্তম এবং ব্যাপক বলিয়া বৃহৎ। তিনি "যথানিকায়" অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর অনুসারে সর্ব্বভূতে গূঢ় অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, এবং সমস্ত জগতের পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া স্বস্বরূপে যিনি জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া জীবগণ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।

সেই পরম পুরুষকে কিরূপে লাভ করিতে হয়? "ত্রিণিপদাবিচক্রমে বিষ্ণোর্গোপঃদাভ্যাং অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ণ"—ঋগ্‌বেদ। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিন পদ—আড়াই দণ্ড বামদিকে, আড়াই দণ্ড দক্ষিণ দিকে আর কিঞ্চিৎকাল মধ্যভাগে শ্বাস বহিতেছে—ইহাতেই সংসারচক্রের প্রবাহ চলিতেছে। এই অনন্ত কালচক্রের গতি স্থির হইলেই

বিষ্ণুর পরমপদ যাহা তাহা লাভ করিতে পারা যায়। বাম দক্ষিণ অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার গতি ক্রিয়ার দ্বারা স্থির হইয়া যখন সুষুম্নায় প্রবেশ করে তখনই স্থিরত্ব পদ লাভ হয়—ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্থিতিকে ধারণ হয়, ঐ স্থিরত্বই প্রকৃত ধর্ম্ম—এই স্থিরতা দ্বারাই নিবৃত্তিপদকে লাভ করা যায়। প্রথমে ক্রিয়া করিতে করিতে যত মন স্থির হয় ততই পাপের ক্ষয় হইতে থাকে। সমুদায় পাপক্ষয় হইলেই মনেতে মন ডুবিয়া যায়, এই শরীরের অধিপতি যে ব্রহ্ম তাঁহার সহিত যোগ হইয়া যায়। এই যোগযুক্ত অবস্থা হইতেই সর্ব্বত্র সমভাব হয়, হৃদয় সুন্দর হয় অর্থাৎ সে হৃদয়ে কোন গ্লানি বা মল থাকে না, তখনই আনন্দের অনুভব হইতে থাকে। তখন সাধক আর কোন আশ্রয়েরই অপেক্ষা করেন না, তখনই সাধকের "রাম ভরোস" বা ব্রহ্মের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা আসে। এই অবস্থাই **ক্রিয়ার পর অবস্থা, ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ**। শ্বাস মস্তকে চড়িয়া যখন স্থির হয় তখনই পরম পদকে যোগী সদা দেখিতে পান। বায়ুর স্থির গতির সহিত মায়া রহিত হইয়া সাধক তত্ত্বাতীত ব্রহ্মভাবে থাকেন। ক্রিয়ার পর অবস্থা, পরম পদ বা ব্রহ্মপদ ইহাই। সূক্ষ্ম অণু স্বরূপে ব্রহ্ম তখন সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার কোন উপলব্ধি হয় না, অথচ তাহাতে মন লীন হইলে সাধক সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন। ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে যে ধ্যানাবস্থা আসে তাহাতে নির্ম্মল ব্রহ্মাণুর সময়ে সময়ে উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মাণুই আমার নিজ স্বরূপ। উহা অনুভব করিয়া সাধক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তখন প্রাণের বাহ্য স্পন্দন না থাকায় মন প্রাণেতেই বিলীন হইয়া পরম শান্তিময় ভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় মনের বিজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়। সেই "সমরস" ভাব অর্থাৎ জ্ঞানধারা তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নধারে প্রবাহিত হইতে থাকে—ইহাই ধ্যানের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে পরমস্থির বা ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মই সকলের আধার, তাঁহাতে থাকিলে পরমানন্দের বোধ হয় এবং তখন এক অখণ্ড ব্রহ্ম বোধের দ্বারা সমস্ত বোধ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, এবং অপর যাহা কিছু সমস্তই ব্রহ্মে লয় হয়।

উপরোক্ত সাধনা এবং পরে অন্যান্য সাধনার ক্রম যাহা কথিত হইবে, তাহার সমস্তগুলিকেই একসঙ্গে আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহাতে নিরোধ অবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হয়। বহুকাল ও বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রিয়ার অভ্যাস ফলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহাকে ধ্যান যোগ বলে তাহা প্রকটিত হয়। এই সাধনার অঙ্গ হইতেছে, সাংখ্যযোগ ও ক্রিয়াযোগ। (১) ক্রিয়াযোগের বহু অঙ্গ আছে। তন্মধ্যে জপের সহিত প্রাণায়ামই সর্ব্বপ্রধান। প্রাণায়ামের ক্রিয়া করিতে করিতে মনের বহির্বিচরণ কমিয়া যায়, চিত্ত একাগ্র হইতে থাকে—ইহাই ধারণা, পরে চিত্ত বিশেষভাবে অন্তর্মুখী হইয়া নিরোধের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই ধ্যানাবস্থা লাভ হয়, পরে ধ্যান গভীরতর হইলে চিত্তের একাগ্রতা পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখন মন নিরুদ্ধ হইয়া যায়—উহার নামই সমাধি। প্রাণায়াম সাধনায় চিত্ত যত চিন্তাশূন্য হয় ততই সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া মন অন্তর্মুখ হইয়া আত্মস্থ হয়—ইহাই ভগবানে **সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ**। চিন্তার দ্বারাও ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান তাহাও কর্ম্মযোগ। পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াযোগগুলিও কর্ম্মযোগ।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

(২) "সাংখ্য ও ধ্যানযোগ"—বিচার যুক্ত জ্ঞানযোগই সাংখ্যযোগ, কিন্তু কেবল মৌখিক বিচার লইয়া থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসে রত হইয়া ক্রিয়াবান সাধকেরা আত্মাদ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। ইহাতেও প্রাণায়ামের আবশ্যকতা আছে, তাহা যোগীরা জানেন। সাধক প্রথম যোনিমুদ্রার দ্বারা শরীরস্থ আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন, ক্রমে শ্রদ্ধা ও অভ্যাসপটুতার দ্বারা জ্যোতির অন্তর্গত কূটস্থ মধ্যে উত্তম পুরুষ নারায়ণের দর্শনলাভ করেন। ইহাই আপনাকে আপনি দেখা। তখন মনের আর অন্য বস্তুতে আসক্তি থাকে না, যোগী কেবল আত্মক্রিয়ার দ্বারা আত্মস্থিতি লাভ করিয়া ভোঁ হইয়া থাকেন। ইহাও প্রাণায়ামেরই ফল। বেশী করিয়া প্রাণায়াম করিলে সাধকেরা আত্মজ্যোতিঃ নিত্যই দর্শন করিতে পারেন ॥ ২৪

অন্বয়। অন্যে তু (অপর কেহ কেহ বা) এবম্ অজানন্তঃ (পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলির কোন একটির দ্বারা আত্মার স্বরূপ জানিতে সমর্থ না হইয়া), অন্যেভ্যঃ (অন্যের নিকট হইতে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করিতে থাকে) শ্রুতিপরায়ণাঃ (আচার্য্যের উপদেশ বাক্যই যাঁহাদের মোক্ষমার্গ গমনের সাধন) তে অপি (তাঁহারাও) মৃত্যুং অতিতরন্তি এব (মৃত্যুকে অতিক্রম করেন) ॥ ২৫

শ্রীধর। অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—অন্যে তু ইতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদি-মার্গেন এবম্ভূতং উপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণম্ আত্মানং সাক্ষাৎ কর্ত্তুম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যু—সংসারং শনৈঃ অতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ। [অতি মন্দাধিকারীদিগের নিস্তারোপায় বলিতেছেন]—অপরে (মন্দাধিকারীরা) সাংখ্যযোগাদি মার্গ দ্বারা উপদ্রষ্টাদি লক্ষণান্বিত আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানিয়া অন্য আচার্য্যের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধ্যান করেন। তাঁহারাও শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ শ্রবণপরায়ণ হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসার ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অতিক্রম করেন ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইহা সকল শুনে অর্থাৎ উপর্য্যুক্ত কর্ম্ম সকল শুনে কোন একটা কিছু মনে স্থির করিয়া বসে; তাহারাও আর কিছু না পাইয়া কেবল ওঁকার ধ্বনি শুনিয়া পড়িয়া থাকে, তাহারাও তরে যায় অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে যে স্থিতি তাহার অনুভব হয়।—তিন গুণের সাম্য হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়, ইহাই তিনগুণের অতীত ভাব। প্রাণ, অপান, ব্যানের গতি তখন সমান। সেই সাম্যে স্থিত হইলে. স্থিরত্বপদকে পাওয়া যায়। তিনগুণের অতীত হইলে সমান বায়ু নাভিদেশেতে স্থির হইয়া হৃদয় পর্য্যন্ত স্থির হওয়াতে ঈশ্বর যিনি হৃদয়েতে আছেন তাহাতে লীন হইয়া সাধক সর্ব্বজ্ঞ হন—এ অধিকার লাভ যাঁহার পক্ষে কঠিন বা অসম্ভব, কূটস্থেতে প্রতিষ্ঠা হইলেও অনন্ত

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

লোকের প্রাপ্তি হয় ; সেই কূটস্থের গুহার মধ্যে প্রবেশ করাও যাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না, তিনি যদি কেবল গুরূপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া চলেন, তিনিও আপনা আপনি ওঁকার ধ্বনি শুনিতে পান। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত যোগীরও যে অবস্থা, যাঁহার গুরুকৃপায় নাদ ব্যক্ত হইয়াছে তিনিও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন—যাহাকে বিষ্ণুর পরম পদ বলে। এই শব্দব্রহ্মের সাধন খুব সহজ, একটু মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই প্রণবধ্বনি শুনা যায়, এবং তাহাতে যিনি মন দিয়া থাকেন তাঁহারও নেশা হয় এবং জগৎ ভুল হইয়া যায় ॥ ২৫

অন্বয়। ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং (স্থাবরজঙ্গম পদার্থ) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই হইয়া থাকে) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২৬

শ্রীধর। তত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ—যাবদিত্যাদি যাবদধ্যায় সমাপ্তি। যাবৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সত্ত্বং উৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যোগাৎ, অবিবেককৃততাত্তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [তাহাতে কর্ম্মযোগসম্বন্ধে তৃতীয়, চতুর্থ, ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলায়, এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যান যোগাদির বিষয়ও বিস্তৃতভাবে বলায়, ধ্যানাদিরও সাংখ্যবিবিক্ত আত্মবিষয়কত্ব হেতু সাংখ্যকেই অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন]—যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গমাদি বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ হইতে। ঐ দুইয়ের অবিবেককৃত তাদাত্ম্যাধ্যাস হেতু উৎপন্ন হয় জানিবে। [এক পদার্থে অন্য পদার্থের ধর্ম্মকে বোধ করার নাম অধ্যাস। অনাত্মাকে আত্ম বোধ হইলে অনাত্মার ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া যে বোধ তাহার নাম অধ্যাস। স্থূলত্ব ও কৃশত্ব আত্মার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু আমি স্থূল আমি কৃশ বলিলে দেহ ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যাসিত হয়। আত্মা যে অনাত্মা হইতে বিলক্ষণ তাহার জ্ঞান না থাকায় এই অধ্যাস উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে এই অধ্যাস অবিবেক হেতুই হয় বলা যাইতে পারে] ॥ ২৬

[জীব ও পরমেশ্বরের অভেদ জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, "যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে"—যাহা জানিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্তের কি হেতু তাহাই দেখাইবার জন্য এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। যাহা কিছু বস্তু সঞ্জাত অর্থাৎ উৎপন্ন হয় সেই স্থাবরজঙ্গম সমস্ত বস্তুই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহার তাৎপর্য্য কি ? অর্থাৎ কি প্রকার সংযোগ এইস্থলে অভিপ্রেত ? [ইহাই বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে] যেমন রজ্জুর সহিত ঘটের অবয়ব-সংযোগমূলক পরস্পর সংযোগ হয়—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ কি সেই প্রকার ? তাহা হইতে পারে না,

কারণ আকাশের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞের কোন অবয়ব নাই। তন্তু এবং পটের যেমন সমবায় রূপ সম্বন্ধ আছে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে সেই প্রকার সমবায় রূপ সম্বন্ধই এস্থলে সংযোগের অর্থ, তাহাও নহে, কারণ তন্তু পটের মধ্যে একটি কারণ এবং অপরটি কার্য্য। তাহাদের মধ্যে এই কার্য্য কারণ ভাব আছে বলিয়াই তন্তু ও পটের পরস্পর সমবায়রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে সেই প্রকার কার্য্য কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধ নাই, এই জন্য উহাদের মধ্যে সমবায়রূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে ইহা কিরূপ সংযোগ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র বস্তুতঃই বিলক্ষণ স্বভাব। ক্ষেত্রজ্ঞ স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ, ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে অধ্যাসরূপ সম্বন্ধ তাহাই এই স্থলে সংযোগ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এবং ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয়। তাহা ছাড়া ক্ষেত্রের তাদাত্ম্য ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম ও তাদাত্ম্য ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এই প্রকার পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্ম্মের পরস্পরে যে আরোপ হয়, সেই আরোপ বা অধ্যাসই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ। এই সংযোগই সংসারের কারণ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপগত বিবেকের অভাবই এই সংযোগের কারণ; যেমন শুক্তি ও রজতের বিবেক জ্ঞান না থাকিলে শুক্তিতে রজত এবং সেই রজতের ধর্ম্ম আরোপিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের পরস্পরাধ্যাসও সেই প্রকার অবিবেকমূলক] —শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহা কিছু হইয়াছে দেখিতেছ—স্থাবর ও জঙ্গম—ইহা সকলেতেই সৎব্রহ্ম আছেন; এবং সকলেরই আকার ক্ষেত্রস্বরূপ আছেন প্রকৃতিরূপে এবং সকলেতেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ জীব পরম পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক এক তিনি আছেন; অতএব সেই এক পুরুষ দেখিলে অনন্য চিত্তে সেই এক পুরুষেতে থাকিলে একই এক অর্থাৎ ব্রহ্মেই ব্রহ্ম। তখন আর কিছু জানিবার ও পাইবার বাকি থাকিল না।—স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং।" তবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ভিন্নবস্তু কিরূপে এবং তাহাদের সংযোগই বা কিরূপে কল্পনা করা যায়? ক্ষর, অক্ষর দুই তাঁহার প্রকৃতি এবং এই দুই প্রকৃতি তাঁহা হইতে অভিন্ন। আমরা যেমন নিজের দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম হস্তকে সংযুক্ত করি সেইরূপ পুরুষোত্তম নারায়ণের ইচ্ছায় তাঁহার এই ক্ষর, অক্ষর প্রকৃতির মিলন হয়, এই মিলনই জীব ও জগৎ। দুই হস্তের মধ্যে যেমন "আমি" বর্ত্তমান তদ্রূপ তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে তিনিই বর্ত্তমান। সমুদ্রে তরঙ্গ দেখিলেও তরঙ্গ যেরূপ সমুদ্র হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ এই নামরূপময় জগৎ ও জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বহির্দ্দৃষ্টি থাকিতে ভিন্ন বোধ কিছুতেই নষ্ট হয় না। কথার বিচারে বুদ্ধি এই ঐক্যটাকে অনুভব করিলেও বাহ্য দৃশ্য থাকিতে এই ঐক্যের অনুভব কথার কথা মাত্র। অধ্যাস বুঝিতে পারিলেও অধ্যাস মন হইতে মুছিয়া যায় না। এই অধ্যাস যেজন্য হয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে প্রাণের স্পন্দন হেতুই মন স্পন্দিত বা সঙ্কল্পময় হইয়া এই বিরাট গন্ধর্ব্ব নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহা সত্য বা অসত্য কেবল বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া বালচপলতা মাত্র। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্য জগৎ বোধের বিষয় হয় না, জাগ্রদবস্থায়

আমরা স্বপ্ন দেখি না। কিন্তু দুটী অবস্থার মধ্যে যেটিতেই থাকিব তখন সেই অবস্থা-স্বরূপ দৃশ্য দেখা বোধ হইবে না। ইহা নাই মনে করিলেই নাই হয় না—কিন্তু এমন অবস্থা আছে যেখানে সত্যই তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। স্বপ্ন জগৎ ও বাহ্য জগৎ মনের দুইটী অবস্থা ভেদে পরিদৃষ্ট হয়। এক অবস্থায় অন্যটী থাকে না। সর্ব্বকালে উহারা থাকে না বলিয়া উহাদিগকে অসৎ বলা হইয়া থাকে। সদ্ বস্তু কেবল মাত্র আত্মা, তাহার ত্রিকালে কোন পরিবর্ত্তন নাই। সেই সদ্ বস্তুর একটি স্বস্থান আছে—তাহা বাহ্যদৃষ্ট স্থানের মত স্থান (space) নহে, তাহাই তাঁহার স্বধাম, সেই স্বধামে কোন মায়া নাই, সুতরাং স্থাবর জঙ্গমাদি নামরূপাত্মক জগতেরও তথায় কোন অস্তিত্ব নাই। সেই আত্মা স্বস্থানে থাকিয়াও যখন স্বস্থান হইতে দূরে সরিয়া আসেন বলিয়া যাহাকে আত্মার গুণযুক্ত অবস্থা বলে—সেই অবস্থায়, এক সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয়, তদ্রূপ সেই এক আত্মাতে যেন অসংখ্য বিম্বপাত হয়, তখনই ভেদজ্ঞাপক স্থাবর জঙ্গমাদি নামরূপময় অসংখ্য অসংখ্য প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই গুণময়ী অবস্থার অন্তরালে যে সত্তা বর্ত্তমান সেখানে নানাত্ব নাই, সেখানে সর্ব্বদাই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়াই আছে, সুতরাং সৃষ্টি বা লয় সেখানে কিছুরই সম্ভাবনা নাই। ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ জীব, এবং পরমপুরুষ ব্রহ্ম ইঁহাদের ভেদ যখন ঔপাধিক, প্রকৃত ভেদ বর্ত্তমান নাই, সেখানে সৃষ্টি বা লয় এ সমস্তই কাল্পনিক, প্রকৃত সত্য নহে। বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে যেমন এক স্বর্ণই সত্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ বহু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে এক আত্মাই বর্ত্তমান আছেন। তবে যে সাধারণতঃ আমাদের নিকট বহু বলিয়া প্রতীত হয় এবং চৈতন্য জড়ের ভেদ অনুভব হয় উহা সমস্তই আপেক্ষিক বোধ মাত্র। সমস্ত ক্ষেত্রকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন তন্মধ্যস্থ পুরুষ, সেই পুরুষকে যখন দেখা যায় তখন তন্মধ্যে একই রকমের রূপ ফুটিয়া উঠে, আর এই সমস্ত রূপ যাঁহার সেই পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন নামরূপময় বোধ সব ডুবিয়া যায়—তখন থাকেন কেবল সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মা। তখন জানিবারও কিছু থাকে না, পাইবারও কিছু থাকে না। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান তিন এক হইয়া কেবল "সৎ" স্বরূপে বিরাজমান থাকেন। কবির বলিয়াছেন—"হরি ভজৈ আপা মিটে তব পাওয়ে করতার"—হরি ভজন করিতে করিতে "আমি" মিটিয়া গেলে তখন কর্ত্তাকে পাওয়া যায়। তাই সাধকেরা বলিয়াছেন—"হরি ভজলেই সর্ব্বনাশ"। অর্থাৎ যে হরি ভজে তাহার নিকট 'সর্ব্বে'র প্রতীতি থাকে না, সে তখন হরির সহিত এক হইয়া যায়। ভক্ত তুলসীদাস রামচরিতমানসে বাল্মীকির মুখ হইতে বলাইয়াছেন—'জানত তুম্হিঁ তুম্হিঁ হোই জাঈ"—তোমাকে জানিলে তুমিই হইয়া যায়। এই শরীর-ঘট যে চৈতন্যের আলোক সম্পাতে চৈতন্যময় হইয়া রহিয়াছে—সেই চৈতন্যের সন্ধান কর, তখন এই দেহের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, এবং দেখিতে দেখিতে আর দ্রষ্টা ও দর্শন কিছুই থাকিবে না। কবির বলিয়াছেন—"ঘটহি মাহ চৌবতারা ঘটহি মাহ দিবান্"—এই শরীর রূপ ঘটের মধ্যে রাজা ও রাজসিংহাসন (কূটস্থ জ্যোতি ও তন্মধ্যস্থ উত্তম পুরুষ উভয়েই বর্ত্তমান) রহিয়াছেন। এই সকল বিষয় সন্ধান না করিয়া কেবল ঘটত্ব পটত্ব লইয়া কলহ করিলে কিছুতেই সেই অগম্য অপার বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না ॥ ২৬

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭

অন্বয়। সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমং তিষ্ঠন্তং (সমভাবে অবস্থিত), বিনশ্যৎসু (সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দেখেন), সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থভাবে দর্শন করেন)॥ ২৭

শ্রীধর। অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবম্ উক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শনমাহ—সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপি অবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্য ইত্যর্থঃ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ। [অবিবেককৃত সংসারের যে উদ্ভব তাহা বলিয়া সেই সংসার নিবৃত্তির জন্য বিবিক্তাত্মবিষয়ক (প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন তদ্বিষয়ক) সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে বলিতেছেন]—স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে নির্ব্বিশেষ সদ্রূপে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন, অতএব তাহাদের বিনাশেও সেই পরমাত্মাকে যিনি অবিনাশী বলিয়া দেখেন তিনিই সম্যগ্‌দর্শী, অপরে নহে॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপে যখন সবভূতেতে সমান হইয়া গেল ও সকল ভূতেতেই স্থিররূপে আটকিয়ে থাকিল—সেই এক ব্রহ্ম পরমেশ্বর হৃদয়েতে অর্থাৎ কূটস্থে—বিনাশমান বস্তুর বিশেষরূপে নাশ হইবার অন্তে যে পরব্রহ্ম দেখিতেছে তাহার আর বিনাশ নাই—ইহা যে দেখিতেছে সেই দেখিতেছে।—সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সংগ্রহে আছে—

"এষ প্রত্যক্ স্বপ্রকাশো নিরংশো-
ঽসঙ্গঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বদৈকস্বভাবঃ।
নিত্যাখণ্ডানন্দরূপো নিরীহঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

এই আত্মা প্রকাশস্বরূপ, অংশবিহীন, সঙ্গরহিত, দোষশূন্য, সকল সময়ে একরূপ, সর্ব্বদা অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, ক্রিয়ারহিত, উদাসীন, জ্ঞানরূপ কেবল এবং নির্গুণ।

কিন্তু এই যে এত ব্যক্তরূপ যাহার অন্ত নাই বলিলেই হয়, যাহা বাহ্য চক্ষে দেখিয়া এক মনে করাই অসম্ভব, সেই অসম্ভবও সম্ভব হয় ক্রিয়ার পরাবস্থায়। এত যে বহুরূপ তাহার মধ্যে সেই একত্ব যেন গুপ্ত হইয়া আছে, স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে তাহার গঠনের নানাত্বই লোকে দেখিতেছে, জানে না সেই স্বর্ণেরই এই বহুরূপ, তাহার মধ্যে স্বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই—সেই একত্বের ভাবটী তখনই প্রকাশ হয় যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় বহুভাব প্রকৃষ্টরূপে লীন হইয়া যায়, তখন মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত টান থাকে, তখন মন তল্লীন হয়, সে অবস্থায় অন্যদিকে মন যাইতে পারে না। ইহাই ভগবানের

"অবরুদ্ধ" রূপ। এইরূপে মন আটকাইয়া থাকিলে আর কিছু দেখা যায় না। সুষুপ্তিতে মন যেমন রুদ্ধ হয় ইহা সে ভাবের অবরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ জাগ্রত ভাব কিন্তু উহাতে মনের বিষয় দর্শন হয় না। মন থাকে না বলিয়াই যে বিষয় দর্শন হয় না তাহা নহে। অজ্ঞান হেতুই বিষয় প্রপঞ্চ ব্যক্ত করে, অবরুদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞান থাকে না সুতরাং অজ্ঞান যে প্রপঞ্চের জনয়িতা অজ্ঞান না থাকায় সে প্রপঞ্চও থাকিতে পারে না। মনের কল্পনা মত যেমন আকাশে কত রূপ দেখা যায়, কিন্তু কল্পনা নষ্ট হইলে কল্পিতরূপের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সব রূপ যখন অরূপ সাগরে ডুবিয়া এক হইয়া যায় উহাই সমত্ব, উহাই ব্রহ্মপরমেশ্বরের রূপ। যাবতীয় জীবভূত কল্পিত হইয়া যখন মূর্ত্তরূপে ব্যক্ত হয়—সেই ব্যক্ত মূর্ত্তির অন্তরালে এই অমূর্ত্তই বিরাজিত থাকেন। অমূর্ত্তকে আশ্রয় করিয়াই অনন্তরূপময় জগৎ অস্তিত্ববান হইয়া থাকে। সমস্ত রূপ যখন আবার এই অব্যক্ত অরূপের মধ্যে আত্মগোপন করে, তখনও কিন্তু সেই সমস্ত ব্যক্ত ভাবের অধিষ্ঠানরূপ অব্যক্তভাব বিনষ্ট হয় না। সে অবস্থায় যে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না তাহা চুলিকোপনিষদে বর্ণিত আছে—

"যস্মিন সর্ব্বমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মস্থাবরজঙ্গমং।
তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্‌বুদা সাগরে যথা॥"

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সেই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মেতেই এই স্থাবর জঙ্গম যেন সাগরের তরঙ্গের মত উত্থিত হইয়াছে এবং তাহাতেই আবার লয় হইয়া যাইতেছে।

যেমন সমুদ্র হইতে বুদ্‌বুদের উৎপত্তি এবং তাহাতেই লয়, সেইরূপ ব্রহ্মসমুদ্র হইতে বুদ্‌বুদ স্বরূপ এই বিশ্ব চরাচরের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মস্বরূপেই আবার তাহা লয় হইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মই প্রাণরূপে প্রবৃত্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয় মনরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাণস্পন্দন রুদ্ধ হইলেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করে, তখন জগৎ আর জগৎরূপে বর্ত্তমান থাকে না, তাহাও ব্রহ্মময় হইয়া যায়। বুদ্‌বুদের উৎপত্তি, স্থিতি যেমন ক্ষণিক, বিশ্বের স্থিতিও তদ্রূপ ক্ষণিক। বুদ্‌বুদের প্রকাশ যেমন ক্ষণেকের জন্য, এইরূপ বিশ্বের প্রকাশও ক্ষণস্থায়ী মাত্র। মনের চঞ্চলাবস্থায় এই তুমি, আমি, সমুদয় বিশ্বের জ্ঞান হয়, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন স্থির হইলে সেই সমস্ত ক্ষণেকের খণ্ড-জ্ঞান পরাবস্থার জ্ঞান মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মশক্তি যে প্রাণ, সেই প্রাণের স্পন্দনেই এই নামরূপময় জগৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য প্রাণ যাহাতে স্পন্দিত না হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, প্রাণের স্পন্দন থাকিতে সংসার দর্শন নষ্ট হইবে না। অতএব সর্ব্বদা প্রাণের ক্রিয়া করিয়া প্রাণকে স্থির করিতে চেষ্টা কর, তখন আর এই ব্যক্তরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইবে না। যাঁহারা আত্মদর্শী যোগী তাঁহারা নিজের দেহের অভ্যন্তরে কূটস্থকে দর্শন করেন, এবং তন্মধ্যে এই পরমরূপময় জগৎও দর্শন করিয়া থাকেন। এই নামরূপময় দৃশ্যভাবও শেষে জ্যোতির্ম্ময়রূপে পরিণত হয়, এবং সেই জ্যোতিও পরাবস্থার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। সেই পরাবস্থার আর বিনাশ নাই, ইহা যিনি যোগ প্রভাবে জানেন তাঁহার জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান॥ ২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

অন্বয়। হি (যেহেতু) সর্ব্বত্র সমং (সর্ব্বত্র সমান) সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ (সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (স্বীয় অবিদ্যাদূষিত বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না অর্থাৎ আপনা হইতে অন্য কিছু মনে করেন না) ততঃ (সেই হেতু) পরাং গতিম্ (পরমগতি) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৮

শ্রীধর। কুত ইতি ? অত আহ—সমমিতি। সর্ব্বত্র—ভূতমাত্রে, সমং সম্যগপ্রচ্যুতরূপেণ অবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাৎ আত্মানং ন হিনস্তি—অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং—মোক্ষং আপ্নোতি। যস্ত এবং ন পশ্যতি স হি দেহাত্মদর্শী, দেহেন সহ আত্মানং হিনস্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"

বঙ্গানুবাদ। [কেন যে তিনি সম্যক্দর্শী তাহাই বলিতেছেন]—যিনি সর্ব্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে, পরমাত্মাকে অপ্রচ্যুতরূপে অবস্থিত দর্শন করেন তিনি আপনি আপনাকে (আত্মাকে) হিংসা করেন না। অর্থাৎ অবিদ্যা হেতু সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে (আবৃত করিয়া) বিনাশ করেন না ; এবং তাহাতেই পরাগতি যে মোক্ষ তাহা তিনি প্রাপ্ত হন। যিনি এরূপ দেখেন না তিনি নিশ্চয়ই দেহাত্মদর্শী, দেহের বিনাশের সহিত আত্মাকেও বিনাশ করেন। [এইরূপ অবিবেকী ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে আত্মহা]—শ্রুতি বলিতেছেন—"যে সকল ব্যক্তিরা আত্মহা হন তাঁহারা মৃত্যুর পর আলোকহীন, অন্ধকারাবৃত যে সকল লোক (নিরয়াদি) তাহাতেই গমন করেন।"

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ (সমান রকম) সর্ব্বত্র ব্রহ্ম সকলেতে স্থিতি যে দেখিতেছে—সে আত্মাকে আত্মাদ্বারা নষ্ট না ক'রে অর্থাৎ অন্যদিকে দৃষ্টি না ক'রে ক্রিয়া করে যাহা গুরুবক্তৃ গম্য, তাহার পর পরাগতি (অর্থাৎ স্থিতি ক্রিয়ার পর) লাভ করে।—পরমাত্মা সর্ব্বভূতে একই ভাবে অবস্থিত—যাঁহারা আজ্ঞাচক্রে কূটস্থ দর্শন করেন তাঁহারা ইহা জানেন। বাহিরের রূপে বা গুণে জীবসমূহের ঐক্য না থাকিতে পারে কিন্তু যে আত্মতেজের প্রকাশ শক্তি দেহাদিরূপে ব্যক্ত হয়, সেই সকল শক্তির মূলই ঐ কূটস্থ জ্যোতিঃ। যদিও অনন্ত বস্তুতে তাঁহার অনন্ত প্রকাশ বর্ত্তমান তথাপি কূটস্থ রূপ মূল উৎসের মধ্যে কোন বর্ণগত বা গুণগত ভেদ নাই। সে কূটস্থ সকলের মধ্যে একই রূপে বর্ত্তমান। সেই কূটস্থ-আত্মার কোন কালে বিনাশ নাই। যাহারা কূটস্থকে দেখে না কূটস্থের তেজে বিকশিত বিশেষ বিশেষ দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত আকৃতি মাত্রকে দেখে, তাহারা আপনার বার বার জন্মমরণ দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ দেহান্ত দ্বারা পৃথক পৃথক উপাধির বিনাশ দেখিতে পায়। যাঁহারা কূটস্থকেই দেখেন, তাঁহারা কোন পদার্থের বিনাশ বা জন্ম জানিতে

পারেন না। প্রাণের চাঞ্চল্য হইতেই মন, সেই মন স্থির হইলেই স্থির প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। মন সঙ্কল্প-বিকল্পবিহীন হইয়া স্থির হইলে তখন আর তাহা মন নহে—তাহা স্থির প্রাণ, সেই স্থির প্রাণই আত্মা। প্রাণের ঊর্দ্ধগতি হইলে আজ্ঞাচক্রে যে তাহার স্থিতি হয়, সেই স্থিতির অবস্থাকেই আত্মা বলে, ইহা নিজ বোধরূপ, লিখিয়া বা বলিয়া বুঝাইবার নহে। আজ্ঞাচক্রে প্রাণ স্থির হইলে মনের লয় হয়, তখন এক আত্মসত্তা ব্যতীত আর কোন উপাধি বর্ত্তমান থাকে না। এই অবস্থায় সব সমান হইয়া যায় এই জন্ম ইহাকে "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। এই যে সমতারূপ আত্মা ইহাকে কেহই হিংসা বা নাশ করিতে পারে না। যিনি বিষয়রূপ বিষধরের মস্তকে চরণ রাখিয়া পরমানন্দে বংশী বাজাইতেছেন সেই সমতা রূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু গোবিন্দকে যে দর্শন না করে সে আত্মার অবিনাশী ভাব বুঝিবে কিরূপে? তাহাদের জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত, শুধু দেহ সম্বন্ধী হইয়াই চিরকাল থাকে। দেহে আরোপিত আত্মবোধ হেতু প্রতি দেহ গ্রহণ ও ত্যাগের সময় তাহারা আত্মাকে জন্মমরণধর্ম্মী বলিয়া মনে করে ও শোকগ্রস্ত হয়। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে "আত্মহা।" যাহারা প্রাণের চাঞ্চল্য এবং তজ্জনিত মনের বিক্ষেপ থামাইতে না পারে তাহারাই এই নিত্য নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ আত্মায় নানাত্ব কল্পনা করে এবং দেহদৃষ্টি যুক্ত হইয়া জন্মমৃত্যুর বিভীষিকা দর্শন করে। আত্মার স্বরূপ অবগত না হইলে জীবকে এইরূপ ঘোর নরক যাতনাই ভোগ করিতে হয়—এইরূপ আত্মহনন ব্যাপার অজ্ঞানান্ধ জীবের মধ্যে সর্ব্বদাই চলিতেছে। তাই আমাদের দুঃখের অবধি নাই, জন্ম মরণ ক্লেশেরও আর অন্ত নাই। হায় জীব, কবে তোমার সে সৌভাগ্যের উদয় হইবে? কবে তুমি শ্রীগুরূপদেশে আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া এই জন্মজরা-মরণ নাট্যাভিনয়ের পরিসমাপ্তি দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। বেদ জীবকে তাই প্রবুদ্ধ করিতেছেন "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—একবার সেই আত্মদর্শী মুক্তাত্মার চরণ ধূলিতে অভিষিক্ত হইয়া, হে জীব, জাগিয়া উঠ, জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে আপনি চিনিয়া লও। অবিদ্যার বশে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া আপনাকে আপনি জানিবার সুযোগ লাভ করিতে পার নাই, এইবার মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ, ওগো! এইবার আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি! এই সুযোগ কিন্তু আর হারাইও না। মনুষ্য দেহ পাওয়াও তত কঠিন নহে, অতিশয় সুদুর্লভ হইতেছে মনুষ্য দেহ পাইয়া আত্মানুসন্ধানে সচেষ্ট হওয়া। যে এই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তাহার গর্ভবাস ও দেহ ধারণের ক্লেশ স্বীকার মাত্রই সার হয়। মনুষ্য দেহ পাইয়া কেবল পশুদের মত ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত হইয়া থাকিলে আর কি হইল? হে জীব! একবার উদ্বুদ্ধ হও, একবার জাগিয়া তোমার স্বরূপ সন্ধান কর, তুমি নিজে কে দেখ, তোমার সর্ব্বস্ব যে আত্মা সেই আত্মার প্রতি মনোযোগী হইয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবার জন্য শ্রীগুরুর চরণপদ্ম আশ্রয় কর। দেখ শ্রীমদ্ভাবগতে কি বলিতেছেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥" ভাঃ ১১শ স্কন্ধ

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

দুর্লভ এই মনুষ্য দেহ। কর্ম্মজনিত দেহ প্রাপ্তি কথঞ্চিৎ সুলভ হইলেও যে মনুষ্যদেহ ভগবদানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবে, সেরূপ দেহ লাভ করা যে বড় কঠিন। কারণ মনুষ্য দেহ পাইয়া লোকে দেহেন্দ্রিয় সুখ লইয়াই উন্মত্ত হয় এবং কামিনী কাঞ্চন ভোগে অনুরক্ত হয়, এবং তাহার ফল স্বরূপ কত অধম যোনি প্রাপ্ত হয় তাহার সীমা সংখ্যা নাই। প্রহ্লাদও বলিয়াছেন "দুলভং মানুষং জন্ম, তদপ্যধ্রুবমর্থদং।" মানুষ হওয়া তো দুর্লভই, যাহাতে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় সেইরূপ জন্মলাভ তদপেক্ষা দুর্লভ। এই মনুষ্য দেহ রূপ নৌকার সাহায্যেই জীব ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হয়। এই দেহতরীর কর্ণধার শ্রীগুরুদেব। গুরুকৃপা লাভ করিয়া যে আত্মাকে স্মরণ করিয়া থাকে তাহার তরী অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়া যায়। যে ব্যক্তি এই অপূর্ব্ব দেহতরী পাইয়া এবং তাহার প্রকৃত কাণ্ডারী লাভ করিয়াও আত্মদর্শনে বঞ্চিত থাকে সুতরাং সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে প্রকৃতই আত্মঘাতী। এ জগতে দেখি সকলেই আপনাকে আপনি আঘাত করে ও সকলেই আপনাকে আপনি নষ্ট করিতে সতত উদ্যোগযুক্ত। কেবল তাহারাই আপনাকে আপনি রক্ষা করে যাহারা গুরূপদেশ মত সাধনাভ্যাসে রত থাকে, আদৌ অন্যদিকে দৃষ্টি করে না। এই সকল উত্তম সুচতুর সাধকেন্দ্রগণই পরাগতি যে মোক্ষ তাহাই লাভ করেন। ক্রিয়া মন দিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা রূপ স্থিতি ক্রিয়াবানেরা অনুভব করিতে পারেন। এবং এই স্থিতি যে অনুভব করিতে পারিয়াছে সে সকলের মধ্যেই এই স্থির অবিচল রামকে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারে যে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত এই আত্মা কাহাকেও হনন করেন না। কারণ "আমিই" আত্মারূপে সকলের মধ্যে রহিয়াছেন। কেহ তো নিজেকে নিজে হনন করে না। আত্মার এইরূপ অবিনশ্বরত্ব ও একত্ব বুঝিলেই উহার যথার্থ ফল যে মোক্ষ তাহাই লাভ হইয়া থাকে। যাহারা আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন নহে তাহারা দেহের মৃত্যুকেই মৃত্যু মনে করিয়া বার বার মরণ পাশে আবদ্ধ হয় ॥ ২৮

অন্বয়। যঃ চ (আর যিনি) কর্ম্মাণি (সমস্ত কার্য্যই) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতির দ্বারায়) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব প্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সাধিত হইতেছে) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা বলিয়া) পশ্যতি (দেখেন) সঃ পশ্যতি; (তিনিই যথার্থতঃ দর্শন করেন) ॥ ২৯

শ্রীধর। ননু শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথম্ আত্মনঃ সমত্বম্ ইত্যাশঙ্কাহ —প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব—দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া; সর্ব্বশঃ—সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ; ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি, তথা আত্মানং চ অকর্ত্তারং—দেহাভিমানেনৈব আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ন স্বতঃ; ইত্যেবং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি; নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৯

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল শুভাশুভ কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বহেতু আত্মার বৈষম্যই দেখা যায়, অতএব আত্মার সমত্ব কিরূপে হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন]—দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত

প্রকৃতির দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মসমূহ সম্পাদিত হইতেছে যিনি দেখেন, সেইরূপ আত্মাকেও যিনি অকর্ত্তা বলিয়া দেখেন—(দেহাভিমান বশতঃ আত্মার কর্ত্তৃত্ব, কিন্তু স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব নাই)—এইরূপ যিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন, অন্যে নহে ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রকৃতির গুণের দ্বারায় সমুদয় কর্ম্ম করে কিন্তু আত্মাতে দৃষ্টি রেখে—সুতরাং সে অকর্ত্তা—ব্রহ্মেতে সর্ব্বদা থাকে।—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য এইরূপ—"সর্ব্বভূতস্থমীশং সমং পশ্যন্ ন হিনস্তি আত্মনা আত্মনমিত্যুক্তং তদনুপপন্নং স্বগুণকর্ম্মবৈলক্ষণ্যভেদভিন্নেষু আত্মসু ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যা প্রকৃতির্ভগবতো মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ, তয়া প্রকৃত্যৈব চ নান্যেন মহদাদিকার্য্যকারণাকারপরিণতয়া কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিয়মাণানি নির্ব্বর্ত্ত্যমানানি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ যঃ পশ্যতি উপলভতে তথা আত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্ত্তারং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতং পশ্যতি স পরমার্থদর্শীত্যভিপ্রায়ঃ। নির্গুণস্যাকর্ত্তুর্নির্ব্বিশেষস্য আকাশস্যেব ভেদে প্রমাণানুপপত্তিরিত্যর্থঃ"—সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে যে দেখিয়া থাকে, সে আত্মাকে আত্মাদ্বারা হিংসা করে না, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে—এই যে কথা বলা হইল, ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ, কারণ জীবের গুণ ও কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, দেহভেদে আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন [সকল ভূতে এই আত্মা সমভাবে থাকিতে পারে না, তাহাই যদি হইত তবে কেহ সুখী কেহ বা দুঃখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা অজ্ঞ, এই প্রকার জীবগণের মধ্যে ব্যবস্থা হইতে পারিত না]। এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন যে, প্রকৃতি শব্দের অর্থ ভগবানের মায়া ; সেই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, শ্রুতিতেও আছে যে "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে"। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্য ও কারণরূপে পরিণত প্রকৃতিই কর্ম্ম করিয়া থাকে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে অন্য কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না। ঐসকল কর্ম্মও তিন প্রকার—বাচিক মানসিক এবং কায়িক। সর্ব্ব প্রকারে প্রকৃতিই সকল প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে ; আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তা নহে ; কারণ আত্মা সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত। এই প্রকারে প্রকৃতি ও আত্মার স্বরূপ যে দেখিয়া থাকে, সেই পরমার্থদর্শী ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা নির্গুণ সুতরাং অকর্ত্তা সেই আকাশের ন্যায় নির্ব্বিশেষ ও নিরুপাধি আত্মা যে প্রতি দেহে ভিন্ন, সে বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না"। আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন নয়, এবং আত্মা অকর্ত্তা ইহা শাস্ত্র ও আচার্য্য মুখে শুনিতেছি বটে, কিন্তু ইহা কি বুঝিয়াছি বলিতে পারি? বরং দৃশ্যমান জগতে বৈষম্যই রহিয়াছে দেখা যায়। যদি বল আত্মা কর্ত্তা নহে, প্রকৃতির দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাতে আত্মাকে অকর্ত্তা সাব্যস্ত হইল বটে কিন্তু প্রকৃতি আসিল কোথা হইতে? এবং প্রকৃতির পরিণাম অন্তঃকরণে যে আত্মার অধ্যাস হয় এবং অধ্যাস বশতঃ আত্মাতে যে কর্ত্তৃত্ব কল্পিত হয়, সেই অধ্যাস সম্ভব হয় কিরূপে? আত্মার অকর্তৃত্ব স্বীকার করিলেও প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কারণ দুটীর সংযোগই প্রয়োজন ; তখন জগতে দুইটী পৃথক পৃথক মূলতত্ত্ব রহিয়াছে বলিতে হয়, এবং তাহাদের পরস্পর অধ্যাসই এই জগৎ জীবরূপ যে পরিণাম তাহা কি করিয়া অস্বীকার করা যায়? আত্মাকে

সকলের অধিষ্ঠানভূত ও স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও—"সকল" তো থাকিয়া যাইতেছে, সুতরাং দৃশ্যমান প্রকৃতিকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদি প্রকৃতিকে তাঁহারই শক্তি বল, তবে ভগবানকে বা আত্মাকে অকর্তা বলা হয় কিরূপে? আমার শক্তির মধ্যে আমিই আছি, সেইরূপ ভগবদ্‌শক্তির মধ্যে ভগবানই বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই সব নানা শঙ্কা উদয় হয়।

বাস্তবিক অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের নানাবিধ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি রহিয়াছে। সেই ঐশ্বর্য্য বশতঃ কথনও তাঁহাকে নির্গুণ নিরুপাধিক এবং কথনও স্বগুণ সোপাধিক বলিয়া দেখা যায়। সুতরাং উভয়ের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই তিনি অকর্তা হইয়াও কর্ত্তা। অবশ্য এ কথা সত্য যে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিকার ও সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিত হইয়াও এবং নিত্য নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও তিনি সগুণ অর্থাৎ জীব ঈশ্বর ও জগতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বরং এই কথা বলাই সঙ্গত যে তিনি নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই। নির্গুণ আত্মা প্রকৃতি যুক্ত হইয়া সগুণ হন। এই প্রকৃতিও কোন ভিন্ন সত্তা নহে, এই প্রকৃতি ভগবানের নিজ শক্তি বা মহিমা। ইহাকেই ব্রহ্মের অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া বলে। ভগবানেরও যেমন অন্ত নাই, তাঁহার মায়ারও তদ্রূপ অন্ত নাই। প্রকৃতিকে কেহ কেহ জড় বলিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কাঠ পাথরের মত জড় নহেন, তিনিও আত্মার দৃশ্য পদার্থ বলিয়া তাঁহাকে জড় বলা হয়। প্রকৃতি ও আত্মা অবিনাভাবে সম্মিলিত। উভয়ই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী। এখন প্রশ্ন হয় যিনি এক অদ্বিতীয় শ্রুতি বলিতেছেন তিনি দুই বা বহু হন কিরূপে? ইহাই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছা—ইহা কিরূপে হয়, কেন হয় বলা যায় না। ভগবানের বিকল্প নাই, বাসনা নাই তবুও যখন তাঁহার আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা হয় যেমন দর্পনে আমরা মুখ দেখি, তখন তিনি নিজ মায়াকে প্রকাশ করিয়া আপনাকে তিনি বহুরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক অদ্বিতীয় হইলেও আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার তাঁহার সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্যই তাঁহার শক্তি বা মায়া। এই মায়া মিলিত হইয়াই তিনি বহু হইয়া থাকেন, এবং বহু হইয়া অর্ভক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সহিত খেলা করে তিনিও তদ্রূপ নিজ প্রতিবিম্বের সহিত খেলা করেন। এ খেলা খেলিবার সময়ও তিনি স্বস্বরূপ হইতে কথনও বিচ্যুত হন না। তাঁহার এই মায়া সৃষ্ট ক্রীড়নকগুলিও কোন পৃথক বস্তু নহে, ইহারা তাঁহারই শক্তি মাত্র। যখন এই ক্রীড়নকগুলি মায়া চক্রের মধ্যে পৃথক রূপে খেলিতে থাকে তখনই তাহাদিগকে বহু মনে হয় এবং তাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। এই ক্রীড়নকগুলি যখন মায়াভেদ করিয়া স্বকেন্দ্রে উপনীত হয়, যেমন জল বিম্ব জলে মিলিয়া যায় উহারাও তদ্রূপ ব্রহ্ম দেহে মিলিয়া যায়। জীব-বিম্বের এই অবস্থা প্রাপ্তিকেই তাহার মুক্তি বলে।

এই মায়া অন্য কিছু বস্তু নহে, ইহা তাঁহার স্বশক্তি। ঋষিরা সেই মূল কেন্দ্রকে পিতা এবং তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি যাহা জগতের উৎপত্তির হেতু তাঁহাকে তাঁহারা বিশ্বজননী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ঋষিদের এক সম্প্রদায় নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবকে ছাড়িয়া এই ব্রহ্মশক্তিকে সগুণ ভাবকেই পূজা করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই বিশ্বের আদি জননী বলিয়া তাঁহাকে

পরমেশ্বরী রূপে চিন্তা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাও বড় সুন্দর ভাব। মা যেন নানা সাজে সাজিয়া কখনও বিশ্বরূপে কখনও জীবরূপে কখনও জীবের মোক্ষদাত্রী হইয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। দেবতা, জীব সকলেই তাঁহার খেলায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

তিনি কার্য্যরূপে বিশ্ব আবার কারণ রূপে নিরাকারা, বিশ্বাতীতা, অরূপিণী হইয়াও জীবের সন্তাপ হরণ করিতেছেন এবং উপযুক্ত পাত্রকে মুক্তি দানের জন্য সদা উদ্যুক্তা হইয়া আছেন। শিবও যেমন বুদ্ধির অগম্য মাও তদ্রূপ বুদ্ধির অগম্যা, তাই দেবীমাহাত্ম্যে ঋষিরা স্তব করিতেছেন—

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপিদোষৈঃ
ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥"

'হে দেবি, তুমি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যেহেতু তুমি ত্রিগুণময়ী, তাই রজোগুণে জগৎ-সৃষ্টি কর, সত্বগুণে জগৎ পালন কর, আবার তমোগুণে জগৎ সংহার করিতেছ—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই একমাত্র হেতু! জগতের সব বস্তু তোমারই প্রকাশ, তথাপি তুমি রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত জীবের জ্ঞেয় নহ। হরিহরাদিও তোমাকে জানিতে পারেন না, তুমি যে অন্তরহিত। তুমি সকলের আশ্রয়রূপা সর্ব্বব্যাপিনী, তাই এ অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই অংশভূতা। প্রকৃতি পৃথক পৃথক দৃশ্যবস্তুরূপে অবিচ্ছিন্ন হইলেও তুমি ষড়বিধবিকারশূন্যা আদ্যা প্রকৃতি।'

সুতরাং জগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে, তাহা সমস্তই প্রকৃতির। ব্রহ্মের মধ্যে যে কার্য্যরূপা ভাব বা শক্তি তাহাই প্রকৃতি, তাহাই আত্মার ক্রিয়াশক্তি—বাহ্য প্রকাশ বা শরীর গ্রহণ। এই ক্রিয়াশক্তি আত্মকেন্দ্র হইতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া জগদাদিরূপে পরিণত হয়, আবার এই ক্রিয়াশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া যখন কেন্দ্র মধ্যে লীন হয়, তখন তাহা অব্যাকৃত, জগদাদিরূপ পরিণাম তখন নাই। প্রথমে এই শক্তি আত্মাতে অবিনাভাবে সম্মিলিত থাকে, পরে তাঁহার নিজেকে নিজে দেখিবার ইচ্ছা হইলেই তাঁহার স্বশক্তি যাহা তাঁহাতেই সুপ্ত থাকে তাহার স্ফুরণ আরম্ভ হয়। এই "একোঽহং বহুস্যাম" সঙ্কল্প। স্ফুরণের প্রথমাবস্থাতেও এই শক্তি অব্যক্ত, তখনও আপনাতে আপনি, কেবল ঈষৎ একটু ব্যঞ্জনাযুক্ত, শক্তি ও শক্তিমান তখনও অভেদ। পরে শক্তি ও শক্তিমান দ্বন্দ্বমিথুন অথচ যুগল—এইরূপে ব্যক্ত হ'ন। তখনও তাঁহারা অঙ্গাঙ্গীরূপেই অবস্থিত। পরে শক্তি যত সৃষ্টির দিকে উন্মুখ হয় তখন শক্তি ও শক্তিমান যেন পৃথক ভাবে উপলব্ধ হইতে থাকে, এই অবস্থায় তাঁহারা পরস্পরে একটু পৃথক ভাবে প্রকাশিত হইলেও পরস্পর হইতে তখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন না। তাই "চিৎ" যতই শক্তি (প্রকাশ) রূপে পৃথক হইতে থাকেন ততই শক্তি মধ্যে চিদাভাসরূপে তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে থাকেন। বহির্দৃষ্টিতে শক্তিকে যতই দেহাদি স্থূলরূপে পরিণত হইতে দেখা যায় ততই সেই সকল স্থূলরূপের মধ্যে চৈতন্য বিম্ব প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

এইরূপে প্রথমে প্রাণশক্তিরূপে, পরে মন-ইন্দ্রিয়-দেহাদিরূপে সেই সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর আত্মশক্তি যেন স্থূল হইতে স্থূলতর রূপ ধারণ করেন। বাষ্প যেমন জল হয়, জল যেমন জমিয়া বরফ হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। আত্মা যখন প্রাণরূপে ব্যক্ত হন, তখন ঐ প্রাণকেই তাঁহার প্রকৃতি বলে। তাঁহার মধ্যে বিচিত্র জগৎ নির্ম্মাণ শক্তি স্বতঃই বর্ত্তমান থাকে। সেই প্রাণরূপা আত্মা-প্রকৃতির মধ্যে আত্মচৈতন্য সদাকাল ঝলমল করিতে থাকে। এই প্রাণের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা ও প্রাণ যেন পৃথক পৃথক বস্তু এইরূপ ভাবের খেলা আরম্ভ হয়। এই খেলাকেই মায়ার খেলা বলে। ইহাতে বহু বিচিত্র ভাবের স্ফুরণ আরম্ভ হয়। এই প্রাণশক্তির সহিত আত্মার নিত্য নির্গুণ ভাব স্বতঃ সম্মিলিত। প্রাণের বিচিত্র নির্ম্মাণ শক্তির স্ফুরণের সহিত তাঁহার যেন নিজ সৃষ্ট বাহ্য জগতের সহিত মিলিত হইবার একটা প্রবল আকর্ষণ তন্মধ্যে দেখা দেয়। ইহাই প্রাণের কম্পন বা প্রাণতরঙ্গের উচ্ছ্বাস। তাহার ফলে মায়োপহিত চৈতন্য অহংকে মনরূপে বাহ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। নির্গুণ পুরুষ হইতে এই মায়াংশেরই পৃথক জীব উপাধি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি যেন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। ইহা যে বাস্তবিক পৃথক তাহা নহে, কিন্তু তবুও যে পার্থক্য দেখায় সেটুকুও যাহাতে না থাকে এইজন্য প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে একটি বিষম আকর্ষণ লক্ষিত হয়। সেই আকর্ষণের বেগই জীবকে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য ত্বরান্বিত করে। জগদাদি ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তা মন প্রাণশক্তিরই পরিণাম। এ সময় প্রাণের অবস্থা চঞ্চল বিক্ষেপময়। উহা যখন নিজ কেন্দ্র মুখ্য-প্রাণের সহিত মিলিত হইবার জন্য বেগযুক্ত হয় তখন প্রাণের পরিণাম দেহেন্দ্রিয় মন প্রভৃতিও সমস্তই কেন্দ্রমুখী হইতে থাকে। ক্রমে সর্ব্বত্রাবস্থিত প্রাণশক্তি গুটাইয়া স্বকেন্দ্রে সম্মিলিত হয়। এই সংমেলনের উপায় প্রাণের দ্বারা প্রাণকে ঘর্ষণ। ইহাও এক প্রকারের হবন ক্রিয়া। দুগ্ধের প্রতি পরমাণুতে অবস্থিত ঘৃত যেমন মন্থনের দ্বারা একীভূত হইয়া ভাসিয়া উঠে, কাষ্ঠদ্বয় সংঘর্ষণ দ্বারা যেমন তন্মধ্যস্থ অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তদ্রূপ প্রাণের মন্থন দ্বারা প্রকৃতিমধ্যগত আত্মজ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয় প্রাণ হইতে পৃথক হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রকৃতিরূপ সলিলের মধ্যে যেন স্বর্ণকমল ঝলমল করিয়া উঠে। ইহাই কারণার্ণবশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবৎস্বরূপ। ইহাই প্রকৃতি-মধ্যগত পুরুষ অথবা রাধাবক্ষবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। জড় চেতনরূপ পুরুষ প্রকৃতির ইহাই যুগল ভাবে সংবদ্ধ ভাব। পরে এই যুগল ভাবের যুগ্মবোধও লয় হইয়া এক অখণ্ডাকার মহাভাব বা পরাবস্থারূপে বর্ত্তমান থাকে। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সমস্তই একের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। 'সদেব আসীৎ' যে একমেবাদ্বিতীয়ং অগ্রে বর্ত্তমান ছিল পরেও এই নানাত্বের বিচিত্রভাব সব মিলিয়া গিয়া এক অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়। মধ্যের এই নানাত্ব মায়ার খেলা মাত্র—প্রকৃত নানাত্ব নাই। এই পুনর্মিলনের নামই সমতা, ইহা সমাধিভাবগম্য। যাঁহারা এইরূপ সমতা লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাধকেন্দ্রদের দেহান্তের পর আর তাঁহাদের স্থূলদেহ উৎপন্ন হয় না, কারণ যে সূক্ষ্ম শরীরকে অবলম্বন করিয়া স্থূল শরীর রচিত হয়, জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহাদের সে সূক্ষ্মশরীরও স্থূলদেহের পতনের সহিত চির নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। যতক্ষণ তাঁহাদের স্থূলদেহ থাকে ততক্ষণ প্রকৃতি তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারে পরিচর্য্যা করেন,

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০

তাঁহাদের অভিমান বিলীন হওয়ায় আর প্রকৃতির কার্য্য সুখদুঃখাদিতে তাঁহাদের আসক্তি বোধ থাকে না, সুতরাং আত্মমগ্ন এই সকল পুরুষেরা সর্ব্বদা ব্রাহ্মীস্থিতিতে বর্ত্তমান থাকায় এবং নিরহঙ্কার বশতঃ প্রকৃতির কার্য্যে তাঁহাদের কর্তৃত্ব বোধ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হওয়ায় অকর্ত্তারূপে তাঁহারা প্রকৃতির কার্য্যাবলী দ্রষ্টারূপে উদাসীনের ন্যায় দেখিতে থাকেন মাত্র ॥ ২৯

অন্বয়। যদা (যখন) ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ (ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাব অর্থাৎ নানাত্ব) একস্থং (এক আত্মাতে স্থিত), অতঃ এব চ (এবং উঁহা হইতেই) বিস্তারং (নানাত্বের অভিব্যক্তি বা বিস্তার) অনুপশ্যতি (দর্শন করেন) তদা (তখনই) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন) ॥ ৩০

শ্রীধর। ইদানীং তু ভূতানাং, প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন অভেদাৎ ভূতভেদকৃতমপি আত্মনঃ ভেদম্ অপশ্যন্ ব্রহ্মত্বম্ উপৈতি ইত্যাহ—যদেতি। যদা ভূতানাং—স্থাবরজঙ্গমানাং, পৃথগ্‌ভাবং—ভেদম্ পৃথকত্বম্, একস্থম্—একস্যামেব ঈশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতম্, অনুপশ্যতি—আলোচয়তি। অতএব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাৎ ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি। তদা প্রকৃতি তাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপি অভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩০

বঙ্গানুবাদ। [এখন দেখ ভূতগণও স্বকারণ প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়া ভূতভেদবশতঃ আত্মার যে ভেদ তাহাও যিনি না দেখেন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন, এতদর্থে বলিতেছেন]—যখন স্থাবরজঙ্গমাদি ভূতগণের পৃথগ্‌ ভবগুলিকে একস্থ বলিয়া অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর শক্তিরূপা প্রকৃতিতে প্রলয়কালে অবস্থিত বলিয়া যিনি আলোচনা করেন, অতএব সৃষ্টিকালেও সেই প্রকৃতি হইতে ভূতগণের আবার বিস্তার বা বিকাশ পর্য্যালোচনা করেন, তখন প্রকৃতিতাবন্মাত্র অর্থাৎ সব প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হওয়ায় সমস্তই এক—এইরূপ অভেদ দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান! [প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি বলিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ, এবং সবভূত প্রলয় কালে প্রকৃতিরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির সহিত অভেদ সুতরাং ব্রহ্মের সহিত অভেদ—এইরূপ অভেদদর্শী পুরুষেরাই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান] ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথক পৃথক ভূতকে যখন সব এক ব্রহ্মজ্ঞান হইল, এবং সেই এক ব্রহ্মের অণুর মধ্যে সকলই থাকিলেন, অতএব এই যে বিস্তার সংসার তখন সমুদয় ব্রহ্ম হইয়া গেল। এক অণুতেই সব, সবই এক অণুতে; তখন আর কিছুই নাই ব্রহ্ম ব্যতীত।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সকল ভূত মনের ও প্রাণের সহিত ব্রহ্মে লয় হয়, তখন ব্রহ্মব্যতীত আর কিছু থাকে না। ঋগ্‌বেদ ৭ম অঃ ৮ অষ্টক ১৪ ঋচা:—"অমৃতং যজ্ঞেমধিমর্ত্তেষু"—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই যে কূটস্থ স্বরূপ ব্রহ্ম মর্ত্তলোকে তিনিই মধু অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ হইতেছেন। আত্মাই সকল

চলায়মান বস্তুতে আছেন, নচেৎ বস্তুর নামরূপও প্রকাশ পাইত না, আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া চঞ্চল, এবং চঞ্চল হইয়া মনরূপে বিবিধ কল্পনা করিতেছেন। প্রাণই আত্মার প্রকৃতি, এই প্রাণে মন দিতে দিতেই চঞ্চল প্রাণ স্থির হয়, সেই স্থির প্রাণে যাহা কিছু দেখিবে সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইবে। আত্মারই বিস্তার প্রাণ, এবং প্রাণের বিস্তার মন বা সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্প স্বরূপ হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। প্রাণ স্থির হইলে যে অণু স্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, সেই অণুর মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব ডুবিয়া যায়, এবং বুদ্‌বুদ্‌ যেমন সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সেই অণুও ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া যায়, তখন এক বলিবারও কেহ থাকে না, কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই এক অণুতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পোরা। সেই এক অণুর জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কূটস্থে থাকিতে থাকিতে অণু দেখা যায়। কূটস্থে যে সর্ব্বদা থাকে তাহার আমি আমার থাকে না, এই আকাশ পাতাল পৃথিবী তাহার সব ব্রহ্মময় হইয়া যায়। এই আত্মদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূতসমূহকে আত্মাতেই অবস্থিত দেখা যায়, এবং তরঙ্গমালা অসংখ্য হইলেও যেমন তাহারা সাগর হইতে উত্থিত হইয়া সাগরেই বিলীন হয়, এবং সেই অসংখ্য তরঙ্গকে সাগর হইতে অভেদ রূপে দেখা যায়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মসত্তা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মসত্তাতেই নিমজ্জন ও তাহাতেই একীকরণ যাঁহার জ্ঞাননেত্রে ভাসিতে থাকে, তিনিই ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করেন। অজ্ঞান বশতঃ রজ্জুতে যে সর্প বোধ হইয়াছিল সেই অজ্ঞান স্বপ্ন কাটিয়া যাইলে সর্পবোধ রজ্জুতে বিলীন হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মে যে জগৎ ভ্রম কল্পিত হইয়াছিল, জ্ঞানের প্রকাশে সেই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়। নাম রূপ মিটিয়া এক সত্তা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

যেমন মণিগণ মধ্যে সূত্র প্রোত আছে, তদ্রূপ ব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে আছেন। হৃদয়, প্রাণ, মন এই তিন সূত্র—যজ্ঞোপবীত—সকল বাহ্য বস্তু যাহা দ্বারা গ্রথিত আছে ; যেমন কোন কর্ম্মের সঙ্কল্প হইলে প্রথমে হৃদয়ে, পরে প্রাণবায়ুতে, পরে মনেতে উদয় হয়। মনেতে যাহা উদয় হয় তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। কার্য্য, কারণ কর্ত্তৃত্ব হেতু বাহ্যিক সকল কর্ম্মের মধ্যে এই ব্রহ্মসূত্র আছে, অভ্যন্তরেও তাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে ক্রিয়া করিয়া হৃদয়কে স্থির করিতে হইবে,—সেই ক্রিয়া—প্রাণের দ্বারা প্রাণকে বৃদ্ধি করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, এবং সে অবস্থায় মনের চাঞ্চল্য আপনা আপনি দূর হয়। স্থিরত্বপদে থাকিলেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, তখন ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে থাকে সেই যোগী, ক্রিয়া করিতে করিতে যোগীদের আপনা আপনি ধারণা হয়, সেই ধারণার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ধারণ করিতে হয়। তখন তাঁহারা যোগযুক্তাবস্থায় থাকিয়া ২৪ তত্ত্বকে যেন দেখিতে পান—এইরূপ অনুভব করেন। (১) মূল প্রকৃতি—এই শরীর মূলাধার, তাহাতে থাকিতে থাকিতে (২) ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহৎ ব্রহ্ম হয়, (৩) পরে সোঽহং ব্রহ্ম ইত্যাকার বোধ হয়, (৪) মন—যিনি ব্রহ্মেতে লীন হন। পঞ্চ তন্মাত্র শরীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ (পঞ্চ তন্মাত্র) চক্ষু, শ্রোত্র, রসনা, নাসিকা, ত্বচ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়);

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়); ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (পঞ্চ মহাভূত) যাহা যোগবলে দিব্য দৃষ্টিদ্বারা দেখা যায়—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞাচক্র। পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম অণুসকল পৃথক রূপে দেখা যায়। এই সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন, ইহা যাঁহারা দেখিতে পান তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী। সকল তত্ত্বের মধ্যে সেই একই ব্রহ্ম রহিয়াছেন। তাই তাঁহারা যে তত্ত্বই দেখেন সকল তত্ত্বেই ব্রহ্ম দর্শন করেন।

মায়ার প্রধান বিকাশ দেশ ও কাল। ইহা দ্বারাই এক বস্তু এত অসংখ্যরূপে প্রতিভাত হয়। এই নানাত্ব দর্শন কিছুতেই যায় না যতক্ষণ আত্মচৈতন্যে বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হয়। বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে দেশকালের অতীত হওয়া সম্ভব নহে। দৃঢ় অভ্যাস সহ যিনি আত্মস্থ হইতে পারেন তাঁহার নিকট দেশ কাল জনিত পদার্থ সমূহের পার্থক্য কিছুই থাকে না, সমস্তই স্বপ্নবৎ মনে হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় একমাত্র ব্রহ্ম চৈতন্যই থাকেন, সুতরাং এই যে অসংখ্য জীব ও জগৎ যাহা দেখা যাইতেছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহার কোন অস্তিত্বই থাকে না। এই জন্য এই জগদাদি রূপ ব্রহ্মবিস্তার, সমস্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায় ॥ ৩০

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ (অনাদি এবং নির্গুণ বলিয়া) অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা (এই অব্যয় পরমাত্মা), শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থাকিয়াও) ন করোতি ন লিপ্যতে (কিছুই করেন না সুতরাং লিপ্ত ও হ'ন না) ॥ ৩১

শ্রীধর। তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাবস্থায়াং দেহকর্ম্মসংবন্ধনিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিঃ তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিবৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি ব্যেতি বিনাশমেতি। যচ্চ গুণবদ্বস্তু তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি। অয়ং তু পরমাত্মা অনাদিঃ নির্গুণশ্চ। অতঃ অব্যয়ঃ—অবিকারীত্যর্থঃ। তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি ন চ কর্ম্মফলৈঃ লিপ্যতে ॥ ৩১

বঙ্গানুবাদ। [তথাপি পরমেশ্বরের সংসারাবস্থায় দেহকর্ম্মসম্বন্ধ নিমিত্ত কর্ম্ম ও তৎ ফলজাত সুখদুঃখাদি দ্বারা যে বৈষম্য তাহা দুষ্পরিহর, অতএব সমদর্শন কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন]—যাহা উৎপত্তিমৎ তাহাই "ব্যেতি" অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর যাহা গুণবৎ তাহার গুণনাশে ব্যয় অর্থাৎ বিনাশ হয়, কিন্তু এই পরমাত্মা অনাদি এবং নির্গুণ অতএব অবিকারী। সেজন্য শরীরে থাকিয়াও তিনি কিছুই করেন না বা কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সুতরাং একেতে সব, সবেতে এক; তখন তাহার আদি কই? গুণই বা কোথায় থাকে তখন? কারণ গুণসব ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছে—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ব্রহ্মেতে লীন হইয়া গিয়াছে—আত্মার পর অবস্থায় স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে—যাহার স্থিতি হইলেও অনন্ত, তাহার আর

বিনাশ কোথায়? তিনি অর্থাৎ যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে—শরীরে থেকেও কিছুই করিতেছেন না—কিছু ব্রহ্ম—করাও ব্রহ্ম !! সুতরাং কিছু করিতেছেন না—অন্যবস্তু থাকিলে তবে লিপ্ত হইতেন, সবই ব্রহ্ম সুতরাং তিনি নির্লিপ্ত।— ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সমস্তই ব্রহ্মে লীন হইয়া গেল, তখন আর তাহাতে গুণ থাকে কি প্রকারে? ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মদশা—তাহার আদি অন্ত নাই, সুতরাং কিছু করিবারও নাই, এবং যখন সবই এক, তখন লিপ্ত করিবার বস্তু কোথায়? প্রাণ ইড়া পিঙ্গলায় বহিলে বহির্বস্তুর জ্ঞান হয়, দেহাদির অনুভব হয়, এবং পরস্পরের মধ্যে যেন একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া ধারণা হয়, আবার প্রাণ যখন সুষুম্নাবাহী হইয়া ত্রিগুণাতীত হইয়া যায় তখন প্রকৃতি কোথায়, এবং তাহার সহিত সংশ্রবই বা হইবে কাহার? প্রকৃতির সহিত সংশ্রব না থাকিলে জন্মমরণাদি বিকার থাকাও সম্ভব নহে। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই :—যাহার আদি নাই তাহাকেই অনাদি বলা যায়, আত্মা নিরবয়ব সুতরাং বিনাশও নাই। যে বস্তু সগুণ, তাহার গুণের অপচয় হইলে বিনাশ হয়। আত্মা নিগু´ণ সুতরাং তাহার বিনাশ হইতে পারে না। শরীরস্থ হইয়াও আত্মা কোন প্রকার কার্য্য করে না, এবং কার্য্য করে না বলিয়া কার্য্যের ফল দ্বারাও লিপ্ত হয় না। আত্মাকে শরীরস্থ বলা হইয়াছে, কারণ শরীরেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

জল মধ্যে সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, জলের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তন্মধ্যস্থ প্রতিবিম্বকেও হিল্লোলিত বোধ হয়, কিন্তু সূর্য্য যেমন প্রকৃত পক্ষে চঞ্চল হয় না তদ্রূপ শরীরের সুখ দুঃখের সহিত আত্মাকে সুখী বা দুঃখী মনে হয় বটে, কিন্তু আত্মার সহিত সে সকল সুখ দুঃখাদির প্রকৃত কোন সম্বন্ধ নাই। সেই জন্ম আত্মা শরীরস্থ হইয়াও শারীর ধর্ম্মের সহিত লিপ্ত হন না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে দেহের মধ্যে তবে কে কার্য্য করে? পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন দেহী যদি থাকে, তবে সেই কার্য্য করে ও কেবল সেই লিপ্ত হয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু দেহী তো তিনিই। "আমাকে সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে"—এইরূপ উক্তির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরে ভেদ অপ্রমাণ্য হয়। যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক কোন দেহী না থাকে তাহা হইলে করেই বা কে, লিপ্তই.বা হয় কে? ভগবান একস্থানে বলিয়াছেন —স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে—অবিদ্যাই কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম ফলে অবিদ্যালিপ্ত জীবের মন লিপ্ত হয়। "অবিদ্যা সংস্থতের্হেতু বিদ্যা তস্য নিবর্ত্তিকা" অবিদ্যাই যখন সত্য নহে মিথ্যা, তখন তৎকর্ত্তৃক ব্যবহারও মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই জগদাদি বিষয়, জীব এবং কর্ম্ম ও জীবের কর্ম্মফলে লিপ্ত হওয়া এ সমস্তই স্বপ্ন দর্শনের ন্যায়। স্বপ্নাবস্থায় প্রতীত হয়, জাগ্রদাবস্থায় তাহার কোন চিহ্ন থাকে না। যাহা সর্ব্বকালে সত্য নহে, তাহা অসত্যই বুঝিতে হইবে। সেই জন্ম জীবের বন্ধন ও মোচন ভ্রমজনিত মনঃব্যাপার মাত্র। আমরা সঙ্কল্পের দ্বারা জগতে লিপ্ত ও আবদ্ধ হই, এই সঙ্কল্প মনের কার্য্য। বলপূর্ব্বক সঙ্কল্প না করিলে কাহাকেও কোন কিছুর সহিত লিপ্ত বা বদ্ধ হইতে হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন দেহ বোধই থাকে না তখন দেহাদির কার্য্যে লিপ্ত হইবারও কাহারও সম্ভাবনা নাই ॥ ৩১

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২

অন্বয়। যথা (যেমন) সর্ব্বগতং আকাশং (সর্ব্বত্র অবস্থিত আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্ম বলিয়া) ন উপলিপ্যতে (কোন বস্তুর সহিত লিপ্ত হয় না) তথা (সেইরূপ) আত্মা (আত্মা) সর্ব্বত্র দেহে (সকল দেহে) অবস্থিতঃ অপি (বিদ্যমান থাকিয়াও) ন উপলিপ্যতে (কিছুরই সহিত লিপ্ত হয় না)॥ ৩২

শ্রীধর। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা ইতি। যথা সর্ব্বত্র—পঙ্কাদিষ্যপি স্থিতম্ আকাশম্ সৌক্ষ্ম্যাৎ—অসঙ্গাৎ পঙ্কাদিভিঃ নোপলিপ্যতে তথা সর্ব্বত্র—উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে অবস্থিতোঽপি আত্মা নোপলিপ্যতে—দৈহিকৈর্দ্দোষগুণৈঃ ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩২

বঙ্গানুবাদ। [ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন] যেমন সর্ব্বত্র অর্থাৎ পঙ্কাদিতেও অবস্থিত আকাশ অসঙ্গ হেতু পঙ্কাদি কর্ত্তৃক উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বত্র; উত্তম, মধ্যম অধম দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা দৈহিক দোষগুণ দ্বারা গুণ বা দোষযুক্ত হয় না॥ ৩২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেমত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেতে সকলেতেই সূক্ষ্মরূপে আকাশের গতি অর্থাৎ স্থিতি—তাৎপর্য্য স্থিতি গতি দুইই!! সূক্ষ্মগতি হইলে স্থিতি, স্থূল গতিতেই গতি!!! কিন্তু সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত নির্লিপ্ত। তদ্রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অণু স্বরূপে সকল দেহেতেই ব্রহ্মব্যাপ্ত অথচ স্থিতি। সেইরূপ আত্মা দেহেতে সূক্ষ্ম ব্রহ্ম স্বরূপে সকল স্থানে আছেন। গতি হইতেছে অথচ স্থিতি!! স্থিতি হইলেই নির্লিপ্ত ব্রহ্ম—সেই স্থিতি ক্রিয়ার পর অবস্থা—যে না পাইয়াছে সে জগতেতে আছে অর্থাৎ জন্ম হইবা পর্য্যন্তই কেবল গতিতেই রহিয়াছে। তাৎপর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের গতি রোধ করিবার জন্য কেবল এই ক্রিয়া—যাহা গুরুবক্ত্র গম্য ও সুখে করা যাইতে পারে। কেবল একটু অনুগ্রহ পূর্ব্বক এদিকে দৃষ্টি রাখা মাত্র ও "কেবলই স্রোতে বেয়ে যাবে"- একটা খুঁটি ধর যাহা তোমার মধ্যে রহিয়াছে।—আত্মা যে নির্লিপ্ত তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে আকাশ। আকাশ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু কোন কিছুরই সহিত আকাশ লিপ্ত নহে, কারণ আকাশ বড় সূক্ষ্ম। ধূলি ধূম আকাশকে সময়ে সময়ে যেন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল মনে হয়, কিন্তু ধূলি ধূম সরিয়া যাইবার কালেও আকাশে কোন দাগ রাখিয়া যাইতে পারে না, কারণ আকাশ অসঙ্গ। আকাশকে সর্ব্বত্রগ বলে অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুতেই তাহার স্থিতি, এই স্থিতি ও গতিটি কি বুঝা চাই! স্থিতি ও গতি একই কথা। স্থিতিশীল আত্মা কালের দ্বারাই গতিশীল হন। সীমাবদ্ধ কালই মায়ার রূপ। দেহ তাহার আশ্রয়, এই কালের জন্যই আমরা আত্মার ইহ পরত্র গমনাগমনের কথা শুনি, এই জন্যই বাল্য, যুবা, বার্দ্ধক্য, জন্ম, মৃত্যুর নানাবিধ খেলা দেখিতে পাই। এই প্রাকৃত সম্বন্ধ রহিত হইলেই আত্মাকে চির স্থির নিত্য নির্ব্বিকার, জন্মজরামরণশূন্য রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সহস্রদলে যাঁহাকে নিত্য নির্ব্বিকার রূপে বুঝা যায়—তাঁহাকে সুষুম্নায় অবস্থিত যখন

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

দেখি তখন তিনি গতিশীল অথচ স্থির। স্থির এইজন্য যে সুষুম্নায় অবস্থিত প্রাণ মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয় না, অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হয় না—"যাবৎ বায়ু মেরোর্মধ্যে তাবন্মৃত্যুভয়ং কুতঃ"—অথচ সেখানে যে একেবারে গতি নাই তাহাও নহে, একেবারে গতিশূন্য হইলে দেহ থাকিতে পারে না। তবুও সুষুম্নায় প্রাণের সূক্ষ্মগতিকে গতিশূন্যই বলে কারণ সে গতিতে কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে না। যখন প্রাণ ইড়া পিঙ্গলায় আসিয়া জন্মমরণধর্ম্মী হয়, তখনও সূক্ষ্মভাবে সুষুম্নায় স্থির প্রাণের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে, আবার এই স্থির প্রাণ যাহা অচল হইয়াও সচল, তাহা যখন একেবারে সহস্রারে পৌছিয়া গতিশূন্য হয়, তখন আর দেহাদির সহিত প্রাকৃত সম্বন্ধ থাকে না। জীবের জন্মাবধি মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত এই গতির রোধ হয় না, তাই জীবের অদৃষ্ট ও দেহ সম্বন্ধও কখন রুদ্ধ হয় না। প্রত্যেক গতিশীল পদার্থই কোন আপেক্ষিক গতিহীন পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান থাকে নচেৎ তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ অস্তিত্ব ততক্ষণ একদিকে গতি ও অন্যদিকে গতিহীন অবস্থা থাকিবেই। ইহাই জীবের বারবার জন্মমরণ বা বারম্বার যাতায়াতের কারণ। এই গতি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই। গতি না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নাই। সকলেই এই গতির মধ্যে পড়িয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই গতি রোধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবস্থায় পৌছানো চাই, যেখানে কিছু হয় নাই, কিছু হইবে না। "ধাম্নাস্বেনসদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি"। এই পরম সত্যকে বুঝিতে হইবে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, যেখানে মায়ার কুহক লীলা নিরন্তর কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া আছে। ক্রিয়ার পরাবস্থাই এই স্বকীয় ধাম, অতএব এই পথযাত্রীদের প্রতি এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া না থাকেন, যাহাতে এই কৈবল্যাবস্থা লাভ হয় তজ্জন্য এই প্রাণের খুঁটিটিকে সবলে যেন ধরিয়া থাকেন। এই খুঁটি বা স্থির ভাব এবং শ্বাস বা গতি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, যে শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে সেই সংসার গতি অতিক্রম করে। নিরন্তর শ্বাস প্রশ্বাস চলিয়াছে এবং পলকে পলকে জীব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—এই সাধারণ স্রোতে আপনাকে বহিয়া যাইতে না দিয়া সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। পরিশ্রম করিলেই ধরিতে পারা যায়, একবার সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিতে পারিলেই "অবিচল রাম" কে প্রাপ্ত হইবে যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন ॥ ৩২

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) যথা (যেমন) একঃ রবিঃ (এক সূর্য্য) ইমং কৃৎস্নং (এই সমস্ত) লোকং জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন), তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (সমুদায় ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৩

শ্রীধর। অসঙ্গত্বাৎ লেপো নাস্তি ইতি আকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতম্। প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৩

বঙ্গানুবাদ। [অসঙ্গত্ব হেতু আত্মার লিপ্ততা নাই ইহা আকাশদৃষ্টান্ত দ্বারা

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

দেখাইয়াছেন। এক্ষণে প্রকাশকত্ব হেতু আত্মা যে প্রকাশ্যধর্ম্মযুক্ত হন না তাহা সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন]—শ্লোকার্থ স্পষ্ট।

[এক রবি যেমন এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন] ॥ ৩৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেমত এক সূর্য্য সকল পৃথিবীকে প্রকাশ করিতেছেন তদ্রূপ শরীরী এই শরীরকে প্রকাশ করেন—(Note)—যতক্ষণ অন্ধকার অর্থাৎ আত্মায় অন্যদিকে দৃষ্টি আসক্তি পূর্ব্বক রহিয়াছে ও আত্মার স্বরূপ আদিত্যবৎ প্রকাশ কূটস্থের না হইতেছে।—সর্ব্বলোকচক্ষু সূর্য্য যেমন 'ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ—বাহ্য পদার্থসমূহের দোষে দূষিত হন না, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্ব দেহের প্রকাশক হইলেও দেহের সুখদুঃখ আত্মাকে লিপ্ত করিতে পারে না। এইরূপ কূটস্থ সূর্য্য যিনি ভিতরে থাকিয়া এই দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিকে প্রকাশিত করিতেছেন, কিন্তু তবুও এই দেহেন্দ্রিয়াদির অশুদ্ধ ও নানাত্ব ভাব কূটস্থকে লিপ্ত করিতে পারে না। যতক্ষণ অন্যদিকে দৃষ্টি ততক্ষণ সব অপ্রকাশ অন্ধকার, আবার যখন কূটস্থ আদিত্যের মত প্রকাশিত হন, সাধক সেই কূটস্থে দৃষ্টি রাখিয়া অনন্যলক্ষ্য হন, তখন আর তাঁহাকে বাহ্যপ্রকৃতি নানাত্বের দিকে কিছুতেই আসক্ত করিতে পারে না। মনে হইতে পারে এই যে এত বাহ্যরূপের স্ফুরণ এবং সে সকলের প্রতি মনেরও অসীম আকর্ষণ, এবং জগতও যখন থাকিবে এবং আমাদের মনও থাকিবে তখন আর জীবের মুক্তি কোথায়? তাই ভগবান বলিতেছেন—ক্ষেত্রই জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই ক্ষেত্রের প্রকাশকই তো ক্ষেত্রজ্ঞ—সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে দেখ না বলিয়া এই ক্ষেত্রের নানাত্বে মোহিত হইয়া বাঁধা পড়িয়া যাও। কিন্তু ক্ষেত্রকে যিনি আলোকিত করিতেছেন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ তুমিই, তুমি তোমাকে জান তাহা হইলেই নিজের খেলায় নিজেকে আর মুগ্ধ হইতে হইবে না! ৩৩

অন্বয়। এবং (এই প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ) ভূতপ্রকৃতি মোক্ষং চ (ভূতগণের প্রকৃতি এবং তাহা হইতে মুক্তি লাভ) যে (যাঁহারা) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞান চক্ষু দ্বারা) বিদুঃ (জানিতে পারেন) তে (তাঁহারা) পরং যান্তি (পরমপদ প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৪

শ্রীধর। অধ্যায়ার্থম্ উপসংহরতি—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবম্—উক্ত প্রকারেণ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং—ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা যা ইয়ম্ উক্তা

ভূতানাং প্রকৃতিঃ তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং—মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুঃ তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৪

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥

প্রকৃতি পুরুষ মিলিত হইয়া একভাবপ্রাপ্ত হওয়ায় যিনি তত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্বারায় সেই উভয়কে পৃথক রূপে প্রতিপন্ন করিলেন সেই পরমানন্দ পরমেশ্বরস্বরূপ নন্দনন্দনকে আমি নমস্কার করি।

ইতি শ্রীশ্রীধর স্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ। [এই অধ্যায়ের অর্থ উপসংহার করিতেছেন—] উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর অর্থাৎ ভেদ বিবেকজ্ঞানলক্ষণরূপ চক্ষুর দ্বারা যাঁহারা জানিতে পারেন, এবং যাঁহারা এই ভূতদিগের প্রকৃতি এবং তাহা হইতে মোক্ষলাভের উপায় যে ধ্যানাদি তাহা জানেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ শরীর এবং শরীরীর জানা জ্ঞানচক্ষু কুটস্থের প্রকাশ হইলেই হয় অর্থাৎ যোনিমুদ্রা অন্যদিকে মন যায় না কেবল সেই দিব্যদৃষ্টিতেই থাকে যাহা গুরুবক্ত্রগম্য। পঞ্চভূত, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য এই পঞ্চভূত আত্মলিঙ্গ, লিঙ্গের দ্বারায় লিঙ্গেতে মৈথুন করে—মনকে স্থির করিলে বুদ্ধি হইবে—বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতির পর যে পুরুষ সেই আমি ব্রহ্ম!! তাৎপর্য্য কালী স্বরূপ প্রকৃতি বলবতী মহেশ্বর স্বরূপ পুরুষের উপর চড়িয়া সকলকে আপন মায়ায় হনন করিতেছেন। তাঁহাকে মহাদেব আপনারই রূপ করিয়া লয়েন। নিলেই অন্যদিকে দৃষ্টি থাকিল না- আপনাতে আপনি থাকা—সেই ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং সকলের পর—তাহাতেই লয়, ইহারই নাম মোক্ষ। এইই পরম পদ, এইই পরমপদ।—যতদিন দিব্যদৃষ্টি সদ্‌গুরু কৃপায় লাভ না হয় ততদিন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে কেহ বুঝিতে পারে না। প্রকৃতি পুরুষের মিলিত ভাব এই দেহের দিকে চাহিলেই কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এই রক্ত মাংস অস্থি মজ্জায় ঢাকা দেহ—সে তো জড়, তাহার মধ্যে আবার চৈতন্যের অপূর্ব্ব খেলা, তাহাতেই এই সমস্ত জড়ের পরমাণুকে যেন চৈতন্যময় করিয়া তুলিতেছে, চেতন জড় যেন মিলিয়া এক হইয়া রহিয়াছে, কাহারও সহিত কাহাকেও যেন পৃথক করা যায় না—কিন্তু সেই প্রকৃতি পুরুষের বিবিক্ত ভাবকেও দেখা যাইতে পারে। এই জড়পিণ্ড দেহ ভেদ করিয়া এক চৈতন্য জ্যোতিঃ প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। সদ্‌গুরু কৃপায় যিনি সাধন পাইয়াছেন তিনি যোনিমুদ্রার সাধন সাহায্যে ইহা

দেখিতে পান। এই দেহস্থ জ্যোতিঃ যাঁহার জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে অনুভব করিতে পারেন; এবং এইরূপ অনুভব করিতে করিতে সে অনুভব আর লুপ্ত হয় না। সাধক ইচ্ছা করিলেই—

"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ॥
একো হি সোমমধ্যস্থোঽমৃতং জ্যোতি স্বরূপকম্।
হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হৃদৌ॥
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥"

ইহাই কূটস্থ জ্যোতিঃ। এই জ্যোতির অন্তর্গতই যে পুরুষ, তিনিই "আমি"। এই "আমি"কে জানিলেই সব জানা হয়। যখন মন আর অন্যদিকে যায় না, সেই দিব্য চক্ষুস্বরূপ কূটস্থ মধ্যেই নিহিত থাকে, তখনই জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ধারণা হইয়া থাকে। সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ লাভের উপায় হইতেছে—এই পঞ্চভূতময় দেহে মূলাধারাদি পঞ্চস্থানে পঞ্চ মূর্ত্তিতে পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়াছেন, ইঁহারাই পঞ্চ প্রাণরূপে দেহে বর্ত্তমান। যখন প্রাণের দ্বারা প্রাণকে মন্থন করা যায় যাহাকে মৈথুন বলে, সেই মৈথুনের ফলে মনঃস্থির হইয়া যায়, মনঃস্থিরে বুদ্ধি স্থির হয়, সেই স্থিরবুদ্ধি বা পরাবুদ্ধিতে প্রকাশিত যে আত্মভাব, তাহাই পুরুষ, তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাই "আমি"। প্রথমে প্রকৃতি বলবতী—তাই কালিকা রূপিণী তাঁর প্রচণ্ডা মূর্ত্তি "চণ্ডারূপাতিভীষণা" প্রকাশ পায়। ইহাই সংসার মূর্ত্তি—আসক্তিরূপা ও জন্মমৃত্যুরূপা ঘোরা বিভীষণা মূর্ত্তি—যাহা স্মরণ করিলে সকলের হৃদ্‌কম্প হইতে থাকে। স্থির শূন্য, ব্যোম বা মহেশ্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া বা তাঁহাকে আবৃত করিয়া "তাথেই তাথেই" ভাবে তাঁর অবিচ্ছিন্ন নৃত্য চলিতেছে—তাহাতেই অখণ্ড মহাকাল মহেশ্বরকে কত বিচ্ছিন্নভাবে, কত অসংখ্য খণ্ড বিখণ্ড ভাবে দেখা যাইতেছে, আর এককে বহুভাবে বহুরূপে দেখিয়া মনের ধন্দ মিটিতেছে না—অজ্ঞান ছুটিতেছে না। আবার লীলা শেষে স্বয়ং মহাদেব যখন তাঁর এই কুহকিনী বহির্ম্মুখী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া লন, তখন বহু এক হইয়া যায়, ঘোরা অঘোরা হইয়া যায়, জন্মমৃত্যুর বিভীষিকাময়ী করালমূর্ত্তি —নীলেন্দীবরলোচনা হইয়া, আর ঐ মোহময়ী মায়া সন্তানবৎসলা জননী হইয়া, অনন্ত বিভিন্ন ভাবকে এক মহাকাশ বা চিদাকাশে পরিণত করিয়া—"সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী" হইয়া—"সর্ব্বশ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতা" হইয়া—অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ ভাণ্ডোদরে শোয়াইয়া রাখেন। ইহাই শবরূপ অনাত্মভাবকে শিবরূপে পরিণত করা, ইহাই বিশ্বকে আপনার করা—ইহাই "আপনাতে আপনি" থাকা। তাহা হইলেই আর অন্যদিকে দৃষ্টি থাকিল না। পূর্ব্বে যিনি অসিকরা হইয়া সবকে হনন করিতে ছিলেন—মায়া-মোহ-কূপে নিক্ষেপ করিতেছিলেন—এখন সেই সকলকে নিজ গলায় পরিয়া, সর্ব্বকে আপনার অঙ্গশোভন হার রূপে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধ থামিয়া গেল, অশুভ শুভরূপে

রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। যখন দেবাদিদেব এইরূপে স্বভক্তকে আপনার রূপ করিয়া লন, তখন ভক্ত অনন্যদৃষ্টি হইয়া আপনাকে তাঁহার মধ্যে বিসর্জ্জন করেন। ইহাই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। অন্যদিকে আসক্তি নাই, সংসার থাকিয়াও তার সংসার নাই, ইহাই আপনাতে আপনি থাকা, ইহারই নাম "ক্রিয়ার পর অবস্থা।" ইহাই সর্ব্বশেষ অবস্থা, ইহাতেই সর্ব্বের নিমজ্জন বা লয়, ইহাই মোক্ষপদ, ইহাই পরম পদ !! ইহাই ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ !! এবং ভূতপ্রকৃতিরও মুক্তি !! সমাধি সাধনে যাঁহারা দৃঢ় অভ্যস্ত, তাঁহারা সমাধি ভঙ্গের পরও আত্মাকে আর প্রকৃতিকার্য্যে লিপ্ত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের এই অবস্থাতে যে ক্ষেত্রের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না তাহা নহে, তাঁহারা জাগ্রদবস্থাতেও যোগযুক্ত থাকায় প্রকৃত ক্ষেত্রকে আর নিজ আত্মসত্তা হইতে পৃথক উপলব্ধি করেন না—ইহাই ভূত প্রকৃতিরও মোক্ষলাভ। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন 'যা ছিলি তাই তাই হবি"। অধ্যাসবশতঃ প্রাণ চঞ্চল হইয়া বাহ্য দৃষ্টিযুক্ত হইয়া এই অনন্ত দৃশ্যের সমুৎপত্তি। আবার প্রাণ স্থিরে বুদ্ধি স্থির হইলেই—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—সাধকের অনুভব হয়। প্রকৃত বন্ধন বা তাহার মোচন নাই, যাহা স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়াছিল, স্বপ্ন ভঙ্গের পর তাহার অস্তিত্ব রহিল না—এইমাত্র, ইহার নামই মোক্ষ। শ্রীমদ্ভাগবত তাই বলিয়াছেন-"বদ্ধোমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ"—১১শ স্কঃ॥ ৩৪

ইতি শ্যামাচরণ আধ্যাত্মিক দীপিকা নামক গীতার
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

বা আলোচনা

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ"—ভক্ত সকলকে আমি মৃত্যুসংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি, ইহাই ভগবানের প্রতিজ্ঞা, কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশের জন্যই ভগবান প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকৃতি পুরুষকেই ভগবান সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই উভয় প্রকৃতির প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হেতুই চিদংশ জীবের সংসার গতি হইয়া থাকে। তাই এ অধ্যায়ে ভগবান প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি তত্ত্বগুলির আলোচনা করিলেন। গভীর জ্ঞানযুক্তিপূর্ণ রহস্যময় আত্মতত্ত্ব না বুঝিলে এবং বুঝিয়াও তদনুরূপ সাধন করিতে না পারিলে জ্ঞানের উদয় হয় না। জ্ঞানের উদয় ব্যতীত সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তাই শাস্ত্রাদেশ হইল শ্রদ্ধালু হইয়া তত্ত্বকথা গুরুমুখ হইতে শুনিতে হইবে, শুধু শুনিলেই হইবে না, শুনিয়া "মৎপরম" হইতে হইবে। "মৎপরম" অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ অক্ষরাত্মাই যাঁহাদের নিরতিশয় গতি, এইরূপ জ্ঞানাশ্রিত ভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারিলে তবে ভগবানের প্রিয় বা ভক্ত হইতে পারা যায়—"প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং"—আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং জ্ঞানবানই তাঁহার প্রকৃত ভক্ত। দেহাত্মবোধই ভগবানের (আত্মার) সঙ্গে মিলিবার প্রচণ্ড অন্তরায়। এই দেহাত্মবোধ হয় কেন? পরমপুরুষের শক্তিরূপা প্রাণ, নাড়ী মধ্য দিয়া দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ প্রাণশক্তি বলে জগদ্বস্তু দর্শন করে। প্রাণই ইন্দ্রিয়গত হইয়া এই দর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করে। এবং সেই প্রাণ আত্মার শক্তি বলিয়া প্রাণের সত্তায় অহং জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জাগতিক বস্তুসমূহ দর্শন করিতে থাকে। জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাদ্বারা দেহবোধরূপ অভিমান নাশ হইলে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় বা জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ হয়। জীবন্মুক্ত তিনিই যাঁহার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নাই, অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ শূন্য হইলেই জীব মুক্ত হন, তখন তিনি কেবল আত্মারূপেই অবস্থান করেন, এইজন্য জ্ঞানী শুধু তাঁহার প্রিয় নহেন তাঁহার আত্মসম হইয়া থাকেন—"জ্ঞানী-ত্বাত্মৈব মে মতম্"—জ্ঞানী আত্মারই স্বরূপ। আর যে সকল ভক্ত আত্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত, তাঁহাদের ভগবানের সহিত যে মিলন তাহা বাহ্যিক, তাঁহারা ভগবানের সহিত অভিন্ন হইয়া তাঁহার প্রকৃত নিজজন হইতে পারেন না। সেই জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন— "যস্মাৎ ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং অনুতিষ্ঠন্ ভগবতো বিষ্ণো পরমেশ্বরস্য অতীব মে প্রিয়ো ভবতি, তস্মাৎ ইদং ধর্ম্ম্যামৃতং মুমুক্ষুণা যত্নতঃ অনুষ্ঠেয়ম্"—ধর্ম্ম্যামৃতের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই ভগবান পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতীব প্রিয় হইতে পারা যায়, সেই কারণে যাঁহারা বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন এরূপ মুমুক্ষুগণ যত্নপূর্ব্বক এই ধর্ম্ম্যামৃতের অনুষ্ঠান করিবেন।

আত্মজ্ঞান ব্যতীত বাস্তবিকই দুস্তর শোকসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ হেতুই আমাদের ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান হইতেই এই দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান হয়, ইহাই আত্মার অবিদ্যা সম্বন্ধ। এই ভয় ও শোক হইতে একমাত্র আত্মবিৎই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ"। যতক্ষণ নানাত্বের নিরসন না হয় ততক্ষণ শোক যাইতে পারে না, কারণ মৃত্যু বা অভাববোধই শোকের প্রধান আশ্রয়।

নানাত্ব দর্শনই মৃত্যু

ঐক্য জ্ঞান ব্যতীত অমৃত লাভ হয় না, যতদিন নানাত্বের দর্শন হইবে ততদিন মৃত্যু আমাদের পিছন ছাড়িবে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" যে এই ব্রহ্মসত্তায় ঈশ্বর জীব জগত ইত্যাদি বিবিধ ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যুর পর পুনঃপুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মা বহু নহে আত্মা এক—ইহা সমাধিজ জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিলেই জীবের জন্মমরণের ত্রাস ঘুচিয়া যায়।

আচ্ছা, আত্মা তো অমৃতস্বরূপ এবং আত্মা ব্যতীত যখন অন্য কিছু নাই তখন জন্ম মৃত্যু দ্বন্দ্বভাব আমরা অনুভব করি কেন? দেহাত্মবুদ্ধিই ঐরূপ ভ্রান্তি বোধের কারণ। দেহ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, দেহে আত্মবোধ থাকায় জন্ম মরণের সহিত এই আত্মারও জন্ম মরণ হইতেছে ভ্রান্ত জীবের এইরূপ মনে হইয়া থাকে। এই দেহভ্রম যতদিন না ঘুচে ততদিন জীবের সংসারসিন্ধু পার হওয়া অসম্ভব।

দেহাতীত বস্তুর জ্ঞান

এই জন্য জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা একান্তই আবশ্যক। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই দেহটির পরিচয় জানা ও দেহ মধ্যে যে দেহাতীত নিত্য-চৈতন্য জন্মমরণহীন একটি বস্তু রহিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও একটি অভ্রান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এইটীই জ্ঞেয় বস্তু, উঁহাকে জানিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞেয় বস্তুটিকে অবগত হওয়া একটুখানি কথা নহে, সে জন্য বহু সাধ্য সাধনা করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হয়। বহু সদ্গুণরাশি আয়ত্ত করিতে হয়, অমানিত্ব অদম্ভিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব প্রকার সংযম ও সাধনায় অভ্যস্ত হইতে হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে গুলিকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বলা হইয়াছে, ঐ সকল সদ্গুণ অনায়ত্ত থাকিলে শাস্ত্রাভ্যাস বা উপদেশ শ্রবণেও কোন ফল হয় না। সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগাভ্যাসে সুনিপুণ হইতে হইবে। কেবল মৌখিক যুক্তি তর্কের দ্বারা অচিন্ত্য বস্তুর ধারণা হয় না।

সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়

প্রথমতঃ সাধনা দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি করিতে হইবে, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে আত্মবিষয়ক স্মৃতি লাভ হইবে। এই স্মৃতিধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিলে মনোবৃত্তি ক্ষীণ হইতে থাকিবে। বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইতে না পারিলে নির্গুণ পুরুষে স্থিতি লাভ করা সহজ নহে। এই স্থিতির নামই অপরোক্ষানুভূতি, জ্ঞান বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যে আত্মা কূটস্থরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই এই শরীরের কারণ। এই শরীর ও শরীরস্থ ধাতু (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি

প্রভৃতি) ব্রহ্মের পৃথক পৃথক সূত্র মেরুদণ্ডের মধ্যে রহিয়াছে, উহা হইতেই এই বিশ্বসংসার বিস্তার লাভ করে। পঞ্চ মহাভূতে এই জগৎ, সেই পঞ্চ মহাভূতের কারণ যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত উহাই মেরু দণ্ডস্থিত চক্রমধ্যে থাকিয়া জীবের দেহ ইন্দ্রিয়কে সংগঠন করিয়া তুলিতেছে। সেই পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে যে অণুস্বরূপ ব্রহ্ম রহিয়াছেন তিনিই বহিঃস্থ হইয়া পঞ্চতত্ত্বকে প্রকাশ করেন। যতদিন উহা আবার অন্তর্মুখ না হয় ততদিন জীবের বিশ্বদর্শনরূপ-ভ্রম কিছুতেই ঘুচিতে পারে না।

যোগের মূল তত্ত্বটী বুঝিতে পারিলে মুক্তির জন্য যোগসাধনের কি প্রয়োজনীয়তা তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ব্রহ্মের অণু প্রাণধারার সহিত মিলিত হইয়া নাড়ীমুখে প্রবাহিত হয় এবং এই প্রবাহের কম্পনের সহিত ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি মনোবৃত্তি ফুটিতে আরম্ভ করে এবং তখন উহা আরও বহির্মুখ হইয়া বিষয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এই বিষয়-অন্বেষণ মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়া অন্য কোন রূপে রোধ করা যায় না। এই জন্য প্রাণের যে স্পন্দন হইতে এই সঙ্কল্প বাসনাময় মনোধর্ম্ম প্রভৃতি জাগিয়া উঠে, সেই স্পন্দনকে রোধ করিতে করিতে যতই প্রাণবৃত্তি নিস্পন্দিত হইতে থাকিবে, ততই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও অন্যরূপ হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে ব্যবহারিক জগতের ক্রিয়া না হইয়া অন্তর্জগতের ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে, পরে সেই সমস্ত ক্রিয়াও আর থাকিবে না। ক্রমশঃ ক্রিয়াদ্বারা স্থির হইতে হইতে অব্যক্ত পদের অনুভব হইতে থাকিবে। অর্থাৎ প্রথমে যাহা ছিল—"সোঽহং ব্রহ্ম" আবার তাহাই হইয়া যাইবে। সব বস্তুর মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে এক মহাপ্রাণকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই, তিনিই যে সর্ব্বভূতের মধ্যে সব হইয়া রহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা আর কঠিন হইবে না। পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততই বাহ্যক্রিয়া রোধ হইয়া যাইবে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না যতদিন চলিবে ততদিন অন্য বিষয়ে হইতে আসক্তি যাইবে না, বাহ্যক্রিয়া রুদ্ধ হইবে না। ব্রহ্মের অণুতে স্থিতি হইলেই ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এক হইয়া যাইবে, তখন জগন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপকে জানিয়া জীবন কৃতকৃত্য হইতে থাকিবে!

যোগাভ্যাস কি জন্য প্রয়োজন?

সেই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ যিনি জীবগণের হৃদয়াকাশে অবস্থিত রহিয়াছেন তাঁহাকে দেহ হইতে পৃথক ভাবে অবস্থিত বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। মুঞ্জতৃণ হইতে ইষিকা অর্থাৎ মধ্যস্থ দণ্ডকে যেরূপ পৃথক করা যায়, এইরূপ সর্ব্বদেহস্থ হইয়াও যিনি দেহাতীত, তাঁহাকে ক্রিয়া দ্বারা স্থিরচিত্ত হইয়া স্বীয় শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পাইবে। সুতরাং কে দেহ সৃষ্টি করিল এবং কিরূপে করিল এবং তিনিই বা কে এবং তুমিই বা কে, প্রকৃতিই বা কি পুরুষই বা কি এ সমস্ত রহস্যই তখন বুঝিতে পারিবে। এই রহস্য ভেদ করিতে হইলে প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ ক্রিয়া বহু পরিমাণে করা প্রয়োজন হয়। তখন দেখিতে পাইবে এই দেহ কার? কে এই দেহকদম্ববৃক্ষে বসিয়া অহর্নিশি বংশীবাদন করিতেছেন? তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার বংশী রব শুনিলে এবং সেই পরমপুরুষকে দেখিয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে আর নানাত্বের কোন চিহ্ন থাকিবে না। তখন আর জানিবার বা পাইবারও কিছু থাকিবে না।

আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিয়া দেখা

দ্বাদশ অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানী বা ভক্তের লক্ষণ কি তাহা দেখানো হইয়াছে, কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান (দেহ ও দেহীর জ্ঞান এবং তাঁহাদের ঐক্য) লাভ করিয়া ভগবানের প্রিয় হইতে পারা যায় সেই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়টি এই অধ্যায়ে সম্যক আলোচিত হইয়াছে। এ জন্ম এ অধ্যায়টী প্রকৃতই দুরূহ।

আত্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্ম দুইটি প্রধান বিষয় অলোচ্য—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি ও পুরুষ। উহাঁদের পরস্পরের সংযোগই সংসার। এই সংযোগ ছিন্ন না হইলে আত্মদর্শন হয় না বা প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞানলাভ করিলেই এই সংযোগ ছিন্ন হয়। এই দেহ ও দেহমধ্যস্থ চৈতন্ম যিনি দেহের সব ক্রিয়ার সাক্ষী এবং যিনি না থাকিলে দেহের ক্রিয়া হইতে পারে না —তিনিই চেতন পুরুষ, সাক্ষী বা আত্মা। প্রথমতঃ এই দেহ-প্রকৃতির ক্রিয়া যে প্রকৃতির নিজস্ব তাহা না বুঝিয়া উহা আত্মার কার্য্য বলিয়া মনে হয়। যদিও এ কথা সত্য আত্মা দেহ মধ্যে বর্তমান না থাকিলে প্রকৃতির ক্রিয়ার (প্রাণ, মন, বুদ্ধ্যাদি) কোন পরিচয় পাওয়া যাইত না, কিন্তু চৈতন্ম সত্তার অস্তিত্ব হেতু প্রকৃতি যে ক্রিয়াশীল হয় উহা আত্মার ধর্ম্ম বলিয়াই ভ্রম হয়। আত্মা যে কর্ত্তা নহেন কেবল সাক্ষীমাত্র তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার হইলে তবে অনুভব করা যায় এবং তখন তাঁহাকে অকর্ত্তা বলিয়া ধারণা হয়। এই জ্ঞান লাভের উপায় যোগমার্গ বা ক্রিয়াযোগ। সাধারণতঃ ভক্তি বা জ্ঞানালোচনাও এই যোগমার্গেরই অন্তর্গত। প্রকৃত জ্ঞান বা ভক্তি আত্মদর্শন ব্যতীত হইবার নহে।

প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন আত্মা কিরূপে দেহের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়া থাকেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। সহস্রারস্থিত পরমাত্মা লীলা বশতঃ আজ্ঞাচক্রে নামিয়া পড়িলেই তাঁহার যে আবরণ রচিত হয় উহাই অজ্ঞানের আবরণ। যাহা অত্যন্ত স্থির ছিল তাহাই স্পন্দনযুক্ত হইলে মায়াশক্তি বা প্রাণের প্রকাশ হয়। সেই প্রাণ চঞ্চল হইলে আত্মা প্রাণের সহিত মিলিয়া নিম্নে অর্থাৎ স্থূলে অবতরণ করেন—ইহাই সৃষ্টি রহস্য। সেই চঞ্চল প্রাণই মনোরূপে এবং পরে দেহাদিরূপে পরিণাম লাভ করিয়া এই বিশাল ব্যক্ত জগৎকে প্রকাশ করেন। সেই জন্ম বদ্ধজীবের প্রথমে দেহকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ সে পঞ্চভূতময় দেহেই প্রথমে আত্মার প্রকাশ অনুভব করে।

আত্মার অবতরণ ও প্রাণের প্রকাশ

এই দেহের সহিত জড়িত যে আত্মভাবের বিকাশ হয়—সেই আত্মাকেই (১) "ভূতাত্মা" বলা হয়। চিন্তাশীল পুরুষেরা তখন বিচার করিলেই বুঝিতে পারেন যে এই নশ্বর, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল ভূতময় দেহ কখনই আত্মা হইতে পারে না। তাঁহারা দেখেন দেহের মধ্যে দেহের অতীত আরও কিছু পদার্থ রহিয়াছে, যাহার দীপ্তিতে এই দেহকে প্রভাম্বিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই দীপ্তির অভাব হইলে এই দেহ জড়বৎ হইয়া যায়, তাহাতে চৈতন্মের গন্ধমাত্র থাকেনা। পরে তাঁহারা সাধনচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান দেহের মধ্যে যে একটি স্পন্দন রহিয়াছে তদ্দ্বারাই দেহ মধ্যে চৈতন্ম সঞ্চার হইতেছে। উহাই প্রাণ স্পন্দন। উহারা প্রাণের

ভূতাত্মা

স্পন্দন ঘটে কিন্তু উহাও আসলে মুখ্য প্রাণ নহে যদ্দারা জীব জীবিত থাকে। তাহা (২) সূত্রাত্মা, প্রাণ স্পন্দন তাহারই শক্তি। এই প্রাণ সম্পাদন দ্বারাই জীব ভোগোপযুক্ত দেহের পরমাণু সকলকে সম্মিলিত করিয়া এই স্থূল দেহকে রচনা করে। পরে এই প্রাণ বহুধা বিভক্ত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে নাড়ীমুখে প্রবাহিত হইয়া দেহকে প্রাণময় ও কর্ম্মোপযোগী করিয়া তুলে। ঐ প্রাণপ্রবাহের মধ্যে একটি অপরূপ শক্তি রহিয়াছে যাহা দেহকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারে। প্রাণ না থাকিলে দেহগঠন ক্রিয়া যে সম্পন্ন হয় না, তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই প্রাণের শক্তি কিন্তু উহাও মুখ্য প্রাণ নহে। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই তাঁহার দেহ বা প্রাণময় কোষ, যিনি এই প্রাণময় কোষে থাকিয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই (৩) জীবাত্মা বা কূটস্থ, দেহাদিতে বর্ত্তমান থাকিয়াও তিনি সর্ব্বদা দেহের অতীত। দেহ প্রাণাদিতে সংশ্লিষ্ট হেতু তাঁহাকে সাবয়ব, সীমাবদ্ধ, বহু ও কর্ম্মফল ভোক্তা বলিয়া ধারণা জন্মে। বহির্দৃষ্টি বশতঃ প্রকৃতির অনুগামী হইয়া জীবের সুখ দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি সুখ দুঃখের ভাগী অথবা কর্ম্মফল ভোক্তা নহেন। কিন্তু প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য হেতু তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফল ভোগাদি তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়। স্বরূপ জ্ঞানে ঐরূপ ভ্রান্তির নিরসন হয়। ঘৃত যেমন দুগ্ধের প্রতি অণুতে থাকিয়া দুগ্ধের অস্তিত্ব প্রদান করে অথচ দুগ্ধের জল ভাগের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, মন্থনদণ্ড দ্বারা দুগ্ধ মথিত হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ ঘৃত তদুপরি ভাসিতে থাকে তাহার সহিত লিপ্ত থাকিয়াও সংলিপ্ত নহে, তদ্রূপ এই দেহাদি বা প্রকৃতি রূপ দুগ্ধ প্রাণায়াম রূপ মন্থন ক্রিয়ার সাহায্যে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র রূপে ভাসিতে থাকে। তখন আত্মা যে প্রকৃতি হইতে অসংলিপ্ত তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। উহাই ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ। এইরূপ ভুত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিলে এই দৃশ্যমান অসংখ্য জীব বা খণ্ড ভাব তখন একে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। (৪) সেই দেহেন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যক্ত পরম একই পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা। এই নির্গুণ পরমাত্মাই লীলা বশতঃ যখন সগুণ হন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রকটিত কূটস্থ চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত"। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে অভিন্ন, "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি"। সর্ব্বভূতের মূল হইতেছে পরা ও অপরা প্রকৃতি, এই উভয় প্রকৃতিই তাঁহার, সুতরাং এক হিসাবে সর্ব্বভূতই তিনি—সেইজন্য বেদ আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মসূত্র পদই পরা প্রকৃতি, তন্মধ্যে সূক্ষ্মরূপে সমস্ত ভূতই বর্ত্তমান, ইহার স্থূল ভাবই অপরা প্রকৃতি বা বিশ্ব। সুতরাং বিশ্বের যোনি ঐ ব্রহ্মসূত্র বা ব্রহ্মযোনি কূটস্থ। কূটস্থের মধ্যেই সমুদায় দেবতারাও রহিয়াছেন। ভিতরের সবিতাই কূটস্থের রূপ, উহা হইতে ত্রিলোক প্রসূত হয়। এই

সূত্রাত্মা

জীবাত্মা

পরমাত্মা

পরা প্রকৃতি

কূটস্থ বা ব্রহ্মযোনি

কূটস্থের মধ্যে যে পুরুষ "যো সাবসৌ পুরুষং সোঽহমস্মি"—"এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়পুরুষ দৃশ্যতে ইত্যাদিধৈবতং"—এই অন্তরাদিত্য কূটস্থে হিরণ্ময় পুরুষ রহিয়াছেন—চারিদিকে সোণার মত আলো, মধ্যস্থলে পুরুষ—যাঁহারা ভালরূপে ক্রিয়া করেন তাঁহারা সেই অধিদৈবত পুরুষকে দেখিতে পান। সেই পুরুষই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি"—ক্ষেত্রান্তর্গত দিব্য চক্ষুর ন্যায় প্রকাশিত কূটস্থকে দেখিলেই আর মন অন্যদিকে যায় না, উহাতে নিত্য স্থিতি হইলেই জীবন্মুক্ত বা ভূত প্রকৃতি হইতে মোক্ষলাভ হয়।

ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ

বিশ্বের উপাদান চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি। বিরাট প্রকৃতি এবং এই ভোগায়তন দেহ উভয়েরই স্বরূপ বা উপাদান এক, এই জন্য উভয়কেই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি বলা যাইতে পারে।

প্রকৃতির পরিচয়,
সাংখ্য ও গীতার মত

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥"

মহাভূত (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটী), অহঙ্কার বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ)—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই ক্ষেত্র। এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর), চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) এবং ধৃতি—এগুলি সমস্তই মনোধর্ম্ম সুতরাং উহারা ক্ষেত্রের অন্তর্গত।

বিশ্বের মূল কারণ অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি। মূল প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণাত্মিকা। গুণত্রয় যখন সুপ্ত বা সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়। অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত ভাব)। জীবের অদৃষ্ট বশতঃ কাল প্রভাবে এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া বিকৃত হয়। প্রকৃতির এই বিকৃত ভাবকেই সৃষ্টি বলে। সৃষ্টিকালে প্রথমে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ আমি কে এবং আমার শক্তির কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়)। পরে রজঃ ও তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া অভিমানাত্মক অহংকার ("আমি"-কে পৃথক করিয়া দেখার ভাব এবং এই "অহং" কার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আমি করিতেছি, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি অভিমান করে) উৎপন্ন হয়। বিষয় সমূহকে আত্মগোচর করার প্রধান শক্তিই অভিমান। এই অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চীকৃত হইলেই আকাশাদি স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্রগুলিও ইন্দ্রিয় গোচর নহে, ইহারা পঞ্চীকৃত হইয়া তবে স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়।

সৃষ্টির বিকাশ

সাংখ্যশাস্ত্র প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্রা এবং এই জগৎ প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম মাত্র। কিন্তু গীতায় ভগবান প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রা বলেন নাই—

সাংখ্যের ও গীতার মত

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে॥"

আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করিয়া থাকে, হে কৌন্তেয়, এ জগৎ বার বার এই জন্যই উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি জড় বলিয়া সৃষ্টি কার্য্যে একাএক সমর্থা নহে, সুতরাং পুরুষের সংযোগ প্রয়োজন। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ, নির্গুণের ইচ্ছা থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহাদের সংযোগ সাধন করে কে? পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থা হন সত্য, কিন্তু এই সামর্থ্যদান করিলেন তো পুরুষ, সুতরাং পুরুষের মধ্যেই প্রেরণা বা ইচ্ছা রহিয়াছে মানিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে পুরুষকে নির্গুণ বলা চলে না। ইচ্ছা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, পুরুষের ইচ্ছা বলিলে তাঁহাকে সমনা বলিয়া মানিতে হয়। পুরুষের ঔদাসীন্য ও কর্ত্তৃত্ব পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেইজন্য মনে হয় প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র বস্তু নহে, যেন লীলা হেতু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তিনি স্বয়ং প্রকৃতি পুরুষরূপে খেলা করিতেছেন। গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

"এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥" ৭ম অঃ

ভূতগণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত ইহা জানিও। অপরা প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হইয়া এবং পরাপ্রকৃতি ভোক্তৃ রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। এই মদীয় প্রকৃতিদ্বয় আমা হইতেই উৎপন্ন অতএব আমিই নিখিল জগতের উদ্ভব ও লয়ের কারণ।

দেহের মধ্যে যে দেহী বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সেই অনুত্তম ভূত মহেশ্বর ভাব সাধারণ লোকে অবগত নহে, তাই মূঢ়গণ বিক্ষিপ্তচিত্ত বশতঃ তাঁহার পরমতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য দেহধারী মনে করিয়া অবজ্ঞা করে।

ভগবানের এই অনুত্তম ভাবটী খেলার সময় যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছাদিত হয়। তাই প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে যে সেই এক পরম পুরুষই রহিয়াছেন তাহা লোকে বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য

যোগমায়া

যোগমায়া শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"ভগবতো যঃ সঙ্কল্পঃ এব যোগঃ, যঃ তদ্বশবর্ত্তিনী যা মায়া সা যোগমায়া"—সুতরাং ভগবানের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প মানিতেই হইল। এই সঙ্কল্প ভগবানের মধ্যগত বস্তু, তাহা বাহিরের আগন্তুক পদার্থ নহে সুতরাং সেই সঙ্কল্প বা ইচ্ছাই তাঁহার মায়া—এই ইচ্ছা রূপ পরিগ্রহ করিলে তাহাই জগদ্রূপে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং জগদাদিও তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে।

উপনিষদেও আছে—"তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ", "তদনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যচ্চ ভবৎ"—

উপনিষদের মত

সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি সৎশব্দবাচ্য ও ত্যৎ শব্দবাচ্য হইয়া থাকেন। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—তিনি আপনি আপনাকে সৃষ্টি বিষয়ে পরিণত করিয়াছেন। তন্ত্রও বলিলেন—"যা শক্তিঃ সর্ব্বভূতাণাং দ্বিধাভবতি সা পুনঃ" একমাত্র শক্তি তিনিই আবার সমস্ত ভূতে দ্বিধা হইলেন।

এই শক্তির কথা উপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলিলেন :—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণাণি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥"

ধ্যানযোগের সাহায্যে ঋষিরা পরমাত্মদেবের স্বগুণাবৃত শক্তিকে কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। যে এক বস্তু কাল হইতে পুরুষ পর্য্যন্ত সমস্ত কারণ সমূহকে পরিচালিত করেন—তাঁহার শক্তিকে ঋষিরা দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবও তাঁহার শক্তিমাত্র—"শক্তয়োযস্তদেবস্য ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা।" "দেবাত্মশক্তিং"—দেব, আত্মা ও শক্তি পরব্রহ্মেরই অবস্থা ভেদ। ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়াও তিনি প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বররূপে অথবা ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা রূপে প্রকাশিত হন। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়াচ"। তাঁহার নানাবিধ পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান প্রভাব ও ক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা যুক্তিদ্বারা বোধগম্য হয় না, কিন্তু সাধকেন্দ্ররা তাঁহার শক্তির বিষয় অবগত হইয়া যাহা বর্ণনা করেন তাহা শাস্ত্রমুখে শুনা যায়। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ"—সেই একবস্তুই সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে রহিয়াছেন—কিন্তু "তং দুর্দ্দশং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টঃ"—সর্ব্বভূতের হৃদয় গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, সুতরাং সহজে তাঁহাকে বুঝা যায় না।

এই প্রকৃতিদ্বয় যে তাঁহা হইতে অভিন্ন ভগবান গীতায় তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনটী পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন—ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম।

প্রকৃতিদ্বয় ভগবানেরই শক্তি—ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম

(১) যাহা ক্ষরিত হয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত শরীর, সেই শরীরগণই ক্ষর পুরুষ (২) ক্ষরের যাহা বিপরীত তাহাই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ যিনি ক্ষর পুরুষের উৎপত্তির কারণ, যিনি মায়ার আশ্রয়, যিনি চেতন ভোক্তা। শরীর নষ্ট হইলেও তিনি বিদ্যমান থাকেন। (৩) যিনি ক্ষর অক্ষর এই উপাধিদ্বারা স্পৃষ্ট নহেন, যাহা সর্ব্বদা শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব তিনিই উত্তম পুরুষ বা পরমাত্মা। উত্তম পুরুষেরই ক্ষর অক্ষর বা অপরা ও পরা দুইটি প্রকৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে এ প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে. ইহাই পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বরের কার্য্যকারিণী শক্তি। তাহা জড়া নহে তাহা নিত্য চৈতন্যময়ী। **এই চৈতন্যময়ী পরমাশক্তিকেই ঈশ্বর এবং তন্ত্রে তাঁহাকেই পরমেশ্বরী বলা হইয়াছে।** তাহাই আদ্যাশক্তি। যোগীরা তাঁহাকেই "চিদাকাশ"

বলেন। এ চিদাকাশই সমস্ত ব্যক্ত জগতের মূল কারণ। ইহা হইতেই ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য চিদাকাশকেই জগদম্বা বা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব-প্রসবিনী বলা হইয়াছে। চেতনের সান্নিধ্যবশতঃই ইঁহাকে যে চেতন বলিয়া বোধ হয় তাহা নহে, ইহা মূল চেতন বস্তুরই স্ফুরণ বা শক্তি। শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক নহেন, ইঁহাদের নিত্য অবিনা সম্বন্ধ সুতরাং উভয়কে কেহ কোন কালে পৃথক করিতে পারে না। তবে পৃথক করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম নির্গুণ তাহা কখনও বোধের বিষয় হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মী-শক্তি বা মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য বোধের বিষয় হয়—তাহাকেই ঈশ্বর বলে। এই ঈশ্বর বা পরা প্রকৃতিকে জানিতে পারলেই জীব জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভের যোগ্য হইয়া থাকেন। চণ্ডীতে তাই বলিলেন—"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন

সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, ত্বংবৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ ॥"

হে দেবি, তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি, তুমিই জগতের মূল কারণ মহামায়া, তুমিই সমস্ত বিশ্বকে সংমোহিত করিয়া রাখিয়াছ। আবার তুমি প্রসন্ন হইলেই জগতের মুক্তির হেতু হও।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কঠোপনিষদ বলিয়াছেন—'ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ' ধাতুর প্রসন্নতাবশতঃ আত্মমহিমা দর্শন করেন। এই ধাতুই শরীরধারক মন প্রভৃতি শুধু করণবর্গই নহে, এই ধাতুই প্রকৃতি বা ঈশ্বরী। এই প্রকৃতি প্রসন্না হইলেই তিনি তাঁহার স্বামীকে দেখাইয়া দিয়া সাধককে চিরদিনের জন্য কৃতার্থ করিয়া দেন। ধাতু=(ধা+তুন), "ধা" ধাতুর অর্থ ধারণ করা "শরীরধারণাৎ ধাতব ইত্যুচ্যন্তে," সুতরাং প্রাণ পদার্থই প্রকৃত ধাতু, "প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ" এই প্রাণই জগদম্বা জগতের মা। "সেই দেবী নিত্যা অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশ-শূন্যা। এই জগৎ তাঁহারই মূর্ত্তি, তিনি চিন্ময়ী রূপে এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তথাপি তাঁহার আবির্ভাবের কথা অনেক প্রকারে কথিত হয়। তিনি নিত্যা হইলেও যখন তিনি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হন তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া জগতে অভিহিত হন।" চণ্ডী।

কপিল দেব "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" বলিয়াছেন। ইহার মানে এ নহে যে তিনি জড়। নিরবচ্ছিন্ন জড় জগতে থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া শাস্ত্র ও ঋষিরা বলিতেছেন "সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তখন জড়ত্ব কল্পনা করিতে যাই কেন? চৈতন্যকে বাদ দিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। এক পরম বস্তুরই শক্তি পরা ও অপরা প্রকৃতি রূপে বিদ্যমান। শক্তি হইতে শক্তিমান অভিন্ন। স্বর্ণালঙ্কার হইতে স্বর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে অলঙ্কার বলিয়া আর যেমন কোন পদার্থ থাকে না তদ্রূপ চৈতন্যের অতিরিক্ত কোনও জড় পদার্থকে কল্পনা করা যায় না। অনাদি অবিদ্যা হেতু আত্মপদার্থে অনাত্মা কল্পিত হয় মাত্র। তাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন —"সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দর্শন করার ফলে এই সংসার চক্রে বা স্থূলদেহে জীব কেবলই ভ্রাম্যমান হয়।

এই প্রকৃতিও আত্মার মতই ইন্দ্রিয়াদির অগোচর সেইজন্য প্রকৃতিকেও অব্যক্ত বলা হয়। তাহার কারণ আত্মা ব্যতীত আত্মার জন্য উপাধি মাত্রকে জড় বলা হইয়াছে। জড়ের অর্থ যাহারা অস্বাধীন। প্রকৃতি বাস্তবিক জড় নহেন, উহা ব্রহ্মই বা ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থামাত্র। প্রকৃতিকে পৃথক মানিতে হইলে উহাকে ব্রহ্মের আবরক বলিয়া মানিতে হয়, এই আবরণ কল্পনা করিতে হইলেই এ আবরণ কে সৃষ্টি করিল, কেন করিল প্রভৃতি বহুবিধ প্রশ্ন উঠিতে থাকিবে। ভগবান গীতায় এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন এই জীবচৈতন্য তাঁহারই পরাপ্রকৃতি, এবং যাহা বাহ্যপ্রকৃতি রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই তাঁহার অপরা প্রকৃতি। উভয় প্রকৃতি যখন তাঁহারই তখন উহারা কেহই জড় হইতে পারে না। ভাগবতে আছে :—

"জ্ঞানমাত্রং পরংব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথকভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥"

পরব্রহ্ম জ্ঞান মাত্র, তিনি পরমাত্মা, পরমেশ্বর প্রভৃতি বহুবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে পৃথক পৃথক ভাবে তিনিই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার পরা প্রকৃতিই হইল প্রাণ যাহা ব্রহ্মসূত্ররূপে জীবদেহে সুষুম্নার মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া এই বিশ্বলীলা সম্পাদন করিতেছেন।

সচ্চিদানন্দ বিভব পরব্রহ্মকে যিনি এই বিশ্বরূপে পরিণত করান, সেই পরমাশক্তি ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু বস্তু হইতে পারেন না। ভগবান নিজশক্তি বলেই স্বেচ্ছায় আপনাকে বিবিধ নাম রূপ দ্বারা পরিছিন্ন করিয়া থাকেন। এই শক্তি তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান। সেই জন্য কেহ কেহ প্রকৃতিকে ব্রহ্মের স্পন্দন বা মায়া বলিয়া থাকেন। বাস্তবিকই যিনি না থাকিলে ব্রহ্ম আছেন কি নাই কেহ জানিতেই পারিত না। ব্রহ্মের সেই কার্য্যভাব বা সগুণ বা ঈশ্বর ভাবই তাঁহার প্রকৃতি। কারণ ভাবই নির্গুণ ভাব। কিন্তু সাধককে এই নির্গুণ ভাবের সহিতও পরিচিত হইতে হয়, নির্গুণ ভাবের সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে নির্গুণব্রহ্ম আত্মমায়া বশে বিশ্বভুবনে পরিণত হইয়াও কিরূপে অবিকৃত ও অসংস্পৃষ্ট হইয়া থাকেন তাহা কিছুতেই বুঝা যাইত না। পরমাত্মার দুইটি বিভাবকে (aspects) পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিতে গিয়াই এক মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে নির্গুণ, প্রকৃতি রূপে গুণময়ী। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যাঁহার প্রকৃতি সেই পরমাত্মা সগুণ ও গুণাতীত উভয়ই। কিন্তু ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যতীত প্রকাশিত হয় না, এবং ক্ষেত্রজ্ঞও ক্ষেত্র ব্যতীত থাকেন না।

সগুণ ও নির্গুণ

তাহা হইলে উহার অর্থ এই হয়—ভগবানের যে বিশ্বলীলা দেখা যাইতেছে (তাহাকে স্বপ্ন বলিলেও তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই) তাহার মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞানাত্মক ভাবকে পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং এই লীলার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় যে বস্তুগুলি তাহার সমূহকে ক্ষেত্র বলে।

প্রকৃতি হইতে যে মহান্ বা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, বেদান্ত তাহাকেই ভগবদ্ ঈক্ষণ বলিতেছেন। ভগবান হইতে ভগবদ্ ঈক্ষণ কার্য্যতঃ স্বতন্ত্র বোধ হইলেও তাহা তাঁহার নিজ শক্তিরই বিলাস মাত্র, অন্য কোন আগন্তুক পদার্থ নহে, এই ঈক্ষণই ভগবদ্ মায়া। এই মায়া যখন লীলা বিলাস হেতু বহির্মুখ হয় তখনই তাহা হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চৈতন্যের বাহ্য স্ফুরণ হয়। সুষুপ্তাবস্থা হইতে যেমন স্বপ্নাবস্থার স্ফুরণ হইয়া থাকে, তখন আপনাকে আপনি কিছু বলিয়া মনে করে। এই আলোচনা বা মনন ক্রিয়া হইতেই মন হয়, পরে তাহা বহুধা সম্প্রসারিত হইয়া শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শাদির ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছা হইতে ইন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয় শক্তি প্রকটিত হইলেই তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য ইন্দ্রিয় ভোগ্য স্থূল জড় জগদাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সকলের মূলেই তাঁর সেই অনাদি ইচ্ছা—"একোঽহম্ বহুস্যাম।"

ভগবদ্ ঈক্ষণ।

পরমাত্মার সেই অনাদি ইচ্ছা বা সঙ্কল্পই মায়া। ভগবান এই গীতায় মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা, দৈবী ও দুস্তরা বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর "দৈবী" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা"—দেব অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুস্বরূপ আমি আমারই স্বভাবভূতা মায়া এই কারণে দৈবী। আচার্য্য রামানুজ বলেন—"দেবেন ক্রিয়া প্রবৃত্তেন ময়া এব নির্ম্মিতা"—লীলাপ্রবৃত্ত ভগবান লীলার জন্য যে মায়া প্রস্তুত করিয়াছেন। এই মায়াও অনির্ব্বাচ্য। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এই মায়া—"সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকংজ্ঞানবিরোধিভাবরূপংযৎকিঞ্চিৎ।" ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহা যে কি তাহা ঠিক বচনীয় নহে, ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান বিরোধী, ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎ। ইহাকে সৎ বলা যায় না এই জন্য যে ইহা জ্ঞান হইলে থাকে না, ইহাকে শশশৃঙ্গের মত মিথ্যাও বলা যায় না, কারণ ইহার ব্যবহারিক সত্তা সকলেই অনুভব করে। কিন্তু উহা যখন ব্রহ্মশক্তি তখন ব্রহ্মের মত সৎ বস্তু না হইলেও ইহা অত্যন্ত অসৎও নহে। ইহা জ্ঞানবিরোধী কারণ যতক্ষণ মায়া বা গুণের খেলা থাকে ততক্ষণ জ্ঞান নিত্যবস্তু হইয়াও আবৃতবৎ বোধ হয়। এই আবরণই মায়ার আবরণ। কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্র এই মায়াকে অবস্তু বলেন নাই।

মায়া

"অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যমনৌপম্যমনাময়ং।
তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতিবিশ্রুতা॥"—দেবী গীতা

তন্ত্র মতে মায়া কি ?

শ্রুতি প্রতিপাদ্য সেই আত্মার স্বরূপ অনুমাণাদি প্রমাণের অবিষয়, এবং সেই আত্ম-পদার্থকে জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদি দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়না—তাই উহা অনির্দ্দেশ্য, তৎসদৃশ দ্বিতীয় পদার্থের অভাব বশতঃ তিনি উপমারহিত এবং জন্মমরণাদি ষড় ভাব বিকার শূন্য বলিয়া তিনি অনাময়। এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধা এক শক্তি আছে তিনি মায়া নামে বিখ্যাত।

"স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতা।
স্বাধারাবরণাত্তস্যা দোষত্বঞ্চ সমাগতং॥" দেঃ গীঃ

আমি নির্গুণা হইয়াও স্বশক্তির সমাযোগ বশতঃ জগতের কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। এই

মায়াই অবিদ্যাশক্তি দ্বারা আত্মাকে আবৃত করে বলিয়া মায়াতে স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্ব দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে ।

"চৈতন্যস্য সমাযোগান্নিমিত্তঞ্চ কথ্যতে।
প্রপঞ্চ পরিণামাচ্চ সমবায়িত্বমুচ্যতে ॥" দেঃ গীঃ

আমার চৈতন্যই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং আমার মায়াশক্তি প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করে, অতএব মায়াই জগতের সমবায়ী বা উপাদান কারণ।

"তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্ দ্বিবিধা স্মৃতা,
সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা।
স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥
তস্যাং তৎ প্রতিবিম্বং স্যাদ্বিম্বভূতস্য চেশিতুঃ।
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকারকঃ।
অবিদ্যায়াস্তু যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বং নগাধিপ।
তদেব জীব সংজ্ঞং স্যাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়ং পুনঃ ॥" দেঃ গীঃ

হে রাজন্, পূর্ব্বে যে প্রকৃতি বলা হইয়াছে তাহা দ্বিবিধ। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে মায়া ও রজস্তমমিশ্র প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলে। এই মায়া স্বাশ্রয় আত্মাকে আবৃত করেন। এই মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্যর নাম ঈশ্বর ! ইঁহার আত্মজ্ঞান কখন আবৃত হয় না। ইনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহে সমর্থ। হে নগাধিপ, অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলে, ইনি সর্ব্বদুঃখের আশ্রয়।

"করোতি বিবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং পুনঃ।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্ প্রকল্পিতঃ ॥" দেঃ গীঃ

হে রাজন্, এই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিনী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কারণ এই ঈশ্বরও রজ্জুসর্পবৎ ব্রহ্মরূপিনী আমাতে কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব তিনি মৎশক্তি প্রেরিত অর্থাৎ মদধীন।

মায়া ভগবানের শক্তি

"মন্মায়াশক্তি সংক্লৃপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরং।
সাপি মত্তঃ পৃথঙ্মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ ॥" দেঃ গীঃ

এই চরাচর সমস্ত জগৎ আমারই মায়াশক্তিদ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে কিন্তু সেই মায়াশক্তি পরমার্থ দৃষ্টিতে মদ্ব্যতিরিক্ত কোন অন্যপদার্থ নহে। কারণ সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের দুটি শক্তির মধ্যে যেটী চেতন অবিকারী তাহাকেই পুরুষ বলে এবং যেটী বিকার যুক্ত ও পরিণামী তাহাকেই প্রকৃতি বলে। শ্রুতিতে বলিয়াছেন—"দ্বে প্রকৃতি বেদিতব্যে পরা চ অপরা"। গীতাতেও এই দুই শক্তিকে পরা ও অপরা নাম দেওয়া হইয়াছে। এই পরা প্রকৃতি জীবের জীবনরূপা, তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। চৈতন্যের ধারণার বিষয় হইয়াই জগতের অস্তিত্ব বর্ত্তমান, এই জগৎ তাঁহার ধারণার বিষয় না হইলে

তাহার অস্তিত্ব থাকিত না।" ইহাকেই আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—"জীবরূপাং ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং।" বেদান্তের ভাষায় ইহাই পরব্রহ্মের স্পন্দন শক্তি। যোগের ভাষায় ইহাই প্রাণশক্তি। মণিতে যেমন স্বাভাবিক জ্যোতি ঝলকিত হয়, শান্ত শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মেও সেইরূপ স্বাভাবিক স্পন্দন উঠে, ঐ স্পন্দনই প্রাণ বা মায়া। ব্রহ্ম চাঞ্চল্যহীন শান্ত শুদ্ধ শিবরূপ এবং তাঁহাতে যে স্পন্দন উত্থিত হইতেছে তাহাই তাঁহার প্রাণশক্তি, মন বা মায়া। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"মায়া বিদ্যা বিহায়ৈবং উপাধি পর জীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরংব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥"

ঈশ্বর ও জীব উভয়ই উপাধি কল্পিত অবস্থা। ("ঈশ্বরত্বং তু জীবত্বং উপাধিদ্বয় কল্পিতং")। মায়া ও অবিদ্যারূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই লক্ষিত হন। অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন—স্বরূপ লক্ষণ নির্গুণ নির্ব্বিকল্প তাহাতে সৃষ্টির কোন কথাই উঠিতে পারে না তাই তাঁহারা ব্রহ্মের এক তটস্থ লক্ষণও স্বীকার করিয়াছেন। তটস্থ লক্ষণে তিনি সগুণ সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বকল্প ও সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা।

এই লইয়া সগুণ ও নির্গুণ বাদীদের মধ্যে কত কলহ বিসম্বাদ হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যোগীর পক্ষে ইহার তথ্য নির্ণয় কিছুই কঠিন নহে। দক্ষস্মৃতিতে আছে—

"স্বসংবেদ্যং হি তদ্‌ব্রহ্ম কুমারীস্ত্রীসুখং যথা।
অযোগীনৈব জানাতি জাত্যন্ধো হি যথা ঘটম্‌"।

জন্মান্ধের যেমন ঘটাদি পদার্থের চাক্ষুষজ্ঞান জন্মে না, কুমারী যেমন স্ত্রীসুখ বুঝিতে পারে না, অযোগীও সেইরূপ স্বসংবেদ্য ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না।

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্‌।"

তন্ত্রে বলিয়াছেন—"অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণানি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানং চ লভ্যতে॥"

ককারাদিবর্ণের অভ্যাস যেমন শাস্ত্রবোধ উৎপাদন করে, যোগও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞান যোগসাপেক্ষ—যোগাভ্যাস হইতেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। শ্রুতিতে আছে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এবং ইহাও বলিয়াছেন "শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপন অভ্যন্তরে আত্মার উপলব্ধি করিবে।"

ভগবান এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। অপরা প্রকৃতির কার্য্য হইল দেহরূপে বা ভোগসাধন দ্রব্যাদিরূপে পরিণত হওয়া এবং পরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ্ঞের কার্য্য—ভোক্তৃত্ব। ইনিই প্রকৃতিস্থ হইয়া "ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান গুণান্‌" প্রকৃতির গুণের ভোক্তা হন। প্রকৃতপক্ষে

পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা, ইনিই জ্ঞেয়

এই প্রকৃতি পুরুষই একই বস্তুর দুটী দিক মাত্র। পরমাত্মার এই দুইটী প্রকৃতি একত্রে থাকার জন্যই অসঙ্গ পুরুষের সংসার ভাব পরিলক্ষিত হয়। পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয় একত্র মিলিলেই

জীবের বদ্ধাবস্থা হয় এবং জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই বদ্ধভাবই বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞানদ্বারা পুরুষ নিজ পরিচয় পাইলেই অপরা প্রকৃতির মমতা বন্ধন হইতে জীব মুক্তিলাভ করে। এই মোহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অপরা প্রকৃতি বৃক্ষের জীর্ণত্বচের মত আপনিই স্খলিত হইয়া যায়। তাই বেদান্ত বলেন প্রবুদ্ধ হইবার পরে অর্থাৎ স্বরূপদর্শনের পর এই জগদাদি স্বপ্নদর্শন তিরোভূত হইয়া যায়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই আমার সৃষ্ট বিশ্ব আর আমার প্রতীতির বিষয় হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিশ্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না, কিন্তু মুক্ত জীব তৎসম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যান। তিনি প্রপঞ্চাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আর প্রপঞ্চ দর্শন করেন না। বস্তুমাত্রেই কাহারও বোধের বিষয় হইয়া তবে প্রতীত হয়, জীবের স্বরূপে স্থিতি হইলে আর তাহার বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না সুতরাং জগদাকারে বুদ্ধির পরিণাম লাভ না হওয়ায় আর জগতের কোন অনুভব থাকিতে পারে না। সেইজন্য মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি যন্ত্র কর্ম্ম করিলেও তাঁহার আর কর্ম্মবন্ধন হয় না। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের তাদাত্ম্য হেতুই জগদ্দর্শন হয়, উহা তাঁহার ব্যবহারিক স্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞের এই ব্যবহারিক ভাব দেখাইয়া পরে তাঁহার পারমার্থিক অসংসারি স্বরূপ দেখানো হইতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞের এই অসংসারি স্বরূপই জ্ঞেয় বস্তু, এবং ঐ জ্ঞেয় বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা না জানিলে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারা যায় না। ভগবান বলিতেছেন সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বস্তু অনাদি, তিনি সৎ অসৎ প্রমাণের বিষয় নহেন। সাধারণতঃ যাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানে লক্ষিত হয় তাহাই সৎ, যাহা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর তাহাই অসৎ—তিনি এই সদসৎ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই নহেন—তিনি নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ রূপ। তিনি কিছুই নহেন, তবে কি তিনি শূন্যমাত্র ?—তাহা নহে। তিনি কিছুই নহেন ইহার অর্থ এই যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু আমার মনের অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে, তদ্রূপ পরা বা অপরা প্রকৃতি, স্থূল বা সূক্ষ্ম তাঁহা হইতে কিছু অতিরিক্ত পদার্থ নহে। কিন্তু সৎ, অসৎ ভাব তাঁহার স্বরূপে না থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত "সর্ব্বের" প্রতীতি আছে, ততক্ষণ তিনিই সর্ব্বাত্মকরূপে—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণে 'বহিরন্তশ্চভূতানামচরং চরমেবচ' এই সর্ব্বাত্মক ভাবও থাকে না। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এই সর্ব্বাত্মক ভাবেই বুঝিতে হয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মানন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। কনক কুণ্ডলের যেমন ভিতরে বাহিরে স্বর্ণ, তেমনই দৃশ্যজগতের অন্তরে বাহিরে এবং তাহার অতীত ভাবেও কেবল এক ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন।

সাংখ্যের মতে জগৎ প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম মাত্র। গীতার মতে যাহা কিছু হইয়াছে সমস্ত তাঁহারই ইচ্ছায়—'ময়াধ্যক্ষেণ" তিনি স্বয়ং যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষরূপে খেলা করিতেছেন। সেই প্রকৃতিই "ব্রহ্মযোনি বা মহত্তত্ত্ব" এবং ঈশ্বর বীজপ্রদ পিতা, অর্থাৎ তাঁহার ঈক্ষণেই প্রকৃতির গর্ভাধান হইতেছে। ঈশ্বর স্বয়ং কামগন্ধহীন, নির্ব্বিকার, আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত, তথাপি অচিন্ত্যনীয় যোগৈশ্বর্য্য বলে তিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করিতেছেন। এই সৃষ্টি একবারে অলৌকিক। সৃষ্ট বস্তুর সহিত তাঁহার কোন যোগ

জগৎ কি ?

নাই। সর্ব্বব্যাপক অথচ কিছুতে তিনি লিপ্ত নহেন, এ বিচিত্র অবস্থা এক ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই অনুভব করা যায়। তিনি লিপ্ত কেন হন না? প্রথমতঃ সৃষ্ট বস্তু প্রকৃতই কল্পিত, যাহা কল্পিত বা স্বপ্নমাত্র তাহা বস্তুতন্ত্রতা বিহীন। সুতরাং কেই বা কিসে লিপ্ত হইবে? তাহা ব্যতীত ব্রহ্ম "সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি, অণুভোঽণু চ"—এত সূক্ষ্ম যে অণু তাহার নিকট স্থূল। এত সূক্ষ্ম আর কোন বস্তু হইতে পারে না বলিয়া তিনি কিছুতেই লিপ্ত হইতে পারেন না। যেমন বায়ু সূক্ষ্ম পদার্থ হইলেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম নহে এইজন্য তাহার স্পর্শ আমরা ত্বকে অনুভব করিতে পারি। শূন্য বা ব্যোম্ বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম—সেই শূন্যে কোন বস্তু লিপ্ত হইতে পারে না। সেই শূন্যের অণুরও দশভাগের একভাগ ব্রহ্মাণু, সুতরাং তাহা কিরূপে অন্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইবে? তাই ব্রহ্ম সকল বস্তুর আধার হইয়াও সকল বস্তু হইতে পৃথক। আপ্তকামের ইহা এক অপূর্ব্ব লীলা। কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি অনাসক্ত এইজন্য সব সাজই তাঁর তথাপি তিনি সকলের সহিত সম্বন্ধ রহিত। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জুই যেমন কল্পিত সর্পের আশ্রয় হয়, সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম সত্ত্বাদিগুণের অতীত হইয়াও সত্ত্বাদিগুণের পালক। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বুঝানো যায় না, যেমন ক্রিয়ার পর অবস্থা কাহাকেও বুঝাইবার উপায় নাই, কিন্তু তাহা অনুভবগম্য, এই জন্য তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায় না। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপের কিছু কিছু ধারণা হয়—তাই ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই সকলের অন্তরে বাহিরে, দূরে ও নিকটে, তিনিই স্থাবর জঙ্গম ও সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ তাঁহারই জ্যোতিঃ মাত্র, তিনি যদিও এক অখণ্ড অবিভক্ত তথাপি বিভক্তের মত দৃষ্ট হইতেছেন, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সেই জন্য আমাদের জ্ঞানদ্বার ইন্দ্রিয়গণের অবিজ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য, এবং সকলের হৃদয়ে তিনিই অধিষ্ঠাতা। তাঁহাকে না জানিলে প্রকৃতি সম্ভূত দেহেন্দ্রিয়াদির কবল হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। এইজন্য জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানের সাধনগুলি জানিয়া জ্ঞেয় বস্তুর যথার্থ ধারণা করিয়া লইতে হয়।

জ্ঞান

এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক হইতে ১১শ শ্লোকোক্ত অমানিত্ব অদম্ভিত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, উহাই জ্ঞানের সাধন, এবং প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জ্ঞানীর ঐ সকল লক্ষণ গুলি প্রকটিত হয়।

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥"

আত্মসাক্ষাৎকারের বিবিধ পন্থা

(১) কোন কোন অধিকারিগণের পক্ষে ধ্যানযোগই আত্মদর্শনের উপায়, তাঁহারা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন, (২) দ্বিতীয় অধিকারিগণ প্রকৃতি পুরুষের প্রভেদ আলোচনা দ্বারা আত্মদর্শন করেন, (৩) এবং সেইজন্য তৃতীয় অধিকারিগণ অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনে

অভ্যস্ত হন ও (৪) চতুর্থ অধিকারিগণ ভগবৎ প্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মদর্শনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ধ্যানযোগ কি? শব্দাদি বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহৃত করিয়া মনেতে আটকাইতে হয় এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রভাবে যে চিন্তা, তাহারই নাম ধ্যান। এই ধ্যানকালে বিজাতীয় জ্ঞানধারা থাকে না, তৈল ধারার স্থায় অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই বহিতে থাকে। সেই ধ্যানের দ্বারা বুদ্ধিতে কোন কোন যোগী প্রত্যক্ চেতন বা আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

সাংখ্যযোগ কিরূপ? সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দৃশ্য, আমি এই গুণত্রয় হইতে বিলক্ষণ, এবং এই গুণত্রয়ের যাহা কিছু ব্যাপার আমি তাহারই দ্রষ্টা। আমি অবিনাশী অপরিণামী আত্মা। এই প্রকার প্রকৃতি পুরুষের বিভাগ চিন্তাই সাংখ্যযোগ—(শঙ্কর)। এইরূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণে কেহ কেহ আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস ইঁহাদের সাধনা। আবার কোন কোন অধিকারিগণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া ভজনা করেন। তদ্দারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহারা নিদিধ্যাসনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আত্মদর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

কিন্তু যাঁহারা অতিমন্দ অধিকারী তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া গুরু-বাক্যানুসারে তাঁহার উপদিষ্ট উপায়ে শ্রদ্ধালু হইয়া আত্মোপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভ করেন।

পূজ্যপাদ গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন—ভালরূপে ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে নির্ম্মল ব্রহ্ম স্বরূপ অণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই তিনি ধ্যান যোগ বলিয়াছেন, কারণ ধ্যানেতে ধ্যেয় বস্তু কিছু থাকা চাই, উহাই সাবলম্ব ধ্যান। আর সাংখ্যযোগ হইতেছে নিরাবলম্ব ধ্যান—অসংখ্য প্রাণায়াম দ্বারা মন যখন বিষয় প্রভৃতিতে অনাসক্ত হইয়া স্থির হয়, সেই নির্ব্বিষয় অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা রূপ যে স্থিতি তাহাই প্রকৃত সাংখ্যযোগ। আর ক্রিয়াযোগ হইতেছে—যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া প্রাণাপানকে স্থির করিবার কৌশল অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন—তাঁহারাই কর্ম্ম-যোগী। কিন্তু সমস্ত উপায় গুলির মধ্যেই ক্রিয়াযোগ আছে।

"জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃ স্যাত্তৎসমুচ্চয়ঃ।
সহায়তাং ব্রজেৎ কর্ম্ম জ্ঞানস্য হিতকারি চ॥"

জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্য লাভ হয়, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মাদি দ্বারা সেই জ্ঞানলাভের সহায়তা হয়।

ক্রিয়াযোগ দ্বারা মুক্তি

একমাত্র প্রাণকর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। এই প্রাণকর্ম্মের সাধনার দ্বারাই প্রাণের স্থিরতা সম্পাদিত হয়। স্থিরতাই প্রাণের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং চাঞ্চল্যই বিকৃত অবস্থা। প্রাণ স্থির হইলেই সত্য বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। স্থির জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্বাভাবিক হয়, বিক্ষিপ্ত জলে প্রতিবিম্ব

বিকৃত দেখায়। যেমন মেঘ মালার দ্বারা সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, আবার মেঘমালা অপসারিত হইলে সূর্য্যকিরণকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তদ্রূপ প্রাণাপান প্রভৃতি প্রাণবৃত্তি দ্বারা অনন্ত স্থিরতা যেন আচ্ছাদিত বলিয়াই বোধ হয়। সাধনশক্তি দ্বারা আবার প্রাণাপান বৃত্তি রুদ্ধ হইলেই চিরস্থির, চির অবিকৃত স্থির প্রাণকে উপলব্ধি করা যায়, এই স্থির প্রাণই অখণ্ড একরস আত্মারই নাম ভেদ মাত্র। এই জন্য সাক্ষাৎ জ্ঞান স্বরূপ আত্মার অববোধই কৈবল্য লাভের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও, স্পন্দনাত্মিকা প্রাণবৃত্তি এই অববোধের যে প্রধান ভাবে অন্তরায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রাণবৃত্তি নিস্পন্দিত হইলেই সমস্ত বাধা ক্ষীণ হইয়া যায় তখন আত্মবোধ বাধাশূন্য হওয়ায় মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ঝলমল করিতে থাকে। প্রাণায়ামরূপ প্রযত্নের দ্বারা প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করা যায়। চঞ্চল প্রাণই মোহপাশ এবং উহাই মৃত্যুভয়ের কারণ, প্রাণায়াম সিদ্ধির দ্বারা সেই ভয় সম্যক বিদূরিত হয়। তাহা ব্যতীত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ভূত ও রূপাদি বিষয় প্রাণের দ্বারা সর্ব্বদেহে পরিচালিত হয়।

"মনোবুদ্ধিরহংকারো ভূতানি বিষয়াশ্চ যঃ।
এবং ত্বিহ স সর্ব্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে॥" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব

সুতরাং প্রাণ যদি স্থির হয়, তাহা হইলে মন বুদ্ধি ও রূপাদি বিষয় যাহা মনকে চঞ্চল করে—তাহা আর উঠিতেই পারে না।

চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়েও প্রাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বিষয়জ্ঞানবাহক যন্ত্রেও অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, মস্তিষ্কের মধ্যেও উহা বর্ত্তমান আছে। "প্রাণো হৃদয়ম্. হৃদি প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ"—প্রাণ হৃদয়ে থাকে, চক্ষুরাদিস্থ নাড়ীতে যেরূপ (বোধবাহী) প্রাণ স্থান, শ্বাসযন্ত্রেও সেই প্রকার প্রাণবৃত্তি রহিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিলেন—"উৎপত্তিমায়তিংস্থানংবিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা। অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে"। প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভুত্ব এবং বাহ্য ও অধ্যাত্ম ভেদে পঞ্চ প্রকারে অবস্থিতি জানিয়া অমৃত ভোগ করেন।

প্রাণ

সমস্ত সৃষ্টির প্রথমেই প্রাণ—"প্রাণো ভূতানাং জ্যেষ্ঠঃ"। জাগতিক সমস্ত পদার্থকে "রয়ি" ও "প্রাণ" বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাণই শক্তি পদার্থ ও রয়ি দ্রব্য পদার্থ। "এষোহগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য, এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ। এষ পৃথিবী রয়ির্দ্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ"—প্রশ্নঃ। এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দিতেছেন, ইনি সূর্য্য, ইনি পর্জ্জন্য, ইনি মঘবান (ইন্দ্র) ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি প্রকাশস্বভাব রয়ি (চন্দ্র), অধিক কি যাহা, সৎ ও অসৎ এবং অমৃত তাহাও ইনি। সেই শক্তি পদার্থের স্থানই সুষুম্না নাড়ী, উহাই স্থির প্রাণের আধার।

"দীর্ঘাস্থিমূর্দ্ধপর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে।
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সুরিভিঃ॥" উত্তর গীতা

মস্তক পর্য্যন্ত যে দীর্ঘাস্থি অর্থাৎ মেরুদণ্ড রহিয়াছে তাহাকে ব্রহ্মদণ্ড বলে, তাহার মধ্যে খুব কোমল ও সূক্ষ্ম ব্রহ্মনাড়ী রহিয়াছে। এই নাড়ীর মধ্যেই শ্বাসকে চালনা করিতে হইবে। যদি বলা যায় সে পথ তো আমাদের দৃষ্ট নহে, কিরূপে আমরা

তন্মধ্যে প্রাণকে পরিচালনা করিব? তাই শ্রুতির উপদেশ "যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং প্রাণস্তেন হি গচ্ছতি"—অমৃতবিন্দু। মনের দ্বারা যদি ঐ মার্গকে লক্ষ্য করা যায় তবে প্রাণও সেই মার্গে গমন করিবে।

এই সঙ্গে পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয় বেদান্ত ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিলে উপরোক্ত বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে আরও সুবিধা হইবে। "পুরুষ চতুষ্পাদ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারিটী অবস্থা। এই চারিটী অবস্থার ৪টী স্থান, যথা—(১)নাভি, (২) হৃদয়, (৩) কণ্ঠ, (৪) মূর্দ্ধা। নাভিতে বায়ু থাকিলে নানাদিকে মন ধাবিত হয়, মনে নানা স্থানে যাওয়ায় চক্ষের পলক পড়িতে থাকে। আবার যখন ক্রিয়াদ্বারা বায়ু নাভিতে স্থির হয় তখন মনও স্থির থাকে, চক্ষেরও পলক পড়ে না। এই স্থিরতাই অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মের প্রথমপাদ। হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত বায়ু চলায়মান থাকিলে ভিতরে ও বাহিরে স্বপ্নদর্শন হয়। বাহিরের স্বপ্ন বাহিরের বস্তু দর্শন, যাহা প্রকৃত পক্ষে নাই তাহাই দেখিয়া মোহিত হওয়া। ভিতরেও যাহা নাই তাহাই স্বপ্নে দেখা যায়, যেমন স্বপ্নে সর্প নাই অথচ সর্প দেখিলে যে ভয় উদ্রেক হয়, সেইরূপ ভয় দেখা। হৃদয় হইতে কণ্ঠে যে বায়ু চলায়মান রহিয়াছে তাহা স্থির হইলেই আর স্বপ্ন দেখা যায় না। বাহিরেও সে ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু দেখে না। স্বপ্ন না দেখাই ব্রহ্মজ্ঞানের চিহ্ন হইতেছে—ইহাই ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ। যখন বায়ু হৃদয়েতে স্থির হয় তখনই সুষুপ্তাবস্থা অর্থাৎ তখন নানাত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহাই ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ। এই তিন পাদের উর্দ্ধে যে বায়ু রহিয়াছে তাহারই নাম অমৃত। উহা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে যখন স্থির হয়, তখনই গগন সদৃশ অবস্থা প্রকাশ পায়। উহাই চতুর্থপাদ বা তুর্য্যাবস্থা।"

যখন তুমি অস্থির হও, তাহার মানে এই যে তোমার বুদ্ধি তখন স্থির নহে। তখন ইহা উহা করিবার, ওখানে সেখানে যাইবার কত কি ইচ্ছা হয়, আবার ক্রিয়া করিয়া যখন স্থির হইয়া যাও, যখন বহু বাসনায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, তখন তোমার বুদ্ধিও স্থির হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে বুদ্ধি ব্রহ্মমুখী তাহাতে আর কল্পনা থাকে না, তখন মনও নিরুদ্ধ বুদ্ধিও স্থির অচঞ্চল। এই স্থৈর্য্য যখন পরাকাষ্ঠা লাভ করে তখনই তাহাকে পরাবুদ্ধি বলে। উহাই **ক্রিয়ার পর অবস্থা**। হৃদয়েতে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠা হইলেই ঐরূপ স্থৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। এই পরমস্থিরতার অবস্থাতেই 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' হইয়া থাকে। তখন আপনি না থাকায় দ্রষ্টার দৃশ্যপ্রপঞ্চও থাকে না, সে অবস্থায় বিশ্বের উৎপত্তি প্রলয় কিছুই সম্ভব হয় না! "জগদাদি অসত্য" এই অবস্থায় বলা যাইতে পারে।

"আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং—"প্রথমে কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, কিন্তু অন্য জ্ঞাতার অভাবে ব্রহ্মও না থাকার মতই হইয়া রহিলেন। এই অগোচর, অনির্দ্দেশ্য বস্তু হইতে, এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন—ইনিই প্রথম পুরুষ নারায়ণ, কারণার্ণবশায়ী। কূটস্থরূপ কারণসলিলে প্রথম দৃষ্ট হন। তাঁহাকে ওঁকার মধ্যস্থ—বলা যায়। এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরই ওঁকার, এবং তাহার অতীত বিদেহ পুরুষ।

এই তিনটী শরীরই সেই বিদেহ পুরুষের প্রকৃতি। তখনও প্রকৃতি পুরুষ সমরস-ভাবাপন্ন। পরে তাহা পৃথক হইয়া বিচ্ছিন্নবন্ধন হইয়া গেল। কিন্তু তখনও উভয়ের মধ্যে চেতনাত্মক শিব ও জড়াত্মক প্রকৃতি বর্ত্তমান রহিলেন। তাহাই বিভক্ত হইয়া দুইটী রূপ গ্রহণ করিল—একটী পুরুষ ও একটী কন্যা হইল। তখন তাহাদের সঙ্কল্পাত্মক মন ও মনের কার্য্য-নির্ব্বাহক ইন্দ্রিয়াদি রচিত হইল, এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য-স্থান স্থূল দেহাদিও রচিত হইল। পরে মন চঞ্চল হইয়া অভিমানাত্মক বৃত্তি বশতঃ পুরুষ আপনাকে ও কন্যাকে পৃথক রূপে দেখিতে লাগিল। পরে পুরুষের মন কন্যার প্রতি আসক্ত হইল। এবং মনের চাঞ্চল্য দ্বারা নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ পুরুষ কন্যার গর্ভে আপনিই জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে সকল জীবের উৎপত্তি হইল। ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ এ সমস্তই চঞ্চল ভাব। গতিশীল হইলেই আত্মার ঐ সকল উপাধি হয়। এই উপাধি বা আবরণই জীবের জীবত্ব। উপরোক্ত (ইন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার ও প্রাণ) আবরণচতুষ্টই বন্ধনের কারণ এই আবরণ চতুষ্টয় হইতে মুক্ত হইলেই জীবত্ব নাশ হয়। এই চাঞ্চল্যই সমস্ত আবরণের মূল কারণ – তাই যতদিন জীবের এই অবস্থা থাকে ততদিন তাহার জন্ম মৃত্যুর চাঞ্চল্য, সুখদুঃখের চাঞ্চল্য, আরও কতবিধ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। এই চাঞ্চল্য হইতেই হৃদয়ের ধুকধুকানি ও ভয় ব্যাকুলতার স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই চাঞ্চল্য বা বেগ নাড়ীমুখে সর্ব্বত্র সম্প্রসারিত হয়। সুতরাং যতদিন এই নাড়ীশোধন বা ভূতশুদ্ধি না হয়, ততদিন স্বরূপাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যায় না। তাই প্রাণকে স্থির করিয়া এই আবরণ চতুষ্টয়কে ছিন্ন করিতে পারিলেই যোগী আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হন। ইহারই নাম তুর্য্যাবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া এই তুর্য্যাবস্থায় উপনীত করে। এই অবস্থা লাভ করিলে আর যোগীকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। উহাই নির্গুণ ভাব, উহা আনন্দময় বা নিরানন্দময় নহে। উহা কূটস্থ অবিকারী। সত্ত্বগুণ অতিমাত্র বিবৃদ্ধ হইলেই আনন্দানুভব হয়, উহা আত্মার নির্গুণ অবস্থার নিম্ন অবস্থা। কিন্তু ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারিলেও যোগী বিশোকা অবস্থা লাভ করেন।

গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই ভগবানের প্রকৃতি বলা হইয়াছে—সুতরাং উভয়ই ভগবান হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভগবান যে জগৎলীলা করেন, এই লীলা প্রসঙ্গেই উভয়ের ভেদ স্বীকৃত হয়। এই জন্য মুক্তিলাভার্থী সাধকবৃন্দের উভয় তত্ত্বই জ্ঞাতব্য। উভয়ের ভেদ যেখানে মিলাইয়া গিয়াছে, তাহাই পরম তত্ত্বের স্থান। তত্ত্ববিদেরা এই পরতত্ত্বকেই তত্ত্ববস্তু বা জ্ঞেয় বলিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব বস্তুটীকেই পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বলা হইয়া থাকে। উহা এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপ। সাংখ্য বলিয়াছেন—“জ্ঞানান্মুক্তিঃ”। এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। যতদিন এই জ্ঞান লাভ না হয় ততদিন ত্রিবিধ দুঃখের জ্বালায় জীব জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। এই ত্রিবিধদুঃখের হেতু জীবের স্থূলাদি দেহত্রয়, এবং জীবের

প্রকৃতি বা মায়া হইতে মুক্তিলাভের উপায়

উহাতে অত্যন্ত আসক্তি হেতুই এই দুঃখ অনুভব হয়। অবশ্য দেহাদির উৎপত্তির কারণ কর্ম্ম, এবং দেহ থাকিলে কর্ম্ম হওয়া অনিবার্য্য। জীবের স্থূল দেহে পঞ্চদশ গুণ বর্ত্তমান থাকে। উহাই প্রপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টি। ব্যোম হইতে শব্দ। অনিলে—শব্দ ও স্পর্শ। অনলে—শব্দ + স্পর্শ + রূপ। সলিলে—শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস। এবং ক্ষিতিতে—শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস + গন্ধ, সমস্ত মিলিয়া পঞ্চদশ। এই পঞ্চদশ গুণের দ্বারাই জীব মোহিত হইয়া তত্তৎ বস্তুতে আসক্ত হয়। এই আসক্তিই বন্ধন। এই বন্ধন ছাড়াইবার উপায় হইল যোগাভ্যাস। কিন্তু এই বন্ধনের ফাঁস আসলে স্থূলদেহে নাই, স্থূলে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। উহার বন্ধনের মূল সূক্ষ্মদেহে, এই সূক্ষ্ম দেহের শোধনই ভূতশুদ্ধি।

এই ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সূক্ষ্মদেহে যে সংস্কার লাগিয়া থাকে তাহা কিছুতেই মুছা যায় না। সূক্ষ্ম দেহে—পৃথিবীতত্ত্ব হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, জলতত্ত্ব হইতে মোহ উৎপন্ন হয়, অগ্নিতত্ত্ব হইতে ক্রোধ, বায়ুতত্ত্ব হইতে কাম এবং আকাশতত্ত্ব হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতদ্বারাই জীবচিত্তে বহু মনোবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে আবদ্ধ করে। যোগাভ্যাসদ্বারা শরীর ও প্রাণ শুদ্ধ হইলে মনোবুদ্ধিও বিশুদ্ধ হইয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। সেইজন্য প্রাচীন আচার্য্যেরা ও ঋষিরা যোগাভ্যাসের জন্য সকলকে উপদেশ করিয়াছেন। যোগাভ্যাসদ্বারা ভূতশুদ্ধি হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ আপনাপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং মনে পরম প্রশান্ত ভাব আসিয়া সাধককে পরমানন্দের অধিকারী করে। সেই জন্য প্রাচীন ঋষিরা ও আচার্য্যগণ যোগাভ্যাসের জন্য সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন। গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শনে এবং তাহার বাৎসায়ন ভাষ্যেও যোগাভ্যাসের দ্বারাই যে উহা লভ্য তাহা স্বীকার করিয়াছেন :—

"অরণ্য গুহাপুলিনাদিষু যোগাভ্যাসোপদেশঃ"—গৌতমসূত্র তত্ত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধিপ্রকরণম্

যোগাভ্যাসজনিতো ধর্ম্মো জন্মান্তরেঽপ্যনুবর্ত্ততে। প্রচয়কাষ্ঠাগতে তত্ত্বজ্ঞানহেতৌ ধর্ম্মে প্রকৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে ইতি। দৃষ্টশ্চ সমাধিনা "তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্মবিধ্যুপায়ৈঃ"।

তস্যাপবর্গস্যাধিগমায় যমনিয়ম্যাভ্যামাত্মসংস্কারঃ। যোগশাস্ত্রাচ্চাধ্যাত্মবিধিঃ প্রতিপত্তব্যঃ। স পুনঃ তপঃ প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো ধ্যানং ধারণেতি। ইন্দ্রিয়বিষয়েষু প্রসংখ্যানাভ্যাসো রাগদ্বেষপ্রহাণার্থঃ, উপায়স্তু যোগাচার বিধানমিতি।—বাৎস্যায়ন ভাষ্য।

"যেনাববুধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতে পুরুষস্য চ"—যে জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভের উপায়। তত্ত্ববিচার দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু মলযুক্ত চিত্তে তত্ত্ব বিচারের উদয়ই হয় না। এইজন্যই ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে। ক্রিয়াযোগই ভূতশুদ্ধির সর্ব্বোত্তম সাধনা। প্রাণপ্রবাহ ঊর্দ্ধাম্নায় (বেদের শিরোভাগে অর্থাৎ সহস্রারে) স্থিতি লাভ করিলেই ভূত প্রকৃতি হইতে যোগীরা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। দেহাত্মবোধই সংসৃতির কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব বলিয়াছেন—

"ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ।
অহং মমেত্যসদ্গ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিম্॥
তদর্থং কুরুতে কর্ম্ম যদ্বদ্ধো যাতি সংসৃতিম্।
যোঽনুযাতি দদৎ ক্লেশমবিদ্যাকর্ম্মবন্ধনঃ॥" ভাঃ ৩য় স্কঃ, ৩১শ অঃ

যে সকল জীব মূর্খ অর্থাৎ যাহারা দেহাতিরিক্ত কোন বস্তুর সন্ধান জানে না, তাহারা এই পঞ্চতত্ত্ব বিনির্ম্মিত স্থূলদেহে আসক্ত হইয়া মূঢ়তা বশতঃ পুনঃপুনঃ অসৎ আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া কুকার্য্য করে। অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধন হেতু যে দেহ এত দুঃখ দেয়, মূঢ় দেহী সেই দেহার্থ কর্ম্ম করিয়াই আসক্তি বশতঃ সংসারগতি লাভ করে।

দেবহূতি বলিতেছেন :—

"যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্নসংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত।
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥"

হে ভগবন্, লোকসকল যতদিন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ফলদাত্রী মায়াকর্ত্তৃক বর্দ্ধিত এই দেহকে তোমা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া না দেখিতে পায়, ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখসমূহের দাতা ক্রিয়াফল প্রসবকারী এই সংসার তাহা হইতে উপরত হইবে না।

কিন্তু দেহ হইতে দেহীকে পৃথক ভাবে দেখাও বড় কঠিন, তাই দেবহূতি বলিতেছেন—

"পুরুষং প্রকৃতি ব্র'হ্মন্ ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ।
অন্যোঽন্যাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাচ্চানয়োঃ প্রভো॥"

হে প্রভো, হে ব্রহ্মন্, প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে যে দৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং দুজনেই অবিনাশী অতএব প্রকৃতি কখনও পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।

"যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ।
অপাং রসস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ॥"

যেমন গন্ধ ও ভূমির, জলের ও রসের সম্বন্ধ বিনাভাব হইতে পারে না, অর্থাৎ একের অভাবে অন্যের সত্তা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে একের অভাবে অন্যের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে না।

"ক্বচিৎ তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণম্।
অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে॥"

কখনঁ কখন তত্ত্ব বিচারে কোন কোন পুরুষের সংসার ভয় নিবৃত্ত হইলেও তাহার কারণদ্বয় অবিনাশী বলিয়া উহা একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া পুনর্ব্বার সেই ভয় উৎপন্ন হয়।

ইহার উত্তরে কপিলদেব বলিতেছেন :—

"অনিমিত্ত নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্॥

জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ॥
ভুক্তভোগা পরিত্যক্ত দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ।
নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বেমহিম্নিস্থিতস্য চ॥
যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে॥
এবং বিদিততত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়িমানসম্।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ॥"

অগ্নির উৎপত্তিস্থান অরণির ন্যায় (কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নি যেমন সেই কাষ্ঠকে দগ্ধ করে) নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মন, তীব্র ভগবদনুরাগ, প্রকৃতি পুরুষের যাথার্থ্য জ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগাভ্যাস জনিত তীব্র আত্মসমাধিদ্বারা পুরুষের প্রকৃতি (বা লিঙ্গশরীর) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিয়ত দহ্যমান হইয়া তিরোহিত হইয়া যায়। তখন প্রকৃতিরও ভোগ শেষ হইয়া যায়, এবং পুরুষও প্রকৃতির দোষগুণের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখেন, এই জন্য প্রকৃতি যেন পরিত্যক্তা স্ত্রীর মত স্বীয় মহিমায় স্থিত পুরুষের কোন অমঙ্গল বা বন্ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষ নিদ্রিত হইলে স্বপ্নযোগে যেমন তাহার নানা অনর্থসংঘটন দৃষ্ট হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে ঐ স্বপ্নকথা তাহার চিত্তে উদিত হইলেও তাহা আর মোহ উৎপন্ন করিতে পারে না, সেইরূপ আমাতে চিত্তসংযোগকারী যে আত্মারাম পুরুষ, প্রকৃতি তাহার কোন অপকার করিতে সমর্থ হয় না।

"এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্ম্মনো দুষ্টমসৎপথম্।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জ্জিতপ্রাণোহ্যতন্দ্রিতঃ॥"

আলস্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য উপায়দ্বারা এবং জিতপ্রাণ হইয়া (অর্থাৎ প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া) অসৎ পথে প্রবৃত্ত দুষ্ট মনকে বুদ্ধিদ্বারা যোগ সাধনে নিয়োজিত করিবে।

উহার ফল বলিতেছেন—

"মনোহচিরাৎস্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
বায়ুগ্নিভ্যাং যথা লোহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্॥"

যেমন সুবর্ণ অগ্নিতে সুতপ্ত হইলে অচিরে নিজের মলিনতা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জিতশ্বাস যোগীর চিত্ত অল্পসময়ের মধ্যেই নির্ম্মল হয়।

এই সূক্ষ্মভূত সমুদায় সূক্ষ্মশরীরে নিহিত থাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি সূক্ষ্মশরীর বায়ুভূত, সূত্রাত্মাই এই সূক্ষ্ম শরীরের প্রাণ। সূত্রাত্মা প্রাণময় সুতরাং স্পন্দনধর্ম্মী, এই স্পন্দন যতদিন না থামিবে ততদিন ত্রিতাপের জ্বালা নিবিবে কিরূপে? এবং জীব মুক্তি লাভই বা কিরূপে করিবে? সুতরাং প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও একটু এখানে আলোচনা করিতে চাই।

"আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষেচ্ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে"—প্রশ্ন উঃ।

প্রাণতত্ত্ব

আত্মা হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে, পুরুষ দেহে যেরূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও এই আত্মাতে (বা পরমেশ্বরে) আতত বা অনুগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত (কামাদি দ্বারা) এই স্থূল শরীরে আগমন করে।

"যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি ; এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে॥"—প্রশ্নঃ। সম্রাট যেরূপ 'এই সমস্ত গ্রাম শাসন কর' বলিয়া অধিকার প্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন ; ঠিক এইরূপই এই প্রাণও অপর প্রাণকে (চক্ষুঃ প্রভৃতি এবং স্বীয় ভেদ সমূহকে) যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া থাকে।

"পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে চ মধ্যে তু সমানঃ ; এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি, তস্মাদেত্যঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি"—প্রশ্নঃ। উক্ত প্রাণই অপানকে পায়ু ও উপস্থদেশে নিযুক্ত করে ; এবং প্রাণ নিজেই চক্ষুঃ শ্রোত্র মুখ ও নাসিকায় অধিষ্ঠান করে। সমান মধ্যস্থানে নাভিতে অবস্থান করে। কারণ ইনিই হুত অন্নকে সমতা প্রাপ্ত করান। প্রাণাগ্নি হইতে এই সাত প্রকার দীপ্তি (চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও জিহ্বা-সম্পাদিত জ্ঞান) নির্গত হইয়া থাকে।

"হৃদি হ্যেষ আত্মা ; অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং, তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি"—প্রশ্নঃ। জীবাত্মা মাংসপিণ্ড দ্বারা পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে বাস করেন, এই হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের এক একটীতে আবার একশত একশত শাখা নাড়ী আছে, সেই প্রত্যেক শাখা নাড়ীতে আবার বায়াত্তর বায়াত্তর হাজার নাড়ী আছে। এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যান বায়ু সঞ্চরণ করে।

আদিত্য মণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মি সমূহের ন্যায় হৃদয় হইতে সর্ব্বাবয়বগামী নাড়ীসমূহদ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যান বায়ু বর্ত্তমান আছে।

এই সকল নাড়ীর অভ্যন্তর দিয়াই যে প্রাণের প্রবাহ হয়, তাহাতেই দেহকে প্রাণময় করিয়া রাখে এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে চৈতন্যময় করিয়া রাখে। জীবাত্মার স্থানও জীবশরীর মধ্যে হৃদয়ে এবং এই হৃদয়ে বায়াত্তর হাজার নাড়ী আছে, এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় প্রাণাদি বায়ুর মধ্যেই আত্মার শক্তিই ক্রীড়া করে।

"অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্" —প্রশ্নঃ। একশত একটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নামক একটি ঊর্দ্ধগামিনী নাড়ী, তাহার দ্বারা উদানবায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য দ্বারা পুণ্যলোক আর পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপলোকে লইয়া যায়, এবং পাপ পুণ্য সমান হইলে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়। উদান জয় করিলে শরীর লঘু হয় ও ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা হয়। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বোধবাহী নাড়ীই সুষুম্না। সুষুম্না ঊর্দ্ধগামিনী। উদানও সেই সুষুম্না স্থিত শক্তি। যাঁহারা মনে করেন প্রাণ এক প্রকার বায়ু তাঁহারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অবগত নহেন। বেদান্ত সূত্রে

দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পাদে আছে—"ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ" —এই সূত্রের দ্বারা জানা যায় যে মুখ্য প্রাণ বায়ু অথবা ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় সকলের সামান্য বৃত্তিমাত্র নহে, কারণ শ্রুতি পৃথক ভাবে এই প্রাণের উপদেশ করিয়াছেন।

"পীতং ভক্ষিতমাঘ্রাতং রক্তপিত্তকফানিলাৎ।
সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মারুতঃ॥" যোগার্ণব

সমান বায়ু অন্নরসকে সর্বস্থানে সমনয়ন করে। আহার্য্য দ্রব্যকে সমনয়ন (assimilate) করা বা শরীরের উপাদান রসরক্তাদিরূপে পরিণত করা সমানের কার্য্য।

ধ্যানসিদ্ধ পুরুষেরা অলৌকিক যোগবল প্রভাবে দেখিয়াছেন—প্রাণবায়ু স্থির হইলেই অমরপদ প্রাপ্তি হয়, সেই অমৃত পদই ব্রহ্মযোনি। সেই যোনি হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি ও সেখানেই সমুদায়ের লয় হয়। এ সংসারে জীব কর্ম্মবশে একবার আসিতেছে ও একবার যাইতেছে, যে ব্রহ্মের খুঁটী প্রাণকে (স্থির বা মুখ্য প্রাণ) দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে, সে গতায়াত হইতে মুক্ত। এই প্রাণ ক্রিয়া দ্বারাই ক্রিয়ার পর অবস্থা বা স্থিতিপদ লাভ হয়, সুতরাং ক্রিয়াই ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্রয়।

"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং,
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং।
ধ্যাত্বামুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং।"—শ্রীরাম তাপনী।

উমা—উ—শিব, মা—লক্ষ্মী, শিব অর্থাৎ আত্মার লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্য্য এই শরীর। এই শরীরই প্রকৃতি বা উমা, এই উমার সহায়তায় অর্থাৎ এই শরীরের দ্বারা (সাধন শরীরের দ্বারাই হয়) যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ সেই ঈশ্বরকে পায়। ঈশ্বর=**ক্রিয়ার পর অবস্থার হৃদয়ে স্থিতিরূপ যে অনুভব তাহাই ঈশ্বর।** তখন তৃতীয় চক্ষু কূটস্থ দেখেন সেই তৃতীয় চক্ষু। এই সংসার সমুদ্র স্বরূপ, ক্রিয়াদ্বারা সেই সমুদ্র মন্থন করিয়া যে ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয়, তাহাই বিষয়রূপ বিষ। সেই বিষকে হজম করেন নীলকণ্ঠ। কণ্ঠস্থিত ষোড়শদল পদ্মে বায়ু স্থির হইলে সাধক নীলকণ্ঠ হইয়া যান। তখন সংসার বিষজ্বালা প্রশমিত হইয়া শান্তি পদ লাভ হয়। তখন হয় "বধির বোবা রসে ডোবা"—সুতরাং কাহারও সহিত কথা কহিতেও ভাল লাগে না, তখনই সাধকের ব্রহ্মযোনিতে স্থিতি হয়।

ভৃগুবল্লিতে আছে—"প্রাণো ব্রহ্ম ইতি, মনো ব্রহ্মেতি, বিজ্ঞান ব্রহ্মেতি, আনন্দং ব্রহ্মেতি।" প্রাণ স্থির হইলেই ব্রহ্ম, প্রাণের সঙ্গেই মন থাকে সুতরাং প্রাণ স্থির হইলেই মন স্থির হইয়া যায়। তখন মনও ব্রহ্ম। পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিজ্ঞানপদ লাভ হয়, তাহাও ব্রহ্ম। বিজ্ঞানের পর যে আনন্দ বোধ হয় সেই আনন্দই ব্রহ্ম।

"প্রাণাপানয়ো কর্ম্মেতি"—প্রাণ ও অপানের কর্ম্মই এই ক্রিয়া, এই ক্রিয়া হইতেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। এই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, আর সব অকর্ম্ম।

এইরূপ কর্ম্মরহস্য অবগত হইয়া যিনি কর্ম্মদ্বারা জীবভাব নষ্ট করিতে পারেন তিনিই পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। জীব যাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারে সেইজন্যই ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জীবের বন্ধনের কারণ ও তাহা হইতে বিমুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

(গুণত্রয়বিভাগযোগঃ)

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। জ্ঞানানাম্ (সকল জ্ঞানের মধ্যে) উত্তমং (শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনরায়) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) সর্ব্বে মুনয়ঃ (সকল মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরা সিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১

শ্রীধর। পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে ॥

"যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বংস্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥" ইত্যুক্তম্, স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগে নিরীশ্বর সাংখ্যানামিব, ন স্বাতন্ত্র্যেণ। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়া এবেতি কথনপূর্ব্বকং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু" ইত্যনেন উক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ এবম্ভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি—পরংভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং—পরমাত্মনিষ্ঠং। জ্ঞায়তে অনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ। ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথম্ভূতং ? জ্ঞানানাং তপঃকর্ম্মাদি বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং, মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ো—মননশীলাঃ সর্ব্বে, ইতঃ—দেহবন্ধনাৎ, পরাং সিদ্ধিং—মোক্ষং, গতাঃ—প্রাপ্তাঃ ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। [পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা বারণ করিয়া গুণসঙ্গ বশতঃ যে সংসারের বিচিত্রতা তাহাই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন]

"ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে হে ভরতর্ষভ ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থ ই উৎপন্ন হইয়াছে"—ইহাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ নিরীশ্বর সাংখ্যগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন, সেরূপ স্বাধীনভাবে হয় না, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা হইয়া থাকে, ইহা কথন পূর্ব্বক ১৩শ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকোক্ত যে সত্ত্বাদিগুণ জন্য সংসার বৈচিত্র্য তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনাভিপ্রায়ে দুইটী শ্লোক দ্বারা ঐ বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন]—পর অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠ যে জ্ঞান (যাহা দ্বারা জানা যায়) অর্থাৎ উপদেশ তাহা পুনরায় তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে বলিব। কিরূপ সেই জ্ঞান ? মোক্ষের হেতু বলিয়া তাহা সমস্ত জ্ঞান অর্থাৎ তপস্যা ও কর্ম্মাদিবিষয়ক জ্ঞান সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহাই বলিতেছেন যে যাহা জানিয়া মননশীল মুনিগণ "ইতঃ"—এই দেহবন্ধন হইতে "পরা সিদ্ধি" অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে:—সকল জানার উত্তম জানা— যাহা জানিলে আপনা আপনি কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে না— এমত যে মুনিগণ তাহারা এই ক্রিয়া পেয়ে (যাহা গুরুবক্ত্রগম্য) সকল সিদ্ধির পর যে পরাসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্ম-- ইচ্ছারহিত অথচ ইচ্ছা না হইতে হইতেই সমুদয় আপনা আপনি হয়—এইরূপ যথার্থ ই হয়—ইহা কথার কথা নয়!! কাজেরই কথা!! যথার্থ!!! দোহাই তোমার !!!! যাহার পর আর কিছুই নাই।—ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বলিয়াছেন তাহার কোন কোনটীকে আরও স্পষ্ট করিবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই যে জগদাদি উৎপন্ন হয় ইহা নিরীশ্বর সাংখ্যমতেও সমর্থিত, এই অধ্যায়ে ভগবান বলিবেন সাংখ্যমতাবলম্বীগণ যেরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ স্বাধীন ভাবেই হইয়া থাকে বলিয়া থাকেন, উহা কিন্তু সেরূপ নহে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ স্বাধীন ভাবে হইতে পারে না, উহা ঈশ্বরেচ্ছাতেই হইয়া থাকে, এই অধ্যায়ে সেই কথা স্পষ্টভাবে ভগবান বিবৃত করিবেন। জীব গুণসঙ্গ দ্বারা বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করে ভগবান পূর্ব্বাধ্যায়ে উহা বলিয়াছেন— এখন গুণগুলি কি কি, কিরূপেই বা গুণসংযোগ হয় এবং গুণসমূহ কিরূপেই বা জীবকে বন্ধন করে—ইহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, এক্ষণে সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক এবং ভূত প্রকৃতি হইতে জীবের কিরূপে মুক্তিলাভ সম্ভব, এবং পূর্ব্বে 'অমানিত্বাদি" জ্ঞান সাধন অপেক্ষাও যে উৎকৃষ্ট জ্ঞানতত্ত্ব আছে সেই পরম জ্ঞান কি এবং কি কি লক্ষণের দ্বারা মুক্ত পুরুষদিগকে বুঝা যায় সেই সকল লক্ষণ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিবেন। পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সাধনের জন্য "সাধন জ্ঞান" মুখ্যতঃ উপদেশ করিয়া চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "সাধ্য জ্ঞানের" বিষয় বর্ণনা করিতেছেন, যাহাপেক্ষা পরমজ্ঞান আর কিছু হইতে পারে না! যে জ্ঞান লাভ করিয়া সাধকেন্দ্রগণ বাসনারহিত রূপ পরমাসিদ্ধির অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই সকল জানার উত্তম জানা কেন? কারণ আর আর সব বিষয় জানিয়া তাহার পর আরও কি আছে এইরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থা রূপ এই যে সাধ্য জ্ঞান ইহা জানিলে আর জানিবার কোন ইচ্ছা থাকে না। অর্থাৎ ইহার পরেও আর কোন উৎকৃষ্ট অবস্থা আছে কিনা এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তিই থাকে না, কারণ উহাতেই সব সঙ্কল্প সব বাসনার নিঃশেষে পরিসমাপ্তি হয়। এইরূপ সংলীন-মানস মুনিগণ পরমানন্দরূপ চরমাবস্থাকে জানিয়া আপনাতে আপনি স্তব্ধ হইয়া যান। যেহেতু তাঁহাদের আর কিছু পাইবার নাই সেইজন্য তাঁহাদের চিত্তে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না এবং অনাবশ্যক বিষয়ে কথা কহিবার প্রবৃত্তির অভাব বশতঃ তাঁহারা সংযতবাক বা মৌন হইয়া থাকেন। এইরূপেই ভূতপ্রকৃতি হইতে যোগীদের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অবশ্য এবম্ভূত মুক্তিলাভ সাধারণ শক্তি ও সৌভাগ্যের কথা নহে। আচ্ছা, এইরূপ ইচ্ছারহিত অবস্থাকেই যদি চরমসৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সে সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিবেন তাঁহাদের দেহ-যাত্রা কিরূপে চলিবে? সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন মত ঈশ্বরেচ্ছায় সমস্ত বিষয়াদি আপনা আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সাধক সেই সকল বিষয় লাভে হর্ষিত হন না এবং তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তিও থাকে না। তথাপি সেই সকল বিষয় সিদ্ধিরূপে সাধকের নিকট

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

স্বয়ং উপস্থিত হয়। কিন্তু উহা সিদ্ধি হইলেও চরম সিদ্ধি বা পরাসিদ্ধি নহে। যখন সাধকের ভয়, দ্বেষ, সঙ্কল্পাদি কিছুই থাকে না, পরমাত্মনিষ্ঠ হেতু আত্মানন্দে মগ্ন পুরুষের ইন্দ্রিয়বিষয় আর তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ বা একটুও অশান্ত করিতে পারে না, অপ্রাপ্য বস্তু পাইবারও ইচ্ছা থাকে না, যাহা প্রাপ্ত তাহারও সংরক্ষণে তিনি উদাসীন—এইরূপ অবস্থাকেই পরাসিদ্ধি বলে। অথচ মজা এমনি যে তাঁহার ভূতপ্রকৃতির প্রয়োজনীয় কোন বস্তুর আবশ্যক হইলে তাঁহার ইচ্ছা হইবার পূর্ব্বেই উহা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি সত্যই কোন ইচ্ছা হয় তাহাও পূর্ণ হইতে বাকী থাকে না, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হওয়াই কঠিন। মন থাকিলে বিষয় ভোগ হয়, কিন্তু অমনস্ক পুরুষের নিকট বিষয় আসিলেও যা, বিষয় যাইলেও তাই, কখন কোনরূপ অভাব বোধ তাঁহার হয় না, সুতরাং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তাঁহার তুল্য বোধ হইয়া থাকে। ইঁহারাই পূর্ণকাম, ইঁহারাই পরাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১

অন্বয়। ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) মম সাধর্ম্ম্যং (আমার স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টি কালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্ম গ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না) ॥ ২

শ্রীধর। কিঞ্চ—ইদমিতি। ইদং—বক্ষ্যমাণং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য—ইদং জ্ঞানসাধনম্ অনুষ্ঠায়, মম সাধর্ম্ম্যং—মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ, সর্গেঽপি – ব্রহ্মাদিষু উৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি—প্রলয়ে দুঃখানি ন অনুভবন্তি। পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিয়া সকলেই আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ মদ্‌রূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা সৃষ্টিকালে (ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তি কালে) পুনরুৎপন্ন হন না, এবং প্রলয় কালেও প্রলয় দুঃখ অনুভব করেন না। অর্থাৎ পুনরায় তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে হয় না ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইহা জেনে যাহা কোন কর্ম্মই নয় অথচ একটা কর্ম্ম!! সে আপনার ধর্ম্মেতে এলে অর্থাৎ স্থিতি হইলে সুখেতেও তাহা নষ্ট হয় না—বিশেষ রূপে অন্য দিকে গেলেও তাহার নাশ নাই!! অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি।—পূর্ব্ব শ্লোক কথিত যে জ্ঞানের কথা বলিবেন ভগবান বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান-ফল এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং"—ভাঃ, ১ম স্কঃ। তৎ অদ্বয়ং জ্ঞানং তত্ত্বং বদন্তি। যে অদ্বয় জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এই তিন নামে অভিহিত হন, সেই জ্ঞানকে তত্ত্ববিদ্‌গণ "তত্ত্ব" বলেন। অদ্বয় অর্থে অদ্বিতীয়, কেবল যে 'চিৎ' মাত্র বস্তু বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যাহা ছাড়া বিশ্বে অন্য কোন বস্তু নাই। সেই জ্ঞানই তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ। এই জ্ঞান স্বরূপকে জানিবার সাধন আছে, তাহাকেও জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান সাধনের সম্যক্ অনুষ্ঠানে মৎস্বরূপতা প্রাপ্তি হওয়া যায়। অর্থাৎ এখন যেমন ব্রহ্ম

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

হইতে আপনাকে পৃথকরূপে বোধ হইতেছে সেই ভেদভাব মিটিয়া গেলে এক অদ্বিতীয় ভাবে সাধকের স্থিতি লাভ হয়। এই পরিস্থিতি হইলে আর তাঁহাকে জন্ম মরণের ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। যে সাধনার দ্বারা এই পরিস্থিতি লাভ হয়, তাহাকে এক প্রকার কর্ম্মই বলে বটে, কিন্তু সে কর্ম্ম অন্য সাধারণ কর্ম্মের মত ক্লেশ স্বীকার বা উদ্যম করিয়া করিতে হয় না, সে কর্ম্ম আপনা হইতেই হয়। সে কর্ম্ম—প্রাণকর্ম্ম। উহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া দিবারাত্র আপনাপনি চলিতেছে—কিন্তু তাহাতে স্থিতি নাই, কেবল চলন্। এই চঞ্চল প্রাণ-তরঙ্গের উৎপাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি অহরহঃ স্বস্ব বিষয় কর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে - যাহাকে অজ্ঞান তমঃ বলিয়া সাধুরা নিন্দা করেন। এই চাঞ্চল্য যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সংসারের কি বিভীষণ মূর্ত্তি!! জন্ম, জরা, মরণ, অভাবের শত শত ক্লেশ যেন হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে। উহার বিকট বদন হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই! এই চঞ্চল প্রাণই আবার বহু সৌভাগ্য বশে যখন স্বস্থানে আসিয়া মিলে, তখন তাহার নিজের ধাতে আসে। এই চঞ্চল প্রাণের নিজ ধাতে আসাই, তাহার স্বরূপে অবস্থান। উহা চিরস্থির, চিরনির্ম্মল, সুখ দুঃখ জন্ম মরণের অতীত ভাব। প্রাণের সুষুম্নায় স্থিতি হইতেই এই সকল অভয় পরম ভাব সকল প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, যখন এই স্থিতির একটুও ব্যত্যয় হয় না, সর্ব্বকালে সমান ভাবে চলিতে থাকে, তখন সুখভোগই কর আর দুর্ভোগই ভোগ কর—তোমার মন আর কিছুতেই বিচলিত হইবে না। এই অচল স্থিতিই ব্রহ্মপদ! জন্ম মরণের ক্লেশ তাহাদেরই হয় যাহারা এই অচল স্থিতিপদকে ধরিতে পারে না। যাঁহারা এই স্থির ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্ত প্রকৃষ্টরূপেই লয় হইয়াছে, উহাই প্রলয়। যাঁহার মনই নাই তাঁহার পক্ষে সৃষ্টিও নাই লয়ও নাই॥ ২

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) মহৎ ব্রহ্ম (মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ আমার প্রকৃতি) মম যোনিঃ (আমার গর্ভাধান স্থান); তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং দধামি (জগদ্বীজ নিক্ষেপ করি); ততঃ (তাহা হইতেই) সর্ব্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সম্ভবঃ ভবতি (উৎপত্তি হয়)॥ ৩

শ্রীধর। তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারম্ অভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং, ন তু স্বতন্ত্রয়োঃ ইতি ইমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চ অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ,বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাৎ ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তৎ মহদ্ ব্রহ্ম মম—পরমেশ্বরস্য যোনিঃ—গর্ভাধানস্থানম্। তস্মিন্নহং গর্ভং—জগদ্বিস্তার হেতুং চিদাভাসং, দধামি—নিক্ষিপামি। প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টি সময়ে ভোগযোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততঃ—গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভবঃ—উৎপত্তিঃ ভবতি ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসাদ্বারা শ্রোতাকে অভিমুখ করিয়া (অর্থাৎ শ্রোতাকে শ্রবণোন্মুখ করিয়া) প্রকৃতি পুরুষের সর্ব্বভূতোৎপত্তির প্রতি যে হেতুত্ব

তাহা পরমেশ্বরাধীন, স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের হেতুত্ব নাই, ইহাই যে বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ বক্তার বলিবার তাৎপর্য্য তাহাই বলিতেছেন]—প্রকৃতিকে মহৎব্রহ্ম বলা হয়, কারণ দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রকৃতি মহৎ, এবং বৃংহিতত্ব অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্ম সকলের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া প্রকৃতি ব্রহ্ম (নিরতিশয়)। সেই মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার (পরমেশ্বরের) যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান। তাহাতেই আমি গর্ভ অর্থাৎ জগদ্বিস্তার হেতু যে চিদাভাস তাহা ক্ষেপন করি। প্রলয়কালে অবিদ্যাকর্ম্মানুশায়ী জীব আমাতে লীন থাকে, সৃষ্টি সময়ে তাহার ভোগযোগ্য ক্ষেত্রের সহিত তাহাকে (জীবকে) সম্যক্ যোজনা করি। এইরূপ গর্ভাধান হইতেই ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥

[ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ ঈদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ—মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকার্য্যেভ্যঃ মহত্ত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্‌ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে। তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। সংভব উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ ততস্তস্মাদ্ গর্ভাধানাদ্ভবতি হে ভারত—এই প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই যে প্রাণিসৃষ্টির কারণ, তাহাই বলিতেছেন—আমার আত্মস্বরূপা—মদীয়া যে মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, সেই মায়াই যোনি অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ—যে কারণ এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য হইতে প্রধান এবং আত্মবিকারস্বরূপ সকল কার্য্যের ভরণ করিয়া থাকে, এই কারণে সেই প্রকৃতিই এই স্থানে মহৎ ও ব্রহ্ম এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। সেই মহৎ ও ব্রহ্মস্বরূপ যোনিতে আমি গর্ভের আধান করিয়া থাকি। এই স্থলে গর্ভ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভেরও জন্মহেতু বীজ অথবা সর্ব্বভূতের জন্মকারণস্বরূপ বীজ। সেই বীজকেই আমি সেই প্রকৃতিরূপ যোনিতে আহিত করি। (ইহার তাৎপর্য্য) ক্ষেত্র ক্ষত্রজ্ঞ এই দ্বিবিধ প্রকৃতই ঈশ্বরের শক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিমান পুরুষ ঈশ্বরই। সেই ঈশ্বরই অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে স্বরূপ গ্রহণ করিতে উদ্যত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া থাকেন (ভূতগণকে তাহাদের নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম্মানুরূপ ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করি)। এই প্রকার সংযোজনই গর্ভের আধান। সেই গর্ভাধানেরই ফল হইতেছে, সর্ব্বপ্রকার ভূতগণের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি। এই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির পরে হয়—লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত শাঙ্করভাষ্য ও তাহার অনুবাদ] ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমার যে যোনি, “সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ব্যাপক” যে ব্রহ্ম তাহার যে অণু, তাহার মধ্যে প্রবেশ করায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি—সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণুরূপে—যেখানে—গেলে কিছুই বলিতে পারে না—জিজ্ঞাসা করিলেও বলে যাহা তাহাই!!!!!!—পুনরায় সৃষ্টিক্রম ভগবান এখানে বলিতেছেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম। প্রজ্ঞাচক্ষু সাধকেন্দ্ররা ব্যতীত ইহা ধারণা করা কঠিন। তথাপি শাস্ত্রে এই সকল কথা পুনঃপুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাহ্যভাবে বুঝিতে গেলে

তাহা বলিয়াও শেষ করা যায় না, এবং শ্রোতারও সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা হয় না। যাহা নিজবোধরূপ, তাহা অন্ধের মুখে ঝাল খাইলে যাহা হয় তাহাই হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, নিরাকার, উৎপত্তি-বিনাশ বর্জ্জিত। তাঁহাকে এই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দ্বারা কি বুঝিবে? তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাঁহারাই একাংশ হইতেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অণুর মত, যাহা যোগীরা অনুভব করিতে পারেন, তাহারই মধ্যে ত্রিলোক বর্ত্তমান। ব্রহ্মঅণুর অর্দ্ধেকের তিন ভাগের এক ভাগ, এই মর্ত্ত্যলোক। তাহার মধ্যে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ। সেই সপ্তদ্বীপের এক ভাগ জম্বুদ্বীপ, সেই জম্বুদ্বীপের লক্ষ কোটী অংশেরও এক অংশ তুমি নহ। আবার তোমার মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ অণু সব রহিয়াছে। সেই সমস্ত অণু অনুভবের দ্বারা বোধগম্য। ভগবান কত সূক্ষ্মরূপে সেই অণুর মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাহা আর এ বুদ্ধির দ্বারা বুঝা অসম্ভব। অণুর মধ্যেই সব, সেই অণুই ব্রহ্ম যোনি।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি গুণাতীত নির্লিপ্ত ও অব্যক্ত, তিনিই আবার সর্ব্বগুণবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর। যাহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অনুভব করে না—তাহারা প্রপঞ্চেতে বর্ত্তমান থাকে তাই তাহারা সংসারকে দেখে ব্রহ্মকে দেখে না। মনের সঙ্কল্প হেতুই প্রপঞ্চ দর্শন। মনই সঙ্কল্প করিয়া বদ্ধ হয়, সঙ্কল্প না থাকিলে জীব মুক্ত হয়। এই অবস্থায় মন আপনি নিঃসঙ্গ হইয়া হৃদয়ে নিরুদ্ধ থাকে, এইরূপ থাকিতে থাকিতে উন্মনী ভাব হয়। এই উন্মনী ভাবই পরমপদ। মনেতেই সংসার ভাসে, এই জন্য মনক্ষয় যতদিন না হয় ততদিন ক্রিয়ার পর অবস্থা ভাল ভাবে হয় না, হইলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। উর্দ্ধ বিন্দু ও অধঃবিন্দুর মধ্যে মন, সেই মন মনেতে থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হয়, তখন কর্ত্তা বা করণ বলিয়া পৃথক কিছুই থাকে না।

আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া মন উপাধি ধারণ করে, এবং সেই মন হইতেই এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি। আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত গুণের স্থান, এই আজ্ঞাচক্রে অচল স্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতির কবল হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই। আজ্ঞাচক্রই ব্রহ্ম যোনি, আজ্ঞাচক্র হইতে নিম্নে অবতরণই মনের সংসারমুখী গতি। এইখানেই উর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ এবং অধোমুখ ত্রিকোণের স্থান। অধোমুখ ত্রিকোণ হইতেই সংসার প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়, এবং উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণের উর্দ্ধমুখই ব্রহ্মলোকের পথ। এইখানে স্থিতিলাভ হইলেই গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই আজ্ঞাচক্রই যোগমায়া'র পুর, এই পুরেতে যিনি থাকেন তিনিই পুরুষ, তিনিই মহেশ্বর বা উত্তম পুরুষ। এই মহেশ্বরের সহিত আদ্যাশক্তি অবিনাসম্বন্ধে নিত্যযুক্ত। কিন্তু গুণাতীত ব্রহ্ম বা পরশিবই মহেশ্বর বা পুরুষোত্তমেরও আদি। এই পরশিবই অবাঙ্মানসগোচর। এখানে প্রকৃতিও নাই পুরুষও নাই। পরে পুরুষোত্তম নারায়ণের মধ্যে এই শিবশক্তি সমভাবে সম্মিলিত, সেখানেও পরস্পরকে বিভিন্ন ভাবে দেখিবার উপায় নাই। পুরুষ প্রকৃতি অভিন্নরূপ হইলেও উহাই তাঁহাদের যুগলরূপ। একদিকে সগুণ, অন্যদিকে নির্গুণ ইহাই মহেশ্বর বা শিবশক্তি সম্মিলিত অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব। সারদা-তিলকে আছে:—

"নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ।
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সগুণ নির্গুণ ভেদে দুইটী বিভাব। ব্রহ্ম যখন মায়াতে অনুপহিত অর্থাৎ মায়াকে স্বীকার করেন নাই তখনই নির্গুণ, মায়াতে উপহিত হইলে তাঁহাকেই সগুণব্রহ্ম বলে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হন অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপহিত থাকেন তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারতত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপসনা হইয়া থাকে। মূল প্রকৃতিতে অনুপহিত যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা নাই। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জীবের অদৃষ্ট সংযোগে অথবা কোন দৈব-কারণ বশতঃ (যাহা কাহারও জানা নাই) তাদাত্ম্য সম্বন্ধযুক্ত কালে অধিষ্ঠান করিলে চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপভেদ মাত্র। ইনিও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত, এবং এখানেও গুণ সাম্যাবস্থা বর্ত্তমান। মূলপ্রকৃতিতে বিকৃতি নাই, কিন্তু কাল সাহচর্য্যে জীবের অদৃষ্ট নিবন্ধন এই আদ্যাশক্তিতে গুণ ক্ষোভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে আছে :—

"সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি প্রকৃত্যামনুবর্ত্ততে।
অদৃষ্টাজ্জায়তে সৃষ্টিঃ প্রথমেতু বরাননে॥
বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসীসৃষ্টিরুচ্যতে।
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাত্মিকা তথা।
আরম্ভ সৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে॥
ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্তল্লক্ষ বিশেষতঃ।
সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি যথাপূর্ব্বং সমাসতঃ॥"

দেবি! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকারের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ অদৃষ্টবশতঃ জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথম সৃষ্টি ও অদৃষ্ট সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। মূল প্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভই এই প্রথম সৃষ্টি।

বিবর্ত্তসৃষ্টিকে মানসীসৃষ্টি বলে। বেদান্তসারে কথিত হইয়াছে :—

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব্ব বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রূপান্তর হয়, তাহার নাম বিকার। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, এবং শব্দ তন্মাত্রাদির বিকার আকাশাদি। যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব্ব বস্তুর অন্যথা ভাব হয় না তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম কালে রজ্জুতে মিথ্যা সর্পের উৎপত্তি হইলেও, রজ্জুর স্বরূপ তখনও অব্যাহত থাকে, তাহাই বিবর্ত্তবাদ। এইরূপ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম

হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব অব্যাহত থাকে, পরন্তু এই রজ্জুতে সর্প কল্পনার ন্যায় মায়াকল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত স্বরূপ। ইহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি বা মানসী-সৃষ্টি নামে অভিহিত হয়। এই সৃষ্ট পদার্থ যখন বিকৃত প্রাপ্ত হইতে হইতে এক বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া অন্য বস্তুকে উৎপন্ন করে তাহাকে তৃতীয় সৃষ্টি বা পরিণাম সৃষ্টি বলে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র, এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তিই তৃতীয় সৃষ্টি বা পরিণাম সৃষ্টি। যখন পঞ্চীকৃত পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতে থাকে তখন তাহাকে চতুর্থ সৃষ্টি বা আরম্ভ সৃষ্টি বা যৌগিকী সৃষ্টি বলা যায়।

জীবের সমষ্টি অদৃষ্ট বশতঃ তাহাদের ভোগকাল সমুপস্থিত হইলে যখন আদ্যাশক্তিতে (মূল প্রকৃতি) গুণক্ষোভ হয়, তৎকালে প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হয়। চৈতন্যযুক্ত শক্তিও তখন ঐ তমোগুণে অনুপ্রবিষ্টা হন। এই তমোগুণ মহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যৎকালে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে সত্ত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই আদ্যাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাঁহাতে উপগতা হ'ন অথবা বিপরীত রতিতে প্রবৃত্তা হন। ইহাই আদ্যাশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যাশক্তির অনুপ্রবেশ। স্ত্রী-পুরুষ সহযোগে যেরূপ জীব সৃষ্টি সেইরূপ মহাকাল সংযোগে আদ্যাশক্তি হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হইতেছে।

প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে নাদের বা মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সত্ত্ব, রজ, তম ভেদে ত্রিবিধ। এই মহত্তত্ত্বই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই প্রথম সৃষ্ট বস্তু।

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে"—প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। গুণভেদে তাঁহারই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি হইয়াছে। রুদ্র জ্ঞানশক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ। গোরক্ষসংহিতায় আছে—

"ইচ্ছাক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধাশক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥"

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে আখ্যাতা। এই তিন শক্তি হইতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। এই ত্রিধাশক্তি রূপ জ্যোতিঃই প্রণবের প্রতিপাদ্য।

ক্রিয়াসারে উক্ত আছে :—

"বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ ॥"

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ হইত ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয়।

মূল প্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সহিত তাদাত্ম্যরূপে সম্মিলিত হইয়া আছেন। সুতরাং শক্তির

সহিত শক্তিমানের কোন ভেদ নাই। মায়া সঙ্কুচিত অবস্থাই ব্রহ্ম ভাব, সুতরাং তাহা অগোচর। ইহাই তুর্য্যাবস্থা, কৈবল্যাবস্থা ও অবাচ্য; ইহাই মহাকারণ দেহ, কৈবল্যজ্ঞান দেহ ও বিদেহ; উহাই পরা, পরাপরা ও নিঃশব্দ বাক্। উহাই অগোচরী, উন্মানী ও ব্রহ্ম। ইহাই সূক্ষ্মবেদ ও অগোচর, উহাই হৃদয়াকাশ, অগোচর শূন্য ও সর্ব্বশুদ্ধাতীত, উহাই ঈশ, অঘোর ও নিরাকার। উহাই মসূরমাত্র দীপকং ও সোঽহং ব্রহ্মদ্বারা সূচিত।

এই ভাণ্ড (দেহ) ও ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন, একই রূপ গুণ সমাবেশে নির্ম্মিত, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে দেহেও তাহাই আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড বা দেহ সমস্তই প্রণবরূপ। সর্ব্ব দেবস্থান এই দেহ মধ্যে সন্নিবিষ্ট। প্রণবের অকার স্বরূপ ব্রহ্মা পৃথ্বীতত্ত্ব মূলাধার চক্রে অবস্থান করিতেছেন, উকার স্বরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি জলতত্ত্ব স্বাধিষ্ঠান চক্রে, মকার স্বরূপ রুদ্র তেজস্তত্ত্ব মণিপুর চক্রে, নাদ স্বরূপ ঈশ্বর বায়ুতত্ত্ব অনাহত চক্রে, বিন্দু স্বরূপ মহেশ্বর আকাশতত্ত্ব বিশুদ্ধ চক্রে, কলাস্বরূপ পরশিব মনোরূপে আজ্ঞাচক্রে, কলাতীত পরব্রহ্ম বা পরমাপ্রকৃতি সহস্রার চক্রে অবস্থান করিতেছেন।

এই সপ্ত চক্রই প্রণবের সপ্তাঙ্গ, এবং বহির্দৃষ্টিতে ইহাই সপ্ত আম্নায়। এই সপ্ত আম্নায়কে বুঝিতে পারিলেই সব বুঝা শেষ হয়। প্রথম আম্নায়ে সৃষ্টি (মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী প্রাণ শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয় আম্নায় স্থিতি (লিঙ্গমূলে স্থিতিরূপ বিষ্ণু), তৃতীয় আম্নায়ে সংহার, নাভিদেশে রুদ্ররূপ—নাভিশ্বাস আরম্ভ হইলেই জীবের মৃত্যু। চতুর্থ আম্নায়ে অনুগ্রহ—ভক্তি হইলেই ভজন হয়, তাহাতেই অনাহত স্থিত অনাহত শব্দই ঈশ্বর কৃপা, তখন হৃদয়স্থ ঈশ্বরের কৃপা অনুভব হয়। পঞ্চম আম্নায়ে অনুভব—বিশুদ্ধ চক্রে কণ্ঠে প্রাণের স্থিতি হইলেই অনুভব পদ লাভ হয়। ষষ্ঠ আম্নায় আজ্ঞাচক্রে নিরনুভব, অনুভবাতীত অবস্থা। এবং সপ্তম-আম্নায় সহস্রার পরব্যোম।

প্রথম আম্নায়ের জ্ঞেয় কুণ্ডলিনীশক্তি, দ্বিতীয় আম্নায়ের গম্য নারায়ণ বা পুরুষোত্তম, তৃতীয় আম্নায়ের জ্ঞেয় কাল, চতুর্থের গম্য বিজ্ঞান পদ, পঞ্চমের শূন্য, ষষ্ঠের গম্য ব্রহ্ম, সপ্তমের জ্ঞেয় পরব্রহ্ম বা পরব্যোম।

প্রথম আম্নায়ের সাধন কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইবার জন্য মন্ত্রযোগ ও হঠযোগ। দ্বিতীয় আম্নায়ের সাধন ভক্তিযোগ ও লয়যোগ; তৃতীয় আম্নায়ের সাধন ক্রিয়াযোগ ও লক্ষ্য বা ধ্যানযোগ, চতুর্থ আম্নায়ের সাধন জ্ঞানযোগ ও উরোযোগ (হৃদয়গ্রন্থিভেদের সাধনা), পঞ্চম আম্নায়ে পরাযোগ ও সন্ন্যাস, ষষ্ঠ আম্নায়ে অমনস্কযোগ ও শাম্ভবী যোগ, সপ্তম আম্নায়ে সহজ-যোগ ও মোক্ষ সাধন হইয়া থাকে।

এই সকল যোগ সাধনের করণও আম্নায় ভেদে বিভিন্ন। প্রথম আম্নায়ের করণ নাসিকা, শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বার, এই শ্বাসপ্রশ্বাস লইয়াই প্রথম আম্নায়ের সাধন। এই শ্বাস স্থির না হইলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হন না। দ্বিতীয় যোগের করণ জিহ্বা—এই জিহ্বা তালুকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তবে বাক্য সংযত হয়, এবং বাক্য সংযমের সহিত ইচ্ছার নাশ হয়। তাহাই ভক্তি-যোগ—যখন মনোগতি অন্যকিছুতে না যাইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মে মগ্ন হয়। তৃতীয় আম্নায় যোগাভ্যাসের করণ চক্ষু, এই চক্ষুর লক্ষ্য ভ্রূমধ্যস্থ হইলে মন ঐকান্তিক লক্ষ্যের প্রতি নিযুক্ত

হয়। দৃষ্টি স্থির না হওয়া পর্যন্ত মন চতুর্দ্দিকে, বহু বিষয়মুখে ধাবিত হয়। চতুর্থ আম্নায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ ত্বক্। কুম্ভকের দ্বারা হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ ঠোকর, এই ঠোকর ক্রিয়াদ্বারা চর্ম্মের মধ্যে যে মোহময়ী শক্তি আবৃত রহিয়াছে তাহার শোধন হয়, এই চর্ম্মের আকর্ষণই সর্ব্বাপেক্ষা মোহময়ী আকর্ষণ, কামসঙ্কল্পের প্রধান স্থান। এই সাধনের পরিসমাপ্তিতে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইয়া দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হয়। পঞ্চম আম্নায়াস্থ যোগাভ্যাসের করণ কর্ণ। কর্ণ শুদ্ধ হইলে মন অত্যন্ত অন্তর্ম্মুখ হয়। শব্দই আমাদিগকে জগতের সহিত নানা সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেয়, শব্দের বন্ধন যদিও শুদ্ধ তথাপি খুব দৃঢ়। শেষ পর্য্যন্ত উহা থাকে। সমস্ত তত্ত্ব আকাশতত্ত্বে মিলিয়া যাইলে এক অনির্ব্বচনীয় শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, যদ্দ্বারা ভববন্ধন ছুটিয়া যায়। ইহাই ভগবন্নাম শ্রবণ। এই শব্দে তন্ময় হইলেই ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ এবং জ্যোতিঃর অন্তর্গত শুদ্ধ মনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই "মন"ই ষষ্ঠ আম্নায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ। "মনঃস্থং মনমধ্যস্থং মনস্থং মনোবর্জ্জিতং। মনসা মনমালোক্য স্বয়ং সিদ্ধন্তি যোগিনঃ॥" বাহিরের দিক দিয়া এই ষষ্ঠ আম্নায়ের করণ প্রাণ। তাই প্রাণ ক্রিয়া করিলে যত শীঘ্র মন মনেতে প্রবেশ করে এত শীঘ্র আর অন্য কিছুতে হয় না। সপ্তম আম্নায়ের যোগাভ্যাস সমাধিতে স্থিতি লাভ। বাহ্যভাবে এই সপ্তম আম্নায়ের করণ হইল মৃত্যু, বাস্তবিক সমাধি ও মৃত্যু একই কথা।

তাহা হইলে "মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম"—মহদ্‌ব্রহ্মই যে ভগবানের যোনি অর্থাৎ গর্ভাধান স্থান এবং মহদ্‌ব্রহ্মই বা কি তাহা বুঝা গেল। এই মহদ্‌ব্রহ্মে গর্ভাধানই দ্বিতীয় বা বিবর্ত্ত সৃষ্টি। এখানে মূল সত্তা অবিকৃত, কেবল কল্পনায় জগৎ রচিতবৎ বোধ হইতেছে। এই মহৎব্রহ্মরূপ যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের বহুরূপে প্রকাশ। মহৎব্রহ্ম, ব্রহ্মাই সমষ্টি মন, ইহাতেই ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বকে উৎপন্ন করেন। "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে"—যিনি হৃদা অর্থাৎ স্বকীয় ইচ্ছার প্রভাবে আদিকবয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার চিত্তে, ব্রহ্ম—ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান তেনে—বিস্তার করিয়াছিলেন—ভাঃ ১ম স্কঃ। ব্রহ্মাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মন, এই মনই সঙ্কল্পের স্থান। মন না থাকিলে কিছু হইবার নহে, তাই যেন ব্রহ্মের মনঃস্বরূপ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন। বিশ্বসৃষ্টির সঙ্কল্প এই মনেই বর্ত্তমান থাকে। "বিদ্ধি মায়া মনোময়ম্"—ভাঃ ১১শ স্কঃ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই মন থাকে না, ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় যেখানে সঙ্কল্প হইতে না হইতেই সব হয়—এমন যে ব্রহ্ম-অণু যাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম অণুর মধ্যে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট ইহাই তাঁহার একাংশ, ইহাই ব্রহ্ম-যোনি, এখানে নিজ সঙ্কল্প কিছুই নাই, কিন্তু অনিচ্ছার ইচ্ছায়—এই স্থান হইতেই সমস্ত বিষয়ের স্ফুরণ হয়। তথাপি বিনা সঙ্কল্পে যাহা বলেন, তখনই তাহাই হয়—ইহাই ব্রহ্মযোনি। এই ব্রহ্মযোনিই ভগবানের স্বশক্তি, ইহার নিজস্ব কোন কামনা বা সঙ্কল্প নাই, কিন্তু জীবের অদৃষ্ট বশতঃ যখন এই অনিচ্ছার ইচ্ছারূপে সঙ্কল্প জাগ্রত হয়, তখনই শক্তি ক্রিয়াবতী হয়, ইহাই তাঁহার গর্ভধারণ। ইহাই তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা। জীবের অদৃষ্ট ইহার হেতু এই জন্য বলা হয়। যদিও অদৃষ্ট কর্ম্মবশেই হইয়া থাকে, কিন্তু জীবের যেমন আদি নাই, তেমনি কর্ম্মের আদিও কোথাও নাই। জীব মৃত্যুকালে কামনা লইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, সুতরাং

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

তাহার উৎপত্তির বীজ তাহার মধ্যেই লীন থাকে। সমস্ত জগতের প্রলয়েও জীবের কর্ম্ম শেষ হয় না, সুতরাং প্রলয়ের পর আবার তাহার উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব। প্রলয়কালে জীব কর্ম্মসহ মহৎব্রহ্মে লীন হয়, মহৎব্রহ্ম প্রকৃতিতে সুপ্ত হন। আবার সৃষ্টিকালে কাম-কর্ম্মানুযায়ী জীবকে স্ব স্ব অদৃষ্ট ভোগের জন্য ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করিবার যে চেষ্টা তাহাই গর্ভাধান ক্রিয়া। এই গর্ভাধানকর্ত্তাই সগুণ ব্রহ্ম।

পরে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতত্ত্বের সৃষ্টি—ইহাই বিকার সৃষ্টি বা পরিণাম সৃষ্টি। এই তৃতীয় সৃষ্টির পর যখন অপঞ্চীকৃত পরমাণু সকল জীবের অদৃষ্ট বশতঃ পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূল দেহ ও অন্নাদি উৎপন্ন করে তাহাই চতুর্থ সৃষ্টি বা যৌগিক সৃষ্টি। অর্থাৎ প্রথম ব্রহ্মরূপ ক্রিয়ার পরাবস্থা হইতে তৎপরাবস্থায় কূটস্থ জ্যোতিঃর মধ্যে বিন্দুরূপা মহাশক্তির আবির্ভাব, পরে শুদ্ধ সঙ্কল্প যাহাতে নিজ ভোগেচ্ছা থাকে না। অথচ ব্রহ্মাণ্ড বীজ কারণ সলিলের মধ্যে ভাসমান। পরে বিবিধ বস্তুর বিবিধ পরমাণুর প্রকাশ, তৎপরে স্থূলতম পিণ্ডভাব। কিন্তু পিণ্ডভাবই থাকুক অথবা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ভাবই থাকুক —সবই ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মস্বরূপ। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম কিরূপে বহু কোটী ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন এবং সেই বিশাল বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্ব জীব সহ আবার কিরূপে অণুর স্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করে, এবং সেই অণু কিরূপে অব্যক্ত মধ্যে বিলীন হয়, তাহা পরম রহস্যময় ব্যাপার !! ৩

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) সর্ব্বযোনিষু (সর্ব্ব যোনিতে) যাঃ (যে সকল মূর্ত্তয়ঃ (মূর্ত্তি সমূহ) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), মহদ্ব্রহ্ম (মহদ্ব্রহ্ম) তাসাং যোনিঃ (তাহাদের মাতৃস্থানীয়া), অহং বীজপ্রদঃ পিতা (আমি বীজদাতা পিতা) ॥ ৪

শ্রীধর। ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠিতাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাম্ অয়ং ভূতোৎপত্তি-প্রকারঃ, অপিতু সর্ব্বদৈব ইত্যাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্ত্তয়ঃ—স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে, তাসাং—মূর্ত্তীনাং মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ যোনিঃ—মাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ পিতা—গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [কেবল যে সৃষ্টি উপক্রমেই মদধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি পুরুষ দ্বারা ভূতোৎ-পত্তি হয় তাহা নহে, পরন্তু ঐরূপে সর্ব্বদাই ভূতোৎপত্তি হইয়া থাকে ; এতদর্থে বলিতেছেন] —মনুষ্যাদি সকল যোনিতে যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি সকল উৎপন্ন হয়, সেই সকল মূর্ত্তির মহদ্ব্রহ্ম বা প্রকৃতিই মাতৃস্থানীয়া আর আমিই গর্ভাধান কর্ত্তা পিতা ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যত যোনি হইতে মূর্ত্তি সব হইতেছে সে একটু একটু পৃথক্ পৃথক্ যোনি—সে সকল যোনির মধ্যেও ব্রহ্ম আছেন, তাহাও ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি—কিন্তু সে বিভক্ত অবিভক্ত ব্রহ্ম মহৎ যোনি, আমি—তাহার বীজ ব্রহ্মের অণুস্বরূপেতেই আছি এবং প্রকৃষ্টরূপে—দ শব্দে যোনি-তাহাতেই রেখে দিই অর্থাৎ আপনাতে আপনি রাখি—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা—আবার

আমি পিতা অর্থাৎ শক্তি পূর্ব্বক আপনা হইতে আপনার মূর্ত্ত্যন্তর—কুটস্থের স্বরূপ- ব্রহ্ম !! অর্থাৎ আত্মজ—অর্থাৎ পিতা, পিতাই পুত্র !!! পুত্রই পিতা !!! —দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু, মৃগাদিযোনিতে যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয় ব্রহ্মই তাহার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি কারণ এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। এই মহদ্‌ব্রহ্মই বা কে এবং আমিটীই বা কে ? যাহা না থাকিলে কিছু হয় না সেই ব্রহ্মই মহদ্‌ যোনি, বা পরম কারণ। যদিও যত যোনি হইতে যত মূর্ত্তি প্রকট হইতেছে, সে সকলের যোনিও ব্রহ্ম, কারণ সবই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, ব্রহ্ম না থাকিলে কোন কিছুরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হইত না। সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম মহৎ যোনি, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে সমস্ত বিভক্ত যোনি অবিভক্ত রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সকল সময়েই তো সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান কিন্তু সকল সময়ে বা সর্ব্বত্রে প্রকাশ হয় না কেন ? কারণ অহং জ্ঞানের অভাবে। যোনি হইতে প্রকাশিত হইতে হইলে অহং জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অহং জ্ঞান যখন একেবারে মিটিয়া যায় তখন ব্রহ্মাণ্ড ও তদতিরিক্ত স্থানে বিশাল ব্রহ্মই কেবল পড়িয়া আছেন, কেবল সত্তামাত্র ভাবে, তাহা আছে বলিবারও কোন দ্বিতীয় সেখানে কেহ নাই। পরে যখন অহং জ্ঞান স্ফুরিত হয়, সেই অহং এর মধ্যেও তিনি—তখন সেই "অহং" ই কূটস্থ চৈতন্যরূপে প্রতি-বিম্বিত হন এই অহং-ই ব্রহ্মাণুরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। এই ব্রহ্মাণু বা কূটস্থ ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে, অর্থাৎ আপনার মধ্যেই আপনি থাকে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা মহৎ অর্থাৎ বিশ্বময় একাকার ছিল, তাহাই শক্তিপূর্ব্বক ক্রিয়া করিলে পিতা হইতে যেমন পুত্র উৎপন্ন হয় সেইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কূটস্থ স্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বদেহের মধ্যে প্রকাশিত হন। কখনও পিতা পুত্র হন, কখনও পুত্র পিতা হন। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কূটস্থ জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে, কখনও কূটস্থ জ্যোতিঃ হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রকাশিত হইতেছে !! কূটস্থ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা একেরই মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। আমিটী তাহা হইলে বীজ, ব্রহ্মাণুরূপে সর্ব্বত্র সম্প্রবিষ্ট, এবং মহদ্‌ ব্রহ্ম—বিরাট ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা বিশ্বভুবনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে—অথবা সমুদ্র হইতে তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায়—যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড পুনঃপুনঃ উঠিতেছে ও ডুবিতেছে ! এই ক্রিয়ার পর অবস্থা ও কূটস্থ কি ভাল করিয়া বুঝিলে আর পুরুষ, প্রকৃতি, ব্রহ্ম, মায়া, সগুণ, নির্গুণ লইয়া গোলে পড়িতে হয় না।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে আছে—"যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন।" পরমাত্মার উপাধিই হইল এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ বা প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্যের খেলা যতক্ষণ ততক্ষণই বদ্ধভাব বা জীবভাব। প্রকৃতি পুরুষ একেরই ভিন্ন উপাধি মাত্র। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় গুণসঙ্গ রহিত হন তখন তিনি নির্গুণ, তখন তাঁহার উপাধি পুরুষ, যখন তিনি বাহ্য ব্যাপারে লিপ্ত হন তখন তিনি গুণযুক্ত, তখন তাঁহার উপাধি প্রকৃতি।

প্রকৃতির মধ্যে তমোভাব প্রবল হইলে তাহা জড় দৃশ্যরূপে প্রকটিত হয়, প্রকৃতির মধ্যে রজঃ ও সত্ত্ব ভাব থাকিলে মনুষ্যভাব প্রকটিত হয় এবং প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশিত থাকিলে দেবশরীর রূপে প্রকটিত হয়। আত্মা প্রকৃতিস্থ হইলেই তাঁহার মন উপাধি হয়, এবং সেই মন হইতেই এই সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত গুণের স্থান, আজ্ঞাচক্রে মনের স্থিতি সম্যক্‌রূপে হইলেই জীব প্রকৃতিমুক্ত হইতে পারে। তখন কোন উপাধিও থাকে না, সৃষ্টিও থাকে না। কিন্তু যিনি আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উঠেন কিন্তু স্থিতিলাভ করেন না তিনি প্রকৃতির অধীন থাকেন এবং এই প্রপঞ্চ জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। সুতরাং যে স্থান পর্য্যন্ত গুণের স্থান বা আরম্ভ, সেই স্থানে স্থিতি লাভ করিলে গুণের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় তাহাই যোনি অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ, অতএব এই আজ্ঞাচক্রই ব্রহ্মযোনি বা মহদ্‌ব্রহ্মের স্থান। তাহা হইতেই ভূত সমূহের উৎপত্তি বা সৃষ্টি। আজ্ঞাচক্রের অধোদেশে নামিলেই ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং সেই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টি ॥ ৪

অন্বয়। মহাবাহো! (হে মহাবাহো) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ (প্রকৃতি সম্ভূত গুণত্রয়) অব্যয়ং দেহিনং (অবিনাশী আত্মাকে) দেহে (দেহ মধ্যে) নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করে) ॥৫

শ্রীধর। তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি সত্ত্বমিত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ বা চতুর্ভিঃ। সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি ত্রয়োগুণাঃ, প্রকৃতিসম্ভবাঃ—প্রকৃতিঃ সম্ভব উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ, তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্‌ত্বেন অভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং, দেহিনং—চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং—নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি—স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখ-মোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [পরমেশ্বরাধীন প্রকৃতি পুরুষ হইতে সর্ব্বভূতোৎপত্তি নিরূপণ করিয়া ইদানীং প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের সংসারাবস্থা বিষয় চারিটী বা চতুর্দ্দশ শ্লোকদ্বারা বিস্তৃত ভাবে বলিতেছেন]—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটী গুণ প্রকৃতি হইতে সম্ভব—(তাদৃশ রূপে যাহাদের উদ্ভব কথিত)। গুণ সকলের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, গুণত্রয় পৃথক ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃতির কার্য্য যে শরীর তাহাতে তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থিত দেহীকে সুখ-দুঃখ-মোহাদিতে বদ্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত করে। দেহী চিদংশ, সেই চিদংশ বস্তুত অব্যয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নারূপ যন্ত্রে আরূঢ় রহিয়া যাহা পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকারের সহিত আত্মা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া এই দেহেতে দেহী আত্মা অবিনাশী কূটস্থ ব্রহ্ম আবদ্ধ !! সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ—ক্রিয়ার পর স্থিতি রূপ ঢাকের কাটি গুড়ুম করে পড়বে।—আচ্ছা, দেহী তো জন্ম জরা মরণাদি রহিত, তবে সত্ব, রজঃ, তমোগুণ ও তদুৎপন্ন সুখ দুঃখ মোহাদি তাঁহাকে কিরূপে

বদ্ধ করে ? প্রলয় কালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতি ও ত্রিগুণে কোন ভেদ নাই। প্রকৃতিতে বৈষম্য আরম্ভ হইলেই ত্রিগুণ প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই জীব ও জগৎ সব সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। প্রকৃতি হইতে গুণ গুলি উৎপন্ন হইয়া এই দেহেই তাহারা অবস্থিতি করে। জীবাত্মা জন্ম মরণ জরাদির অতীত হইলেও দেহেতে তাদাত্মভাব প্রযুক্ত দেহস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম্ম শোক মোহাদি তদ্দ্বারা দেহীকে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে। যেমন দেহাশ্রিত ছায়া দেহীকে আবৃত করে মনে হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ-আত্মার আশ্রিত যে গুণ, তাহা যেন আশ্রয়দাতা ক্ষেত্রজ্ঞকে বন্ধন করে এইরূপ মনে হয়।

গুণই শক্তি। গুণ কোথা হইতে আসে এবং কেনই বা আসে ? শক্তিমানের মধ্যে যেমন শক্তি অন্তর্নিহিত, সে শক্তির খেলা তিনি যে সর্ব্বদাই দেখান তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই দেখাইতে পারেন, সেইরূপ গুণীর মধ্যে গুণ সর্ব্বদাই অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, যখনই প্রকাশ হয়—এই প্রকাশও স্বাভাবিক তজ্জন্য কোন সঙ্কল্প করিতে হয় না—তখনই শক্তিমানের শক্তিকে আমরা বুঝিতে পারি। যখন এই শক্তি তাঁহার মধ্যে সুষুপ্তাবস্থায় থাকে, দীর্ঘকাল ধরিয়াও জাগ্রত হয় না—সেই অবস্থাই নির্গুণ, নিস্পন্দিত ভাব। উহাই প্রকৃতির সাম্যভাব, পুরুষ ও প্রকৃতি তখন যেন শিবগৌরীরূপে এক অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ঋষিরা ধ্যানযোগে সেই বিশ্বকারণ শক্তিকে দেখিয়াছিলেন :—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥" শ্বেতাশ্ব উঃ

স্বপ্রকাশ মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরের আত্মভূতা শক্তিকে তাঁহারা কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই যে শক্তি ইনিই মায়া বা প্রকৃতি। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় ইহা জড়া নহে। ইহা তাঁহারই নিজ শক্তি। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" এই মায়াই পরাপ্রকৃতি। ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় (প্রেরণায়) চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই শক্তি স্বগুণ (সত্ত্বরজতমোনামক গুণ ও স্বীয় কার্য্য পৃথিবী জলাদি) দ্বারা আচ্ছাদিত, কারণ মাত্রেই স্বীয় কার্য্য দ্বারা আবৃত থাকে, অর্থাৎ কারণের আকার কার্য্যের আকারে লুক্কায়িত থাকে, সেই জন্য কারণ বস্তুটিকে ধরিতে পারা যায় না।

এই বিশ্বজননী শক্তি যাঁহার সেই দেবতা কালাত্মযুক্ত অর্থাৎ সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতা, যিনি সেই সকল কারণকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন—সেই যে ভগবানের স্বীয় শক্তি তাঁহাকে তাহারা দর্শন করিয়াছিলেন।

যেমন অগ্নিতে জ্বলন স্বাভাবিক, সে প্রকাশের জন্য কোন আয়াসের প্রয়োজন হয় না সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে শক্তির হিল্লোল অত্যন্তই স্বাভাবিক। বিনা প্রযত্ন বা সঙ্কল্পেই তাহা স্ফুরিত হয়। যখন স্ফুরণ আরম্ভ হয়, তখনই উহা তাঁহার সঙ্কল্প এইরূপ মানিয়া লওয়া হয়। এই শক্তি গতিশীলা, স্পন্দনধর্ম্মী, কিন্তু কোন গতিই স্থিতিশীল কোন সত্তায় যুক্ত না হইয়া গতিশীল

(সত্ত্বগুণের বন্ধন)

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

হইতে পারে না। এই গতিটী চিরন্তন নহে বলিয়া উহাকে মিথ্যা বা মায়া বলা হয়। কিন্তু স্থিতিশীলতা তাঁহার মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান। এইজন্য জলে পতিত চন্দ্রিকারই চাঞ্চল্য দৃষ্টি হয়, কিন্তু চন্দ্রিকার চাঞ্চল্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে যে স্বাভাবিক জ্ঞান-কৌমুদী বিচ্ছুরিত হয় তাহা সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্য বিক্ষেপাদি ধর্ম্ম শূন্য, সেই জন্য তাহা চিরস্থির, চিরনির্ম্মল, সুতরাং নিত্য অবিনাশী। সেই ব্রহ্মকিরণ মায়া স্পর্শে মায়ার চঞ্চলত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা চঞ্চলবৎ মনে হয়। প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ না হইলে তো সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলেই প্রাণ চঞ্চল হয়, এবং সেই চঞ্চল প্রাণই সত্ত্ব,রজঃ, তমোগুণরূপে এবং তাহার বাহন ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ী মুখে প্রবাহিত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব মন, বুদ্ধি অহঙ্কারে পরিণত হইয়া এই জগৎ খেলা আরম্ভ করিয়া দেন, তখন এই সকল বস্তুতে আত্মবোধ হওয়ায় ইহাদিগের পানে আসক্তি পূর্ব্বক ক্ষেত্রজ্ঞ দৃষ্টিপাত করেন। এই কারণেই নিত্যমুক্ত অবিনাশী কূটস্থ দেহী দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যান। এই দেহই যেন তাঁহার নিজের এবং উহা তাঁহার সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে হয় ইহাই দেহীর বদ্ধাবস্থা। আবার এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি যে শুদ্ধ মুক্ত, সেই শুদ্ধ মুক্ত স্বভাবকেই প্রাপ্ত হন। প্রাণই চঞ্চল হইয়া এত গোলযোগ উৎপন্ন করিয়াছে, তাই অতি যত্নে প্রাণের চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ করিতে হইবে। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর স্থিতি হইলেই সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্ত আত্মা নিজ মহিমায় নিজে বিরাজ করিবেন ॥ ৫

অন্বয়। অনঘ! (হে নিষ্পাপ) তত্র (সেই সকলের মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (নির্ম্মল বলিয়া) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ম্ (নিরুপদ্রব) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) [আত্মাকে] সুখসঙ্গেন জ্ঞান-সঙ্গেন চ (সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা) বধ্নাতি (বন্ধন করে) ॥ ৬

শ্রীধর। তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারং চাহ—তত্রেতি। তত্র—তেষাং গুণানাং মধ্যে, সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ—স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং—ভাস্বরম্। অনাময়ং—নিরুপদ্রবং, শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গঃ তেন চ বধ্নাতি। প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গঃ তেন চ বধ্নাতি। হে অনঘ—অপাপ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মান্ তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও তাহার বন্ধকত্বের প্রকার বলিতেছেন]—সেই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্ব স্ফটিক মণির ন্যায় প্রকাশক অর্থাৎ ভাস্বর এবং অনাময় অর্থাৎ নিরুপদ্রব শান্ত, অতএব শান্ত বলিয়া স্বীয় কার্য্য যে সুখ তাহার সহিত যে সঙ্গ বা আসক্তি, তদ্দ্বারা আবদ্ধ করে। আর সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্ব হেতু স্বকার্য্য যে জ্ঞান তাহার

সহিত যে সঙ্গ বা আসক্তি, তদ্দ্বারাও আবদ্ধ করে। হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন, 'আমি সুখী' 'আমি জ্ঞানী' প্রভৃতি মনোধর্ম্ম সকলকে তদভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজনা করিয়া থাকে ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেখানে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাতেই ময়লা—ইহা ছাড়া আত্মাতে থাকা নির্ম্মল। কূটস্থ ব্রহ্ম!! নির্ম্মল কোন বস্তু হইলেই প্রকাশকে পায়—যে তলওয়ারে মরচে লেগেচে তাহা পরিস্কার ক্রিয়ার দ্বারা করিলে—যাহা গুরু বক্ত্র গম্য—সেই তলওয়ারেতে এরূপ প্রকাশ হয় যে আপনার মুখ তাহাতে দেখা যায়। ইহাই পাতঞ্জল সূত্রে বলিয়াছেন "স্বরূপ দর্শনং" (অর্থাৎ প্রকৃতিজ দর্পণে আপনার রূপ আপনি দেখা যায়) যখন আপনাকে আপনি দেখিল ও আপনি ব্রহ্ম হইল তখন সবই ব্রহ্ম! ও সবই দেখিল সুতরাং প্রকাশই রূপ—ব্রহ্মের; ইহার নিমিত্তই স্বপ্রকাশ স্বরূপ বেদান্তে কহিয়াছে। যখন সব এক বস্তু হইল তখন বিশেষ নাশ হইয়া অন্য বস্ত্বন্তর কি প্রকারে হইবে—অতএব অবিনাশী—বিকার রহিত—আসক্তি পূর্ব্বক অন্য বস্তুতে সুখাভিলাষ করিলে নিঃশেষরূপে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাহা ছাড়িয়া আত্মাতে আপনি থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে মুক্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, সত্ত্বগুণে সেই আবরণ নষ্ট করে, এই জন্য ইহা প্রকাশক। সত্ত্বগুণের এই প্রকাশকত্ব গুণ থাকায় যে বস্তুর যাহা স্বরূপ তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে। রজস্তমগুণের মত ইহা বিক্ষেপ ও আবরণ যুক্ত নহে বলিয়া ইহা বস্তুর যথার্থ রূপকে প্রকাশ করে, তাহাতে আমরা কোন বস্তু গ্রহণযোগ্য বা কোন বস্তু ত্যাগযোগ্য তাহা বুঝিতে পারি, ইহাতে ভ্রমদর্শন হয় না বলিয়া ইহা সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব শূন্য। কিন্তু অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণজনিত যে প্রকাশ ধর্ম্ম তাহাতে জ্ঞান জন্মায় বটে, কিন্তু উহা মিশ্রজ্ঞান অর্থাৎ তাহার সহিত রজস্তম ভাব মিলিত, তাহা নানাত্ব জ্ঞানের প্রকাশক, উহা কথঞ্চিৎ সুখময় বলিয়া জীবকে সেই সকল খণ্ডিত সুখে আবদ্ধ করে, এতদ্বারা অখণ্ডজ্ঞান যাহা শুদ্ধ আত্মার ধর্ম্ম তাহা এ জ্ঞান নহে, যাহাকে পরাবিদ্যা বলে যদ্দ্বারা আত্মদর্শন হয় উহাও জ্ঞান নহে। সুতরাং এ জ্ঞান দ্বারা বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া জীব বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। আলোচনাত্মক দর্শন শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানজাত জ্ঞান দ্বারা দ্রব্যাদির গুণের যে জ্ঞান হয়, তাহা এই জাতীয় জ্ঞান। ইহার সঙ্গ ত্যাগও কম কঠিন নহে। আত্মাতে যে মনের ঐকান্তিক স্থিতি তাহাই সত্য জ্ঞান ও উহা সত্য জ্ঞানের প্রকাশক। উহার লক্ষণ হইতেছে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ আনন্দ, উহা একমাত্র আত্মারই ধর্ম্ম। এই আত্মাতে না থাকিয়া মন পঞ্চতত্ত্বে থাকিলে মনে নানারূপ ময়লা লাগে, এবং তাহার স্বচ্ছতার হ্রাস হইয়া যায়। তরবারিতে মরিচা পড়িয়া গেলে যেমন তাহা অস্বচ্ছ হয় ও তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না তদ্রূপ মন সমল থাকিলে তাহাতে আত্ম প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। আবার তরবারিকে ঘসিলে যেমন উহা পরিষ্কৃত হইয়া চক্ চক্ করে, এবং তাহাতে নিজের মুখও দেখা যায়, তদ্রূপ ক্রিয়ার দ্বারা মন বিকল্পশূন্য হইলে তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়, সেই স্বচ্ছ শুদ্ধ মনের মধ্যে আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুর মধ্যে যে সুখাভিলাষ আশা, তাহাই মনের চঞ্চল ভাব।

মন যতদিন চঞ্চল থাকে ততদিন আত্মার বিশুদ্ধ ভাব প্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্য কি করিতে হইবে কবির সাহেব বলিয়াছেন—

"কবির,ꣳশিকলিগর্ কিজিয়ে, শব্দ, মস্কলা দেই।
মন্‌কা ময়েল ছোড়ায়কে, চিৎদরপণ করি লেই॥"

অস্ত্রপরিষ্কারক যন্ত্রের নাম শিকলিগড়, কামারের জাঁতা; তাহাতে অস্ত্র শান দিতে হইলে অস্ত্রকে আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত সেই শান প্রস্তরের চাকায় বার বার আগা হইতে গোড়া এবং গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত লাগাইয়া রাখিতে হয়। চাকা তো ঘুরিতেছে, সেই চক্ররূপ শ্বাস ক্রিয়া পুনঃপুনঃ আসিতেছে যাইতেছে, সেই যাওয়া আসার সহিত তুমি অস্ত্ররূপ মনকে লাগাইয়া রাখ। অস্ত্র শান দিয়া পরিষ্কার করিবার সময় একরূপ শব্দ হয়, তদ্রূপ তুমিও মরিচা পড়া মন-অস্ত্রটীকে যখন প্রাণরূপ শানের উপর বসাইবে, তখনও এক প্রকার শব্দ হইবে। মরিচা কাটিয়া গেলে আর শব্দ হয় না, তদ্রূপ মনের ময়লা কাটিয়া মন যত নির্ম্মল হইবে, ততই আর শব্দ হইবে না। মনের কথা কহাও আর থাকিবে না। মন একটু স্থির হইলেও বিন্দু দর্শন হইবে, কিন্তু সে বিন্দু স্থির নহে, যেন নড়িতেছে মনে হইবে। যত নড়িবে তত দেখাও কম যাইবে, বেশী নড়িলে একবারেই দেখা যাইবে না। দর্পণ নড়িলে কি তাহাতে মুখ দেখা যায়? তদ্রূপ। দর্পণ স্থির হইলে যে কোন প্রতিবিম্ব পড়ুক দেখা যাইবে, সেই প্রকার চিৎরূপ বিন্দুকে স্থির করিয়া দর্পণের ন্যায় সম্মুখে রাখিলে সমস্ত জগৎ তাহার মধ্যে দেখা যায়।

কিরূপে সেই বিন্দু জ্যোতি দর্শন করিতে হয়, তাই কবির বলিতেছেন—

"কবির গুরু ধোবি, শিখ্ কপড়া, সাধন সিজনি হার,
সুরৃতী শিলাপর ধোইয়ে, নিকৃলে জ্যোতি অপার॥"

কবির বলিতেছেন শিষ্যের মনটী ময়লা কাপড়ের মত, আর গুরু হ'লেন ধোপা। ধোপা যেমন কাপড়ে সাজিমাটী মাখাইয়া পাথরে আছাড় দেয়, গুরুরূপী ধোপা শিষ্যকে সাধন রূপ সাজিমাটী মাখাইয়া, আত্মার ধ্যানরূপ শিলাতে বারম্বার আছড়াইতে শিক্ষা দেন। আছড়াইতে আছড়াইতে কাপড়ের সমস্ত ময়লা কাটিয়া কাপড় যেমন স্বচ্ছ সুনির্ম্মল হয়, তদ্রূপ গুরূপদেশ মত সাধন করিতে করিতে শিষ্যের মন হইতে সব ময়লা কাটিয়া গিয়া তন্মধ্যে অপূর্ব্ব চিৎ-জ্যোতিঃর প্রকাশ হয়, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে মনের যে স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধতা আসে তদ্দারাই প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে ও উহাতেই আত্মানুভূতি হয়। বিবেকচূড়ামণিতে শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ,
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥"

বিশুদ্ধ সত্ত্বের লক্ষণ হইল—(১) প্রসন্নতা, (২) আত্মানুভূতি, (৩) পরমা শান্তি, (৪) তৃপ্তি, (৫) প্রহর্ষ ও (৬) পরমাত্মনিষ্ঠা—এতদ্বারাই নিত্যরস রূপ আত্মাকে লাভ করা যায়।

যতদিন প্রাণপ্রবাহ চঞ্চল থাকিবে ও ইড়া পিঙ্গলার মুখে চলিবে ততদিন জ্ঞান জন্মিবে বটে, কিন্তু তাহা সাংসারিক জ্ঞান, পরমাত্মনিষ্ঠজ্ঞান নহে। সুষুম্নায় প্রাণপ্রবাহ চলিতে থাকিলে বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হয়, পরে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। উহাই প্রকৃত

(রজোগুণের বন্ধন)

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

পরমাত্মনিষ্ঠা, ঐরূপ অবস্থা লাভ হইলে আর অশান্তি, নিরানন্দ বা অজ্ঞানে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না ॥ ৬

অন্বয়। কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয়) রজঃ (রজোগুণ) রাগাত্মকম্ (অনুরাগরূপ) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (বলিয়া জানিও)। তৎ (তাহা) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্তির দ্বারা) দেহিনং (দেহীকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৭

শ্রীধর। রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চ আহ—রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকং—অনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্—তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ, সঙ্গঃ—প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতিঃ বিশেষেণ আসক্তিঃ। তয়োঃ তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবঃ যস্মাৎ তৎ রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেন—আসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি। তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মসু আসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [রজোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব বলিতেছেন]—রজঃসংজ্ঞক গুণ রাগাত্মক অর্থাৎ অনুরঞ্জনরূপ (অনুরাগ স্বরূপ) জানিবে, অতএব তৃষ্ণা ও সঙ্গ উৎপাদক। তৃষ্ণা—অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ এবং সঙ্গ—প্রাপ্তবিষয়ে প্রীতি অর্থাৎ বিশেষরূপ আসক্তি। তৃষ্ণা, সঙ্গ এই দুইটার সমুদ্ভব হয় যাহা হইতে সেই রজোগুণ, দেহীকে দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মসকলের আসক্তিতে নিরন্তর বদ্ধ করে। যেহেতু তৃষ্ণাও সঙ্গ দ্বারাই কর্ম্মে আসক্তি জন্মে ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—রজঃ অর্থাৎ ইড়া ; অন্য কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক ইচ্ছা—আত্মার দ্বারায় হইলে হয়—সেই বস্তুতে প্রার্থনার ইচ্ছা, অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিলে সেই বস্তু পাইবার ইচ্ছা হয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত, যাহা না পাইলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। তাহারই নাম তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা তোমাকে বদ্ধ করিয়া জালরূপে দাঁড় করিয়া রেখে দিয়াছে হাত যোড় করিয়া। কারণ সেই বস্তুর দ্বারায় আমার মনের কিয়ৎক্ষণ তৃপ্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হইব। এইরূপ ইচ্ছাতে দাঁড়িয়ে থাকারূপ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে—এই শরীরের মধ্যে কূটস্থ স্বরূপে অর্থাৎ মহাদেবের—যেমত কোন ব্যক্তি মেঠাইয়ের দোকানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—রজোগুণের স্বভাব রঙাইয়া দেওয়া। ইহা হইতেই তৃষ্ণা ও আসঙ্গ হয়। যে বস্তু আমার নাই তাহাকে পাইবার জন্য যে অভিলাষ তাহার নাম তৃষ্ণা, এবং যে বস্তু আমার আছে তাহাতে প্রীতি বশতঃ তাহা যেন থাকে এইরূপ মনোবৃত্তির নাম আসঙ্গ। রজোগুণই কর্ম্মসঙ্গ উৎপন্ন করিয়া তদ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। কোন বস্তুকে বার বার আসক্তির সহিত দেখিলেই তাহা পাইবার জন্য লোভ হয়। এই লোভই জীবকে পরের দাসত্ব স্বীকার করায়, অন্যের নিকট মাথাকে অবনত করায়। কেননা অভিলষিত বস্তু পাইয়া মনের একটু তৃপ্তিলাভ হয়। এই অতৃপ্তির বেগ মনে উদয় হয় কেন ? তাহার কারণ তখন ইড়া নাড়ীতে প্রাণবেগ

(তমোগুণের বন্ধন)

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮

সঞ্চারিত হয়। গৈরিক রঙ্গ শাদা কাপড়ে লাগাইলে সেই কাপড়কে যেন গৈরিক রঙ্গে অনুরঞ্জিত করে, তদ্রূপ ইড়া নাড়ীর প্রবাহ চলিলে সকল বস্তুর প্রতি লোভের সহিত আসক্তি আসে। আমাদের দেশ-প্রীতি, জীবের কল্যাণ-ইচ্ছা—এই শ্রেণীর আসক্তি। জীব যে মহাদেব, তিনি ভিখারীর মত একটু কিছু পাইবার আশায় যেন হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জানেন না যে তাঁহার সত্তাতেই সব, তাঁহার পাইবার কিছু নাই, তবুও প্রাণের চাঞ্চল্য হেতু এই অমনস্ক অশুচি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। মন দিয়া ক্রিয়া করিলে প্রাণের স্থিরতা যেমন যেমন হইতে থাকে বস্তুর প্রতি তখন আর কোন আসক্তি থাকে না। সেই জন্য যাঁহারা কল্যাণকামী তাঁহাদের সকলের মন দিয়া ক্রিয়া করা আবশ্যক ॥ ৭

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) তমঃ তু (তমঃগুণ কিন্তু) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জন্মে) সর্ব্বদেহিনাম্ (সকল দেহীর) মোহনং বিদ্ধি (মোহজনক বলিয়া জানিবে)। তৎ (তাহা) প্রমাদালস্য নিদ্রাভিঃ (প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা) নিবধ্নাতি (দেহীকে আবদ্ধ করে) ॥ ৮

শ্রীধর। তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চ আহ—তম ইতি। তমঃ তু অজ্ঞানাৎ জাতম্ আবরণ-শক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাৎ উদ্ভূতং বিদ্ধি ইত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং—ভ্রান্তিজনকম্, অতএব প্রমাদেন, আলস্যেন, নিদ্রয়া চ তৎ তমো দেহিনং নিবধ্নাতি। অত্র প্রমাদঃ—অনবধানম্, আলস্যম্—অনুদ্যমঃ, নিদ্রা—চিত্তস্য অবসাদাৎ লয়ঃ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। [তমোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব কি বলিতেছেন]—তমোগুণটী কিন্তু অজ্ঞান হইতে জাত অর্থাৎ প্রকৃতির যে অংশ আবরণ-শক্তি প্রধান, তাহা হইতে উদ্ভূত। অতএব সকল দেহীর মোহন অর্থাৎ ভ্রান্তিজনক। সুতরাং প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রা দ্বারা সেই তমোগুণ দেহীকে আবদ্ধ করে। প্রমাদ শব্দের অর্থ অনবধানতা, আলস্য শব্দে অনুদ্যম এবং নিদ্রা শব্দে চিত্তের অবসাদ জন্য লয় ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাতে না থাকায়—অন্যবস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করার নাম তমোগুণ অর্থাৎ পিঙ্গলা সকল দেহীর অর্থাৎ মহাদেবকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, নতুবা জীবমাত্রেই শিব অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে যাহা গুরু-বক্ত্‌গম্য। সে সকল কর্ম্ম যাহা দ্বারায় আবদ্ধ হইতেছেন তাহা প্রকৃষ্টরূপে আসক্তির সহিত তদ্গত চিত্তে আগ্রহ প্রকাশ মাতালের মতন কাহাকে কি বলিতেছেন মিছে অনুধাবন করিতে পারেন না—না পারিয়া আপনার গর্ম্মিতে উথলিয়া উঠে নেচে নেচে নানারূপ দেখাইয়া কালযাপন করিতেছেন। আর বলেন যে আমার সাবকাশ নাই—আর করেন যে কি তাহাও নিজে জানেন না কারণ মাতাল!!!! যাহা আসিবে সম্মুখে কোন ভাল কর্ম্ম তাহা বলেন পরে করব—

"সে পর" পর পর হইয়া যায়, পরে নিদ্রা !!!!! ও ॥ যত আবশ্যক নাই তাহারও অনেক অধিক অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় শুয়েও এক প্রহর বেলার সময় উঠিতে আলিস্যি এইরূপ কয়দিন। বিনা কয়েদের—বলিলেও মানিবেনা – কি আশ্চর্য্যের বিনা বন্ধনের বন্ধন অর্থাৎ আপনার দ্বারা আপনি বন্ধন অর্থাৎ কেহ বলেও না যে তুমি নিদ্রা যাও—র্ আড়বাজি কর ইত্যাদি।—অবিদ্যার বিক্ষেপ-শক্তি যেমন রজোগুণ, অবিদ্যার আবরণ-শক্তি তেমনই তমোগুণ। তমোগুণ সর্ব্বদা জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, মোহাভিভূত করিয়া তুলে। যাহা করিলে ভাল হইবে তাহার দিক দিয়াও মাড়াইবে না, অথচ যে কার্য্য করিলে নিজের ক্ষতি হইবে তাহাতে খুব উৎসাহ – ইহাকেই প্রমাদ বলে। আর সর্ব্বদা বুদ্ধির জড়তা. সুতরাং বিচার পূর্ব্বক কিছু নিজে করিতে পারে না, সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী ; চিত্তের এত অবসাদ যে একটু স্থির হইয়া বসিতে গেলেই হাই উঠে, ঘুম পায়। করে মালা আছে তাহা যত ঘুরুক বা না ঘুরুক মাথা ঠক্ ঠক্ করিয়া দেয়ালে ঠুকিয়া যাইতেছে ! ভাল কথা শুনিতে শুনিতে এত ঘুম আসে যে একটী কথাও কাণে প্রবেশ করে না। আবাব ধ্যান করিতে না করিতে নাসিকা গর্জ্জন করিতে থাকে, কিন্তু তাঁহার নিজমনে ধারণা যে তাঁহার সমাধি হয় ! এইসব বুদ্ধির বিপর্য্যয় ভাব সর্ব্বদা তমোগুণীকে ঘেরিয়া থাকে। হরিনাম করিতেও আলস্য বোধ হয়—তাই বলেন ও সব চেঁচামেচি করিয়া লাভ নাই। ধ্যান বা সাধন করিতেও ভাল লাগে না—জিজ্ঞাসা করিলে বলেন ও সব করা অনাবশ্যক, আমি বসিলেই আমার ধ্যান জমিয়া যায়, বাস্তবিক কিন্তু তাঁর ধ্যান জমে না, জমে নিদ্রা ! এই তমোগুণের যে যত বশীভূত হইবে তাহার অজ্ঞান ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ততই তাঁহার নিকট আত্মা ঘনাচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হইবেন। মানবের, সাধকের এত বড় শত্রু আর নাই বলিলেই হয়। অনেকে ভগবান যা করিবেন তাহাই হইবে বলিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করেন, উহা কিন্তু প্রকৃত ভগবৎনির্ভরতা নহে। ভগবান ইহাকেই দেহীর ভ্রান্তিজনক ভাব বা তমোগুণ বলিতেছেন। আলস্য ও নিদ্রা উহার অনুচর। এইরূপ ভ্রান্তি, আলস্য ও নিদ্রার বশবর্ত্তী হইলে ভগবৎসাধনা হয় না।

আমাদের শ্বাস ক্রিয়া কখনও ইড়ায় চলে, কখনও পিঙ্গলায় চলে। এই শ্বাসের গতি অনুসারে মনের রং বদলাইয়া যায়। শ্বাসের গতির দিকে যাঁহাদের লক্ষ্য নাই, তাঁহারা চিত্তস্পন্দনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না কেন আমার ক্রোধ হয়, কেন আমায় নিদ্রাতুর করে, কেন আমি আলস্যের বশবর্ত্তী হই। যাঁহারা গুরূপদেশ মত শ্বাসে লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস করেন, তাঁহারা প্রাণের স্পন্দনানুরূপ মনও যে স্পন্দিত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা চিত্তে অবৈধ চিন্তা আসিবামাত্র তখনই জাগ্রত হইয়া উঠেন। শ্বাসে একটু লক্ষ্য রাখিলে অথবা কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করিলে গুণের আক্রমণ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারা যায়। শরীর মনের জন্য কিছু বিশ্রাম বা নিদ্রা আবশ্যক বটে কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন মাত্রা ছাপাইয়া না উঠে ! এই সকল বন্ধন কেহ আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় না, আমরাই অবিবেক ও আলস্য বশতঃ শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া অশুভের হস্তে আত্মসমর্পন করি !! তাহাতে যে কত দুঃখ পাই, তবুও মোহ কাটে না !! ৮

(ত্রিগুণের সামর্থ্য)

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখে সঞ্জয়তি (দেহীকে সুখে সংশ্লিষ্ট করে) রজঃ কর্ম্মনি (রজোগুণ কর্ম্মে), উত (এবং) তমঃ তু (তমঃ কিন্তু) জ্ঞানম্ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত করিয়া) প্রমাদে সঞ্জয়তি (প্রমাদে সংযুক্ত করে) ॥ ৯

শ্রীধর। সত্ত্বাদীনামেবং স্বস্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি—সংশ্লেষয়তি, দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ। এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি। তমস্তু মহৎসঙ্গেন উৎপত্স্যমানমপি জ্ঞানং আবৃত্য—আচ্ছাদ্য, প্রমাদে সঞ্জয়তি। মহদ্ভিঃ উপদিশ্যমানস্য অর্থস্য অনবধানে যোজয়তি। উত—অপি আলস্যাদৌ অপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই যে এইপ্রকার স্ব স্ব কার্য্যকরণের সামর্থ্যাতিশয় আছে তাহাই বলিতেছেন]—সত্ত্বগুণটী সুখে সংশ্লিষ্ট করে, দুঃখশোকাদির কারণ থাকিলেও দেহীকে সুখাভিমুখী করে। এবং সুখাদির কারণ থাকিলেও রজঃ কর্ম্মেতে সংশ্লিষ্ট করে। তমঃ কিন্তু মহৎসঙ্গে উৎপদ্যমান জ্ঞানকেও আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে সংযোজিত করে। মহৎ কর্তৃক উপদিশ্যমান বিষয়ে অনবধানতা ও আলস্যাদিতেও সংযোজিত করে ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাতে সর্ব্বদা থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে সম্যক্ প্রকারে সুখ উৎপত্তি আপনা আপনি সুখে থেকে পরমানন্দ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ করে। যে আনন্দ মুখে ব্যক্ত করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই তজ্জন্য অব্যক্ত—নিজবোধরূপ—পরে বুঝাইয়া দিতে পারে না। রজোগুণেতে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ফল কিছুকালের নিমিত্ত অর্থাৎ এ জমী আমার একশত বৎসরের নিমিত্তে পরে কাহার হইবে তাহার স্থিরতা নাই—জমীটুকু দশহাত লম্বা সাড়ে তিন হাত চওড়া তাহার নিমিত্ত দশজন লোক খুন্ আর অর্থব্যয় কত? যে মামলা করিতে করিতে ফকির হইয়া গেলেন—পেশাদার ফকির এই ত রজোগুণের কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্মেতেই প্রায় লোক আবিষ্ট—আর আমিই যে কে? ও আত্মাই বা কি? তাহা জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত ভুলেও মনে এল না—অথচ জ্ঞান্ জ্ঞান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ, লোকের কাছে আমি বড়লোক বলিয়া জ্ঞাত হব করিয়া থাকে। সুতরাং অন্যান্য বস্তু এবং কথাবার্ত্তাতে আসক্তিপূর্ব্বক প্রায় সমুদয় সময় যাপন করেন। যাহা কিছু বাকী থাকে—তাহা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া নিদ্রারূপ অনিয়মিত অবস্থাতে প্রত্যহই আবৃত থাকিয়া ঘোর অন্ধকারে পতিত থাকেন—সুতরাং আলো না থাকিলেই অন্ধকারে থাকিতে হয়। সে আলো স্বচেষ্টাপূর্ব্বক অনুসন্ধান করা উচিত। তাহা জেনে শুনেও ঐ অন্ধকারে থাকিতে আমি ভাল বাসি এইরূপ বলিয়া থাকে—আমার টাকা আছে খাচ্ছি দাচ্ছি

ভড়ভড়িয়ে হাগ্‌ছি বেস্‌ আছি। এইরূপ আমোদেতে অন্ধকারে মিথ্যা কিছুদিনের নিমিত্ত মত্ত থাকিয়া ছারপোকার ন্যায় মৃত্যুর স্বরূপ যমে এসে ধরে।—সত্বগুণ সুখে সংশ্লিষ্ট করে। আত্মাতে না থাকিতে পারিলে প্রকৃত সুখের মুখ দেখা যায় না। ক্রিয়া দ্বারাই আত্মাতে স্থিতিরূপ পরমানন্দ অবস্থা লাভ হয়, উহা অব্যক্ত, মুখে জানাইবার উপায় নাই। কিন্তু ক্রিয়া করাটাও খুব সুখকর নয়, বরং করিতে নীরসই বোধ হয়। তবুও সত্বপ্রধান চিত্ত যে, ক্রিয়া করিতে স্বাদু বোধ না হইলেও সে কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিত ক্রিয়া করিতে ছাড়ে না। আবার যে প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ক্রিয়াভ্যাস করে তাহার মনটা ধীরে ধীরে সত্বগুণে ভরিয়া যায়। প্রকৃত দুঃখশোকের কারণ থাকিলেও যিনি জোর করিয়া ক্রিয়া করিতে বসেন, ক্রিয়াতে একটু মন লাগিলেই তাঁহার মন হইতে বিষয় চিন্তা চলিয়া যায়, তখন একটি অনাময় অবস্থা মনকে ঘেরিয়া বসে, তখন মনের নিশ্চিন্ত অবস্থার জন্য একপ্রকার সুখ বোধ হয়। অবশ্য অর্থ, সম্মান, ভোগাদি পাইলেও মনে একপ্রকারের সুখের উদয় হয় কিন্তু সে সুখ সাত্বিক সুখ নহে। তবে দুঃখ শোক না থাকিয়া মনে যে হর্ষ উৎপন্ন হয়, এইটুকু সাত্বিকতা তাহার মধ্যে থাকে। সত্বগুণ সুখে আবদ্ধ করে বটে কিন্তু সে বন্ধনরজ্জু ততটা দুশ্ছেদ্য নহে। সত্বগুণ সুখের দিকে আবদ্ধ করে কেমন? যেমন ক্রিয়া করিতে করিতে যে শান্তি একটু একটু পাওয়া যায়, যাহা এই দুঃখের জগতে বড়ই দুর্লভ—সেই শান্তিটুকুর লোভে ক্রিয়া করিতে প্রত্যহ নিয়মিত বসে—এই যে সুখের বন্ধন ইহা অবশ্যই সত্বগুণে আছে, কিন্তু এ বন্ধনে শেষ পর্য্যন্ত বন্ধন মোচন করিয়া দেয়, এইজন্য ইহাকে মন্দ বলা যাইতে পারে না।

আর রজোগুণের বন্ধন কি? কেবল কর্ম্মে নিয়োগ করা। সাধু হইয়াছে, ত্যাগীর বেশ লইয়াছে তবুও কর্ম্মাসক্তি যায় না। সামান্য বিষয় যাহা উপেক্ষা করিলেও চলে তাহারই জন্য মাসে কুড়ি বার আদালতে ছুটাছুটি করিতেছে। সন্ন্যাসী সাজিয়াও বিষয় ভোগের দিকে খুব আকর্ষণ, কেহ কিছু বলিলে বুঝাইয়া দেন জনক রাজার মত তিনি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। তাই আজ কাল এই ঘরে ঘরে জনক রাজার ঠেলায় অতিমাত্রায় লোককে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। আবার যিনি ধনী তিনি সাধুসঙ্গ করিলেও তাঁহার মধ্যেও ধনমদের দুর্গন্ধে লোককে অস্থির করিয়া রাখে। টাকা কড়ি হয়তো যথেষ্ট আছে, সংসারে প্রয়োজনও তেমন নহে, পেন্সন হইয়া গিয়াছে—তবু যে একটু ভগবৎ আলোচনা করিবেন বা সাধন করিবেন—সে হবার জো নাই, সেই বৃদ্ধ জীর্ণাবস্থাতেও ময়লা ঘাঁটিবার লালসা অতিমাত্রায় বিদ্যমান। ইহা সমস্তই রজোগুণের খেলা। রজোগুণে জীবকে এই প্রকারেই আবদ্ধ করে!! তমোগুণ আরও অদ্ভুত! কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণ জনিত প্রমাদে জীবকে সংশ্লিষ্ট করে। কিছু বুঝেনা তাহাও নহে, বেশ বিচার শক্তিও আছে, কিন্তু এত অলস এত নিদ্রাকাতর যে ভাল পথে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারে না। হয় তো মহৎসঙ্গ হেতু বিবেক বৈরাগ্যও আছে, ভগবানের দিকে মনও যায়, কিন্তু সাধন করিবার জন্য অতক্ষণ কে আসনে বসিয়া থাকে! এই সাধন করিতে যাইবে, অমনি কেহ আসিয়া ভূতের গল্প জুড়িয়া দিল, হাঁ করিয়া তাহাই শুনিতে লাগিল, এইরূপে দুর্লভ সময় প্রমাদে, আলস্যে, বৃথা কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যায় ও এ সমস্তই

(দুইটি গুণের অভিভব ও একটির প্রাবল্য)

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

তমোগুণের খেলা। অবিদ্যার মাত্রা এই তমোগুণেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মাতাল যেমন মলপিণ্ড দেহের কদর্য্যভাব অনুভব করিতে পারে না, তমোগুণীরা সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিজের প্রমাদজনিত দুঃখের অবস্থাকে অনুভব করিতে পারে না, হঠাৎ তারপর একদিন মৃত্যু আসিয়া লোকান্তরে লইয়া যায় ॥ ৯

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভব করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয় বা প্রবল হয়), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া], তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়] ॥ ১০

শ্রীধর। তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয়—তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি—অদৃষ্টবশাৎ উদ্ভবতি, ততঃ স্বকার্য্যে সুখে জ্ঞানাদৌ সংযোজয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় উদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাদৌ সংযোজয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চ উভৌ অপি গুণৌ অভিভূয় উদ্ভবতি। ততশ্চ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত বিষয়ের হেতু কি তাহাই বলিতেছেন]—সত্ত্বগুণটি, রজঃ এবং তমোগুণকে তিরস্কৃত করিয়া উদ্ভূত হয় অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হয়, তদনন্তর স্বকার্য্য যে সুখ ও জ্ঞানাদি তাহাতেই জীবকে সংযোজিত করে। রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন স্বীয় কার্য্য তৃষ্ণাদিতে জীবকে সংযুক্ত করে, আর তমোগুণটিও সত্ত্ব এবং রজ উভয়কেই অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়। তখন স্বকার্য্য যে প্রমাদ ও আলস্য তাহাতেই দেহীকে সংযুক্ত করে। ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমে একজনকে মারিলেন—মারিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন, এইরূপ রজঃ আর তমোগুণেতে আবৃত হইয়া সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেন অর্থাৎ কাশীতে এসে ব্রহ্মচারী হইলেন—মেরে হায় হায় করিলেন—রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে আসিলেন আবার বলিতে লাগিলেন যে হায় হায় করিলে কি হইবে, মেরেছি বেস্ করেছি—সত্ত্বগুণ হইতে তমোগুণে আসিলেন, পরে মনে করিলেন যে কর্ম্মটা ভাল করিনি—পুনরায় তমঃ হইতে সত্ত্বগুণে আসিলেন এখন যাহাকে মারিয়াছিলেন, তাহার তরফের লোকগুলি পুনরায় লড়াই করিতে এল—সুতরাং সত্ত্বগুণ হইতে পুনরায় রজোগুণে এলেন—এইরূপ তালপাতার সিপাইরা এক নিশ্বেসের ফুঁ দিয়ে যম উড়িয়ে যাহাদিগকে নিয়ে যায়।—তিনটি গুণ একই কালে কার্য্য করিতে

(গুণসমূহের বৃদ্ধির চিহ্ন)

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

পারে না। একটি গুণ প্রবল হইলে আর দুইটি অভিভূত অবস্থায় থাকে, কিন্তু নষ্ট হয় না। এই গুণগুলি সকল অবস্থাতেই মিলিত ভাবে থাকে। তবে সত্ত্বগুণের উদয় তখনই বলা যায় যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া মাথা তুলিয়া বসে এবং অন্য দুইটি অভিভূত ভাবে থাকে। যাঁহারা নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন কোন গুণটি এইবার মাথা চাড়া দিয়াছে। যাঁহারা সাধনাভ্যাসে মনকে নিযুক্ত না রাখেন তাঁহাদিগকে গুণগুলি স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। তাই একই মানুষের কোন সময়ে বেশ সাত্ত্বিক ভাব, কোন সময়ে রাজসিক ভাব ও কোন সময়ে তামসিক ভাব উদয় হইতে দেখা যায়। সেই ভাব দেখিয়া বুঝা যায় তাঁহার মধ্যে কোন্ গুণ এখন খেলা করিতেছে। শ্বাসের গতি দেখিলেও উহা বুঝা যাইতে পারে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু এই গুণগুলি স্বেচ্ছামত আসিয়া কি দেহীকে আক্রমণ করে? তাহা নহে, ইহাই জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট। বেশ ভাল মানুষটি বসিয়া আছে, হঠাৎ ভিতরে ভূত রাগিয়া উঠিল, মনটা তখনই তমোভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত গুণক্রিয়া কখন কখন পূর্ব্বকর্ম্মসূত্র ধরিয়া দেহীকে বিকল করিতে থাকে। বাহিরের দিক হইতে কখন কখন কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ মনটা কখন আনন্দিত, কখন বিষাদিত হইতেছে ইহাই রজোগুণজনিত বিক্ষিপ্ত ভাব!

সাধারণ লোকেরা অধিকাংশ সময়েই স্রোতোতাড়িত তৃণের ন্যায় এইরূপ গুণকর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা সাধক তাঁহারা সেইরূপ অনবধান নহেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রাণে লক্ষ্য রাখেন, তাই কোন গুণ স্বাভাবিক ভাবে প্রবল হইলেও তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে না। কোন গুণকেই প্রশ্রয় দিলে তাহারা অতিমাত্রায় দেহীকে জড়াইয়া ধরে। এইজন্য গুণের প্রতি বা প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যাঁহারা অলস তাঁহারা যদি আপনার এই তমোগুণের প্রতি ঔদাসীন্য দেখান, তবে তাঁহাকে তমোগুণ এরূপ আক্রমণ করিবে যে সেই গুণ যেন তাঁহার স্বভাবজাত বলিয়া মনে হইবে, তাঁহার অন্তঃকরণে যেন উহা বাসা বাঁধিয়া আছে বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ সব গুণই প্রবল হইতে পারে, জীব অভ্যাস বশতঃ যেমন যেমন ভাবে উহাদিগকে প্রশ্রয় দিবেন, উহারাও সেই সেই মত প্রবল বা দুর্ব্বল ভাবে দেহীকে আক্রমণ করিতে থাকিবে ॥ ১০

অন্বয়। যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্ব্বদ্বারেষু (সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং প্রকাশঃ (জ্ঞানরূপ প্রকাশ) উপজায়তে (আবির্ভূত হয়), তদা উত (তখনই) সত্ত্বং বিবৃদ্ধং (সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) ইতি বিদ্যাৎ (ইহা জানিবে) ॥ ১১

শ্রীধর। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গানি আহ—সর্ব্বদ্বারেষু ইতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্ আত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষু অপি দ্বারেষু—শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদি জ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ

উপজায়তে—উৎপদ্যতে, তদা অনেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ—জানীয়াৎ। উত শব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াৎ ইত্যুক্তম্ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং সত্ত্বাদি গুণের বিশেষভাবে বৃদ্ধির চিহ্ন তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—এই আত্মার ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদিদ্বারসমূহে যখন শব্দাদি জ্ঞানময় প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন এই প্রকাশ চিহ্ন দ্বারা সত্ত্বগুণকে বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে। "উত" শব্দে সুখাদি চিহ্নদ্বারা ও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই দেহের সব ইন্দ্রিয়েতেই লক্ষ্য করিলে আত্মার প্রকাশ গুরুবাক্যের দ্বারায় জন্মাইতে পারে। সে ক্রিয়া স্বরূপ জ্ঞান হইতেছে, যাহা গুরুবক্ত্রগম্য। সেই বিদ্যাই বিদ্যা, আর সব অবিদ্যা অর্থাৎ সেই জানাই জানা আর সব অজ্ঞতা। সেই ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইলেই সত্ত্বগুণে থাকা হইল।—যে সময় যে গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে সময় তাহার কিরূপ চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাহারই কথা ভগবান বলিতেছেন। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়। তখন যে জ্ঞানপ্রবাহ চলে তাহার মধ্যে কোন ভ্রম প্রমাদ থাকে না, যাহার যাহা স্বরূপ তাহাই প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণশালী সাত্ত্বিক পুরুষের কথাবার্ত্তা, ভাব ভঙ্গীর মধ্যেও সাত্ত্বিকতার চিহ্নই প্রকটিত হইবে। তখন তাঁহার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয় না, বা তাঁহার মন এমন কিছু মনন করিতে পারে না, যাহা সাত্ত্বিকতার বিরোধী, অথবা ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজক ব অবসাদকর হইতে পারে। তখন ঠিক যেন উপনিষদোক্ত এই প্রার্থনা বাক্যের সফলতা সাধক আপনার মধ্যে বুঝিতে পারেন :—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ

হে দেবগণ! যজ্ঞপরায়ণ আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পারি, চক্ষুদ্বারা উত্তম বিষয় যেন দর্শন করিতে পারি। সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে এই কর্ণ এমন শব্দ শুনিতে পায় যাহা শুনিলে মনের বহির্মুখ ভাব স্বতঃই তরোহিত হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে সে অশব্দের শব্দ, সে মুরজমুরলীর মূর্চ্ছনা শুনিয়া মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইয়া উঠে। বাহিরের দর্শন নহে, অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া যায়, সাধক কত কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে বাহিরের সব দৃশ্য ভুলিয়া যান। এমন পবিত্র সুগন্ধের উদয় হয় যাহাতে নাসিকা পবিত্র গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে, জিহ্বায় এমন রসাস্বাদ হইতে থাকে যে বাহিরের রসের সহিত আর সে রসের তুলনা হয় না। এইরূপ সব ইন্দ্রিয়দ্বারেই দিব্যভাব ফুটিয়া উঠে। মন এত স্থির হইয়া যায় যে সেই বিক্ষেপশূন্য শান্ত চিত্তাকাশ শরৎকালীন মেঘশূন্য স্বচ্ছ আকাশের মত সুনির্ম্মল শ্যাম-শোভায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এই অবস্থায় কেহ গালি দিলেও খারাপ বোধ হয় না, কেহ সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেও কোন ক্ষতি বোধ মনে হয় না। সুষুম্নায় যখন প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়, তখনই এই অবস্থা হয়। এই অবস্থায় যাহা জানা যায়, তাহাই আসল বিদ্যা বা জ্ঞান, আর সবই অজ্ঞান। যে যত মন দিয়া ক্রিয়া করিবে তাহার সত্ত্বগুণ ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তাই

(রজোগুণ বৃদ্ধির চিহ্ন)

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

কবির বলিয়াছেন ভগবানকে পাইবার জন্য এই শরীরকে জ্বালাইয়া কালী কর অর্থাৎ খুব পরিশ্রম কর, আর কালীর কলম দিয়া সেই কালিতে রামের নাম লিখিয়া পাঠাও। এইরূপ অষ্টপ্রহর যে লাগিয়া থাকে, সেই ভগবানের প্রেমাস্বাদের নেশায় ভোর হইয়া যায়। কবির আরও উৎসাহের সহিত বলিয়াছেন—

"কবির প্রেম পিয়ালা ভরি পিয়া রটিরহা গুরুজ্ঞান্।
দিয়া নাগারা শব্দকা, লাল্ খাড়ে ময়দান॥"

কবির ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ প্রেম বাটি ভরিয়া পান কর, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ সব প্রেমে ভরপুর হইয়া উঠুক, এই ভাবে গুরুদত্ত সাধনা দিন রাত রটিতে থাক, তখন কত অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য, কত অদ্ভুত কাণ্ড সকল দেখিতে পাইবে। রাজা আসিলে যেমন তাঁহার আগমনের চিহ্ন স্বরূপ নানাবিধ সুস্বর সংযুক্ত বাজনা বাদিত হইতে থাকে, তদ্রূপ এই দেহের মধ্যে ওঁকারের বিবিধ নাদ ঝঙ্কৃত হইতে থাকিবে এবং তখন দেখিবে তোমার যিনি সর্ব্বস্ব লালমণি—তিনি ময়দানে—চিদাকাশের প্রান্তরে অপরূপ দিব্য সাজে সাজিয়া সাধকের চিরদিনের আশা সফল করিতেছেন॥ ১১

অন্বয়। ভরতর্ষভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) লোভঃ (পরদ্রব্যগ্রহণে ইচ্ছা) প্রবৃত্তিঃ (সর্ব্বদা কার্য্যে লাগিয়া থাকা) কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ (কর্ম্মে সতত উদ্যম), অশমঃ (অশান্তি বা অস্থিরতা বা উপশমহীন হর্ষরাগাদি প্রবৃত্তি) স্পৃহা (সকল বস্তু পাইবার জন্যই তৃষ্ণা) এতানি (এই সকল চিহ্ন) রজসি বিবৃদ্ধে (রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (জন্মে)॥ ১২

শ্রীধর। কিঞ্চ—লোভ ইতি। লোভঃ—ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি পুনঃ-পুনর্ব্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ। প্রবৃত্তিঃ—নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা, কর্ম্মণামারম্ভঃ—মহাগৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ। অশমঃ—ইদং কৃত্বা ইদং করিষ্যামীত্যাদি সঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ। স্পৃহা—উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা। রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এভিঃ লিঙ্গৈঃ রজোগুণস্য বিবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—লোভ শব্দে ধনাদির আগম, উহা বহুরূপে হইলেও পুনঃ পুনঃ তাহার বৃদ্ধি করিবার যে অভিলাষ; প্রবৃত্তি—সর্ব্বদা কর্ম্মে লাগিয়া থাকা, কর্ম্মসকলের আরম্ভ, মহাগৃহ (অট্টালিকাদি) নির্ম্মাণের উদ্যম; অশম—এইটি করিয়া আবার এইটি করিব ইত্যাদি নিরন্তর সঙ্কল্প বিকল্পের অশান্তি ভাব। স্পৃহা—বস্তু দেখিবামাত্রেই তাহা উত্তমই হউক বা অধমই হউক ইতস্ততঃ সংগ্রহেচ্ছা। রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে এইসকল চিহ্ন উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ এই সকল চিহ্ন দ্বারা রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন বিষয়েতে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রকৃষ্টরূপে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টিকরতঃ তদগত চিত্ত হইবার পূর্ব্বক্ষণের নাম লোভ; প্রবৃত্তি—প্রকৃষ্টরূপ সেই

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

অর্থকে সদা সর্ব্বদা তদ্রূপ হইয়া মনকে সেইখানে রাখার নাম প্রবৃত্তি; কোন বস্তু ভাল করে চোকে দেখে আসক্তিপূর্ব্বক হঠাৎ করার নাম আরম্ভ; ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কোন কর্ম্ম করার নাম কর্ম্ম। সম্যক্ প্রকারে ইচ্ছারহিত না হওয়া অর্থাৎ এ দরজায় হেরেছি অন্য দরজায় যাব অর্থাৎ মুনসেফ আদালত ক্ষুদ্র আদালত বড় আদালত ইত্যাদি—ইহা সকল রজোগুণের কর্ম্ম, রজোগুণ বৃদ্ধির কর্ম্ম।—রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে কি কি চিহ্ন উপস্থিত হয় তাহাই ভগবান বলিতেছেন। (১) কোন বিষয় দেখিবা মাত্র তাহা পাইবার জন্য আসক্তি পূর্ব্বক সেই বস্তুর পানে চাহিয়া থাকার নাম লোভ! বহু ধনাগম সত্ত্বে আরও পাইবার ইচ্ছা, যাহা কিছু চোখে পড়ে তাহাই সংগ্রহ করিয়া ঘরে পুরিয়া রাখার ইচ্ছা। (২) প্রবৃত্তি—সর্ব্বদাই কিছু না কিছু একটা লইয়া ব্যস্ত থাকা। যাহা একবার মনে লাগিয়াছে, সেই খানেই মনকে লাগাইয়া রাখা। আহা! উহার কেমন গহনাটি, আহা উহার কেমন বাড়ীটি, আহা কেমন সুন্দর তার বাগানটি—এই সব সর্ব্বদা মনে জল্পনা করা, এবং সেই সব বিষয় সংগ্রহে দিনরাত পরিশ্রম করা। (৩) কর্ম্মারম্ভ—বড় বড় গৃহ অট্টালিকা নির্ম্মাণে উদ্যোগ, নিজের অনেক কিছু আছে, তথাপি স্বাধিকার বিস্তারের জন্য সর্ব্বদা উদ্যোগ। (৪) অশম—মনের শান্তি নাই, সর্ব্বদা মনে সঙ্কল্প বিকল্পের ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে, মকর্দ্দমা করিতেছি, হারিতেছি, কখন জিতিতেছি কখনও বা হারিলে আবার উচ্চ আদালাতে যাইবার ইচ্ছা ইত্যাদি। (৫) স্পৃহা—যা কিছু দ্রব্য, ভূমি, ধন, স্ত্রী, সমস্ত আমার হউক, এইরূপ মনে মনে জল্পনা।

এই সমস্তই রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ—ইড়ায় শ্বাস বহিবার সময় মনের এইরূপ অবস্থা হয় ॥ ১২

অন্বয়। কুরুনন্দন! (হে কুরুনন্দন) অপ্রকাশঃ (আবরণ—জ্ঞানের অভাব) অপ্রবৃত্তিঃ চ (কর্ম্মে অনুদ্যম, আলস্য) প্রমাদঃ (অনবধানতা, কর্ত্তব্যের বিস্মৃতি), মোহঃ এব চ (এবং মোহ, আচ্ছন্ন ভাব, বুদ্ধির বিপর্য্যয়), এতানি (এই সকল) তমসি বিবৃদ্ধে (তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশঃ—বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ—অনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ—কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যম্, মোহঃ—মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈঃ তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—অপ্রকাশ—বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি—অনুদ্যম, প্রমাদ—কর্ত্তব্য বিষয়ে অনুসন্ধান রাহিত্য, মোহ—মিথ্যাভিনিবেশ। তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায়। এই সকল চিহ্ন দ্বারা তমোগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করায় আত্মাব্যতীত তমোগুণে থেকে আর প্রবৃত্তি—ভালরূপে আসক্তিপূর্ব্বক তদগত চিত্ত হইয়া অর্থাৎ

(মৃত্যুকালে গুণত্রয়ের বৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ ফল)

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪

তাহাই হইয়া যাওয়া—প্রকৃষ্টরূপে মাতাল হওয়া এবং আপনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করে মজে থাকা—এই সকল তমোগুণের বৃদ্ধির কর্ম্ম। তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ পিঙ্গলায় শ্বাস বহিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই বলিতেছেন। তখন সবই অপ্রকাশ, জ্ঞানের কথা শুনাইলেও তাহা মাথাতে প্রবেশ করে না। জন্ম-জরা-মরণরূপ ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও তৎপ্রতীকারে প্রবৃত্ত না হওয়া, মনে কোন প্রকার বিবেক বুদ্ধির উদয়ই না হওয়া। শাস্ত্র, গুরু-বাক্য শুনিয়াও তদনুষ্ঠানে উৎসাহ না থাকা। যথাসময়ে যথা-কর্ত্তব্য সাধনাদি করিতে বিস্মৃত হওয়া, মোহ বশতঃ মদ্যপানাদি অনর্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিপরীত বুদ্ধি—যাহা করিলে কল্যাণ হয় তাহা না করা। নিদ্রা, আলস্য, শুইয়া পড়িয়া থাকা, কিছুতেই ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা না হওয়া। এই সকল বৃত্তিগুলি যখন স্ফুরিত হয়, তখন তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে॥ ১৩

অন্বয়। যদা তু (যখনই) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে) দেহভৃৎ (দেহী) প্রলয়ং যাতি (মৃত্যু প্রাপ্ত হয়) তদা (তখন) উত্তমবিদাম্ (উত্তমবিদ্‌গণের) অমলান্ লোকান্ (নির্ম্মল লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥১৪

শ্রীধর। মরণসময়ে বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি—উপাসতে ইতি উত্তমবিদঃ তেষাং যে অমলাঃ—প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাঃ তান্ প্রতিপদ্যতে—প্রাপ্নোতি॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [মরণ সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ত্বাদির বিশেষ ফল দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন] —সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যদি জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবে তিনি উত্তমবিদ্‌গণের (উত্তম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির উপসনা করেন যাঁহারা) যে অমল অর্থাৎ প্রকাশময় লোক সকল যাহা সুখ-ভোগের বিশেষ স্থান, তাহা তিনি প্রাপ্ত হন॥

[উত্তমবিদাং—মহদাদিতত্ত্ববিদাম্ (মহদাদি তত্ত্বগণের)—শঙ্কর]॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তখন সত্ত্বগুণেতে প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি হইবে যখন সমুদয় প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে লয় হইয়া যাইবে—তখন উত্তম যাহাকে বলে অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মলোক গমন করিয়া লোকে থাকে—যেখানে কোন প্রকৃতির ময়লা নাই অর্থাৎ নির্ম্মল ব্রহ্মপদে থাকে।—পিঙ্গলাতে যখন প্রাণ প্রবাহ থাকে তখন চিত্ত মোহযুক্ত হইয়া থাকে, সে সময় দেহত্যাগ হইলে ভগবৎ স্মরণ হয় না। সুতরাং তাহার গতিও ভাল হয় না, পর শ্লোকে তাহা কথিত হইবে। কিন্তু যাঁহাদের সুষুম্নামার্গে প্রাণ প্রবাহ চলিবার সময় দেহত্যাগ হয়, তাঁহাদের ভগবচ্চিন্তায় দেহত্যাগ অবশ্যই হইবে। সুষুম্নাতে প্রাণের স্থিতিকাল যত বৃদ্ধি পায় ততই চিত্তে সত্ত্বভাবের উদয় হয়।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

এই স্থিতিকাল বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া মৃত্যু হয়। উহা অমল ব্রহ্ম-স্থান, ওখানে প্রকৃতির ময়লা কিছু নাই। ইড়া, পিঙ্গলা,সুষুম্নার অতীত গুণবর্জ্জিত স্থান যাহা, তাহাই ব্রহ্মপদ—সেই ব্রহ্মপদে থাকিয়া সাধক ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি হিরণ্যগর্ভেরই রূপ, যাঁহারা ঐ সকল রূপের উপাসক তাঁহারা সগুণ উপাসক, তাঁহারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবলোকাদি প্রাপ্ত হন, যাঁহারা নির্গুণের উপাসক তাঁহাদের আর কোন লোক-লোকান্তরে গমনের প্রয়োজন হয় না, তাঁহারা প্রাণবিলয়ের সহিত এইখানেই সদ্যমুক্তি প্রাপ্ত হন। কূটস্থ জ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে যাঁহাদের দেহ বিলয় হয় তাঁহারা নির্ম্মল ব্রহ্মলোকে, প্রকৃতির পরপারে গিয়া উপনীত হন। পরাবস্থায় থাকিতে থাকিতে যাঁহাদের দেহবিলয় ঘটে তাঁহাদের সদ্যমুক্তি হয়—"অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ॥ ১৪

অন্বয়। রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যু হইলে) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে) জায়তে (জন্মলাভ করে), তথা (সেইরূপ) তমসি (তমোগুণের বৃদ্ধি কালে) প্রলীনঃ (মৃত ব্যক্তি) মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদি যোনিতে) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে) ॥ ১৫

শ্রীধর। কিঞ্চ—রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে। তথা তমসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলীনো—মৃতো মূঢ়োযোনিষু—পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। আর তমোবৃদ্ধি কালে মৃত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্মলাভ করে ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—রজোগুণেতে যখন যায় প্রকৃষ্টরূপে লীন হইয়া, তখন ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করে—আর যখন তমোগুণেতে প্রকৃষ্টরূপেতে লীন হয় তখন মূর্খের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—যেন বোকাটা!!!! চৈতন্য বোকা (ব্রহ্ম) ব্রহ্ম লম্পট। তাৎপর্য্য—সব জানে কিন্তু জানে না অচৈতন্য বোকা (ব্রহ্ম) বেশ্যা লম্পট—"কিছুই জানে না অথচ বলে সব জানি।"—কর্ম্মাসক্তিই রজোগুণের চিহ্ন, এই অবস্থায় যখন মানুষ থাকে তখন ফল লাভার্থই কর্ম্ম করে। আবার এই অবস্থায় ঐ মনুষ্যের দেহান্ত ঘটিলে, তাহার দেহটাই না হয় গেল, ক্রিয়া প্রকাশের যন্ত্রটিই নষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু কর্ম্মের বাসনা যাহার হয় সে মনও থাকে, এবং দেহ নষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম দেহস্থিত মনের সে বাসনাও নষ্ট হয় না। জীব যখন আবার কর্ম্মক্ষেত্র এই পৃথিবীতে আসে তখন সেই মন, সেই বাসনা লইয়াই আসে। এখন নূতন দেহ ধারণের সময় তাহার দেহ প্রকৃতি তাহার পূর্ব্ববাসনার অনুরূপ হইবে, সুতরাং কর্ম্মাসক্তি যাহার অধিক সে আবার এই মনুষ্যযোনিই প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম করিবার দেহই এই মনুষ্যদেহ, সুতরাং যাহাদের কর্ম্মাসক্তি প্রবল তাহাদের মনুষ্যজন্ম লাভ হওয়া অনিবার্য্য, তদ্রূপ দেহান্ত কালে তমোগুণের আতিশয্য থাকিলে অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভাদি অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিলে, সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার যে দেহ

(সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্ম্মের ফল)

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

হইবে, তাহা বিড়াল, কুক্কুর, ছাগ মহিষ ব্যাঘ্র সর্পাদির মতই হইবে। নচেৎ ঐ সকল বৃত্তি চরিতার্থ হইবে কিরূপে? জীবিতাবস্থাতেও যাহাদের রজোগুণ প্রবল থাকে, তাহারা সদাসর্ব্বদা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া বহুবিধ কর্ম্মে আপনাকে লিপ্ত রাখে, আর তমোগুণ প্রবল হইলে তখন তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি যেন লোপ পায়, একটা গণ্ড মূর্খের মত তাহার মনোভাব হয়। সকলের মধ্যে সেই একই নারায়ণ, কিন্তু তবু গুণভেদে কত বৈষম্য দেখায়। রঙ্গীন কাঁচের মধ্য দিয়া শুদ্ধ বস্তুকে দেখিলেও যেমন তাহা কাঁচের রঙ্গে অনুরঞ্জিত হয়, তদ্রূপ চিরনির্ম্মল অবিকারী আত্মাকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মধ্য দিয়া দেখিলে তাঁহাকে সেই সেই গুণরঞ্জিতের ন্যায় দেখায়। বাস্তবিক তাঁহার নিজের শুদ্ধভাবের মধ্যে কোন গুণের ব্যঞ্জনা নাই। তাই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মকে, মূর্খ, চোর, বোকা, লম্পট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম সব জানিয়াও কিছুই জানেন না যেন, আর প্রাকৃত লোকেরা কিছুই জানেন না, অথচ বলে সব জানি ॥ ১৫

অন্বয়। সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ (সুকৃত বা সাত্ত্বিক কর্ম্মের) ফলং ফল) নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং নির্ম্মল ও সাত্ত্বিক) আহুঃ (তত্ত্বদর্শীরা বলিয়াছেন), তু (কিন্তু), রজসঃ ফলং (রজোগুণের ফল) দুঃখম্ (দুঃখ)। তমসঃ ফলম্ (তামসিক কর্ম্মের ফল) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) ॥ ১৬

শ্রীধর। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য—সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং—সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং—প্রকাশবহুলম্ সুখং ফলম্ আহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি—রাজসস্য কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ। তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ। তমসঃ ইতি—তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ। তস্য অজ্ঞানং – মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ। সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনা অষ্টাদশেঽধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [এক্ষণে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের স্বানুরূপ কর্ম্মদ্বারা যে বিচিত্র ফলহেতুত্ব তাহাই বলিতেছেন]—সাত্ত্বিক কর্ম্মের সত্ত্বপ্রধান, নির্ম্মল অর্থাৎ প্রকাশ বহুল সুখরূপ ফল—ইহা কপিলাদি ঋষিরা বলেন। কর্ম্মফল কথনের প্রস্তাব চলিতেছে বলিয়া বলিতেছেন যে রজস্ শব্দের অর্থ রাজস কর্ম্ম তাহার ফল দুঃখ বলিয়া ঋষিরা বলেন। তমস শব্দে তামস কর্ম্ম, তাহার ফল অজ্ঞান অর্থাৎ মূঢ়ত্ব। সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের লক্ষণ "নিয়তং সঙ্গরহিতং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিবেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত যাহা মন গ্রাহ্য করে—সে এই ক্রিয়া যাহা গুরুবাক্য দ্বারা লভ্য—এই সৎ সুকৃৎ এই সাত্ত্বিক কর্ম্ম ইহার নির্ম্মল ফল ব্রহ্ম যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়—রজোগুণের ফল অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিলেই দুঃখ—অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে, তমোগুণে থাকিয়া—আমি যে কে তাহা জানিতে পারে না সুতরাং অজ্ঞান—তমোগুণের

(গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ ফল)

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭

ফল—যেমত কোন ভদ্রলোক চামারণীর বাড়ীতে গিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়।—সাত্ত্বিক কর্ম্ম অত্যন্ত নির্ম্মল বলিয়া উহার সর্ব্বপ্রধান ফল মনের অকপট মল রহিত অবস্থা। কারণ তখন কোন আবরণ থাকে না। যে কর্ম্মের দ্বারা মনের "অহংমমাকার" রূপ আবরণ কাটে তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। ইন্দ্রিয়দ্বারে আমরা শুভ কর্ম্ম করিলেও তাহা পূর্ণ সাত্ত্বিক হয় না। কারণ রজস্তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়াই অভিমানাত্মক অহংকারের উৎপত্তি হয়, এই অহংকারের সাত্ত্বিক অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় (Organs) এবং মন উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা ঠিক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম হয় না। অতএব যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইবে তাহা মনঃগ্রাহ্য। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গ শরীর—এই লিঙ্গ শরীর সূক্ষ্ম বস্তু সুতরাং স্থূলদেহাদি হইতে সূক্ষ্মধর্ম্মী। মনঃ ও প্রাণের কল অবিরত চলিয়াছে, সেই অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করার ফল চাঞ্চল্য ও অবসাদ, সুতরাং তাহা সাত্ত্বিক নহে। সাত্ত্বিক কর্ম্ম তাহাই যখন প্রাণ স্থির ও মন স্থির হইয়া সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য হয়। সুতরাং সুকৃত বা সাত্ত্বিক কর্ম্ম তাহাই যাহা দ্বারা প্রাণ স্থির হয় ও তৎসহ মনও স্থির হয়। সেই কর্ম্মই হইল প্রাণ ক্রিয়া, ইহা একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্ম, ইহার ফল মলশূন্য হওয়া। একমাত্র ব্রহ্মই মলশূন্য পবিত্র, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনিই হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলেই মন কর্ম্ম করিয়া ফলের জন্য ধুকপুক করে, তদ্দ্বারা আসক্তি জন্মে—ইহাই রজোগুণের ফল। আর তমোগুণে আত্মবিস্মৃত জীব তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব ভুলিয়া যায়, কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায় পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হয়। এবং এই আসক্তি অজ্ঞানেরই ফল। এই জন্য তমোগুণের ফল দুঃখবহুল॥ ১৬

অন্বয়। সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং সঞ্জায়তে (জ্ঞান জন্মে); রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ (লোভ হয়); তমসঃ (তমোগুণ হইতে) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ ও মোহ) অজ্ঞানং এব চ (আর অজ্ঞান) ভবতঃ (হইয়া থাকে)॥ ১৭

শ্রীধর। তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে। অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে, তস্য চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি। ততঃ তামসস্য কর্ম্মণঃ অজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেব ইত্যর্থঃ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [এ বিষয়ে হেতু কি তাহাই বলিতেছেন]—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ। রজোগুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, লোভ দুঃখহেতু বলিয়া লোভপূর্ব্বক কর্ম্মের ফল দুঃখই হয়। তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও

(সত্ত্বাদি বৃত্তিশীলের ফলে ভেদ)

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এজন্য তামস কর্ম্মের যে অজ্ঞানপ্রাপক ফল হয় তাহা যুক্তিযুক্ত—ইহাই তাৎপর্য্য॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্বগুণে থাকিলে পর অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে পর ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আপনার স্থিরপদ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। রজোগুণ অর্থাৎ যখন ইড়ায় থাকে তখন ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিতে তদগত চিত্ত হইয়া তাহার প্রাপ্তি ইচ্ছা সর্ব্বপ্রকারে করে—ইহারই নাম যোগ—পিঙ্গলাতে থাকিলে প্রকৃষ্টরূপে মত্ত হইয়া একজনকে মারিতে অন্য জনকে মারে মোহিত হইয়া সেই বস্তুর প্রতি—আপনাকে আপনি না জেনে সুতরাং অজ্ঞান তমোগুণেতে হয়।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ক্রিয়া করিলে সত্ত্বগুণ বাড়ে, সুতরাং যে ক্রিয়া অধিক করে তাহার সত্ত্বগুণও বাড়িতে থাকে। সত্ত্বগুণ হইল ক্রিয়ার পর অবস্থায় অল্প অল্প স্থিতি, সুষুম্নায় প্রাণ তখন ধীরে ধীরে চলে, এই স্থিরতা বাড়িলেই স্থিরত্বপদ লাভ হয়। উহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ক্রিয়ার পর অবস্থা ক্রমশঃ ক্রিয়া করিতে করিতেই হয়। যে যেমন ক্রিয়া করিবে তাহার সেই রূপ নেশা হইবে। কূটস্থ মধ্যে পরব্যোম স্বরূপের প্রকাশ হয়—উহাই পরমাকাশ। পরমাকাশের অনুভবই জ্ঞানের চিহ্ন। ব্রহ্মের অন্য কোন চিহ্ন নাই, তিনি আছেন এই জানাই তাঁহার চিহ্ন। অন্য সাধনায় যে মুক্তিক্রম আছে, তদপেক্ষা ক্রিয়া দ্বারায় উহা সহজলভ্য। সৃষ্টির বিকাশের সময় আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী হয়। ক্রম পূর্ব্বক প্রলয় হইলে প্রত্যেক তত্ত্বই স্ব স্ব কারণে লয় হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় একেবারে প্রলয় হয়, ক্রমের অপেক্ষা নাই। একেবারে সর্ব্ব কারণের কারণস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাই হইয়া যায়। উপরোক্ত অবস্থা ক্রিয়া করিয়া সুষুম্নায় থাকার ফলেই লাভ হয়। ইড়ায় থাকিলে বিষয় তৃষ্ণা বাড়িয়া চলে, তজ্জন্য লোভ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি, খুব বাড়িয়া যায়। আর তমোগুণে কেবল প্রমাদ ও কেবল মোহ॥ ১৭

অন্বয়। সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) ঊর্দ্ধং (ঊর্দ্ধলোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন)। রাজসাঃ (রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) মধ্যে তিষ্ঠন্তি (মধ্য-লোকে অবস্থান করেন)। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টগুণ সম্পন্ন) তামসাঃ (তামস ব্যক্তিগণ) অধঃ গচ্ছন্তি (অধোগতি প্রাপ্ত হয়)॥ ১৮

শ্রীধর। ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ—সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি—সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাৎ উত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব-পিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি—মনুষ্যলোকে এব উৎপদ্যন্তে। জঘন্যো—নিকৃষ্টঃ তমোগুণঃ তস্য বৃত্তি—প্রমাদমোহাদিঃ। তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি। তমসো বৃদ্ধিতারতম্যাৎ তামিস্রাদিষু নিরয়েষু উৎপদ্যন্তে॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [সম্প্রতি সত্ত্বাদিবৃত্তিশীল ব্যক্তিদের ফলভেদ কিরূপ হয় তাহাই বলিতেছেন]

—সত্ত্ববৃত্তিপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধলোকে গমন করেন। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ ও তারতম্য অনুসারে মনুষ্য,—গন্ধর্ব্ব,—দেবলোক, এমন কি সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়। মনুষ্যলোকে যত সুখ তাহার শতগুণ গন্ধর্ব্বলোকে, আবার গন্ধর্ব্বলোক হইতে শতগুণ পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে শতগুণ দেবলোকে এবং দেবলোক হইতে শতগুণ সত্যলোকে আনন্দ হয়। যাহারা রাজস অর্থাৎ তৃষ্ণাদি দ্বারা আকুল তাহারা মধ্যে থাকেন অর্থাৎ মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হন। জঘন্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট, সেই নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তি যে প্রমাদ—মোহাদি, তাহাতে স্থিত ব্যক্তিগণ অধোলোকে গমন করে। তমোগুণের বৃদ্ধির তারতম্য অনুসারে তামিস্রাদি নিরয়ে (নরকে) উৎপন্ন হয়॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া করিতে করিতে মাথার উপরে যায়—সেখানে গেলেই নেশা হয়—সেই আনন্দ সর্ব্বদা ভোগ করে—লড়াই বড়াই মধ্যস্থানে বাহুদ্বারা করে—যাহা রজোগুণের কর্ম্ম—আর অধম ক্রিয়া, অধোতে থেকে অধোদেশে গমন করে যাহা তমোগুণের কর্ম্ম—যাহা অত্যন্ত মন্দ।—সুষুম্না-মার্গে স্থির গুম্ভস্বরূপ যে বায়ু, যিনি এই শরীরকে ধারণ করিয়া আছেন তাহাতে যিনি থাকেন তিনি ব্রহ্মের অণুকে অনুভব করেন। পরে হৃদয়ে, কূটস্থে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে মন ও প্রাণের স্থিতি লাভ হয়, তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। ক্রিয়া না করিলে সাধারণে ইহা লক্ষ্য করিতে পারে না। কূটস্থের মধ্যে ভালরকমের জ্যোতির্বিশিষ্ট আকাশ মণ্ডল, প্রদীপের সলিতার মত আলো সেই আকাশ মণ্ডলে জ্বলিতে থাকে, তাহারই মধ্যে ত্রিলোক। পরে এই সমস্তই যে ব্রহ্ম তাহাই বোধ হয়। ক্রিয়া মন দিয়া অনেকক্ষণ প্রতিদিন করিলেই প্রাণ সুষুম্নার মধ্যে গমনাগমন করে। যাঁহাদের এইরূপ হয় তাঁহারাই সত্ত্বপ্রধান পুরুষ। পরে এই প্রাণ যখন মাথায় চড়িয়া স্থির হইয়া যায়—তখন গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই জন্য যাঁহারা সুষুম্নায় থাকেন তাঁহাদের ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি হইতে হইতে আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হয়, পরে সহস্রারে প্রবেশ হয়।

আজ্ঞাচক্র হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের স্থান। কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত রজোগুণের এবং নাভির নীচে তমোগুণের স্থান। সাধনার দ্বারা কণ্ঠের উপরে মন যিনি রাখিতে পারেন তাঁহার মন রজস্তমোময় ক্ষেত্র পার হইয়া সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে পারে। ইহাই সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থা। সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থা হইতেই আজ্ঞাচক্র ও তদূর্দ্ধে মনের স্থিতি হইলে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়। সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থা হইলে দেহের সর্ব্ব দ্বার দিয়াই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। তখন দূর শ্রবণ, দূর দর্শন, ইচ্ছামাত্রই দেবলোকে দেবতাদের সহিত অবস্থান হইয়া থাকে। যাঁহাদের রজোগুণ প্রবল তাঁহাদের স্থান মধ্যলোকে অর্থাৎ কর্ম্মভূমি এই জগতে বারংবার আসা যাওয়া করিতে হয়। তাঁহাদের কর্ম্মস্থান কণ্ঠের নীচে, (হৃদয়ে) এ হৃদয় সর্ব্বদাই ধুক্ ধুক্ করিতেছে, কি হইবে কিরূপে উহা আরম্ভ হইবে—এই সমস্ত মনোভাব। হস্তাদিই তাঁহাদের কর্ম্মের প্রধান সাধন, যাহা দ্বারা সাধারণতঃ সংসারী জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে। তমোগুণের অধম কার্য্যাদি অধোদেশ হইতেই বেশীর ভাগ হয়। নাভির নীচে নিতম্ব, জঘনাদি প্রদেশ, ঐ সব স্থানেই কামের বসতি। কামলীলা, পশুভাব সব ঐ দেশ হইতেই হয়। যাহাদের মন সর্ব্বদাই নাভির নীচে, সেই সকল কামভোগপরায়ণ জঘন্য জীবের অধোগতিই লাভ হয়॥ ১৮

(গুণকে অতিক্রম করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়)

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা|দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯

অন্বয়। যদা দ্রষ্টা (যখন দ্রষ্টা) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে) অন্য কর্ত্তারং (অন্যকে কর্ত্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (না দেখেন), গুণেভ্যঃ চ (এবং গুণসকল হইতে) পরং (গুণের অতীত বস্তুকে) বেত্তি (জানিতে পারেন), তদা (তখন) সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবং (আমার ভাব, ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৯

শ্রীধর। তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চং উক্ত্বা তদ্বিবেকতঃ (তদ্ব্যতিরেকেন) মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি, অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং—ব্যতিরিক্তং তৎ সাক্ষিণম্ আত্মানং বেত্তি তু মদ্ভাবং—ব্রহ্মত্বম্ অধিগচ্ছতি—প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে প্রকৃতির গুণসঙ্গ কারণই যে সংসারপ্রপঞ্চ তাহা বলিয়া এক্ষণে তদ্ব্যতিরেকে মোক্ষপ্রাপ্তি দেখাইতেছেন]—যখন কিন্তু দ্রষ্টা বিবেকী হইয়া বুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত গুণ ভিন্ন অন্যকে কর্ত্তারূপে দেখেন না, কিন্তু গুণই কর্ম্ম করে এইরূপ দেখেন, এবং গুণসমূহের ব্যতিরিক্ত তৎসাক্ষীস্বরূপ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি মদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, যাহারা অন্যদিকে দৃষ্টি করিতেছে যাহা দ্বারায় সেই আত্মাতে সর্ব্বদা দৃষ্টি রহিয়াছে—তখন ত্রিগুণাতীত হইয়া পর ব্রহ্মেতে থাকিয়া আমার ভাব অর্থাৎ এক হইয়া আপনা আপনি বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি ব্রহ্মেতে গমন করে।—শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"পুরুষের প্রকৃতিস্থতারূপ মিথ্যাজ্ঞানের সহিত যে জীব সম্বন্ধ, তাহারই গুণত্রয়ে আসঙ্গ হয়। সুখ, দুঃখ, মোহাদি এই ত্রিবিধ গুণ হইতে—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়—এই প্রকার বোধই গুণত্রয়ের সহিত পুরুষের সঙ্গ। এই সঙ্গই পুরুষের সংসারের কারণ। সদসৎ জাতির মধ্যে যে জন্ম তাহাই সংসার। এই অবিদ্যামূলক মিথ্যা জ্ঞানই বন্ধের কারণ, এবং সম্যগ্‌দর্শনই মোক্ষের উপায়, সেইজন্য বলিতেছেন যে কার্য্য, কারণ ও বিষয় এই তিনরূপে পরিণত গুণত্রয় হইতে অন্য কেহ কর্ত্তা হইতে পারে না, যে ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করিয়া থাকে, এবং গুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গুণসমূহের সাক্ষীকেও দেখিয়া থাকে, সেই দ্রষ্টা মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে"। বাস্তবিক দেহবুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত গুণগুলি ব্যতীত কর্ম্মের কর্ত্তা অন্য কেহ নহে, এইরূপ গুণ সমূহকে কর্ত্তা, এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মা সাক্ষী মাত্র, এই জ্ঞান যাঁহার সুদৃঢ় হইয়াছে তিনি ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ইহাই "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"। এখন এইটুকু উপর উপর পুঁথির জ্ঞান থাকিলেই যে তাঁহারা ভগবানের স্বরূপাবস্থায় পৌঁছিতে পারিবেন তাহা নহে। আমাদের সংসারে জড়াইয়াছে কে? ত্রিগুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নায় যে প্রাণ প্রবাহ চলিয়াছে, তাহাতেই

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০

জীবের সহিত ত্রিগুণের তাদাত্ম্য - উহাই জীবের বহির্দৃষ্টিরূপ সংসার হইতেছে, সেই প্রাণ প্রবাহের অন্যথা না হইলে সংসারদৃষ্টি নষ্ট কিছুতেই হইবে না। এইজন্য কি করিতে হইবে? সেই প্রাণের সাধনা গুরূপদেশ মত করিতে পারিলে তবেই প্রাণপ্রবাহ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিবে, তখনই গুণাতীত পরব্রহ্মের সহিত মিলন হইবে। পরাবুদ্ধির সহিত এই বুদ্ধি এক হইয়া যাইবে। গুণের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ লুপ্ত হইবে, তখন গুণকার্য্য আর আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আত্মাকে তখনই গুণাতীত বলিয়া বুঝা যাইবে। প্রাণপ্রবাহ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নায় থাকায় বিষয়ে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি হয়, কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে হইলেও এই ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার দ্বারাই সাধন করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারাই গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়। ইহার কৌশল গুরুমুখে জানিতে হয়। গুণাতীত পুরুষেরা গুণের কার্য্য কেবল সাক্ষীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, আত্মাও প্রকৃতির কার্য্যের ঐরূপ দ্রষ্টামাত্র। প্রাণ স্থির করিয়া আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে থাকিতে পারিলেই জগতকার্য্যে ঔদাসীন্য আসে॥ ১৯

অন্বয়। দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজভূত) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা দুঃখ হইতে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হইয়া) অমৃতম্ অশ্নুতে (মোক্ষ লাভ করেন)॥ ২০

শ্রীধর। ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতি ইত্যাহ—গুণানিতি। দেহাত্মাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাঃ। তান্ এতান্ ত্রীন্ অপি গুণান্ অতীত্য—অতিক্রম্য, তৎকৃতৈঃ জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্, অমৃতং—পরমানন্দং প্রাপ্নোতি॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [তাহার পর সত্ত্বাদিগুণকৃত (অর্থাৎ যে গুণত্রয় দেহাদি আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে) অনর্থ সমূহের নিবৃত্তিদ্বারা মানব যে কৃতার্থ হয় তাহা বলিতেছেন]—দেহী দেহসমুদ্ভব গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া তৎকৃত জন্ম, জরা, মৃত্যুরূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই তিনগুণ অতীত হ'য়ে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন সেই মহাদেব যিনি এই দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন অর্থাৎ কুটস্থ স্বরূপ আপনিই আসিয়াছেন তিনি স্থিরত্ব পদ পাইয়া জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত পদ অর্থাৎ অমর পদ ভোগ করেন।—শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"মায়ার উপাধিভূত তিনটী গুণকে—জীবিত থাকিতে থাকিতেই অতিক্রম করিয়া দেহী জন্মমৃত্যু জরানিবন্ধন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক অমৃতপদ লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার হইলেই জীব মদ্ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। এই দেহোৎপত্তির মূল হেতু পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়।"

গুণত্রয়ের পরিণাম এই দেহ, এই দেহের অতীত অবস্থা লাভ না করিলে কেহই মুক্তি লাভ

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১

করিতে পারে না। এই দেহাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলেই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে হইবে, অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না-বর্জ্জিত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। তাহার উপায় ক্রিয়া। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলে অণুপরিমাণ যে এই জীব সে ব্রহ্মের অণুতে মিলিয়া অজীব ব্রহ্ম হয় অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামও ব্রহ্মস্বরূপ হয়। যোনিমুদ্রায় মণির অণুর ন্যায় ব্রহ্মের অণু কূটস্থের মধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং সেই অণু স্বরূপ ব্রহ্মকে দেখিয়া ইন্দ্রিয়েরা নিবৃত্ত হইয়া যায় অর্থাৎ বিষয়ান্বেষণে ব্যাপৃত না থাকিয়া স্থিরভাবে থাকে। ক্রিয়ার পর অবস্থার এই নিদর্শন। তখন দেহী মদ্ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। তাহা কিরূপে হয়? ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন অন্যদিকে যায় না, আত্মা পরমাত্মাতে লীন হইলে যে ঐশ্বর্য্য (নেশা) হয়, তাহাতে থাকিয়া মহৎব্রহ্মে লীন হয়, অর্থাৎ মহৎতত্ত্বাদির গতি ও গুণের জ্ঞান হওয়ায়, তখন তাঁহাকে ভগবানই বলা যায়, তিনিই জগদ্‌ব্যাপক মহেশ্বর। কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র স্বরূপ জ্যোতিঃ আছেন। সেই ভগবান সর্ব্বব্যাপী, তন্নিমিত্ত তিনি সর্ব্বগত শিব। তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত, স্রোতের মধ্যে জল, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যেমন থাকে তদ্রূপ। ঘর্ষণ বা পেষণ দ্বারা যেরূপ ঐসব বাহির করিতে হয়, সেইরূপ প্রাণাপানের ঘর্ষণ দ্বারা এই গুহাস্থিত পুরুষকে দর্শন করা যায়। যিনি প্রাজ্ঞ (জীব) তিনিই পরমাত্মা। তাঁহার উপাধি হৃদয়াকাশ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকিলে 'আমি'র হরণ (হৃৎ) হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার "আমি" থাকে না। এই অবস্থাকেই "অন্তরাকাশ" বলে, এই অন্তরাকাশই পরব্যোম ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছেন। সেই পরমাত্মা শরীরের আনখাগ্রকেশে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই শরীরের সার জ্যোতিঃ, যাহা না থাকিলে এই শরীর মৃতের ন্যায় হয়। সেই অচিন্ত্য শক্তিরূপা জ্যোতিঃর সার হইতেছেন যিনি হৃদয় গুহায় "অণোরণীয়ান্" রূপে প্রকাশিত আছেন। এই ব্রহ্মাণু ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ। তাহা হইলে এই মহাদেব কূটস্থই দেহে উৎপন্ন হইয়া জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিরত্ব পদ লাভ করিয়া তিনি জন্ম জরা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া বিদেহ অবস্থা যাহা অমৃত পদ তাহা লাভ করেন ॥ ২০

অন্বয়। অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। প্রভো! (হে প্রভো) কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কিরূপ লক্ষণদ্বারা) [দেহী] এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণ) অতীতঃ ভবতি (মুক্ত হন); কিমাচারঃ (কিরূপ আচার যুক্ত হন), কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই তিন গুণকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)? ২১

শ্রীধর। গুণান্ এতান্ অতীত্য অমৃতম্ অশ্নুতে ইত্যেতৎ শ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং আচারং গুণাত্যয়োপায়ং চ সম্যগ্ বুভুৎসুঃ অর্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো কৈঃ লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈঃ আত্মনি উৎপন্নৈঃ চিহ্নৈঃ গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণ প্রশ্নঃ। কঃ আচারঃ অস্য

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২

ইতি কিমাচারঃ—কথং বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। কথঞ্চ—কেন উপায়েন, এতান্ ত্রীনপি গুণান্ অতীত্য বর্ত্ততে ? তৎ কথয় ইত্যর্থঃ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিলে অমৃত লাভ হয়, ইহা শুনিয়া গুণাতীতের লক্ষণ, তাঁহার আচার এবং গুণত্রয় অতিক্রমের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়া]—অর্জ্জুন বলিতেছেন, প্রভো ! আত্মাতে উৎপন্ন কীদৃশ লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারা দেহীকে গুণাতীত বলিয়া জানা যায়—ইহাই লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন। কিমাচার শব্দের অর্থ তাঁহার আচার কিরূপ অর্থাৎ তিনি কি ভাবে অবস্থান করেন ? কথং অর্থাৎ কি প্রকারে বা এই গুণত্রয় অতিক্রম করা যাইতে পারে ? তাহা বল ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের তেজ বলিতেছেন :—এই তিন গুণের চিহ্ন কি ? আর ইহার অতীতই বা কিরূপ প্রকারে হয় ? আর কিসে থাকিলেই বা হয় ? আর এই তিন গুণটাই বা কি প্রকার ? আর ইহাতে কি রূপেই বা লোকেরা রহিয়াছে ? হে প্রভো ! প্রকৃষ্টরূপে হইয়াছ তুমি এই শরীর হইতে অর্থাৎ উত্তম পুরুষ তুমি বল।—যখন জানা গেল এই গুণত্রয়ই আমাদের ভববন্ধনের হেতু, তখন ভববন্ধন মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করা সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অর্জ্জুন বলিতেছেন, প্রভো, ত্রিগুণের জ্বালায় জীব ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, সে ত্রিগুণের লক্ষণ তো তুমি বলিলে আমিও বুঝিলাম। এখন বলিয়া দাও জন্মমৃত্যুর বীজ এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় কিসে ? যে অতিক্রম করে তাহার এমন কি লক্ষণ ফুটে উঠে যদ্দ্বারা তাহাকে ত্রিগুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। তুমি চিনাইয়া না দিলে আমাদের নিজ নিজ অহঙ্কার সর্ব্বদা ভুল বুঝাইয়া দিবে। গুণেতে থাকেই বা কেমন করিয়া, গুণাতীত হয়ই বা কেমন করিয়া ? গুণাতীত হইলে তাহার আচার ব্যবহার কেমনতর হয় ? এই সব বুঝাইয়া দাও প্রভো ॥ ২১

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। পাণ্ডব ! (হে পাণ্ডব) প্রকাশং চ (প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) প্রবৃত্তিং চ (ও কর্ম্ম প্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (সমুদিত হইলে) ন দ্বেষ্টি (যিনি দ্বেষ করেন না), নিবৃত্তানি চ (এবং উহারা নিবৃত্ত হইলে) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) ॥ ২২

শ্রীধর। "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্ব্বিশেষ বুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং—শ্রীভগবানুবাচ - প্রকাশং চেত্যাদি ষড্ভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ—সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং। প্রবৃত্তিঞ্চ—রজঃ কার্য্যম্। মোহঞ্চ—তমঃ কার্য্যম। উপলক্ষণমেতৎ সত্ত্বাদীনাম্। সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি—স্বতঃ প্রাপ্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি। নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা ন কাঙ্ক্ষতি, "গুণাতীত স উচ্যতে" ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৪শ শ্লোকে "স্থিতপ্রজ্ঞের কি লক্ষণ" ইত্যাদি জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হইলেও, পুনরায় তাহা বিশেষরূপে জানিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ইহা মনে করিয়া প্রকারান্তরে তাহার লক্ষণাদি ছয়টী শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন।—তন্মধ্যে এই এক শ্লোকদ্বারা তাহার লক্ষণ বলিতেছেন।] প্রকাশ শব্দের অর্থ (একাদশ শ্লোকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন)—সত্ত্বের কার্য্য। প্রবৃত্তি শব্দে রজোগুণের কার্য্য। মোহ শব্দে তমোগুণের কার্য্য। গুণত্রয়ের উপলক্ষণার্থ ইহা কথিত। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য যথাযথ স্বতঃ প্রবৃত্ত (উপস্থিত) হইলে যিনি দুঃখ বুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না, এবং নিবৃত্ত হইলে সুখ বুদ্ধিতে আকাঙ্ক্ষা না করেন তিনিই গুণাতীত (এইরূপে ৪র্থ শ্লোকের সহিত ইহার অন্বয়)॥ ২২

["তামসীবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে আমি মূঢ় হইয়াছি, রাজসী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে আমি রজোগুণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভ্রংশ হইতেছি—ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর, এইরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশরূপ গুণ আমার বিবেক উৎপাদন করিতেছে এবং আমাকে সুখে আসক্ত করিতেছে—এই প্রকার ভাবনার বশে গুণত্রয়ের কার্য্যগুলির প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকাদি গুণত্রয়যুক্ত পুরুষেরা যেমন আত্মসমক্ষে একবার প্রকটিত হইয়া পুনর্ব্বার নিবৃত্ত সত্ত্বাদিগুণের কার্য্যাবলীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন হয়, গুণাতীত পুরুষ কোন প্রকার গুণকার্য্যের প্রতি সেরূপ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হন না—শঙ্কর]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে ঃ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক রকমের প্রকাশ, যেখানে দিনও নাই রাতও নাই—সেই প্রকাশেতেই প্রকৃষ্টরূপে তদগতচিত্ত; তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃষ্টরূপে মত্ত মাতালের মত থেকে অন্য সকল দিক হইতে চিত্ত তদ্গত হইয়া তৎপদে মোহিত, তজ্জন্য তাহাতে থাকিতে সম্যক্‌রূপে ইচ্ছা, তাহাও নাই আর তাহাতে না থাকি তাহারও ইচ্ছা নাই—মাথার উপর চড়ে বসে যেন কেহ বসিয়া আছে—এইরূপ বসে থেকে এই তিন গুণকে অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বিশেষ রূপে চলিতেছে না অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মনাড়ীতে চলিতেছে এইরূপ গুণের পর অবস্থা একভাবে থাকা। ইহা যে জানে সেই আমার ভাবেতে যায়—অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যতদূর পারা গেল বর্ণনা করা গেল (যাহা গুরুবক্ত্র গম্য—রুর চিহ্ন সব স্থির)।—

আমরা সাধারণতঃ যে রকম প্রকাশকে প্রকাশ বলিয়া থাকি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় প্রকাশ সেরূপ ধরণের নহে। তাহা যে অজ্ঞান বা অন্ধকার তাহাতো নয়ই, অথবা আলোকের মত কিছু যে প্রকাশ তাহাও নহে। সে এক আশ্চর্য্য রকমের প্রকাশ, ইন্দ্রিয়াদির অনধিগম্য। উপনিষদ বলিতেছেন ঃ—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ কঠঃ, ২য় অঃ, ২য় বল্লী

সূর্য্য সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াও সর্ব্বাত্মভূত সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র এবং তারকাও তদ্রূপ; এই বিদ্যুৎসমূহও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই অগ্নি আর পারিবে কোথা হইতে? অধিক কি, এই যে সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সেই প্রকাশমান পরমেশ্বরের অনুগত ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড যেমন অগ্নিসংযোগবশতঃ দাহকারী অগ্নির অনুগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি এই সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহও তাঁহার দীপ্তিতেই বিভাত হন। এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভাত হন। এবং কার্য্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রহ্মের দীপ্তিরূপতা স্বতঃই অবগত হওয়া যায়। কেননা, যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই সে কখনই অন্যের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না।

ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া তাঁহার চৈতন্য সত্তায় চরাচর জগৎ প্রকাশিত হইতেছে।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" কঠ, ১ম, তৃতীয়।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে গূঢ়—আবৃত অর্থাৎ আত্মারূপে কাহারো নিকট প্রকাশ পায় না। কারণ দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তবে ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া শোকমুক্ত হন কিরূপে? তিনি তো প্রকাশ পান না। বিরুদ্ধ কথা হয় বলিয়া বলিতেছেন—যে তিনি অবিশুদ্ধ বুদ্ধিরই অজ্ঞেয়, পরন্তু সংস্কৃত অগ্র্য একাগ্রতাযুক্ত এবং সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণে তৎপরা বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।

অগ্রে বুদ্ধি স্থির করিতে পারিলে অত্যন্ত সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম যিনি তাঁহাকে দেখা যায়। 'ক্ষীণদোষাঃ যতয়ঃ পশ্যন্তি'—যাঁহারা সংযতচিত্ত অর্থাৎ যাঁহাদের মন অন্যদিকে যায় যায় না। তাঁহারা শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

এই যে শুভ্র নির্ম্মল প্রকাশ, এই প্রকাশ স্বরূপে যাঁহার চিত্ত তদ্গত, এই পরম পদ ছাড়িয়া যাঁহার চিত্ত অন্য কোথাও যাইতে চাহে না—এরূপ অবস্থা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা তো পরপারে পৌছিলেন বলিয়া, কিন্তু যাঁহারা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, পরম নির্ভয় পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত অবস্থাকেও আগ্রহভরে কামনা করেন না, আবার চিত্ত যদি একটু সংসারে নামিয়া পড়ে তাহা হইলেও বিরক্ত হন না। তাঁহারা সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মদর্শন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্য "পরমপদে বসিয়াই থাকিব আর সংসার দর্শন করিব না", এইরূপ ইচ্ছাও তাঁহাদের উদয় হয় না, অথবা সংসারের যে যে ভোগ বাকী আছে তাহা ভোগ করিয়া লই এরূপ ইচ্ছাও মনে উদয় হয় না। কারণ যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ হন—তাঁহাদের নিকট

"যে যে কামাঃ দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে, সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতুর্য্যা, নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ॥" কঠ

মনুষ্যলোকে যে যে কাম্যপদার্থ অত্যন্ত দুর্লভ সেই সমস্ত কাম্যবস্তু স্বেচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। রথস্থিতা, বাদিত্রাদিযুক্তা এই রমণী সমূহ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এরূপ সুন্দরী

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩

মনুষ্য কর্ত্তৃক লব্ধ হওয়া সম্ভব নহে। সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলে এই সকল এবং অন্যান্য উপভোগ্য কাম্য বস্তু সকল সাধকের নিকট আপনাপনি উপস্থিত হয়, যাঁহারা এই সকল ভোগ্য বস্তুতে মোহিত না হইয়া ইহাদিগকে নিষ্ঠীবনের মত ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই সাধকাগ্রগণ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চাবস্থার সাধক তাঁহারাই—যাঁহারা এইসকল কাম্যবস্তু, এবং ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। ইন্দ্রিয়লালসা হেতুই কাম্য বস্তুকে সুখকর মনে হয় এবং দুঃখজনক বস্তু গ্রহণে অনিচ্ছা হয়। কিন্তু যাঁহারা মনঃ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমূহের অতীত স্থানে উপনীত হইয়া নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলিয়াছেন—যাঁহারা ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যেই কোন পার্থক্য অনুভব করেন না—সেই ব্রহ্মবিদ্ যোগীদের প্রাণশক্তি (যদ্দ্বারা চালিত হইয়া মন বিষয়ানুভব করে) মাথার উপরে চড়িয়া বসে, আর নামে না, তাঁহারা তিনগুণের অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন কিনা, সুতরাং গুণ আর তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ে টানিয়া আনিতে পারে না। যখন সূক্ষ্মরূপে প্রাণ ব্রহ্মনাড়ীতে চলে তখন গুণের পর অবস্থা, অর্থাৎ তখন মন অনন্ত হয়, একভাবে সর্ব্বদা স্থির থাকে। এই অবস্থা যে পায় এবং তাহাতেই থাকে সেই ব্রহ্মপদ লাভ করে, **ক্রিয়ার পর অবস্থা** ইহাই। ইহাই গুরুভাব। কারণ "গুরু"র

"গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদিগুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়াভ্রান্তিবিমোচকঃ॥"

গুরুর—"গু" বর্ণ মায়াকে বলে অর্থাৎ যাহা গুণবিশিষ্ট। মূলাধারস্থিত শক্তি হৃদয়েতে আসিয়া যখন স্থিতি পদ লাভ করে অথচ মৃণাল তন্তুর মত হৃদয়েতে গমনাগমন করে, সেই স্থিতি পদের নাম হংস, এবং তাহা যখন প্রাণমধ্যে যায় ও বিন্দু দেখায়, তাহারই নাম রূপ বা কূটস্থ। এই পর্য্যন্ত "গুরু"র "গু" কার। তাহার পর "রু" কার মায়াভ্রান্তি বিমোচক উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা—ব্রহ্মনিরঞ্জন রূপ। তখন সব স্থির। এই পরম স্থির ভাবই বিশ্বাতীত বা গুণাতীত অবস্থা।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতে আসিয়া এই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ সংসারের কিছু কিছু কার্য্যাদি করেন বটে, কিন্তু সংসারে অভিভূত হইবার মানুষ সেখানে না থাকায়, প্রকৃতি তাঁহাকে কিছুতে লিপ্ত করিতে পারে না। তখন তিনি এদেশের লোক নহেন। পরাবস্থার পরবাবস্থাতেও গুণ তাঁহাকে জড়াইতে পারে না। রজঃ, তম তো আসিতেই পারে না, কখন কখন ঝির ঝির করিয়া ক্ষীণ ধারায় সত্ত্বগুণ আসিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ চ্যুতি ঘটাইতে পারে না॥ ২২

অন্বয়। যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (স্থিত হওয়ায়) গুণৈঃ (গুণ সমূহের কার্য্য সুখ দুঃখাদির দ্বারা) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) গুণাঃ (গুণ সমূহ)

বর্ত্তন্তে (স্বকার্য্য করিতেছে) ইত্যেবং (এইরূপে) যঃ অবতিষ্ঠতি (যিনি অবস্থান করেন), ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না); [তিনিই গুণাতীত] ॥ ২৩

শ্রীধর। তদেবং স্বসংবেদ্যং গুণাতীতস্য লক্ষণম্ উক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং কিমাচার ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নস্য উত্তরমাহ—উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ—সাক্ষিতয়া আসীনঃ—স্থিতঃ সন্, গুণৈঃ—গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ, ন যো বিচাল্যতে—স্বরূপাৎ ন প্রচ্যাব্যতে। অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে, মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যঃ তূষ্ণীম্ অবতিষ্ঠতি। পরস্মৈপদমার্ষম্। নেঙ্গতে--ন চলতি ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে গুণাতীতের স্বসংবেদ্য (নিজ বোধগম্য) লক্ষণ বলিয়া, পরসংবেদ্য (অপরের বোধগম্য) লক্ষণ—তাঁহার আচার কিরূপ—এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তিনটী শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন]—(১) উদাসীনবৎ—উদাসীনের ন্যায় সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত হইয়া (২) গুণকার্য্য যে সুখদুঃখাদি তাহার দ্বারা যিনি বিচলিত হন না অর্থাৎ স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না। (৩) সত্ত্বাদি গুণসকল স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ মাত্র নাই—এইরূপ বিবেকজ্ঞান দ্বারা যিনি তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করেন, চঞ্চল হন না। 'অবতিষ্ঠতি'—এই ক্রিয়া পদে যে পরস্মৈপদ রহিয়াছে, তাহা আর্ষ প্রয়োগ ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—গুণ সব যেমন তেমনই আছে—বায়ু স্থির যেমত নির্ব্বাত দীপ।—নির্ব্বাত স্থানে প্রদীপ শিখা যেরূপ স্থির ও চঞ্চল থাকে, তদ্রূপ যোগীর প্রাণবায়ু স্থির হইয়া যায়, এবং প্রাণবায়ুর স্থিরতার সহিত মনও অত্যন্ত স্থির হইয়া যায়, তখন সে মন আর বিষয়ে ভ্রমণ করে না, কিন্তু দেহ-প্রকৃতি যত দিন বর্ত্তমান থাকে ততদিন যোগীর প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ দেহাদিতে যেমন হইবার হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার মন সেই সব সুখ দুঃখাদি ভোগে নির্লিপ্ত থাকে অর্থাৎ সুখের বিষয় পাইয়া সুখী হওয়া বা দুঃখাস্পদ ব্যাপারে তিনি দুঃখী হন না। তুর্য্যাবস্থাগত চিত্তের বিষয় সংস্পর্শ হয় না। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুর্য্যাবস্থা—তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পর্য্যন্ত ভোগের, আনন্দের অবস্থা, চতুর্থ অবস্থাটি শিবভাব, সেখানে কিছুই নাই, কোন ভোগ নাই। এই কূটস্থের পর যে পুরুষ (চতুর্থ অবস্থা গুণাতীত অবস্থা) তিনিই ব্রহ্ম। কূটস্থই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ তিনিই সকল কার্য্যের কারয়িতা, আর যিনি কাজ করেন বিষয়ে লিপ্ত হন তিনিই ভূতাত্মা। এই ভূতাত্মাই শ্বাস বা জীব যিনি বিষয়ে লিপ্ত হন। কূটস্থই মহৎ, তিনি অণুর অণু, রূপার মত আভা। তাহার পর যে পুরুষ, তিনিই শিব। এই শ্বাসই ব্রহ্ম, ইহার দ্বারাই ব্রহ্মতে যাওয়া যায়। সমুদয় তখন এক হয়, সেই এককে দেখিলে সমুদয়কে দেখা যায়। মনই এই সমুদয়কে সৃষ্টি করে, সেই মন যাহার কূটস্থে থাকে সে সর্ব্বজ্ঞ হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই ব্রহ্মস্বরূপ সাধক হন, তখন চরাচররূপ যে বোধ বা ভাব তাহার হনন হয়। মনই সকল ভাবের কর্ত্তা, মন যখন চর বা অচর কোন বস্তু মনন করে, তখন তাহা মন্তকে গৃহীত হয়। সেই মন্তকেই আবার মন যখন ব্রহ্মলীন হয়, তখন চরাচর সমস্ত বস্তুরই বিনাশ হয়, উহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আত্মা পরমাত্মাতে যোগ হইয়া লীন হন, তখন সকল রকমের দেখা শুনার সংহার হয়, ও তদ্গত চিত্ত হইয়া চরাচর বস্তুর নাশ হয়। অতএব সেই

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪

শিবই রুদ্ররূপে সকলকে নাশ করেন। ইনিই ব্রহ্ম, সদা সর্ব্বদা ইঁহাকেই ধ্যান করা উচিত, তাহা হইলেই জন্মমৃত্যু হইতে রহিত হইয়া পরমপদে লীন হওয়া যায়, সংসারে যাহাপেক্ষা আর মঙ্গলকর বিষয় হইতে পারে না। এইরূপেই সকল বস্তুর ত্যাগ আপনা আপনি হইয়া থাকে, তখন কোন বস্তুতেই মন যায় না। সুতরাং অনুকূল বা প্রতিকূল বস্তুর প্রতি তাঁহার রাগ বা দ্বেষ থাকিতে পারে না। সর্ব্ববিষয়েই তিনি উদাসীনবৎ থাকেন, অর্থাৎ বাহ্য কোন ব্যাপারই তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। চিত্তকে বহির্ম্মুখ করিবার মত শত শত ঘটনা ঘটিয়া যায়, কিন্তু কোন ঘটনাই তাঁহার মনকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারে না। বিষয়ের প্রবাহ নদীস্রোতের মত চলিতেছে, তিনি তাহাতে তলাইয়া যান না, স্রোতের উপরে যেন ভাসিতে থাকেন। প্রাণের স্থিতি ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মস্তকে হইলে, এই অবস্থা সাধকের স্বাভাবিক হয়। ইহাই প্রাণবায়ুর স্থিরতা। গুণ সকল যে যাহার কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু তিনি নির্ব্বাত দীপের মত স্থির এইরূপ আত্মস্থ পুরুষই গুণাতীত। সুখ দুঃখ বা মোহে তাঁহার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় না॥ ২৩

অন্বয়। [যঃ—যিনি] সমদুঃখসুখঃ (দুঃখ ও সুখে সমজ্ঞান বিশিষ্ট) স্বস্থঃ (স্বরূপে অবস্থিত) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (লোষ্ট্র, পাষাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞান সম্পন্ন) তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যবুদ্ধিসম্পন্ন) ধীরঃ (ধীমান) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিন্দা প্রশংসাতে সমভাব)—

শ্রীধর। অপি চ—সমেতি। সমে সুখদুঃখে যস্য। যতঃ স্বস্থঃ—স্বরূপ এব স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনানি যস্য। তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য। ধীরঃ—ধীমান্। তুল্যা নিন্দা চ আত্মস্তুতিশ্চ যস্য॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [আরও]—(৪) যে ব্যক্তির সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান (৫) যিনি স্বস্থ অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিত, অতএব (৬) লোষ্ট্র পাষাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞানসম্পন্ন, এবং (৭) সুখ-দুঃখের হেতুভূত যে প্রিয়াপ্রিয় সে সম্বন্ধে যাঁহার তুল্যবুদ্ধি. আর (৮) যে ব্যক্তি ধীমান এবং (৯) নিন্দাস্তুতিতে যাহার তুল্য জ্ঞান [তিনিই গুণাতীত]॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—স্বীয় অবস্থায় থাকিয়া দুঃখ সুখ দুইই সমান সে সময়ে সোনা আর ঢেলা, নিন্দা স্তুতি দুইই সমান, যেমত মাতালের প্রিয় অপ্রিয় দুয়েতে সমান; বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে দৃষ্টি।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহাই পরাবুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা। সেই পরমানন্দ অবস্থাতে যাঁহারা নিত্যমগ্ন তাঁহাদের নিকট আর সুখ দুঃখ কি? সুখ দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, যখন মনই নাই তখন আর সুখ দুঃখ আসিবে কিরূপে? বিষয়াসক্তচিত্ত সুখের জিনিষ পাইলে সুখী হয়, দুঃখের ব্যাপার ঘটিলে কাঁদিয়া আকুল হয়, কিন্তু যিনি আত্মস্থ থাকিয়া এই সব জগৎ ও জগদ্ব্যাপারকে স্বপ্নতুল্য বোধ করেন, সেই সদা জাগ্রত পুরুষকে আর সুখ দুঃখ দিবে

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

(গুণাতীত হইবার উপায়)

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

কে? পরমানন্দরসে মগ্ন হইয়া যাঁহার নিজ সাংসারিক হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টি নাই, তাঁহার নিকট স্বর্ণ ও মাটির ঢেলার সমানই মূল্য। গুণেরই স্তুতি নিন্দা, যিনি গুণকে অতিক্রম করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট স্তুতি নিন্দার আর পার্থক্য কোথায়? মাতালের যেমন নিজের অবস্থার জ্ঞান নাই, সেইরূপ যাঁহার লক্ষ্য বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া পরাবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই গুণাতীত। মদ্যপ যেমন সুখ দুঃখের প্রতি উদসীন, মুক্ত পুরুষের পরাবুদ্ধিতে স্থিতি হেতু তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয় বলিয়া কিছুই থাকে না ॥ ২৪

অন্বয়। মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) তুল্যঃ (সমবোধ) মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্র ও শত্রুপক্ষে) তুল্যঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন), সর্বারম্ভ পরিত্যাগী (দেহধারণার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত উদ্যমত্যাগী) সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হন) ॥ ২৫

শ্রীধর। অপি চ—মানেতি। মানে অপমানে চ তুল্যঃ। মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ। সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভান্—উদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। এবম্ভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—(১০) যে ব্যক্তি মানাপমানে তুল্য আর (১১) মিত্র পক্ষে, শত্রুপক্ষে যিনি তুল্য এবং (১২) যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের উদ্যমে ত্যাগশীল, এবম্ভূত আচারযুক্ত ব্যক্তিকেই লোকে ত্রিগুণাতীত বলে ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মান অপমান শত্রুমিত্র ক্ষয় দুয়েতেই তুল্য মাতালের মতন। সুরু হবার পূর্ব্বেই ত্যাগ হ'য়ে বসে রয়েছে সুরুই কত্তে চায় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কর্ম্মই করিতে চায় না, ইহারই নাম গুণাতীত।—মাতালের পক্ষে যেমন তিরস্কার পুরস্কার দুই সমান, গুণাতীতের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁহার কোন কাজ সঙ্কল্প করিয়া সুরু করিতে হয় না। কেহ কিছু করিতে বলিল করিলেন, আবার কেহ বার বার নিষেধ করিতেছে তাহাও তাঁর কাণে যায় না। আমিষ খাইলেন কি নিরামিষ খাইলেন তাঁহার কোন ধারণাই নেই, খাইতে দিলে খাইলেন এই পর্য্যন্ত। যাহা মনে আসিল করিলেন, করিয়া তজ্জন্য কোন আনন্দ বা তাপ নাই। শত্রুপক্ষ অপমান করিল, নিন্দা করিল বা মিত্রপক্ষ প্রশংসা করিল তাঁহার কিছুই গ্রাহ্য নাই ॥ ২৫

অন্বয়। যঃ চ (আর যিনি) মাম্ (আমাকে) অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন (ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে) সেবতে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) এতান্ গুণান্ (এই গুণ সকলকে) সমতীত্য (সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হ'ন) ॥ ২৬

শ্রীধর। কথঞ্চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্তত ইতি ? অস্য প্রশ্নস্য উত্তরমাহ—মাঞ্চেতি। "চ" শব্দঃ অবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরম্ অব্যভিচারেণ—একান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য—সম্যগতিক্রম্য, ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায়, কল্পতে—সমর্থো ভবতি॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [কিরূপে এই গুণত্রয় অতিক্রম করা যায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন]—শ্লোকস্থ 'চ' শব্দের অর্থ অবধারণ। আমি যে পরমেশ্বর আমাকেই অব্যভিচার অর্থাৎ একান্ত ভক্তিযোগসহ যিনি সেবা করেন, তিনিই এই ত্রিগুণ সম্যগ্‌রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—"মাঞ্চ" আমাকে অর্থাৎ ক্রিয়া যে করে—অন্য দিকে (মন) আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া অর্থাৎ সতী হইয়া—কূটস্থ প্রতি এক দৃষ্টে থাকিয়া আত্মায় থাকা, অপর বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি না করে থাকা—ধারণা, ধ্যান, সমাধি পূর্ব্বক গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া যে ক্রিয়া করে—যাহা গুরু-বক্তৃগম্য সে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ত্রিগুণ রহিত হইয়া অষ্ট প্রহর সমান রূপে স্থির থাকিয়া আমার ভাব অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছি বা যাইব—এরূপ কল্পনা হয়—ওঁ।—ত্রিগুণ কিরূপে অতিক্রম করা যায় এইবার সেই উপদেশ ভগবান দিতেছেন। সেই উপায় হইতেছে—অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের সেবা। অব্যভিচারিনী ভক্তি কি ? আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"ন কদাচিদ্ যো ব্যভিচরতি তেন ভক্তিযোগেন ভজনং"—যে ভক্তিযোগ কোন সময়েই অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তিযোগই অব্যভিচার, এইরূপ অব্যভিচার ভক্তিযোগের দ্বারা যে ভজন করে। অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা ভগবানের সেবার অর্থ তাহা হইলে এই হইতেছে—সাধারণতঃ আমাদের অন্তঃকরণে বহুবিধ বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে কিন্তু যে অন্তঃকরণে অন্য বৃত্তির উদয় না হইয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থ যে আত্মা, নারায়ণ বা ঈশ্বর রহিয়াছেন—যিনি আমার "আমি"—সেই "আমি" কে ছাড়া অন্যভাব বা অন্য প্রত্যয় যাঁর মনে আসে না তাঁহারই অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ভগবানের ভজনা হয়।

সর্ব্বরূপে তাঁহার রূপ, জগতে চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থই সেই পরমেশ্বর সত্তায় পরিপূর্ণ তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই—এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভজনা করাই প্রকৃত ভজন, কিন্তু তাহা মুখের কথা নহে, এই ভাবটি চিন্তা করিলেই যে সেই ভাব মনে জমিয়া যাইবে বা স্থায়ী হইবে তাহা নহে। অনন্যভাব তখনই হইতে পারে যখন মন শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের দ্বারা বিচলিত হইবে না। এরূপ অবস্থাটি পাইতে হইলে মনকে নিশ্চল করিতে হইবে। মন যদি ময়লা ঘাঁটে বা আসক্তি পূর্ব্বক বিষয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে তাহার সতীত্ব থাকিল কৈ ? অব্যভিচারী সে হইবে কিরূপে ? তখনই সে অব্যভিচারী হইতে পারে যখন অন্য কোন বস্তুর দিকে আসক্তিপূর্ব্বক সে দৃষ্টিপাত করিবেনা। দৃষ্টিকে আত্মাভিমুখ করাইতে হইলে ক্রিয়া করিতে হইবে, ক্রিয়া দ্বারা বিনাবরোধে প্রাণ স্থির হইলে তৎসহ মনও স্পন্দনশূন্য হইয়া যাইবে। স্পন্দনশূন্য মনের কোন অবলম্বন থাকে না, এই নিরাবলম্ব চিত্তেই অনন্যভাব বা ভক্তি ফুটিয়া

উঠে। ইহা ইড়া পিঙ্গলার শ্বাস চলিতে হইবে না। তবে ক্রিয়া করিতে করিতে প্রাণের স্থিরতা সহ যখন শ্বাস সুষুম্নায় প্রবাহিত হইবে, এবং সেই প্রবাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই প্রাণ মস্তকে চড়িয়া বসিবে, তখন অষ্টপ্রহর স্থির ভাব—এইরূপে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাধক পরম অভয় পদ লাভ করিয়া থাকেন। কেবল জ্ঞানের কথা আওড়াইয়া বা উচ্চকণ্ঠে হরি নাম করিয়া অশ্রু ফেলিলেই হইবে না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকিতে প্রকৃত ভক্তি আসিবে না। কামিনীকাঞ্চনে অত্যাসক্ত পুরুষের ভক্তি লাভ হয় না। তবে জ্ঞান ভক্তির কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার হয়। কবির বলিয়াছেন

"কবির পাককরূপী রাম হ্যায় সবঘট রহা সমায়
চিৎ চকমক্ ভিন্ হটায়ে নহী ধূয়াঁ হোয় হোয় যায়।"

কবির বলিতেছেন রাম যিনি তিনি অগ্নিরূপী সকল ঘটেতেই প্রবেশ করিয়া আছেন, যিনি চিত্তরূপী চক্‌মকীকে সরাইতে না পারেন (অর্থাৎ মনের কল্পনা) তাহার অগ্নি দর্শনের সৌভাগ্য হয় না, কেবল ধূমমাত্র দেখা হইয়া থাকে।

"চিত্তঃ কারণমর্থানাং তস্মিন্নস্তি জগত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎক্ষীণং তচ্চিকিৎস্তং প্রযত্নতঃ॥"

বিষয়ের কারণ চিত্ত তাহাতেই ত্রিজগত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই চিত্ত ক্ষীণ হইলে তবে জগৎ ক্ষীণ হয়, অতএব সেই চিত্তক্ষয়ের উপায় অনুসন্ধানই বিধেয়।

সে জিনিস তো সহজ নহে, সে যে নাম রূপের অতীত, নাম রূপ না মিটিলে তাহাকে কে পাইবে? কবির বলিয়াছেন—

কবির নিশুদিন দমে বিরহিনী অন্তরগত কি লায়ে।
দাস কবিরা কোবুঝে সৎগুরু গয়ে লাগায়ে॥
কবির যোজন বিরহী নাম্ কে সদা মগন মন মাহ
য়া দরপন কি সুন্দরী কহু না পকড়ি যাঁহ॥

কবির বিরহিনী অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই যাঁহার মনে উদয় হয় না দিনরাত বিরহ জ্বালায় জ্বলিতেছেন, যাহার জন্য জ্বলিতেছেন তিনি অন্তরে অন্তরস্থ হইয়া গোপনে বসিয়া আছেন। কবির এ জ্বালার কথা আর কে বুঝিবে? কিন্তু সদ্গুরুই এই আগুন ধরাইয়া গিয়াছেন। কবির যিনি নামের (পরমাত্মার) বিরহী অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, পরাবস্থারূপী পরমাত্মা—যাঁহাকে পাইলে প্রাণ শীতল হয়, তাঁহাকে পাইবার জন্য মন সেই সাধন লইয়াই মগ্ন হইয়া আছেন—কিন্তু মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকে সাধারণ দৃশ্যের মত দেখা যাইবে—যেমন স্ত্রীপুত্রধনাদি আমরা পাই—কিন্তু হায় কূটস্থে যাহা দেখা যায় ঐ বুঝি সেই—এই মনে করিয়া যে তাঁহাকে দেখিতে বা ধরিতে যাইবে, তখনই তাহা আর দৃষ্টিগোচর হইবে না। যেমন দর্পণে সুন্দরী দেখা যায়, অনুভব করা যায়, কিন্তু ধরা যায় না। ধরা গেলে তো চিন্ময় জড়ে পরিণত হইতেন—তাই তাঁহাকে ধরিয়াও ধরা যায় না, পাইয়াও পাওয়া যায় না। তবে এই বিরহের অবস্থা যাঁহার লাভ হয়, তাঁহার মনে আর

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

কোন বিষয়াভিলাষ থাকে না, সুতরাং চিত্তস্পন্দনও থাকে না। তখন যা কিছু প্রত্যক্ষ হয় সবই যেন সেই বিষ্ণুময় বলিয়া মনে হয়। এই জগৎ প্রপঞ্চ মনেরই কল্পনা, সেই মন থাকিতে প্রপঞ্চ মিটিবে না। ব্রহ্ম দর্শনও হইবে না। এইজন্য প্রকৃত ভগবদভজন মনোনিগ্রহ। সেই মন নিগ্রহ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ক্রিয়া ॥ ২৬

অন্বয়। হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়, পর্য্যাপ্তি অথবা প্রতিমা বা ঘনীভূত প্রকাশ), অব্যয়স্য (অব্যয় অর্থাৎ পরিণামশূন্য) অমৃতস্য (মোক্ষের) [প্রতিষ্ঠা]; শাশ্বতস্য (অপক্ষয় রহিত বা চিরন্তন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা); ধর্ম্মস্য চ (ধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা), ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ (অখণ্ড আনন্দস্বরূপেরও প্রতিষ্ঠা) ॥ ২৭

শ্রীধর। তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণোহীতি। হি—যস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা, ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং। যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্য—নিত্যস্য, অমৃতস্যচ—মোক্ষস্য নিত্যমুক্তত্বাৎ। তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ তথা ঐকান্তিকস্য—অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠা অহং পরমানন্দৈকরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনঃ মদ্ভাবস্য অবশ্যম্ভাবিত্বাদ্ যুক্তমেবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিত ভবাম্বুধিম্।
সুখং তরতি তদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। [এ বিষয়ে অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে হেতু বলিতেছেন]—যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম। যেমন সূর্য্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশ তদ্বৎ আমিও ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রকাশ। আমি নিত্যমুক্ত বলিয়া নিত্য অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের প্রতিষ্ঠা। শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া আমি মোক্ষের সাধনারূপে শাশ্বত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এবং পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া ঐকান্তিক অর্থাৎ অখণ্ডিত সুখেরও আমি প্রতিষ্ঠা। অতএব মদ্সেবকগণের মদ্ভাব প্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিত্ব প্রযুক্ত তাঁহারা যে ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন ইহা যুক্তিযুক্ত বলাই হইয়াছে ॥ ২৭

শ্রীকৃষ্ণাধীন যে গুণ সমূহ (সত্বরজস্তম) তাহাদের প্রতি আসক্তি দ্বারা প্রসঞ্জিত (সজ্ঘটিত) এই যে ভবসাগর তাহা তাঁহার ভক্ত সুখে উত্তীর্ণ হয়—ইহাই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান বলিলেন।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই ব্রহ্মেতে যখন ক্রিয়া করিতে করিতে যখন প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হয় তখন অমর পদ পাইয়া অমৃত ক্ষরণ হয় অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হইয়া যায়—তখন অব্যয় অবিনাশী সুতরাংই—কারণ সব ব্রহ্ম হইলে

নাশ হইয়া যাহা হইবে তাহাও ব্রহ্ম, এক বস্তু হইলে বস্তুন্তর না থাকিলে নাশ কি প্রকারে হইবে? নিত্য সেই অবস্থায় থাকিলে অর্থাৎ অষ্টপ্রহর সেই অবস্থায় থাকিলে, সেও ব্রহ্ম হইয়া গেল—ইহারই নাম ধর্ম্ম—অধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া আত্মাতে থাকার নাম ধর্ম্ম—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ক্রিয়া করার নাম ধর্ম্ম যাহা গুরুবক্ত্র গম্য—যেখানে থাকিলে সুখের এক অন্ত অর্থাৎ বরাবর একই অবস্থায় পরমানন্দ সুখে অবস্থিতি করে, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যাঁহারা ক্রিয়া করেন সকলেরই হইয়া থাকে অল্পস্বল্প—আর এই সুখের নিমিত্তই সকলেই পরের গোলামী করিতেছে আর মহাশয় মহাশয় বলিয়া খুন!! কিন্তু "বিরলোহি মহাশয়ঃ" যাহা অষ্টাবক্র বলিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সদা সর্ব্বদা বিশেষরূপে দিব্যদৃষ্টি দ্বারায় আত্মশক্তিপূর্ব্বক কূটস্থেতে আট্‌কিয়া রহিয়াছেন, তৎপদ ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না তিনিই মহৎ ও মহাশয়—সেই বড় মানুষ যাহা কিছু দিবে তাহা পাইয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত সুখ; কিন্তু যে সুখের অন্ত নাই, এমত সুখ লাভ করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না—এমত সুখে সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছা করা চাই!!!—পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে অচলা ভক্তির সহিত যে আমার সেবা করে সে সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্মভাব লাভ করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হইলে গুণ অতিক্রম করিতে হইবে। অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত স্বরূপ হইতেছি "আমি"। এই "আমি" টি কে? ইনিই কূটস্থ চৈতন্য, যিনি গীতা বলিতেছেন। ব্রহ্মই শেষ গন্তব্য স্থান, কিন্তু তাহা সর্ব্ব প্রকার উপাধি বিবর্জ্জিত, সত্তামাত্র নির্গুণ স্বরূপ—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থার দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। এই নির্গুণ স্বরূপ অদৃশ্য, অস্পর্শ ও অব্যবহার্য্য, তাহাতে আনন্দও নাই নিরানন্দও নাই। জল যেমন বাষ্পের ঘনীভূত মূর্ত্তি, তুষার যেমন জলের ঘনীভূত মূর্ত্তি—তদ্রূপ নিরবয়ব নির্লিপ্ত বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তার ঘনীভূত প্রকাশ এই কূটস্থ চৈতন্য—তিনি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের জ্ঞানদাতা, তিনি সকল উপাসক মাত্রেরই জ্ঞানদাতা। তাহা হইলে রূপবিবর্জ্জিত ব্রহ্মের যদি কিছু প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় থাকে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশিত করেন—তিনিই কূটস্থ চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ। এই কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম একই। ব্রহ্ম মনঃবুদ্ধির অতীত, ইনি মনঃ-বুদ্ধির গ্রাহ্য এই মাত্র। কিন্তু তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করা যায় না। যেমন সরোবরে কমল ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ ব্রহ্মসরোবরে এই কূটস্থ চৈতন্যের বিমলজ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে। উহাই অরূপের রূপ। ভক্ত সাধক এইরূপ দেখিয়া কৃতার্থ হন।

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্য"

তুমি সর্ব্বত্র একরূপ, সকল প্রাণির তুমিই আত্মা, সর্ব্ব-শরীর-রূপ-পুরে তুমিই অবস্থিত, তুমি নিত্য বিদ্যমান, সত্যস্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ, তুমি অন্তহীন অথচ সকলের আদি। এই কূটস্থ চৈতন্যের যাঁহারা উপাসক, তাঁহারাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম স্বরূপ

হইয়া যান। কিন্তু উহা অবিজ্ঞাত ভাব, আমাদের ইন্দ্রিয় মন তাহার কোন ধারণাই করিতে পারে না। সেই অবিজ্ঞাত ব্রহ্ম যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হন, তিনি ব্রহ্মের নিজ শক্তি বা মায়া, তাহাই সগুণভাব মহেশ্বরভাব—যাঁহাকে পুরুষোত্তমও বলে এবং আত্মাশক্তিও বলা হয়। যোগীরা এই শক্তিকেই কূটস্থ চৈতন্য বলেন। যোগীরা কূটস্থ ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া যোগধারণা দ্বারা পুরুষোত্তমের জ্ঞান লাভ করেন। যখন আমিই সেই এক পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক—এইরূপ অনুভব হয় তখনই সর্ব্বংব্রহ্মময়ং জগৎ হয়। অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ হন এবং সবই ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াতে "আমি"ও থাকে না। ক্রিয়ার দ্বারা স্থিতি পদ পাইলেই উপরোক্ত অবস্থা লাভ হয়। উহাই অমৃতপদ। উহার নাশ কখনও নাই, এই জন্য অব্যয়। অন্য কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া অষ্টপ্রহর যিনি সেই অবস্থাতে মগ্ন হইয়া থাকেন, তিনিই বুঝিতে পারেন এই ক্রিয়ার পর অবস্থাই শাশ্বতধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এবং ইহাতে যে শান্তি ও আনন্দ আছে, তাহা রিপুর দাসত্ব বা লোকের দাসত্ব করিয়া পাইবার উপায় নাই। এই পরমপদই ঐকান্তিক সুখের একমাত্র আশ্রয়, বা উহাই একমাত্র নিরতিশয় সুখ স্বরূপ। তখন আর কোন বস্তুর জন্যই ইচ্ছা নাই, এইরূপ ইচ্ছারহিত হইলেই শান্তিপদ বা অমৃত পদ লাভ হয়। প্রাণবায়ুর স্থিরতা হইতেই এই অমৃত পদ লাভ হয়। সেই অমর পদই ব্রহ্মযোনি, অর্থাৎ সেই স্থিতিপদ হইতেই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়। সেই ব্রহ্মযোনি হইতে সমুদয়ের উৎপত্তি, এবং সেইখানেই সমুদয়ের লয় হয়। এ সংসারে জীব একবার যাইতেছে একবার আসিতেছে—এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্ম বৃথায় কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের খুঁটী প্রাণকে যে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া আছে সেই কেবল গতায়াত হইতে মুক্ত ॥ ২৭

ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ।

সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিরাকার নিরবয়ব, কিন্তু তিনি ঘটস্থ হইলেই তাঁহার নাম রূপ উপাধি হয়। অসংখ্য ঘটে যেমন আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব পড়ে, প্রতি দেহঘটে কূটস্থ জ্যোতিঃ ও তন্মধ্যস্থ বিন্দুই সেই বিশাল ব্রহ্ম স্বরূপের প্রতিবিম্ব। এই দেহঘটে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করাতেই অবিনাশী কূটস্থ ব্রহ্ম বদ্ধবৎ পরিদৃষ্ট হন। তখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া শিবস্বরূপ আত্মা পঞ্চতত্ত্ব মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ উপাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি জীবভাবে মোহিত হন। ক্রিয়ার পর স্থিতি হইলেই তবে এই বন্ধন মোচন হয়। দর্পণ যেরূপ মলযুক্ত হইলে আর তাহাতে প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ নির্ম্মল কূটস্থ ব্রহ্ম পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই আত্মার সুনির্ম্মল ভাব আবৃত হইয়া যায়। তখন মরিচা পড়া তরবারির মত আর তাহাতে মুখ দেখা যায় না, সব অন্ধকার মত হইয়া যায়। প্রাণপ্রবাহ ইড়া পিঙ্গলায় চলিলে জীবের এইরূপ দশাই হইয়া থাকে, তখন

সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মের যেন কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যায় না। ইড়ায় প্রাণ চলিলে কেবল বিষয় চিন্তাই প্রবল হয়; বিষয় তৃষ্ণায় তখন মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়। আবার পিঙ্গলায় প্রাণপ্রবাহ চলিলে মানুষ ঠিক মাতালের মত হইয়া যায় কোনরূপ জ্ঞান বা ধৈর্য্য কিছুই থাকে না। আলস্য প্রমাদে জীবকে হতচেতন করিয়া ফেলে, অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া জীব কেবলই হাবুডুবু খাইতে থাকে। শ্বাস সুষুম্নায় চলিলে মন সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ থাকে। শ্বাসের গতি অনুযায়ী মনেরও গতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই জন্য শ্বাস যাহাতে স্থির হয় তাহাই করা আবশ্যক। শ্বাসে লক্ষ্য রাখিতে পারিলেই শ্বাসের চাঞ্চল্য হ্রাস হয়। যে যত ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তাহার সত্ত্বগুণ তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সাধকের অত্যধিক সত্ত্বগুণ স্ফুরিত হইলেই সম্যক্ প্রকারে ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ হয়। তখন যদি দেহত্যাগ হয় তাহা হইলে ব্রহ্মচিন্তায় দেহত্যাগ হইবে, তাহা হইলে সাধকের ব্রহ্মলোকে গতি হইবে, সেখানে প্রকৃতির মলযুক্ত ভাব না থাকায় সাধক ব্রহ্মপদে স্থিতি লাভ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হন। রজস্তমগুণের স্ফুরণের সময় দেহত্যাগ ঘটিলেই কর্ম্মময় জীবন বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবন প্রাপ্তি হয়। ক্রিয়া বেশীক্ষণ করিলে সত্ত্বগুণ বাড়ে, তখন শ্বাস উর্দ্ধে অর্থাৎ মাথায় প্রবেশ করে, তখনই শান্তি পদ লাভ হয়। যাহারা বাসনার বশে ক্রিয়া করে, তাহারা আবার মনুষ্য যোনিতে ফিরিয়া আসে, আর যাহারা ক্রিয়া করে না, তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে কামবৃত্তি কখনও অপসারিত হয় না। তাহাদের দৃষ্টি অধোদিকে সুতরাং তাহাদের গতিও তদ্রূপ। যত কিছু কর্ম্ম সমস্ত এই ত্রিগুণের খেলা, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নায় প্রবাহ হেতু হইয়া থাকে। আত্মা এ সকল ব্যাপার হইতে উর্দ্ধে, তাই তাঁহাকে ত্রিগুণাতীত বলে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার ক্রিয়া যতদিন চলে ততদিন কাহারও মুক্তিলাভ ঘটে না। কিন্তু সাধনার দ্বারা যিনি সর্ব্বদা আত্মদৃষ্টি করিতে শিখিয়াছেন, তিনি গুণকার্য্যে আসক্ত না হওয়ায় স্থির ভাব প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার বুদ্ধি পরাবুদ্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত পদ লাভ করে, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবস্থিত থাকেন। এইরূপ সাধকের চিত্ত তদ্গত, অন্য কোন কামনা তাঁহার থাকে না, তখন তাঁহার প্রাণপ্রবাহ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নায় বিশেষভাবে চলে না, তাঁহার প্রাণ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। ইহাই গুণকে অতিক্রম করা। গুণ সকল চালিত হয় প্রাণ বায়ু দ্বারা, বায়ু তখন স্থির সুতরাং গুণের গুণত্ব তখন কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় স্থিত পুরুষের পক্ষে স্বর্ণ আর পাথর, নিন্দা আর স্তুতি, মান ও অপমান, শত্রু ও মিত্র সবই সমান বোধ হয়। অষ্টপ্রহর সমান ভাবে এইরূপ স্থিতি যাঁহার হয় তিনিই জীবন্মুক্ত॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

প্রাণিশাস্ত্রানুসারে উৎপাদন ও সংহরণ এই দুইটি ক্রিয়াই জীবনতত্ত্বের প্রধান বিষয়। এই দুইটি ক্রিয়া পরস্পর বিপরীত হইয়াও একটি অন্যটির সহিত মিলিত ভাবে অবস্থিত। কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। উহা সর্ব্বদা একসঙ্গে বর্ত্তমান। হিন্দুদের লিঙ্গপূজার মধ্যে এই মিলিত ভাবটী বড় সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে দেখিতে

পাওয়া যায়। যোনির সহিত লিঙ্গের নিত্য সম্বন্ধরূপ মূর্ত্তিটী হইল শিবলিঙ্গ। এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে যাহা প্রথমে বুঝা আবশ্যক সেই প্রসঙ্গই এখানে উত্থাপন করিতেছি। সংহরণ ক্রিয়ার সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার হইতেছে উৎসর্গ ক্রিয়া, প্রশ্বাস বা বায়ুর অপগম। এতদ্বারাই প্রত্যেক জীব-কোষাণুর মল বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ক্ষণকালের জন্যও এ ক্রিয়া বন্ধ হইলে জীবের জীবন থাকে না। উপায় বিশেষ দ্বারা এই শ্বাসের নির্গমন রোধ করা যায়, তখন শ্বাস গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় না। সমাধিমগ্ন যোগীর এই অবস্থা এত স্বাভাবিক হয় যে সাধারণ জীবের মত শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগই তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হইয়া থাকে। শ্বাসের বহিঃক্রিয়া যোগীর নিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার এই শ্বসন ক্রিয়া ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে, তখন তাহা সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া হয় বলিয়া বাহির হইতে তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। কারণ একবারে বন্ধ হইয়া গেলে শরীর থাকিতে পারে না। আমাদের শারীরিক সমস্ত ব্যাপারই এই শ্বসন ক্রিয়ার অধীন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি বৃক্ষলতাদির মধ্যেও এই শ্বসন ক্রিয়া অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সুষুম্নান্তর্গত শ্বসন ক্রিয়ার বাহ্য চিহ্ন থাকে না কিন্তু তাহা যে আছে তাহার প্রমাণ শ্বসন ক্রিয়া না থাকিলে বীজের মধ্যে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারিত না। ভর্জ্জিত বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, কারণ তন্মধ্যে প্রাণ প্রবাহিকার আধারভূতা নাড়ীটি অগ্নিতে পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রবাহিকা যতদিন থাকে ততদিন জীব মৃতবৎ হইলেও তাহার মধ্যে জীবনী শক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে। এই প্রবাহিকা নষ্ট হইয়া গেলে জীবনের আর কোন আশা থাকে না। সমাধিমগ্ন যোগীর বাহ্য শ্বাস ক্রিয়া থাকে না, এমন কি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় না, কিন্তু তবুও তাঁহার মধ্যে প্রাণ আছে নিশ্চয়, কারণ ব্যুত্থিত যোগীর সাধারণ জীবের মতই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে দেখা যায়। এই প্রাণধারা যখন ইড়া পিঙ্গলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তখনই শ্বাসের আগম ও নিগমকে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। জীবের এই অবস্থাকেই সাধারণ ভাষায় জীবিতাবস্থা বলে। একমাত্র প্রাণকেই বিবিধ কার্য্যানুসারে ও তাহার বিভিন্ন স্থানে গতির অনুযায়ী প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে প্রাণ দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রভৃতিকে নিজ নিজ কার্য্যে সংস্থাপিত করে। সৃষ্টি, পোষণ ও ধ্বংস কার্য্য এই প্রাণেরই শক্তি বিশেষ। ঐ সকল কার্য্যশক্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র নামে অভিহিত হয়। সৃষ্টির স্থান হইল মূলাধার হইতে নাভি, নাভি ও বক্ষের মধ্যে পোষণ কার্য্য সম্পাদিত হয়, কণ্ঠ হইতে আজ্ঞাচক্র হইল লয়স্থান এবং তদূর্দ্ধে সহস্রারই অমৃতময় স্থান। ঐ স্থানে স্থিতি হইলে জীব অজর অমর হইয়া যায়। প্রাণাদিরা সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত স্বভাব, কিন্তু প্রাণের যেটি অপরিবর্ত্তনীয় স্থির ভাব তাহাই আত্মা। প্রাণের এই স্থির ভাব না থাকিলে তাহার চাঞ্চল্যও থাকিতে পারিত না। এই স্থির ও চঞ্চল ভাব এক সঙ্গেই গাঁথা রহিয়াছে যোনি ও লিঙ্গ বা পুরুষ ও প্রকৃতির সংযুক্তাবস্থার ন্যায়। তাহাতেই জগৎ ও ব্রহ্ম যেন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। চঞ্চল ও স্থির প্রাণ এক সঙ্গে গ্রথিত, সেই চঞ্চলতা হইতে স্থির ভাবকে বাহিরে

করিয়া লইতে হইবে। যেমন দুগ্ধের জলভাগ পৃথক করিলেই তন্মধ্যস্থ ঘৃতকে দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ অনন্ত চাঞ্চল্যের মধ্য হইতেই অনন্ত স্থিরতাকে বাহির করিয়া লইতে হইবে। মুঞ্জ তৃণ হইতে ইষীকা (মধ্যস্থ দণ্ড) গ্রহণের ন্যায় ধৈর্য্যসহকারে স্থির প্রাণ অন্তরাত্মাকে প্রাণায়ামাদি যোগকৌশলের দ্বারা এই শরীরেন্দ্রিয় হইতে পৃথক করিয়া ফেলিতে হইবে। সূত্রাত্মা (জীব বা প্রাণ) পরমাত্মার সহিত নিত্য যোগযুক্ত হইলেও জীবের অদৃষ্ট বশতঃ নিজে কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আবার কেন্দ্রমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। জীব বহির্ম্মুখ হইয়া কেন্দ্র হইতে পরিধির মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জন্মমৃত্যুর চাঞ্চল্য হইতে সুখ দুঃখাদির চাঞ্চল্য বা বিকার এ সমস্তই স্বকেন্দ্রের বহির্ভাগে বিচরণ হেতু হইয়া থাকে। আবার নিজ কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিলে এ সমস্ত চাঞ্চল্যের লেশমাত্র থাকে না। সাধন প্রভাবে প্রাণাদি বায়ু নিজ কেন্দ্র সূত্রাত্মার মধ্যে ফিরিয়া আসে, এবং সূত্রাত্মা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইলেই যে অবস্থা প্রাপ্তি হয় যোগীরা তাহাকেই অবস্থাভেদে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধি নাম দিয়া থাকেন। এই প্রাণকে রুদ্র বলা হয়। যেমন রুদ্র সংখ্যায় একাদশ, তেমনই প্রাণ (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়) সূত্রাত্মাকে লইয়া একাদশ। প্রাণকে যে রুদ্র বলে তাহার প্রমাণ—"যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ।" রুদ্রের অর্থ যিনি রোদন করান। এই প্রাণরূপী রুদ্রই বিবিধ নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া দেহীকে অষ্ট পাশে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে। দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া সমস্তই প্রাণবায়ুর অধীন, এবং এই দর্শন শ্রবণাদির দ্বারাই জীব মোহাবিষ্ট হইয়া বিষয়ে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়, এবং বহুদিন দুঃখ ভোগ করিয়া রোদন করিতে থাকে। তাই শ্রুতিতে ঋষিদের প্রার্থনা হইতেছে—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"—হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। প্রাণের স্থিরতাই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ। প্রাণ সুষুম্নাবাহিনী হইলেই এই প্রাণের প্রসন্ন ভাব সাধককে অভয় দান করিয়া থাকে। প্রাণ সুষুম্নাবাহিনী হইয়া প্রশান্তভাব ধারণ না করিলে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের ঘুরপাক হইতে পরিত্রাণ লাভের আর কোন উপায় নাই। ইহাই প্রকৃত শিবোপাসনা বা লিঙ্গপূজা। এইরূপ শিবোপাসনাই সারাৎসার তত্ত্ব। ভক্ত সাধক তুলসীদাস তাই বুঝি বলিয়াছেন—

"সবহিঁ কহোঁ কর যোড়ি
শঙ্কর ভজন বিনা নর ভগতি ন পাবৈ মোরি।"

লিঙ্গ আর যোনি এই দুইটিই সৃষ্টি কার্য্যের প্রধান উপকরণ। শিব শক্তি, পুরুষ প্রকৃতি কিম্বা ঈশ্বর ও মায়া, এই যুগ্মভাব গুলি ঐ লিঙ্গ ও যোনির সাঙ্কেতিক নাম মাত্র। এই দুই মূল শক্তির সংযোগ হইতেই সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে—যদিও এই দুই শক্তি স্বরূপতঃ একেরই বিভিন্ন প্রকাশ। বীজাবস্থায় এই দুই শক্তি একত্রে মিলিত থাকে, তখন বীজের মধ্যে এই দুই শক্তি অভিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই অভিন্ন যুগ্মভাবকেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বলা হয়। এই ঈশ্বরের মধ্যে একদিকে যেমন সৃষ্টিকারিনী শক্তির বিদ্যমানতা রহিয়াছে অপর দিকে উহা তদ্রূপ প্রপঞ্চাতীত শান্ত শিবাদ্বৈত পরমব্রহ্ম রূপে বর্ত্তমান। তখন শিব ও শক্তিকে পৃথক

বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যখন পরব্রহ্মের মধ্যে সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন "স ঐক্ষত"—পরব্রহ্মের এই সৃষ্টিমুখী সংকল্পের বুদ্বুদ উপরে উত্থিত হইতে না হইতেই শিব শক্তি পৃথক হইয়া দ্বৈততত্ত্বের বিকাশ হইতে থাকে। কিন্তু এই শিব শক্তি তখনও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, তখনও উভয়ে অঙ্গাঙ্গী ভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে মিলিত থাকেন। তখনও উহা অলিঙ্গ পদবাচ্য না হইলেও জ্ঞান গোচর নহে—এইজন্য এ ভাবকেও অব্যক্তাবস্থা বলা যাইতে পারে। ইহাই শিবশক্তির সমরস ভাব, উহাই জগদম্বা বা আদ্যাশক্তি—এতৎমধ্য যে চৈতন্য তাহাই দ্বিতীয় পুরুষ। পরে এই অব্যক্তাবস্থা ভেদ করিয়া যে ভাস্বর জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়, তাহাকেই লিঙ্গ বলা হয়, ইনিই তৃতীয় পুরুষ, এই স্থান হইতেই প্রকৃতি পুরুষের ভেদ আরম্ভ হয়। লিঙ্গ যখন প্রকাশিত হয় তাহার সহিত যোনিও উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে যাহা এক অদ্বিতীয় ছিল, পরে যাহা দ্বৈতরূপে প্রকাশিত হইয়াও অব্যক্তের মধ্যেই অঙ্গাঙ্গী রূপে বর্ত্তমান ছিল, এখন সেই অভেদ ভাব যেন ছুটিয়া গেল, প্রকৃতি পুরুষ দুইটি পৃথক ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু পরস্পরের এই পৃথক অস্তিত্ব প্রস্ফুটিত হইলেও তাঁহারা এক অন্যের সহিত যেন জড়িত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকই এ অবস্থায় তাঁহাদের পৃথক রূপ বা ভাব প্রকাশিত হইলেও কদাপি তাঁহারা এক অন্যকে ছাড়িয়া থাকেন না। ইহাই পুরুষ প্রকৃতির পৃথক ও মিলিত ভাব। যোগীরা ইহাকেই কূটস্থ জ্যোতিঃ রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতিমণ্ডলের মধ্য বিন্দু বা কেন্দ্র স্থানীয় যে কৃষ্ণ গোলক (ছোট শালগ্রাম শিলার ন্যায়, উনিই রাধাবক্ষঃস্থল-স্থিত শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই সাধকেন্দ্রগণের ধ্যেয় সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষ। এই পুরুষটিই পুরুষোত্তম নারায়ণ বা দ্বিতীয় পুরুষের সহিত অভিন্ন। কিন্তু জ্যোতিঃ ও তন্মধ্যস্থ কৃষ্ণ যে "পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং" (নীল পীতের মিশ্রণ) তিনিই তৃতীয় পুরুষ। এ দুয়ের এমনই সম্বন্ধ যে একে ছাড়িয়া অন্য প্রকাশিত হইতে পারে না—ইহাই যুগল ভাব। তদবধি সর্ব্ব প্রকার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এই যুগ্মভাব অনুস্যূত হইয়া আছে। কিন্তু এই যুগ্মরূপ সেই শিবশক্তি সমরস ভাবপূর্ণ চিদাকাশ হইতেই সরোবরের সলিল মধ্য হইতে কমলের প্রস্ফুরণের মত উত্থিত হয়, ঠিক যোনির অন্তর্গত লিঙ্গের ন্যায়। জ্যোতিই যেন প্রকৃতির দেহ এবং কৃষ্ণ গোলক মধ্যস্থ বিন্দুই যেন পুরুষের দেহ। এই দেহদ্বয় পৃথক ভাবে প্রকটিত হইয়াও অনাদি কাল হইতেই নিত্য মিলিতাবস্থায় চির বর্ত্তমান। এই জ্যোতিঃ স্বরূপ দেহ ত্রিগুণান্বিত, তাই উহাকে তিনটি রেখা রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। এই তিনটি রেখার মিলনে একটা ত্রিভুজ গঠিত হয়। এই তিনটি বস্তুতঃ এক হইলেও গুণের প্রভেদ হেতু বিভিন্নাকার (শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উভয়স্থানেই তাহাদের কেন্দ্রমধ্যস্থ বিন্দুটি একই। এই যোনিমণ্ডল ঊর্দ্ধমুখ ও অধোমুখ ভেদে দুই প্রকার। ঊর্দ্ধমুখ যোনিকে ব্রহ্মযোনি ও অধোমুখ যোনিকে মাতৃযোনি বলে। সাধককে এই মাতৃযোনি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, তাই তন্ত্রে বলা হইয়াছে—"মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য সর্ব্বযোনিং (ব্রহ্ম) সমাচরেৎ।" কিন্তু উভয় যোনির কেন্দ্র হইল সেই বিন্দু। এই বিন্দুস্থানকে না জানিলে কেহই সাধক হইতে পারেন না। যদিও উভয় যোনির মধ্যে সেই একই বিন্দু (পুরুষ) বর্ত্তমান তথাপি জগদ্যোনি কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থান হেতু ঐ বিন্দুকেও যেন দুইটি বলিয়া ভ্রম হয়। এই দুইটি বিন্দু যাহে মিটারের পারদের মত উপরেও থাকিতে

পারে নীচেও থাকিতে পারে। পার্থক্য এই যে এই বিন্দু একই কালে উভয় যোনিতেই বর্ত্তমান থাকে। যখন এই বিন্দু অধোমুখী হইয়া মূলাধারস্থ ত্রিকোণ যন্ত্রে অবস্থিত হয়, তখনই সংসারমুখী বাসনা প্রবাহিত হয়, শিব জীবরূপে প্রকাশিত হন। এই অধোমুখ বিন্দুকে ঊর্দ্ধমুখ করিবার প্রক্রিয়া হইল ষট্‌চক্র ভেদের ক্রিয়া বা প্রাণায়াম। ইহাকে মূলাধার হইতে যেন জোর করিয়া উঠাইয়া আজ্ঞাচক্রের উপর ঊর্দ্ধ ত্রিকোণ মধ্যে সংস্থাপন করিতে হয়। প্রাণ সংযমের দ্বারা যখন ঊর্দ্ধ ত্রিকোণক্ষেত্রে বিন্দু সংস্থাপিত হন, তখনই জীব শিব হইয়া যান। ইহাকে স্মরণ করিয়াই বেদ বলিলেন—"ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ।" ইনি বিরূপাক্ষ কারণ তাঁহার দৃষ্টি তখন জগতে সম্বদ্ধ নহে। ঊর্দ্ধ ত্রিকোণে বিন্দু প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রপঞ্চাতীত অবস্থার সাক্ষাৎ হয়। ঊর্দ্ধ ত্রিকোণে বিন্দুকে ধারণ করাই গর্ভাধান ক্রিয়া। ঊর্দ্ধ ত্রিকোণে গর্ভধারণ হইলেই জগত লয় হইয়া ব্রহ্মমুখী অপ্রাকৃত অবস্থার উদয় হয়; এবং অধঃ ত্রিকোণে গর্ভাধান হইলেই জগত প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

(পুরুষোত্তম যোগঃ)

(সংসার অশ্বত্থ)

শ্রীভগবানুবাচ।

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। উর্দ্ধমূলং (উর্দ্ধে যাহার মূল) অধঃশাখম্ (অধোদিকে যাহার শাখা) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অশ্বত্থং (অশ্বত্থরূপ সংসার—কাল পর্য্যন্ত যাহা থাকিবে না। সংসার এতই অনিত্য! অ—না, শ্ব—কল্য, স্থা—থাকা) প্রাহুঃ (বলেন), ছন্দাংসি (বেদ সকল) যস্য (যাহার) পর্ণানি (পত্রসমূহ), তং (তাহাকে) যঃ বেদ (যিনি জানেন) সঃ বেদবিৎ (তিনি বেদবেত্তা) ॥ ১

শ্রীধর। বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।
বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে 'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে' ইত্যাদিনা পরমেশ্বরম্ একান্ত ভক্ত্যা ভজতঃ তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তং। ন চ একান্ত ভক্তিঃ জ্ঞানং বা অবিরক্তস্য সম্ভবতি ইতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকম্ জ্ঞানম্ উপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসারস্বরূপং বৃক্ষরূপকালংকারেণ বর্ণয়ন্ শ্রীভগবান্ উবাচ—উর্দ্ধমূলমিতি। উর্দ্ধম্—উত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং উৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্। অধঃ ইতি ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে। তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তম্। বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতি ইতি বিশ্বাসানর্হত্বাৎ অশ্বত্থং প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাৎ অব্যয়ঞ্চ প্রাহুঃ, "উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন" ইত্যাদ্যা শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি—বেদা যস্য পর্ণানি—ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্ব প্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যঃ তং এবম্ভূতং অশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসার-প্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলম্ ঈশ্বরঃ শ্রীনারায়ণঃ। ব্রহ্মাদয়ঃ তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ। স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ, প্রবাহরূপেন নিত্যশ্চ। বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতাম্ আপাদিতশ্চ। ইতি এতাবানেব হি বেদার্থঃ। অত এব বিদ্বান্ বেদবিৎ ইতি স্তূয়তে॥ ১

বঙ্গানুবাদ। [বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান বা ভক্তি হয় না—ইহা স্ফুট অর্থাৎ ব্যক্ত হইল। এজন্য ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে বৈরাগ্য সহিত জ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন।]

[পূর্ব্বাধ্যায়ের (১৪শ অঃ) শেষভাগে (২৬শ, ২৭শ শ্লোকে) 'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরমেশ্বরের একান্ত ভক্তি দ্বারা ভজনশীল ব্যক্তিরা তৎপ্রসাদলব্ধ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করেন—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু অবিরক্ত (বৈরাগ্যহীন) ব্যক্তির একান্ত ভক্তি

বা জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, এইজন্য বৈরাগ্যপূর্ব্বক জ্ঞানের উপদেশ দিবার ইচ্ছায় প্রথমতঃ সার্দ্ধশ্লোক দ্বারা সংসার স্বরূপ বৃক্ষকে রূপকালঙ্কারে বর্ণন করতঃ]—শ্রীভগবান বলিতেছেন—এই সংসারবৃক্ষ উর্দ্ধমূল—অর্থাৎ ইহার মূল উর্দ্ধ—অর্থাৎ উত্তম, যাহা ক্ষর এবং অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট, এমন যে পুরুষোত্তম তিনিই যাহার মূল, তাহাকে এবং পুরুষোত্তম হইতে অধঃ অর্ব্বাচীন কার্য্যোপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদিকে এতদ্বারা গৃহীত হইয়াছে, বৃক্ষের শাখার মত ইঁহারা যাহার শাখা—তাহাকে অশ্বত্থ বলে কারণ বিনশ্বর বলিয়া অর্থাৎ "শ্বঃ" আগামী প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে না এই জন্য যাহা বিশ্বাসের অযোগ্য। ইহাকে কিন্তু "অব্যয়" বলে কারণ প্রবাহরূপে ইহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। "উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ"—কঠ উঃ—(এষঃ—এই সংসাররূপ বৃক্ষ, অশ্বত্থ—অস্থায়ী, আগামী দিবস পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা বলা যায় না। উর্দ্ধমূল—ইহার মূল উর্দ্ধ অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অবাক্‌শাখঃ—নিম্নদিকে বিস্তৃত শাখাযুক্ত, অর্থাৎ দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি জীবদ্বারা পূর্ণ, সনাতনঃ—অনাদিকাল হইতে এই সংসার প্রবাহরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে)। বেদসকল সেই সংসার বৃক্ষের পত্ররাজি, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন দ্বারা ছায়াস্থানীয় যে কর্ম্মফল সমূহ তদ্দ্বারা সংসার বৃক্ষটি জীবসমূহের আশ্রয়ণীয় রূপে প্রতিপাদন করে বলিয়া বেদসকল যেন পত্রের কার্য্য করে। অর্থাৎ বেদ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই কর্ম্মফল উৎপত্তির কারণ। কর্ম্মফলই ছায়াস্থানীয় হইয়া সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ, এজন্য সংসার বৃক্ষের পর্ণস্থানীয় বেদ। [যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থা ধর্ম্মাধর্ম্ম-তদ্ধেতু-ফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ। যেরূপ পত্রগুলি বৃক্ষের রক্ষার প্রতি হেতু, সেইরূপ এই বেদত্রয়ও সংসার বৃক্ষের পরিরক্ষক। যেহেতু বেদের দ্বারাই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ এবং ফল প্রকাশিত হইয়া থাকে—শঙ্কর]

যিনি সংসারকে এইভাবে জানেন তিনিই বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের মূল—ঈশ্বর বা নারায়ণ, তদংশ ব্রহ্মাদি শাখাস্থানীয়। এই সংসার বৃক্ষ বিনশ্বর কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য এবং বেদোক্ত কর্ম্ম সমূহ দ্বারা এই সংসারের সেব্যত্ব প্রতিপাদিত হয় অর্থাৎ সংসারে আসিয়া বেদোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায় বলিয়া ইহা সেব্যও বটে—ইহাই বেদার্থ বা তাৎপর্য্য অতএব এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত পুরুষকেই বেদবিদ্ রূপে স্তুতি করা যায় ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—মূল উপরে শাখা নীচে—মাথা উপরে হাত পা নীচে এইরূপ অশ্বত্থবৃক্ষাকার কলেবর, উল্টা ছন্দ অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে যে সকল ঝাড় বুটা দেখা যায়, সেই পাতা ; এইরূপ যে কূটস্থকে জানে সেই বেদকে জানে ; আবার—।—শ্রুতিতেও আছে—

উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ ॥ কঠঃ উঃ

এবং (এই— সংসাররূপবৃক্ষ) অশ্বত্থঃ (অচিরস্থায়ী, যাহা আগামী দিবস পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ) [এই অশ্বত্থের] ঊর্দ্ধমূলঃ (ঊর্দ্ধ যে বিষ্ণুর পরমপদ তাহাই যাহার মূল) অবাক্‌শাখঃ (শাখা সমূহ যাহার অধোগামী—স্বর্গ, নরক তির্য্যক ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিরূপ শাখা-সমূহ দ্বারা অবাক্‌শাখ) [ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূত-সমূহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় নির্ম্মিত করিয়াছে।] সনাতনঃ (অনাদি কাল হইতে প্রবাহরূপে বর্ত্তমান বলিয়া চিরন্তন)—[এই সংসার বৃক্ষের যিনি মূল] তিনিই শুক্রং (শুভ্র বা শুদ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়, চৈতন্যাত্মক আত্মজ্যোতিঃস্বভাব), তৎ ব্রহ্ম (সর্ব্বাপেক্ষা মহত্বনিবন্ধন তিনিই ব্রহ্ম) তৎ এব (তিনিই) অমৃতং (অবিনাশ স্বভাব) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন), সর্ব্বে লোকাঃ (সমস্ত লোক) শ্রিতাঃ (সেই ব্রহ্মেই আশ্রিত রহিয়াছে) তং উ (তাঁহাকে) কশ্চন (কেহই) ন অত্যেতি (অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারেনা)। ইহাই সেই বস্তু যাহা নচিকেতা জানিতে চাহিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে অনেকবার এই গীতা ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি যে ব্রহ্মাণ্ডই সংসার, এবং এই দেহ সেই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র আয়তন। "দেহঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ। ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি মে মতঃ" (শিবসংহিতা)। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন এই সংসারবৃক্ষ অবাক্‌শাখঃ অর্থাৎ শাখা গুলি অধোদিকে বিস্তৃত—স্বর্গ নরক তির্য্যক ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিরূপ শাখাসমূহ দ্বারা অবাক্‌-শাখঃ—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় নির্ম্মিত করিয়াছে—এই বৃক্ষাকার কলেবর। মূল বলিতে আমরা সাধারণতঃ তলের দিকে অন্বেষণ করিব, কিন্তু এই বৃক্ষের মূল উপরে, শাখা নীচে। এই মূল জীবের মস্তক, মেরু শিখর। এই মেরুশিখর সহস্রারই বিষ্ণুর পরম পদ।*

"শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা
মুনীন্দ্রা অপ্যন্তে প্রকৃতিপুরুষং স্থানমমলাঃ ॥"

যাঁহারা শৈব তাঁহারা উক্ত স্থানকে শিব স্থান বলিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ উহাকে পরমপুরুষ

* জীবের মূল মস্তিষ্ক বা মেরুশিখর বলিলে এমন কেহ যেন না বুঝেন যে মস্তিষ্কই (Brain) যেন আসল বস্তু। মস্তিষ্কটি জীব-সম্বিতের আত্মপ্রকাশের স্থান মাত্র। সমস্তিষ্ক অবয়বটি আত্মার অধিষ্ঠান। উহারা কেহই আত্মচৈতন্য নহে, দেহকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। শরীরের নাশে জীবের নাশ হয় না, বরং দেহ হইতে বিনির্গত হইলে দেহেরই নাশ হইয়া থাকে। সেইজন্য বাক্য আসল বস্তু নহে, যিনি বলিতেছেন তিনিই জ্ঞেয় বা আত্মা, ঘ্রাণ আসল সত্য বস্তু নহে ঘ্রাতাই আসল বস্তু, রূপ আসল বস্তু নয় দ্রষ্টাই জ্ঞাতব্য বস্তু, মন আসল বস্তু নহে মনন-কর্ত্তাই আসল বস্তু, কর্ম্ম আসল বস্তু নহে কর্ম্মের কর্ত্তাই আসল জ্ঞাতব্য বস্তু—(কৌষীতকী উঃ)। সুতরাং মনুষ্যাবয়বের মধ্যে মস্তিষ্কমধ্যগত যে স্থানটিতে বিষ্ণুর পরমপদ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই সহস্রদল পদ্ম বলে।

বিষ্ণুস্থান বলেন, কেহ কেহ উহাকে হরিহর স্থান বলিয়া থাকেন, এবং দেবীভক্তেরা উহাকে শক্তিস্থান এবং কোন কোন বিশুদ্ধ মুনিগণ ঐ স্থানকে প্রকৃতিপুরুষের স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন।

"ইহ স্থানং জ্ঞাত্বা নিয়তনিজচিত্তো নরবরো
ন ভূয়াৎ সংসারে ক্বচিদপি চ বদ্ধস্ত্রিভুবনে।
সমগ্রা শক্তিঃ স্যান্নিয়মমনসস্তস্য কৃতিনঃ
সদা কর্ত্তুং হর্ত্তুং খগতিরপি বাণী সুবিমলা॥"

এই সহস্রারপদ্ম বিদিত হইয়া যিনি নিজ চিত্তকে তথায় সংযত করিতে সমর্থ হন তিনি নর-শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে পুনরায় সংসারে বা ত্রিভুবনের কুত্রাপি স্থানে আবদ্ধ হইতে হয় না। সেই সংযতচিত্ত কৃতী সমগ্র শক্তিই আয়ত্ত করিতে পারেন। সৃষ্টি স্থিতি সংহারে তাঁহার সামর্থ্য হইয়া থাকে এবং শূন্যমার্গে তিনি বিচরণ করিতে পারেন। বাগ্‌দেবী তদীয় মুখে নিরন্তর অধিষ্ঠান করেন।

"ব্রহ্মরন্ধ্রে মনো দত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥"

ব্রহ্মরন্ধ্রে মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণার্দ্ধ কালও অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে।

"অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অণিমাদিগুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ॥"

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হয়, তিনিই পুরুষোত্তম। তিনি স্বেচ্ছানুসারে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ করিয়া, শেষে আমাতেই বিলীন হইয়া যান।

এই সহস্রার কমলদলস্থিত বিষ্ণুর পরমপদ হইতে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীরূপা ত্রিধারা ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপিণী নাড়ীত্রয় প্রবাহিত হইয়াছে। এই তিনটি ধারাই ত্রয়ী বা বেদত্রয়। এই বেদোক্ত ক্রিয়া দ্বারাই (ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাতে ক্রিয়া করিয়া থাকিলে) ত্রিলোক ব্যবস্থিত, অর্থাৎ যতক্ষণ ইহাদের ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ এই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি ত্রিলোকের বিদ্যমানতা।

যাহা সহস্রারে সব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, যেখানে কিছুই ছিল না, সেই মহাশূন্য পরব্যোম (ক্রিয়ার পর অবস্থা) হইতে—

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥" সারদাতিলক।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আত্মাশক্তি হইতে যে নাদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়।

"প্রাণিদিগের সকাম-ভাবে কৃত কর্ম্ম সকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী—সর্ব্বকর্ম্ম-ফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়। তদনন্তর বিন্দুরূপী

ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই "শক্তিতত্ত্ব"। বিন্দুর অচিদংশ বীজ এবং চিদ্-অচিদ্ মিশ্রাংশ "নাদ"; চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা শক্তির ক্রিয়াপ্রধান অবস্থাই নাদ।

"অবয়বীভূত হওয়া" এই অর্থবাচী 'বিন্দ্' ধাতুর উত্তর "উ" প্রত্যয় করিয়া "বিন্দু" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবয়বীভূত হয় তাহাই বিন্দু। রেখা হইতে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা অবয়ব (Figure) সৃষ্টি হয়। সেই রেখা বিন্দুর সমষ্টি মাত্র; বিন্দু অবিভাজ্য বস্তু, কিন্তু সেই বিন্দুর পরিচালনে (মায়া শক্তির প্রভাবে) বহু বিন্দুর উৎপত্তি মনে হয়, এবং সেই সকল বিন্দু-সমষ্টিই রেখা, এবং রেখার পরিচ্ছিন্ন সংস্থানেই ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্তাদি আকৃতিতে পরিণত হয়।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মায়াশক্তির দ্বারা স্বীয় তনুকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করেন। সেই মায়া দ্বারাই এক অখণ্ড বস্তু বহুরূপে প্রতিভাত হন। সহস্রারে কলাতীত পরমব্রহ্ম বা পরমা প্রকৃতি অবস্থান করেন, তাহাই আজ্ঞাচক্রে মনোরূপ কলাস্বরূপ পর শিব এবং বিশুদ্ধ চক্রে আকাশ মূর্ত্তি বিন্দুস্বরূপ মহেশ্বর, অনাহতচক্রে বায়ুমূর্ত্তি নাদরূপ ঈশ্বর, মণিচক্রে তৈজস মূর্ত্তি রুদ্র, স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলমূর্ত্তি বিষ্ণু ও মূলাধারচক্রে পৃথিবীমূর্ত্তি ব্রহ্মা এবং তাহা হইতেই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি। তাহা হইলে আমার এই দেহই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার আধারস্থান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির থাকিলে শূন্য হইতে এক শব্দ হয়, সেই শব্দের নাম নাদ, সেই নাদ-ব্রহ্মের একাংশেতে জগৎ, আর অর্দ্ধমাত্রাতে নিশ্চল স্থিতি বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। পক্ষিশাবকের বাসার মতন হৃদয় আত্মার স্থান, সেই আত্মা বিষয়ান্বিত হইলেই জীব, বিষয়পাশ হইতে রহিত হইলেই তখন শিব। ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে অব্যক্ত পদ, সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এক পুরুষ হয়, যাহা দেখা যায় এবং দেখা যায়ও না। সেই পুরুষের পর আর কিছুই নাই। তাহাই কাষ্ঠা এবং তাহাই পরা গতি। ১৮ নিমেষ পর্য্যন্ত বিনা ক্লেশে স্থিতি যাহার হয় সে-ই কালকে জয় করিয়াছে, তাহাই পরা গতি। উত্তম পুরুষের রূপ শরীরেরই মত অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি, অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ, ভ্রূমধ্যে যাঁহাকে দেখা যায় এবং চুলের একহাজার ভাগের এক ভাগ সদৃশ সূক্ষ্ম নক্ষত্রের মত জ্যোতি, তিনিই জীব, সুষুম্নার মধ্যে আসিতেছেন ও যাইতেছেন। 'অকস্মাৎ সংজায়তে কালঃ'—ব্রহ্মা হইতে কাল অর্থাৎ শূন্য, শূন্য হইতে বায়ু, সেই বায়ু উর্দ্ধেতে গিয়া তমঃ, সেই তমঃ হইতে জল, তাহার মথনে শিশির, তাহার মথনে ফেণ, তাহা হইতে অণ্ড, অণ্ড হইতে ব্রহ্মা, তাহা হইতে বায়ু, তাহা হইতে ওঁকাররূপ শরীর, তাহা হইতে সাবিত্রী জগদ্ধাত্রী মূলাধারে, তাহা হইতে সমুদয় লোক, পুনরায় ইহার উল্টা দিক—গায়ত্রী অর্থাৎ ক্রিয়া করা, ক্রিয়া করিয়া কূটস্থে থাকা, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিতে করিতে কূটস্থে থাকা হয়, জ্যোতিঃ দর্শন হয় ও অমৃতরূপ রসাস্বাদ হয়, তখন এক আশ্চর্য্যরূপ স্থিতি মূলাধার হইতে লিঙ্গমূল ও লিঙ্গমূল হইতে নাভি পর্য্যন্ত হইতে থাকে। হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহাই ইড়া বা প্রাণ বায়ু, পিঙ্গলার গতি অধোদেশে, এই অধঃ ও উর্দ্ধ মধ্যে সুষুম্না। তিনি অগ্নিস্বরূপ, সকল বস্তুকে ভস্ম করিয়া এক করিয়া দেন এবং আপনিও ভস্ম হইয়া যান। কণ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অগ্নি আছেন, ইঁহাকেই ব্রহ্মাগ্নি বলে, ইহা

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধানি মনুষ্যলোকে ॥ ২

স্বপ্রকাশ স্বরূপ। এই তিন বায়ু নাভিতে এক হইয়া যখন হৃদয় পর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকে, তখনই ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন প্রাণ ও অপান সমান রূপে স্থির—ইহাই প্রলয়। সৃষ্টি সেই রূপ ব্রহ্ম হইতে দেহ পর্য্যন্ত ক্রম অনুযায়ী হয়। এই সৃষ্টি লয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে, এক অবস্থায় থাকে না, সেই জন্য ইহা অশ্বত্থ, আবার সর্ব্বদাই এইরূপ সৃষ্টি লয় হয় বলিয়া প্রবাহ-রূপে উহা অব্যয়। পর্ণগুলি যেমন বৃক্ষকে সজীব রাখে সেইরূপ ছন্দ অর্থাৎ জীবের ইচ্ছা বা বাসনাই এই সংসারবৃক্ষকে জীবিত রাখে। এই ইচ্ছাই কূটস্থের মধ্যে বিবিধ শক্তির খেলা ও বর্ণরূপে দেখা যায়। এই কূটস্থকে যিনি জানেন তিনিই বেদকে জানেন। 'ন বেদং বেদ ইত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।'এই বেদ ব্রাহ্মণেরই পাঠ্য। এই জন্য ক্রিয়া সকলেরই করা উচিত। ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়, প্রাণ, মন সব স্থির হয়, ইহাই যজ্ঞসূত্রের তিন গ্রন্থি। তিনি পরম পবিত্র, অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের (পঞ্চতত্ত্বই মূল) অতীত হন। সেই আত্মা 'সহজং' অর্থাৎ জন্মের সহিত হইয়াছেন (শ্বাসরূপে) এবং তাহা 'পুরস্তাৎ'—এই দেহপুর মধ্যে রহিয়াছেন। তিনি 'প্রজাপতি'—তিনি সকলেরই উৎপত্তির কর্ত্তা, প্রাণ না থাকিলে কোন কিছুর উৎপত্তি হয় না। তিনি আয়ু এবং আয়ুঃস্বরূপ যত দিন শ্বাস ততদিন জীবন। "অগ্র্যম্"—অগ্রভাবে অর্থাৎ বায়ু উর্দ্ধে মস্তকে গমন করিলে "বলমস্তু তেজঃ"—বল ও শক্তি তদ্দ্বারা হউক অর্থাৎ বল যোগবল সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি শক্তি হয়।

পরে নিগুর্ণ ব্রহ্ম যে পরব্যোম তাহাতে লীন হইয়া যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থার অগোচর রূপ, অর্থাৎ সকল গুণ আছে অথচ নিগুর্ণ, সেই গুণাতীত অবস্থায় এই সমুদয় বিশ্ব, তুমি, আমি, স্ত্রী, পুরুষ, বড়, ছোট সব এক হইয়া যায়, এক বলিবারও কেহ সেখানে থাকে না ॥ ১

অন্বয়। তস্য (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) বিষয়-প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্লব যুক্ত) শাখাঃ (শাখা সমূহ) অধঃ উর্দ্ধং চ (অধঃ ও উর্দ্ধ ভাগে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত) মনুষ্য লোকে (মর্ত্ত্য লোকে) কর্ম্মানুবন্ধীনি (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ) কর্ম্মানুবন্ধ, মূলানি (মূল সমূহ) অধঃ চ (নিম্নদিকেই বিশেষ ভাবে) অনুসন্ততানি (বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে) ॥ ২

শ্রীধর। কিঞ্চ—অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেন উক্তাঃ। তেষু চ যে দুষ্কৃতিনঃ তে অধঃ—পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ—বিস্তারং গতাঃ। সুকৃতিনশ্চ ঊর্দ্ধং—দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ—সত্ত্বাদিবৃত্তিভিঃ জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধাঃ—বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়াঃ—রূপাদয়ঃ, প্রবালাঃ—

পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ। শাখাগ্রস্থানীয়াভিঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ, চ শব্দাদূর্দ্ধং চ মূলানি অনুসন্ততানি—বিরূঢ়ানি। মুখ্যং মূলম্ ঈশ্বর এব। ইমানি তু অন্তরালানি মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনীতি। কর্ম্ম এব অনুবন্ধি—উত্তরকালভাবি যেষাং তানি। ঊর্দ্ধাধোলোকেষু যদ্ উপভুক্তং তত্তদ্ভোগবাসনাদিভিঃ হি কর্ম্মক্ষয়েণ মনুষ্যলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি। তস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু, অতো মনুষ্যলোকে ইত্যুক্তম্ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্যোপাধিবিশিষ্ট জীবগণ শাখাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা দুষ্কৃতিশালী তাহারা অধঃশাখা, তাহারাই পশ্বাদি যোনিতে বিস্তার প্রাপ্ত। আর যাঁহারা সুকৃতিশালী তাঁহারাই ঊর্দ্ধশাখা, তাঁহারা দেবাদি যোনিতে বিস্তৃত, তাঁহারাও সেই সংসারবৃক্ষের শাখা। [ঐ সমস্ত শাখা] সত্ত্বাদিগুণের বৃত্তিরূপ জলসেচনদ্বারা যথাযথভাবে প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আর শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত সংযুক্ত বলিয়া রূপরসাদি (ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ) 'প্রবাল' অর্থাৎ কিশলয় বা নবপল্লব স্বরূপ। এস্থলে "অধশ্চ"—এই "চ" শব্দে, (শুধু অধঃ নহে) ঊর্দ্ধভাগেও মূলসকল 'অনুসন্তত' অর্থাৎ বিরূঢ় বা বিস্তৃত। মুখ্য মূল অবশ্য পরমেশ্বর, কিন্তু এই অন্তরাল (অবান্তর) মূলগুলিই ভোগবাসনা-স্বরূপ। তাহাদিগের কার্য্য কি বলিতেছেন—'মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি।' অর্থাৎ কর্ম্মমাত্রেই অনুবন্ধি অর্থাৎ উত্তরকালভাবি যাহাদের, তাহারা। (এই অন্তরাল মূলগুলির "অনুবন্ধ" অর্থাৎ উত্তরফল কর্ম্ম)। ঊর্দ্ধ এবং অধোলোকে উপভুক্ত যে সকল ভোগনিচয়, সেই সেই ভোগের বাসনাদ্বারা কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তত্তৎ বাসনানুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঊর্দ্ধ এবং অধোলোকে তত্তৎ ভোগবাসনা উপভোগ করিয়া আবার যখন মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাদের সেই সেই বাসনারূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্ম্মাধিকার অন্যলোকে নাই, মনুষ্যলোকেই আছে, এইজন্য মনুষ্যলোকের কথাই এখানে বলিলেন ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অধঃ হইতে শাখা অর্থাৎ নাড়ীসব উপরে গিয়াছে অর্থাৎ মাথায় ; গুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ভালরূপে বৃদ্ধিকে পাইয়াছে—সেই কূটস্থের মধ্যে প্রবাল বর্ণ (গাঢ় রক্ত) যত দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারাই ঋষিস্বরূপে কূটস্থের জ্যোতির মধ্যে নক্ষত্রের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়—অধঃ হইতে ঊর্দ্ধেতে যাইবার জন্য চেষ্টা পায় তাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিতে উন্মত্ত হইয়া মনুষ্যেরা আপন কর্ম্মেতেই আপনি বদ্ধ হইয়া যায়।—এই সংসার বৃক্ষটির সম্বন্ধে এই শ্লোকে আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এই সংসার-বৃক্ষ বা এই নরতনুর মধ্যে বাসনানুরূপ কাহারও শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি কাহারও অশুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতেছে। এই সকলের মূল কারণ কূটস্থ ব্রহ্ম যিনি আজ্ঞাচক্রে এবং তদূর্দ্ধে রহিয়াছেন, কিন্তু উঁহাদের অবান্তর কারণ অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে প্রাণের প্রবাহ এবং তদনুযায়ী মন শুভাশুভ কর্ম্মে স্পন্দিত হয়। কর্ম্মানুযায়ী এই সকল নাড়ীর মধ্যে কর্ম্মোন্মুখী স্পন্দন সব প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারা জীব কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হয়। নাড়ী সমুদয় যখন স্পন্দিত হইয়া বেগযুক্ত

(বৈরাগ্য দ্বারা সংসারবৃক্ষ ছেদন)

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

হয়, সেই বেগ প্রধানতঃ গুণত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারই বেগ। কর্ম্ম দ্বারা ঐ সকল বেগ আরও প্রবলতর হয়। এই জন্ত উহারাই জীবকে কর্ম্মে বদ্ধ করে। ঐ নাড়ীগুলি অধোদিকে মূলাধার হইতে উর্দ্ধে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই কর্ম্মানুবন্ধি ধারাগুলি প্রধানতঃ দুই প্রকারের। কতকগুলি উর্দ্ধমুখী, কতকগুলি অধোমুখী। অধোমুখী স্পন্দন হইতে যে সকল কর্ম্মবাসনার উদয় হয়, তাহারা জীবকে আরও অধোগতি দান করে। অর্থাৎ বার বার জন্ম যাতায়াত, এবং কখন কখনও পশ্বাদি ইতরযোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কারণ জন্ম বাসনানুরূপই সকলের হয়। উর্দ্ধমুখী স্পন্দন হইতে জীবের সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হয়; এবং সে স্পন্দন সুষুম্নার। সুষুম্নার স্পন্দন হইতে কূটস্থ জ্যোতিঃর দর্শন হয়। এবং সেই কূটস্থ জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে গুহার মধ্যে যে রক্তবর্ণ জ্যোতিঃ সকল দেখা যায় তাঁহারাই ঋষি, ঐরূপ জ্যোতির্ম্ময়-রূপে তাঁহারা কূটস্থ মধ্যে রহিয়াছেন। বাহিরেও যেমন শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয় ভোগ হয়, অন্তরেও সেইরূপ হয়। তবে ভিতরে যতই ঐ সকল অপ্রাকৃত শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের অনুভব হইতে থাকে, ততই সাধক অধ্যাত্ম জগতের উচ্চস্তরে প্রবেশ করিতে থাকেন।। ২

অন্বয়। ইহ (এই সংসারে) অস্য (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয় না), তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ ন চ আদিঃ (না অন্ত, না আদি) ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (না স্থিতি) [উপলব্ধ হয়]; এনম্ (এই) সুবিরূঢ়মূলম্ (সুদৃঢ়মূল) অশ্বত্থং (অশ্বত্থকে) দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ (দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) [ব্রহ্মকে জানিতে হয়] ॥ ৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিঃ অস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা উর্দ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং ন উপলভ্যতে, ন চ অন্তঃ—অবসানম্ অপর্য্যন্তত্বাৎ, ন চাদিঃ অনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা—স্থিতিঃ, কথং তিষ্ঠতীতি ন উপলভ্যতে। যস্মাৎ এবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরুচ্ছেদ্যঃ অনর্থকরশ্চ তস্মাৎ এনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেত ইত্যাহ—অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনম্ অশ্বত্থম্ সুবিরূঢ়মূলম্—অত্যন্তবদ্ধমূলম্ সন্তম্, অসঙ্গঃ—সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগঃ তেন দৃঢ়েন শস্ত্রেণ সম্যগ্‌বিচারেণ ছিত্ত্বা—পৃথক্ কৃত্বা ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—ইহ সংসারস্থিত প্রাণিগণ এই সংসারের উর্দ্ধমূলত্বাদিরূপে যে স্বরূপ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার অবসান উপলব্ধি হয় না, যেহেতু সংসার অসীম, ইহার আদিও উপলব্ধি হয় না, যেহেতু সংসার অনাদি। এবং ইহার স্থিতি অর্থাৎ সংসার যে কি ভাবে আছে—তাহাও উপলব্ধি হয় না। যেহেতু এবম্ভূত এই

সংসারবৃক্ষ দুরবচ্ছেদ্য এবং অনর্থকর, অতএব ইহাকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য, ইহাই সার্দ্ধ শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন। অত্যন্ত বদ্ধমূল এই অশ্বত্থ অসঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গরাহিত্য—অহংমমতাত্যাগ, সেই ত্যাগরূপ শস্ত্রকে সম্যক্ বিচার দ্বারা দৃঢ় করিয়া ছেদন করিতে হইবে ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন ভুত ইহার লাভ করেনা—ইহার অন্তও নাই আদিও নাই—কারণ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ—না সম্যক্ প্রকারে স্থিতি, ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে। এই ব্রহ্মাকার কলেবরের উপরে যে মূল মস্তক স্বরূপ আছে তাহাতে বিশেষরূপে আরূঢ় অর্থাৎ কোন কারণ বশতঃ না যাওয়া অথচ গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া ক'রে চলা ইচ্ছারহিত হইয়া—যাহা অস্ত্র হইতেছে খুব মজবুদ্ রূপে ইচ্ছারহিত স্বরূপ অস্ত্র দ্বারা মূলে ছেদন করতঃ অর্থাৎ ক্রিয়া করতঃ যাহা গুরুবক্ত্রগম্য।—স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নকালে দেখিতে পাইলেও উহা জাগ্রদাবস্থায় থাকে না, সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় যাহা পাওয়া গেল, তাহা তো থাকিল না, তবে সে বস্তু আছে কি করিয়া বলিব? সুতরাং যে সংসারকে লোকে বুদ্ধির বিভ্রমে এত জড়াইয়া ধরে, তাহাকে কিন্তু সে পায় না, একটু বিচার করিলেই উহা বুঝা যায়। ইহা সমস্তই ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল মাত্র, মনের কল্পনায় যেন তাহা রূপ গ্রহণ করিয়া সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু আকাশে দৃষ্ট মূর্ত্তি যেমন মেঘের গতির সহিত সেথায় মিলাইয়া যায়, তদ্রূপ ক্ষণে ক্ষণে যাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে সে সংসারকে সত্য বলিতে পারা যায় কি? ইহা কখন আরম্ভ হইয়াছে আর ইহার সমাপ্তিই বা কখন হইবে, এবং ইহা বাস্তবিক আছে কি নাই কিছুই জানা যায় না। ক্রমাগত যে চলিতেছে তাহার আবার স্থিতির কল্পনা কিরূপে করিবে? এ সংসার বৃক্ষ সত্য নহে, কিন্তু সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে,—সংসারকে এইরূপ সত্যবৎ দেখা কিরূপে ঘুচিবে? তাই বলিতেছেন—'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা'—মনের কল্পনা যাহা মন হইতে উত্থিত তাহা মন না গেলে যাইবে কিরূপে? তাই ইহাকে ছেদনের জন্য অসঙ্গ শস্ত্র চাই। 'আমি ও আমার' এই যে ভাব ইহাই সঙ্গ, এমন অবস্থা চাই যেখানে "আমি"ও থাকে না "আমার"ও থাকে না। গীতার বহু স্থানে বলা হইয়াছে 'ময়ি জীবত্বং কল্পিতং'—জীবভাব কূটস্থ চৈতন্যে কল্পিত হয় মাত্র। প্রাণের চাঞ্চল্যে এই জীবভাব ফুটিয়া উঠে, যদি প্রাণের চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনের কল্পনা মনেই লয় হইয়া যাইবে। মন থাকিবেই না তো তাহার কল্পনা উঠিবে কিরূপে? তাহা হইলে করিতে হইবে কি? এই বৃক্ষাকার কলেবরের মস্তকের ভাগে সহস্রার দল কমল অবস্থিত, উহা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে উহা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে স্থিত হয়, তখন যে ইচ্ছারহিত অবস্থা আসে তাহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা। ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী মুক্ত। তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। উহাই প্রকৃত পক্ষে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই ছেদন কার্য্য সম্পন্ন হয় ক্রিয়া দ্বারা। যে মন দিয়া ক্রিয়া করিবে সেই স্থির হইয়া ইচ্ছারহিত হইবে, তাহার আর দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত যোগ থাকিবে না। এই অসঙ্গ শস্ত্রই ইচ্ছারহিত অবস্থা। যে যত ক্রিয়া করিবে এবং যাহার মনঃপ্রাণ যত স্থির হইবে ততই সে সঙ্গরহিত হইবে। এই সঙ্গরহিত অবস্থা

(সংসার বৃক্ষের মূল—ব্রহ্মানুসন্ধান)

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

বাড়িতে বাড়িতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই, পরম পাবন ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইবে। উহাই মুক্তিপদ। হৃদয়ে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি হইলেই পরম স্থিরত্ব ভাবের উদয় হয়। উহাতেই সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ বোধ হয়। ইহাকেই যোগীরা তূর্য্যাবস্থা বলেন ॥ ৩

অন্বয়। ততঃ (তদনন্তর) তৎ পদং (সেই বৈষ্ণব পদ) পরিমার্গিতব্যম্ (অন্বেষণ করিতে হইবে) যস্মিন্ গতাঃ (যে পদে প্রবিষ্ট হইলে) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন নিবর্ত্তন্তি (সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না), [কিরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে ?] তম্ এব চ (সেই) আদ্যং পুরুষং (আদি পুরুষকে) প্রপদ্যে (শরণ গ্রহণ করিতেছি—এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) যতঃ (যাঁহা হইতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসার প্রবৃত্তি) প্রসৃতা (নিঃসৃত হইয়াছে) ॥ ৪

শ্রীধর। তত ইতি। ততঃ তস্য মূলভূতং তৎ পদং—বস্তু বৈষ্ণবং পদং, পরিমার্গিতব্যম্—অন্বেষ্টব্যং। কীদৃশং ? যস্মিন্ গতাঃ—যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো, ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি—ন আবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমাহ—যত এষা পুরাণী—চিরন্তনী, সংসার-প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা—বিসৃতা, তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে—শরণং ব্রজামি ইত্যেবম্ একান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর সেই সংসারের মূলভূত 'তৎপদং' সেই বস্তু যাহাকে বৈষ্ণবপদ বলে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। তৎপদটি কীদৃশ ? যে পদ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর সংসারে আবর্ত্তন করিতে হয় না। অন্বেষণের প্রণালীটি কিরূপ হইবে তাহাই বলিতেছেন। "যাঁহা হইতে চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিসৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের শরণ গ্রহণ করিলাম" এইরূপ একান্ত ভক্তির সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- তাহার পর—পদ—অর্থাৎ ক্রিয়া করে তৎ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চ'লে যাওয়া উচিৎ—যেখানে গেলে ফের ফেরে না পুনর্ব্বার অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ; তমেব চাদ্যং তিনিই আদি পুরুষ কূটস্থের পর যাঁহাকে দেখা যায় তাঁহার চরণ অর্থাৎ ক্রিয়াতে ভালরূপে থাকা ; যেখান হইতে সকল ভালরূপে মন অন্য বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করতঃ তদ্রূপ হইয়া যায়—এইরূপেতে প্রকৃষ্টরূপে সৃজন সমুদয় বস্তুর হইয়াছে।—সেই পরমপদ অন্বেষণ করিবার কথা হইতেছে। সেই পরমপদ কি ? সংসার ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য মনে স্বরনা করিলেও আমাদের ইন্দ্রিয় মন তাহা স্বীকার করে না। যেটুকু রস পায় তাহার জন্যই ইন্দ্রিয় মন লোলুপ হইয়া সংসারকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকে। এইজন্য যাহা সত্যই রসাল যাহা বাস্তবিকই মধুর সেই রস তাহাকে আস্বাদন করাইতে না পারিলে

তাহার বিষয়-তৃষ্ণা মিটিবে না। বিষয়ের আসক্ত নিবৃত্ত হইবে না। এই জন্য ক্রিয়া করিয়া সঙ্গমুক্ত হইতে হইবে, এই সঙ্গমুক্ত অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মান্বেষণ হয়। ইহা একটু আধটু চেষ্টার কর্ম্ম নয় এইজন্য সাধককে সুরবীর হইতে হইবে। যাঁহারা ক্রিয়ায় খুব পরিশ্রম করেন এবং মন দিয়া ক্রিয়া করেন তাঁহারা সেই বিষ্ণুর পরম পদকে দেখিতে পান—যোনিমুদ্রায় আকাশের মত এক চক্ষুর প্রকাশ হয়, তাহাই তাঁহারা সর্ব্বদা দেখিতে পান। সেই চক্ষুর অণুর মধ্যে ত্রিলোক, সেই তিন লোকের মধ্যে মর্ত্ত্যলোক, আবার আমি সেই মর্ত্ত্যলোকে। সমুদয়ের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদয়, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার !! ক্রিয়ার পর অবস্থাই বিষ্ণুর পরম পদ, যাঁহারা মস্তকে সর্ব্বদা থাকেন অর্থাৎ যাঁহাদের প্রাণ সহস্রারে গিয়া এত স্থির হইয়া যায় যে সেখান হইতে আর তাহাদের নামিতে ইচ্ছা করে না ! সেখানে আমিও থাকে না আমারও থাকে না। ব্রহ্ম তখন সূক্ষ্ম অণুরূপে সর্ব্বব্যাপক, সেই ব্রহ্মে যিনি লীন হইয়া থাকেন, তিনিও সব হইয়া সর্ব্বত্রেতেই থাকেন। আত্মা স্থির হইলেই ঈশ্বর, তখন ষড়ৈশ্বর্য্য প্রকাশ পায়। যাঁহারা মস্তকে সর্ব্বদা বাস করেন তাঁহারাই দেবতা, যিনি কূটস্থ ব্রহ্মে থাকেন তিনিই ব্রাহ্মণ। কূটস্থই রাজা, ঋষি, দেবতা, তিনিই মাতৃরূপে সংস্থিতা, আবার কূটস্থের মধ্যে যে দেবতা তিনিই উত্তম পুরুষ। এইরূপে ক্রিয়া করিয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যখন বায়ু স্থির হয়, তখনই ঐ পরম দেবতার পূজা হয়। যজুর্ব্বেদে ৩১ অধ্যায়ে আছে "পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রং তথা লোকান্ অকল্পয়ন্" ইড়া পিঙ্গলা এই দুই চরণ দ্বারা গমন করিতে করিতে ভূমি অর্থাৎ মূলাধারে গিয়া মস্তক পর্য্যন্ত স্থির থাকা, স্থির থাকাতে কাণেতে সমস্ত শোনা যায়, দূর শ্রবণ হয়। এই প্রকারে সমস্ত লোক সৃষ্ট হয়। মনন করলেই সৃজন, মনে না করিলে বস্তুর প্রতি লক্ষ্য থাকে না ; সুতরাং তখন সৃষ্টি হয় না। কূটস্থেতে থাকিয়া যাঁহারা ক্রিয়া করেন, তাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিস্তার রূপে ব্রহ্মকে অনুভব করেন। এইরূপ ব্রহ্ম-বিস্তার যাঁহারা দর্শন করেন তাঁহাদের নিকট বিভাগ কিছু থাকে না, সব এক হইয়া যায়। ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যিনি তদ্বৎ হইয়া যান, তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। আর সংসারের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তাঁহাকে টানিতে পারে না। মনের সঙ্কল্পও নাই সুতরাং কোন কিছু পাইবার ইচ্ছাও নাই, বুদ্ধি স্থির এই জন্য সে অবস্থা হইতে নামিবার প্রয়োজন বোধও করেন না। কূটস্থে দর্শনের পর এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থার সাক্ষাৎকার হয়। তিনিই আদি পুরুষ, তাঁহারই শরণাগত হইতে হইবে। কিরূপে শরণাগত হইব ? তাঁহার চরণ দুইটি ধরিতে হইবে। সেই চরণদ্বয়ই এই শ্বাস প্রশ্বাস যাহা সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে। এই শ্বাসের ক্রিয়া যাঁহারা করেন, তাঁহারা যখন সেই স্থিরত্ব পদ লাভ করেন, তখনই বিষ্ণুর পরম পদকে তাঁহারা স্পর্শ করেন। এই পরম স্থান হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসৃত হইয়া থাকে —অর্থাৎ এই পরম স্থান হইতে অনিচ্ছার ইচ্ছায় যাহা কিছু সঙ্কল্প বা চেষ্টা হয়, তখনই তাহা পূর্ণ হয়, যাহা মনে করা যায় তখনই তাহা হয়, এইরূপে সমুদয় বস্তুর সৃজন তথায় আপনা আপনি হইয়া থাকে। এই মনঃপ্রাণের স্থিরতায় পরিপূর্ণ দৃশ্য জগৎ শূন্যবৎ হইয়া যায় আবার এই মনঃ-প্রাণের স্থিরতার ব্যতিক্রম ঘটিলেই এই দৃশ্য প্রপঞ্চের প্রকাশ হয়। মন বহির্ম্মুখ হইয়া দৃশ্য প্রপঞ্চে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে রমণ করে॥ ৪

(পরম পদ প্রাপ্তির সাধনা)

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ সংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

অন্বয়। নির্মানমোহাঃ (মান ও মোহশূন্য), জিতসঙ্গ দোষাঃ (ইন্দ্রিয়-সঙ্গরূপ দোষ-শূন্য), অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠা), বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষ রূপে নিবৃত্তকাম) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ (সুখ দুঃখ রূপ দ্বন্দ্ব হইতে) বিমুক্তাঃ (মুক্ত হইয়া), অমূঢ়াঃ (অমূঢ় অর্থাৎ বিবেকী পুরুষগণ), তৎ অব্যয়ং পদং (সেই অব্যয় পদ), গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫

শ্রীধর। তৎ প্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্ আহ—নির্মানেতি। নির্গতৌ মানমোহৌ অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যঃ তে। জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈঃ তে। অধ্যাত্মে—আত্মজ্ঞানে, নিত্যাঃ—পরিনিষ্ঠিতাঃ বিশেষণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যঃ তে। সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখ-দুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি, তৈঃ বিমুক্তাঃ। অতএব অমূঢ়াঃ—নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তঃ তৎ অব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [তাঁহার (ভগবানের) প্রাপ্তি বিষয়ে সাধনান্তর দেখাইয়া বলিতেছেন]—(১) "নির্মানমোহাঃ"—নির্গত হইয়াছে মান—অহঙ্কার, মোহ—মিথ্যাভিনিবেশ যাহা হইতে। (২) "জিতসঙ্গদোষাঃ"—পুত্রাদি সঙ্গরূপ দোষ জিত হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ সঙ্গদোষ যাহারা জয় করিয়াছে। (৩) "অধ্যাত্মনিত্যাঃ"—আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ তাহাতে নিষ্ঠাবান্। (৪) "বিনিবৃত্তকামাঃ"—বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে কাম যাহাদের। (৫) "সুখদুঃখ-সংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ"—সুখ দুঃখের হেতু বলিয়া সুখদুঃখ নামক যে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব, তাহা হইতে যাঁহারা বিমুক্ত। [অতএব তাঁহারা] (৬) "অমূঢ়াঃ"—যাঁহাদের অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহারা সেই অব্যয় বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মানরহিত অর্থাৎ কেহ আমাকে ভাল বলুক এ ইচ্ছা না থাকে—আমার বলিয়া না জানা—ইচ্ছারহিত—দ্বিধারহিত—সুখ দুঃখের ইচ্ছা-রহিত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অষ্ট প্রহর—মুর্খলোক যাহারা ক্রিয়া করে না—তাহারা ক্রিয়া ক'রে অব্যয় অবিনাশী পদকে পায়; অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি।—কি প্রকারের ব্যক্তিগণ এই পদ প্রাপ্ত হন, তাহাই এখানে ভগবান বলিতেছেন। প্রথমতঃ মান ও মোহ তাঁহাদের থাকিবে না, কেহ আমাকে মান্য করুক বা ভাল বলুক এই প্রকারের ইচ্ছা যখন অন্তঃকরণ হইতে মুছিয়া যাইবে। অর্থাৎ নিরহঙ্কার হইতে হইবে। অসত্য বস্তুর প্রতি আমাদের যে অভিনিবেশ হয়, তাহার কারণ অবিবেক। অবিবেক বা মোহ বশতঃই আমরা "আমার পুত্র, আমার গৃহ, আমার ধন ইত্যাদির জন্য অহঃরহঃ ব্যাকুল হই। বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত পুরুষদের এ সব ভাব থাকে না। পুত্র, দার, ধনাদিতে জীবের যে আসক্তি, সেই আসক্তিই দোষ। পুত্র,

দার ও ধনাদির সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রাখিলে এই আসক্তি আসিবেই। এই আসক্তিই পরমপদ লাভের ঘোর অন্তরায়। এই দোষ রহিত হইতে না পারিলে পরমার্থ চিন্তনে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই জন্যই "অধ্যাত্মনিত্য" হইতে হইবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভে একান্ত নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। পরমাত্মার স্বরূপ আলোচনা সর্ব্বদাই করিতে হইবে। কিন্তু শুধু কথার ভট্টাচার্য্য হইলে চলিবে না। শুধু পুঁথি পড়িয়া, পুঁথির কথা আলোচনা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না, যাহাতে স্বরূপের বোধ হয় এজন্য অষ্ট প্রহর নেশায় মত্ত হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ক্রিয়া মন দিয়া অধিকক্ষণ না করিলে এ নেশা আসিবে না। এই নেশার ভাব যাহার যত বেশী হয়, সে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরিমাণে ভোগ করে। এ বড় কঠিন জিনিষ, পরমাত্মার প্রতি অগাধ প্রীতি না থাকিলে ক্রিয়া করিবার এ উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হয় না।*

এইরূপ আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠা যাহার যত বেশী অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া যে যত নেশায় থাকে, তাহার তত বিষয়ের অনুভব নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই বিনিবৃত্ত কাম হইতে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভাবগুলি বিলুপ্ত হয়। সুতরাং যাহারা মূঢ় অর্থাৎ ক্রিয়া করে না, তাহাদের অজ্ঞানও নিবৃত্ত হয় না, পরমপদও প্রাপ্তি হয় না। সেই-জন্য যাঁহারা অমূঢ় অর্থাৎ সাংসারিক সুখ দুঃখের জন্য যাঁহারা ব্যাকুল নহেন, তাঁহারা দিনরাত ক্রিয়ায় লাগিয়া থাকেন, এবং তাহার ফলে অবিনাশী পদ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি

* মহাত্মা কবির সাহেব বলিয়াছেন—

> কবির্ ইহ্ তো ঘর হ্যায় প্রেম্ কা, মারগ্ আগম্ অগাধ্।
> শিষ্ কাট্‌কর পালরা ধরে, লাগে প্রেম্ সমাধ্॥

কবির এ তো (এই দেহ, মনুষ্য জীবন) প্রেমের ঘর, কিন্তু সেই প্রেমের রাস্তা বড় অগম্য, সহজে যাওয়া যায় না। কারণ সমস্ত বস্তুই চঞ্চল বা গতিশীল, কেবল সেই প্রেমের ঘরে যাইবার রাস্তা অত্যন্ত স্থির, অচঞ্চল না হইলে সেখানে পৌছিবার উপায় নাই। আর তাহা অগাধ অর্থাৎ বড়ই গভীর, তল পাওয়া যায় না (ক্রিয়ার পর অবস্থার শেষ কোথায়?) কি করিয়া এই প্রেম লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন—মস্তক কাটিয়া পাল্লা ঠিক না করিলে প্রেম-সমাধি লাগিবে না। দুই দিকের পাল্লা সমান না করিলে হইবে না। যদি কোনটা একটু উঁচু বা নীচু থাকে তবে তাহাতে অন্য কিছু বস্তু রাখিয়া পাল্লা ঠিক করিয়া লইতে হয়। দাঁড়ির উপরকার স্থানটা কাটিয় দিলে পাল্লা দুটি পড়িয়া যায়, এবং দাঁড়ি তাহার উপর থাকে, তদ্রূপ ইড়া, পিঙ্গলার পাল্লা একবার নীচু হইতেছে একবার উঁচু হইতেছে; অর্থাৎ কখনও ইড়া চলে, কখনও পিঙ্গলা চলে। যখন ক্রিয়া করিতে করিতে মস্তক নত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে কোন বাহ্য চিন্তার উদয় হয় না (ইহাই মাথা কাটিয়া পাল্লা ঠিক করা), তখন দুই দিকের পাল্লা ইড়া পিঙ্গলা স্থির হইয়া যায়। ইড়া পিঙ্গলা স্থির হইলেই সুষুম্না তত্ত্বে তত্ত্বে চলিতে থাকে, তখনই পরমাত্মার সহিত মনের নিবিড় মিলন হয়, ইহাই প্রেমের সমাধি।

> "কবির ছন্ পড়ে ছন্ উত্‌রে সো তো প্রেম ন হোয়।
> আট পহর্ লগা রহে্ প্রেম কহাওয়ে সোয়॥"

কবির এই এখনই একটু নেশা হইল আবার ক্ষণ পরে তাহা চলিয়া গেল তাহাকে প্রেম বলে না। প্রেম তখনই বলা যায়, যখন অষ্টপ্রহর নেশা সমান ভাবে লাগিয়া থাকে।

(অপুনরাবৃত্তি ও পরম ধাম)

न तद्भासयते सूर्य्यो न शशाङ्को न पावकः।
यद्गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ ৬

তাহাই লাভ করেন। অব্যয়পদ—দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন নহে। এক ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই দেশ কালের বা নাম রূপের ঢেউ থামিয়া যায়॥ ৫

অন্বয়। যৎ গত্বা (যাহা প্রাপ্ত হইয়া) ন নিবর্ত্তন্তে (যোগিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন না), তৎ (তাহাই) মম পরমং ধাম (আমার পরম ধাম)। তৎ (তাহাকে—সেই পরমপদকে) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না), ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ (চন্দ্রও পারে না, অগ্নিও পারে না)॥ ৬

শ্রীধর। তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। তৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ তৎ ধাম—স্বরূপং পরমং মম। অনেন সূর্য্যাদি-প্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষ-প্রসঙ্গো নিরস্তঃ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [সেই গন্তব্য পদ কিরূপ তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন]—সেই পদকে সূর্য্যাদি প্রকাশ করিতে পারে না, যোগিগণ যে পদ পাইয়া সংসারে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, সেই ধামটি আমার পরম স্বরূপ। ইহাদ্বারা সেই পরম ধাম সূর্য্যাদিরও প্রকাশের বিষয় নহে, [অর্থাৎ তাঁহারাও সেই পরম ধাম প্রকাশে অসমর্থ]—বলা হইল; ইহাতে জড়ত্ব ও শীতোষ্ণাদি দোষের প্রসঙ্গও নিরস্ত হইল॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সে বড় এক আশ্চর্য্য জায়গা—যাহা ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিরা অনেকেই দেখিতেছেন যাহা গুরুবক্ত্রগম্য কিন্তু লোক শুনিলে পরিহাস করিবে না জানার দরুণ—সূর্য্যের কিরণ সেখানে নাই—চন্দ্রের রশ্মি নাই—অগ্নির দীপ্তি নাই—যেখানে গেলে পর ফের ফেরে না—সেই আমার পরম ধাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—সে জায়গা খুবই আশ্চর্য্যজনক স্থানই বটে, কিন্তু তাহা কাশী, হরিদ্বারের মত স্থানবিশেষ নহে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তাহার মন-রূপ উপাধি জন্মিলে তখন তাহার দেশ কালের ধারণা জন্মে। এই ধারণা হইতেই দেশ কালাদির ব্যবধান, তাহা হইতে আবার পৃথক পৃথক স্থান ও বস্তুরূপ পরিণাম দৃষ্ট হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্তঃকরণ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই জীব ব্রহ্মের ভেদ ভাব চলিয়া যায় তখন জীবের স্বস্বরূপে অবস্থান হয়, উহাই ব্রহ্মধাম। তাহা জীবের পক্ষে বড়ই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বটে। দেহে আত্মবোধবশতঃ যে মন এই বিরাট সংসারকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহার সহিত শত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে, যে সম্বন্ধ কখনও যাইবে বলিয়া জীব কল্পনাও করিতে পারে না—সেই সম্বন্ধ ও বিবিধ নামরূপময় এই জগৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রকাশও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ঘট যেমন মহাকাশকে খণ্ডিত করিয়া ঘটাকাশ উপাধি গ্রহণ করে, কিন্তু স্বরূপতঃ ঘটাকাশে মহাকাশে কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ অন্তঃকরণবৃত্তি

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

যাহা যে আত্মভাবকে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও তত্তৎ বিষয়রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, সেই মনোরূপ ঘটোপাধি বিলীন হইবা মাত্র, তাহার স্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক যাহা ছিল, তাহাকে তাহাই বলিয়া তখন বোধ হয়। এই অবস্থাকে বিষ্ণুর পরম পদ বলে। এই অবস্থা একবার পাইলে আর স্বরূপচ্যুতি হয় না। জগৎ স্বপ্ন একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর সে স্বপ্নদর্শনের পুনরাবৃত্তি হয় না, তখন যোগী সদা জাগ্রত। সেই অবস্থাই ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা! সেখানে আলোকও নাই, অন্ধকারও নাই; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি নাই—অথচ স্বপ্রকাশ। সেখানে কূটস্থের নক্ষত্ররূপ গুহাতে ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা গমন করিতে পারা যায়। সেখানে দেবতারা আকাশ মূর্ত্তিতে ওঁকার ধ্বনিতে গান করিতেছেন অনুভব হয়। যাঁহারা ক্রিয়া করেন তাঁহারাই এই আনন্দময় স্থানে যাইতে পারেন। প্রথমে প্রাণায়াম দ্বারা অনিল স্থির হয়, সেই স্থিতিই অমৃতপদ বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। তখন সাধকও সেই আনন্দময়ের সহিত এক হইয়া যান। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতে ইহা (আনন্দ) অনুভব হয়। তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই তাঁহাকে বহুদূরে যেন মনে হয়। যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অনুভব করিয়াছে, সে জানে তাঁহাতেই সমুদয় এক হইয়া আছে, তিনি সকলের মধ্যে এবং সকলের অন্তর বাহ্যে এক তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" ৬

অন্বয়। জীবলোকে (সংসারে) জীবভূতঃ (সংসারী বা জীবরূপে যাহা প্রসিদ্ধ) সনাতনঃ (এবং যাহা নিত্য) [সেই জীব] মম এব অংশঃ (আমারই অংশভূত); প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিলীন) মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি (মন যাহাদের ষষ্ঠস্থানীয় সেই ইন্দ্রিয়গণকে) [প্রলয়ান্তে] জীবলোকে কর্ষতি (সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকে) ॥ ৭

শ্রীধর। ননু চ ত্বদীয়ং ধামপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ যদি ন নিবর্ত্তন্তে, তর্হি "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তি-প্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মম এব অংশঃ যোঽয়ম্ অবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ। অসৌ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি পুনঃ জীবলোকে—সংসারে উপভোগার্থম্ আকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চ উপলক্ষণার্থম্। অয়ং ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তি-প্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াৎ অস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিঃ। তথাপি অবিদ্যাবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ঃ, ন তু শুদ্ধে। তদুক্তং—"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি" ইত্যাদিনা। অতঃ চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্ অবিদ্বান্ প্রকৃতৌ

লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানি ইন্দ্রিয়াণি আকর্ষতি। বিদুষাং তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তেঃ ন আবৃত্তিরিতি ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [যদি তোমার ধাম প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি না হয়, তবে "সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে 'সংপদ্য' সম্পন্ন অর্থাৎ একীভূত হইলেও তাহারা জানিতে পারে না যে আমরা ব্রহ্মে একীভূত হইয়াছি" এই শ্রুতি দ্বারা সুষুপ্তি ও প্রলয় সময়ে তৎপ্রাপ্তি সকলেরই হয়, তবে সংসারী কে থাকিল ? এই আশঙ্কায় সংসারী যে কে তাহা পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আমার এই যে অংশ যিনি অবিদ্যা দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদা সংসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই জীব সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন—ইন্দ্রিয়গণকে (মন হইয়াছে ষষ্ঠ যাহাদের সেই ইন্দ্রিয়গণকে) পুনরায় জীবলোকে সংসার উপভোগার্থ আকর্ষণ করে। (এই শ্লোকস্থ "ইন্দ্রিয়" শব্দ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণের উপলক্ষণার্থ ব্যবহৃত)। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই—সত্য বটে সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে মদংশ হেতু সর্ব্বজীবমাত্রেরই আমাতে লয় প্রাপ্ত হওয়ায় মৎপ্রাপ্তিই হয়, তথাপি অবিদ্যাবৃত সানুশয় জীবের প্রকৃতিবিশিষ্ট যে আমি সেই আমাতেই লয় হয়, কিন্তু শুদ্ধ যে আমি সেই আমাতে লয় হয় না। তাই উক্ত হইয়াছে—"অব্যক্ত হইতে সকলেই ব্যক্ত হয়" ইত্যাদি। অতএব পুনরায় সংসারের জন্য নির্গত হইয়া অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানী জীব প্রকৃতিতে লীন ভাবে স্থিত নিজ উপাধিভূত ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে। কিন্তু বিদ্বানগণের শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্তি হেতু পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমারই অণুর অংশেতে সব জীবলোক জীব হইয়া শিব স্বরূপ নিত্যই বর্ত্তমান কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় মন এই ছয়—শরীরের পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যাহার প্রকৃতি হইতেছে তাহাতেই আত্মাতে আত্মায় না থেকে অর্থাৎ ক্রিয়া না করে—প্রকৃতির গুণের উপর বশীভূত হইয়া, অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক আকর্ষিত হইয়া অর্থাৎ বিষয়ের দিকে মন ইচ্ছার সহিত টেনে উপস্থিত করে।—যদিও সব জীবই শিবস্বরূপ কারণ সকল দেহের মধ্যে সেই ব্রহ্মাণু রহিয়াছেন, যাঁহার জন্য এই দেহাদির প্রকাশ। সেই ব্রহ্মাণুর প্রতি লক্ষ্য না থাকায় প্রকৃতি মাত্র (দেহেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ) বোধের বিষয় হইতেছে। নচেৎ ব্রহ্মাণুর পরিবর্ত্তন নাই, পরিবর্ত্তন হয় প্রকৃতিতে। এই প্রকৃতির মধ্যে যতক্ষণ থাকিতে হইবে ততক্ষণ যাওয়া আসার শেষ নাই। প্রাণের স্পন্দনই মন। সেই প্রাণ যতদিন চঞ্চল থাকিবে ততদিন মনের বহির্গমনাগমন থাকিবেই। এই মনের গমনাগমনই সংসার জন্মমৃত্যুর অভিনয়। কিন্তু যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণের গমনাগমন নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের মন আর বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয় না। মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার স্বভাব নষ্ট হয় না। নিদ্রিত ব্যক্তির সব সঙ্কল্প ও চেষ্টা সুপ্ত থাকে, নিদ্রাভঙ্গের পর আবার জাগ্রত হইয়া সে যেমন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুসরণ করে, তদ্রূপ জীব মরিবার পর তাহার সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদির পরমাণু নিজ নিজ অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের মধ্যে লীন হয় বা প্রসুপ্ত থাকে, সেই জীবের ভোগ করা শেষ হইলে আবার যখন জগতে আসিবার সময় হয়, তখন প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াদিকে সে আকর্ষণ করে, এবং তদনুরূপ তাহার দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সমুৎপন্ন হয়। যাহারা

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

কর্ম্মানুবন্ধী অজ্ঞ জীব, তাহাদেরই উপরোক্ত অবস্থা হয়, কিন্তু যাঁহাদের প্রাণশুদ্ধির সহিত মনঃ শুদ্ধি হইয়াছে, যাঁহাদের মনে সাংসারিক বাসনার তরঙ্গ থাকে না, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। প্রাণাপানের গতির সহিত সঙ্কল্প বিকল্পের বুদ্ বুদ্ ভাসিয়া উঠে। ততদিন এই সংসার চক্র বন বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকে, তাহার আর বিশ্রান্তি নাই। কিন্তু এই জীব ভাব স্পন্দনধর্ম্মী সুতরাং বহির্ম্মুখ, তাহা হইলেও এই শ্বাসের গতি আরম্ভ হইতেছে, একটি গতিশূন্য স্থির অবস্থা হইতেই। এই স্থির অবস্থা না থাকিলে কাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাণের বহির্গমনাগমন হইত? সুতরাং একটি স্থির অবস্থা আছে এবং সেই **স্থির অবস্থায় ও ঊর্দ্ধে অগতির গতি যিনি, যিনি পরম শিব, যিনি পুরুষোত্তম যিনি জগন্মাতা তিনি রহিয়াছেন।** যদিও তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের মধ্যেই আছেন কিন্তু তাঁহাতে লক্ষ্য না থাকায় তাঁহাকে কেহ অনুভব করিতে পরে না, সেই পরম স্থির অবস্থাই মায়াতীত অবস্থা, "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং"। সেই পরম ধামই এই সচঞ্চল, অচঞ্চল সকল অবস্থারই জননী। তাঁহার আশ্রয় যে পাইয়াছে—তাহার আর পদস্খলন হয় না, তাহাকে স্বস্থান হইতে চ্যুত হইতে হয় না। চণ্ডীতে আছে—"ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং" "রোগান-শেষানপহংসি তুষ্টা"—তুমি তুষ্ট হইলে অশেষ উপদ্রব নাশ করিয়া দাও মা, তোমার আশ্রয় যাহারা লইয়াছে, তাহাদের কখনও বিপদের সম্ভাবনা নাই। তখন জগজ্জননীর অনুচরী অবিদ্যা আর তাহাকে সংসার ভোগের জন্য আকর্ষণ করিতে পারে না। শ্বাসই তাঁহার চরণ সেই চরণ ধরিয়া যে থাকে তাহাকে মা আপনার অঙ্কে—(ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ পরমানন্দ ধামে) উঠাইয়া লন॥* ৭

অন্বয়। আশয়াৎ (পুষ্পাদি স্থান হইতে) গন্ধান্ (গন্ধ সমূহকে) বায়ুঃ ইব (বায়ুর ন্যায়) [গ্রহণ করিয়া] ঈশ্বরঃ (দেহাদির প্রভু জীবাত্মা) যৎ শরীরম্ (যে দেহ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) যৎ চ অপি (ও যে দেহ হইতে) উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করে) [তদা—তখন] এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) সংযাতি (গমন করে) ॥ ৮

* আত্মা জীবলোকে সুর নর পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাদের দেহাদির জন্ম মৃত্যুতে সেই আত্মার বিনাশ নাই, ইহা ২য় অধ্যায়ে বহুবার বলা হইয়াছে। সেই আত্মা সনাতন কেন না উহা ব্রহ্মরূপ আমারই অংশ, সুতরাং তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন উঠিবে ব্রহ্মের যদি অংশ অংশ থাকিয়া যায় তাহা হইলে ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অনন্তত্বের হানি হয়, অথবা ব্রহ্ম অংশ হইতে পৃথক বস্তু হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব আছে ইহা মানিতে হয় তাহার এই ভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার কথা বলা হইয়াছে, এবং পরমাত্মার পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকৃতির কথাও বলা হইয়াছে। এখন শক্তিমান হইতে শক্তি যেমন স্বতন্ত্র বস্তু নহে তাহাদের সত্তা পৃথক তদ্রূপ পরমাত্মার প্রকৃতি বা শক্তিদ্বয় তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। অতএব মম অংশ জীব ও ব্রহ্মের অভিন্ন অভেদের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

শ্রীধর। তানি আকৃষ্য কিং করোতি? ইত্যাহ—শরীরমিতি। যৎ—যদা, শরীরান্তরং কর্ম্মবশাৎ অবাপ্নোতি, যতশ্চ শরীরাৎ উৎক্রামতি, ঈশ্বরো—দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাৎ, এতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্ যাতি। শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ। আশয়াৎ—স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মান্ অংশান্ গৃহীত্বা বায়ুঃ যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। [সেই ইন্দ্রিয়াদি আকর্ষণ করিয়া জীব কি করেন? তাহা বলিতেছেন] —(জীব) যখন কর্ম্মবশে শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় এবং যে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, ঈশ্বর অর্থাৎ দেহাদির স্বামী তখন পূর্ব্বশরীর হইতে এই সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলিকে গ্রহণ করিয়া সেই শরীরান্তর সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ শরীরান্তরে প্রবেশ করেন)। শরীর থাকিলেই যে ইন্দ্রিয় গ্রহণ হয় তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। আশয় হইতে অর্থাৎ কুসুমাদির নিকট হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ সকলকে গ্রহণ করিয়া বায়ু যেমন গমন করে, সেইরূপ ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহা পাচ্চে, যাহা ছাড়্‌চে—শরীর—হৃদয়েতে ধারণা করিয়া বিষয়াসক্ত হইয়া ইচ্ছার সহিত—অজানত যেমত গন্ধেতে লোকের নাক হঠাৎ অনুভব হয় কিন্তু কিসের দ্বারায় সে অনুভব হইল তাহা লোকে প্রণিধান করে না. সে বায়ুর দ্বারা গন্ধ আসিয়াছে, তো কোন গন্ধ পরিত্যাগ করিতেছে ও কোন গন্ধ গ্রহণ করিতেছে—তদ্বৎ অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক যাওয়া, ইচ্ছাই তাহার মূলীভূত হইয়াছে অর্থাৎ চঞ্চল মন—আপনাতে. আপনি না থেকে বেড়াতে গিয়ে আপনা হ'তে আপনি আবদ্ধ !!! যেমত পাখী একটি নদীতীরে পিপাসান্বিত হইয়া একটি দাঁড়ের উপর বসিয়া জলপান করিবে এমত ইচ্ছায় বসিল—দাঁড়ের দুইদিকে দুই কাটী লম্বা উপরে দাঁড় সেই দাঁড়, এক চোঙ্গার মধ্যে, পাখী বসিলেই যেমত জল পান করিতে উদ্যত হইলেন অমনি ঘুরে গেলেন—জোর করিয়া ছট্‌ফট্ করিয়া পুনর্ব্বার উঠিলেন, আবার জলপান করিতে গিয়া আবার পড়িলেন, এইরূপ করিতে করিতে পাখমারা এসে অনায়াসে ধরিয়া লইল—তদ্রূপ সংসারে ইচ্ছাস্বরূপ তৃষ্ণায় আবৃত হইয়া ইড়া পিঙ্গলা স্বরূপ দুই কাটীতে বসিয়া ছট্‌ফটানি—কর্ম্মেতে আবৃত হইয়া—যম এসে ধর্‌লেন।—যিনি জীব নামে পরিচিত তিনি কর্ম্মবশে দেহত্যাগ করিবার সময় সূক্ষ্মদেহকে গ্রহণ করিয়াই গমন করেন, যেমন বায়ুর সহিত মিলিয়া গন্ধ গমন করে। আবার যখন দেহী পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের যথাযথ ফল ভোগ করিয়া তাহার আবার দেহান্তর গ্রহণের সময় হয়, তখনও তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতির অনুযায়ী দেহ গঠনের জন্য পূর্ব্ব দেহের ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে চিরদিন লোককে হিংসা করিয়াছে, তাহার সেই হিংস্র স্বভাবের অনুরূপ বা পরজন্মে ব্যাঘ্র বা সর্পের দেহ হইবেই, কারণ মনোময় সূক্ষ্ম দেহে রক্তমাংসাদি নাই কেবল ভাবনাময় দেহ। যখন তাহার সেই সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহের জন্য স্থূল অণু সকলকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, তখন তাহার ভাবনাময় দেহের অনুরূপ স্থূল অণুসকল আকর্ষিত হইবে। সুতরাং গত জন্মে যে যেমন

চিন্তানুরক্ত, তাহার পরজন্মের দেহও তদনুরূপ হইবে। এইজন্য জীবের ভাবময় (সূক্ষ্ম দেহ) দেহকে পবিত্র চিন্তা দ্বারা পূত করিতে না পারিলে পরিশেষে তাহার বিষম পরিণাম ভোগ করিতে হয়!! দুর্ব্বিসহ যাতনাময় দেহ লাভ করিয়া তাহাকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা বুদ্ধিমান চতুর তাঁহারা জীবের এই দুর্গতির বিষয় অবগত হইয়া সাবধান হন, এবং যাহাতে অশুভ দেহ প্রাপ্তি না হয় তজ্জন্য শুভ কর্ম্ম ও শুভ চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর এই সকল দুঃখ দুর্গতি পাইতে হয় না। যাঁহারা পরমার্থ চিন্তা করেন না, আত্মা কিছুই বুঝেন না, কেবল ইন্দ্রিয় ভোগে অনুরক্ত তাঁহারা আত্মঘাতী, তাঁহাদের মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"
ঈশোপনিষৎ

ঘোর অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন আলোকহীন সেই সমস্ত লোক বা তদ্রূপ জন্ম তাহারা প্রাপ্ত হয়। কাহারা? যাহারা আত্মঘাতী আত্মজ্ঞান-বিহীন তাহারাই মৃত্যুর পর সেই সব অন্ধকারাবৃত নিরয়াদিতে এবং পরে বৃক্ষ-পাষাণরূপ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই জন্য নিজ নিজ মনকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিলে বড় নিরুপায়!! কেবল আসক্তি, কেবল বাসনা লইয়া উহারা বার বার দেহকে ছাড়ে ও গ্রহণ করে। লোকে হঠাৎ প্রবহমান বায়ু হইতে গন্ধ পাইল, কিন্তু জানে না কোথা হইতে সে গন্ধ আসিতেছে; এত পড়িয়া শুনিয়া, এত দেখিয়াও আমার বুদ্ধি কেন অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? বায়ুতে ফুলের গন্ধের মত ঐ পূর্ব্বজন্মের দেহ মন হইতে সেই সুগন্ধ-দুর্গন্ধরূপ শুভাশুভ কর্ম্মাসক্তি এজন্মেও টানিয়া আনিয়াছে। তাই আমি অবশ হইয়া পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ যে প্রকৃতি লাভ করিয়াছি, তাহারই আদেশ মত চলিতে বাধ্য হইতেছি। এইখানে তুমি একটু ভাবিয়া দেখ, তুমি কি করিবে? তোমার চিত্ত শোধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে? তুমি সৎসঙ্গ কর, সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন কর, সদ্গুরুর অন্বেষণ কর। তুমি নির্জ্জনে বসিয়া রোদন কর আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর তাহা হইলেই তুমি বল লাভ করিতে পারিবে, তুমি ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য চেষ্টিত হইতে পারিবে। তুমি আর দাঁড়ের পাখীর মত মুখ বাড়াইয়া জল পান করিবার আশায় একবার এদিকে একবার ওদিকে ঝুঁকিও না। জীব! তুমি বিষয় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া একবার ইড়ায় তোমার প্রাণের প্রবাহ ছুটিতেছে, তখন তুমি বিষয় চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতেছ, একবার প্রাণের প্রবাহ পিঙ্গলায় ছুটিতেছে, তখন তুমি নিদ্রায়, আলস্যে, বৃথামোদে কেবল কালক্ষয় করিতেছ!! এতদিন যে বিষয় ভোগ করিলে, তৃষ্ণা কি মিটিল? বিষয়ের প্রতি আসক্তির নেশা কি ছুটিল? এইবার যে তোমার শিয়রে শমন দাঁড়াইয়া আছে! ওরে ভ্রান্ত, ওরে উন্মত্ত, এখনও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, এখনও স্মরণের অভ্যাসে প্রবৃত্ত হও, যদি তোর প্রাণের প্রবাহ একবার সুষুম্নামুখী হয়, তাহা হইলেও যে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে!! ৮

(জীব কিরূপে বিষয় ভোগ করে)

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

অন্বয়। অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ (চক্ষু), স্পর্শনং (ত্বক্), রসনং (জিহ্বা) ঘ্রাণম্ এবচ (এবং ঘ্রাণ) মনঃ চ (এবং মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয় সমূহ) উপসেবতে (উপভোগ করে) ॥ ৯

শ্রীধর। তান্যেব ইন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্, যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছন্তি তদাহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি—বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চ অন্তঃকরণম্ অধিষ্ঠায়—আশ্রিত্য, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অয়ং জীব উপভুঙ্ক্তে ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [সেই ইন্দ্রিয় গুলিকে দেখাইয়া (নামোল্লেখ করিয়া) যেজন্য তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া গমন করে তাহা বলিতেছেন]—শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা এই বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি ও অন্তঃকরণ মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল জীব উপভোগ করে ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমে লোকে শুনে যে ইহাতে বড় মজা—পরে দেখে—পরে ছোঁয়—তৎপরে চাকে—শোঁকে—এসকল কর্ম্মেরই প্রথমে মন চিত্ত বুদ্ধি স্থির করতঃ সমুদয় কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষার সহিত আপনার আসল সেবা ক্রিয়া ছেড়ে উপসেবা অর্থাৎ ফাল্‌তো ভেল্কির ন্যায় কিয়ৎস্থায়ী ধোঁকায় পতিত হয়—এরূপ ধোঁকা কত খাইল—কিন্তু আপনি যে খোকা সেই খোকা কত বারই হইলেন।—জীব পূর্ব্ব শরীর হইতে উৎক্রমণ কালে জীব মনঃ ও ইন্দ্রিয় (সূক্ষ্ম শরীর) সহ গমন করে। ঐ বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া জীব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সমূহকে উপভোগ করে। পঞ্চভূত নির্ম্মিত এই স্থূল শরীরই আমাদের সর্ব্বস্ব নহে। এই স্থূল শরীর বিনষ্ট হইলেও সপ্তদশ অবয়বযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর তখনও বর্ত্তমান থাকে, জীব উৎক্রমণের সময় ঐ সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোকে গমন করেন ; আবার জন্ম গ্রহণের সময় ঐ সূক্ষ্ম শরীর সঙ্গে সঙ্গে আসে। সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণ মন বুদ্ধি সবই থাকে, এইজন্য জীবের পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের সমস্ত সংস্কার ঐ সূক্ষ্ম শরীরে নিহিত থাকে। এ শরীরও দেখা যায়, কি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত সকলেই দেখিতে পায় না।

এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর জীবকে বড় ধোঁকা দেয়, তাহারাই যেন জীবকে জীবত্ব ভাবে ভাবিত করায় এবং সেইজন্য জীবের স্বরূপানুসন্ধানে আগ্রহ জন্মে না। এই যন্ত্রগুলিতে আরূঢ় হইয়া জীব বিষয়ের রসাস্বাদ করে, এইজন্য ইহারা যে যে বস্তুকে স্বাদু বোধ করায়, জীবও যেন সেই সকল বস্তুকে স্বাদু বলিয়া অনুভব করেন। তাহার ফলে বিষয় ভোগ করিয়া আশা ও আকাঙ্ক্ষা যেন কিছুতেই মিটে না, তাই আসলের সেবা ছাড়িয়া ফাল্‌তো বস্তুর পিছনে সময় নষ্ট করে। কতবার বিষয় ভোগ করিয়া কত দুঃখ পাইতেছে, তবুও আশার স্বপ্ন ভাঙ্গে না। লোকে ঠেকিয়া শিখে, কিন্তু কতবার জীব কত তাপে তাপিত হইল, কত কষ্ট পাইল তবুও

(আত্মাকে বিবেকযুক্ত পুরুষেরা দেখিতে পান)

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

বিষয় দেখিলেই অজ্ঞ বালকের ন্যায় আবার তাহা উপভোগ করিতে চায়। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের সেবা ছাড়িয়া প্রাণের সেবা করেন। প্রাণের শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রাখিলেই তাঁহার চরণ সেবা হয়। যাঁহারা গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া মন দিয়া এই ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের প্রাণ ও অপান ইড়া ও পিঙ্গলা মিলিত হইয়া যায়, এই মিলিতাবস্থাতেই ভগবানের চরণে চরণ দেওয়া ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ভাব দেখিয়া ভক্ত সাধক কৃতার্থ হইয়া যান ॥ ৯

অন্বয়। উৎক্রামন্তং (দেহান্তরে গমনশীল) স্থিতং বা (দেহে স্থিত) ভুঞ্জানং অপি (এবং বিষয়-ভোগনিরত), গুণান্বিতং (গুণসংযুক্ত) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (বিমূঢ় ব্যক্তিগণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) জ্ঞানচক্ষুষঃ (অমূঢ় অথবা বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) ॥ ১০

শ্রীধর। ননু কার্য্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণ এবম্ভূতম্ আত্মানং সর্ব্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি? তত্রাহ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং—দেহাৎ দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা, বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি—ন আলোকয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল এবম্ভূত আত্মাকে কার্য্যকারণসংঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া সকলেই দেখে না কেন ? তাই বলিতেছেন]—উৎক্রামন্তং অর্থাৎ দেহ হইতে দেহান্তরে গমনশীল, কিম্বা সেই দেহেই স্থিত, অথবা বিষয়ভোগশীল বা ইন্দ্রিয়াদি-যুক্ত যে জীব তাঁহাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু যাঁহাদের তাদৃশ বিবেকী ব্যক্তিগণ দেখিতে পান ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি ক্রমশঃ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিয়াই চলিয়াছেন এবং স্থির হইয়া চলিতে চলিতে কিছু দিন রহিয়াছেন এবং ভোগ যেমন যেমন গুণের কর্ম্ম করিতেছে তদনুযায়িক প্রাপ্ত হইতেছেন—গুণ ছাড়িয়া নির্গুণে থাকিলেই হয়—কিন্তু তাহা করিবেন না—আপনার একই গুণ তাহা কখন ছাড়িতে পারেন না মূর্খের মতন—সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম-ভোগ যাহা দুঃখ তাহাকে সুখ বিবেচনা করিয়া এবং যাহা মিথ্যা অর্থাৎ কিছুদিনের নিমিত্তে তাহাকে সত্য বিবেচনা করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতে-ছেন না—অথচ দেখ্‌বার জিনিস্ মেখের (ম্যাক্) মতন শরীরের মধ্যস্থানে রহিয়াছে তাহা গুরুবাক্যের দ্বারা জানিয়া ক্রিয়া করিলেই জানবার দিব্য দৃষ্টি কূটস্থ দ্বারায় দেখিতে পান। আপনার ভাল নয় পরের ভাল—এই কুসংস্কারেতেই সর্ব্বনাশ—আবদ্ধ হইয়া লোকে হইতেছে।—যাঁহাদের আত্মজ্ঞান নাই, যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাদৃশ বিমূঢ় ব্যক্তিরা কেবল ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত,

[প্রযত্নশীল যোগীরা আত্মাকে দেখিতে পান, অপরে পায় না]

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।

যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

তাহাতে অনেক সময় বহু দুঃখ যাতনা ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তবুও তাহা ছাড়িয়া পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার তাহাদের একটুও অবসর নাই। দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই গুণসম্ভূত, সেই দেহেন্দ্রিয় লইয়াই তাঁহারা দিন-রাত বসিয়া আছেন, তাহারই তোয়াক্কে সমস্ত শক্তি ও সময় নষ্ট হইতেছে, তাহাতেও কোন শান্তি পাইতেছেন না ; কারণ গুণে যতক্ষণ থাকিতে হইবে ততক্ষণ ত্রিতাপ নষ্ট হয় না—তবু তাহা ছাড়িয়া দিয়া মন দিয়া সুন্দর ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রিয়া করিলেই হয়, যাহাতে গুণের ক্ষেত্র হইতে নির্গুণে গিয়া পঁহুছিতে পারেন -তাহার দিকে কিন্তু বিন্দু মাত্রও লক্ষ্য নাই, অথচ গুণেতে থাকিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছেন, দিন-রাত হায় ! হায় ! করিতেছেন, তবুও সদ্গুরুর উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া যে বাঁচিয়া যাইবেন তাহার দিকে একটুও লক্ষ্য নাই, বরং এই কুসংস্কার যে ক্রিয়া করিলে সংসারের বাহির হইয়া যাইতে হয়—তাই চেষ্টা করিয়া ক্রিয়া যাহাতে কেহ না করে কোমর বাঁধিয়া সেই চেষ্টায় লাগিয়া পড়েন, আর নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করেন।

আত্মচৈতন্যের অনুভব কেবলমাত্র ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, কারণ যে আত্মা দেহেন্দ্রিয়ের অতীত, দেহেন্দ্রিয়ের অতীত হইতে না পারিলে কিরূপে তাহা উপলব্ধি হইবে ? এই আত্মার দর্শন ভৌতিক পদার্থের দর্শনের মতন নহে, যাঁহার জ্ঞানচক্ষু বা তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে সেই যোগিগণই এই আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। এই আত্মার সত্তাতেই দেহেন্দ্রিয়াদির সমস্ত কার্য্যই হইতেছে অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, গন্ধগ্রহণ, মনের সঙ্কল্প, বুদ্ধির অনুভব সমস্তই হইতেছে, কিন্তু এমনি দৈব বিড়ম্বনা যে সত্তার প্রভাবে এই সমস্ত কার্য্য সম্ভব হইতেছে - যাঁহাদের ধী আত্মস্থ নহে, তাঁহারা কিন্তু কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারেন না। এই জন্য আত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয় মনঃবুদ্ধির বহির্বিচরণ ভাব রোধ করিতে হইবে, তাহারা যতদিন শান্ত হইয়া অন্তর্মুখ না হইবে, ততদিন আত্মদর্শন কিছুতেই সম্ভব নহে। যাঁহারা বিবেকহীন—তাঁহারা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত কিন্তু ঐ সকলের কারণ যিনি তাঁহার প্রতি লক্ষ্য নাই, সুতরাং কাহার তেজে এই সব শ্রবণ দর্শন মননাদি হইতেছে তাঁহার কথা মরণান্ত কাল পর্য্যন্তও ভাবিবার অবসর আসে না ॥ ১০

অন্বয়। যতন্তঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণই) আত্মনি অবস্থিতং (নিজ-দেহে বা বুদ্ধিতে অবস্থিত) এনং (এই—আত্মাকে) পশ্যন্তি (দেখিয়া থাকেন) ; যতন্তঃ অপি (যত্ন করিয়াও) অকৃতাত্মনঃ (অজিতেন্দ্রিয় বা অশুদ্ধচিত্ত, দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত) অচেতসঃ (মূঢ় বুদ্ধিরা) এনম্ (এই আত্মাকে) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) ॥ ১১

শ্রীধর। দুর্জ্ঞেয়শ্চ অয়ং যতো বিবেকিষু অপি কেচিৎ পশ্যন্তি, কেচিন্ন পশ্যন্তি ইত্যাহ —যতন্ত ইতি। যতন্তঃ ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিৎ এনম্—আত্মানম্, আত্মনি —দেহে অবস্থিতং—বিবিক্তং পশ্যন্তি। শাস্ত্রাভ্যাসাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্ব্বাণা অপি অকৃতাত্মনঃ —অবিশুদ্ধচিত্তা অতএব অচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [এই আত্মা দুর্জ্ঞেয়, যেহেতু বিবেকী পুরুষের মধ্যেও কেহ কেহ দেখিতে পান, কেহ কেহ বা পান না,—ইহাই বলিতেছেন।] ধ্যানাদির দ্বারা প্রযত্নশীল যোগিগণ, কেহ কেহ এই আত্মাকে আপনার শরীরে অথচ দেহ হইতে বিবিক্ত রূপে অবস্থিত দেখেন। শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা প্রযত্ন করিলেও যাঁহারা অকৃতাত্মা অর্থাৎ অবিশুদ্ধ চিত্ত, অতএব মন্দমতি তাহারা ইঁহাকে দেখিতে পায় না ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা:—ধ্যান ধারণা সমাধিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ আট্‌কিয়া থেকে আপনার মনেতে আপনি থেকে (যাহাকে লোকে করে না,যাহার নিমিত্ত উপরে দুঃখ প্রকাশ করা গেল) দেখিতে পায় দিব্যদৃষ্টির দ্বারায় আত্মার ক্রিয়া করে (যাহা গুরুবক্তু গম্য) স্থিতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আট্‌কিয়ে থেকে ক্রিয়ার পর অবস্থায়, কিন্তু যাঁহার আত্মাকে স্থিতি না করিতে পারিয়াছেন ক্রিয়ার দ্বারায়, কেবল মনকে টেনে আত্মাতে আনিতেছেন অর্থাৎ প্রথম চেষ্টা করিতেছেন, তিনি আত্মাকে দেখিতে পান না - কারণ কূটস্থ ব্রহ্মেতে চৈতন্যরূপ আটকিয়ে থাকা হয় নাই—ইহারই নাম অকৃতাত্মা অর্থাৎ কিছুকাল করিতে করিতে হইবে।—শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"কোন কোন যোগিগণ সমাহিতচিত্তে এবং প্রযত্নপর হইয়া এই আত্মাকে দেখিতে সমর্থ হন—এবং এই আত্মাই আমি—এই আত্মার স্বরূপ যাহা স্বীয় বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় সেই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা অকৃতাত্মা অর্থাৎ অসংস্কৃত-হৃদয়—যাহারা তপস্যা ও ইন্দ্রিয় জয় এই দুইটি উপায় অবলম্বন করে নাই এবং যাহারা অবিবেকী তাহারা প্রযত্নপরায়ণ হইলেও সেই আত্মাকে দেখিতে সমর্থ হয় না"—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের একমাত্র উপায়, এবং তজ্জন্য তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-জয় প্রয়োজন। প্রাণায়ামই পরম তপস্যা এবং তদ্দ্বারাই ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তর্মুখ করিতে পারিলেই আত্মদর্শন হয়। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলেই চিত্ত অন্তর্মুখ হয়, সেই অন্তর্মুখ ভাবের গভীরতার তারতম্যই ধারণা, ধ্যান, সমাধি বলিয়া উক্ত হয়। সমাধি ভাব চরম অন্তর্মুখ ভাব, এই অবস্থায় প্রাণ আটকাইয়া যায় অর্থাৎ শ্বাসের বহির্বিচরণ থাকে না এবং মন বিষয়ান্তরে ধাবমান না হইয়া আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থিতির অবস্থাতেই আত্মা আমাদের জ্ঞানগম্য হন। যাঁহারা এই পরিস্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই যোগী। কিন্তু যাহারা "অচেতসঃ" অর্থাৎ সাধন করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, এই মাত্র বা দুই দশ বৎসর চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন—তিনি তখনও আত্মাকে দেখিতে পান নাই—অর্থাৎ তখনও বেশ স্থির হইতে পারেন নাই। সাধনার বহু অভ্যাসে তবে এই স্থিরতা একটু একটু উপলব্ধি হইতে থাকে। যিনি সাধনা দ্বারা খুব স্থিরতার স্বাদ পাইয়াছেন তাঁহারাই কৃতাত্মা অর্থাৎ তাঁহাদের জীবন সফল হইয়াছে, তাঁহারা স্ব স্ব প্রাণ-ধারাকে অসীম প্রাণের বা ব্রহ্ম চৈতন্যের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, যাহাদের সে সামর্থ্য এখনও লাভ হয় নাই তাঁহারা অকৃতাত্মা বটেন, কিন্তু তাঁহারাও যদি মন দিয়া আরও দীর্ঘকাল সাধনা করেন তবে তাঁহারাও কৃতার্থ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

অন্বয়। আদিত্যগতং (আদিত্যগত অর্থাৎ সূর্য্যস্থ) যৎ তেজঃ (যে তেজ) চন্দ্রমসি চ যৎ (চন্দ্রে যে তেজ), যৎ চ অগ্নৌ (এবং যে তেজ অগ্নিতে) অখিলং জগৎ (সমস্ত জগৎকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ তেজঃ (সেই তেজ) মামকম্ বিদ্ধি (আমারই জানিও)॥ ১২

শ্রীধর। তদেবং "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং, তৎপ্রাপ্তানাঞ্চ অপুনরাবৃত্তিঃ উক্তা। তত্র চ সংসারিণঃ অভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্। ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপম্ অনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যৎ অনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্ব্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" ইত্যাদির দ্বারা পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় যে পরম ধাম তাহা বলা হইয়াছে এবং তদ্ধামপ্রাপ্ত জীবের অপুনরাবৃত্তির কথাও বলা হইয়াছে। তাহাতে সংসারীর অভাব আশঙ্কায় দেহাদিব্যতিরিক্ত যে সংসারীর স্বরূপ তাহাও দর্শিত হইয়াছে। এখন চারিটি শ্লোক দ্বারা অনন্তশক্তিস্বরূপে সেই পরমেশ্বরসম্বন্ধীয় রূপ নিরূপণ করিতেছেন]—সূর্য্যাদিতে স্থিত যে অনেক প্রকার তেজ বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছে, সেই সমস্ত তেজ মদীয় তেজ বলিয়া জানিবে॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সূর্য্যের তেজ যাহা সূর্য্য হইতে আসিয়াছে তদ্দারায় সব প্রকাশিত—তদ্রূপ কূটস্থের তেজ এই শরীরে থাকায় শরীরে স্বপ্রকাশ হইতেছে—সেই তেজই রূপ ব্রহ্মের হইতেছে—যাহা আকাশ হইতে আসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু আকাশে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু সেই আকাশের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে পরব্যোম স্বরূপ এক এক অণুর মধ্যে অনেক ব্রহ্মস্বরূপ অণু, তাহার মধ্যে অনেক ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে—সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তুমি এক জন—তুমি কত ছোট লোক তাহা আপনা আপনি বিবেচনা করিতে পার না! তোমার আস্ফালনের আর সীমা নাই, তুমি কি তা তুমি নিজে বল্‌তে পার না! এইরূপ চন্দ্র ও অগ্নি তেজের অণুর মধ্যে আমারই রূপ—ইহা দৃষ্টিগোচর হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল। ক্রিয়া না করিলে এরূপ অবস্থার বোধ বল্লে হবে না—বোধ হইলেই বোধ হইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির মধ্যে যে তেজ সে সমস্ত প্রকাশই তাঁহার।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" কঠঃ উঃ

প্রকাশমান সেই আত্মার প্রকাশেই সূর্য্যাদি সমস্ত প্রকাশশীল পদার্থ প্রকাশিত হইতেছে, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই প্রভাবে দীপ্তি পাইতেছে।

তিনি "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"—তিনিই সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় বস্তুকে জ্যোতিঃ দান করেন। জ্যোতিঃ না থাকিলে কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতে পারিত না। এই শরীরের মধ্যেও তিনি জ্যোতিঃ রূপে রহিয়াছেন, তাই এই শরীরের প্রকাশ অনুভব হইতেছে। আমরা যে শরীরের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের কথা বলি, সেই লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য সমস্তই সেই কূটস্থ জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ মাত্র। সেই কূটস্থ জ্যোতিঃ সূত্রাত্মার সহিত যখন এ দেহ ত্যাগ করেন, তখন এ দেহ শ্রীহীন ও মলিন হইয়া যায়। সেই জ্যোতিঃ সূক্ষ্মরূপে এই আকাশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ক্ষুদ্র একটি ব্রহ্মাণুর প্রকাশ এই জ্যোতিঃ, সেই ব্রহ্মাণুর মধ্যে কত ব্রহ্মাণ্ডই ভরা রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নির প্রতি অণুর মধ্যে সেই তাঁহারই রূপ ভরিয়া আছে, ইহা যে দিন আমাদের বোধগম্য, হইবে, সেই দিনই আমরা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিব। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই অনন্ত ব্রহ্মাণু, সেই এক ব্রহ্মাণুরই অন্তর্গত। সেই একই বহু এক হইয়া এবং সেই বহু একই একং অদ্বিতীয়ং হইয়া বিভাত হইতেছেন। এক-কে সহস্র লক্ষবার এক দিয়া গুণ কর তবুও তাহা এক-ই থাকিবে (যেমন ১×১×১×১×১=১)। যাহা প্রকাশিত হইতেছে সমস্তই সেই এক হইতে। মহাশূন্যই সেই, বহুবার তাহা হইতে কিছু গ্রহণ কর বা তাহাতে কিছু যোগ কর ফল একই,—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" প্রত্যেক জীবের মধ্যে সেই যে কূটস্থ এবং তদন্তর্গত সূক্ষ্ম বিন্দু—তাহাই "চিৎকণা," অনন্ত চিদাকাশে এইরূপ কোটি কোটি "চিৎকণ" আকাশের গায়ে নক্ষত্রের মত ঝলমল করিতেছে। এই এক একটি "চিৎকণ" ই আমার "আমি"। এই "চিৎকণ' অনন্ত চিতের সহিত ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। চিদ্ঘন পুরুষোত্তম বা চিন্ময় পরমাত্মার সহিত এই "চিৎকণ" সমধর্ম্মভাবাপন্ন। অর্থাৎ ইনিও জন্ম-জরা-মরণাদিবর্জ্জিত, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ-স্বরূপ। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর পরমাত্মা হইতে এই সহস্র সহস্র চিৎকণ ছুটিয়া বাহির হইতেছে,—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি॥" মুণ্ডক।

ইনিই অক্ষর পুরুষ, ইনিই প্রত্যগাত্মা। প্রত্যেক দেহে প্রকটিত যে চৈতন্য, সে ইঁহারই চৈতন্য। ইঁহা হইতেই সুখদুঃখভোক্তা জীব উৎপন্ন হইয়া অধ্যাত্ম নামে প্রখ্যাত হইতেছেন। শরীরাদি প্রকৃতির সহিত ইঁহারই সম্বন্ধ। প্রত্যগাত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক, শরীরের দোষগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিও পরমাত্মার ন্যায় নিত্য, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। এই জীবই সেই অক্ষর পুরুষের উপাসনা করিয়া তাঁহার সহিত তাদাত্ম্যভাবে মিলিত হইয়া যায়। সেই অবস্থাকেই মুক্তি বলে॥ ১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩

অন্বয়। অহং চ (আমি), গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) ওজসা (বল দ্বারা) ভূতানি ধারয়ামি (ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি), রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃ চ ভূত্বা (চন্দ্র হইয়া) সর্ব্বাঃ ওষধীঃ (সমুদয় ব্রীহিযবাদি ওষধিগণকে) পুষ্ণামি (পুষ্ট করিতেছি) ॥ ১৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—গামিতি। গাং—পৃথিবীম্, ওজসা—বলেন অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি। অহমেব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—পৃথিবীতে বলদ্বারা অধিষ্ঠান করিয়া আমি চরাচর ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি। আমি রসময় চন্দ্র হইয়া ব্রীহি যবাদি শস্যসমূহকে সংবর্দ্ধন করিতেছি ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই পৃথিবীর চন্দ্রের রশ্মির দ্বারায় সমুদয় গাছ গাছড়াতে রস প্রবেশ করতঃ ওষধিস্বরূপে আমি পুষ্ট করিতেছি—তাহা যোগীরা বলপূর্ব্বক মূর্দ্ধ্নিতে আত্মপ্রাণ রাখিয়া স্থির করতঃ দ্রব্যের গুণের মধ্যে প্রবেশ করেন—যে যোগী এরূপ অবস্থায় থাকেন তাঁহার ক্রিয়া ভালরূপ হয় না, কারণ ব্রহ্ম অনন্ত—ব্রহ্মের গুণও অনন্ত—এক অনন্তেই রক্ষা নাই—আবার অনন্তের অনন্ত, গেলে তাঁহার অন্ত আর পাবার যো নাই—তিনি আপনাকে আপনি ভুলিলেন।—পৃথিবী যে স্বস্থানে রহিয়াছে, স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে না, ইহা পৃথিবীর স্বকীয় গুণ নহে, বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নহে,—ইহাই ঐশ্বরিক শক্তি, সেই ঐশ্বরিক শক্তির প্রেরণাই মাধ্যাকর্ষণ রূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে। চন্দ্রের মধ্যে যে অমৃত রহিয়াছে, তাহাও ঐশ্বরিক শক্তি, সেই শক্তি অমৃতরূপে ওষধাদির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তন্মধ্যে রোগনিবারিণী ও জীবনদায়িনী শক্তি হইয়া বিশ্বকে রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক তরু লতা গুল্মের মধ্যে রোগনিবারিণী অসাধারণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা চন্দ্রের রশ্মি হইতে ঐ সকল শক্তি লাভ করে। কিন্তু কোন্ ওষধির কি কি গুণ বর্ত্তমান তাহা কেবল বাহ্য পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না। যোগীরা যোগবলে সমস্ত ওষধির গুণ অবগত হইতে পারেন, এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ গুণ কোন্ সময়ে প্রকট হয়—এই কাল-জ্ঞানও তাঁহাদের যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহারা ওষধির গুণ জানিয়া যখন তাহা প্রয়োগ করেন, তখন তাহা সিদ্ধমন্ত্রের মত কার্য্য করে। আত্মপ্রাণ মূর্দ্ধাতে বলপূর্ব্বক আনিয়া তাঁহারা দ্রব্যকে চিন্তা করিলেই, তন্মধ্যে যে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা তাঁহাদের জ্ঞানের গোচর হয়। ঋষিরা পূর্ব্বকালে লোকহিতার্থ এই ভাবে দ্রব্যের গুণ অবগত হইয়া জন-সমাজে প্রচার করিতেন, তাহার ফলেই চিকিৎসাশাস্ত্রে ওষধিদ্বারা রোগ মোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত যাঁহারা কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াই এই সকল কার্য্যে সমধিক শক্তি প্রয়োগ করেন তাঁহারা যোগাভ্যাসের আসল ফল যে শান্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না,

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪

বৃথা কালক্ষয় হইয়া যায়। জীবহিতের ছলে তাঁহারা ঘোর কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া পরিশেষে তাঁহারা কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া মুক্তি মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ॥ ১৩

অন্বয়। অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ ভূত্বা (জঠরাগ্নি হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ আশ্রিতঃ (দেহকে আশ্রয় করি), প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও আপন বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া) চতুর্ব্বিধম্ অন্নং (চারিপ্রকার খাদ্য—চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্ব্বিধ খাদ্য) পচামি (পরিপাক করি) ॥ ১৪

শ্রীধর। কিঞ্চ—অহমিতি। বৈশ্বানরঃ—জাঠরাগ্নিঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্য অন্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভিঃ ভুক্তং—ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্ব্বিধং অন্নং পচামি। তত্র যৎ দন্তৈঃ অবখণ্ড্য অবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি—তদ্ভক্ষ্যং। যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি—তদ্ভোজ্যম্। যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি—তল্লেহ্যং। যত্তু দংষ্ট্রাদিভিঃ নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্য অবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তৎ—চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধোঽস্য ভেদঃ ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—আমি বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিদিগের দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, [জঠরাগ্নির] উদ্দীপক প্রাণ ও অপান বায়ু সহকারে প্রাণিদিগের ভুক্ত—ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, চুষ্য—এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি। তন্মধ্যে তাহাই ভক্ষ্য যাহা দন্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করা যায়—যেমন পিষ্টকাদি। যাহা জিহ্বা দ্বারা বিলোড়ন করিয়া গিলিয়া ফেলিতে হয় তাহাই ভোজ্য—যেমন পায়সাদি। যাহা জিহ্বাতে নিক্ষেপ করিয়া রসাস্বাদনপূর্ব্বক গলাধঃকরণ করিতে হয় তাহাই লেহ্য—যেমন দ্রবীভূত গুড়াদি। যাহা দন্তদ্বারা নিপীড়ন করিয়া রসাংশমাত্র গলাধঃকরণ করিয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া দিতে হয়—তাহাই চোষ্য—যেমন ইক্ষুদণ্ডাদি; এই চতুর্ব্বিধ অন্নের ভেদ ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরে অগ্নিস্বরূপ আমার দেহের মধ্যে প্রাণ আর অপান সমানরূপে আট্‌কে থাকিলেই চতুর্ব্বিধ অন্ন—চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—হজম্ করি, সেই অগ্নি যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীরে আছে ততক্ষণ লোক জীবিত, জীবন গেলেই সে অগ্নি গেল (মরে গেছে—লোকে বলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে) কিন্তু এমত রূপ অগ্নি এই শরীরে জাজ্বল্যমান তথাপি ক্রিয়াতে—আত্ম চিন্তনেতে—অনবধান, আগুন দিলেও যদিস্যাৎ অবধান না হয় তবে যাতে খুসি তাতে লাগুক।—ভগবান জঠরাগ্নিরূপে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্ব্বিধ অন্নের পরিপাক করিতেছেন। কিরূপে পরিপাক করেন? প্রাণ ও অপান এই দুইটি বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া পরিপাক করেন। বাস্তবিক ভোজন একটি সাধারণ কার্য্য নহে। ভোজনের দ্বারাই জীব পুষ্ট হয়, বল লাভ করে। আধিভৌতিক শরীর যেমন অন্নাদিদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, ইহার সার ভাগও তদ্রূপ আধ্যাত্মিক শরীর পরিপুষ্ট করে—যদি অন্ন পবিত্র হয় ও দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হয়।

এই অন্নের ভোক্তা কে? যেমন সর্ব্ব কর্ম্মের ফল নারায়ণে অর্পিত হয়, এই অন্নও সেইরূপ পরম দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হয়। সেই অন্ন গ্রহণ করিবার জন্য তিনি বৈশ্বানররূপে জঠরে বসিয়া আছেন। একবার যেন সে কথা স্মরণ করিয়া প্রতি গ্রাসে তাঁহাকে খাওয়াইতে পারি। দেবোদ্দেশে অন্ন ত্যাগ করিতে পারিলে তাহা একটি পবিত্র যজ্ঞে পরিণত হইতে পারে। তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"পূজয়েদশনং নিত্যং অদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥"

অন্নই জীবন ধারণের মূল—এই ভাবে অন্নকে ধ্যান করিবে। অন্নকে নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। অন্ন দেখিয়া আনন্দিত হইবে, যদি অন্য কোন কারণে মনে তাপ থাকে, তাহাও অন্ন দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই অন্ন যেন প্রতিদিন প্রাপ্ত হই,—এই বলিয়া অন্নকে বন্দনা করিবে।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন—ভোক্তা বৈশ্বানর অগ্নি, ভোজ্য অন্নই সোম—এই দুইটি মিলিয়াই অগ্নিষোম হয়। এই জগৎ অগ্নিষোমময়—এই প্রকার যাহার দৃষ্টি, তাহার পক্ষে অন্নদোষ বলিয়া কিছু থাকে না।

এই পরমাত্মরূপী অগ্নিতে প্রত্যহ ভোজ্যরূপ আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই পরমাত্ম-রূপী অগ্নির প্রাণ ও অপানই আজ্যভাগ অর্থাৎ ঘৃত। এই প্রাণাপানরূপ ঘৃত ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে হবন হইতেছে, তাহাতেই আমরা বাঁচিয়া আছি, সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চিন্তা যাহা আমাদের জীবনের লীলা তাহা হইতেই উত্থিত হইতেছে। কিন্তু সাবধান! কেবল বিষয় চিন্তায় যদি ঐহবিঃ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তবে তাহাতে কেবল মাত্র ধূম উঠিবে,—কেবল অজ্ঞান-অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে, ভিতরের সে প্রজ্বলিত অগ্নির কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। প্রাণাপানের ঘর্ষণেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ক্রিয়ার দ্বারাই এই প্রাণাপানের ঘর্ষণ হয়, ক্রিয়া পাইয়াও যদি অবধান না হয়, অর্থাৎ মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা না হয়, তবে সে অগ্নি কামাগ্নি, ক্রোধাগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, এবং এই দেহ মনঃ প্রাণ তাহার ইন্ধনের কাজ করিবে। তাই আমরা অগ্নিরূপী পরমাত্মার নিকট আমাদের মনের বাসনাটি সাম-বেদের প্রথম মন্ত্র দ্বারা ব্যক্ত করি—

"ওঁ অগ্ন আ যাহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি।" হে অগ্নে, তুমি আমাদের জীবন যজ্ঞের আহুতি গ্রহণের জন্য এস। তুমি যজ্ঞেশ্বর, জীবন যজ্ঞের এই প্রাণরূপ হবিঃ তুমি গ্রহণ করিলেই, উহা চিরস্থির পরমানন্দ ধামে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। ঐ স্থির প্রাণ স্থির চিত্তই দেবতাদের ভক্ষণীয় বা গ্রহণীয়। এতদিন অস্থির চঞ্চল মনঃ প্রাণ দ্বারা কেবল অসুরদিগকেই ভোজন করান হইয়াছে, দেবতারা উপবাসী আছেন। আজ হে অগ্নিরূপ ভগবান তোমার কৃপায় প্রাণ স্থির হইয়াছে, মনঃ স্থির হইয়াছে, এইবার উহা দেবভোগ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। তুমি হোতা হইয়া এই আস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর। তুমি হোতা অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তা—এই প্রাণযজ্ঞের তুমিই কর্ত্তা, তুমি আস্তীর্ণ কুশ অর্থাৎ

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

মূলাধারের উপরে স্বাধিষ্ঠানে নারায়ণরূপে অবস্থান করিতেছ, তোমাকে দেখিয়া আমি যেন নিজের কর্ত্তৃত্ব বোধ ভুলিয়া যাইতে পারি।

জগতের একমাত্র কর্ত্তা প্রভুই হইলেন পরমাত্মা, তিনিই অগ্নি, আর যাহা কিছু এই ব্যবহারিক জগৎ সমস্তই সোম বা অন্ন. পরমাত্মা—ভোক্তা দ্রষ্টা ও আর ইদং সর্ব্বং ভোজ্য বা দৃশ্য। এই দ্রষ্টা দৃশ্য যতক্ষণ মিলিত না হইবে,—দুই এক না হইবে, যতদিন জগদম্বা কালিকারূপে "সব"-কে খাইয়া না খেলিবেন, ততদিন জগৎ-দর্শন বা ভ্রান্তি-দর্শন ঘুচিবে না ॥ ১৪

অন্বয়। অহং চ (আমিই) সর্ব্বস্য হৃদি (সকলের হৃদয়ে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট আছি), মত্তঃ (আমা হইতে) স্মৃতিঃ, জ্ঞানম্ অপোহনং চ (স্মৃতি, জ্ঞান এবং তাহাদের অভাব বা বিলোপ হয়) সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ (সমস্ত বেদের দ্বারা) অহম্ এব বেদ্যঃ (আমি-ই জ্ঞেয়)। বেদান্তকৃৎ (বেদান্তার্থ-প্রকাশক), বেদবিৎ চ (এবং বেদার্থবেত্তা) অহমেব (আমিই) ॥ ১৫

শ্রীধর। কিঞ্চ—সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য—প্রাণিজাতস্য, হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহং, ততশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি। জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি। অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈঃ তত্তৎ-দেবতারূপেণ অহমেব বেদ্যঃ। বেদান্তকৃৎ—তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকশ্চ জ্ঞানদো গুরুঃ অহমিত্যর্থঃ। বেদবিদেব চ—বেদার্থবিদপি অহমেব ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—আমি সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। অতএব আমা হইতেই (আমি থাকার জন্যই) প্রাণিমাত্রের পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি হয়। আমা হইতেই বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজনিত জ্ঞান হইয়া থাকে। এবং অপোহন অর্থাৎ সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপ আমা হইতেই হয়। বেদ সকলের দ্বারা (বেদ-প্রতিবাদ) তত্তৎ দেবতারূপে আমিই বেদ্য এবং বেদান্তকৃৎ অর্থাৎ বেদান্ত-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জ্ঞান-দাতা গুরু আমি-ই, এবং বেদার্থবিদও আমি-ই ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকলের হৃদয়েতে নিঃশেষরূপে স্থিতি যাহা যোনিমুদ্রায় (গুরুবক্ত্রগম্য)—তত্রাপি গলায় মাদুলি প'রে অন্যত্রে ঢেঁড়রা পিটিয়ে বেড়াচ্চেন, বকে বকে। ক্রিয়ার পর অবস্থার যে স্থিতি তাহাও হৃদয়েতে—তাহারই নাম জ্ঞান—যদিস্যাৎ সব জানিতে ইচ্ছা কর—তো ক্রিয়ার পর-অবস্থায় (স্থিতি) থাক। কারণ, তখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না—জানিবারও ইচ্ছা থাকে না—তুমি

ব্যতীত অন্য কোন বস্তুও থাকে না, আর সব যখন এক হইয়া গেল আর সেই এক তুমি হইলে তখন সবই এক হইল। সুতরাং সবই জানা হইল। জানা জানা ক'রে লোকে খুন, সেই জানা—যাহা জানিবার যোগ্য,—তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই জানিতে পারিবে !!! জানা - জানা দুই বস্তু না হইলে হয় না—একজন জান্‌বে আর এক জিনিসকে, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থেকে সব এক হ'য়ে, দুই তখন থাকিল না, সুতরাং দুই না থাকিলেই জান্‌বার অন্ত করা হইল, অতএব বেদান্ত পড়ে শুনে যে অবস্থা প্রাপ্ত হতে হইবে তাহা এক পলভরের মধ্যে সমুদয় জান্‌বার অন্ত করে দেন। ওঁ ওঁ ওঁ তাহা জানিবার—যা জানা উচিত, তাহাও ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি জানিতে পারে। বেদ—বিদ ধাতু—জানা, সেই বেদ গুরুকৃপা করিলে অর্থাৎ তুমি নিজে কৃপা করিলে এক পল ভরের মধ্যে জানিতে পারে ওঁ এমত উত্তম বস্তু হইতে লোকে বিমুখ রহিয়াছে।—অন্তর্য্যামি রূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে "আমি" অবস্থিত রহিয়াছি। আমা হইতেই সমস্ত প্রাণীর পূর্ব্বানুভূত বিষয় স্মরণ হয়—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা"। আবার আমি আছি বলিয়াই জীবের বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান হয়। আবার এই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমা হইতে হয়—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা"। বেদ হইতে সমস্ত দেবতার জ্ঞান হয়, আমিই সর্ব্বদেবময় সুতরাং সর্ববেদের বেদ্যও একমাত্র আমি। এবং সমস্ত জ্ঞানের গুরুও আমি। এখন যদি বলা যায় সবই যদি তুমি, তবে এ বদ্ধভাব তো তোমার এবং এজন্য জীব কর্ম্মফল ভোগ করিতে যায় কেন? বাস্তবিক রজ্জুতে সর্পভ্রম কালেও যেমন সর্পধর্ম্ম রজ্জুতে থাকে না, তদ্রূপ এই কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করে না। অঙ্কুর উদ্গমের যেমন আলোক হেতুমাত্র, তাহার সহিত অঙ্কুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ জীবের কর্ম্মানুরূপ ফলের উদয় হয় আত্মার স্থিতি হেতু, নচেৎ কর্ম্মের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। কর্ম্ম অজ্ঞানজনিত জীবের ভাব মাত্র, আত্মাতে অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব—এজন্য তাঁহাতে কর্ম্ম ও তজ্জনিত বন্ধন থাকিতে পারে না।

অন্তর্য্যামিরূপে তিনি যে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি যোনিমুদ্রায়। বাহিরে অস্থি-মাংস-রক্ত-বিনির্ম্মিত এই দেহ-যষ্টি ব্যতীত আর তো কিছুই দেখা যায় না, কেন তবে ঐ অচেতন ইন্দ্রিয়েরা বিষয় অনুভব করিতে পারে, কেন মন মনন করে—"কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি"—কোন দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন? কাহার অভিপ্রায়ে লোকে এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছে? তাহার উত্তরে উপনিষদ বলিতেছেন—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।"

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণের শক্তি, তিনি মনের মন, তিনি বাক্যের

বাক্য—কথন-শক্তি, তিনি প্রাণের প্রাণ। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"শ্রবণেন্দ্রিয়কে সাধারণতঃ নিজবিষয় শব্দ গ্রহণ করিতে সমর্থ দেখা যায়, কিন্তু নিত্য অসংহত (নিরবয়ব) সর্ব্বান্তরস্থ আত্ম-জ্যোতিঃ বিদ্যমান থাকিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেই বিষয়াভিব্যঞ্জন-সামর্থ্য থাকে, নচেৎ থাকে না।" "আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—এই পুরুষ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশাদুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে—এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দীপ্তিতেই প্রকাশিত হয়। আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট যিনি পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহা যোনিমুদ্রা দ্বারা জানা যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি—তাহাও হৃদয়ে হইতেছে, "যতো নির্য্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়ান্মনসঃ স্থিতিকারণম্॥" এই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় নামই প্রকৃত-জ্ঞান। কারণ প্রকৃত-জ্ঞানে দ্বৈতভাণ থাকে না, এই ক্রিয়ার পর অবস্থার আর কোন দ্বিতীয় বস্তুর অনুভব হয় না, কারণ তখন "ইদং সর্ব্বং" সমস্ত সেই এক অদ্বিতীয়ের মধ্যে আত্মসংগোপন করে, ছায়া তেজের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাই—"অপোহনং" বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত জ্ঞান সমাধিজ জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তখন আর কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না। আমিই যে সেই এক অদ্বিতীয়ের সহিত অভিন্ন এ স্মৃতি-ধারা ক্রিয়ার পর-অবস্থার পর-অবস্থায় উদয় হয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় দ্বিতীয়ের বা জ্ঞাতার অভাবে কোন জ্ঞেয় বস্তু থাকিতে পারে না। সেই অদ্বয় পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা-স্বরূপ, এ জ্ঞান অনুমানে থাকিলেও ইহার প্রত্যক্ষ অনুভব ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই হয়—ইহাই বেদবিদের অবস্থা। তবে মনে হইতে পারে সব ভুলিয়া যাওয়াই কি তবে জ্ঞান হইল? আমাদের নিদ্রার সময় বা মস্তিষ্কের বিকৃতি হইলে আমরা যেরূপ সব ভুলিয়া যাই, এ সেরূপ ভুলিয়া যাওয়া নহে, এ এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে এই দৃশ্য বৈচিত্র্যের—এই নামরূপ তরঙ্গের—আত্ম-সমুদ্রের মধ্যে বা নিজের মধ্যে নিমজ্জন। যাহারা অনবরত জ্ঞান জ্ঞান বলিয়া ভ্যান ভ্যান করে, তাহারা জানে না তাহাদের এই সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কতটুকুই বা জ্ঞান লাভ হয়? কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যে ডুবিতে পারে, সে যখন আবার ক্রিয়ার পর-অবস্থার পর-অবস্থায় ব্যুত্থিত হয়—যখন তাহার বাহ্য চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে না—কিন্তু তখন তাহার জানিবার ও বুঝিবার শক্তি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—সে অবস্থা হইতে ইচ্ছা করিলে সে এত জানিতে ও বুঝিতে পারে, যাহা জগতের সমুদয় জ্ঞান-গর্ভ পুস্তক পড়িলেও তাহা হইবার নহে। বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা যে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ হয় যোগীর সে জ্ঞান মুহূর্ত্ত মধ্যে হইতে পারে। যাহা জানিলে সমুদায় জানা যাইতে পারে, যাহা জানিলে এত পৃথক পৃথক ভাবে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন হয় না,—যে অবস্থা বেদান্তাদি বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াও লাভ হয় না, সেই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত তুর্য্যাবস্থা পলকের মধ্যে সাধকের আসিতে পারে, যদি সাধক আপনার প্রতি আপনি কৃপা করিয়া মন দিয়া সাধনা করেন, বিষয়ের হেয়ত্ব জানিয়া বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত হন, দুষ্কার্য্য হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে ফিরাইয়া লন, প্রাণ-ক্রিয়া করিয়া মনঃপ্রাণকে আত্মস্থ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হন—তবে "কা চিন্তা মরণে রণে?" ॥ ১৫

(ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ)

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

অন্বয়। ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) ইমৌ দ্বৌ (এই দুইটি) পুরুষৌ এব (পুরুষই) লোকে (সংসারে--প্রসিদ্ধ), [তন্মধ্যে] সর্ব্বানি ভূতাণি (সমস্ত ভূত) ক্ষরঃ (নশ্বর), কূটস্থঃ (ভোক্তা চেতন) অক্ষরঃ উচ্যতে (অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত হন) ॥ ১৬

শ্রীধর। ইদানীং "তদ্ধাম পরমং মম" ইতি যদুক্তং তৎ স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং দর্শয়তি — দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তৌ এব আহ— তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি—ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তানি শরীরাণি। অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটঃ—রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বত ইব, দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থঃ—চেতনো ভোক্তা। স তু অক্ষরঃ পুরুষঃ ইতি উচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং ৭ম শ্লোকোক্ত "তদ্ধাম পরমং মম"—এই শ্লোকোক্ত যে স্বকীয় সর্ব্বোত্তমত্ব তাহা তিনটি শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন]—ক্ষর এবং অক্ষর এই দুইটি পুরুষ জগতে প্রসিদ্ধ আছেন। তাহাদিগকেই (তাঁহাদের সম্বন্ধেই) বলিতেছেন। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ হইতেছেন সমস্ত ভূতগণ—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর। যেহেতু অবিবেকি লোকের শরীর সমুহে পুরুষত্বের প্রসিদ্ধি আছে। "কূট" শিলারাশিময় যেরূপ পর্ব্বত (দেহ বিনষ্ট হইলেও পর্ব্বত যেমন শিলারাশিরূপে থাকে) সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলেও নির্ব্বিকার হেতু যিনি বিদ্যমান থাকেন—তিনিই কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা। সেই চেতন ভোক্তাকেই বিবেকিগণ অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দুই পুরুষ এই লোকের মধ্যে, এক ক্ষর এক অক্ষর—অন্য দৃষ্টিতে আসক্তিপূর্ব্বক যিনি রহিয়াছেন তাঁহার নাশ আর আত্মায় থাকিয়া যিনি কূটস্থেতে রহিয়াছেন তিনি অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী ; তন্নিমিত্তে যত লোক সব নাশমান, কেবল কূটস্থেতে যাঁহারা অষ্টপ্রহর রহিয়াছেন তাঁহারাই অবিনাশী—যাহার স্থিতি ত্রিকূটিতে, যাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কেবল গুরুবক্তৃ গম্য—গুরুর চক্ষের দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যায় – না দেখাইলে দেখিতে পাওয়া যায় না।—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আচার্য্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন ; তাঁহার সেই ব্যাখ্যার অনুবাদ এখানে দিতেছি। "ভগবান ঈশ্বর—যিনি নারায়ণ এই নামে প্রসিদ্ধ, সেই পরমাত্মা এক হইলেও তদীয় উপাধির নানাত্ব আছে। 'আদিত্যগত যে তেজ অখিল জগৎকে ভাসিত করে'—এই সকল শ্লোক দ্বারা সংক্ষিপ্ত ভাবে বিভূতির বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি দ্বারা প্রবিভক্ত বলিয়া প্রতীত অথচ বাস্তবিক নিরুপাধিক যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণের জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির আরম্ভ করা হইতেছে। অতীত এবং অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী

অধ্যায়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সেই সকল পদার্থকে তিন প্রকারে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন,—যে পুরুষ দুই প্রকার। এই সংসারের পুরুষ বলিলে দুই প্রকার রাশিতে বিভক্ত দুই জাতীয় পদার্থ বুঝা যায়। এক প্রকার হইতেছে "ক্ষর" যাহা ক্ষরিত হয় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর এক প্রকার পুরুষ যাহাকে "অক্ষর" বলা যায়। এই অক্ষর রাশি ক্ষর হইতে বিপরীত পুরুষ, অর্থাৎ ইহাই ভগবানের মায়াশক্তি এবং এই অক্ষরই ক্ষর নামক পুরুষের উৎপত্তির পক্ষে বীজস্থানীয় কারণ। অনেক সংসারী জীবের এবং সংস্কার সমূহের ইহাই একমাত্র আশ্রয়। কে সে ক্ষর এবং কেই বা সে অক্ষর, তাহাই ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন যে, "ক্ষর" এই শব্দটির অর্থ সর্ব্বভূত অর্থাৎ সমস্ত বিকারজাত বস্তুই ক্ষর। কূটস্থ যে পুরুষ, তাহাই অক্ষর শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ। কূটস্থ এই শব্দটির অর্থ এই,—কূট শব্দের অর্থ রাশি ; যিনি রাশির ন্যায় অপরিবর্ত্তনশীল হইয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেই কূটস্থ বলা হয়। অথবা কূট শব্দটির অর্থ মায়া, বঞ্চনা, জিহ্মতা, কুটিলতা। সংসারের অনন্ত বীজস্বরূপ মায়াশক্তির যিনি আশ্রয় এই কারণেও তিনি অক্ষয় বা অবিনাশী।"

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের মতে তাহা হইলে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ কি হইলেন ? কার্য্যোপাধিযুক্ত যাহা ভৌতিক ও বিনশ্বর পদার্থ—তাহাই ক্ষর, এবং কারণোপাধিযুক্ত অবিনশ্বর মায়া শক্তিই অক্ষর পুরুষ। শ্রীধর বলিলেন—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত যে সমস্ত শরীর, যাহাকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের প্রকাশ হয়, সেই ব্যক্তভাবরূপ শরীর ক্ষর পুরুষ। আর দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি বিদ্যমান থাকেন, তিনি কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা। এখন দেখা যাক এই চেতন ভোক্তা অব্যক্ত কারণ ও ব্যক্ত শরীররূপ কার্য্য কিরূপে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্তা হইতে উদ্ভূত হইল। আমাদের সম্বিতের চারিটি ভূমিকা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। আর একটি অবস্থা আছে তাহাকে যোগীরা অতিতুর্য্যাবস্থা বলেন। যাহা হউক সাধকদিগকে সম্বিতের এই নিম্নভূমি হইতে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম ভূমিতে উত্তোলন করাই যোগ সাধনের উদ্দেশ্য। সম্বিৎ যতক্ষণ উচ্চতর ভূমিতে উত্তোলিত না হয় ততক্ষণ আমাদের পশুভাব, জীবভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। সমাধিজ প্রজ্ঞা ব্যতীত কেহ দেবভাব বা শিবভাব পাইতে পারেন না। গীতার ব্যাখ্যায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীব পরমাত্মার সহিত এক হইয়াও যে রূপ তাঁহা হইতে প্রাণ-প্রবাহের মধ্য দিয়া জাগ্রদাবস্থায় বা স্থূল শরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ঠিক বিপরীত মুখেই ইঁহাকে আবার স্বস্থানে স্বীয় কেন্দ্রে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। এই প্রত্যাবৃত্ত হইবার পথানুসরণকেই সাধনা বলে। প্রথমতঃ জাগ্রৎ ভূমিকা,—স্থূল দেহ, পরে স্বপ্নভূমিকা বা সূক্ষ্মদেহ, পরে সুষুপ্তি বা কারণ দেহকে অতিক্রম করিয়া সাধককে চতুর্থ ভূমি বা তুরীয়াবস্থাতে ফিরিয়া অসিতে হইবে। স্থূল দেহে চৈতন্য সঞ্চার হইবার কালে সূক্ষ্ম ও কারণ দেহে চৈতন্য সঞ্চারিত আছেই বুঝিতে হইবে। যখন স্থূল শরীরে এই চৈতন্য প্রকাশিত থাকে, তখন তাহাকেই আমরা জাগ্রদাবস্থা বলি। এই স্থূলদেহস্থ যে চৈতন্য—তাহাই প্রকৃত পক্ষে ভূতাত্মা—ইনিই অন্নময় কোষের বাহন ; ইহাই অহমিকার ক্ষেত্র। এই চৈতন্য কেবল 'অহং'-অভিমানী জীব, সুখ-দুঃখের ভোক্তা, এই স্থূল জগৎ ও স্থূল ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুই উহার নজরে পড়ে না। এই জন্য ইহাকে আত্মার স্থূল ভাব বা জড়ভাব বলাও যায়। এই স্থূল ভাব বা জড়ভাব অত্যধিক মাত্রায় থাকিলে মনুষ্যের

পশুত্বে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াও কিছু মাত্র বিস্ময়জনক ব্যাপার নহে। এই ভাব হইতে জীব যখন আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে প্রযত্ন করে, তখন সেই নিম্ন শ্রেণীর সাধকের ভাবকেই তন্ত্রে "পশ্বাচার" বলা হইয়াছে। এই পশ্বাচার অনুষ্ঠান হইতেই ভূতাত্মা জীবাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট বা নিমজ্জিত হয়। এই জীবাত্মাই পরমাত্মার কিরণ, ইহাই শুদ্ধ 'অহং' রূপে কারণ-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর ও স্থূল-শরীরকে প্রাণময় করিয়া তুলে। সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরই ইঁহার বাহন অর্থাৎ এইখানে জীবাত্মাকে জ্যোতিঃরূপে (তৈজস) প্রত্যক্ষ করা যায়। এই কিরণ স্থূল শরীরে আপতিত না হইলে স্থূল-শরীরাভিমানী 'অহং' বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেমন স্বপ্নে স্থূল শরীরে অভিমান থাকে না। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-দেহ—এ সমস্তই প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চাতীত আত্মা যখন এই সকল স্তরে (condition) প্রাণসূত্ররূপে (সূত্রাত্মা) অবতরণ করেন, তখনই এই কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। এই প্রাণই মনের জনকস্থানীয়। "মনোনাথস্তু মারুতঃ"—এই সূত্রাত্মাই জীব, ইঁহাকেই বেদান্ত মতে চিদাভাস বলা হয়। এই সূত্রাত্মাই শ্বাসরূপে জীবের জীবন। এই জন্য ফিরিবার পথে যোগীরা এই শ্বাস প্রশ্বাসকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন তুষের মধ্যে চাউল আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ এই শ্বাসের মধ্যে প্রত্যগাত্মা আচ্ছন্ন থাকেন। চাউলে তুষ থাকিলে তবে আবার তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে, তুষ বাহির হইয়া গেলে আর অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না, তদ্রূপ যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস থাকে, ততক্ষণ তাহার বাসনা ও কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল-ভোগের জন্য জন্ম মরণাদি হয়। সাধনের দ্বারা এই শ্বাসের ক্ষয় হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে—তাহা জন্ম-মরণের অতীত অবস্থা। এই সূত্রাত্মা প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদে আছে :—

"প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে, ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥"

হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং মাতাপিতার অনুরূপ বা পূর্ব্ব-কর্ম্মের অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ! যে তুমি প্রাণসমূহের সহিত অবস্থান কর, তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে বলি-উপহার প্রদান করিয়া থাকে।

"যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥"

হে প্রাণ! তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে আছে, আর যাহা মনেতে সঙ্কল্প ব্যাপারাদি দ্বারা নিয়ত ভাবে রহিয়াছে, সেই তনুকে শিব অর্থাৎ প্রশান্ত কর, উৎক্রান্ত হইও না অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হইও না। কারণ প্রাণ স্থির হইলে উহা অন্যত্র যাইতে পারে না। ছান্দোগ্যে আছে জ্ঞানীদের প্রাণ উৎক্রমণ করে না।

"প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥"

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত। হে প্রাণ! মাতা যেরূপ

পুত্রগণকে রক্ষা করেন; সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর, এবং আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর।

"আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মিং-শ্চরীরে॥" আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করে। পুরুষ দেহে যেরূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও আত্মাতে আতত বা অনুগত থাকে, এবং মনঃ-সম্পাদিত কোষাদি দ্বারা এই স্থূল শরীরে আগমন করে।

প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্র—তিনিই কূটস্থ, জীবাত্মা ইঁহারই কিরণ মাত্র। এই চিৎকণ প্রত্যগাত্মাও শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। এই চিৎকণ যে কত তাহার সংখ্যা নাই। এই চিৎকণগুলিই—"একোঽহং বহুস্যাম্"-এর বহু। কিন্তু বহু হইয়াও উহা ঐ এক অদ্বিতীয়ের সহিত সর্ব্বদা যোগ-যুক্ত। এই চিন্মাত্র পুরুষই অনন্ত চিদাকাশের বক্ষে প্রতিনিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই চিদাকাশই অব্যক্ত পরব্রহ্মের কতকটা ব্যক্ত ভাব। যেন শিবের সহিত শিবানী মিলিত। সেই অব্যক্ত ভাবকে কেহই আয়ত্ত করিতে বা বুঝিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সেই ব্রহ্মযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে—

"সচ্চিদানন্দ-বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্‌বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে যে নাদ (মহৎ) উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিন্দুর (অহঙ্কার তত্ত্বের) উৎপত্তি হয়।

"বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ॥"

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ শিব-শক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি—জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছে।

এই চেতন ভোক্তা পুরুষই চিৎকণ। ইনিই সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ "জ্যোতিরিবাধূমকঃ"—ধূমহীন জ্যোতিঃর ন্যায়। ইনিই অন্তরাত্মা।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ
মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।" কঠঃ উঃ

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ যিনি অন্তরাত্মা (জীবাত্মার আত্মা), যিনি জনগণের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট, তিনি শরীরের সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছেন। মুঞ্জাতৃণ হইতে যেমন ঈষীকা পৃথক করা যায়, সেইরূপ ঐ পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায়।

পরে ঐ চিদংশও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মধ্যে যেন ডুবিয়া যায়। কারণ অসংখ্য ঘটে একই

(পরমাত্মাই পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বর)

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

সূর্য্যের অসংখ্য প্রতিবিম্ব পড়ে, অসংখ্য ঘটোপাধির বিনাশের সহিত ঐ সকল চিদাভাসগুলির কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন কেবল একই বর্ত্তমান থাকে, এক বলিবারও কেহ থাকে না।

'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্',—(ছান্দোগ্য)। ইহাই মায়ার বা চিৎকণের আত্ম-বিলোপন। যে খেলা আরম্ভ হইয়াছিল, সে খেলা ফুরাইয়া গেল। ইহাই কৈবল্যাবস্থা। যোগসূত্রে আছে—"প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।" প্রসংখ্যানে বা বিবেকজ জ্ঞানেও বিরাগযুক্ত হইলে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হইতে ধর্ম্মমেঘ-সমাধি হয়। "ততঃ ক্লেশ-কর্ম্ম-নিবৃত্তিঃ"। এই ধর্ম্মমেঘ-সমাধি হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল মূলের সহিত নষ্ট হয়। পুণ ও অপুণ্য কর্ম্মাশয় সকল সমূলে হত হয়। ক্লেশ-কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্ জীবিত থাকিয়াও বিমুক্ত হন।

তাই পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয় ব্যাখ্যায় বলিলেন—পুরুষ দুই প্রকার। যাহাদের আসক্তি-পূর্ব্বক বিষয়াদিতে দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহারা দেহ-সম্বন্ধী বদ্ধজীব, তাহাদের চৈতন্যমাত্র ভূতাত্মায় পর্য্যবসিত, তাহারাই জন্ম মৃত্যুর চরকীতে চড়িয়া বন্ বন্ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, আর যাহাদের দৃষ্টি কূটস্থে নিবদ্ধ, তাহাদের মন দেহ-সম্বন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া সেই প্রত্যগাত্মায় নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের জীব অর্থাৎ মন প্রত্যগাত্মার সহিত মিলিত হইয়া পরে পরমাত্মার সহিতও মিলিয়া যাইবে—এই জন্য তাহারা অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা স্বয়ং অক্ষরস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের দেহে আত্মবোধ নাই, তাহাদের ত্রিকূটীতে পরম স্থিতিলাভ হইয়া গিয়াছে। তাহারা অভয় ও অমৃত পদ লাভ করিয়াছে ॥ ১৬

অন্বয়। অন্যঃ তু (ঐ দুই প্রকার [ক্ষর ও অক্ষর] পুরুষ হইতে ভিন্ন) উত্তমঃ পুরুষঃ (উত্তম পুরুষ) পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন), যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ (ঈশ্বর ও অব্যয়) লোকত্রয়ম্ আবিশ্য (লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্ত্তি (সকলকে পালন করিতেছেন ॥ ১৭

শ্রীধর। যদর্থম্ এতৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্ অন্যঃ—বিলক্ষণঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেব আহ—পরমশ্চাসৌ আত্মা চেতি উদাহৃতঃ—উক্তঃ শ্রুতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরাৎ—অচেতনাদ্বিলক্ষণঃ পরমত্বেন অক্ষরাচ্চেতনাদ্ ভোক্তৃ-র্ব্বিলক্ষণঃ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মতি। য ঈশ্বরঃ—ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ—নির্ব্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ম্ কৃৎস্নং আবিশ্য বিভর্ত্তি—পালয়তি ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [যে জন্য ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় লক্ষিত হইলেন তাহা বলিতেছেন]—এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্য একটি পুরুষই উত্তম পুরুষ। তাঁহার বৈলক্ষণ্য কি তাহা বলিতেছেন যে তিনি পরমাত্মা (তিনি পরম এইরূপ আত্মা) বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন। তিনি আত্মা বলিয়া অচেতন ক্ষর হইতে বিলক্ষণ, আর পরমত্ব হেতু ভোক্তা

অক্ষর পুরুষ হইতেও বিলক্ষণ এই তাৎপর্য্য। তাঁহার পরমাত্মত্বই দেখাইতেছেন যে সেই ঈশনশীল ঈশ্বর অব্যয় এবং নির্ব্বিকার হইয়াও লোকত্রয়ের হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া (প্রাণিমাত্রকেই) পালন করিতেছেন ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই কূটস্থ দেখিতে দেখিতে পরে এক উত্তম পুরুষ দেখিতে পায়—যাঁহাকে পরমাত্মা শাস্ত্রে কহে, যিনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবন যাহা এই শরীরের মধ্যে (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত সপ্তপাতাল, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা পৃথিবী মর্ত্তলোক, কণ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সপ্ত স্বর্গ) ইহাতে প্রবেশ করে চামড়ার জামা পরে আপনার ভরণ পোষণ বিশেষরূপে অর্থাৎ যাহার মন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইতেছে সে খাইতেছে—তিনি অব্যয় অবিনাশী, কারণ সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বব্যাপী তদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু থাকিলে তবে পরিবর্ত্তন হইত, যখন সবই এক তখন নাশ কার—তিনিই ঈশ্বর—কর্ত্তা জীব স্বরূপ সর্ব্বত্রেতে সব করিতেছেন অথচ কিছুই করিতেছেন না সূক্ষ্ম ব্রহ্মরূপে – করাকরি কেবল স্থূলরূপের জানিবে তাহা নিত্য নয়। ওঁ।—"হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকরাসীৎ"—হিরণ্যগর্ভ কূটস্থই সর্ব্বাগ্রে দেখা যায়, তাঁহা হইতেই সমস্ত ভূত জাত, তিনি সকলের একমাত্র পতি অর্থাৎ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই হিরণ্যগর্ভ কূটস্থের মধ্যেই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, কূটস্থ দর্শন করিতে করিতে তাহার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তমপুরুষের রূপ শরীরেরই মত, অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ যাহা ভ্রূ মধ্যে দেখা যায়, আর চুলের এক হাজার ভাগের এক ভাগ, তিনিই জীব সুষুম্নার মধ্যে আসিতেছেন ও যাইতেছেন ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম নক্ষত্রের মতন জ্যোতি যাহা দেখা যায়। উত্তম পুরুষ ব্রহ্ম, তাঁহারই অধীনে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, আপ, পৃথিবী এই পঞ্চ তত্ত্ব সেই উত্তম পুরুষ হইতেই হইয়াছে। সেই উত্তম পুরুষ ঈশ্বরই সকলের কারণ। তিনিই বিষয় ভোগ করিতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। সেই স্বরূপবৎ ঈশ্বরের তখন সে রূপও থাকে না, তখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ", ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন আর কিছুই নাই। তিনিই সমুদয় জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ তিনি ব্রহ্ম তাঁহার কোন চিহ্ন নাই, তথাপি সেই আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য ইহা শ্রুতিতে বলেন। যজুর্ব্বেদে আছে—"মরুতঃ শিবঃ মরুতঃ ব্রহ্ম" মরুতই শিব, মরুতই ব্রহ্ম। সেই মরুত যখন স্থির হইলেন তখন শিব এবং সেই মরুতই অন্তদিকে মন দিয়া সৃষ্টি করিতেছেন।

ক্রিয়ার পর অবস্থাই শিব, যিনি সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন। তিনি প্রথমে জল, তন্মধ্যে বীজ, তাহার মধ্যে নারায়ণ, তাহার মধ্যে কূটস্থস্বরূপ হেমাণ্ড আপনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনিই গায়ত্রী ও তিনিই নিত্যের নিত্য। যখন কূটস্থস্বরূপ গায়ত্রী লয় হন, তখন তাহার শক্তি ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে থাকে। "দেবাত্মশক্তি স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"—(শ্বেতাশ্বঃ উঃ) —মায়াধীশ্বর পরমাত্মার আত্মভূতা, অস্বতন্ত্রা, সেই শক্তি স্বগুণ অর্থাৎ সত্বরজস্তমো নামক স্বকীয় গুণে ও স্বীয় কার্য্য দ্বারা নিগূঢ়া অর্থাৎ আচ্ছাদিতা। যখন সাধক কূটস্থে থাকেন তখন সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন, তাহার মধ্যে যে গুহা আছে তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, যেখানে

রাত্রি বা দিন কিছুই নাই—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততঃ বৈ সদজায়ত" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত তস্মাৎ তৎসুকৃতমুচ্যতে"—ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ দর্শন, তৎপরে ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিয়া কূটস্থের মধ্যে যখন দেবতাদির দর্শন হয় তখনও কিন্তু দ্বন্দ্ব ভাব। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে দর্শনাদি নাই, তখন নির্দ্বন্দ্ব ভাব, উহাই ধ্রুব, স্থির, অক্ষর, আর দর্শনাদি ব্যাপার অস্থির ও ক্ষর। যদিও এই শরীরের মধ্যেই কূটস্থ রহিয়াছেন কিন্তু প্রথমে তাহা দেখা যায় না। যোনিমুদ্রায় কূটস্থ দর্শন হয়। কূটস্থ দর্শন হইল, এবং তাহারও বহু পরে তন্মধ্যে ঈশনশীল সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণদর্শন হয়। উহাই পুরুষোত্তম রূপ। কূটস্থ মধ্যেই সৎ, অসৎ সমুদয় সৃষ্টি হইতেছে, সেই জন্য তন্মধ্যে ত্রিলোক ও ত্রিলোকস্থ জীব সমুদয়কে দেখা যায়। পরে পুরুষোত্তম বা ঈশ্বর দর্শন। এই পুরুষোত্তমই ক্ষর অক্ষরের সংযুক্ত ভাব, এখানে ক্ষরের প্রাধান্য নাই, সেই জন্য নারায়ণ প্রপঞ্চের অধীশ্বর, প্রপঞ্চ লইয়া খেলা করেন মাত্র, কিন্তু তথাপি প্রপঞ্চাতীত ভাবে সদা অবস্থিত। এই হিরণ্যগর্ভাখ্য নারায়ণই সর্ব্বজীবের উপাস্য। হিরণ্যগর্ভ, নারায়ণ, ঈশ্বর, বিষ্ণু এই সকল একেরই নাম। তিনিই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সূত্রাত্মা, প্রাণ বা হংসরূপে নির্দ্দিষ্ট হন। তখন তাঁহার বহির্ম্মুখ বৃত্তি ফুটিয়া উঠে, এবং এই প্রপঞ্চ ব্যক্ত জগতের ব্যবহার চলিতে থাকে। তখন তাঁহাকে সুপ্তবৎ বলিয়া মনে হয়—নিজেকে নিজে যেন বিস্মৃত। এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ সদা একভাবে থাকে না এইজন্য উহাদিগকে ক্ষর বলা হয়। এই ক্ষর পদার্থও অক্ষর পুরুষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু গুরূপদেশ মত সাধনা দ্বারা যখন বাহ্য বায়ু স্থির হইয়া যায় অতি সূক্ষ্মভাবে কেবল তত্ত্বে তত্ত্বে চলিতে থাকে তখন বাহ্য প্রকৃতি বা দেহকে আর অনুভব করা যায় না। তখন ক্ষর অক্ষরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন "হংস" বিপরীত ভাবে গমন করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চকে আত্মসাৎ করেন। তখন "সোঽহং, সোঽহং"—অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্যই আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত, আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।* সাধনার চরম ফল ক্রিয়ার

* তিনটি পুরুষ ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম। ভূতপ্রকৃতিতে সঞ্চারিত যে চৈতন্য তাহাই ক্ষর পুরুষ। ঘটস্থ সূর্য্য প্রতিবিম্বের মত। ঘটের পরিবর্ত্তনে সূর্য্যের পরিবর্ত্তন হয় না বা ঘটনাশে তাহা নষ্ট হয় না; কিন্তু ঘটনাশের সহিত ঘটমধ্যস্থ প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যাহা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য নহে, যাহা শুদ্ধ চৈতন্য, যাহা ভূত প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত, দেহরূপ ঘট নষ্ট হইলেও যাহা থাকে, যাহা ঘটস্থ হইয়াও সর্ব্বঘটে একই রূপ অর্থাৎ মনঃস্থং মনোমধ্যস্থং হইয়াও যিনি "মনবর্জ্জিতং", যাহা অবিনাশী কূটস্থ,—তাহাই অক্ষর পুরুষ। ইনিই "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"—ইনিই পরা প্রকৃতি। যাহা না থাকিলে সৃষ্ট্যাদি কিছুই হইতে পারে না। যিনি প্রাণরূপে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছেন। ইনি অজ, শাশ্বত, অবিনাশী পুরুষ।

উত্তম পুরুষও এই অক্ষর পুরুষের সহিত অভিন্ন, কিন্তু তাঁহাতে আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অক্ষর পুরুষে নাই। ইহা অতিশয় রহস্যজনক তত্ত্ব। এ তত্ত্ব সকলে অবগত হইতে পারে না। জড় চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া, চৈতন্যবৎ বলিয়া বোধ হয়। শুদ্ধ চৈতন্য জড়সম্পর্করহিত—তাহাতে মনোধর্ম্ম নাই, তাহা শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র—জ্যোতিঃ মাত্র। কিন্তু সেই জ্যোতির অন্তর্গত পুরুষ, যাহাতে জড়ের ধর্ম্ম নাই, যাহা শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হইয়াও—কর্ত্তা ও ঈশান-ভাব সমন্বিত, যিনি সকলের হৃদয়স্থ হইয়াও হৃদয়-ভাব দ্বারা অনাবৃত, যাঁহার নিকট আমার মনের-কথা বলিতে পারি, যিনি কর্ম্মরূপ বিধাতা, যিনি আমার কথা শুনেন, আমাকে জানেন, আমাকে ভাল বাসিতে পারেন এবং আমার ভালবাসা লইতে পারেন—তিনিই নরাকৃতি নারায়ণ পুরুষোত্তম বা ভগবান। ক্ষর, অক্ষর

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

পর অবস্থা সমুদিত হইলে তথায় আর দৃশ্য দর্শন নাই। সেই অবস্থায় সদা থাকার নামই মহানির্ব্বাণ পদ, সেখানে কাল চক্রবৎ ভ্রমণ করেন না। এই অবস্থা পাইতে হইলে (১) প্রথম প্রয়োজন ক্রিয়া করা, (২) ক্রিয়া করিয়া নেশায় মত্ত হইয়া থাকা, (৩) প্রকৃতিস্থ হওয়া (অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এক হইয়া যাইলে এক প্রকার সমতা অনুভব হয় তাহাই) (৪) শান্তিপদ লাভ (৫) সদা শান্তি পদে থাকা। তখন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না, মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না, বস্তু নিরপেক্ষ পরম শান্তির ভাব ফুটিয়া উঠে ॥ ১৭

অন্বয়। যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরম্ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত) অক্ষরাৎ অপি (অক্ষর হইতেও) উত্তমঃ চ (উত্তম), অতঃ (সেই হেতু) লোকে বেদে চ (লোকে এবং বেদে) পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ অস্মি (পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত হইয়াছি) ॥ ১৮

শ্রীধর। এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বম্ আত্মনঃ নামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং—জড়বর্গম্ অতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ। অক্ষরাৎ চেতনবর্গাদপি উত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ। অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ—প্রখ্যাতোঽস্মি। তথা চ শ্রুতিঃ—"সর্ব্বস্যায়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি ইত্যাদি" ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [স্বীয় নাম নির্ব্বচন দ্বারা এবম্ভূত পুরুষোত্তমত্ব প্রমাণ করিতেছেন]—যেহেতু ক্ষরকে অর্থাৎ জড়বর্গকে অতিক্রম করিয়া আছি তাহার কারণ আমি নিত্যমুক্ত, এবং আমি অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ হইতেও উত্তম, কারণ আমি নিয়ন্তা। এজন্য লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত। এ বিষয়ে শ্রুতি এই—"সেই এই আত্মা, ইনি সর্ব্বলোকের বশীকরণে সমর্থ, সর্ব্বলোকের ঈশান বা ঈশ্বর, এবং তিনি এই সমস্তকে শাসন করেন" ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তন্নিমিত্তে কূটস্থ ক্ষরের অতীত কিনা পরে দেখা যায় তোমাতেই, তন্নিমিত্তে অক্ষরের পর উত্তম অর্থাৎ উর্দ্ধেতে একটি পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য তুমি জান্‌লে পর লোকের মধ্যে বলিতে পারিবে যে একটি উত্তম পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়—জেনে শুনে ভাল লোকে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহাকেই বেদ কহে—ওঁ—সেই বেদ ওঁকার হইতে

সমস্তই ইঁহার অন্তর্গত। ইঁহারই ভজনা হয়। ব্যক্ত ভাবের পরাকাষ্ঠা ভাব এই পুরুষোত্তম ভাব। কিন্তু পরব্রহ্ম সমস্ত ব্যক্তভাবের অতীত। তাঁহারই একাংশ মাত্র এই কারণার্ণবশায়ী আদি পুরুষ। ইনিই জগতের পরিপালনার্থ অবতীর্ণ হন। পরব্রহ্মের স্বরূপ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অতীত, পুরুষোত্তম ভাবও তন্মধ্যে নিমজ্জিত। তাঁহাকে জানিবার কোন উপায় নাই তিনি সত্তামাত্র। সমস্ত বিশেষণ অপগত হইলে, সমস্ত নাম রূপ মিটিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, যাঁহা হইতে সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় অনন্ত সৃষ্টি উচ্ছ্বসিত হইতেছে অথচ যিনি স্বয়ং সমস্ত উচ্ছ্বাসবিবর্জ্জিত, যাহা ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমেরও আশ্রয়, যাঁহাকে পুরুষ নামেও অভিহিত করা যায় না, যিনি সর্ব্বজ্ঞও নহেন, অজ্ঞও নহেন—তিনিই ব্রহ্ম। উপনিষদে এই ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন—জ্ঞানীগণ এই সত্তা মাত্র বস্তুর সত্যতা স্বীকার করিয়া আর সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন—তিনিই পরব্রহ্ম।

নির্গত, আর সেই ওঁকারস্বরূপ এই শরীর—এই শরীর হইতে যাহা জানা যায় তাহার নাম বেদ ওঁ ওঁ ওঁ—অতএব জেনে শুনে সব শাস্ত্রেতে পুরুষোত্তমের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—যবেরই যব তাহারই নাম ইন্দ্রযব জানিলে যবেরই মতন বোধ হয়, না জানিলে ইন্দ্রযব কি জানি কত বড়ই হবে!!! অর্থাৎ গুরু-বক্ত্র দ্বারায় জানিলেই সব সহজ—আর রামচন্দ্রকেই সহজ ক্রিয়াতেই পাওয়া যায় (যাহা গুরুবক্ত্রগম্য)।—

আমি পুরুষোত্তম; কেননা পূর্ব্বোক্ত ঐ দুই প্রকারের পুরুষের উপরেই আমার স্থান। কার্য্যরূপ এই শরীর বা জগৎ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট হইলেন কূটস্থ, তাহা হইতেও উত্তম—উত্তমপুরুষ, তিনিই কূটস্থে প্রতিবিম্বিত হন। কূটস্থের মধ্যে, সাধনার পরিপক্কাবস্থায় তাহাকে সাধকেরা দেখিয়া থাকেন। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, তাহা এই—ক্ষর পুরুষের অতীত তাঁহাকে বলা হইল এবং অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম তাঁহাকে বলা হইল কেন? তবে কি ক্ষর পুরুষের মধ্যে তিনি নাই? না, এখানে সে কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। ক্ষরের অতীত, কেননা এই জড়বর্গ দেহাদি বড় স্থূল, বড় বহির্ম্মুখ, যাহারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়বর্গ লইয়াই থাকে, তাহারা দেহস্থিত কূটস্থ চৈতন্যের কোন সন্ধানই পায় না—এই জন্য তাদৃশ জনগণের তিনি অনধিগম্য, কিন্তু তিনি অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম কেন? কারণ এই দেহের অভ্যন্তরে যে চিজ্জ্যোতি কূটস্থ মণ্ডল রহিয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা গুরুকৃপায় দেখিতে পান, তাঁহারাও সেই হিরণ্ময়বপু ধৃত-শঙ্খ-চক্র যে পুরুষোত্তম নারায়ণ, তাঁহাকে কদাচিৎ দেখিতে পান। এই হেমাণ্ড কূটস্থ জ্যোতিঃই যেন তাঁহার বাহ্য শরীর। তাহার অভ্যন্তরে সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ। এই উত্তম পুরুষই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অখণ্ড চিৎসত্তা হইতে অভিন্ন। এই পুরুষোত্তম ভাবই সগুণ ভাবের পরাকাষ্ঠা। নির্গুণ ভাব একমাত্র ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপলব্ধি করা যায়। এই পুরুষোত্তম দর্শনের পরই সাধক ক্রিয়ার পর-অবস্থা (আপনাতে আপনি) সহজেই লাভ করিতে পারেন। উহাও ক্রিয়ার পর-অবস্থাই বটে, তবে উহা সগুণ ভাব, গুণাতীত ভাবই সর্ব্বোত্তম অবস্থা। লোকে এই সকল কথা প্রথমে অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিতে পায়, তাহার পর মহাপুরুষেরা আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা এবং নিজ-সাধনার অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা জানিতে পারেন, তাহাই জগতের কল্যাণের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহাই শাস্ত্র এবং বেদ। বেদের মূল প্রণব। এই দেহই প্রাণব-রূপ। এই দেহকে যিনি জানিয়াছেন এবং দেহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যিনি অনুভব করিতে পারেন—তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বাহ্য বিচার দ্বারা এই পুরুষোত্তমকে বুঝিতে গেলে নানারূপ বাদ উপস্থিত হয়। এই পুরুষোত্তম ভাবই "রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্"। বাস্তবিকই তো ইহা কত বড় রহস্য! যাহারা দেহ ব্যতীত কিছু বুঝিতে পারে না, কেবল বিচার দ্বারা ইহাতে চেতন পদার্থকে মাত্র লক্ষ্য করিতে পারে, সেই চেতন ধারা অনন্ত চিৎসত্তা হইতে আসিতে আসিতে কত রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা না জানিলে ঐ পরম রহস্য কি করিয়া বুঝা যাইবে? এই শরীরের মধ্যে একটি জ্যোতিঃর সদা সর্ব্বদা স্ফুরণ দেখিতেছি, যদ্দ্বারা অচেতন ইন্দ্রিয়-মনাদি সচেতনের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যে সূত্রাত্মা প্রাণের প্রকম্পনে এই সমস্ত বিষয় বোধগম্য হইতেছে,

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

সেই নিখিল জীবের জীবনস্বরূপ প্রাণ-শক্তি আরও কতই না রহস্যময়—সেই প্রাণ-ধারা যে এক চিৎকণ জ্যোতিঃর প্রবাহমাত্র, সেই চিদংশ বা স্থির প্রাণ আরও কত রহস্যময়—তাহার উপরেও সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ, সুতরাং তাহা যে রহস্য বিষয়ের মধ্যে উত্তম রহস্য হইবে তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে ? ১৮

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) এবম্ (এইরূপে) যঃ (যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীন হইয়া) মাং (আমাকে) পুরুষোত্তমং জানাতি (পুরুষোত্তম বলিয়া জানে), সঃ (সেই) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারে) মাং ভজতি (আমাকে ভজনা করে), [তদনন্তর সে] সর্ব্ব-বিৎ (সর্ব্বজ্ঞ হয়) ॥ ১৯

শ্রীধর। এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবং—উক্ত প্রকারেণ, অসংমূঢ়ঃ—নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্ব্বভাবেন—সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি ততশ্চ সর্ব্ববিৎ—সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [এবম্ভূত ঈশ্বরকে জানার কি ফল তাহাই বলিতেছেন]—উক্ত প্রকারে নিশ্চিতমতি হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে, সে সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করে, তদনন্তর সে সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হয় ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কেহ আমাকেই ভজনা করে (**অর্থাৎ ক্রিয়া করে গুরুবাক্যের দ্বারা উপদেশ পাইয়া**) **সম্যক্ প্রকারে অচৈতন্য হইয়া** [জগৎ ভুলিয়া ; বিষয়ের প্রতি এই অনাসক্তি ভাবই ভগবানের প্রতি নিশ্চিতমতি করে] **অর্থাৎ কখনও ভুলেও যায় না, সেই পুরুষোত্তমকে জানে অর্থাৎ দেখে—সে সব জানে—আর সব ভাবেতেই অর্থাৎ যাহাতেই মন লাগায় তাহাতেই উত্তম-পুরুষকে দেখে অর্থাৎ সর্ব্বত্রেতেই ব্রহ্মই দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থেকে।**—গুরূপদেশ মত যে অকৈতব ভাবে সাধনা করে, সাধনার উদ্দেশ্য কোন ফলপ্রাপ্তি নহে, কেবল তাঁহাকে প্রাপ্তি এইরূপ মনে ধারণা করিয়া ভজনা করে, সে জগতের অন্য সব কথা ভুলিয়া যায়, তাঁহাকে ভিন্ন তাহার আর কিছুই মনে থাকে না—এই ভাবে ভজনা করিতে করিতে সে উত্তম পুরুষকে দেখিতে পায়, তখন সব বন্ধন তাহার মিটিয়া যায়, তখন সে সর্ব্ববিদ্ হয়। কারণ সকল বস্তুতেই তাঁহাকে দেখে। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহাকে যে জানিল সেও ব্রহ্মরূপই হইয়া গেল—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি," সর্ব্বত্রে ব্রহ্মদৃষ্টি না হইলে, সর্ব্বের সহিত নিজেকে না মিলাইতে পারিলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় না। তাই ব্রহ্মবিদ্ ব্যতীত কেহ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারেন। চিত্ত একান্ত হইলে যখন তাহাতে অন্য কোন বৃত্তির উদয় নাই তখনই সর্ব্বগত বাসুদেবের ভজনা হয়। সর্ব্বভাবে ভজন করিতে করিতে "সর্ব্ব" অর্থাৎ নামরূপ মিটিয়া যায় তখন দ্বিতীয়ের কোন ভাণ থাকে না, এমন কি জ্ঞাতৃ-ভাব পর্য্যন্ত থাকে না। প্রথমতঃ সর্ব্বত্রই তিনি নিজেকে

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

দেখিতে পান, পরে সর্ব্ব বলিয়াও কিছু থাকে না, সর্ব্বের পৃথক অনুভবও মিটিয়া গিয়া—'একমেবাদ্বিতীয়ং" মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সে ভাব বুঝিবার জন্যও দ্বিতীয় কেহ থাকে না। ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থা অল্প অল্প উদয় হইতে থাকিলে একটা নেশার মত ভাব হয়, তাহাতে প্রথম প্রথম সব বস্তুই মনে পড়ে, কিন্তু কোনও বস্তুর প্রতি মন জমে না, ক্রমে আর কোন বস্তুই মনে পড়ে না, তখন সব হইতে মন সংহৃত হইয়া মনের মধ্যেই মন জমিয়া বসে, তখন আর সঙ্কল্প বিকল্পের কোন ঢেউ উঠে না। মন যে আছে সঙ্কল্প বিকল্প না থাকায়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পরে সে ভাবও ডুবিয়া যায়, তখন এক অবিজ্ঞাত-রাজ্যের পরদা খুলিয়া যায়। সে জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল না, যে দৃশ্য পূর্ব্বে দেখা যাইত না, যে শব্দ পূর্ব্বে কখনও শোনা যায় নাই, তাহাই বোধের বিষয় হয়। পরে সে অলৌকিক বোধও আর থাকে না। তখন সব বোধ একের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যায়, যেমন সব নদী সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্রই হইয়া যায়, তাহাদের আর পৃথক নাম-রূপ থাকে না, তদ্রূপ উহাই গুণাতীত ব্রহ্মভাব,—"রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহম্" ভগবানের সেই যে রূপ তাহা কোন আকৃতি নহে, তাহাই অরূপের রূপ, মন যাহাকে দর্শন করিলে পরম তৃপ্তিলাভ করে, যাহাতে সমস্ত শোক-তাপ দূর করে। তাই ভগবানের কোন মায়িক রূপ দর্শনই সাধনার শেষ ফল নহে। তাঁহার স্বরূপে নিত্যস্থিতি ও সেই স্বরূপে নিজেকে ডুবাইয়া দেওয়াই, ভক্তিভাবের পরাকাষ্ঠা, এবং সেই ভাবই নিজবোধরূপ, জ্ঞানস্বরূপ তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারাই ভগবদ্ভজনার সর্ব্বোত্তম ফল। এই স্থিতির নামই ক্রিয়ার পর-অবস্থা। তাঁহার অলৌকিক শক্তিই কার্য্যরূপে এই দৃশ্যজগৎ ভাসিত হইতেছে, মন এই প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করে ও ভোগ করে। কিন্তু সমস্ত দৃশ্যের মূলে যে একটি বিন্দু রহিয়াছে, সেই বিন্দু বা কেন্দ্রমূলে ফিরিয়া যাওয়াই কার্য্যজগতের অতীত বা পর-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। সেখানে আর নানাত্ব নাই। কল্পনার বহু-মুখে প্রকাশই বাহ্য জগৎ মনের স্বরূপ চ্যুতি, সেই কল্পনার মূল মন স্বকেন্দ্রে ফিরিয়া গেলে তাহার বহুমুখী প্রকাশের অভাব হয়। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান বা যোগ। এই যোগাভ্যাস সকলেরই কর্ত্তব্য, যোগাভ্যাস ব্যতীত জ্ঞান ভক্তি কিছুই লাভ হয় না। যোগাভ্যাস আত্মদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায়। অন্য কোন বলই যোগবলের তুল্য নহে। যোগবল-বিহীন ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়জয়ে অসমর্থ হইয়া বিষয়ে নিমগ্ন হয় ॥ ১৯

অন্বয়। অনঘ ভারত! (হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন) ইতি (এই প্রকারে) গুহ্যতমম্ (পরম গুহ্য) ইদং শাস্ত্রং (এই শাস্ত্র) ময়া উক্তং (মৎকর্ত্তৃক কথিত হইল), এতদ্ বুদ্ধ্বা (ইহা জানিয়া) [লোকে] বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ চ স্যাৎ (ও কৃতার্থ হইয়া থাকে) ॥ ২০

শ্রীধর। অধ্যায়ার্থম্ উপসংহরতি—ইতীতি। ইতি অনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমম্—অতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তম্। ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকম্ অধ্যায়মাত্রং। হে অনঘ—ব্যসনশূন্য! অত এতৎ মদুক্তং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্—সম্যগ্‌জ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ। যোঽপি কোঽপি। হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোঽসি ইতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০

সংসারশাখিনং ছিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। [অধ্যায়ার্থের উপসংহার করিতেছেন]—ইতি অর্থাৎ এই সংক্ষেপ প্রকারে গুহ্যতম অর্থাৎ অতিরহস্যপূর্ণ সম্পূর্ণ শাস্ত্রই আমি বলিয়াছি। কিন্তু এই বিংশতি শ্লোকযুক্ত অধ্যায়মাত্র নহে, [ইহাতেই শাস্ত্রের সম্যক রহস্য বলা হইল]। হে অনঘ অর্থাৎ ব্যসনশূন্য এই মদুক্ত শাস্ত্র বুঝিয়া যে কোন ব্যক্তি সম্যগ্‌জ্ঞানী হইতে পারিবে এবং কৃতকৃত্য হইবে, সুতরাং হে ভারত, তুমিও যে কৃতকৃত্য হইবে, সে বিষয়ে আর অধিক কি বলিব ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ২০

বিভু ভগবান সংসাররূপ বৃক্ষ ছেদ করিয়া পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশাধ্যায়ে স্পষ্টরূপে পরম পদ বিষয়ে উপদেশ দিলেন ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা - এই অত্যন্ত গুপ্ত যে শাস্ত্র তাহা বলিলাম আমি ইহা স্থির করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে বুদ্ধিমান হও (ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে না থাকে সে বুদ্ধিমান হয় না) ও কৃতকৃত্য হও অর্থাৎ ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক।—এই অধ্যায়টি অত্যন্ত রহস্যময়। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"সমগ্র গীতা-শাস্ত্রের যাহা অর্থ, তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সমগ্র বেদের অর্থ যাহা, তাহাও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—"যস্তং বেদ স বেদবিৎ" "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ"—ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সকলের মধ্যেই এই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন—ইঁহাকে জানিলে যে কোন লোকই হউক সেই কৃতকৃত্য হইতে পারে। কেবল যত্ন করিয়া সাধনাভ্যাস করিতে হইবে। সাধনাভ্যাসের ফলে এই দেহেই কূটস্থ ও তন্মধ্যে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া জীবন সফল করা যায়, কিন্তু জীব এত দুর্ভাগ্য, এত নির্ব্বোধ যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া কেবল জ্বালা ও তাপ সহ্য করিতে হয়, তাহাই পুনঃ পুনঃ করিবে, কিন্তু যে কর্ম্মে সব জ্বালা মিটিয়া যায়, অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তি-রাশি নিবৃত্ত হইয়া অনন্ত শান্তি-পথের দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, সেই সাধনা একটু পরিশ্রম করিয়া করিলেই হয়, কিন্তু সে পথে কেহ যাইবে না, অথচ রোগ, শোক-দুঃখের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে। সেই বুদ্ধিমান যে ক্রিয়া করে, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই জীবন কৃতকৃত্য হয়। সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত যে পুরুষোত্তম ; তাহাই এই সাধনাদ্বারা অবগত হওয়া যায় ॥ ২০

ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ।

এই বৃক্ষাকার কলেবর, ইহার মূল উপরে অর্থাৎ মস্তকে, এবং হস্তপদাদি সমস্তই নীচের দিকে। হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রকৃতপক্ষে সব কাজ করে, কিন্তু হুকুম আসে মস্তক হইতে। যে সমস্ত কার্য্য জীবকে কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করে সে, সমস্তই গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার মধ্যেই গুণ সব পুষ্ট হয় এবং তথা হইতে প্রস্ফুটিত হইয়া তাহারা সংসার মুখে প্রধাবিত হয়। এই অবস্থায় যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহা ফলাকাঙ্ক্ষা-যুক্ত বলিয়া তাহাতে জীবের বন্ধন হয়। সুতরাং দেহের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে যদি প্রাণের স্থিতি না হয়, তাহা হইলেই বন্ধন দশা ভোগ করিতে হইবে। আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে যে মূল রহিয়াছে তাহা কর্ম্মানুবন্ধি নহে, সেই মস্তকে (সহস্রারে) প্রাণের স্থিতি হইলেই গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই অশ্বথ-রূপ (যাহা কা'ল পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ) কলেবর যে পুষ্টিলাভ করিতেছে অর্থাৎ বার বার জন্মমরণ সঙ্কুল যে দেহাদি ধারণ করিতেছে, বাসনা তাহার মূল ; এই বাসনার মূলচ্ছেদ করিতে না পারিলে বার বার জন্ম যাতায়াত নিবৃত্তি হইবার নহে। মন দিয়া ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ হয়। উহাই সংসারবৃক্ষের মূলচ্ছেদক অস্ত্র। ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাই অপুনরাবৃত্তি স্থিতি। তিনিই আদিপুরুষ, তাঁহাকে কূটস্থের পর দেখা যায়। ঐ অবস্থা হইতে নামিয়া আসিয়াই সব হইয়াছে, তখন মন অন্য বস্তুতে আসক্তির সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে তদ্রূপ হইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রকাশিত করিতেছে। ক্রিয়ার পর স্থিতি সে বড় আশ্চর্য্য অবস্থা ; সেখানে চন্দ্রের দীপ্তিও নাই, সূর্য্যেরও রশ্মি নাই, অথচ সে ধাম আপনার মহিমায় সর্ব্বদা প্রভান্বিত, **তাহাই পরমাত্মার পরম ধাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থা।** অষ্ট প্রহর এই অবস্থায় থাকিলেই ক্রিয়ার পর স্থিতিরূপ অবিনাশী পদকে পাওয়া যায়।

পরমাত্মার কিরূপে জীব-ভাব হয়, কিরূপে তিনি দেহ-মধ্যে আসেন ও বাহির হন, যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত অজ্ঞানী জীব, তাহারা উহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারে না। আত্মাই ইন্দ্রিয় ও মনে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক কিরূপে বিষয় ভোগ করিতেছেন, তাহা অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয়ই দেহস্থ ষটচক্র দিয়া বিদ্যুৎবেগে দ্বিদলপদ্মে মনঃস্থানে উপনীত হয়, পরে তখনই সহস্রদলে নীত হয়, তাহার পরে আমাদের বিষয়ের অনুভব হয়, কিন্তু সেই অনুভব হইতে স্বল্পক্ষণও বিলম্ব হয় না। যাঁহাদের ক্রিয়ার দ্বারায় আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হওয়ায় বুদ্ধি স্থির হইয়া যায়, তাঁহারাই এই সূক্ষ্ম অনুভব করিতে পারেন, যাহাদের বুদ্ধি স্থির নহে অর্থাৎ বিমূঢ়, তাহারা এ সব কিছুই ধারণা করিতে পারে না। এই স্থিরবুদ্ধি হইতেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়।

এই দিব্য দৃষ্টি তাঁহাদেরই হয়, যাঁহারা ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বারা মনকে নিরোধ করিতে পারেন। যাঁহারা অকৃতাত্মা অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মে আটকাইয়া নাই তাঁহাদের উত্তমরূপ স্থিতি দিব্য দৃষ্টি হয় না। বাহিরের সূর্য্য কিরণে যেমন জাগতিক বস্তু-সমূহ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ কূটস্থ কিরণই এই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকে প্রকাশময় করিয়া রাখিয়াছে। সেই তেজই

ব্রহ্মের রূপ, যাহা আকাশ হইতে আসিতেছে। এই আকাশের মধ্যেই পরব্যোম-স্বরূপ অণু, আবার সেই অণুর মধ্যে কত শত ব্রহ্মাণু রহিয়াছে, আবার এক একটি ব্রহ্মাণুর মধ্যে কত ব্রহ্মাণ্ড যে তাহার সীমা নাই। এই অণুর জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

১৫শ অধ্যায় ১২।১৩।১৪ শ্লোক।

আত্মা প্রাণরূপে সকল বস্তুতেই আছেন বলিয়া আমরা সকল বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি। এক একটি বস্তুর কত গুণ, এক একটি লতা পাতা উদ্ভিদের মধ্যে কত গুণ রহিয়াছে, তাহা যোগীরা আত্ম-প্রাণ মূর্দ্ধাতে স্থির করিলেই সব জানিতে পারেন—কিন্তু ইচ্ছা করিয়া এ-সব জানা ভাল নহে. তাহাতে আত্ম-সাক্ষাৎকারের বিঘ্ন ঘটে। হৃদয়ে নিঃশেষরূপে স্থিতি হইলেই প্রকৃত জ্ঞান হয়, যদি সব জানিতে চাও তো ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থির হইয়া থাক, তাহা হইলে যাহা কিছু জানিবার তাহাও জানিবে, এবং সব জানারও শেষ হইবে। সে অবস্থায় কোন ইচ্ছাই থাকে না, তবে যাহা জানিবার যোগ্য, তাহা ক্রিয়ায় পর অবস্থায় ইচ্ছা না করিলেও জানা যায়।

ক্ষর ও অক্ষর এবং উত্তম পুরুষ।

এই লোকে দুই রকমের পুরুষ আছেন,—ক্ষর ও অক্ষর। অক্ষর পুরুষ কূটস্থ এবং এই দেহ প্রকৃতি এবং দৃশ্যমান বস্তু মাত্রেই ক্ষর পুরুষ। যাঁহারা আসক্তি পূর্ব্বক এই দেহাদি দৃশ্য পদার্থই দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের নাশ হয়, আত্মজ্ঞান বা শান্তিলাভ কিছুই হয় না। যাঁহারা কূটস্থে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অষ্টপ্রহর বসিয়া আছেন, তাঁহারাই অক্ষর পুরুষের সহিত এক হইয়া অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন। এই কূটস্থ দেখিতে দেখিতে আর একটি পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হয়, তিনিই উত্তম পুরুষ; তাঁহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্মা বলে, তিনিই চামড়ার জামা পরিয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, তিনিই অব্যয় অবিনাশী, তিনিই ঈশ্বর ও কর্ত্তা এবং তিনিই জীবরূপে সর্ব্বত্র সব কার্য্যই করিতেছেন। কিন্তু এ সব অনিত্য মাত্র। তিনিই ব্রহ্মরূপে আবার কিছুই করিতেছেন না। কূটস্থের জ্ঞান হইলেই তাহা যে বিনাশশীল নয় অর্থাৎ ক্ষরের অতীত, তাহা যোগীরা বেশ বুঝিতে পারেন। তদূর্দ্ধে যিনি রহিয়াছেন তিনিই পুরুষোত্তম।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্‌বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥" কঠ উঃ

এই ব্রহ্মপদই প্রাপ্তব্য বলিয়া বেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং যে জন্য বা যাঁহার জন্য তপস্যা-সমূহ (প্রাণায়ামাদি সাধনা) অনুষ্ঠিত হয়। সাধকগণ যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির জন্য, ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মপদ সংক্ষেপে বলিতেছি যে তাহা "ওঁ"। [ওঁকারের রহস্য গীতার প্রথম ভাগে দেখুন।]

যিনি গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দৃঢ় ভাবে ও অনুরাগের সহিত সাধনা করিবেন; তিনিই উত্তম পুরুষকে এই দেহাভ্যন্তরেই দেখিতে পাইবেন, এবং ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া তাহাতেই স্থিতি লাভ করিতে পারিবেন। ইহা অতি গুপ্ত রহস্য, যাঁহারা মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে চাহেন, তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেন থাকিবার চেষ্টা করেন। ওঁ হরিঃ ওঁ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

(দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ যোগঃ)

শ্রীভগবানুবাচ।

(দৈবী সম্পদ—তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার)

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥ ১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। অভয়ং (ভয়শূন্যতা) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, অথবা আত্মজ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং (দান), দমঃ চ (দম) যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ), তপঃ (তপস্যা) আর্জ্জবং (সরলতা)॥ ১

শ্রীধর। আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্তং, তত্র ক এতৎ তত্ত্বং বুধ্যতে, কো বা ন্ বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারিণঃ অনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্য আরম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে অধিকারি জিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ—

"ভারো যো যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগালোড়িতো যদা।
তদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণম্॥" ইতি।

তত্র অধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবী সম্পদম্ আহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং—ভয়াভাবঃ। সত্ত্বস্য—চিত্তস্য, সংশুদ্ধিঃ—সুপ্রসন্নতা। জ্ঞানযোগে—আত্মজ্ঞানোপায়ে, ব্যবস্থিতিঃ—পরিনিষ্ঠা। দানং—স্বভোজ্যস্য অন্নাদেঃ যথোচিতসংবিভাগঃ। দমঃ—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ। যজ্ঞঃ—যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ। স্বাধ্যায়ঃ—ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ জপযজ্ঞো বা। তপঃ—উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি। আর্জ্জবম্—অবক্রতা॥ ১

বঙ্গানুবাদ। "আসুরী সম্পৎ ত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পৎকে আশ্রয়কারী ব্যক্তিরা যে মুক্ত হন, ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য ষোড়শ অধ্যায়ে তাহার বিচার করা হইতেছে।"

[পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তে "হে ভারত! ইহা জানিয়া লোকে জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে"—ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এ তত্ত্ব কে বা বুঝিতে পারে এবং কে পারে না এইজন্য তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ও অনধিকারীর নির্ণয়ার্থ এই ষোড়শাধ্যায়ের আরম্ভ। কার্য্যার্থ নিরূপিত হইলেই তাহার অধিকারী বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়। তাই কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—"ভার যে বহন করিবে

সেই ভারের বিষয় পূর্ব্বে যদি আলোড়িত হয় তবেই কোন ব্যক্তি ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায়" ইতি। তন্মধ্যে অধিকারি-বিশেষণরূপ দৈবীসম্পদ তিনটি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন]—অভয় শব্দে—ভয়াভাব। সত্ত্ব শব্দে—চিত্ত, সংশুদ্ধি—সুপ্রসন্নতা। জ্ঞানযোগে ব্যবস্থিতি—আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা। দান—স্বভোজ্য অন্নাদির যথোচিত সংবিভাগ। দমং—বাহেন্দ্রিয় সংযম যজ্ঞ—যথাধিকার দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ। স্বাধ্যায়—ব্রহ্মযজ্ঞাদি বা জপযজ্ঞ। তপঃ—শারীরাদি তপস্যা (পরের অধ্যায়ে বলিবেন)। আর্জ্জব—অবক্রতা (সরলতা) ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইতেছেঃ—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে মরবার যে ভয় তাহা ক্রমশঃ যায়—সর্ব্বদাই সুষুম্নাতে থেকে সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারায় সব দেখিতে পায়; জ্ঞান—যোনিমুদ্রাতে থাকা; ধারণা ধ্যান সমাধি করা, ক'রে বিশেষরূপে স্থিতি; ক্রিয়াদান, ইন্দ্রিয়াদির দমন, ও ক্রিয়া করা, আর বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে স্থির থাকা, কূটস্থে থাকা, সরল হওয়া, কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকিলেই সরল কখনই হয় না ও হিংসারহিতও হ'তে পারে না, যাহা হওয়া উচিৎ—আপনাকে আপনি না দেখিলে কেমন করিয়া অন্যকে দেখিবে, যে আপনাকে দেখিবে সে সকলকে সমান দেখিবে। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিলে, সব এক হওয়ার নিমিত্তে আপনাতেই আপনি তুষ্ট, তাহা ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিরা দেখিতেছেন।—পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে জীবগণের প্রকৃতি তিন প্রকার—(১) দৈবী, (২) আসুরী ও (৩) রাক্ষসী। আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি—বন্ধনের কারণ এবং দৈবী প্রকৃতিই মোক্ষলাভের অনুকূল। পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে ভগবান বলিয়াছেন—"এই গুহ্যতম জ্ঞান জানিয়া কৃতকৃত্য হও"—এখন এই তত্ত্ব জানিবার প্রকৃত অধিকারী কাহারা, জানিতে পারিলে সেই অধিকার লাভের জন্য মুমুক্ষু জীব প্রস্তুত হইতে পারে, তাই সেই অধিকারের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইতেছে। যাহারা মুমুক্ষু তাঁহাদের প্রয়োজন এক প্রকারের, যাহারা সংসারী তাহাদের প্রয়োজন অন্য প্রকারের। মুমুক্ষুর যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই দৈবী সম্পৎ, সংসারী অর্থাৎ বিষয়াসক্তের যাহা প্রয়োজনীয়—তাহাই আসুরী সম্পৎ। এখন অসুরের দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ, তাই আসুরী সম্পদের জন্যই জীব লালায়িত, দৈবী সম্পদের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। যদ্দারা জীবকে মুক্তিমার্গের অধিকারী করে তাহাই দৈবী সম্পৎ, এবং যাহা লৌকিক জ্ঞান—যদ্দারা জীবের কামোপভোগ পরিবর্দ্ধিত হয়—তাহাই আসুরী সম্পৎ। আসুরী সম্পদের দ্বারা জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম-যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হয় না, দৈবী সম্পদের দ্বারা জীবের মোক্ষমার্গানুকূল প্রবৃত্তির উদয় হইয়া তাহাকে শান্তির পথে, সত্যের পথে লইয়া যায়। তাই এখানে দৈবী-সম্পদের অধিকারী যাহারা—তাহাদের কি লক্ষণ এবং কি গুণ থাকে, সেই সকল কথা ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।

(১) অভয়—ভয়শূন্যতা। আমা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ আছে—এই দ্বিতীয়ের অভিনিবেশ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অভয় লাভ হয় না।

ভগবানের পরম পদই প্রকৃত অভয় পদ। যাহা লাভ করিলে আর এই চিত্ত সংসারমুখী হইতে পারে না। তাই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন—"অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ"—সর্ব্বপ্রাণী আমা হইতে যেন অভয় লাভ করে, এবং আমিও সর্ব্বপ্রাণী হইতে যেন অভয় লাভ করি। কাহাকেও পর না ভাবা। তাহা হইলেই আর কাহারও উপর হিংসা হয় না। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত না হইলে বৈরত্যাগ হয় না। পরের উন্নতি দেখিয়া নিজেরও তদ্রূপ উন্নতি হউক এইরূপ বাঞ্ছা করায় আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইহাতে পরের মধ্যে নিজেকে দেখা হইল না, পর পরই হইয়া রহিল। পরকে আপনার করিতে হইলে বাসনাত্যাগের প্রয়োজন, বাসনাত্যাগ করিতে হইলেই মনোনাশের প্রয়োজন। সর্ব্বাপেক্ষা জীবের বড় ভয় হইতেছে মৃত্যু-ভয়, মৃত্যু-ভয়ে জীব সদাই সন্ত্রস্ত। এই ভয় যায় কি প্রকারে এবং অভয় পরমপদই বা প্রাপ্তি হয় কি প্রকারে? যাঁহারা শ্রদ্ধালু হইয়া ক্রিয়া করেন, এবং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা অল্প অল্প করিয়া অনুভব করিতে পারেন—তাঁহাদেরই হৃদ্‌রোগ নষ্ট হয়, মরণের ভয় থাকে না, কারণ তাঁহারা প্রতিদিনই মৃত্যুর স্বাদ (দেহ হইতে পৃথক্ হওয়া) কিছু কিছু পাইতেছেন, এবং তাহা যে কত আনন্দের অবস্থা ইহা জানিতে পারায় আর মৃত্যুর জন্য তাঁহাদের কোন আশঙ্কা বা ব্যাকুলতা থাকে না। মনের নিঃশঙ্ক অবস্থা—আমার পীড়া হইবে, কি সর্প-ব্যাঘ্র আক্রমণ করিবে, কে আমাকে দেখিবে,—এই সব উদ্বেগ কিছুই থাকে না।

(২) **সত্ত্বসংশুদ্ধি**—অন্তঃকরণের অশুদ্ধিভাবের (যেমন প্রবঞ্চনা, মিথ্যাব্যবহার ইত্যাদি) পরিবর্জ্জন। ভিতর বাহির সমান। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নহে, তাহারা কখনও ভয়শূন্য হইতে পারে না। বুদ্ধি নির্ম্মল হয় কিরূপে? যাঁহারা প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করেন, তাঁহাদের নাড়ী-প্রবাহ বিশুদ্ধ হয়, নাড়ী বিশুদ্ধ হইলে তাহার স্পন্দনও বিশুদ্ধ হয়। স্পন্দন বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তিও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা সর্ব্বদা সুষুম্নাতে থাকেন, তাঁহাদের চিত্ত-স্পন্দন বিশুদ্ধ হইবেই। সাধারণতঃ ইড়া-পিঙ্গলার প্রবাহে পড়িয়াই জীবের সংসার বাসনার উদয় হয়। এই প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যখন সুষুম্নার পথ খুলিয়া যায়, তখনই জীবের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় সুতরাং বাসনাশুদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) **জ্ঞান এবং যোগে একান্ত নিষ্ঠা**—শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে তৎপরতা বা একাগ্রতাই হইল প্রধান দৈবী সম্পৎ। কারণ জ্ঞান ও যোগ ব্যতীত সত্ত্বসংশুদ্ধি হইবার উপায় নাই। আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞানই জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা পুস্তক পড়িয়া হইবার নহে। আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভব হয় যোনিমুদ্রায়। কূটস্থ মণ্ডল হইতে পুরুষোত্তম দর্শন পর্য্যন্ত সমস্তই হয়, যিনি যোনিমুদ্রায় থাকিতে পারেন। এই যোনিমুদ্রাই প্রধান পীঠ স্থান। এইখানে অলৌকিক অধ্যাত্মজ্ঞান এবং বিশ্বরূপাদি সাধকের দর্শন হইয়া থাকে, এত বড় দৈবী সম্পৎ আর কিছুই নয়। আর যোগ—ক্রিয়ার পর-অবস্থার স্থিতি, অভ্যাসপটুতা দ্বারা ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে স্থিতিলাভ করিতে পারা। এই যোগাবস্থা জ্ঞানাবস্থা প্রাপ্তির সাহায্য করে এবং জ্ঞানাবস্থা যোগপ্রাপ্তির সহায়তা করে।

(৪) **দান**—নিজদ্রব্যে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহা পরার্থে উৎসৃষ্ট করাই দান। নিজ সামর্থ্যানুযায়ী অন্নাদির সংবিভাগ দ্বারাই ত্যাগ শিক্ষা হয়। যতক্ষণ পরার্থে নিজ চিত্ত, শক্তি,

সামর্থ্য ব্যয় করিতে না পারি ততক্ষণ চিত্ত স্বার্থভাবে কলুষিত থাকে। এইরূপ কলুষিতচিত্তে জ্ঞানলাভ বা যোগে নিষ্ঠা কাহারও হইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্যাগ বা দান জীবকে সৎপথ—ভগবানের পথ দেখাইয়া দেওয়া। ক্রিয়াভ্যাসই ভগবল্লাভের প্রশস্ত উপায়, এইজন্য ক্রিয়া দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

(৫) **দম**—বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ। যে নিজের ইন্দ্রিয় দমনে অশক্ত, সে তো সমস্ত শক্তি ও অর্থকে তাহার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ বহ্নির ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে, সে আর অপরের দুঃখ অভাবের কথা ভাবিবে কিরূপে ? এইজন্য অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কখনও দান করিতে পারে না। যাঁহারা অভয় লাভ করিতে চান, তাঁহারা এই জন্যই ইন্দ্রিয়-দমনে মনোযোগ করিবেন।

(৬) **যজ্ঞ**—বেদবিহিত দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ—প্রভৃতি পঞ্চ মহাযজ্ঞ। মনুষ্য জন্মিবা মাত্রই পঞ্চঋণে ঋণী থাকে। এই সকল ঋণমুক্তি এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা হইয়া থাকে। তাহা গীতার অন্যান্য অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে। এখানে আবার কিছু উল্লেখ করিতেছি। সাধকেরা, বিশেষতঃ দ্বিজাতিরা সন্ধ্যা-বন্দনাদির পরই "দেবযজ্ঞ" করিবেন। দেবযজ্ঞ অর্থাৎ নিজ নিজ ইষ্ট দেবতা ও গৃহদেবতার পূজা। প্রথমেই পঞ্চ দেবতার পূজা—

"আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যমন্তে চ কুলদেবতাং॥"

গণেশ, সূর্য্য, নারায়ণ, রুদ্র, দেবী ও শেষে কুল-দেবতার পূজা যথাক্রমে করিতে হইবে।

পরে ইষ্ট ও গৃহ-দেবতার পূজা করিতে হইবে—

"অন্নেন সুমনোভিশ্চ গন্ধৈর্ধূপৈঃ প্রদীপকৈঃ।
গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাং॥"

গৃহস্থ ব্যক্তি নিজগৃহে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্ন দ্বারা গৃহদেবতার পূজা করিবেন।

দেবপূজার পর—হোম। নিত্য হোমের অনুষ্ঠান এখন আমাদের দেশ হইতে প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। কিন্তু নিত্য হোমের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। ইহার উপকারিতা লোকে এখন আর বুঝিতে পারে না। এই নিত্য হোমের অনুষ্ঠান কিছু আড়ম্বরময় বা জটিল নহে। গৃহীর যাহা স্বীয় খাদ্য—তাহাই দিয়া আহুতির কার্য্য হইতে পারে।

বৈশ্বদেব—"যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ"—যে দেবতা বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন—সেই বিশ্বদেব বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে। শুধু "ওঁ বৈশ্বদেবায় নমঃ"—বলিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে বৈশ্বদেবের পূজা ও আহুতি দিবে।—এই সকলই "দেবযজ্ঞের" মধ্যে।

শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা 'ঋষিযজ্ঞ' সম্পাদিত হয়। তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা 'পিতৃযজ্ঞ' সম্পন্ন করিতে হয়।

বলি—ইহা দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে অন্ন দিবার ব্যবস্থা আছে—ইহাই ভূতযজ্ঞ। "দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি" হইতে "প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ"।

"পিপীলিকা-কীট পতঙ্গকাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্তু॥"

দেবতা, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ এবং বন্ধুহীন ও পতিত বা পাপী আমার প্রদত্ত এই অন্নগ্রহণ করিয়া তৃপ্ত এবং মুদিত হউক।

অতিথি পূজা—নৃযজ্ঞ। "প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ॥"

প্রিয় হউক, দ্বেষ্য হউক, মূর্খ হউক বা পণ্ডিত হউক—বৈশ্বদেব ক্রিয়ার অবসানে যে অতিথি প্রাপ্ত হইবে, সে সাক্ষাৎ স্বর্গপ্রদ।

"হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী।" অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বলিয়াই মান্য করিবে। অতিথির নাম, কুল, দেশ ও বিদ্যার পরিচয় লওয়া শাস্ত্রে নিষেধ আছে। যদিও—"অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা সর্ব্বপূজোত্তমোত্তমা" তথাপি "বহিঃপূজা বিধাতব্যা যাবজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে।" —এইজন্য বাহ্য কর্ম্মাদির কথা এখানে বিস্তৃত ভাবে বলা হইল। কিন্তু যোগীদের আসল যজ্ঞ হইল ক্রিয়ার অভ্যাস। যোগ-যজ্ঞই সকল যজ্ঞের সার। প্রাণেতে অপান এবং অপানে প্রাণ-বায়ুর হোমই প্রকৃত হোম। "ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে।"

(৭) স্বাধ্যায়—বেদাদির অধ্যয়ন, বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনা। ইহা বাহ্যভাব। অধি+ই+অনট্‌=অধ্যয়ন। ই ধাতু অর্থে গমন, অধি অর্থে উপরে। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন প্রাণাপানের গতি উর্দ্ধে বা মস্তকে গিয়া স্থির হয়। "ইকারং পরমেশানি স্বয়ং কুণ্ডলী মূর্ত্তিমান্" ইহাই পরমৈশ্বর্য্য; অধি মানে ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্যও হয়। যখন কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে উত্থিত হইয়া তথায় স্থিতিলাভ করেন। সুতরাং পূজনীয় লাহিড়ী মহাশয় যে বলিয়াছেন "স্বাধ্যায়" অর্থে – বুদ্ধির পর পরা-বুদ্ধিতে স্থির থাকা, তাহা "স্বাধ্যায়ে"র ধাতুঘটিত অর্থ হইতে বেশ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

(৮) তপঃ—শারীর ক্লেশ, ইহার পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

"ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
উর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥"

ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বোত্তম তপস্যা। ব্রহ্মে বিচরণ অর্থাৎ তাঁহাতে স্থিতিই আসল ব্রহ্মচর্য্য। কেবল মাত্র শুক্র ধারণেই উর্দ্ধরেতা হওয়া যায় না। যাহার রেতঃ উর্দ্ধগত হইয়াছে। কঠোর তপোনুষ্ঠান ব্যতীত কেহই উর্দ্ধরেতা হইতে পারে না। "রেতঃ" শব্দ "রী" ধাতু হইতে, যাহা ক্ষরিত হয়। অর্থাৎ যাহা একস্থানে থাকে না, ক্রমাগতঃই বহির্গত হইয়া যায়। আমাদের "চিত্ত"ই সেই রেতঃ, এই চিত্ত যখন উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া সেইখানেই স্থিত হয়,—এমনটি যাহার হয়, তাহাকেই "উর্দ্ধরেতা" বলে;—উর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ"। এইজন্যই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তপের অর্থ করা হইয়াছে—"কূটস্থে থাকা"।

(৯) আর্জ্জব—সরলতা। যাহার বাসনা অধিক সে সরল হইতে পারে না। লোভাতুর চিত্ত কি কখনও সরল হইতে পারে? এইজন্য যতক্ষণ ইচ্ছা-কামনা জাগিয়া আছে, ততক্ষণ বক্রতা থাকিবেই। আপনাতে আপনি তুষ্ট যে, অন্যের অদৃষ্ট দেখিয়া তাহার দুঃখ হয় না, বরং অন্যের সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া মনে হয়। মনের স্বচ্ছতা থাকে—এইজন্য লাভালাভের প্রতি

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২

দৃষ্টি থাকে না সুতরাং কাহাকেও হিংসা করিতে হয় না, এবং সেই ভাব গোপন রাখিবার জন্য ভাণ করিতে হয় না। যাহা বুদ্ধিতে আসে তাহা বলিয়া ফেলে, সুতরাং অন্যকেও ধোঁকা খাইতে হয় না॥ ১

অন্বয়। অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ (অহিংসা, সত্য, অক্রোধ) ত্যাগঃ শান্তিঃ (ত্যাগ ও শান্তি) অপৈশুনং (পরনিন্দাত্যাগ, অখলতা) ভূতেষু দয়া (সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া), অলোলুপ্ত্বং (নির্লোভ ভাব) মার্দ্দবং (মৃদুতা), হ্রীঃ (কুকর্ম্মে লজ্জা) অচাপলম্ (অচাঞ্চল্য)॥ ২

শ্রীধর। কিঞ্চ—অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্। সত্যং—যথার্থভাষণম্। অক্রোধঃ—তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্ষোভানুৎপত্তিঃ। ত্যাগঃ—ঔদার্য্যম্। শান্তিঃ—চিত্তোপরতিঃ। অপৈশুনং—পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনম্, তদ্বর্জ্জনম্ অপৈশুনং। ভূতেষু দয়া—দীনেষু দয়া। অলোলুপ্ত্বং—লোভাভাবঃ (অবর্ণলোপঃ তু আর্ষঃ)। মার্দ্দবং—মৃদুত্বং, অক্রূরতা। হ্রীঃ—অকার্য্য-প্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা। অচাপলং—ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম্॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—অহিংসা—পরপীড়াবর্জ্জন। সত্য—যাহা ঠিক তদনুরূপভাষণ (যাহা যথার্থ তাহাই অসঙ্কোচে বলা)। অক্রোধ—কাহারও কর্ত্তৃক তাড়িত হইলেও ক্রোধের অনুৎপত্তি। ত্যাগ—ঔদার্য্য (যেমন দানে ক্লেশ বোধ না করা)। শান্তি—চিত্তের উপরতি। অপৈশুন—পরোক্ষে পরদোষ প্রকাশকে "পৈশুন" বলে, তাহার বর্জ্জনকে অপৈশুন বলে। ভূতে দয়া—দীনের প্রতি দয়া। অলোলুপ্ত্ব—লোভাভাব। অলোলুপত্ব —এইপ্রকার শব্দের "প"এর "অ" কার লোপ হইয়া অলোলুপ্ত পদ হইয়াছে, ইহা আর্ষপ্রয়োগ। মার্দ্দব—মৃদুতা, অক্রূরতা। হ্রী—অকার্য্য করণে লোকলজ্জা। অচাপল্য—ব্যর্থ ক্রিয়া না করা॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—হিংসা না থাকিলে ইচ্ছা থাকে না—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় না থাকিলে ইচ্ছা নাশ হয় না যত বস্তু দেখিতেছ সবই মিথ্যা, কারণ (যে) সবই দেখিতেছ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—অতএব সত্য সেই ব্রহ্ম; ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনি আছি এরূপ বোধ হয় না, যখন আপনিই নেই তখন অন্যও নেই, ক্রোধ কি প্রকারে কাহার উপরে থাকিবে? ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না, কাজে কাজেই ইচ্ছাই নাই তার ফল কি? ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে আমিও কিছু নেই আমারও কিছু নেই—আমিই নেই তার খলতা করবো কার সঙ্গে—আমি মজাটা মারবো ও অন্যকে মজাটা মারতে দিই ইহারই নাম দয়া; ব্রহ্মব্যতীত অন্য বস্তু নেই লোভ কিসে করবো—সকল লোকের কথার উপর টপ্পা (টেক্কা)—ভিজে ভারি কথা অর্থাৎ কাজের কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয় না, যাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হয়—তখন চঞ্চলত্ব থাকে না।—(১০) অহিংসা—প্রাণীদিগকে

পীড়িত না করা। হিংসা বহির্মুখ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পরপীড়ন না করিলে জীবিকা চলে না, এই জন্য জীব হিংসাপরায়ণ। যতদিন নিজের সুখেচ্ছা থাকিবে, ততদিন সেই ইচ্ছা পূরণার্থ অন্যকে পীড়ন না করিয়া উপায় নাই; এইজন্য যাঁহাদের বাসনা সংযত হইয়াছে, নিজের সুখাভিলাষের দিকে দৃষ্টি নাই; তিনিই হিংসাশূন্য হইতে পারেন। যতক্ষণ ইচ্ছার নাশ না হয়, ততক্ষণ এ অবস্থা আসে না। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই সকল ইচ্ছার সম্যক্ নাশ হয়। পরাবস্থায় যাঁহারা থাকেন সেই সকল মহাপুরুষই আপনাতে আপনি শুদ্ধ। তাঁহাদের চিত্তমধ্যে হিংসার ঢেউ খেলে না, তাই তাঁহাদের হৃদয় বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ। কোন হিংস্রক জন্তুও তাঁহাদিগকে হিংসা করে না, বরং তাঁহাদের নিকটে আসিলে তাহাদের স্বীয় হিংস্র-স্বভাব পর্য্যন্ত শোধিত হইয়া যায়।

(১১) সত্য—যে বস্তু যাহা—তাহাকে সেই ভাবে ঠিক বলাই সত্য। রাখিয়া ঢাকিয়া বলা বা যাহা নয় তাহাই বলা ইহার বিপরীত। মিথ্যা রোচক হইলেও বলা উচিত নহে, সত্য অপ্রিয় হইলে বা পরের পীড়াদায়ক হইলে সে সত্যও মিথ্যার সমান। ইহা হইল বাহিরের কথা। প্রকৃত কিন্তু সত্য অন্য বস্তু। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা"—ব্রহ্মই সত্য আর এ সমস্ত দৃশ্য পদার্থই মিথ্যা। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এই দৃশ্য পদার্থের অস্তিত্বই অনুভব হয় না, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সত্য বা ব্রহ্ম সত্তার অভাব হয় না।

(১২) অক্রোধ—অন্য কর্ত্তৃক পীড়িত ও অপমানিত হইলেও মনে কোন অন্য ভাব না হওয়া; তখনও মনের শমতা নষ্ট হইতে না দেওয়া। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনি আছি কি নাই, অন্য কেহ আছে বা নাই এ সব বোধই থাকে না, সুতরাং কেহ আমাকে পীড়ন করিল এ কথা মনে উদয়ই হয় না, তবে ক্রোধ হইবে কাহার উপর? আমি বা অপর কেহ থাকিলে তবে তো ক্রোধ হইবে!

(১৩) ত্যাগ—সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করাই ত্যাগ। এই ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। সাংসারিক কোন ভোগের প্রতিই আসক্তি না থাকা। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই এই ত্যাগ পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে, কোন বস্তুরই তখন স্পৃহা থাকে না।

(১৪) শান্তি —অন্তঃকরণের উপশম বা চিত্তের উপরতি। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এবং পরাবস্থার পরাবস্থাতেও এই শান্তি উপলব্ধি করা যায়। মন সঙ্কল্পশূন্য, সুতরাং মন নাই, চিত্তের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থাই শান্তির অবস্থা।

(১৫) অপৈশুন—পরের নিকট অপরের ছিদ্র প্রকাশ না করা, কাহারও দোষকীর্ত্তন না করা। খলস্বভাবের লোকেরাই পরের দোষকীর্ত্তনে শতমুখ হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায়—আমিও থাকে না, আমারও থাকে না, সুতরাং আমি নাই অন্য কেহও নাই, খলতা কে কাহার উপর করিবে?

(১৬) ভূতে দয়া—দুঃখিত বা ব্যথিত প্রাণীর প্রতি কৃপা বা সহানুভূতি। আমি সাধন করিয়া শান্তি পাইতেছি, আনন্দ পাইতেছি, এই তাপিত জীবও যাহাতে সেই শান্তি উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য যে চেষ্টা। লোকে যাহাতে ক্রিয়া করে ও ক্রিয়া পায় তাহাই করা।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

বাহিরের অভাব অর্থাদির দ্বারা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনে যে দিবারাত্র অশান্তির চিতা জ্বলিতেছে, তাহাই নির্ব্বাপিত করিবার উপায় ধরাইয়া দেওয়াই প্রকৃত "দয়া"।

(১৭) **অলোলুপতা**—বিষয় নিকটে আসিলেও ইন্দ্রিয়সমূহের অবিকৃতি। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কোন বস্তুর প্রতিই লোভ থাকে না, কারণ তিনি জানেন এক ব্রহ্মপদার্থ ব্যতীত আর কোন বস্তুই নাই।

(১৮) **মার্দ্দব**—মৃদুতা, অক্রূরতা। দাম্ভিকতার অভাব, পরের প্রতি ব্যবহারে কোমল ভাব রক্ষা করা। পদে পদে চটিয়া না উঠা বা সামান্য কারণেই ব্যতিব্যস্ত না হওয়া।

(১৯) **লজ্জা**—অকার্য্যে অপ্রবৃত্তি। সকলকে টপ্‌কাইয়া বড় হওয়ার অনিচ্ছা। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।" এই লজ্জা না থাকিলে মানুষ পশু অপেক্ষা হীন হইয়া যায়, কোন কুকার্য্য করিতেই তাহার চিত্তে বাধা আসে না। আমি যাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল, তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর না হইয়া অকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ মুখ লইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইব ? এইরূপ যে মনোবৃত্তি তাহাই "হ্রী"। এমন সুকুমার বৃত্তি আর নাই। লজ্জা যাহার আছে, শ্রী, সৌন্দর্য্য তাহার চিরদিন থাকে, তাহার শোভায় সকলেই মুগ্ধ হয়।

(২০) **অচাপল্য**—বিনা প্রয়োজনে বাক্, পাণি বা পাদ প্রভৃতির ব্যাপার না থাকাই অচাপল্য। এই চাপল্যের আর অন্ত নাই। মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সর্ব্বদাই ব্যাপার যুক্ত। কি যে করিতেছে, কেন যে করিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। অথচ এই চাঞ্চল্যের দাপটে সমস্ত নরনারীই অস্থির—ঠিক পাগলের মত। যে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে মনোযোগ সহকারে ক্রিয়া করে তাহার এই চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া যায়, শেষে এত হ্রাস হয় যে তাহার চিত্ত ধ্যানানুশীলনের যোগ্যতা লাভ করে। ধ্যাননিষ্ঠ চিত্তেই সমাধি আসন্ন হয়॥ ২

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্ (তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ) অদ্রোহঃ (অদ্রোহ) নাতিমানিতা (অনভিমান) [এই গুণগুলি] দৈবীসম্পদম্ অভিজাতস্য (দৈবীসম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে)॥ ৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—তেজ ইতি। তেজঃ—প্রাগল্‌ভ্যম্। ক্ষমা—পরিভবাদিষু উৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ। ধৃতিঃ—দুঃখাদিভিঃ অবসীদতঃ চিত্তস্য স্থিরীকরণং। শৌচং—বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধিঃ। অদ্রোহঃ—জিঘাংসারাহিত্যম্। অতিমানিতা—আত্মনি অতিপূজ্যত্বাভিমানঃ, তদভাবঃ নাতিমানিতা। এতানি অভয়াদীনি ষড়্‌বিংশতিপ্রকারাণি দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদম্ অভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসঃ ভবন্তি ইত্যার্থঃ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—তেজ—প্রাগল্‌ভ্য (তেজস্বিতা)। ক্ষমা—

পরাভবের উপস্থিতিতে ক্রোধ হইলেও সেই ক্রোধকে বাধা দেওয়া। ধৃতি—দুঃখাদির দ্বারা অবসাদগ্রস্ত চিত্তকে স্থিরীকরণ। শৌচ—বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি। অদ্রোহ—জিঘাংসারাহিত্য। নাতিমানিতা—আপনাতে অতি পূজ্যত্বাভিমানকে অতিমানিতা বলে, তাহার অভাব। অভয় প্রভৃতি এই ষড়্‌বিংশতিপ্রকার দৈবীসম্পদ অভিজাত ব্যক্তির হইয়া থাকে। দেবযোগ্য সাত্ত্বিকী-সম্পদ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, এবং যাহাদের জীবন ভাবীকল্যাণময় সেই সকল পুরুষের এই সকল দৈবীসম্পদ জন্মিয়া থাকে ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তেজ অর্থাৎ মনের তেজ, যাহার দ্বারায় সমুদয় দেখিতে পায় ও করিতে পায়—কোন বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া ক্ষমা করে—আপনা আপনি স্থির থাকে, সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাকে—পরের অনিষ্ট জেনে করে না—অতিশয় মানের অভিলাষ থাকে না, অল্প স্বল্প থাকে যাহা আবশ্যক—ইহা সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মেতে সর্ব্বদা থাকায় সম্যক্ প্রকারে এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম দৈবীসম্পদ।—

(২১) তেজ—এ তেজ বাহ্য ত্বগ্‌গত দীপ্তি নহে এ তেজ মনের সাহস, হৃদয়ের বল ও উৎসাহ ; এই তেজ যাহার থাকে সে কখনও কাম, লোভ প্রভৃতির দ্বারা পরাভূত হয় না, সহস্র বিপদপাতেও সত্য বা ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হয় না। সাধনার দ্বারায় মনের এই তেজ এত বৃদ্ধি পায় যে তখন তাহাকে যোগবল বলা যায়, এই তেজ যাঁহার যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তিনি তদ্দারায় যাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহাই দেখিতে পান এবং যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন।

(২২) ক্ষমা—কেহ গালি দিলে বা তাড়না করিলে সামর্থ্য সত্ত্বেও যিনি তাহা সহ্য করেন, ক্রোধ হইতে দেন না, যদি বা ক্রোধ হয় তখনই মনের বেগকে প্রশমিত করিতে পারেন তাঁহার মনোবিকার বাহিরে কেহ বুঝিতেও পারে না। ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থাতে ব্যোম্‌-ভোলা হইয়া বসিয়া আছেন, কে কি তাঁহাকে বলিতেছে তাহা গ্রাহ্যও করেন না।

(২৩) ধৃতি—শঙ্কর বলিয়াছেন—"দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতিষেধের জন্য অন্তঃকরণের যে বিশেষ বৃত্তি তাহাই ধৃতি", অর্থাৎ যে বৃত্তি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়শক্তি উত্তম্ভিত হয়, অবসন্ন হইতে পারে না। ধৃতি প্রকৃত পক্ষে যোগ ধারণা, এই ধৃতি যত বর্দ্ধিত হয় ততই যোগী আপনা আপনি স্থির হইয়া যান। মন বিক্ষেপশূন্য হয় বলিয়া সুখ দুঃখ যোগীকে তখন চঞ্চল করিতে পারে না।

(২৪) শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ইহা দুই প্রকার। মৃত্তিকাদি জলাদির দ্বারা যে শৌচ তাহাই বাহ্য, মন বুদ্ধির নির্ম্মলতাই আভ্যন্তর শৌচ। এ শৌচ তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি হয়,—তখনই ব্রহ্ম ভাব, তখন আমিও নাই ও সমস্তই এক বোধ হয়। আকাশই সর্ব্বাপেক্ষা শুচি, সেই চিদাকাশে যিনি অবস্থিত তদপেক্ষা শুচি আর কে হইবে ?

(২৫) অদ্রোহ—লোকের সহিত বিরোধ না করা। জানিয়া শুনিয়া যোগী পরের অনিষ্ট করেন না, যাহাতে লোকের অনিষ্ট হয়, এরূপ কার্য্য ও চিন্তা হইতে যোগী বিরত থাকেন। যে উদাসীন তাহার সহিত কাহারও বিবাদ হয় না।

(আসুরী সম্পদ)

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪

(২৬) অনতিমানিতা—অতিমান অর্থাৎ আমি অতিশয় পূজ্য এইরূপ অভিমান না থাকা। সাধনায় খুব অনুরাগ আছে, সাধনও বেশ করিয়া থাকেন, তবুও মনের অস্বচ্ছতা নষ্ট হয় নাই; তাই মনে হয় লোকে আমাকে সাধক বলিয়া জানুক, আমার শক্তির প্রশংসা করুক ও সম্মান করুক। মনের এ ভাব থাকিলে সাধনায় প্রকৃত উন্নতি হইবে না। মন অতিশয় অভিলাষে পূর্ণ থাকে,—যাহা না থাকিলে নয়, সেই স্বল্পমাত্র অভিলাষ তাঁহার থাকে। অতি অল্পে যাঁহার সন্তোষ, তাঁহার আবার লোকের নিকট বড় হইবার জন্য ইচ্ছা থাকিবে কেন?

যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে এই সকল দৈবীসম্পদের অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের উপরোক্ত গুণ সকল স্বাভাবিক হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য দ্বারা পুণ্যময়ী বাসনা হেতু জীব উত্তরোত্তর পুণ্যবান ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৩

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্ব) দর্পঃ অভিমানঃ ক্রোধঃ চ (দর্প, অভিমান ও ক্রোধ) পারুষ্যম্ (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানং চ এব (ও অজ্ঞান) আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (আসুরী সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে]॥ ৪

শ্রীধর। আসুরীং সম্পদমাহ—দম্ভ ইতি। দম্ভঃ—ধর্ম্মধ্বজিত্বং। দর্পঃ—ধনবিদ্যাদি-নিমিত্তঃ চিত্তস্য উৎসেকঃ। অভিমানঃ—ব্যাখ্যাত এব। ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ। পারুষ্যম্—নিষ্ঠুরত্বম্। অজ্ঞানম্—অবিবেকঃ। আসুরীম্ ইতি উপলক্ষণম্। অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পৎ তাম্ অভিলক্ষ্য জাতস্য এতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ইত্যর্থঃ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [আসুরী সম্পদ বলিতেছেন]—দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব। দর্প—ধনবিদ্যাদি নিমিত্ত চিত্তের উৎসেক অর্থাৎ অভিমান। অভিমানের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে (অতি-পূজ্যত্বের অভিমান)। ক্রোধ প্রসিদ্ধ অর্থেই ব্যবহৃত অর্থাৎ যাহাকে ক্রোধ বলা যায়। পারুষ্য—নিষ্ঠুরতা। অজ্ঞান—অবিবেক। যাহারা আসুর ও রাক্ষসী সম্পৎ লক্ষ্য করিয়া জন্মিয়াছে তাহাদিগের ঐ দম্ভদর্পাদি হইয়া থাকে॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মনে মনে কুলীন বলিয়া দেমাক্ করা—জোর আছে বলিয়া বুক চাড়া দিয়া চলা—যত মান আবশ্যক তাহার অপেক্ষা জেয়াদা প্রার্থনা করা—সর্ব্বদা রেগেই থাকা—নিষ্ঠুর বচন বলা—আর আত্মাতে না থাকা অর্থাৎ ক্রিয়া না করা—ইহা সকল আসুরী সম্পদ অর্থাৎ ক্রিয়া যারা করে না তাহাদিগের এইরূপ স্বভাব আপনা আপনি হয়।—(১) দম্ভ—ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপনের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহাকে ধর্ম্মধ্বজী বলে। হাতে মালা ফিরিতেছে, কিন্তু মন অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনে মনে বিষয় চিন্তাই হইতেছে, কিন্তু নিকটে

(দৈবী ও আসুর সম্পদের ফল)

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫

লোক কেহ আসিতেছে দেখিলে অমনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানের ভাণ করা। নিজে অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিশ্বাস কিন্তু মুখে একবারে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। নিজেকে খুব বড় কুলীন বলিয়া অভিমান আছে, কিন্তু কার্য্যে মেথরের অধম। এইরূপ পরবঞ্চনাই দম্ভ।

(২) **দর্প**—ধনে, মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে আমার তুল্য কেহ নাই এইরূপ ধারণা। ধনজনের গর্ব্বে মাটিতে পা পড়ে না। চলিবার সময় সর্ব্বদা বুক চাড়া দিয়া চলে। অন্য কাহারও কথা বলিবার সময় সর্ব্বদা নাক সিটকায় এবং অন্য তাহাপেক্ষা কত ছোট আকার ইঙ্গিতে ইহাই প্রকাশ করে। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অবমাননা করিতে সঙ্কুচিত হয় না। কেহ তদপেক্ষা বেশী জানে বা বিদ্যায় জ্ঞানে বড় ইহা শুনিতেই পারে না। সবজান্তা ভাব—এই সবই দর্প।

(৩) **অভিমান**—আমি পূজ্য, সর্ব্ববিষয়ে আমি শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধারণা। কিছু অভিমান সকলেরই থাকে। কিছু অভিমান থাকা সকল সময়ে খারাপও নহে, কিন্তু অধিক অভিমান ভাল নহে। কাহারও হয়তো পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু তজ্জন্য অভিমানে আর সকলকেই তুচ্ছ বোধ করা ইহাই অভিমান, আর পাণ্ডিত্য মোটেই নাই অথবা যৎসামান্য আছে কিন্তু তাহারই অভিমানে স্ফীত হইয়া থাকাই দর্প।

(৪) **ক্রোধ**—সর্ব্বদা রাগিয়া থাকা, এতটুকু নিজের মতলবের বাহির হইলেই উত্তেজিত হওয়া। ক্রোধীকে লোকে ভয় করে ও ঘৃণা করে।

(৫) **পারুষ্য**—নিষ্ঠুর বচন বলা, লোকের মর্ম্মে আঘাত দিয়া কথা বলা। লোকের জাতি কুল বা অঙ্গহীনতাদির জন্য বিদ্রূপ করা। জীবকে অযথা কষ্ট দিবার প্রবৃত্তি।

(৬) **অজ্ঞান**—অবিবেক, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে মিথ্যা ধারণা। যেমন নিজে আলস্য বশতঃ কিছুই করিব না, মুখে বলিব ভগবান যেরূপ করাইতেছেন সেইরূপই করিতেছি, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কিছু হয় না ইত্যাদি। ক্রিয়া করিলে বা সাধনা করিলে প্রকৃত মঙ্গল হইবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইবে, শান্তিলাভ হইবে, কিন্তু অত কে করে—এইরূপ প্রমাদ এবং আলস্যে কাল ক্ষয় করা। যাহারা সাধন করে না তাহাদের বুদ্ধি আরও বিকৃত হয়। পূর্ব্বজন্মের সাধনা যাহার থাকে তাহার এরূপ দুর্ম্মতি হয় না, সাধনাতে তাহার প্রবৃত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কিছু করা না থাকে, তাহাদেরই বুদ্ধিতে এই সব বিপরীত ভাব আসিয়া থাকে। আসুর সম্পদ ভোগ করিবার জন্য যাহাদের জন্ম তাহাদেরই দম্ভ দর্প প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥ ৪

অন্বয়। দৈবী সম্পৎ (দৈবী সম্পদ) বিমোক্ষায় (মোক্ষের নিমিত্ত) আসুরী (আসুরী সম্পদ) নিবন্ধায় (বন্ধনের নিমিত্ত) মতা (অভিপ্রেত)। পাণ্ডব (হে পাণ্ডব) মা শুচঃ

(শোক করিও না), দৈবী সম্পদম্ (দৈবী সম্পদকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতঃ অসি (তুমি জন্মিয়াছ)॥ ৫

শ্রীধর। এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্ আহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তঃ ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী। আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং সংসারী ইত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুত্বা কিম্ অহম্ অধিকারী ন বেত্তি সন্দেহব্যাকুলচিত্তম্ অর্জ্জুনম্ আশ্বাসয়তি—হে পাণ্ডব, মা শুচ—শোকং মা কার্ষীঃ। যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতোঽসি॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [এই উভয় সম্পদের কার্য্য কি দেখাইয়া বলিতেছেন]—দৈবী যে সম্পদ সেই সম্পদযুক্ত ব্যক্তি আমার উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হয়। আর যাহারা আসুরী সম্পদ-যুক্ত ব্যক্তি তাহারা নিত্য সংসারী হয়। ইহা শুনিয়া আমি অধিকারী কিনা এই সন্দেহাকুলচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে হে পাণ্ডব! তুমি শোক করিও না, যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ ভোগ করিবার জন্য জন্মিয়াছ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দৈবী সম্পদ যাহা উপরে বলিয়া আসিলাম, ইহা বিশেষ রূপে মোক্ষ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে, আর আসুরী মতেতে অর্থাৎ ক্রিয়া না কল্লে নিঃশেষরূপে বন্ধন—অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া সেই বস্তুরই হইয়া যায়।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে মানুষ হয় আসুরী-সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, নয় তো দৈবীসম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বাসনাবহুল মানব চিত্ত ক্রমাগতই ভোগসুখের অন্বেষণে লালায়িত হয়। সুখের জন্য তৃষ্ণা জীবের স্বাভাবিক, কিন্তু সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রনিষ্ঠার অভাবে মানুষের প্রবৃত্তি আরও বিষয়মুখেই ধাবিত হয়; বিষয়েই সুখ আছে এ ভ্রম কিছুতেই তাহার যায় না। বহু জন্মের পুণ্যকর্ম্মফলে মানুষের যথার্থ সুখের দিকে লক্ষ্য পড়ে, তখন সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবে বুঝিতে পারে সুখ বাহিরের বস্তু নহে, তাহা ধন জন মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে নাই, প্রকৃত সুখ আত্মার মধ্যে। তখন আত্মান্বেষণে জীব ব্যাকুল হয়, বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিতে থাকে। কিন্তু দুই এক জন্মে পূর্ণ বৈরাগ্য প্রাপ্তিও ঘটে না, চিত্তও পূর্ণ আত্মমুখী হইতে পারে না। এই জন্য তাহাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে বা অল্প বা অধিক পরিমাণে আত্মান্বেষণে সচেষ্ট ছিল, তাহাদের বর্ত্তমান জন্ম দৈবীসম্পদযুক্তই হয়। সেই জন্য দেখা যায় কতকগুলি লোকের সাধু গুরুর উপদেশ না পাইলেও তাহাদের চিত্ত আপনা হইতেই ভগবদ্মুখী হয়। তাঁহাদের "বিবেক নিম্নং কৈবল্য প্রাগ্ভারং চিত্তম্"—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধন ফলে তাঁহারা ভূতাত্মা ও জীবাত্মার ঊর্দ্ধে প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হইয়া আছেন; আবার তাঁহাদের নিম্নস্তরেও কতকগুলি সাধক আছেন যাঁহাদের ভূতাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কাজে কাজেই তাঁহারাও আর বাহ্য বিষয় লইয়া মগ্ন থাকিতে পারেন না, বিষয় রস তাঁহাদের নিকট বিরসই বোধ হয়। এই সকল জীব যখন জগতে আসেন তখন দৈবীসম্পদযুক্ত হইয়াই আসেন। আবার এমন কতকগুলি জীব আছেন যাঁহারা ইন্দ্রিয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, পশুধর্মী, তাঁহারা ভোগলালসার চরিতার্থতা ছাড়া অন্য কিছু উচ্চভাব বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে হইবে

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্দৈব আসুর এ চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬

এখনও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁহাদিগকে বার বার জগতে যাতায়াত করিতে হইবে। যদিও দ্রষ্টা বা পুরুষ চিন্মাত্র, অন্যান্য ধর্ম্মাদি দ্বারা তিনি অপরামৃষ্ট, কিন্তু এক একটি পুরুষ অনাদিকাল হইতে এক একটি চিত্তের বা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত। প্রকৃতিই চিত্তাকারে পরিণত হয়, এই জন্য চিত্তকে প্রকৃতি বলা যায়। যোগদর্শনে বলিয়াছেন—

"দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ" (২।১৭)

দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগই হেয়হেতু। চিন্ময় পুরুষই দ্রষ্টা এবং বুদ্ধিই দৃশ্য, কারণ যাবতীয় দৃশ্যই বুদ্ধ্যাকারে পরিণত হয়। এই উভয়ের সংযোগ সম্বন্ধ যতদিন প্রতীতি হইতে থাকিবে, অজ্ঞানও ততদিন থাকিবে। এই অজ্ঞানই আসল "হেয়", ইহাই সমস্ত দুঃখের মূল। বাস্তবিক কিন্তু আত্মার সহিত কখনও দৃশ্যবস্তুর সংযোগ হইতে পারে না, আত্মস্বরূপে তিনি এক ও অদ্বিতীয়—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুঝিতে পারা যায়, তখন কেই বা কাহার দৃশ্য, এবং কেহ বা কাহার দ্রষ্টা থাকিবে? কিন্তু সংযোগ না থাকিলেও সংযোগের যে প্রতীতি হয় ইহাই অজ্ঞান। এইজন্য দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে সংযোগ তাহা অজ্ঞান হেতুই হইয়া থাকে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অজ্ঞান বিলুপ্ত হইলে দৃশ্য বস্তুর কোন অস্তিত্বই থাকে না।

এই চিত্তাকারা বা প্রাণাকারা (চিত্ত প্রাণেরই স্পন্দন) প্রকৃতির সংশোধনই সমস্ত সাধনের মূল উদ্দেশ্য। এই জন্য যোগীরা প্রাণের সাধনা দ্বারা তাহার বহির্ম্মুখী বৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া দেন। প্রাণ অন্তর্ম্মুখ হইয়া সুষুম্নাবাহী হইলে চিত্তেরও স্পন্দন হ্রাস হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাসনার বেগও কমিয়া যায়। বিক্ষেপশূন্য চিত্ত প্রাণের সহিত এক হইয়া পরম স্থিরতার ভাবকে প্রাপ্ত হয়, উহাই চিত্তের শুদ্ধি বা প্রাণের শোধন। শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধপ্রাণ যোগীর জন্মান্তরীয় পুণ্য আছে বুঝিতে হইবে, তাহারই ফলে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাদের অবস্থা এইরূপ, তাঁহারা অসুর ও রাক্ষসদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাহারবিহারী হইতে পারেন না, এবং পরমার্থ সাধনেও অমনোযোগী হইতে পারেন না। যাঁহারা অনুরাগের সহিত নিত্য ক্রিয়া করেন তাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থা বা মোক্ষ নিশ্চয়ই লাভ করিবেন কারণ দৈবীসম্পদযুক্ত না হইলে ক্রিয়ার-প্রতি অনুরাগ হয় না। ক্রিয়ার প্রতি অনুরাগ থাকিলে সংযমের দিকেও দৃষ্টি থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সংযম প্রভৃতি দৈবী সম্পদগুলিই জীবকে মুক্তি লাভে সাহায্য করে, আর যাহারা শ্রদ্ধাহীন, ক্রিয়া ভাল করিয়া করে না বা মোটেই করে না তাহারা বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন, বাহিরের বস্তুতেই তাহাদের আসক্তি—সেই সকল বস্তুতেই তাহাদের প্রাণ পড়িয়া থাকে। ইহাই প্রাণের বন্ধন। আসুরী সম্পদের ইহাই ফল ॥ ৫

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) অস্মিন্ লোকে (এই জগতে) দৈবঃ আসুরঃ চ (দৈব ও আসুর) দ্বৌ (দ্বিবিধ) ভূতসর্গৌ (ভূত সৃষ্টি হইয়াছে) দৈবঃ (দৈবসম্পৎ) বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ (বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে); আসুরং (আসুর সম্পদের বিষয়) মে শৃণু (আমার নিকট শ্রবণ কর) ॥ ৬

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭

শ্রীধর। আসুরী সম্পৎ সর্বাত্মনা বর্জ্জয়িতব্যা ইত্যেতৎ অর্থম্ আসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ—দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাৎ শৃণু। আসুররাক্ষসপ্রকৃত্যোঃ একীকরণে দ্বৌ ইত্যুক্তম্। অতঃ "রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা" —ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্ত প্রকৃতিত্রৈবিধ্যেন অবিরোধঃ। স্পষ্টম্ অন্যৎ।

বঙ্গানুবাদ। [আসুরীসম্পৎ যে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় এতদর্থে আসুরী সম্পদের কথা বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন]—ভূতগণের যে দুই প্রকার সৃষ্টি তাহা আমার বাক্য হইতে শ্রবণ কর। আসুর ও রাক্ষস প্রকৃতিকে এক করিয়া ধরা হইল, এই জন্য সৃষ্টি দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার বলিয়া বর্ণন করা হইল। অতএব নবম অধ্যায়ে "রাক্ষসীমাসুরী" ইত্যাদি শ্লোকে যে ত্রিবিধ প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত বিরোধ হইল না। অপর অংশ স্পষ্ট অর্থাৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দুই রকমের লোক, এক দৈবী ও এক আসুরী—দৈবীর বিষয় অনেক বলিয়া আসিয়াছি, ক্রিয়া যারা না করে তাহাদিগের মন কোন কোন বস্তুতে থাকে তাহা এক্ষণে বলিতেছি।—মনুষ্যগণের সৃষ্টিই 'ভূতসর্গ'। এই ভূতসর্গ দুই প্রকার। সৃষ্ট মনুষ্য মাত্রেই হয় দৈবীসম্পদ্‌যুক্ত কিম্বা আসুরসম্পদ্‌যুক্ত। দৈবী ভূতসর্গের পরিচয়—দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ বর্ণনায়, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণ ব্যাখ্যায়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয় বলিয়া দিয়া, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ বর্ণনা কালে এবং ষোড়শ অধ্যায়ে "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" প্রভৃতি বাক্যে—বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে, এইবার আসুর ভূতসর্গের বিষয় ভগবান বলিবেন, কারণ আসুরের গুণকাহিনী শুনিলেই জীব সেই ভয়ঙ্কর আসুর ভাব ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারে। অর্থাৎ আমি কোন প্রকৃতির লোক তাহা মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং আপনাকে আপনি সংশোধন করা যাইতে পারে। ক্রিয়া করারই বা কি ফল তাহাতো অনেক পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন ক্রিয়া না করার কি ফল, ক্রিয়াহীনের মন কিরূপ বিষয়ে আবদ্ধ থাকে তাহাই বলা হইতেছে, যদি তাহা শুনিয়া আসুর প্রকৃতির লোকেরা সাবধান হয় ও নিজ নিজ চরিত্রের সংশোধনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৬

অন্বয়। আসুরাঃ জনাঃ (অসুর স্বভাবের লোকেরা) প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না); তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং (শৌচ নাই) ন চ আচারঃ (আচারও নাই) ন অপি সত্যং বিদ্যতে (আর না সত্যই বিদ্যমান আছে) ॥ ৭

শ্রীধর। আসুরীং বিস্তরশঃ নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিং চেত্যাদি দ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিম্ অধর্ম্মাৎ নিবৃত্তিঞ্চ আসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি। অতঃ শৌচম্ আচারঃ সত্যং চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। ['প্রবৃত্তিং চ' হইতে দ্বাদশটি শ্লোকে আসুরী সম্পৎ বিস্তৃতপূর্ব্বক নিরূপণ

করিতেছেন]—আসুর স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত আর অধর্ম্মে নিবৃত্ত হইতে জানে না। অতএব তাহাদের মধ্যে, শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—একবার মনে হয় করি আবার মনে হয় কর্‌বো না—এই ক্রিয়া যারা করে না তাহাদিগের এইরূপ ভাব হয়—তাহারা ব্রহ্মেতে থাকে না অর্থাৎ কোন বিষয়েরই নিশ্চয় নাই—কোন এক আচারে থাকে না—মিথ্যা ভিন্ন সত্য বল্‌তে জানে না—সত্য তাদের কাছে একেবারে নাই।—ধর্ম্ম দুই প্রকার প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা লোকের সুকৃতি সঞ্চয় হয়, এবং নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম দ্বারা জীব মুক্তিমার্গে অগ্রসর হয়। কিন্তু এ সমস্তই স্বেচ্ছামূলক নহে, সমস্তই শাস্ত্রবিধি দ্বারা শাসিত। সুতরাং উভয়েতেই শাস্ত্রানুগত পুরুষার্থ করিবার প্রয়োজন হয়। এইজন্য শাস্ত্রবিধি কি তাহা জানা আবশ্যক। শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ না জানিলে তদনুগত হইয়া কার্য্য করিবার উপায় নাই। এই সকল আসুর প্রকৃতির লোকদের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন তাহারা জানেও না, গ্রাহ্যও করে না, অধর্ম্ম হইতেও তাহাদের নিবৃত্তি নাই, সুতরাং নিবৃত্তি মার্গে যাইবার মত তাহাদের মানসিক শক্তিরও নিতান্ত অভাব। কি যে ধর্ম্ম আর কি যে অধর্ম্ম এ সব অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার মত তাহাদের সামর্থ্যও নাই ইচ্ছাও নাই। যাহারা এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য তাহাদের শৌচ সদাচারই বা কিরূপ থাকিবে? তাহাদের মধ্যে এই জন্য সত্যও থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-ভোগ সুখাদিতে তাহারা এত উন্মত্ত, যে সেই সকল ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য সহস্র সহস্র মিথ্যা প্রবঞ্চনা যদি করিতে হয় তাহাও তাহারা করিতে প্রস্তুত। এই সকল মিথ্যাবাদী কপট ও বঞ্চকদের নিকট আবার সত্যই বা কি, শৌচ সদাচারই বা কি? আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলেই হইল। তাহারা যদি সাধন গ্রহণও করে এবং করিব বলিয়া গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাও করে, তবু সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে না, কত রকম মিথ্যা ছল করে। যদি বা কখনও মনে হয় সাধন করি, কিন্তু এত ভোগাসক্তচিত্ত যে ভোগের বস্তু পাইলেই সাধন মাথায় রহিয়া যায়। আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিশ্চয় প্রত্যয় তো তাহাদের নাই, তবুও লোক-দেখানো কিছু অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে স্থির বিশ্বাস হয় না। যদি কাহারও নিকট শুনিতে পায় যে ওরূপ অভ্যাসে শরীর অসুস্থ হইবে, অমনি ভয় পাইয়া সাধন ছাড়িয়া দিল। অথবা যদি কেহ বলে এমন একটি সাধু আসিয়াছে যিনি মন্ত্রের দ্বারা সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন, তবে চলিল তখনই তাঁহার নিকট সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে; এইরূপ তাহাদের মনোভাব। এই সব দুর্ব্বলচেতারা কি আর সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে? প্রবৃত্তি অর্থে ইষ্টসাধন সম্বন্ধে যত্ন বিশেষ—ইহাকেই সাধনা বা ক্রিয়া বলে, আর এই ইষ্টসাধন বা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে মনের বিরাম বা বিশ্রাম হয়, তাহাই নিবৃত্তি। যাহারা সুর নহে—অসুর, অর্থাৎ যাহাদের চিত্তে রাজসিক ও তামসিক ভাব অত্যন্ত প্রবল, তাহারা ক্রিয়া লয়ও না, করেও না, ক্রিয়ার পর অবস্থার যে শান্তি তাহা তাহারা আদৌ অবগত নহে। সুতরাং ব্রহ্মরূপ সৎ বস্তুর বিষয়ে তাহাদের কোন অনুসন্ধানই নাই, এবং তদনুযায়ী জীবনকে চালাইবার প্রণালী বা আচারও তাহারা অবগত নহে। এবং তাহাদের উহা ভালও লাগে না ॥ ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

অন্বয়। তে (তাঁহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা অর্থাৎ বেদাদি প্রমাণশূন্য) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন অর্থাৎ স্বাভাবিক) অনীশ্বরম্ (ঈশ্বরশূন্য) অপরস্পরসম্ভূতম্ (স্ত্রীপুরুষসংযোগ জাত) কিমন্যৎ (ইহার অন্য কোন কারণ নাই) [কেবল] কামহৈতুকম্ (কাম ভোগার্থ মাত্র) আহুঃ (বলিয়া থাকে)॥ ৮

শ্রীধর। ননু বেদক্রয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চ কথং ন বিদুঃ? কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ অনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদি ব্যবস্থা স্যাৎ, কথং বা শৌচাচারাদি বিষয়াম্ ঈশ্বরাজ্ঞাম্ অতিবর্ত্তেরন? ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাৎ? অত আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং—বেদপুরাণাদি প্রমাণং যস্মিন্ তাদৃশং জগৎ আহুঃ—বেদাদীনাং প্রমাণ্যং ন মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ধূর্ত্তভণ্ডনিশাচরাঃ" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা—ব্যবস্থাহেতুঃ যস্য তৎ। স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যম্ আহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগৎ আহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগতঃ উৎপত্তিং বদন্তি? ইতি অত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরম্। অপরস্পরতঃ—অন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুরুষমিথুনাৎ সম্ভূতম্ জগৎ। কিমন্যৎ? কারণমস্য নাস্তি অন্যৎ কিঞ্চিৎ। কিন্তু কামহৈতুকমেব—স্ত্রীপুংসয়োঃ উভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্য ইতি আহুঃ ইত্যর্থঃ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কি জন্য (অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা) জানে না; এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অঙ্গীকার না করিলে জগতের সুখদুঃখাদি ব্যবস্থা (কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী কেন?) কিরূপে হয়? এবং তাহারা শৌচ ও আচার বিষয়ে ঈশ্বরাজ্ঞা (বেদোক্তি) কিরূপে অতিক্রম করে? আর ঈশ্বর অঙ্গীকার যদি না করে তবে জগদুৎপত্তি কি হইতে হয়? অতএব বলিতেছেন]—অসত্য—বেদপুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্য নাই যাহাতে, জগৎকে তাদৃশ বলে। অর্থাৎ বেদাদির প্রামাণ্য মানে না। এইরূপ (তাহাদের কর্ত্তৃক) উক্ত হইয়াছে—তিন বেদের কর্ত্তা—ধূর্ত্ত, ভণ্ড ও নিশাচর। অতএব "অপ্রতিষ্ঠ" অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন যাহার, জগৎকে তাদৃশ বলে। জগদ্বৈচিত্র্য স্বাভাবিক (কোন কারণের অধীন নহে), ইহাই তাহারা বলে। অতএব অনীশ্বর অর্থাৎ ব্যবস্থাপক কর্ত্তা নাই যাহার, জগৎকে তাদৃশ বলে। তবে কিরূপে এই জগতের উৎপত্তি হয়? সেই জন্য তাহারা বলে—অপর ও পর এই অপরস্পর অর্থাৎ অন্যোন্য; তাহা হইতে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এই দুই হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। "কিমন্যৎ" অর্থাৎ ইহারঅন্য কারণ কি? অন্য কিছু কারণ নাই, কিন্তু কামহৈতুক অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এই উভয়ের যে কাম সেই কামই প্রবাহরূপে এই জগতের হেতু॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মিথ্যাই তা'রা স্থির করেছে—এ জগতে বলে তা'রা যে ঈশ্বর কেও নেই, আপনা আপনি হইয়াছে—বেশ্যাগমনের তুল্য আর কিছুই নাই।—আসুর প্রকৃতির লোকেরা জগৎকে অসত্য বলিয়াই স্থির করিয়াছে। জ্ঞানীরা যে হেতু

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাহাদের কিন্তু সে ধারণা নহে। জ্ঞানীরা বলেন এই নামরূপময় জগতের নামরূপটা সত্য নহে, কিন্তু যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই নাম রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আশ্রয় পদার্থ অসত্য নহে--তাহাই পরম সত্য। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সে সর্প মিথ্যা কিন্তু সর্পজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত রজ্জু মিথ্যা নহে; সেইরূপ নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হইলেও উহাদের অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য সত্তা নিত্য সত্য পদার্থ। আসুরপ্রকৃতিরা এ ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলে না, তাহারা বলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থা এ জগতে নাই। থাকিলে একজন তার নিয়ন্তা থাকিতে হয়, কিন্তু জগতে সেরূপ কোন নিয়ন্তা নাই। সেরূপ নিয়ন্তা থাকিলে তাহাদের বড় বিপদ, কারণ শুভাশুভ কর্ম্মের ফল বিধান করিবার কেহ থাকিলে তাহাদের তজ্জনিত দণ্ডাদি ভোগ অনিবার্য্য, এইজন্য তাহারা আপনার মনকে বুঝাইয়া রাখে সেইরূপ কেহ নিয়ন্তা বা কারণ জগতের নাই, সেইজন্য তাহাদের স্বেচ্ছাচারের আর সীমা নাই। তবে এ জগৎ জীব হয় কোথা হইতে? তাহাদের প্রেরক কে? ইহার উত্তরে তাহারা বলে—কামসুখাভিলাষী স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সমাগমের এই ফল। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বর ইহার কারণ নহে। "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" জীববহুল এই জগতের সকল জীবেরই সমস্ত ভোগ্য যিনি বিধান করিতেছেন—তিনি এক অদ্বিতীয়—ইহা আসুর প্রকৃতির লোকেরা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারা বলে মনের এই যে বিবিধ সঙ্কল্প বিকল্প—বেশ্যার মত অবিরত একটা ছাড়িয়া আর একটাকে ধরিতেছে—সেই মনই ভাল। মন না থাকিলে সুখ কোথায়? ইহার বিক্ষেপ আছে সে তো ভালই, নচেৎ কামভোগ্য বস্তু ভোগ হইবে কিরূপে? কামনাত্যাগ, মনকে শান্ত করা, ভগবানকে ভজনা করা, এ সব পাগলের কর্ম্ম। এই সকল সহজসুখবাদীগণকেই নাস্তিক বলে॥ ৮

অন্বয়। এতাং দৃষ্টিম্ (এইরূপ দৃষ্টিকে—মত বা বুদ্ধিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (নষ্টস্বভাব, মলিনচিত্ত) অল্পবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতি) উগ্রকর্ম্মাণঃ (ক্রুরকর্ম্মা) অহিতাঃ (জগতের শত্রু বা অমঙ্গলকারী ব্যক্তিগণ) জগতঃ ক্ষয়ায় (জগতের বিনাশের জন্যই) প্রভবন্তি (জন্মগ্রহণ করে)॥ ৯

শ্রীধর। কিঞ্চ—এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং—দর্শনম্ আশ্রিত্য, নষ্টাত্মানো—মলীমসচিত্তাঃ সন্তঃ, অল্পবুদ্ধয়ঃ—দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ। অতএব উগ্রং—হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে, অহিতা—বৈরিণঃ ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—উদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—লোকায়তিক চার্ব্বাকগণের (নিরীশ্বরবাদিদিগের) এই দর্শনকে আশ্রয় করিয়া মলীমসচিত্ত হওয়ায় দৃষ্ট বিষয়ে যেরূপ মতি হয় [তাদৃশ প্রত্যক্ষবাদী অল্পবুদ্ধি জনেরা] অতএব হিংস্রকর্ম্মা বৈরীগণ, জগতের ধ্বংসের জন্যই তাহারা জন্মগ্রহণ করে॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ লক্ষ্য থেকে—যাহারা আপনাতে আপনি

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্ গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

থাকে না অর্থাৎ ক্রিয়া করে না—কিছুতেই বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে না—উগ্রকর্ম্ম মেরে ফেলা ইত্যাদি জগতের ক্ষয় হেতু হয়—যাহাতে মন্দ পরের হয় তাহা করে।—যাহারা সাধন করে না, তাহারা কেহই আত্মাকে বুঝিতে পারে না। দেহটাকেই সব মনে করে, এই জন্য দেহটাকে পোষণ করিবার জন্যই তাহারা সমগ্র জীবন ব্যয় করে এবং এমন অকর্ম্ম নাই যাহা করে না। এই সকল লোকদের বুদ্ধি সাধারণতঃ তমসাচ্ছন্নই থাকে, তাই শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় পুরীষমূত্রভাবিত এই দেহটার জন্যই তাহারা শশব্যস্ত থাকে। তাহাদের বুদ্ধি অল্প, এইজন্য তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ও অল্প, সুতরাং অপরিমেয় জ্ঞান বস্তু বা আত্মার ধার দিয়াও তাহারা যায় না। তাহারাই নষ্টাত্মা অর্থাৎ শ্রীগুরুর উপদেশ মত আপনাতে আপনি থাকে না, থাকার উপায় বা কৌশলও অবগত নহে। এই সকল লোকদের প্রকৃতি প্রায়ই হিংসাপ্রবণ হয়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করিতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করে না। ইহাদের এ জন্ম তো এই ভাবেই গেল, পরজন্মেও হিংস্র স্বভাববশতঃ সর্পাদি হিংস্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে। তখন আবার জগৎ জীবের অহিতাচরণ করিয়া লোককে উত্যক্ত করে ॥ ৯

অন্বয়। [তে—তাহারা] দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ আশ্রিত্য (কামকে আশ্রয় করিয়া) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদোন্মত্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্ গ্রাহান্ (অসৎ আগ্রহ বা অশুভ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া—অমুক মন্ত্র জপ করিয়া এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিব ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় মনগড়া সিদ্ধান্ত) গৃহীত্বা (গ্রহণপূর্ব্বক) অশুচিব্রতাঃ (অশুচি অর্থাৎ নিরয় গমনোপযোগী কর্ম্মে) প্রবর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১০

শ্রীধর। অপি চ—কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরং—পূরয়িতুম্ অশক্যং, কামম্ আশ্রিত্য—দম্ভাদিভিঃ যুক্তাঃ সন্তঃ, ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তন্তে। কথম্? অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা—অনেন মন্ত্রেণ এতাং দেবতাম্ আরাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদীন্ দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে। অশুচিব্রতাঃ—অশুচীনি মদ্যমাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [আরও] - তাহারা দুষ্পূর (যাহা পূর্ণ করিতে পারা যায় না) কামনাকে আশ্রয় করিয়া দম্ভাদিযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কিরূপ? অসদ্-গ্রাহসকলকে গ্রহণ করিয়া—অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি সাধন করিব অর্থাৎ প্রচুর ধনরত্ন লাভ করিব—এইরূপ দুরাগ্রহ সকলকে মোহবশতঃ স্বীকার করিয়া [উক্ত কার্য্যে] প্রবর্ত্তিত হয়। অশুচিব্রত—অশুচি যে মদ্যমাংসাদি বিষয় তাহাই যাহাদের ব্রত (সেব্য) তাহারা ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মৈথুন করাটাই ভাল ইহারই দেমাক্ করে—বুকচাড়া মোহেতে সদ্ বস্তু গ্রহণ করে না অর্থাৎ সৎকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে। ব্রহ্ম ব্যতীত যে সকল বস্তু তাহাতেই প্রবৃত্ত—ওঁ ওঁ।—সেই

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১

উগ্রকর্ম্মা ব্যক্তিরা কি করে, তাহারই পরিচয় দিতেছেন। তাহারা দুষ্পূর কামনার বশবর্ত্তী হইয়া দম্ভ, মান এবং মদ এই তিনটির সহিত সর্ব্বদা যুক্ত হয়। তাহারা অপূরণীয় দুরাশার বশে দম্ভ অভিমান ভরে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুরাগ্রহ অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—যেমন অমুক দেবতার আরাধনায় ধনলাভ হইবে, কিম্বা কোন নায়িকা সিদ্ধি লাভ করিয়া কামভোগার্থ স্ত্রীরত্ন পাওয়া যাইবে—এই সব দুরাশায় উদ্‌ভ্রান্তমতি কত দেবতারই আরাধনা করে, কত মন্ত্রাদি জপ করে; কিন্তু তাহারা অশুচিব্রত, তাহাদের দ্বারা কোন সাত্ত্বিক কার্য্য হইবার নয়। কোন উত্তম বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। সেই সব ব্রত পালনে শরীর মন পবিত্র হয়, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মন বিক্ষেপশূন্য হয়, হৃদয়ে সাত্ত্বিক বলের সঞ্চার হয়। তাঁহার মুখমণ্ডলেও এমন একটি স্নিগ্ধভাব থাকে যে দেখিলেই মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়। আর যাঁহাদের আচরণ ও নিয়ম নিষ্ঠা ইহার বিপরীত, তাহারাই অশুচিব্রত। তাহাদের আহারও যেমন তমোগুণান্বিত, তাহাদের ব্যবহারও তদ্রূপ। তাহাদের চিত্ত, তাহাদের কার্য্য ও তাহাদের সঙ্গ সকল বিষয়েই সাত্ত্বিকতার অভাব। ভাল কোন বিষয়েই তাহাদের প্রবৃত্তি নাই, কোন সৎ কার্য্য করিতে তাহারা জানে না, কেবল যাহাতে লোকের অনিষ্ট হয় তাহাই করে। লোককে ভয় দেখাইয়া তাহাদের বিত্ত অপহরণের চেষ্টা করে। এই সকল ঘোর তামসিক প্রবৃত্তির লোকেরা কোন অপকর্ম্ম করিতেই বাকী রাখে না। ইন্দ্রিয় ভোগার্থ তাহাদের মন সদাই উদ্যত, কিন্তু প্রকৃত হিত কিসে হইবে, কিরূপে চিত্ত ব্রহ্মভাবনায় ভাবিত হইবে সে পথে তাহারা কিছুতেই চলিবে না॥ ১০

অন্বয়। প্রলয়ান্তাম্ (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) অপরিমেয়াং (অপরিমেয়) চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ (চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া) কামোপভোগপরমাঃ (কামভোগপরায়ণ) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (কামভোগই পরম পুরুষার্থ এরূপ যাহাদের নিশ্চয়)॥ ১১

শ্রীধর। কিঞ্চ—চিন্তামিতি। প্রলয়ঃ—মরণম্ স এব অন্তঃ যস্যাঃ তাম্। অপরিমেয়াং—পরিমাতুং অশক্যাং, চিন্তাম্ আশ্রিতাঃ—নিত্য চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে। এতাবদিতি—কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যৎ অস্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ। অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে ইত্যুত্তরেণ অন্বয়ঃ। তথা চ বার্হস্পত্যসূত্রং—"কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ ইতি চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চ" ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, পরিমাণ করিতে পারা যায় না এইরূপ চিন্তাকে যে সকল লোকেরা আশ্রয় করিয়াছে অর্থাৎ নিত্য চিন্তাপর, কাম উপভোগই পরম পুরুষার্থ, কামোপভোগ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই—এইরূপ কৃতনিশ্চয় ব্যক্তিরা কুকর্ম্মদ্বারা অর্থসঞ্চয় ইচ্ছা করে—এই পর শ্লোকের সহিত অন্বয়। বার্হস্পত্য সূত্রে আছে—কামনাই পুরুষার্থ আর চৈতন্যবিশিষ্ট যে কায় বা দেহ তাহাই পুরুষ শব্দ বাচ্য॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিন্তার আর সীমা নাই, মহাপ্রলয়ের সময় যেরূপ চিন্তা

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২

তদ্রূপ, ভোজন আর মৈথুন বিনে আর কিছুই ভাল না ইহাই নিশ্চয়।—আসুরী প্রকৃতির মনুষ্যদের কামিনীকাঞ্চনই পরম পুরুষার্থ, সুতরাং তাহারা সর্ব্বদা কাম উপভোগের চিন্তা লইয়াই থাকে। মরণ কাল পর্য্যন্ত তাহাদের এই প্রকার অজস্র চিন্তার আর বিরাম হয় না। তাহারা এই চৈতন্যযুক্ত দেহটাকেই পুরুষ এবং কামোপভোগকেই পুরুষার্থ বলিয়া মানে। তাহাদের ধারণা দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ, দেহান্তের পর কাহাকেও কোন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে না, নিজ কর্ম্মের জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না। এইজন্য তাহারা নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য কোন অকর্ম্মই বাদ দেয় না। ভগবানের শরণ গ্রহণ করা বা তাঁহার ভজনাকে নিষ্ফল চেষ্টা ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বলিয়া তাহারা মনে করে॥ ১১

অন্বয়। আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশারূপ পাশে) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম এবং ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিগণ) কামভোগার্থম্ (কামভোগের জন্য) অন্যায়েন (অসৎ উপায়ে) অর্থসঞ্চয়ান্ (অর্থসঞ্চয়) ঈহন্তে (ইচ্ছা করে)॥ ১২

শ্রীধর। অত এব—আশেতি। আশা এব পাশাঃ তেষাং শতানি তৈঃ বদ্ধা ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ—কাম ক্রোধৌ পরময়নং আশ্রয়ো যেষাং তে। কাম-ভোগার্থম্ অন্যায়েন—চৌর্য্যাদিনা, অর্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীন্, ঈহন্তে—ইচ্ছন্তি॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। আশারূপ যে শত শত পাশ তাহা দ্বারা বদ্ধ—অর্থাৎ ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণ, এবং কাম ক্রোধের পরম আশ্রয় স্বরূপ যাহারা, সেই সকল ব্যক্তিগণ কামভোগার্থ চৌর্য্যাদি দ্বারাও অর্থ রাশি সংগ্রহে ইচ্ছা করে॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—নানারূপ আশাতে বদ্ধ—শত শত অন্যায়ে টাকা উপার্জ্জন করে অর্থাৎ কাকেও মেরে ফেলে টাকা নেয়—কাম আর ক্রোধেতেই যুক্ত—সেই টাকা নিয়ে মৈথুন আর ভোজন করে।—শত শত আশাপাশে এই সকল লোক আবদ্ধ। যাহা কিছু লোকের দেখে বা শুনে তাহাতেই আকৃষ্ট হয় এবং আমারও সেইরূপ কিসে হয় তাহারই চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত করে। যদি দৈবাৎ আশা সফল না হয় বা কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে, তবে রাগিয়া আগুন হয়, এমন কি আশা ও লোভের বশে মানুষকে খুন করিয়া ফেলে এবং নিজ নরকের পথ পরিষ্কার করে। পরস্ব অপহরণে এবং দেবতা ব্রাহ্মণের দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণে ইহাদের মনে কোন দ্বিধা উৎপন্ন হয় না। যেন ধনসংগ্রহ ও তদ্দ্বারা কামোপভোগই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এইজন্য সেই সকল দুর্ব্বৃত্তেরা লোককে ঠকাইয়া তাহাদের ধনাদি আত্মসাৎ করে, এবং তাহারা এতদূর কামুক হয় যে পরস্ত্রীকেও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না॥ ১২

(ধনতৃষ্ণা—লোভ)

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

অন্বয়। অদ্য (আজ) ইদং (ইহা) ময়া লব্ধং (আমা কর্তৃক লব্ধ হইল—অর্থাৎ আমি পাইলাম) ইমং মনোরথম্ (এই অভিলষিত বা ইষ্টবস্তু) প্রাপ্স্যে (আমি পাইব), ইদম্ মে অস্তি (ইহা আমার আছে), পুনঃ (পুনরায়) ইদং ধনম্ অপি (এই ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ১৩

শ্রীধর। তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে—প্রাপ্স্যামি। মনোরথং—মনসঃ প্রিয়ম্। স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাং চ ত্রয়াণাং শ্লোকানাম্ ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেন অন্বয়ঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [তাহাদের মনোরথ বর্ণন করিয়া চারিটি শ্লোকে তাহাদের নরকপ্রাপ্তির বিষয় বলিতেছেন]—[আমি অদ্য এই ধন লাভ করিলাম। আমার এই অভিলষিত বস্তুটি পরে পাইব বা আমার এই মনোরথটি সিদ্ধ হইবে। আমার এই ধন আছে, আরও এইরূপ ধন আমার হইবে।] প্রাপ্স্যে—পাইব। মনোরথ—মনের প্রিয়। এই শ্লোকত্রয়ের "ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তি"—অর্থাৎ এই অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া নরকে পতিত হয়—এই চতুর্থ শ্লোকস্থ বাক্যের সহিত অন্বয় ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আজ ২৫৲ পেয়েছি, আরও ৫০৲ পাবো এক জনকে মেরে—এই ৭৫৲ হ'ল—আরও ২৫৲ পাব, আর ২৫৲ কি পাব না? তাহলেই ১০০৲ হইবে।—আসুর প্রকৃতির লোকেদের ধনতৃষ্ণাও বড় প্রবল হয়। তাহারা কেবল মনে মনে ভাবে—এই সব ধন তো এখন পাইলাম, আরও মনের মত কত ধন লাভ করিব! এই তো এত টাকা আমার জমিয়া গিয়াছে, আগামী বৎসরে আরও আমার এত লাভ হইবে! আরও কিছু পাইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, আমি লক্ষপতি হইয়া যাই, লোকে তাহা হইলে আমাকে কত মান্য করিবে। অবশিষ্ট টাকা কি কোন রকমে সংগ্রহ করিতে পারিব না? পারিতেই হইবে কোন প্রকারে। লোকে আমাকে যাই বলুক।

লোককে নিরয়গামী করিতে এই ধনেষণার মত আর কিছুই নাই। ধনমদে মত্ত ব্যক্তির হৃদয় এত ক্ষুদ্র হইয়া যায় যে অর্থের জন্য সে পিশাচের অভিনয় করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। ধন যেমন মানুষকে মত্ত করে এমন আর কিছুতেই নহে। ধন মনুষ্যের চিত্তকে প্রস্তরবৎ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া তুলে ॥ ১৩

অন্বয়। অসৌ শত্রুঃ (ঐ শত্রু) ময়া হতঃ (মৎ কর্তৃক হত হইয়াছে) অপরান্ অপি চ (ও অন্যান্য শত্রুকেও) হনিষ্যে (হনন করিব), অহং ঈশ্বরঃ (আমি ঈশ্বর অর্থাৎ

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫

সকলের নিয়ন্তা বা প্রভু) অহং ভোগী (আমি ভোগী) অহং সিদ্ধঃ (আমি সিদ্ধ বা কৃতকৃত্য) বলবান্ সুখী (আমি বলবান ও সুখী॥ ১৪

শ্রীধর। কিঞ্চ—অসৌ ইতি। সিদ্ধঃ—কৃতকৃত্যঃ। স্পষ্টমন্যৎ।

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—সিদ্ধ—কৃতকৃত্য। আর সব স্পষ্টই আছে। [আমি এই শত্রুকে নাশ করিয়াছি। অন্যান্য শত্রুদিগকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান ও আমিই একমাত্র সুখী, অন্য লোকেরা শুধু পৃথিবীর ভার বাড়াইবার জন্য]॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এবার তো শত্রু মেরেই ফেলেছি—আরও যে ব্যাটা আসবে তাকেও মারবো—আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান, সুখী।—ইহারা লোকের কাছে বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়ায়—আমাকে কেও কেটা মনে করিও না। অমুক লোক জান তো কিরূপ স্পর্দ্ধিত ও ধনবান ছিল, আমি তাহার স্পর্দ্ধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছি, আমার বিপক্ষে যে থাকিবে তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই, তাহাকে বিনাশ করিবই করিব। আর অমুক অমুক যে সব শত্রু আছে তাহাদের তো উকুনের মত টিপিয়া মারিয়া ফেলিব। তাহারা যত চেষ্টাই করুক আমার কিছুই করিতে পারিবে না—আমার লাঠির বল কত তাহারা তা কি জানে? আমিই ঈশ্বর, আবার অন্য নিয়ন্তা কে আছে, আমি যাহা করিব তাহাই হইবে। এমন মূল্যবান ভোগ্য বস্তু আর কাহার আছে? আমি এই সকল বস্তু নিত্য ভোগ করি—অমুক লোক পাতা চাটিয়া বেড়ায়, উহার সঙ্গে আমার আবার তুলনা? আমি সিদ্ধ পুরুষ—আমার কাছে চালাকি নয়, এখনই উহার প্রাসাদ তুল্য ঘর ভূমিসাৎ করিয়া দিব। আমাকে মন্দ বলা সহজ নহে, দেখিতেছ তো আমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া কি রকম তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! আমার মন্ত্রশক্তির প্রভাব তো জানে না! একেবারে ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া দিব। অমুক লোকের কি সর্ব্বনাশ করিয়া দিলাম! আমাকে আবার ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করাইয়াছিল, জানেনা তো আমার সিদ্ধি শক্তির কত বড় প্রভাব। আমাকে ধরিতে এলেই আমি তখন পক্ষী হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইব। আমার সংসার সুখের সংসার। আমার কত জমি, জমিদারী ঘর ইমারত, আমার বাড়ীতে কত লোক খাটে, কত লোক খায়, আমার ছেলেমেয়েগুলি সবই হীরার টুকরা। এত তেজ এত সুখ আর কাহারও ভাগ্যে নাই ইত্যাদি॥ ১৪

অন্বয়। [আমি] আঢ্যঃ (ধনবান) অভিজনবান্ (কুলীন) অস্মি (হই), ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ কঃ অস্তি (আর কে আছে)? যক্ষ্যে (আমি যজ্ঞ করিব), দাস্যামি (দান করিব), ইতি (এই প্রকারে) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞানে বিমোহিত)॥ ১৫

শ্রীধর। কিঞ্চ—আঢ্য ইতি। আঢ্যঃ—ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজনবান্—কুলীনঃ। যক্ষ্যে—যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশাৎ মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি। দাস্যামি

(মূঢ় অবিবেকিগণের নরক গতি)

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

স্তাবকেভ্যঃ। মোদিষ্যে—হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবং অজ্ঞানেন বিমোহিতা—মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—আঢ্য—(আমি) ধনাদি সম্পন্ন। অভিজনবান—কুলীন। যক্ষ্যে—যাগাদি অনুষ্ঠান দ্বারা অন্য দীক্ষিতগণ অপেক্ষা বা তাহাদের নিকট মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইব। স্তাবক নটাদি প্রভৃতিকে দান করিব। মোদিষ্যে—আমোদ করিব, ফূর্ত্তি করিব—এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত হয় অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমার ঢের লোক আছে, আমার তুল্য কেউ নেই, এইরূপ অজ্ঞানেতে মোহিত হইয়া।—এই সকল আসুর প্রকৃতির লোকেরা লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায়—ধনে, মানে, কুলে শীলে আমার মতন এ তল্লাটে আর কেহ নাই। আমি এমন ধুমধামের সহিত যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করিব যাহা দেখিয়া লোকের তাক্ লাগিয়া যাইবে। তাহাদের বলিতেই হইবে এমন যজ্ঞ তাহারা আর কোথাও দেখে নাই, দীন দুঃখী ব্রাহ্মণকে এমন দানও পূর্ব্বে কেহ করে নাই। দেখিবে তখন কত লোক আসিয়া আমার তোষামোদ করিবে, নট প্রভৃতিরা আমার কত স্তবগান করিবে। আমিও তাহাদের প্রচুর ধন দিব, আমার যশে সমস্ত দেশ ভরিয়া যাইবে। বন্ধু বান্ধবের সহিত কত আহ্লাদ পান ভোজন চলিবে—এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত মূঢ়েরা বহুবিধ চিন্তা করিয়া থাকে॥ ১৫

অন্বয়। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা (বহু প্রকার কল্পনায় বিভ্রান্তচিত্ত) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহজালে সংবদ্ধ), কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত) [ব্যক্তিগণ] অশুচৌ নরকে (ক্লেশময় বা অপবিত্র নরকে) পতন্তি (পতিত হয়॥ ১৬

শ্রীধর। এবম্ভূতা যং প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তং অনেকচিত্তম্, তেন বিভ্রান্তা—বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ—মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ। এবং কামভোগেষু প্রসক্তা—অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ, অশুচৌ—কশ্মলে নরকে পতন্তি॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রকারের লোকেরা যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর]—অনেক চিত্তবিভ্রান্ত—অনেক মনোরথে চিত্ত প্রবৃত্ত সুতরাং তদ্দ্বারা বিক্ষিপ্ত। মোহজালসমাবৃত—মৎস্য যেরূপ সূত্রময় জালে যন্ত্রিত হয় সেইরূপ মোহময় জাল দ্বারা তাহারা সমাবৃত। কামোপভোগে প্রসক্ত—অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট হইয়া ক্লেশযুক্ত যে নরক তাহাতে পতিত হয়॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিত্তের অনেক রকম ভ্রান্তি ও মোহজালেতে আবৃত হ'য়ে—কাম আর ভোগেতে আসক্ত হ'য়ে নরকেতে পড়ে থাকে অর্থাৎ দুঃখী হয়।—উক্ত প্রকারের লোকেদের চিত্ত বহুবিধ সঙ্কল্প দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্থাৎ এক বস্তুতে

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭

তাহাদের চিত্ত স্থির থাকে না ; যাহাদের চিত্ত এতাদৃশ বিক্ষিপ্ত তাহাদের মনে আর সাত্ত্বিকভাব আসিতে পারে না, তাহারা শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া কেবল অসচ্চিন্তাতেই কালক্ষেপণ করে, এবং সর্ব্বদা ভ্রমজালে জড়িত হইয়া যাহা অকল্যাণকর কর্ম্ম তাহাতেই আসক্ত হয়। এইরূপ বিষয়াসক্তচিত্ত মৃত্যুকালেও ঐ সকল কদর্য্য চিন্তায় ব্যাপৃত হয়। সুতরাং ঘৃণ্য সংস্কার বশতঃ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অমেধ্য কৃমিজালপূর্ণ নরকাদিতে নিমগ্ন হয়। কুকর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির চিত্তে যে সঙ্কল্প উঠে তাহাই নরকের বিষ্ঠাসদৃশ, সেই চিন্তাতে যাহারা সতত মগ্ন তাহাদের নরকবাসই হয়। মৃত্যুর পর তদনুরূপ যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করে, সেখানে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারিপ্রকারের কর্ম্ম ব্যতীত আর কোন কর্ম্ম থাকে না। এতদপেক্ষা ঘোর ক্লেশময় নরক আর কি হইতে পারে ? ১৬

অন্বয়। আত্মসম্ভাবিতাঃ (পূজ্যতাভিমানী, আত্মশ্লাঘাকারী) স্তব্ধাঃ (অনম্র, অবিনয়ী) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধননিমিত্ত অভিমান ও মত্ততাযুক্ত) তে (তাহারা) দম্ভেন (দম্ভ সহকারে) অবিধিপূর্ব্বকং (অবিধিপূর্ব্বক—স্বেচ্ছাচার মত) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা) যজন্তে (যজন করে) ॥ ১৭

শ্রীধর। যক্ষ্যে ইতি চ যঃ তেষাং মনোরথঃ উক্তঃ, স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধান এব, ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ—পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ। অতএব স্তব্ধা—অনম্রাঃ। ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ তে নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাঃ তে নামযজ্ঞাঃ। যদ্বা দীক্ষিতঃ সোমযাজী ইত্যেবমাদিনা নামমাত্র প্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাঃ তৈঃ যজন্তে। কথম্ ? দম্ভেন, ন তু শ্রদ্ধয়া। অবিধিপূর্ব্বকং চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অন্য যাজক অপেক্ষা মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিব—এই যে তাহাদের মনোরথ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা কেবল দম্ভাহঙ্কারপ্রধান মাত্র, তাহা যে সাত্ত্বিকভাব নহে—তাহাদের এই অভিপ্রায় দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আত্মসম্ভাবিত—আপনা হইতে পূজ্যতা প্রাপ্ত, কিন্তু কোন সাধু কর্ত্তৃক সম্ভাবিত বা পূজ্য বলিয়া স্বীকৃত নহে। অতএব অনম্র। ধন জন্য মান এবং মদযুক্ত হইয়া তাহারা নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। অথবা দীক্ষিত এবং সোমযাজী ইত্যাদি নামমাত্র প্রসিদ্ধির জন্য (অমুক ব্যক্তি খুব যাজ্ঞিক এইরূপ নাম লইবার জন্য) যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। কিরূপ ভাবে করে ? দম্ভের সহিত করে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নহে। অবিধিপূর্ব্বক করিলে যেরূপ হয় তাহাদের যজ্ঞও সেইরূপ হয় ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনার যা কিছু আছে তাতেই দেমাক্ ক'রে, ভাকিয়া ঠেসান দিয়া বসে আছে—কোন একটা পূজা নাম ও দেমাকের নিমিত্তে বিশেষরূপে মন স্থির না করিয়া করে।—এই সকল লোকেরা আত্মসম্ভাবিত অর্থাৎ

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮

অন্য কর্ত্তৃক সম্মানপ্রাপ্ত না হইলেও তাহারা আপনাকেই আপনি সম্ভাবনা অর্থাৎ সম্মান করে, কিন্তু কোন সাধু ব্যক্তি তাহাকে সেরূপ সম্মানভাজন মনে করেন না। তাহাদের তুল্য সর্ব্বগুণান্বিত আর কেহই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই—এই তাহাদের ধারণা। তাই তাকিয়া ঠেসান দিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকে, বা ফোঁটা তিলক করিয়া মালা গলায় দিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকে—ইচ্ছা সকলেই আসিয়া তাহার চরণে পড়ুক। সুতরাং এই সকল লোক বড় অবিনয়ী হয়, একটু সম্মান খাতিরের ত্রুটি হইলে রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হয়। তাহাদের যদি টাকা-কড়ি থাকে, তবে সেই ধনের জন্য মান ও মদ উৎপন্ন হয়, সহজে কাহারও নিকট নত হইতে চাহে না। যদি বা যজ্ঞ করে তাহাও আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া করে। দেবতার প্রতিও কোন প্রকার শ্রদ্ধা নাই, বেদবিধির প্রতিও লক্ষ্য নাই এবং ভক্তি নাই। একটা যাহা হউক হইলেই হইল। কেবল নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া তাহারা শাস্ত্রবিহিতভাবে বা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া করে না। তাহাদের এই সব যজ্ঞ কেবল বাহ্যাড়ম্বরময়, আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত করিবার জন্যই এই সকল যজ্ঞ করে। শাস্ত্র বিহিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না বলিয়া যজ্ঞের প্রকৃত ফলও লাভ হয় না। ক্রিয়া করে জপ করে—সবই নাম কিনিবার জন্য, সুতরাং মন স্থির করিয়া করে না, এবং মনে বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকায় ক্রিয়ার ফল যে স্থিরতা তাহাও লাভ করিতে পারে না। আত্মযজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনাতে আপনি থাকা। তাহারা সে কথা অবগত নহে, তাই যশের জন্য নামমাত্র যজ্ঞ করে, সুতরাং সমস্তই অবিধি-পূর্ব্বক হয়। অমুকের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু গুরুর কথা মানিয়া যে কাজ করিবে এরূপ মনের অভিপ্রায় নহে। শুধু লোকদেখানো একটা দলে নাম লিখান মাত্রই সার হয়॥ ১৭

অন্বয়। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয় করিয়া) [তাহারা] আত্মপরদেহেষু (আপনার ও অপরের দেহে অবস্থিত) মাং (আমাকে) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (অসূয়াকারী বা দোষদর্শী হয়)॥ ১৮

শ্রীধর। অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মপরদেহেষু—স্বদেহেষু পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে। দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাৎ আত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি। তথা পশ্বাদীনামপি অবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহ এব অবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্। অভ্যসূয়কাঃ—সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [তাহাদের যজ্ঞ কিরূপ অবিধিপূর্ব্বক হয় তাহাই বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন]—অহঙ্কার, বল, দর্প প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্ম ও পরদেহে চিদংশরূপে স্থিত আমাকে বিশেষরূপে দ্বেষ করতঃ যজ্ঞানুষ্ঠান করে। দম্ভযজ্ঞে শ্রদ্ধার অভাব হেতু আপনাকে বৃথা পীড়া-দেওয়া হয়, এবং পশ্বাদির অবৈধ হিংসায় চৈতন্যদ্রোহমাত্র ফল

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

হয়, এই জন্য "প্রদ্বিষন্তঃ" এইরূপ বলিলেন। অভ্যসূয়কাঃ—তাহারা সন্মার্গবর্ত্তিদের গুণেতে দোষারোপকারী হয়॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এহার আশ্রয় ক'রে অন্য ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে।—["অহঙ্কার—অহং করণ।:বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান গুণ সকল আত্মাতে অধ্যারোপ করিয়া ভাবে যে এই সকল গুণ আমার—ইহাই অহঙ্কার। এই অহঙ্কারকেই অবিদ্যা বলা হইয়া থাকে। অন্যান্য দোষ অপেক্ষা এই অহঙ্কার দোষই সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশদায়ক, সর্ব্বপ্রকার অনর্থকর প্রবৃত্তি ও দোষের ইহাই মূল। দর্প—যাহার উদ্ভব হইলে লোকে ধর্ম্ম অতিক্রম করে, অন্তঃকরণ আশ্রিত এই দোষকে দর্প বলে। কাম—স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর প্রতি যে অভিলাষ তাহাই কাম"—শঙ্কর]।

'ঘট্ ঘট্ বিরাজে রাম'—প্রতি দেহঘট যে এক আত্মারাম বিরাজ করিতেছেন—এই দেহাত্ম-বাদীরা সে কথা জানেও না, মানেও না। তাই তাহারা সর্ব্বদেহে অবস্থিত, সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী আমাকে (আত্মাকে) প্রিয়বোধ করিতে পারে না, বরং বিদ্বেষ করিয়া থাকে। ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ কিরূপ ? বেদ শাস্ত্রাদিতে ভগবানের যে আজ্ঞা রহিয়াছে সেই আজ্ঞাকে অবজ্ঞা করিয়া অবহেলা করে। সুতরাং সাধু ক্রিয়াবানেরা যে প্রত্যহ আমাকে স্মরণ মনন দ্বারা আমার শরণাপন্ন হয় তাহা ঐ বিদ্বেষকারিগণ সহ্য করিতে পারে না। তাহারা ঐ সকল সজ্জনবর্গের নিন্দা করিয়া বেড়ায় এবং নিজের মদ মাৎসর্য্যে বিভোর হইয়া সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে॥ ১৮

অন্বয়। তান্ (সেই সকল) দ্বিষতঃ (দ্বেষপরবশ) ক্রূরান (ক্রূর) নরাধমান্ (নরাধম অশুভান্ (অশুভকর্ম্মকারিগণকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু যোনিষু এব (আসুরী যোনিসমূহেই) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি)॥ ১৯

শ্রীধর। তেষাং চ কদাচিৎ অপি আসুরস্বভাবপ্রচ্যুতিঃ ন ভবতি ইত্যাহ—তানিতি দ্বাভ্যাম্। তান্ অহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু—জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপি আসুরীষ্বেব অতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষু অজস্রম্ অনবরতং ক্ষিপামি—তেষাং পাপ কর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [তাহাদের কথনই আসুরস্বভাব দূর হয় না—ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আমার বিদ্বেষকারী সেই ক্রূরগণকে জন্মমৃত্যুমার্গ সংসারে তাহাতেও আবার আসুরী অর্থাৎ অতিক্রূর ব্যাঘ্রসর্পাদি যোনিতে 'অজস্র' অনবরত নিক্ষেপ করি। সেই পাপকর্ম্মাদের পাপের সদৃশ ফল দান করি॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এমন রকম ক্রূর লোকদের ঐ আসুরী জন্মেতে ফেলে দিই, যাহারা নরের মধ্যে অধম—ম শব্দে মণিবন্ধ কূটস্থ, তাহার নীচে যে থাকে অর্থাৎ কূটস্থে যে না থাকে সেই অধম!!!—ভগবান দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ"—আমি সর্ব্বভূতগণের আশয়ে অর্থাৎ অন্তঃকরণে আত্মারূপে অবস্থিত। তাহা হইলে এই "অহং" ই কূটস্থ চৈতন্য বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। ইঁহার দ্বেষ্যও কেহ নাই প্রিয়ও কেহ নাই, তবে তিনি ক্রূরকর্ম্মাদিগকে কেন আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন ? তাঁহার দ্বেষ্য প্রিয় কেহ নাই বটে, কিন্তু তিনি কর্ম্মফল বিধাতা, জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে, এই ফলের বিধান কর্ত্তা তিনিই। নিজ নিজ কৃত কর্ম্মের ফলভোগ সকলকেই করিতে হয় বটে, কিন্তু অচেতন কর্ম্ম ফল দিতে পারে না যদি কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফলের সংযোগ করিয়া দিবার জন্য কোন চেতন-কর্ত্তা না থাকেন ? অবশ্য তিনি মানুষের মত রাগদ্বেষের অধীন হইয়া যে এইরূপ দণ্ডবিধান করেন তাহা নহে, তাঁহার সত্তাপ্রভাবে কর্ম্ম-সমূহ ফলোৎপাদন করে এবং জীব কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। নচেৎ ভগবানের কেহ দ্বেষ্য বা কেহ প্রিয় থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বত্রই সম। তবে তিনি দুষ্টদিগকে আসুরী জন্মে নিক্ষেপ করেন কিরূপে ? তাহার কারণ যাঁহারা সাধুপ্রকৃতির লোক তাঁহাদের মন আজ্ঞাচক্রে এবং তদূর্দ্ধে থাকে, এবং এই সকল আসুর প্রকৃতির লোকদের চিত্ত আজ্ঞাচক্রের নীচে থাকে ; সুতরাং তাদৃশ লোকেরা আসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া আপনাপনিই অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা আজ্ঞাচক্রে কূটস্থে না থাকে তাহারাই অধম। এই সকল লোকের এইরূপ মনোবৃত্তি থাকায় তাহারা মৃত্যুকালেও উচ্চভাবে ভাবিত হয় না, কাজে কাজেই তাহাদের চিত্তের বৃত্তির অনুরূপ আবার দেহ লাভ হইয়া থাকে। কে কিরূপ কর্ম্মে কিরূপ ফলভোগ করিবে বা ঐ সকল ব্যক্তির পরজন্মে কিরূপ গতি হইবে, এ সমস্তই ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব শক্তিই জীবের কর্ম্মের সহিত অনুরূপ ফল সংযোগ করিয়া দেয়। তাহা কি প্রকার, ভগবান ১৫শ অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টোঃ মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ"।

সর্ব্ব প্রাণীর বুদ্ধি বৃত্তিতে অন্তর্যামিরূপে আমি অধিষ্ঠিত, আমা হইতেই পূর্ব্বানুভূত বিষয় জনিত স্মৃতি, এবং বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপ সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি স্বয়ং কিছু না করিলেও তাঁহার অস্তিত্বই দেবতা, মানুষ ও ইতর সকলকেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করে। ভগবানের এই বিরাট শাসনের অধীন সকলেই। দেবতারাও ইহার অন্যথা করিতে পারেন না। সেই পারমেশ্বরী নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জীবের কর্ম্মই অনুরূপ ফলোৎ-পাদনে সমর্থ হয়। ভগবানের দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই—ফলভোগ করে জীব নিজ কর্ম্মানুযায়ী। একটা নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকিলে এই বিরাট জগত চলিবে কিরূপে ? ঈশ্বরেচ্ছাতেই প্রকৃতির নিয়ম দুর্লঙ্ঘ্য—যে যেমন কর্ম্ম ও চিন্তা করে, তাহার মনোভাব মৃত্যুর সময়েও তদনুরূপ থাকে, এবং সেই মনোভাব অনুযায়ী তাহার উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—"অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা"—(৫।১০।৭)। পক্ষান্তরে অনুশয়িগণের মধ্যে অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত জীবগণের মধ্যে যাঁহারা অশুভকর্ম্মা তাঁহারাও অবিলম্বে নিজ কর্ম্মানুসারেই কুৎসিতযোনি প্রাপ্ত হন—কুক্কুরযোনি কিংবা

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

শূকরযোনি অথবা চণ্ডালযোনি লাভ করেন। যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া দেহাতীত বা প্রকৃতির অতীত ক্রিয়ার পরা অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের দেহাভিমান না থাকায় দেহজনিত কর্ম্মে আবদ্ধ হইতে হয় না। হইলেও দেহাতীত অবস্থায় দেহের ফলভোগ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এইজন্য মন যাহাতে আজ্ঞাচক্রে বা তদূর্দ্ধে থাকিতে পারে তদ্রূপ সাধনার অভ্যাস করা আবশ্যক। যাঁহাদের মন আজ্ঞাচক্রের নীচে থাকে তাহারা আসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া দ্বেষ ও ক্রূর বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অশুভকর্ম্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে। তাহার ফলে তাহারা ক্রূর ও নীচ যোনিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিম্ (আসুরী যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়া) ততঃ (তদপেক্ষাও) অধমাং গতিং যান্তি (অধমগতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২০

শ্রীধর। কিঞ্চ—আসুরীমিতি। তে চ মাম্ অপ্রাপ্যৈব ইতি এব কারেণ মৎপ্রাপ্তি-শঙ্কাপি কুতস্তেষাম্? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গম্ অপ্রাপ্য ততোঽপি অধমাং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তি ইত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—"মামপ্রাপ্যৈব"—এই এব-কার দ্বারা বলিলেন যে তাহাদের মৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কোথায়? কারণ মৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যে সন্মার্গ তাহা না পাওয়ায় তদপেক্ষা আরও অধম কৃমিকীটাদি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই রকম আসুরী জন্ম হ'য়ে হ'য়ে পরে ডোম চামার হয়।—পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ এই সকল লোকেরা এ জন্মেও ঐ সকল দুষ্ট কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে তাহাদের প্রকৃতি অতিমাত্র দূষিত হইয়া যায়, এবং দূষিত প্রকৃতিতে সৎকর্ম্মের প্রবৃত্তিই থাকে না। জন্ম জন্মান্তর ঐ সকল নীচ কার্য্য করিতে করিতে শেষে ডোম চামারের ঘরে জন্ম হয়। চিত্ত শুদ্ধির অভাবে ভগবদ্ প্রাপ্তির পথ তাহারা জানিতে পারে না, জানিলেও তাহা তাহারা গ্রহণ করে না বরং উপহাস করে, এই সকল কারণে তাহারা সাধুমার্গ প্রাপ্ত হয় না। আত্মক্রিয়াতে তাহারা আস্থা স্থাপন করিতে পারে না সুতরাং তাহা করা অনাবশ্যক মনে করে। যাহাতে বুদ্ধি ভাল হয়, ভগবদ্মুখী হয় সে দিকে ইহাদের কোন চেষ্টাই থাকে না। সুতরাং স্বীয় দূষিত প্রকৃতিরও সংশোধন হয় না। স্বেচ্ছাহার-বিহারী হইয়া আসুরী সম্পদ্ ত্যাগ করিতে পারে না; এবং উচ্চকুলে বা উচ্চ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিবার সামর্থ্যও থাকে না। এইরূপে কত জন্মই তাহাদের নষ্ট হয়, বার বার গর্ভবাস ক্লেশ পাইতে হয়; ইহা যে কিরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় জীবকে নিক্ষেপ করে জীব যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখে তাহা হইলে প্রাণ দৈবীসম্পদ্ লাভের জন্য ব্যাকুল না হইয়াই থাকিতে পারে না ॥ ২০

(নরকের ত্রিবিধ দ্বার)

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

(কামমুক্ত পুরুষের শ্রেয়ঃ সাধনে সামর্থ্য)

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

অন্বয়। কামঃ, ক্রোধঃ তথা লোভঃ (কাম, ক্রোধ ও লোভ) ইদং ত্রিবিধং (এই তিনটি) নরকস্য দ্বারং (নরকের দ্বার) আত্মনঃ নাশনং (আত্মার নাশক); তস্মাৎ (অতএব) এতৎ ত্রয়ং (এই তিনটিকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১

শ্রীধর। উক্তানাম্ আসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়ম্ ইত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতি ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং অতএব আত্মনো নাশনং—নীচযোনিপ্রাপকং। তস্মাৎ এতত্ত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত আসুর দোষগুলির মধ্যে সর্ব্বদোষের মূলীভূত যে দোষত্রয়, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ইহাই বলিতেছেন]—কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার, অতএব "আত্মনাশন" অর্থাৎ নীচযোনিপ্রাপক। সেই জন্য এই তিনটি সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কাম ক্রোধ লোভ এই তিনেতে থাকিলেই আত্মায় থাকা হয় না, তন্নিমিত্ত ইহা ত্যাগ করা উচিত—ত্যাগ শব্দার্থ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত।—আসুরী সম্পদের প্রকার অনন্ত হইলেও কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিই মুখ্য। এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে পারিলে আসুরী সম্পদ পরিহার করা যায়। ইহারা আত্মজ্ঞানের নাশক। এই তিন বৃত্তি দ্বারাই আত্মজ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে। যাহারা আত্মজ্ঞানহীন, তাহাদের নীচযোনি প্রাপ্তি হয়। এই তিনটিকে লইয়া যাহারা মগ্ন থাকে তাহাদের আত্মাতে থাকা হয় না, মাথায় কোন জ্যোতিঃর প্রকাশ হয় না, সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিয়া মুমুক্ষু সাধকগণের এই তিনটিকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যই প্রকৃত ত্যাগ, কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থা ব্যতীত ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হয় না। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন সাধকের সদসৎ কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি থাকে না। স্বাভাবিক যখন যে ভাবের উদয় হয়, তদনুরূপ তাঁহাদের কর্ম্ম চেষ্টা হয়। তবে যাঁহারা মুমুক্ষু মাত্র তাঁহাদের এই তিনটির উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—নরক প্রাপ্তির এই তিনটি দ্বার, যে দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে আত্মা নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আর কোন পুরুষার্থের যোগ্য হইতে পরে না। এই তিনটিতে যে ডুবিয়া থাকে, মোক্ষপথ তাহার নিকট এক প্রকার অবরুদ্ধই থাকে। এ তিনটি আসক্তি থাকিতে, ইচ্ছা হইলেও মোক্ষমার্গে যাইবার কোন উপায় হয় না। সেইজন্য মুক্তিমার্গে গমনেচ্ছু পুরুষের এই তিনটির সংযমে বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক ॥ ২১

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) এতৈঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) তমোদ্বারৈঃ (নরকের দ্বার

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) নরঃ (মনুষ্য) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (আপনার মঙ্গল) আচরতি (সাধন করে) ততঃ (তাহা হইতে) পরাং গতিং যাতি (পরমা গতি প্রাপ্ত হয়)॥ ২২

শ্রীধর। ত্যাগে চ বিশিষ্ট-ফলমাহ—এতৈরিতি। তমসঃ—নরকস্য দ্বারভূতৈঃ এতৈঃ ত্রিভিঃ কামাদিভিঃ বিমুক্তো নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং—তপোযোগাদিকম্ আচরতি। ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [দোষত্রয় ত্যাগে যে বিশেষ ফল হয় তাহা বলিতেছেন]—"তমসঃ—অর্থাৎ নরকের দ্বারভূত যে কামাদি দোষত্রয়" তাহা হইতে বিমুক্ত নর আত্মার শ্রেয়ঃ-সাধন তপোযোগাদি আচরণ করে, তদনন্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই তিনকে ছেড়ে আত্মাতে সর্ব্বদা থেকে গুরুবাক্যের দ্বারা ক্রিয়া ক'রে উত্তম গতি প্রাপ্তি হয়।—চিত্ত উপদ্রবশূন্য না হইলে কেহই শ্রেয়ঃ সাধনে কৃতকার্য্য হয় না। কাম ক্রোধ ও লোভের প্রাবল্য হেতুই মানুষ নিজের শ্রেয়ঃ আচরণে বঞ্চিত হয়। যাহারা ঐ ত্রিবিধ উপদ্রব হইতে মুক্ত, তাহাদেরই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। দেহ-ইন্দ্রিয়াদির বিষয় মুখে গতি হইতেই নরকের পথ প্রশস্ত হয়। মন দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া কাম লোভাদির বাসনাকে চরিতার্থ করে। যাহারা এই চরিতার্থতাই উপভোগ করিতে চায়, তাহাদের দৃষ্টি বিষয়েন্দ্রিয়াদির সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তাহাদের প্রাণের গতি ইড়া পিঙ্গলাতেই পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত হয়, সুতরাং চিত্ত বিশেষভাবে বহির্ম্মুখ হইয়া যায়। তাহাতে কেবল ত্রিতাপের জ্বালা উত্থিত হইয়া মানবকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করে। এই দেহেন্দ্রিয়ের কল চালাইতেছে প্রাণাদি বায়ুরা। তাহাদেরই বিশেষ বিশেষ প্রবাহ হইতে এই কাম-ক্রোধ-লোভাদি সমুদ্ভূত হয়। সুতরাং প্রাণকে ঠাণ্ডা করিতে না পারিলে এই রিপু-ত্রয়ের হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি নাই। সদ্‌গুরুর উপদেশ মত প্রাণ ক্রিয়া করিলে প্রাণের গতি ইড়া পিঙ্গলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুষুম্নায় প্রবেশ করিবে। এই সুষুম্নায় প্রাণের গতি হইতেই পরা গতি লাভ হয় অর্থাৎ সহস্রারে স্থিতি হয়। ইহাই জীবের সর্ব্বোত্তম গতি। তখন কাম-ক্রোধ-লোভাদিকে আর চেষ্টা করিয়া দূর করিতে হয় না, তাহারা প্রাণের স্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং-ই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়॥ ২২

অন্বয়। যঃ (যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য (শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া) কামচারতঃ (স্বেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ত্ততে (কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (লাভ করিতে পারে না) ন সুখং ন পরাং গতিং (না সুখ, না পরা গতি প্রাপ্ত হয়)॥ ২৩

শ্রীধর। কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—য ইতি। শাস্ত্রবিধিং—বেদবিহিতং ধর্ম্মং, উৎসৃজ্য, যঃ কামচারতঃ—যথেচ্ছং বর্ত্ততে, স সিদ্ধিং—তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি ন চ সুখং—উপশমং, ন চ পরাং গতিং—মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ। [কামাদিত্যাগও স্বধর্ম্মাচরণ বিনা সম্ভব হয় না, ইহাই বলিতেছেন]—যে ব্যক্তি বেদবিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে থাকে (অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) সেই ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। সুখ অর্থাৎ উপশম এবং পরাগতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শাস্ত্রের বিধি অর্থাৎ বিশেষরূপে স্থিতি ক্রিয়ার দ্বারায় না হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে কোন কর্ম্ম করে তাহার সিদ্ধি হয় না—সুখ ও পরম গতি প্রাপ্তি হয় না—পরম গতি অর্থাৎ স্থিতি।—শাস্ত্র কি ? শাস্ত্র বলিতে বেদকেই বুঝায়, এবং বেদানুগত স্মৃতি পুরাণকেও শাস্ত্র বলে, কিন্তু স্মৃতি পুরাণ যদি কোনস্থানে বেদ-বিরুদ্ধ হয়, তবে তাহার প্রামাণ্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। যাহা অজ্ঞাত বস্তু, শাস্ত্র তাহার জ্ঞাপক। যে বস্তু আছে,অথচ আমরা জানিতে পারি না—শাস্ত্রই তাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়, আবার সেই অজ্ঞাত বস্তুকে জানিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিধি বা সাধনা থাকে, সেই বিধির বোধকও হইতেছেন—শাস্ত্র বা বেদ। শাস্ত্র হইতেই আমরা সেই বিধি অবগত হইতে পারি। এই বিধি "অপূর্ব্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যা" ভেদে তিন প্রকার। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ের যে উপদেশ—তাহাই "অপূর্ব্ব বিধি"। যেমন "স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র করিবে" কিম্বা "প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে"। অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে স্বর্গলাভ যে হয়—তাহা আমরা কেহ অবগত নহি, কিন্তু আমরা তাহা মানিয়া চলি। কেন ? না— বেদের উপদেশ, এই উপদেশই "অপূর্ব্ব"। আর যাহা আংশিক অজ্ঞাত এবং আংশিক জ্ঞাত—তাহাকে "নিয়ম" বলে। যেমন ধান্যকে নিস্তুষ করিয়া অন্ন হয়—তাহা আমরা জানি, কিন্তু ধান্যকে নিস্তুষ করিবার অনেক উপায় আছে ; তন্মধ্যে উদূখলে কুটিয়া যে অন্ন হইবে. তাহাতেই যজ্ঞ করিতে হইবে,—এই যে আংশিক অজ্ঞাত বিষয়ের বিধি,—তাহার নামই "নিয়ম"। স্বভাবতঃ মানুষ আপনার রুচিমত অনেক বিষয়ে অনুরক্ত হয় ; যেমন —পশুমাংস ভক্ষণ। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ যে—"পঞ্চনখ" প্রাণী ব্যতীত অন্য পশুর মাংস খাইবে না—এই বিধির নাম "পরিসংখ্যা"। বেদোক্ত কর্ম্ম বা উপাসনা এই তিন প্রকার বিধির দ্বারা শাসিত। বেদে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড আছে। কর্ম্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া লোকে স্বর্গাদি উচ্চলোক লাভ করে, জ্ঞান-কাণ্ডের ফল অন্যরূপ। তাহা অলৌকিক জ্ঞান, যদ্দ্বারা জীবের নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয়। এইজন্য বেদ সর্ব্ব পথেরই প্রদর্শক। বেদ ব্যতীত জীবের মুক্তি লাভ হইতে পারে না—তাই চণ্ডীতে বলিয়াছেন—

"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদ-পাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥"

তুমি শব্দ ব্রহ্মরূপা, তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রদ ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের আশ্রয়, তুমি উদাত্তাদি স্বরযোগে রমণীয় পদযুক্ত সামবেদেরও আশ্রয়। অতএব তুমিই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদরূপা। তুমি সর্ব্বার্থ-প্রকাশিকা, তুমিই সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তা ; তুমিই সংসার-প্রবাহের রক্ষণার্থ কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তি-রূপা। তুমি নিখিল জগতের পরমদুঃখ-নাশিনী।

এইজন্য যাহারা শুভকর্ম করে না বা করিলেও শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সিদ্ধিলাভ, সুখ লাভ বা মোক্ষ—কিছুই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র অসংখ্য, তাহাতে বিধিও অনন্ত, সুতরাং সকলেই যে সকল শাস্ত্র মানিয়া চলিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এত অধিক এবং তাহারা পরস্পর এত বিরুদ্ধভাবাপন্ন, যে তাহা মানিয়া চলা কাহারও পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সব বিধি—সব সময়ে সকলের জন্য নহে, কাহার পক্ষে কখন্ কোন্ বিধি সুসঙ্গত হইবে, তাহা বলিয়া দিতে হইলেও শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শুধু শাস্ত্র-জ্ঞান থাকিলেও হইবে না, জিজ্ঞাসুর পক্ষে কোন্ বিধি যুক্তিযুক্ত—ইহা বুঝিতে হইলে যে মেধার প্রয়োজন, তাহা থাকা আবশ্যক, কিন্তু তাহা সকলের থাকে না; এবং শুধু মেধা মাত্র থাকিলেও চলিবে না, সে মেধা "বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা" হওয়া চাই—যদ্দ্বারা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়—ইহা সাধকের বহু সাধনার ফলে যে সিদ্ধি লাভ হয়—সেই সাধনসিদ্ধি না থাকিলে তিনি কাহার পক্ষে কিরূপ সাধনা উপযোগী তাহা বলিয়া দিবেন কিরূপে? সুতরাং বাহ্যভাবে কেবল শাস্ত্রানুশীলনেও কোন ফল হইবে না। বরং বহুশাস্ত্রাভ্যাস ও বহুশাস্ত্র-আলোচনার নিষেধও আছে। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলং হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥"—যিনি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কিন্তু পরনিষ্ণাত নহেন অর্থাৎ পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণাদি করেন না, তাঁহার শাস্ত্রপাঠ কেবল শ্রমমাত্র, যেরূপ বন্ধ্যা-গাভীপালকের বৃথা শ্রম হয়। তাই:—

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥"

শাস্ত্র অনেক, জ্ঞাতব্যও বিস্তর, কিন্তু আয়ুঃ স্বল্প এবং বিঘ্ন বহু, সুতরাং যাহা সারভূত—তাহাই উপাসিতব্য, যেমন হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধের সারভাগ গ্রহণ করে সেইরূপ শাস্ত্র হইতে সারভাগ লইতে হইবে। যদিও আত্মতত্ত্ব সুবিজ্ঞেয় নহে, শাস্ত্রানুসারেই তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারে শাস্ত্রানুশীলনও সমূহ ক্ষতি করে। কিন্তু আজকাল আমরা তাহা মানি কই? এই শ্লোকের বাহ্য অর্থও অতিশয় উপাদেয়, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক।

শাস্ত্র অর্থে বেদ এবং বেদের অর্থ জ্ঞান। বেদ অপৌরুষেয়, পুরুষের চেষ্টার ফলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান নিত্য সিদ্ধ বস্তু, যেমন স্বতঃ প্রকাশিত সূর্য্যের সাময়িক আবরক মেঘ, তদ্রূপ নিত্য-সিদ্ধ জ্ঞান-বস্তুর সাময়িক আবরক অজ্ঞান। এই অজ্ঞান আত্মদৃষ্টির অভাব সূচিত করে। আত্মদৃষ্টির অভাব হইলে আমাদের কতকগুলি ভ্রম উৎপন্ন হয়, পুনরায় আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইলে সে ভ্রম থাকে না। ভ্রম মানেই - যাহা সত্য নহে, তাহাকে সত্য বলিয়া ধারণা করা। যে বস্তু যাহা—তাহাকে তাহা না জানিয়া অন্য বস্তু মনে করাই ভ্রম। আত্মদৃষ্টির অভাব-বশতঃ এই ভ্রম আমাদের সর্ব্বদাই হইতেছে। কিন্তু আমাদের ভ্রম হয় বলিয়া যে সত্য বস্তুর কোন বিকার ঘটে—তাহা নহে, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলেও রজ্জু রজ্জুই থাকে, তদ্রূপ নিত্য সত্য ব্রহ্ম বস্তুতে জগদাদি অসৎ বস্তুর ভ্রম হইলেও, যাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য—তাহার সত্যস্বরূপের

কখনও কোন ব্যভিচার হয় না। সুতরাং আমরা জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও আত্মার স্বরূপে কোন বিকার হয় না, তাহা সর্ব্বদাই একরূপ। এই একত্বের দর্শন হয় না কেন? কারণ—সূর্য্যের কোলে মেঘের মত, সত্য-জ্ঞানের কোলে কিছু আবরণ পড়ে,—ঐ আবরণই অজ্ঞানের জনক। সেই আবরণ সরিয়া গেলে দর্শন-যন্ত্রের আবরণের অভাবে আমরা তখন সূর্য্যের স্বতঃ প্রকাশকে অনুভব করিতে পারি। কিন্তু আমাদের জানিবার পূর্ব্বেও তাঁহার স্বতঃ প্রকাশের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইজন্য পুরুষের চেষ্টার ফলে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়—তাহা নহে, পুরুষের চেষ্টার ফলে জ্ঞানের আবরণ সরিয়া যায় মাত্র। এই জ্ঞানের আবরণ প্রকৃতি বা ক্ষেত্র। মন সেই প্রকৃতির মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে বিষয় অনুভব করে, নানত্ব দেখে, জন্ম-মৃত্যুর খেলা দেখিতে থাকে, জ্ঞান ঢাকা পড়িয়া যায়। সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রানুশীলন করিতে হয়। শাস্ত্র অর্থে—শাসন বা আজ্ঞা। কাহার শাসনে এই শরীর যন্ত্র চলিতেছে? "বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্"—বায়ুই এই শরীরের বিধাতা বা শাসক। বায়ুর বলেই এই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বা সমগ্র প্রকৃতি-কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। সেই সকল বায়ুর মধ্যে প্রাণই মুখ্য। এই প্রাণের আজ্ঞাতেই সব কার্য্য হইতেছে। তাই বায়ুই শরীরের শাস্তা বা শাস্ত্র। এই শাস্তার শরণাগত হইয়া চলিতে পারিলেই এই সমগ্র প্রকৃতি তাহার অধীন হয়। তখন সে প্রকৃতির অধীশ্বর পুরুষকেও অবগত হইতে পারে। এই প্রকৃতি-পুরুষকে অবগত হইলেই জীব জন্মমরণরহিত হইয়া যায়। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিলেন—"নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি"—এই বায়ুই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, হে বায়ো তোমাকে নমস্কার। "প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি"—এই দেহরূপ পুরে প্রাণরূপী অগ্নিত্রয়ই সর্ব্বদা জাগরিত থাকে। প্রজাপতি বলিয়াছেন—যজ্ঞের সহিতই প্রজাসকল সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রাণযজ্ঞই সেই যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ করিতে পারিলে তবে আত্মোন্নতি লাভ হয়। ইহাই সকলকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করে।

এই বায়ু সচঞ্চল হইয়া মনকে উৎপন্ন করে এবং মনের দ্বারা বিষয় ভোগ হয়। এই বায়ু স্থির হইলে মন প্রাণের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখনই ব্রহ্ম দর্শন হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা এই বায়ু আয়ত্ত হইলে অপরোক্ষানুভূতি হইয়া থাকে। এই বায়ুর সাধনই জ্ঞাতব্য বস্তু। প্রশ্নোপনিষদে এ সম্বন্ধে ঋষি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বায়ু সকলের শাসক বলিয়া সেই ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় যে নিয়ম বা বিধি আছে, তাহাই শাস্ত্রবিধি। এই বায়ুর ক্রিয়াকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলে। ক্রিয়া দ্বারা মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সমস্ত চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে তখনই বেদজ্ঞান হয়। এই বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে সাধক বেদাতীত চরম জ্ঞান লাভ করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জ্জুনকে কিন্তু "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"—বেদ ত্রিগুণাত্মক, তুমি গুণাতীত হও বলিলেন কেন?—এই বাক্যে বেদকে অবহেলা করিতে বলা হয় নাই (২য় অঃ ৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। বেদ-বিধি দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে নিস্ত্রৈ-গুণ্যের অবস্থা লাভ করা যায়। বেদবিধিই হইল—মেরুদণ্ডের মধ্যে ষট্‌চক্রের ক্রিয়া। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়কে জানিতে পারিলে যেমন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ ষট্‌চক্রে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিলে শেষে যে বিশেষ-রূপে স্থিতি লাভ হয়, এই গুণাতীত অবস্থা

(শাস্ত্র কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণ)

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

লাভের পর আর ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না। এই জন্যই প্রথম প্রথম শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া (মনকে ষট্‌চক্রের মধ্যে না রাখিয়া বাহিরের বস্তুতে রাখাই শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘন) স্বেচ্ছাচারী হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। সহস্রারে প্রাণের স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার শেষ হয়। এইজন্য ষট্‌চক্রের ক্রিয়াই বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং সহস্রারে স্থিতিই জ্ঞানকাণ্ড—"জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" জ্ঞানেই সমস্ত সমাপ্ত হয়। এই বিশেষ স্থিতি দ্বারাই মনের চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়, মন পরম শান্ত হইয়া পরমানন্দ রূপ আত্মাতে চিরদিনের জন্য নিমগ্ন হইয়া যায়। ক্রিয়া প্রথমে ইড়া-পিঙ্গলাতেই আরম্ভ করিতে হয়, কারণ উহাই তখন প্রত্যক্ষ। ক্রিয়া করিতে করিতে ইড়া-পিঙ্গলার কাজ বন্ধ হইয়া সুষুম্নায় কাজ হয়। সুষুম্নায় প্রাণবায়ুর প্রবাহ থাকিলেই নির্ম্মল সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়। পরে সাধক গুণাতীত হইয়া যান। যে ক্রিয়া করে না—তাহার ইড়া-পিঙ্গলার গতি শুদ্ধ হয় না, সুতরাং পরমা স্থিতি লাভ না হওয়ায় তাহার যথার্থ সুখ বা পরম-গতি (নির্ব্বাণ মোক্ষ) লাভ হইতে পারে না ॥ ২৩

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই হেতু) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের নিরূপণে) শাস্ত্রং তে প্রমাণম্ (শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ) [সুতরাং] ইহ (কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে বিধান—তাহা) জ্ঞাত্বা (বিদিত হইয়া) কর্ম্ম কর্ত্তুম্ (কর্ম্ম করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ২৪

শ্রীধর। ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যম্ ইদং অকার্য্যম্—ইতি অস্যাম্ ব্যবস্থায়াং তে—তব, শাস্ত্রং—শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা ইহ—কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি, তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্-জ্ঞানমুক্তীনাম্ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪

দেবদৈতেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ। [ফলিতার্থ বলিতেছেন]—ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য—এই ব্যবস্থায় (অর্থাৎ ইহা নিরূপণের জন্য) শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব শাস্ত্র-বিধানোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান যে তুমি, তোমার যথাধিকার কর্ম্ম করাই উচিত। কারণ সত্ত্বশুদ্ধি, সম্যক্ জ্ঞান এবং মুক্তি লাভের মূলই কর্ম্ম ॥ ২৪

ষোড়শাধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পত্তির সংবিভাগ দেখাইয়া সাত্ত্বিকের যে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার তাহা প্রদর্শিত হইল ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তন্নিমিত্তে শাস্ত্রে যেরূপ বলেছে বিশেষরূপ বুদ্ধির পর পরা বুদ্ধিতে স্থির হইয়া কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করা উচিত—বিশেষ রূপে স্থিতি হইয়া যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা।—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রাচার জানা থাকিলে আর স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি হয় না। যতদিন শাস্ত্র ঠিক জানা না যায়, ততদিন গুরুর উপদেশ মত সাধনপথে চলাই কর্ত্তব্য। "ইহ" অর্থাৎ এই কর্ম্মাধিকার ভূমিতে তুমি বর্ত্তমান, অতএব তোমার পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথেই চলা উচিত। শাস্ত্র প্রথমে ঠিক মত বুঝা যায় না, পড়িলেই যে শাস্ত্রজ্ঞান হইবে—তাহাও নহে, তবে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। সাধকের পক্ষে শাস্ত্রের যে কি অর্থ তাহা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছি।

কর্ম্মাধিকার কি তাহাই বলিতেছি। যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কূটস্থে লক্ষ্য করিলেই জ্ঞাতব্য কি তাহা জানিতে পারেন এবং কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারেন। শরীরে কোন গুণ প্রবল এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে কোন তত্ত্বের ক্রিয়া চলিতেছে—তাহা বুঝিবার কৌশল আছে। সমস্ত জগতের সংবাদ এই কূটস্থে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তিনটি বিন্দুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিন গুণ ত্রিকোণাকারে তিনটি বিন্দুরূপে লক্ষিত হয়। রজঃ বিন্দুটি বাম কোণে রক্তাভার ন্যায় দৃষ্ট হয়, তমঃ বিন্দুটি দক্ষিণ কোণে কৃষ্ণাভা সদৃশ দৃষ্ট হয়, সত্ত্ব বিন্দুটি ঊর্দ্ধকোণে শুভ্র কিরণের ন্যায় বোধ হয়। ইহাদিগকেই যথাক্রমে বামা, রৌদ্রী ও জ্যেষ্ঠা বলে—ইহারা সকলেই শক্তিরূপা। ক্ষিতি তত্ত্বের বর্ণ হরিদ্রাবৎ, জল তত্ত্বের বর্ণ ফিকে সবুজ, তেজস্তত্ত্বের বর্ণ জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ, মরুতের বর্ণ জাঙ্গাল এবং ব্যোমতত্ত্বের বর্ণ আকাশ সদৃশ। এই তিন বিন্দু মিলিয়া এক হইয়া গেলে ত্রিকোণের মধ্যস্থলে শ্রী-বিন্দুর দর্শন হয়, উহাই মুক্তিদায়িনী শক্তি।

এ সমস্তই শরীরস্থ বায়ুর শক্তি। প্রাণায়ামাদি যোগ ক্রিয়া দ্বারা এই সমস্ত বায়ুর বহু রহস্য জানিতে পারা যায়। যেমন করিয়াই হউক বায়ুকে আয়ত্ত করিতে হইবে, এই বায়ুর গতি অনুসারেই জীব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদিতে আসক্ত হইয়া বহির্ম্মুখ ও বদ্ধ হয়, বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা এই বায়ুকে আয়ত্ত করিলেই জীবের অন্তর্লক্ষ্য আরম্ভ হয়। ক্রিয়া যতই অধিক করিবে বায়ুর শক্তিতে অভ্যন্তরস্থ নাড়ী সমুদয় ততই বিশুদ্ধ বা মলশূন্য হইবে। নাড়ীমুখে বায়ুর গতি অনুসারেই শুভাশুভ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সকল সমুদ্ভূত হয়। নাড়ী যত শুদ্ধ হইবে ততই মনের গতিপ্রবাহ শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইতে থাকিবে। কিন্তু ক্রিয়া আরম্ভ করিবামাত্রই নাড়ী শুদ্ধ হয় না। যাহার যতটা অধিকার তাহার অধিকারানুযায়ী ততটা উন্নতিলাভ হয়। শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—এই শ্লোকস্থ "ইহ" শব্দটি দ্বারা "কর্ম্মাধিকার ভূমি" প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শরীরটি কর্ম্মের ক্ষেত্র বা ভূমি, ইহাতে কর্ম্মের অধিকারানুরূপ ফল দেয়।

শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্র শাস ধাতু হইতে, যিনি শাসন করেন বা আজ্ঞা দেন। বায়ুই এই

দেহেন্দ্রিয়কে শাসন করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করে—(প্রশ্নোপনিষদ), সুতরাং বায়ুগুলিই শাস্ত্র। বিধি—বি পূর্ব্বক ধা ধাতু হইতে—যাহার অর্থ বিশেষরূপে ধারণ করা। তাহা হইলে শাস্ত্র বিধির অর্থ—বায়ু বিশেষরূপে যখন স্থির হইয়া মস্তকে স্থিত হয়, তাহাই শাস্ত্র বিধি—যাগকে ক্রিয়ার পর অবস্থা বলে।

সেই বিধি পালনের যে নিয়ম গুরু বলিয়া দেন, সেই নিয়ম অনুসারে চলিলেই সাধক উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন। তখন সাধক যে সোপানে আরূঢ় হইয়াছেন তদনুসারে ক্রিয়ারও নানারূপ বিধান আছে, গুরু তাহা বলিয়া দেন। সাধনে যাহার যতটা অধিকার, তাহাই তাহার স্বভাবজ কর্ম্ম, ইহাই শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম। এ কর্ম্ম করিলে সাধকের ক্রমশঃ উন্নতি লাভ হইতে থাকে, ও পথে নানা বিঘ্ন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেও অধিকারানুরূপ যে সাধন করিয়া যাইতে পারে তাহার প্রাণ ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসে, পরে বিশেষরূপে স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই মনুষ্য জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য সেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারা যায়। অতএব ক্রিয়ার ক্ষেত্র এই শরীরকে লাভ করিয়া ক্রিয়া করিতে কখনও অবহেলা করিও না। ইহাই ভগবদ্ বাক্যের অভিপ্রায়॥ ২৪

ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতা ষোড়শ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

———

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

(শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগঃ)

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহোরজস্তমঃ॥ ১

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য (শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া) তু (কিন্তু) শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (দেবদেবী সকলকে পূজা করে) তেষাং নিষ্ঠা কা? (তাহাদিগের নিষ্ঠা কিরূপ?) সত্ত্বং (সাত্ত্বিকী)? রজঃ (রাজসী?) আহো তমঃ (অথবা তামসী?) ॥ ১

শ্রীধর। উক্তাধিকার হেতুনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি" ইত্যনেন শাস্ত্রোক্ত বিধিম্ উৎসৃজ্য কামচারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানে অধিকারো নাস্তি ইত্যুক্তং। তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিম্ অধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্র ইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তম্ উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানা ন গৃহ্যন্তে, তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা। ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধে অর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি। তান্ এব অধিকৃত্য "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা" "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ। অতো নাত্র শাস্ত্রোল্লঙ্ঘিনঃ গৃহ্যন্তে, অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা বা আলস্যাদ্বা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নম্ অকৃত্বা কেবলম্ আচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে। অতোঽয়মর্থঃ—যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্বা অনাদৃত্য কেবলম্ আচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে, তেষাং তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি কিং সত্ত্বম্? আহো কিং বা রজঃ? অথবা তম ইতি? তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃসংশ্রিতা বা? তমঃসংশ্রিতা বা? ইত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজসতামসত্বাৎ ত্রিধা সন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতাঃ তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাত্মজ্ঞানে অধিকারঃ স্যাৎ অন্যথা ন ইতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। ["উক্ত তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারের হেতু সমূহের মধ্যে সাত্ত্বিকী যে শ্রদ্ধা তাহাই মুখ্য, এইজন্য সপ্তদশ অধ্যায়ে তিন প্রকার গৌণ শ্রদ্ধার ভেদ কথিত হইতেছে।" পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে 'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য' ইত্যাদি শ্লোকে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞানে অধিকার নাই—ইহা বলা হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া কামাচার (যথেচ্ছাচার) ব্যতিরেকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তির (তত্ত্বজ্ঞানে) অধিকার

আছে কি না—ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া]—অর্জ্জুন বলিলেন। এখানে "শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে যজ্ঞ করে"—ইহার দ্বারা শাস্ত্রার্থ বুঝিয়াও তাহার উল্লঙ্ঘন করে যাহারা—সেই সকল ব্যক্তিরা এখানে গ্রহণীয় নহে, কারণ তাহাদের পক্ষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজন সম্ভব নহে। আস্তিক্য বুদ্ধিই শ্রদ্ধা। শাস্ত্রে জ্ঞানবান ব্যক্তির শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে শ্রদ্ধা সম্ভবপর নহে। যেহেতু তাহাদিগকে গ্রহণ করিলে "শ্রদ্ধা ত্রিবিধ, সাত্ত্বিকগণ দেবতাদিগকে যজন করেন" ইত্যাদি বিষয় যাহা পরে বলিবেন তাহার অনুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি হয়। অতএব শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনকারিগণ এখানে গ্রহণীয় নহে। তবে যাহারা ক্লেশবুদ্ধিতে বা আলস্য বশতঃ শাস্ত্রার্থ জ্ঞানে প্রযত্ন না করিয়া কেবল আচার পরম্পরা বশতঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কোন দেবতারাধনে প্রবৃত্ত যাহারা, তাহারাই এস্থলে গ্রহণীয়। অতএব এই শ্লোকের এই অর্থ হয় যে যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি সকলকে ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দুঃখ বুদ্ধিতে অথবা আলস্য বশতঃ অনাদর করিয়া কেবল আচার প্রামাণ্যবশতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজ্ঞ করিয়া থাকে, তাহাদের নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা আশ্রয় কি প্রকারের? তাই বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (হে কৃষ্ণ) তাহাদের ঐ নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক অর্থাৎ সেই যে তাহাদের দেবপূজা-প্রবৃত্তি তাহা কি সত্ত্বসংশ্রিত অথবা রজঃসংশ্রিত কিম্বা তমঃসংশ্রিত? (ইহাই অর্থ)। শ্রদ্ধার সাত্ত্বিকতা হেতু এবং ক্লেশবুদ্ধি ও আলস্যবশতঃ শাস্ত্রে অনাদরের রাজসিকত্ব ও তামসিকত্ব দোষ বিধায় ত্রিধা সন্দেহ। তাহাদের শ্রদ্ধাযুক্ত নিষ্ঠা হেতু তাহাদিগকে সাত্ত্বিক বলিয়া সন্দেহ হয়, আবার ক্লেশবুদ্ধি ও আলস্য হেতু শাস্ত্রে অনাদর রাজস বা তামস ভাব সূচিত করে। সুতরাং প্রশ্ন এই যে যদি ঐ সকল ব্যক্তি সত্ত্বসংশ্রিত হয়, তবেই তাহাদের যথোক্ত আত্মজ্ঞানে অধিকার থাকিতে পারে, অন্যথা তাহাদের অধিকার নাই॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের তেজের দ্বারায় অনুভব হইতেছে ঃ—যে কেহ শাস্ত্রবিধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থেকে কর্ম্ম যে করে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত তাহার নিঃশেষরূপে স্থিতি সত্ত্ব, রজঃ তমঃ কর্ম্মেতে কি প্রকার?—"কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা করতঃ নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারা অসুর-সম্প্রদায়। (২) যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ বিদিত হইয়া তদনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেব-সম্প্রদায়। (গীতার্থ-সন্দীপনী)। (৩) কিন্তু আর এক প্রকারের সম্প্রদায় আছেন যাহারা আস্তিক্যবুদ্ধিশালী, দেবপূজাদিতে বা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলিতে অশ্রদ্ধা নাই, বরং তাহার অনুষ্ঠান যথাসময়ে যাহা করিবার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা পণ্ডিত নহেন, শাস্ত্রবিধি ঠিকমত জানেন না বা জানিবার চেষ্টাও করেন না, তাঁহাদের কৃত পূজা যজ্ঞাদি ঠিক যথাশাস্ত্রমত হইল কি না, এ বিষয়ের কোন খবরও রাখেন না, তবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহা করিয়া যান—এই শ্রেণীর লোকদিগের একদিকে যেমন শ্রদ্ধা, অন্যদিকে শাস্ত্রবিধির যথাযথ পালনে তাঁহারা শিথিল ভাবাপন্ন—তাদৃশ লোকদিগের যে শ্রদ্ধা তাহা সাত্ত্বিক হইবে, অথবা রাজসিক বা তামসিক হইবে?

প্রকৃত পূজা যাহা তাহা সাধারণভাবে বা সকলের দ্বারা হইবার নহে। শাস্ত্রবিহিত ভাবে পূজা বা যাগযজ্ঞাদি করা কঠিন, বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে। শাস্ত্রের বিধি বিধানানুসারে যে পূজা তাহা অল্প লোকেই করিতে পারে, কারণ আমরা সে বিধান সকল জানি না, জানিলেও তাহা করিতে পারা আমাদের সকলের সাধ্যের মধ্যে নহে। এইজন্য বর্ত্তমান কালে যে পূজা বা যজ্ঞাদি হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রবিধি মত হয় না। তথাপি কুলপরম্পরানুযায়ী গৃহদেবতা বা বিশেষ সময়ের বিশেষ পূজা যে আমরা করিয়া থাকি তাহা বিধিমত না হইলেও শ্রদ্ধার অভাব হয়তো তাহাতে নাই—এই প্রকারের যে নিষ্ঠা তাহা কোন্ শ্রেণীর নিষ্ঠা? সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক? এই শ্লোকের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এই—কাজ সকলেই করে, একজন সামান্য লোক হইতে অসাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলকেই কোন না কোন কর্ম্ম করিতে হয়। অত্যন্ত সংসারাসক্ত দুর্জ্জন ব্যক্তিও কর্ম্ম করে, আবার নিঃস্বার্থ সাধু ব্যক্তিও পরের জন্য কত পরিশ্রম করেন। এই সকল শ্রেণীর লোকই হয়তো সাধনায় প্রযত্ন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের নিষ্ঠার পার্থক্য যথেষ্ট। একজন ক্রিয়া করেন এই জন্য যে শরীর ভাল থাকিবে বলিয়া, কেহ সাধনা করেন লোকের উপর প্রভুত্ব করিবেন বলিয়া, কেহ করেন কেবল লোককে দেখাইবার জন্য, আবার কেহ কেহ সাধন করেন আত্মস্বরূপকে বিদিত হইবার জন্য। মনুষ্য জন্মের ইহাই সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য, এইজন্য তাঁহারা অন্য সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া কেবল যাহাতে আত্মজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্যই তাঁহারা প্রযত্ন করিয়া থাকেন। এই সকল শ্রেণীর নিষ্ঠা গুণযুক্ত অর্থাৎ কাহারও বা সাত্ত্বিক নিষ্ঠা, কাহারও রাজসিক এবং কাহারও বা তামসিক। কিন্তু আর এক প্রকারের কর্ম্মী আছেন যাঁহাদের কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন চলিয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য যথাবিহিত কর্ম্ম করিয়া যান, অথচ ঐ সকল কর্ম্মে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না। এই ভাবে কর্ম্ম করিতে সকলেই তো পারে না। যাঁহারা সাধন প্রভাবে ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সেই অবস্থায় থাকিয়া জগতের সকল ব্যবহারই যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রবিধিতে না থাকিয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকিয়া ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ক্রিয়া করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সেই ফলাকাঙ্ক্ষা বিষয়ে যে নিষ্ঠা বা দৃঢ়রূপে স্থিতি, তাহা কি ফল প্রসব করে? তাঁহাদের শ্বাস তো সুষুম্নায় চলে না, সুতরাং মনে তো সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা হয় না, এবং সাত্ত্বিকী না হইলে গুণাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া যায় না। তাঁহাদের শ্বাস ইড়া পিঙ্গলাতেই বেশীর ভাগ চলে, কিন্তু তবুও ক্রিয়াতে নিষ্ঠা থাকায় প্রত্যহ কোন না কোন রকমে করিয়া চলেন। তাঁহাদের এই প্রকারের আচরণকে কি বলা যাইবে? কেহ কেহ আছেন যাঁহারা শাস্ত্র মানেন, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজার্চ্চনাও করিয়া থাকেন, কিন্তু বিধিমত পূজা করিতে হইলে যেরূপ সাধনশীল হওয়া আবশ্যক তাঁহারা সেরূপ সাধনসম্পন্ন নহেন। তাঁহাদের কৃত পূজার্চ্চনা কোন্ গুণের কার্য্য হইবে ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। অনেক ক্রিয়াবানের ক্রিয়ার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু যে প্রণালীতে ক্রিয়া করিলে ঠিক বিধিসঙ্গত সাধনা হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না, বা করিতে পারেন না, তাদৃশ ক্রিয়াবানেরাও ক্রিয়ার ফল লাভে সমর্থ হন অথবা বঞ্চিত হইয়া থাকেন? ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

(মুখ্যশ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, গৌণশ্রদ্ধা ত্রিবিধা)

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। দেহিনাং (দেহিগণের) সা শ্রদ্ধা (সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (স্বাভাবিক, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারপ্রসূত) এব চ (আর তাহা) সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী চ (সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী) ইতি ত্রিবিধা ভবতি (এই তিন প্রকারই হয়) তাং শৃণু (তাহা শুন) ॥ ২

শ্রীধর। অত্র উত্তরং শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বর-পূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ স্বভাবজাঃ—স্বভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারঃ, তস্মাৎ জাতা। স্বভাবম্ অন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোত্থং বিবেকজ্ঞানং। তত্তু তেষাং নাস্তি। অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেন ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণু। তদুক্তং—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন" ইত্যাদিনা ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [ইহার উত্তর]—শ্রীভগবান বলিলেন। শ্লোকের অর্থ এই যে শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত জনগণের পরমেশ্বর-পূজাবিষয়া একমাত্র সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই হইয়া থাকে; কিন্তু লোকাচারানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত জনগণের যে শ্রদ্ধা,—তাহাই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে। তাহার কারণ—তাহাদের শ্রদ্ধা "স্বভাবজা" অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কার-জাত। স্বভাবকে অন্যথা করিতে শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানই সমর্থ; তাহা তাহাদের (লোকাচারানুযায়ী যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে) নাই, অতএব কেবল পূর্ব্ব-স্বভাবানুযায়ী (বা সংস্কার বশতঃ) যে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে; তাহা তিন প্রকার। সেই ত্রিবিধা শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রবণ কর। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—"নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই হইয়া থাকে" ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে ঃ—তিন রকমের শ্রদ্ধা হইতেছে—সাত্ত্বিকী, রাজসিক, তামসিক।—শ্রদ্ধা তিন প্রকারের, এবং তাহা প্রাণি-গণের 'স্বভাবজ'—অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্মাদি সংস্কার এবং যাহা মরণকালে অভিব্যক্ত হয়। সেই পূর্ব্বসংস্কারই বর্ত্তমান দেহে স্বভাব বলিয়া কথিত হয়। সেই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতি-ভেদে তিন প্রকারের হইয়া থাকে। এই স্বভাব লইয়াই মনুষ্য জন্মিয়াছে। যাহার যেরূপ পূর্ব্বসংস্কার, তাহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা শিক্ষা না পাইলেও হইবে। এইরূপ শ্রদ্ধাও প্রকৃতি অনুসারে যে ত্রিবিধ হয়, তাহারই কথা এখানে ভগবান বলিতেছেন। শাস্ত্রাদি পাঠ, সাধুসঙ্গ ও সাধনজনিত যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সাধকদিগের হইয়া থাকে, তাহার কথা এখানে বলিতেছেন না। মনে অনবরত তিনটি গুণ খেলা করিতেছে, মন যখন যে গুণে অবস্থিতি করে, তদনুসারে তাহার শ্রদ্ধা—সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী হইয়া থাকে। এই গুণ জীবের প্রকৃতিগত,

(পুরুষ শ্রদ্ধাময়)

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

সুতরাং শ্রদ্ধাও প্রকৃতির ভাবানুযায়ী তিন প্রকারের হইবে-ই। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে এই তিন গুণের অবিরত পরিবর্ত্তন হেতু শ্রদ্ধারও অনবরত পরিবর্ত্তন হইতেছে। শ্বাস ইড়া-পিঙ্গলায় থাকিলে, শ্রদ্ধাও তদনুযায়ী রাজসিক বা তামসিক হইতে থাকিবে। সুষুম্নায় শ্বাস বহিলেই তখন সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। স্বাভাবিক শ্রদ্ধা পূর্ব্বকর্ম্মানুযায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা—সাধন ভজন সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয় ॥ ২

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) সর্ব্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সত্ত্বানুরূপা ভবতি (নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হইয়া থাকে); অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (এই জীব শ্রদ্ধাময়), যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ এব সঃ (তিনি সেইরূপই) ॥ ৩

শ্রীধর। নমু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী এব সত্ত্বকার্য্যত্বেন ত্বয়ৈব ভগবতা উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। যথোক্তং— "শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ ॥"
ইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য বৃত্তয় ইতি। অতঃ কথং তস্যাঃ ত্রৈবিধ্যম্ উচ্যতে? সত্যম্। তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটতে ইত্যাহ—সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা—সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী, সর্ব্বস্য—বিবেকিনঃ অবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি। তস্মাৎ অয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ—শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। তদেবাহ—'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ'—যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য, "স এব সঃ"—তাদৃশঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ। যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষঃ স পুনঃ তাদৃশ সত্ত্বসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্ত এব ভবতি। যস্তু রজস উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনঃ তাদৃশ এব ভবতি। যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনঃ তাদৃশ এব ভবতীতি। লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষু এবং সাত্ত্বিক-রাজস-তামস-শ্রদ্ধাব্যবস্থা। শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [সত্য বটে শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীই হয়, যেহেতু হে ভগবন্ তুমিই উদ্ধবকে বলিয়াছ যে—শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তপস্যা, সত্য, দয়া, স্মৃতি, তুষ্টি, ত্যাগ, অস্পৃহা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, দয়াদি ও আত্মনির্বৃতি-ইহারা সকলেই সত্ত্বগুণের বৃত্তি। অতএব কিরূপে (শ্রদ্ধাকে) ত্রিবিধ বলা সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে এ কথা সত্য, তথাপি সত্ত্ব, রজঃ ও তমের মিশ্রণে সত্ত্ব ত্রিবিধ হয় বলিয়া, শ্রদ্ধারও ত্রিবিধতা ঘটে—ইহাই বলিতেছেন]—সত্ত্বানুরূপ অর্থাৎ সত্ত্বের তারতম্যানুসারে বিবেকী ও অবিবেকী—সকলেরই শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। সেই জন্য এই লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ ত্রিবিধ শ্রদ্ধার দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয়। তাই বলিতেছেন "যো যচ্ছ্রদ্ধ" অর্থাৎ যাহার যাদৃশী শ্রদ্ধা "স এব সঃ"

সে তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়। যে পূর্ব্বে সত্ত্বোৎকর্ষতা হেতু সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে সেই সংস্কার-হেতু পুনরায় সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাযুক্তই হয়। যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে রজোগুণের উৎকর্ষতা হেতু রাজস-শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে পুনরায় সেইরূপ রাজস-শ্রদ্ধাযুক্ত হয় এবং তমোগুণের উৎকর্ষতা হেতু যে তামস-শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে পুনরায় তামস-শ্রদ্ধাযুক্তই হইয়া থাকে। এই জন্য লৌকিক আচারানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের জন্যই এই প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধার ব্যবস্থা। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানজনিতবিবেকযুক্তের স্বভাব-বিজয়হেতু একমাত্র সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই হইয়া থাকে। এই প্রকরণের ইহাই অর্থ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্বগুণে অর্থাৎ ক্রিয়া করে ব্রহ্মের অণুতে থেকে এই পুরুষোত্তম ইনিই ব্রহ্মময়—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনিই ব্রহ্ম।—বিশিষ্টসংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণকেই "সত্ত্ব" বলে। অন্তঃকরণের প্রকাশস্বভাবহেতুই উহাকে "সত্ত্ব" বলা হয়। যে অন্তঃকরণে যে প্রকারের সংস্কার প্রবল থাকে, সেই সংস্কার অনুরূপই তাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। গুণ সংমিশ্রণহেতু অন্তঃকরণেরও তারতম্য হইয়া থাকে—সেই হেতু শ্রদ্ধারও বৈচিত্র্য ঘটে। শ্রদ্ধা—অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, এইজন্য কেহই একেবারে শ্রদ্ধাহীন হইতে পারে না। জীবের মধ্যে যে গুণই প্রবল থাকুক, সত্ত্বগুণ কিছু থাকেই, সুতরাং শ্রদ্ধাও কিছু থাকিবেই। তাই জীবকে "শ্রদ্ধাময়" বলা হইয়াছে। অবশ্য অত্যন্ত তমঃপ্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে সত্ত্বগুণ অত্যন্ত অস্ফুট থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিকী বৃত্তির কার্য্য অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাহারা কেবল লোকাচার-মাত্র অনুসরণ করিয়া কার্য্য করে তাহাদের শ্রদ্ধার উৎকর্ষ হয় না। শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন। গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা, কিন্তু অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে সাত্ত্বিকী দৃঢ়-শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সাধকের দৃঢ়-শ্রদ্ধা হইতেই সাধনবিষয়ে তাহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়। গীতা বলিয়াছেন—শ্রদ্ধাবানেরা অর্থাৎ যাঁহারা তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় তাঁহারাই জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞানলাভের পরই পরম-শান্তির উদয় হয়। ক্রিয়া মন দিয়া যিনি যত অধিক করিবেন, ততই তাঁহার সত্ত্বসংশুদ্ধি হইবে, সুষুম্নার মধ্য দিয়া প্রাণধারা প্রবাহিত হইলে ব্রহ্মাণুতে স্থিতিলাভ হইবে, এবং পরে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সাধক ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া যাইবেন।

ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব থাকে না, তখন সাধক গুণাতীত হইয়া যান। কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থা হইতে নামিয়া আসিলে অথবা ক্রিয়া করিতে করিতে যখন মন কিছু স্থির হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরোধ-অবস্থাপ্রাপ্তি হয় নাই, তখন মনে বিষয় চিন্তা না থাকায় উহা সত্ত্বগুণের অবস্থা বটে এবং ঐ অবস্থা প্রাপ্তি হইলে তখন সাধনায় যে উগ্র প্রযত্ন হয়, তাহা হইতে ধ্যান ও ধ্যান হইতে সমাধি আসন্ন হয়। মুক্তির জন্য সুতীব্র ইচ্ছা হেতু মোক্ষলাভে যে প্রযত্ন হয়, তাহাই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা—'চেতসঃ সম্প্রসাদঃ'—এই শ্রদ্ধা হইতে চিত্তের প্রসন্নতা হয় অর্থাৎ চিত্তে তখন মল-ভাগ বেশী না থাকায় সাধনাতে প্রযত্নের আধিক্য হয়, প্রযত্নের আধিক্য হইতে চিত্ত মহাস্থিরতার মধ্যে প্রবেশ করে। সমুদ্রের গভীর অতলে ডুব দিয়া যেমন লোকে রত্ন সংগ্রহ করে,সেইরূপ সমাধির যোগী জ্ঞানরত্ন

(শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত—গুণ-ভেদে পূজার প্রকার-ভেদ—
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তির পূজা)

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

লাভে কৃতকৃত্য হন। সত্ত্বগুণ যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই অণু সদৃশ ব্রহ্ম অনুভূত হইতে থাকে। এই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ হইতে সম্ভূত যে প্রকৃতি—তাহা ব্রহ্মেরই বিকার। ক্রিয়া যত বেশী করিবে ততই তুমি গুণ অতিক্রম করিয়া গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে। সাধনার ক্রম ও তাহার ফল নিম্নে লিখিত হইল—

কূটস্থই দেবতা, সেই কূটস্থ-মধ্যে নারায়ণ, কূটস্থে মন রাখিলে কূটস্থ যেমন সর্ব্বব্যাপক, সাধকের মনও সেইরূপ সর্ব্বব্যাপক হয়। কূটস্থই ব্রহ্ম, গুরু ও আচার্য্য ; কূটস্থে থাকিলে চিত্তের প্রসন্নতা, হয় তাহাই সত্ত্বসংশুদ্ধি ও চিত্তের সত্ত্বগুণে অবস্থিতি। পরম পদ আত্মাতেই রহিয়াছে, যিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বদা কূটস্থে মন রাখিতে পারেন—তিনিই ঋষি। আত্মায় লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস হইতেই আত্মাতে মনের স্থিতি হয় ও মন আত্মার সহিত এক হইয়া যায়। আত্মাই কূটস্থ এবং ব্রহ্মাণু। ব্রহ্মাণুর মধ্যে ত্রিলোক বর্ত্তমান, ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে—স্বর্গ, মর্ত্ত সর্ব্বত্রই গমনাগমন করা যায়। কারণ স্বর্গ মর্ত্ত সমস্তই সেই ব্রহ্মের অণুর মধ্যে, সাধক সেই ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও যে সর্ব্বত্রই যাইতে পারিবেন, বা থাকিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কূটস্থের মধ্যেই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, যিনি শক্তির সহিত সাধন করেন, তিনি এই শরীরের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পান। তিনিই প্রকৃষ্টরূপে শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বত্রে এই জন্য তাঁহাকে "বিষ্ণু" বলে ; তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবান বলিয়া তাঁহার নাম "ভগবান"। আবার কূটস্থের মধ্যে তিনি পরম নির্ম্মল পুরুষোত্তম—এই জন্য তাঁহার নাম শিব। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় তিনি আপনাতে আপনি। তিনি সকল রসের রস অথচ স্বয়ং অরস। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই বিজ্ঞানময় অবস্থা, সেখানে আলোকও নাই—অন্ধকারও নাই—তখন তিনি সর্ব্বময়, কারণ "সর্ব্ব" তাঁহারই প্রকাশ। এই জন্য ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যে থাকে—সে সর্ব্বজ্ঞ হয়॥ ৩

অন্বয়। সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) দেবান্ যজন্তে (দেবগণের পূজা করেন) রাজসাঃ (রাজসিকগণ) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষ-রাক্ষসদিগকে), অন্যে (অপর) তামসাঃ জনাঃ (তামসিক ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে (প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে)॥ ৪

শ্রীধর। সাত্ত্বিকাদি-ভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনা সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে—পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে। এতেভ্যঃ অন্যে বিলক্ষণাঃ তামসাঃ জনাঃ তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদি প্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং পূজাভিরুচিভিঃ তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিত্বং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ তাহাদের কার্য্য ভেদের দ্বারা দেখাইতেছেন]—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের পূজা করেন। রাজসব্যক্তি রজঃপ্রকৃতি যক্ষরাক্ষস-

(আসুরিকের পূজা)

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫

গণের পূজা করেন। এতদুভয় হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন যে তামসিকগণ তাহারা তমঃপ্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেবতা অর্থাৎ কূটস্থের উপাসনা সত্ত্বগুণাবলম্বীরা করে রজোগুণেতে ধনের উপাসনা করে—এবং ভোগ, ও তমোগুণেতে মৃত্যুর ও পঞ্চভূতের উপাসনা করে।—যাঁহাদের সত্ত্ব-প্রকৃতি স্বাভাবিক তাঁহারা দেবগণের পূজা করেন। কূটস্থই পর-দেবতা, এইজন্য কূটস্থের দর্শনাদি যাঁহাদের নিত্য হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে তাঁহারা সাত্ত্বিক। এই সাত্ত্বিকাদি গুণ কোন্ ব্যক্তির মধ্যে রহিয়াছে, তাহা এইরূপে বুঝা যায় :—একই সাধন সকলকে বলা হইল, একজন কত শ্রদ্ধা সহকারে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রত্যহ কূটস্থ দর্শন ও স্থিরতার অনুভব হইতে লাগিল। কিন্তু যাহারা রাজসিক, তাহারা অর্থ ও ভোগ চায় সুতরাং তাহারা ক্রিয়া করিয়া ফল পাইতে চাহে। ক্রিয়া করিয়া কিরূপে অন্ততঃ দুই চারিটা ছোট ছোট অনায়াসলভ্য সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার দিকেই তাহাদের বেশী লক্ষ্য থাকে। যাহারা ক্রিয়া করে না, তাহারা কুবেরাদি যক্ষগণকে ও নৈঋতাদি রাক্ষসগণকে পূজা করিয়া ধন-লাভের আশা করিয়া থাকে। ইহার ফলে তাহারা আরও কামজালে জড়িত হইয়া মোক্ষের পথকে অবরুদ্ধ করে। যাহারা তমোগুণী, তাহারা ভূত প্রেতাদির পূজা করে। অনেক অসভ্য জাতিরা—এইরূপ দেবতাকেই পূজা করে। আবার সভ্য জাতির মধ্যেও অনেক পুরুষ বুজরুকি দেখাইয়া লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ভূত-পিশাচাদির উপাসনা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভও করে, কিন্তু সেই সিদ্ধির ফলে তাহাদের আরও অধোগতি হয়। আবার কেহ কেহ ভূত-পঞ্চকের উপাসক, তাহাদের দৃষ্টি স্থূল ; সেইজন্য জল, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চীকৃত ভূতাদির উপাসনায় তাহারা কালক্ষেপ করে, কিন্তু জল অগ্নির মধ্যে যে একমাত্র পর-দেবতা রহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারে না ; এই জন্য তাহারা অমৃতত্ব লাভ না করিয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর সেই সকল স্বধর্মভ্রষ্ট প্রেতাদির উপাসকগণ বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়া উল্কামুখ কট-পূতনাদি নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪

অন্বয়। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কার সংযুক্ত) কামরাগবলান্বিতা (কামনা, আসক্তি ও বলযুক্ত) যে অচেতসঃ জনাঃ (যে সকল অবিবেকী জন) অশাস্ত্রবিহিতং (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং তপঃ (ভয়ঙ্কর তপস্যা) তপ্যন্তে (তপঃ আচরণ করে) ॥ ৫

শ্রীধর। রাজস তামসেষ্বপি পুনর্ব্বিশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রবিধিং অজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীন পুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকী এব ভবন্তি। কেচিৎ তু মধ্যমা রাজসা ভবন্তি। অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনঃ অত্যন্তং মন্দভাগ্যাঃ তে পূর্ব্বানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং—ভূতভয়ঙ্করং তপঃ তপ্যন্তে

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬

—কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতবঃ দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ। তথা কামঃ—অভিলাষঃ, রাগঃ—আসক্তিঃ, বলম্—আগ্রহঃ। এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ, তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি ইত্যুত্তরেণ অন্বয়ঃ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [রাজস ও তামসগণের মধ্যেও বিশেষত্ব আছে, তাহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—শাস্ত্রবিধি না জানিয়াও কেহ কেহ প্রাচীন পুণ্যসংস্কার বশতঃ যাহারা উত্তম এইরূপ ব্যক্তিই সাত্ত্বিক হয়। কেহ কেহ বা মধ্যম তাহারা রাজস হয়, কিন্তু যাহারা অধম তাহারা তামস হইয়া থাকে। যাহারা আবার অতি মন্দভাগ্য তাহারা গতানুগতিক ভাবে পাষণ্ড সঙ্গে পড়িয়া তদাচারানুবর্ত্তী হইয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোর অর্থাৎ ভূতভয়ঙ্কর তপস্যা করে। তাহার কারণ এই যে, তাহারা দম্ভ ও অহঙ্কার সংযুক্ত এবং কাম (অভিলাষ), রাগ (আসক্তি) আর বল অর্থাৎ আগ্রহ দ্বারা অন্বিত হইয়া থাকে। "তাহাদিগকে নিশ্চয় আসুর বলিয়া জানিবে" এই উত্তর শ্লোকের সহিত অন্বয়॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া না ক'রে যে ঘোর তপস্যা করে পঞ্চতপাদি, দেমাক অহঙ্কারের সহিত ইচ্ছা এবং ক্রোধ ও বলপূর্ব্বক।—দম্ভ ও অহঙ্কারের সহিত যাহাদের নিত্যসম্বন্ধ তাহারা কাম, রাগ ও বলে উন্মত্ত হইয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যা করে—শরীরকে শুষ্ক করে অর্থাৎ অতি ক্ষীণ করিয়া ফেলে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য উপায় দ্বারা অচৈতন্য করিয়া রাখে, আবার এক এক সময়ে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় পাষণ্ডের মত ঘোর অত্যাচার করে। অস্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়কে প্রক্ষীণ করিলেই সংযম অভ্যাস হয় না, এবং সংযমের ফলও লাভ করিতে পারে না। তাহারা মনে করে এই সকল অস্বাভাবিক উপায়ে তপস্যা করিলে শীঘ্রই তপস্যার ফল লাভ হইবে। কাহারও কাহারও এইরূপ তপস্যার ফল লাভও কিছু হয়, কিন্তু বিবেক বৈরাগ্য না থাকায় অহঙ্কার অভিমান বশতঃ শাস্ত্র গুরু দেবতার অবহেলন করিয়া তাহারা ঘোর নরকের পথ পরিষ্কার করে। পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপু, রাবণাদিও ঘোর তপস্যা করিয়াছিল, তপস্যার ফল লাভ ঐশ্বর্য্য শক্তি ও সমৃদ্ধি তাহাদের প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল, কিন্তু বিবেক বৈরাগ্যের অভাবে অসংযমাদির জন্য তাহারা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্য আসুরী তপস্যা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। যাহাদের শরীর ইন্দ্রিয় খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়, তাহাদের বিষয়াসক্তি কম হয় না। লোভ বশতঃ তাহারা সকাম তপস্যায় আত্মনিয়োগ করে। এতদ্বারা মনোবুদ্ধি আরও বিমলিন হওয়ায় তাহারা আত্মদর্শনের অনুপযুক্ত হইয়া যায়॥ ৫

অন্বয়। অচেতসঃ জনাঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) শরীরস্থং (দেহস্থিত) ভূতগ্রামং (পঞ্চভূত সমূহকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ (এবং শরীর মধ্যস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে) কর্ষয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) [যে তপশ্চরন্তি—যাহারা তপস্যা করে] তান্ (তাহাদিগকে) আসুর নিশ্চয়ান্ (আসুর নিশ্চয় অর্থাৎ অসুরের ন্যায় যাহাদের নিশ্চয়) বিদ্ধি (জানিও)॥ ৬

শ্রীধর। কিঞ্চ—কর্ষয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং—আরম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং, ভূতানাং—পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং—সমূহং কর্ষয়ন্তঃ—বৃথৈব উপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বন্তঃ, অচেতসঃ—অবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং, দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্ষয়ন্তো যে তপঃ চরন্তি তান্ আসুরনিশ্চয়ান্—আসুরঃ অতিক্রূরো নিশ্চয়ং যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—শরীরস্থ অর্থাৎ শরীরারম্ভকরূপে দেহে অবস্থিত ভূতগ্রাম অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে, বৃথা উপবাসাদি দ্বারা কৃশ করিয়া অবিবেকিগণ অন্তর্য্যামিরূপে দেহমধ্যে স্থিত যে আমি সেই আমাকেও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন দ্বারা ক্লেশ দিয়া তপশ্চরণ করে, তাহাদিগকে অতিক্রূর নিশ্চয় বলিয়া জানিবে ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা - শরীর শুকিয়ে ফেলে ইন্দ্রিয়াদি সকলকে অচৈতন্য রেখে অর্থাৎ কূটস্থে না থেকে যে শরীর মধ্যে আমিই আছি আমাকে এরূপ ক্লেশ দিয়া যে তপস্যা করে সে আসুরী তপস্যা হইতেছে অর্থাৎ ভাল নয়—সকাম।—দেহাভ্যন্তরে আত্মা সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, আসুরবুদ্ধিরা সেই আত্মাকেও কৃশ করে। আত্মাকে কৃশ করার অর্থ ইহা নহে যে আত্মা দেহাদির ন্যায় ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হইয়া যান। আত্মা কৃশ তখনই হন যখন ঈশ্বরবাক্য অবহেলা করা হয়। শাস্ত্রাদি না মানা বা তদনুসারে কার্য্যাদি না করিলেই ঈশ্বরবাক্য অবহেলা করা হয়। এবং তাহা হইতে আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান আবৃত হইয়া যায়। আত্মার উপর এইরূপ আবরণ যত পড়িবে, ততই আমাদের মনঃবুদ্ধি আর আত্মার স্বপ্রকাশ ভাবকে অনুভব করিতে পারিবে না, ইহাই আত্মাকে কৃশ করা। "সূর্য্যকোটিপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্"—যোগীরা আত্ম-জ্যোতিঃর প্রকাশ ঐরূপই অনুভব করেন, কিন্তু যাহারা অনাচারী বা অত্যাচারী তাহারা সাধনতন্ত্রের কঠোর নিয়মাদি পালন করিতে পারে না। মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় না হওয়ায় বিষয় ভোগে অতিরিক্ত রুচির হ্রস্বতা ঘটে না, ইহার ফলে দেহেন্দ্রিয়াদি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, সুতরাং জ্যোতিঃর ধারক দেহাদি বলশূন্য হওয়ায় আত্মার প্রতিবিম্ব ঐ সকলের মধ্য দিয়া সুন্দর রূপে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। যেমন কাচ ও শিলার মধ্যে স্বচ্ছতার তারতম্য হেতু জ্যোতিঃর প্রকাশের তারতম্য ঘটে, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়াদি সত্ত্বভাবাপন্ন না হইলে তন্মধ্যে আত্মজ্যোতিরও প্রকাশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য যাহারা পাপাদি কর্ম্ম দ্বারা শরীর ইন্দ্রিয় মনকে কলুষিত করে, তাহাদের মধ্যে আত্মজ্যোতির প্রকাশও তদ্রূপ তেজোহীন হয়, ইহাই "আত্মস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে" বলার উদ্দেশ্য। সংযম মোটেই নাই অথচ যোগী হইবার ইচ্ছা যেরূপ হাস্যোদ্দীপক, সেইরূপ কূটস্থে না থাকিয়া গায়ের জোরে তপস্বী সাজিতে যাওয়াও ঐরূপ অস্বাভাবিক ও নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। অনেকে মনে করেন তন্ত্রমতে সাধনাদিও বেদবিরুদ্ধ ব্যাপার। কেন? তন্ত্রের মত বেদেও কি পশু হননাদির উপদেশ নাই? বেদকে অমান্য করা এক জিনিষ, এবং বেদবিধি পালনে অক্ষমতা প্রযুক্ত শিবোক্ত তন্ত্রানুসারে কার্য্য করা 'অশাস্ত্র বিহিত কার্য্য' নহে। তন্ত্রেরও হৃদগত উদ্দেশ্য বেদোক্ত মার্গকে রক্ষা করা। যখন মানুষ কালদোষে দুষ্ট রোগগ্রস্ত হইয়া অসমর্থ হইয়া পড়ে, সেই অসমর্থ জীবকুলকে পুনরায় ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে তাহাদের ব্যাধিকে উপশম করিবার

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

চেষ্টা করাই সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য, নচেৎ স্বধর্ম্ম পালন করিবে কে? তাই দুরারোগ্য কলি-দোষ-দূষিত ব্যাধিকে উপশম করিবার জন্যই জগদ্‌গুরু মহাদেব জীবের কল্যাণার্থ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রমতে সাধন করিলেই যে 'অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপস্য' হয় তাহা নহে। "ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণ হেতবে"—জীবের নিস্তারের নিমিত্তই তন্ত্রশাস্ত্র আপনি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তন্ত্রে যে ভোগ সাধন বস্তু লইয়া সাধনার কথা আছে, তাহারও উদ্দেশ্য তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ ভোগবাসনা নিবৃত্ত করিয়া দেওয়া। পরে নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়া সাধক মোক্ষলাভের উপযুক্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য তন্ত্রে বলিয়াছেন—

"যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ, যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
দেবীপদাম্ভোজ-সমাশ্রিতানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥"

যিনি ভোগী তিনি মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না, মুমুক্ষু ব্যক্তিরও ভোগ লাভ হইতে পারে না। যিনি জগন্মাতার চরণ পদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি তন্ত্রোক্ত বিধানমত উপাসনা করেন, তিনি ভোগ ও মোক্ষ দুই প্রাপ্ত হন। এইজন্য তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যেও যোগাভ্যাস বিহিত হইয়াছে; যাঁহারা তত্ত্বান্বেষী তাঁহারা পঞ্চ মকারের গূঢ় উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সাধনা করিলেই আর কোন গোলযোগ হয় না; আর যাঁহারা তাহা না করিয়া স্থূলভাবেই সাধন করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারাও যদি প্রকৃত সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিয়া থাকেন তবে তাঁহার নির্দ্দেশ মত চলিলে তাঁহারাও কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। স্বমাংস-হোম বা ব্রাহ্মণ-রক্ত দ্বারা হোম করিয়া যে ইষ্টদেবতার তর্পণ বিধি আছে—তাহার অর্থ সাধারণে জানে না, এই জন্য গুরুমুখে তন্ত্রাদি শাস্ত্র জানিয়া পড়িতে হয়। মহাভারতের টীকাকার শ্রদ্ধাস্পদ নীলকণ্ঠ জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য ও তন্ত্রের সাঙ্কেতিক অর্থ অবগত না হইয়া ঐ সকল কথায় জীবহত্যার সূচনা হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে অশাস্ত্রবিহিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তন্ত্রোক্ত মতে সাধনা অশাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না। জীবহত্যার বিষয় বৈদিক যজ্ঞেও আছে, কিন্তু তাহারও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, বাহ্য অর্থ মাত্র লইয়া বিচার করিলে স্বয়ং বেদও "অশাস্ত্রীয়" হইয়া পড়েন।

কূটস্থে থাকাই প্রকৃত তপস্যা, তাহা না জানিয়া যাহারা ভক্তির সহিত কেবল বাহ্যানুষ্ঠানে আসক্ত হয় তাহাদের তপস্যারও কিছু ফল হয়, কিন্তু যাহারা বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে রত হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে, এবং একটা কিছু ফল পাইবার আশায় তপস্যায় রত হইয়া শরীর-মনকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে, সে তপস্যা আসুরিক তপস্যা, তাহাতে কূটস্থ দর্শনও হয় না, ক্রিয়ার পর-অবস্থাও লাভ হয় না, তাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রয়াস বলিয়া মনে হয় ॥ ৬

অন্বয়। সর্ব্বস্য (সকল প্রাণীর) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি

(সাত্ত্বিক আহার)

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

(তিন প্রকার প্রিয় হয়); তথা (সেইরূপ) যজ্ঞঃ, তপঃ, দানং (যজ্ঞ, তপস্যা ও দান) [তিন প্রকারের হইয়া থাকে] তেষাং (তাহাদের) ইমং ভেদং (এই প্রভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৭

শ্রীধর। আহারাদি ভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্তু ইত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য য আহারঃ—অন্নাদিঃ, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি। তথা যজ্ঞতপোদানানি চ ত্রিবিধানি ভবন্তি। তেষাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজস-তামসাহার-যজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহার-যজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [আহারাদির ভেদ হইতে সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ দেখাইবার জন্য ১৩টি শ্লোকে বলিতেছেন] - সকল লোকেরই যে আহার "অন্নাদি"—তাহা যথাযথ ত্রিবিধ ভাবে প্রিয় হইয়া থাকে, সেইরূপ যজ্ঞ তপস্যা ও দানও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। তাহাদের নিম্নোক্ত ভেদ শ্রবণ কর। ইহা হইতে রাজস তামস আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিক যজ্ঞাদি সেবা দ্বারা সত্ত্ববৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য—ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিলেন ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আহার, যজ্ঞ, তপস্যা, দান তিন প্রকার তাহা বলিতেছি।—সমস্ত মনুষ্যেরই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে আহার যজ্ঞ তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ হইয়া থাকে, তাহাই ভগবান এইবার বলিবেন। কে সত্ত্বনিষ্ঠ, কে রজোনিষ্ঠ এবং কে-ই বা তমোনিষ্ঠ—তাহাদের বিশেষ বিশেষ আহার্য্যের প্রতি প্রীতি দেখিয়াই বুঝা যায়। সাত্ত্বিক আহারাদি করিলেও প্রকৃতি কতকটা সত্ত্ব-ভাবাপন্ন হয়, অতএব যাহাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সাধককে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ, এবং রাজস ও তামস আহার পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করাইবার জন্যই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারাদির ভেদ ভগবান এইখানে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥ ৭

অন্বয়। আয়ুঃ, সত্ত্ব, বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ (আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসাদ ও রুচি-বৃদ্ধিকর) রস্যাঃ (সরস), স্নিগ্ধাঃ (স্নেহ-ঘৃতাদিযুক্ত), স্থিরাঃ (যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী হইতে পারে) হৃদ্যাঃ (প্রীতিকর) আহারাঃ (আহার সকল) সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ (সাত্ত্বিকগণের প্রিয়) ॥ ৮

শ্রীধর। তত্র আহার-ত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুঃ—জীবিতম্, সত্ত্বম্—উৎসাহঃ, বলং—শক্তিঃ, আরোগ্যং—রোগরাহিত্যম্, সুখং—চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিঃ—অভিরুচিঃ। আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ। তে চ রস্যাঃ—রসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ—স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা—দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ—দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ। এবম্ভূতা আহারাঃ—ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

(রাজসিক আহার)

কট্‌্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আহারের ত্রিবিধতা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আয়ু অর্থাৎ জীবন, সত্ত্ব অর্থাৎ উৎসাহ, বল—শক্তি, আরোগ্য—রোগরাহিত্য, সুখ অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদ, প্রীতি অর্থাৎ অভিরুচি—ইহাদের বিশেষরূপ বৃদ্ধিকর, অথচ (সেই সব আহার্য্যগুলি) রসবস্তু, স্নেহযুক্ত এবং যাহার সারাংশ দেহে চিরকালাবস্থায়ী হয়, এবং তাহা হৃদ্য অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম অর্থাৎ মনের আনন্দ হয়—এইরূপ যে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি, তাহা সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয় ক্ষীরে, সত্ত্বগুণ ঘৃতে, বল দুগ্ধে, আরোগ্য তিক্তে, সুখ মধু, প্রীতি পায়স—রসাল জিনিষ ঠাণ্ডা; স্থিরা—হবিষ্যান্ন; হৃদ্যা—পায়স ঘৃত মধু মিশ্রিত—এই সকল সাত্ত্বিক আহার।—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের যাহা প্রিয় আহার এবং যাহা সত্ত্বগুণবর্দ্ধক তাহা কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই বলিতেছেন। (১) এরূপ আহার করিবে যদ্দ্বারা আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়—যেমন ক্ষীর। (২) যদ্দ্বারা মনের উৎসাহ ও শরীরের অবসাদ দূর হয় এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে—যেমন ঘৃত। (৩) যাহাতে বল বৃদ্ধি হয়—যেমন দুগ্ধ। (৪) যদ্দ্বারা পীড়া থাকিলে আরোগ্য প্রাপ্তি হয়—যেমন তিক্ত দ্রব্য। (৫) যদ্দ্বারা সুখ লাভ হয়—যেমন মধু। (৬) যাহা ভোজন মাত্রেই তৃপ্তি লাভ হয়—যেমন পায়স। (৭) যাহা রসযুক্ত বস্তু যেমন মিষ্টফল ও রসাদি,—রসাল বস্তু ভোজনে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। (৮) যাহা স্নিগ্ধ বস্তু—যেমন মাখন, তক্র (মাঠা) প্রভৃতি। (৯) যাহা স্থিরা—যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী ভাবে থাকে—যেমন হবিষ্যান্ন। (১০) যাহা হৃদ্যা—যে সকল বস্তু দেখিবা-মাত্র হৃদ্য (মনোরম) বোধ হয়, কোনরূপ অপবিত্রতা যাহাতে নাই—যেমন পায়স, ঘৃত, মধুমিশ্রিত আহার—ইহারাই সাত্ত্বিক আহার। যাঁহারা যোগাভ্যাসে রত, তাঁহাদের প্রথম প্রথম আহারীয় বস্তু সাত্ত্বিক না হইলে সাধনায় অনেক বিঘ্ন হয়। সাধনায় যাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া প্রতিদিন সাধনা করে তাঁহাদের শ্বাসের স্থিরতা বৃদ্ধি হয় এবং স্থিরতা বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের আহারের পরিমাণ ক্রমশঃই লঘু হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে শরীর দুর্ব্বল বা রোগগ্রস্ত হয় না ॥ ৮

অন্বয়। কট্‌্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহার সকল) রাজসস্য (রাজস ব্যক্তিগণের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) ॥ ৯

শ্রীধর। তথা—কট্‌্বিতি। অতিশব্দঃ কট্‌্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে। তেন অতি কটুঃ—নিম্বাদিঃ। অত্যম্লঃ অতিলবণঃ, অত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ। অতি তীক্ষ্ণঃ—মরীচাদিঃ। অতি-রুক্ষঃ—কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ। অতিবিদাহী—সর্ষপাদিঃ। অতিকট্‌্বাদয় আহারা রাজসস্য ইষ্টাঃ—প্রিয়াঃ। দুঃখং—তাৎকালিকং হৃদয়সন্তাপাদি। শোকঃ—পশ্চাদ্ভাবি দৌর্ম্মনস্যম্। আময়ঃ—রোগঃ। এতান প্রদদতি—প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯

(তামসিক আহার)

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—(এই শ্লোকে যে "অতি" শব্দ আছে তাহা কটু প্রভৃতি সপ্ত শব্দের সহিত সম্বন্ধ)। সেইজন্য—অতি কটু যেমন নিম্বাদি। অতি অম্ল, অতি লবণ ও অতি উষ্ণ—দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ। অতি তীক্ষ্ণ যেমন মরিচাদি। অতি রুক্ষ—যেমন কঙ্গু [কাঙ্গনি ধান্য, পীততণ্ডুলা ইহা মধুর-কষায় রস] ও কোদ্রব [কোদো নামক ধান্য বিশেষ।] অতি বিদাহী—সর্ষপাদি। অতি কটু প্রভৃতি আহার রাজসগণের প্রিয়। তাহা দুঃখ—তাৎকালিক হৃদয়সন্তাপপ্রদ, শোক—পশ্চাদ্জাত দৌর্মনস্য বা অপ্রসন্নতা, এবং আময়—রোগপ্রদ ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কষা, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, ঝাল, রুক্ষি করে যে সকল দ্রব্য, লঙ্কা, মরীচ—ইহা রাজসিক আহার— খেলে দুঃখ আর শোক হয়—ভালরূপে।—যে সকল বস্তুর সেবনে দুঃখ, শোক এবং ব্যাধি উৎপন্ন হয়, এবং যাহা—(১) অতি কটু যেমন নিম্ব, চিরেতা ইত্যাদি, (২) অতি অম্ল—কাঁচা তেঁতুল, চালতা, আমড়া ইত্যাদি, (৩) অতি লবণ (অতিশয় লবণযুক্ত না হইলে কেহ কেহ খাইতে পারে না) (৪) অতি উষ্ণ—যেমন আগজ্বলন্ত ভাত, দুধ ইত্যাদি যাহাতে জিহ্বা পুড়িয়া যায়, (৫) অতি তীক্ষ্ণ—ঝাল, লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি, (৬) অতি রুক্ষ—যে সকল দ্রব্যে রুক্ষি করে—কাউনি, কোদো প্রভৃতি স্নেহহীন দ্রব্য, চালভাজা, ছোলাভাজা ইত্যাদি। (৭) বিদাহী—যাহা খাইলে মুখের ভিতর, পেট, বুক, গলা জ্বলিয়া উঠে - যেমন সর্ষপ প্রভৃতি। এই সমস্ত দ্রব্যই রাজসগণের প্রিয়। ইহারা ভোজনকালেও দুঃখপ্রদ কারণ শরীরে কষ্ট অনুভব হয়, ইহার পরিণামও দুঃখজনক, কারণ এতদ্বারা ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সকল বস্তু সেবনে শরীর অসুস্থ হয় এবং সাধনে বিঘ্ন উৎপন্ন করে, সেইজন্য ক্রিয়াবানেরা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন ॥ ৯

অন্বয়। যাতযামং (অর্দ্ধপক্ব বা যাহা এক প্রহর পূর্ব্বে পাক হইয়াছে, শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত) গতরসং (রসশূন্য, যাহার সার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে) পূতিপর্য্যুষিতং চ (পূর্ব্বদিন পক্ব, বাসি ও দুর্গন্ধযুক্ত) উচ্ছিষ্টম্ অপি (এবং অপরের ভুক্তাবশিষ্ট) অমেধ্যং চ (এবং অপবিত্র) যৎ ভোজনং (যে ভোজ্যবস্তু) [তৎ—তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামসগণের প্রিয়) ॥ ১০

শ্রীধর। তথা—যাতযামমিতি। যাতঃ যামঃ—প্রহরো যস্য পক্কস্য ওদনাদেঃ তদ্ যাতযামং—শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তম্ ইত্যর্থঃ। গতরসং—নিষ্পীড়িতসারং, পূতি—দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং—দিনান্তরপক্কম্, উচ্ছিষ্টম্—অন্যভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং—অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি এবম্ভূতং ভোজনং—ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। যাতযাম - পক্কবস্তু প্রভৃতি, ভোজনের পূর্ব্বে প্রহরাতীত হওয়ায় যাহা শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গতরস—নিষ্পীড়িতসার, যাহার সারাংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। পূতি—দুর্গন্ধময়। পর্য্যুষিত—দিনান্তরের পক্ক। উচ্ছিষ্ট—অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট।

অমেধ্য—অভক্ষ্য কলঞ্জাদি (বিষাস্ত্রবিদ্ধ পশুপক্ষ্যাদির মাংস)—এইরূপ ভোজ্য তামসগণের প্রিয় ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দশ এগার দণ্ড রাঁধা ভাত পচা পান্তা, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র—এই সকল তামস ভোজন।—গুণভেদে আহারের ভেদ হইবেই। সত্ত্বগুণ যাঁহার প্রবল তিনি রাজসিক বা তামসিক আহার গ্রহণ করিতে পারেন না, গ্রহণ করিলে তাঁহার শরীর ও মন অসুস্থ হইয়া পড়িবে ; এইরূপ তামস বা রাজস প্রকৃতির লোকেরা সাত্ত্বিক আহার করিলে তাহারাও পীড়াগ্রস্ত হইবে। অবশ্য রাজসিক ও তামসিকেরা যদি ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণযুক্ত আহার গ্রহণ করিতে থাকেন ও সত্ত্বানুরূপ কার্য্য ও চিন্তাদির অভ্যাস করিতে থাকেন, তবে তাঁহাদের নিজ স্বভাবও ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু সহসা করিতে গেলেই অনর্থ উৎপন্ন হয়। যাঁহাদের প্রাণ সুষুম্নামার্গে প্রবাহিত হয় তাঁহাদের পক্ষে অশুদ্ধ আহার বিপজ্জনক। এইজন্য যোগীদের অশুদ্ধ আহার গ্রহণে সাবধানতা আবশ্যক, নচেৎ বিপরীত ফল হয় ॥ ১০

গল্প আছে—যে সিদ্ধসাধক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকে কোন চণ্ডাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে ভোজন করাইবার জন্য তাহাদের খাদ্য শূকর মাংস পাক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি যে সমস্তই ব্রহ্ম বলেন, ইহা তাঁহার অন্তরের কথা কি মৌখিক কথা দেখিতে হইবে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কুক্কুরের বেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডালেরা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া কুক্কুরবেশধারী শঙ্করাচার্য্যকে তাড়াইয়া দেয়। পরে তাহারা স্বামীজির জন্য অপেক্ষা করিয়া তিনি না আসায় বড়ই দুঃখিত হয়, পরে আচার্য্যের নিকট তাহারা গিয়া বলে—আপনি মিথ্যা কথা কেন বলিলেন ? আপনি আমাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন না তাহা আমরাও জানি, পূর্ব্বে সে কথা আমাদিগকে বলিলেই হইত, আমরা আপনার জন্য আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতাম না। আর আপনি যে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, মনুষ্য ও পশু সকলকেই ব্রহ্মময় বলেন, আপনার এ কথাও কপট বাক্য মাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। শঙ্কর তাহাদিগকে সমাদর করিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন—'ভাই আমি তো ভোজন করিবার জন্য তোমাদের ওখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম,তোমরা আমাকে ভোজন করিতে দিলে কৈ ? তাহারা বলিল আমরা সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম, আপনি তো আসেন নাই, আপনি আসিলে আমরা একজনও কি আপনাকে দেখিতে পাইতাম না ? সুতরাং আপনার আসা কথনই সত্য নহে। তাহাতে আচার্য্য বলিলেন—তোমাদের এ কথা ঠিক, কিন্তু আমিও অসত্য বলিতেছি না। আমি মনুষ্যবেশে তোমাদের নিকট যাই নাই, তাহার কারণ তোমরা আমার জন্য যে অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহা আমার শরীরের অনুকূল নহে, অথচ তোমাদের নিমন্ত্রণ যথন গ্রহণ করিয়াছি, তথন তাহা রক্ষা করিতেই হইবে। এইজন্য যে শরীরে উক্ত আহার পরিপাক করা যাইতে পারে, আমি তদনুসারে কুক্কুরের বেশে তোমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছিলাম, তোমরা তো আমাকে খাইতে দিলে না, বরং লগুড়াঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলে। এই কথা শুনিয়া অবশ্য চণ্ডালেরা অত্যন্ত লজ্জিত হইল।

আর একবার বুদ্ধদেবের সময়ও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, বুদ্ধদেবের ভক্ত চণ্ড তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শূকর মাংস খাইতে দিয়াছিল। করুণাময় বুদ্ধদেব চণ্ডের প্রদত্ত শূকর মাংস গ্রহণ করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এমন কি তাহাতেই তাঁহার দেহাবসান হয়। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—এই শূকর মাংস চণ্ডের প্রিয় আহার, তাহাই সে আমাকে দিয়াছিল, কিন্তু আমার শরীরে উহা সহ্য হইল না, আজ তাহারই ফলে আমার দেহ নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" বটে, এবং শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই আহার বলিয়াছেন তাহাও

(সাত্ত্বিক যজ্ঞ)

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

অন্বয়। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) বিধিদিষ্ট (যথাশাস্ত্র

অতি সত্য, কারণ রাগ, দ্বেষ, মোহ ত্রিবিধ দোষবর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিতে না পারিলে চিত্ত প্রসন্নও হয় না, নির্ম্মলও হয় না। সেরূপ ভাবের যিনি অধিকারী তাঁহার পক্ষে উহার অর্থ এইরূপই, কিন্তু যাহাদের সে উচ্চ অধিকার জন্মে নাই, যাহারা অধ্যাত্মমার্গে প্রবর্ত্তক মাত্র, তাহাদের পক্ষেও আহার (যদ্দ্বারা শরীর পুষ্ট ও সবল থাকে) যথাসম্ভব পবিত্র হওয়া আবশ্যক। কারণ কদর্য্য অন্ন গ্রহণে আয়ুক্ষয় হয়, শরীর রোগগ্রস্ত হয় এবং অকালমৃত্যু হইয়া থাকে। মনুস্মৃতিতে আছে—"অনভ্যাসেন তু বেদানাং আচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাৎ অন্নদোষাচ্চ কালো বিপ্রান্ জিঘাংসতি"। (৫ম অধ্যায় ৪র্থ শ্লোক)

দেহ, মন শুদ্ধ না থাকিলে অহরহঃ ভগবৎস্মৃতির উদয় হয় না, সুতরাং দেহ মন শুদ্ধির জন্য অন্নদোষবর্জ্জিত হইতে হইবে, এবং আচার বর্জ্জন করিলেও অন্নের শুদ্ধি হানি হইয়া থাকে ; সুতরাং আচার সর্ব্বথা অবর্জ্জনীয়।

শ্রীমদ্ আচার্য্য রামানুজও খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ পরিহার করিতে বলিয়াছেন। (১) জাতিদোষ (২) আশ্রয়দোষ, (৩) নিমিত্তদোষ। জাতিদোষের অর্থই এই যে নীচ জাতির বা কুকর্ম্মাসক্ত লোকের অন্ন গ্রহণ করিবে না। এখনও সে আচার ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবলভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সংস্পর্শ দোষও খুব বড় দোষ—কিন্তু এ যুগের লোকেরা সে কথা আর মানিতে চাহেন না, সত্ত্বগুণের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। এখনকার কালেও চিকিৎসকেরা উৎকট ব্যাধিপীড়িত স্থানের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। যদি ব্যাধিগ্রস্ত স্থানের অন্ন গ্রহণে দোষ হয় (স্থূল শরীরের পক্ষে দূষিত স্থানের অন্ন গ্রহণে ব্যাধি হওয়া প্রায় অনিবার্য্য) তবে সূক্ষ্ম শরীরের অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি যে হীনজাতি ও হীন কর্ম্মকারীর অন্নে দূষিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? শ্রুতিতে বলিয়াছেন—অন্নই প্রাণ মন বুদ্ধিরূপে পরিণাম লাভ করে। সুতরাং যাহারা যে অন্নে পুষ্ট হইবে তাহাদের মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় চেষ্টাও তদ্রূপ হইতে বাধ্য। জ্ঞান দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিরা সেইজন্যই হিন্দুসমাজের মধ্যে আহার সম্বন্ধে এত কড়াকড়ি নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। ইহা কাহারও প্রতি বিদ্বেষজনিত নহে, বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যই তাঁহারা এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এস্থলেও Segragation camp আছে, প্রয়োজন হইলে নগর মধ্যে যাত্রীকে একাএক যাইতে না দিয়া আটক করিয়া রাখা হয়। মঙ্গল ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই এরূপ ব্যবস্থা করা হয়। আমরা ইংরাজ সরকার বা মিউনিসিপালিটীর আদেশ মান্য করিয়া চলিতে কোন আপত্তি করি না, কিন্তু শাস্ত্রবাক্য মানিব না—তাহার কারণ শ্রদ্ধার অভাব। যাঁহারা এই প্রাচীন পদ্ধতি মান্য করিয়া চলেন তাঁহাদের অগত্যাই রান্নাঘরের মধ্যেই কিছু কিছু ধর্ম্মকে রাখিতে হয় বৈকি ? আহার তো প্রস্তুত হইবে সেখানে। রন্ধনকর্ত্তা ও রন্ধনসামগ্রীর স্থান রান্নাঘরেই, সুতরাং রান্নাঘরকে বাদ দিয়া ধর্ম্মরক্ষা করা কঠিন। সূক্ষ্মের সংযম করিতে হইলে যদি স্থূলের সংযম করা অগ্রে আবশ্যক হয় তবে ধর্ম্মকে রান্নাঘরে পুরিলেই উহা কিরূপে জড়বাদ হয় তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। অবশ্য জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা অনেক সময় সত্যকে বাদ দিয়া তাহার উপরের খোসাটিকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকি বটে কিন্তু উহা একেবারে ছাড়িয়া দিলেই কি আমরা জড়াতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিব ? মনুষ্য সমাজ প্রাচীন হইলেই তাহার ধর্ম্মমতগুলি সমাজস্থ সকলে প্রাণ দিয়া না করিতে পারিলেও অনেকেই তাহা প্রাণ দিয়া পালন করেন এবং তাহা জ্ঞানপূর্ব্বকও তাঁহারা করিতে পারেন ; যদি সকল লোকে সেরূপভাবে আচারবান হইতে নাও পারে কিন্তু আচারবর্জ্জিত হইলে তাহারা যে অধিকারভ্রষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, এ কথা কেন আমরা ভাবিয়া দেখি না। মনু বলিয়াছেন—"আচারাৎ বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদ ফলমশ্নুতে"।

নিশ্চিত) যঃ যজ্ঞঃ (যে যজ্ঞ) যষ্টব্যম্ এব (অবশ্যই অনুষ্ঠেয়) ইতি মনঃ সমাধায় (এইরূপ মনঃ সমাধান করিয়া) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ সাত্ত্বিকঃ (তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ) ॥ ১১

শ্রীধর। যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধঃ, তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈঃ বিধিনা দিষ্ট—আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞঃ ইজ্যতে—অনুষ্ঠীয়তে, স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ। কথম্ ইজ্যতে? যষ্টব্যমেবেতি—যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়—একাগ্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [যজ্ঞ যে ত্রিবিধ তাহা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞের বিষয় এখন বলিতেছেন] – ফলাকাঙ্ক্ষারহিত পুরুষগণ কর্ত্তৃক বিধি দ্বারা দিষ্ট অর্থাৎ আবশ্যক বলিয়া বিহিত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, সেই যজ্ঞই সাত্ত্বিক। কিরূপে তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন? যজ্ঞানুষ্ঠানই আমার কর্ত্তব্য, অন্য ফল সাধনীয় নহে, এইরূপ মনকে একাগ্র করিয়া ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ক্রিয়া করা—বিশেষ রূপে বুদ্ধি স্থির ক্রিয়ার পর হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া এইরূপ মনেতে করিয়া ধারণা, ধ্যান, সমাধি পূর্ব্বক যে করে সে সাত্ত্বিক।—ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞটি কেমন তাহাই বলিতেছেন। এই যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করিতে হয়। সব যজ্ঞেই তো ফলের আকাঙ্ক্ষা আছে, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যজ্ঞ তবে কোনটি? ভগবৎপ্রীতি-কামনায় অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাও সাত্ত্বিক যজ্ঞ বটে, কিন্তু আর এক প্রকারের যজ্ঞ আছে যাহাতে মোটেই ফল কামনা থাকে না। তাহাই প্রকৃত পক্ষে সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ইহাকে ব্রহ্মযজ্ঞও বলে, কারণ ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে প্রাণকে লইয়া গেলেই বুদ্ধি বিশেষরূপে স্থির হয়। তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কারণ সে কর্ম্ম ব্যতীত জীবের উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। অন্যান্য যত কর্ত্তব্য আছে, তাহা করিলে তদনুরূপ সংস্কার মনেতে থাকিয়া যাইবেই, মনকে সংস্কার-শূন্য না করিতে পারিলে প্রকৃত কামনা-শূন্য হওয়া যায় না। প্রাণের মধ্যে যে কর্ম্মের সংস্কার বা দাগ পড়িয়া যায়, তাহা মুছিয়া ফেলা অসম্ভব যদি প্রাণের শোধণ না হয়। প্রাণ শুদ্ধ হইয়া স্থির হইলেই মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধমনে আর সংকল্পের ঢেউ উঠে না। সংকল্পশূন্য অবস্থাতেই সমাধিপ্রজ্ঞার উদয় হয়। তাই সমাধিপ্রজ্ঞার জন্য ধারণা-ধ্যানাদি আবশ্যক। আবার ধারণা-ধ্যানের জন্য প্রাণায়ামাদি যে পুরুষার্থ সাধন – তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। তাহাই আবার বিধিদিষ্ট ভাবে করিতে হইবে। সাধনার জন্য যে শাস্ত্রের নিয়মাদি পালন—তাহাই বিধিদিষ্ট যজ্ঞ। নিজের খেয়াল মত সাধন করিলে চলিবে না—গুরুর উপদেশ ও আদেশ মত করিতে হইবে এবং তাহাও প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক করিতে হইবে ॥ ১১

(দাম্ভিকের রাজস যজ্ঞ)

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২

অন্বয়। তু ফলম্ অভিসন্ধায় (কিন্তু ফলে অভিসন্ধি করিয়া) অপি চ (এবং) দম্ভার্থম্

এব (দম্ভের জন্য অর্থাৎ নিজ ধার্ম্মিকত্ব বা মহত্ব প্রকাশের জন্য) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) তং যজ্ঞং (সেই যজ্ঞকে) রাজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে) ॥ ১২

শ্রীধর। রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলম্ অভিসন্ধায়—উদ্দিশ্য, যৎ ইজ্যতে—যজ্ঞঃ ক্রিয়তে। দম্ভার্থঞ্চ—স্বমহত্বখ্যাপনার্থং, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [রাজস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন]—ফল অভিসন্ধি করিয়া অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যে, এবং স্ব-মহত্বখ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ও দেমাকের সহিত যে এ রকম করে তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে।—ফললাভ কামনা করিয়া কিংবা আমি ধার্ম্মিক ইহা লোকে জানুক—এই প্রকার বাসনা লইয়া যে যজ্ঞ বা ক্রিয়াদি করে, তাহা রাজসিক। অনেকে সাধন করেন এই উদ্দেশ্যে—যে উহাতে তাঁহার রোগ আরাম হইবে এবং লোকে তাঁহাকে যোগী বলিবে। এইসব উদ্দেশ্য লইয়া যাঁহারা ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের ক্রিয়া ভালরূপ হয় না। দাম্ভিক লোকেরা প্রকৃত বড় না হইয়া লোকের নিকট সম্মান প্রতিষ্ঠা চায়। হয়তো লোকে একটা বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, তিনি দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, লোককে জানান হইতেছে, তিনি কত সময় ধরিয়া পূজা করেন। কিন্তু পূজা হয়তো কিছুই করেন না, কোন পূজার ভাণ করিয়া ঠাকুর ঘরে বসিয়া থাকেন এবং ঢোলেন ॥ ১২

(শ্রদ্ধাহীনের তামস যজ্ঞ)

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

অন্বয়। বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য) অসৃষ্টান্নং (সৎপাত্রে অন্নদানশূন্য) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবর্জ্জিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণাশূন্য), শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্য) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং পরিচক্ষতে (তামস বলিয়াছেন) ॥ ১৩

শ্রীধর। তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি। বিধিহীনং—শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্। অসৃষ্টান্নং—ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ অসৃষ্টং ন নিষ্পাদিতং অন্নং যস্মিন্ তং। মন্ত্রহীনং—মন্ত্রৈর্হীনং। অদক্ষিণম্—যথোক্তদক্ষিণারহিতং চ শ্রদ্ধাশূন্যং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে—কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [তামস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন]—শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদির উদ্দেশ্যে অসম্পাদিত অন্ন, মন্ত্রহীন, যথোক্ত দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস বলিয়া থাকেন ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর বিশেষরূপে বুদ্ধি স্থির না করিয়া ও ক্রিয়া না করিয়া ও ওঁকার ক্রিয়া না করিয়া, যে কিছু করে সমুদয় তামসিক কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া গুরুবাক্যের দ্বারায় লাভ করিয়া সমুদয় কর্ম্ম করিবে, নচেৎ সব বৃথা।—ক্রিয়া বিধিহীন কখন হয় ? যখনই উহা অনিয়মিত রূপে করা হয়, সময়ের ঠিক নাই,

তপস্যা তিন প্রকার—শারীর বাচিক ও মানস।

(শারীর তপ)

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪

স্থানের ঠিক নাই, "ব্যাগার ঠেলার মত" কাজ করা। তাহা ছাড়া যাঁহারা নিয়মিত ভাবেও প্রত্যহ করেন, তাঁহারা যদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়াই ধড় মড় করিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়েন, তবে উহা বিধিহীন হয়। উহার নিয়ম বা বিধি এই যে মন দিয়া ক্রিয়া করার পরেও খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকা ; যতক্ষণ মন চঞ্চল না হয়। এইরূপ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার আস্বাদন হয়।

অসৃষ্টান্ন—অন্ন=প্রাণ ; অ+সৃষ্ট—মিলিত বা যুক্ত অর্থাৎ যে প্রাণ যুক্ত বা মিলিত নহে অর্থাৎ সচঞ্চল। ক্রিয়া করিয়া স্থিরত্ব অবস্থাকে অনুভব করিতে না পারা।

মন্ত্রহীন—শ্বাসই মন্ত্র, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া প্রাণায়ামাদি যে ক্রিয়া করা হয়, তাহা না করাই মন্ত্রহীন যজ্ঞ। সকল পূজার প্রারম্ভেই প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা না করিয়া পূজা করা।

অদক্ষিণ—দক্ষিণা=ক্রিয়ার শেষ ফল অর্থাৎ পর-অবস্থা, তাহার অপ্রাপ্তিই দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ।

শ্রদ্ধাবিরহিত—শ্রদ্ধা=ভক্তিভাব, বিশ্বাস, মনের নির্ম্মলতা। এই সকল না থাকাই শ্রদ্ধা বিরহিত ভাব। যাহার ক্রিয়াতে ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, এবং অনাদরের সহিত করে বলিয়া ক্রিয়া করিয়াও মন নির্ম্মল হয় না বা সঙ্কল্পশূন্য হয় না—তাহাই শ্রদ্ধা-বিরহিত যজ্ঞ।

ক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষশূন্য ভাবে করিতে হইবে, এবং গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া করিতে হইবে, কেবল পুস্তক দেখিয়া সাধন করিলে চলিবে না। গুরু যাহা যাহা উপদেশ দিবেন, সেইগুলি ঠিক ঠিক মত করিয়া যাইতে হইবে। তাহা না করিলে পরিশ্রম মাত্রই সার হইবে॥ ১৩

অন্বয়। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অর্চ্চনা), শৌচম্ (শৌচ), আর্জ্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য), অহিংসা চ (ও অহিংসা) শারীরং তপঃ (শরীরসাধ্য তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ১৪

শ্রীধর। তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবৎ শারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদি ত্রিভিঃ। প্রাজ্ঞাঃ—গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ। দেব-ব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকং চ শারীরং—শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ উচ্যতে॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [তপস্যার সাত্ত্বিকাদি ভেদ দেখাইবার জন্য প্রথমতঃ শারীরাদি ভেদে তপস্যা যে ত্রিবিধ, ইহা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ (অর্থাৎ গুরু ব্যতিরিক্ত অন্য তত্ত্ববিদ্) ব্যক্তির পূজা ও শৌচাদি, আর্জ্জব (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্য এবং

অহিংসা—এইগুলি শারীর তপস্যা বলিয়া কথিত হয়। শারীর তপস্যা অর্থাৎ যে তপস্যা শরীর দ্বারা সম্পাদ্য ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেবতা কুটস্থেতে ধ্যান, ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির নিকট যাওয়া, আত্মাতে থাকা, বিশেষ চৈতন্য ক্রিয়ার দ্বারায় হইয়াছে যাহার তাহার নিকট যাওয়া, 'পূজনং' ক্রিয়া করা—ব্রহ্মেতে থাকা, "আর্জবং" সরল হওয়া অর্থাৎ যাহা মনে তাহাই বলা, "ব্রহ্মচর্য্যং" ব্রহ্মেতেই থাকা, অন্যের ভালতে কাতর না হওয়া—এই শারীরিক তপস্যা।—তপস্যা ত্রিবিধ; তন্মধ্যে শারীর তপস্যার কথা এখানে বলিতেছেন। (১) দেবতার পূজা—পুষ্প ধূপ নৈবেদ্যাদির দ্বারা যথাশাস্ত্র-বিহিত দেবার্চ্চনা,—ইহাই বাহ্য পূজা, কিন্তু যাঁহারা যোগাভ্যাস-নিরত, তাঁহাদের পূজা হইল কূটস্থেতে ধ্যান। কূটস্থের ধ্যান কিরূপে করিতে হয়, তাহা সদ্গুরুর নিকট শিখিতে হয়। (২) দ্বিজ—বাহ্য দৃষ্টিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সৎকার, অন্তর্লক্ষ্যে দ্বিজ হইলেন—ক্রিয়াবান ব্যক্তি, যাঁহার কূটস্থ দর্শন হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করা এবং তাঁহার সহিত সাধন বিষয়ে আলোচনা করা। ক্রিয়াবানদিগকে দ্বিজ বলা যায় এই জন্য যে তাঁহাদের দুইবার জন্ম হইয়াছে। প্রথম জন্ম—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, দ্বিতীয় জন্ম—গুরু যখন কূটস্থ দর্শন করাইয়া দিয়া কূটস্থ দর্শনের উপায় বলিয়া দেন। অর্থাৎ যে "আমি কে" ভুলিয়া যাওয়ায় জীবের দেহাত্মবোধই প্রবল হয়, যখন গুরু কৃপা করিয়া আমার "আমি" কে দেখাইয়া দেন, তখন যে আত্মস্মৃতির উদয় হয়, সেই স্মৃতি হেতু "আত্ম" সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে—তাহাই সংস্কার। (৩) গুরু পূজা—বাহ্যভাবে পিতা, মাতা, আচার্য্যগণের পূজা। অন্তর্লক্ষ্যে—যিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পূজাই গুরুপূজা। আত্মাই প্রকৃত গুরু। "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ"—আত্মাই একমাত্র গুরু। (৪) প্রাজ্ঞ-পূজা—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পূজা। দ্বিজ ও গুরুর তো পূজা করিতেই হইবে, কিন্তু গুরু না হইলেও বা ব্রাহ্মণ না হইলেও যদি তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তিনি যে কোন বর্ণেরই হউন তাঁহার পূজা কর্ত্তব্য। আবার অন্তর্লক্ষ্যে তিনিই প্রাজ্ঞ, যিনি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ সুষুম্না যাঁহার চৈতন্যযুক্ত হইয়াছে, যিনি এ পথের বহু দূরের কথা জ্ঞাত আছেন—তাদৃশ মহাত্মাদের সহিত সঙ্গ করা ও তাঁহাদিগকে সৎকার করা আবশ্যক। (৫) শৌচ—মৃজ্জলাদির দ্বারা শরীর-শুদ্ধি, এবং প্রাণায়ামাদির দ্বারা যে মনঃস্থির হয়, তাহাই শুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মেতে থাকিবার চেষ্টা। (৬) আর্জ্জবম্—অকপট ভাব, মনে যাহা আসে—তাহাই বলা, মনের ভাব গোপন না করা। অন্তর্লক্ষ্যে যখন মন, ইন্দ্রিয় ও বাক্য সংযত হইয়া গিয়াছে। (৭) ব্রহ্মচর্য্য—শাস্ত্রনিষিদ্ধ মৈথুন ত্যাগ। অন্তর্লক্ষ্যে—মন যখন ব্রহ্মাভ্যাসে রত হয় এবং ব্রহ্মেতেই থাকে, তখনই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য হয়। এই ব্রহ্মরত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—"স দেবো ন তু মানুষঃ"। (৮) অহিংসা—প্রাণি-পীড়ন পরিত্যাগ, অন্যের ভাল দেখিয়া ব্যথিত না হওয়া। শ্রুতি বলেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" প্রাণিগণকে হিংসা না করা। তাহাদের জীবন নাশ করাই শুধু হিংসা নহে। পরকে পীড়া দেওয়া, মর্ম্মভেদী কথা বলা—এ সবও হিংসা। মানুষ যতদিন স্বার্থপর থাকিবে, ততদিন কোন না কোন প্রকারে

(বাঙ্ময় তপস্যা)

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

সে অন্যকে হিংসা করিবেই। যম সাধনের মধ্যে অহিংসাই সর্ব্বোত্তম। হিংসা দ্বেষই ব্রহ্ম-ভাব প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। যে সকলকে আপনার মনে করিতে না পারে, এবং অন্যের উপকারের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করিতে না পারে, তাহার ভগবদ্ভক্তি হয় না, ভগবৎ-দর্শন বা জ্ঞান হওয়া দূরের কথা। এগুলি শরীরসাধ্য তপস্যা, শরীর না থাকিলে হয় না। ইহার অন্তর্লক্ষ্য ও বহির্লক্ষ্য উভয়ের প্রতিই সাধকের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। বাহ্য ও অন্তর উভয় ভাবই আয়ত্ত করিতে না পারিলে প্রকৃত আত্মোন্নতি হইতে পারে না, এই জন্য উভয় ভাবেই এগুলি অনুষ্ঠেয় ॥ ১৪

অন্বয়। অনুদ্বেগকরং (অনুদ্বেগকর) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতজনক) যৎ বাক্যং (যে বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (ও বেদাভ্যাস) বাঙ্ময়ং তপঃ (বাচিক তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৫

শ্রীধর। বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং—ভয়ং ন করোতীতি অনুদ্বেগকরং বাক্যং, সত্যং, শ্রোতুঃ প্রিয়ম্, হিতঞ্চ – পরিণামে সুখকরং, স্বাধ্যায়াভ্যসনং—বেদাভ্যাসশ্চ, বাঙ্ময়ং—বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [বাচিক তপস্যা বলিতেছেন]—উদ্বেগ শব্দে ভয়, তাহা করে না যে বাক্যে—তাদৃশ বাক্যই অনুদ্বেগকর আর তাহা শ্রোতার প্রিয় ও হিত অর্থাৎ যাহা পরিণামে সুখকর এইরূপ সত্যবাক্য এবং বেদাভ্যাস—এইগুলি বাক্য দ্বারা নির্ব্বর্ত্ত্য অর্থাৎ বাঙ্ময় তপস্যা ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা— যাহাতে অন্য কাহারও উদ্বেগ না হয় এমত কথা বলা—সত্য—প্রিয় ও হিত বাক্য—স্বাধ্যায়—বুদ্ধির সহিত ক্রিয়া করা, ইহাকে বাঙ্ময় তপস্যা কহে।—শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই—অনুদ্বেগকরত্ব, প্রিয়ত্ব, হিতত্ব এবং সত্যত্ব এই চারিটি ধর্ম্মের সহিত বাক্যের সম্বন্ধ থাকাই চাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য "চ" এই সমুচ্চয়বাচক শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যদি বাক্য সত্য হয় অথচ তাহা উদ্বেগকর অথবা অহিত কিম্বা অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যকে বাঙ্ময় তপঃ বলা যাইবে না। আবার যদি বাক্য হিত ও অনুদ্বেগকর হয়, কিন্তু সত্য না হয় তাহা হইলেও ঐ বাক্য বাঙ্ময় তপঃ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রিয় বাক্যও যদি সত্য, হিত ও অনুদ্বেগকর না হয়, তাহা হইলেও তাহা বাঙ্ময় তপস্যার মধ্যে পরিগণিত হইবে না। সুতরাং এই বাচিক তপস্যাও সহজ নহে।

আধ্যাত্মিকভাবে—ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায়—যোগী যে সকল বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহা কখনও অসত্য হয় না, তাহা জগতের কল্যাণজনক ও প্রিয় হইবেই।

স্বাধ্যায়—স্ব—জীব, অধি—অতিক্রম করা, ই—গমন করা, যখন জীবভাব অতিক্রম

(মানসিক তপস্যা)

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

করিয়া গমন করে। এ অবস্থা কখন হয়, যখন বুদ্ধির সহিত ক্রিয়া করা হইয়া থাকে। এই গমন করে কে? মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী জীবশক্তি। কোথায় গমন করেন?—পরমানন্দরূপ সহস্রারে শিবের সহিত স্থিতি হয়। "ই" শব্দের অর্থ—"ইকারং পরমেশাণী স্বয়ং কুণ্ডলী মূর্ত্তিমান্।"

ইহাকে বাঙ্ময় তপস্যা কেন বলা হইল? বাক্যের মূল প্রাণ, প্রাণ স্থির হইলে আপনাপনি বাক্য সংযম হইয়া যায়। সাধক ইহাতে সংযতবাক্ হন বলিয়া ইহাকে বাঙ্ময় তপস্যাও বলা যাইতে পারে ॥ ১৫

অন্বয়। মনঃপ্রসাদঃ (মনের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (সৌম্যভাব—মুখের প্রসন্নতা প্রভৃতি দ্বারা অন্তঃকরণের যে বৃত্তিবিশেষ অনুমিত হয়, তাহাই "সৌম্যত্ব"—শঙ্কর।) মৌনং (মৌনভাব) আত্মবিনিগ্রহঃ (অন্তঃকরণের নিরোধ) ভাবসংশুদ্ধিঃ (অকপটতা,—হৃদয়শুদ্ধি) ইতি এতৎ (এইগুলি) মানসং তপঃ (মানসিক তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়) ॥ ১৬

শ্রীধর। মানসং তপ আহ—মনঃপ্রসাদ ইতি। মনঃপ্রসাদঃ—স্বচ্ছতা, সৌম্যত্বম্—অক্রূরতা, মৌনং—মুনের্ভাবঃ মননমিত্যর্থঃ, আত্মনো—মনসো, বিনিগ্রহঃ—বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ—ব্যবহারে মায়ারাহিত্যম্। ইত্যেতন্মানসং তপঃ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [মানসিক তপস্যার বিষয় বলিতেছেন]—মনঃপ্রসাদ—মনের স্বচ্ছতা। সৌম্যত্ব—অক্রূরতা। মৌন অর্থে মুনির ভাব অর্থাৎ মনন। আত্মবিনিগ্রহ—মনের বিনিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহার। ভাবসংশুদ্ধি—ব্যবহারে মায়ারাহিত্য। এইগুলিকেই মানস তপঃ বলে ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে মনের সন্তুষ্টতা লাভ করা স্থির থাকা, তৃপ্ত থাকা, আত্মায় ব্রহ্মেতে থাকা আটকিয়ে, এই মানস তপস্যা।—ক্রিয়ার শেষে এক প্রকার মানসিক প্রসন্নতা আসে, তখন কোন উদ্বেগ থাকে না। মানসিক তপস্যার সর্ব্বোচ্চ ফলই মনন বা ধ্যান—যখন কোন সঙ্কল্প থাকে না। "সৌম্যত্ব"—ইহা মনের প্রসন্নতা চিহ্ন, যাহা সাধকের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়, একটা অপূর্ব্ব স্থিরতা, মন তখন আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সংলীন হইয়া যায়। "মৌন"—ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হেতু মনের ক্রিয়া থাকে না। এই মন এত স্থির হইয়া যায় যে, যখন যোগী ব্যুত্থিত হন তখনও তাঁহার নেশার ঘোর কাটে না, মন থাকিলেও মনের বিচেষ্টা থাকে না। বাহিরের বিবিধ উৎপাতেও সে স্থির ভাবের বিচ্যুতি ঘটে না। "আত্মবিনিগ্রহ"—চিত্তবৃত্তির নিরোধ, আপনাতে আপনি থাকা বা ব্রহ্মেতে আটকিয়া থাকা। "ভাবসংশুদ্ধি"—যে অবস্থায় মনের অশুদ্ধি থাকে না, মনের অশুদ্ধিতেই তো যত বিকার, সেই বিকার থাকে না, তখন কাহাকেও পর বা শত্রু মনে হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ না থাকায় তখন চিত্তে কোন ছল বা কপট ভাব থাকে না।

(সাত্ত্বিক তপস্যা)

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

(রাজস তপ)

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮

ইহাই আত্মভাবে প্রতিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়ের বিষয় দেখিয়া মন আর তখন উল্লম্ফন করে না। এই গুলিকে মানস তপস্যা বলা হয়। এখানে কেবল মনকে আটকাইবার বিষয়ই বিশেষ ভাবে আলোচনীয় ॥ ১৬

অন্বয়। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য) যুক্তৈঃ (যোগযুক্ত বা একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া (পরম শ্রদ্ধার সহিত) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তৎ (পূর্ব্বোক্ত) ত্রিবিধং তপঃ (ত্রিবিধ তপস্যাকে) সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (সাত্ত্বিক বলা হয়) ॥ ১৭

শ্রীধর। তদেবং শরীরবাঙ্মনোভিঃ নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতং। তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েত্যাদি ত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈঃ যুক্তৈঃ—একাগ্রচিত্তৈঃ নরৈঃ তপ্তং তৎ সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা সম্পাদ্য ত্রিবিধ তপস্যা দর্শিত হইল। সেই ত্রিবিধ তপস্যাও সাত্ত্বিকাদি-ভেদে যে ত্রিবিধ, তাহাই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন] —উত্তম শ্রদ্ধার দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও একাগ্রচিত্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত যে ত্রিবিধ তপস্যা তাহাকে সাত্ত্বিক বলে ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মেতে থেকে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া আটকিয়া থাকার নাম সাত্ত্বিক।—কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার কথা বলিয়া গুণভেদে যে তাহাও তিন প্রকার, সেই কথা এইবার বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত তপস্যাগুলি কখন সাত্ত্বিক হয়? যখন চিত্ত ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়, তখনই তাহা একাগ্র হইয়া নিরোধমুখী হয়, তাই শিষ্টব্যক্তিগণ ইহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলিয়া থাকেন। প্রাণায়ামই পরম তপস্যা, এই প্রাণায়াম করিতে করিতে সাধকের প্রাণ-ধারা যখন সুষুম্নায় চালিত হয়, তখনই চিত্ত একাগ্র হয় ও বহিঃশ্বাস ক্ষীণ হইতে হইতে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়, ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সাত্ত্বিক তপস্যার লক্ষণ ॥ ১৭

অন্বয়। সৎকারমানপূজার্থং (সৎকার, মান ও পূজা পাইবার জন্য) দম্ভেন চ (এবং দম্ভপূর্ব্বক) যৎ এব তপঃ (যে তপস্যাই) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ ইহ (তাহা ইহলোক-সর্ব্বস্ব অর্থাৎ ইহলোকে ফলপ্রদ) [সুতরাং] চলম্ (অল্পকালস্থায়ী), [অতএব] অধ্রুবং (অনিশ্চিত) [তৎ তপসঃ—সেই তপস্যা] রাজসং প্রোক্তং (রাজস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ১৮

শ্রীধর। রাজসমাহ—সৎকারেতি। সৎকারঃ—সাধুকারঃ—সাধুরয়মিতি তাপসোঽয়ম্

(তামসিক তপস্যা)

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

ইত্যাদি বাক্‌পূজা। মানঃ—অভ্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ দৈহিকী—পূজা। পূজা - অর্থলাভাদিঃ। এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে। অতএব চলং—অনিয়তং, অধ্রুবঞ্চ—ক্ষণিকং। যৎ এবম্ভূতং তপঃ তদিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [রাজস তপস্যার কথা বলিতেছেন]—সৎকার অর্থাৎ সাধুকার। লোকে বলিবে ইনি সাধু, ইনি তাপস—ইত্যাদিই বাক্ পূজা। মান—অভ্যুত্থান ও অভিবাদনাদির দ্বারা যে পূজা, তাহাই দৈহিক পূজা। পূজা—অর্থলাভাদি ; অর্থ দানের দ্বারা যে সম্মান প্রদর্শন। এই নিমিত্ত অর্থাৎ "সৎকার," "মান," "পূজা" লাভ করিবার জন্য এবং দম্ভসহকারে যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে সে তপস্যার ফল অনিয়ত বা অনিত্য, এবং অধ্রুব অর্থাৎ ক্ষণিক—এবম্ভূত যে তপস্যা—তাহা এখানে রাজস বলিয়া কথিত ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল কর্ম্ম, মান, এবং পূজার নিমিত্ত দম্ভপূর্ব্বক তপস্যা যে করে সে রাজসিক।—লোকে আমাকে তপস্বী বলিবে, নিরাহারী বলিবে, আমাকে দেখিলে সকলে অভিবাদন করিবে, কাহারও গৃহে যাইলে সে গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান করিবে, উত্তম ভোজন দিবে, বহু দান করিবে—এই সব আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া দম্ভের সহিত যে তপস্যার অনুষ্ঠান তাহা রাজস তপস্যা। এই সব তপস্যার ফল অনিয়ত অর্থাৎ চঞ্চল, কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না এবং সেই অল্প ফল লাভও যে ধ্রুব তাহাও নহে ; বিনা সাধনায় ফাঁকি দিয়া যে নাম কেনা হয়, তাহা আর কতকাল থাকে ? অথচ এইরূপ লোক-দেখানো তপস্যাতে লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার ফল হইতেই শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ১৮

অন্বয়। মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেক বশে) আত্মনঃ পীড়য়া (নিজেকে কষ্ট দিয়া—দেহেন্দ্রিয়াদির পীড়া দ্বারা) পরস্য উৎসাদনার্থং বা (অথবা পরের বিনাশার্থ) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে তপস্যা করা হয়) তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (তাহাকে তামস তপস্যা বলে) ॥ ১৯

শ্রীধর। তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণ—অবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণ আত্মনঃ পীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে। পরস্যোৎসাদনার্থং বা—অন্যস্য বিনাশার্থম্ অভিচাররূপং, তৎ তামসম্ উদাহৃতং—কথিতম্ ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [তামস তপস্যার কথা বলিতেছেন]—অবিবেককৃত দুরাগ্রহ অবলম্বন করিয়া আত্মপীড়ার দ্বারা অথবা অন্যের বিনাশার্থ অভিচাররূপ যে তপস্যা করা হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনাকে ক্লেশ দিয়ে (উপবাসাদি) যে কর্ম্ম করে—পরের (না) ভাল হওয়ার নিমিত্তে—তাহাকে তামস ক্রিয়া কহে।—যেমন পর জন্মে রাজা হইবার আশায় পঞ্চতপাদি ক্লেশসাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান, অথবা কোন ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন বা তাহার বিনাশের জন্য মারণ, উচাটন প্রভৃতির যে অনুষ্ঠান, তাহাই তামসিক

দানের প্রকার ভেদ

(সাত্ত্বিক দান)

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

তপস্যা। আমরা একজন তপস্বীর কথা শুনিয়াছিলাম যিনি কোন লোককে নির্ব্বংশ করিবেন বলিয়া শীতকালে সারা দিনরাত জলে পড়িয়া থাকিতেন, এবং গ্রীষ্মের সময় সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এইরূপ মনোবৃত্তিই দূষণীয়। আমার কথা শুনিল না বা আমার মনের মত হইল না বলিয়া যে একজনের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে তাহার মানে কি? আমি অন্যের নিকট হইতে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি সেই কথা মনে রাখিয়া আমাকেও লোকের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে। তবে কখনও কখনও লোককে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহাতে দণ্ডণীয় লোকের এবং অন্যেরও প্রকৃত উপকার হয়। কখনও কখনও ঋষিরা ক্রোধ করিয়া দুষ্ট লোককে সেই ভাবে অভিশাপ দিতেন। তাহাতে কিন্তু দুষ্কর্ম্মকারীর পাপের দণ্ড হইত এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে এবং অন্যকে সচেতন করিয়া রাখিত। যেমন দক্ষের প্রতি ও ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ। ইহা তামসিকতা নহে, এরূপ ক্রোধ লোকস্থিতির জন্য প্রয়োজন ॥ ১৯

অন্বয়। দাতব্যম্ ইতি (দেওয়া কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতে) অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (উপযুক্ত স্থানে, বা পুণ্য দেশে) কালে চ (পুণ্য কালে বা উপযুক্ত সময়ে) পাত্রে চ (ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে অথবা উপযুক্ত পাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দান) সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২০

শ্রীধর। পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ— দাতব্যমিতি। দাতব্যমেব ইত্যেব নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে—প্রত্যুপকারাসমর্থায়। দেশে—কুরুক্ষেত্রাদৌ। কালে—গ্রহণাদৌ। পাত্রে চেতি দেশকাল সাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা। পাত্রে—পাত্রভূতায় তপঃ শ্রুতাদি সম্পন্নায় ব্রাহ্মণায় ইত্যর্থঃ। যদ্বা পাত্র ইতি চতুর্থী এবৈষা। পাত্রে ইতি তৃবন্তং। রক্ষকায় ইত্যর্থঃ। স হি সর্ব্বস্মাৎ আপত্ত্রাণাৎ দাতারং পাতীতি পাতা, তস্মৈ যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত দানের ত্রৈবিধ্য বলিতেছেন]—"দান করাই উচিত এই রূপ নিশ্চয় পূর্ব্বক উপকারে অসমর্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে দান দেওয়া হয়—কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যদেশে, গ্রহণাদি সময়ে এবং পাত্রভূত তপস্যা ও শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়—তাহাই সাত্ত্বিক দান। ["পাত্রে"—এইস্থলে চতুর্থী না হইয়া বিবক্ষায় সপ্তমী। পাত্র শব্দে পাত্রভূত অর্থাৎ তপস্যা ও শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, অথবা পাত্রে—এই পদেও চতুর্থী (পাতৃ শব্দের চতুর্থীর একবচন)। তাহার অর্থ রক্ষকের উদ্দেশ্যে। সর্ব্ব প্রকার আপদগণ হইতে দাতাকে যে রক্ষা করে, তাহার উদ্দেশে যে দান তাহা সাত্ত্বিক] ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহার দ্বারায় কোন উপকার হবে না, দেশ কাল পাত্র

বিবেচনা ক'রে দেওয়ার নাম সাত্ত্বিক দান—যেমত ক্রিয়া দেওয়া।—অভাবগ্রস্ত বা উপযুক্ত পাত্রকে অর্থ বা অন্নাদি দানও দান, কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চতর দান আছে। সে দান করিতে হইলে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হয়। মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অভাব ধনাদি বস্তু নহে, মানুষ আধ্যাত্মিক বিষয়েই বড় দীন। সেখানে সে অন্ধ, খঞ্জ, বধিরের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারের শক্তিসামর্থ্যহীন। জীব ভবরোগে বড় কাতর অথচ প্রতিকারের কোন সামর্থ্য নাই, এইরূপ নিরুপায় দীনার্ত্ত ব্যক্তিকে যিনি ভগবৎ-পদে পৌঁছিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তদপেক্ষা বড় দান আর কে করিতে পারে? এইরূপ দানের সামর্থ্য অবশ্য সকলের থাকে না, যিনি সাধনসম্পন্ন ও বিবেকী, ভগবান যাঁহার অন্তরে বসিয়া এই প্রকার জীবোদ্ধার প্রবৃত্তির প্রেরণা করেন, তিনিই ধন্য—তিনিই প্রকৃত দাতা। কবির সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন—"কবির গুরু সমান দাতা নাহিঁ, যাচক শিখ সমান্।" চঞ্চলমনা শিষ্য অপেক্ষা কাঙাল আর তো কেহ নাই, কারণ সে কিছুতেই তৃপ্ত নহে। এই ভিখারী মনও যে একদিন সাধন বলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে এবং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেবতারও দুর্লভ পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতে পারে। অতএব এ দানের তুলনায় আর সব দানই তুচ্ছ।

এই দান কোথায় করিতে হইবে? প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে কোন কালেই তত্তুল্য বস্তু দিতে সমর্থ হইবে না। তত্তুল্য কিছু দিবার মত বস্তুই যে আর নাই, এবং গুরুও তাহার নিকট হইতে কোন প্রত্যুপকারের আশা রাখেন না—সুতরাং যাহাতে ভবাম্বুধি উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এইরূপ উপদেশ দানই প্রকৃত দান ও সাত্ত্বিক দান।

দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

দেশ—সেই স্থানই যোগ্যতর স্থান, যে স্থানের লোকেরা হরিভজন করিতে জানে না বা শিখে নাই। সাধন সম্বন্ধে যে দেশ অনভিজ্ঞ, সেই দেশেই সাধনের বীজ ছড়াইতে হয়।

কাল—যে সময় দেশ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বা যে সময় রোগের প্রবল প্রাদুর্ভাবে দেশ ধ্বংস-মুখে পতিত, সেই সময়েই তো সুবৈদ্য ও সুপথ্যের প্রয়োজন। তাই যে সময়ে ধর্ম্মের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত প্রায়, যে সময় ধর্ম্মধ্বজীরা মনগড়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অতি সাহসের পরিচয় দেয়, সেই কালে যদি কেহ সত্যদর্শী পুরুষ মহান্ধকারে পতিত জীবের নিকট সত্যের দীপবর্ত্তিকা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে সত্যের পথে চালিত করেন, তবে বুঝিতে হইবে উপযুক্ত কালে জ্ঞানচক্ষু দানে তিনি জগৎও জীবের উপকার করিতেছেন।

পাত্র—যে বুভুক্ষু তাহার জন্যই অন্নের প্রয়োজন। যে ভগবানের জন্য ব্যাকুল, অথচ যে পথহারা পথিক পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, তাহাকে সৎ পথ দেখাইয়া দেওয়াই সৎপাত্রে দান এবং উহাই সাত্ত্বিক দান, কিন্তু করুণা বা মমতার বশীভূত হইয়া অপাত্রে দান করিলে ব্রহ্মবিদ্যা নিষ্ফল হইয়া যায়। পথ প্রাপ্তির যাঁহার জন্য ব্যাকুলতা আছে এবং ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্য তৃষ্ণা আছে, তিনিই এই দান গ্রহণের যোগ্য অধিকারী বুঝিতে হইবে। যাহারা কেবল মাত্র কৌতূহল নিবারণের জন্য অথবা পার্থিব বস্তু প্রাপ্তির আশায় সাধুর নিকট উপদেশ লইতে আসে, সেই সকল বিবেকহীন সাধনচেষ্টাশূন্য ব্যক্তিরা দানের অযোগ্য পাত্র।

ইষ্টদেবতা বা অন্তর্য্যামী ভগবানই সদ্‌বস্তু আর সবই অসৎ, সেইজন্য ইষ্টদেবতা বা পরমাত্মাই প্রকৃত সৎপাত্র ; "দেশ"—অস্থিতির মধ্যে যে স্থিতি, চিরচঞ্চলতার মধ্যে যাহা একমাত্র অচঞ্চল —যাহাকে পরম পদ বলে "পদং তৎ পরমং বিষ্ণো"—চাঞ্চল্য হইতে অচঞ্চল ভাব বিলক্ষণ বলিয়া সেই অচঞ্চল ভাবের যেখানে পরিস্থিতি—তাহাই দেশ, কারণ দেশ কল্পনা না থাকিলে কালের কল্পনা করা যায় না সুতরাং উদ্ধার লাভ দেশ ও কাল সাপেক্ষ। অনুপকারী পাত্র—উপকার করিতে হইলেই কার্য্য আবশ্যক, যেখানে আপনা হইতে সব কাজ বন্ধ, যাহার ক্রিয়ার পর অবস্থা—তাহা অপেক্ষা অনুপকারী পাত্র আর হইতে পারে না। সেইরূপ পাত্রের উদ্দেশ্যে জাগতিক বা অসৎ বস্তুর যে ত্যাগ বা তাহাতে সমর্পণ—তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥ ২০

[দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাখ্যাতাগণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা নাকি আধুনিক ব্যাখ্যাতাদের কাহারও কাহারও মনোমত হয় নাই। তাঁহারা সেই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়াছেন। প্রাচীনেরা শাস্ত্রসিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধনশীল ; যাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানও নাই এবং শাস্ত্র বাক্যেও বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা কঠিন সন্দেহ নাই এবং এই জন্যই ঋষি-বাক্যে তাঁহারা অনুদারতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। পীড়ায় কাতর একজন মুচি বা ডোমকে দান করা বা সাহায্য করা যে ঋষিদের অনভিপ্রেত এ কথা কোন শাস্ত্রেও নাই বা তাহার ভাষ্য টীকাতেও নাই। দানের উপযুক্ত পাত্রকেই দান করিতে হইবে, অপাত্রে বা কুপাত্রে দান দেওয়া না হয় ইহাই টীকাকারদের অভিপ্রায়। যে দেশের শাস্ত্রকারগণ দীন দুঃখী (নৃ-যজ্ঞ), পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের (ভূত যজ্ঞ) জন্য নিত্য বলি সংগ্রহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই শাস্ত্র প্রণেতারাই যদি অনুদার হন, তবে জগতে উদারতা কোথায় তাহাতো বুঝিতে পারি না। তবে সেকালে তাঁহারা যেরূপ দেশ, কাল, পাত্র উপযুক্ত মনে করিতেন আধুনিক লোকেরা আর সেই সব দেশ, কাল, পাত্রের সম্বন্ধে সেরূপ শ্রদ্ধা বহন করেন না, সুতরাং সেই সব পাত্রকে তাঁহারা তাদৃশ উপযুক্ত মনে করেন না। ইহা প্রাচীনদের বুদ্ধির ভুল বা আধুনিকদের মতিভ্রম তাহা বুঝা যায় না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানের যোগ্য পাত্র, ও দান দিবার উপযুক্ত কাল প্রাচীনদের যাহা ধারণা ছিল এখন সে ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। তাহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে বিচার এখন করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ সে কাল এ কাল নহে। প্রাচীনেরা ভৈক্ষ্যাচরণ সকলের সম্বন্ধে স্বীকার করেন নাই। যে খাইতে পায় নাই তাহাকে অন্ন দিবে, যে রোগী তাহাকে শুশ্রূষা করিবে, যে অসমর্থ তাহাকে সাহায্য করিবে, যে ভীত তাহাকে অভয় দান করিবে—এরূপ শাস্ত্রোপদেশ তো সমস্ত গৃহীরই প্রতিপাল্য। শাস্ত্রকারগণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহস্থের পক্ষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওরূপ দানের কথা এখানে বলা হয় নাই, উহা প্রত্যেকের নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। যে ক্ষুধাতুর সে মুচি হউক, ডোম হউক, চণ্ডাল হউক, তাহার পক্ষে অন্নই পথ্য, সুতরাং ক্ষুধাতুরকে অন্ন দানের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই। এমন কি অবজ্ঞা পূর্ব্বক বা অহঙ্কৃত হইয়া দান করাও নিষেধ, এই জন্য শাস্ত্রকারগণ পূর্ব্ব হইতেই দাতাকে, "হ্রীয়া দেয়ং, ভীয়া দেয়ং সংবিদা দেয়ম্" বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন আর্য্য ঋষিদের চরম লক্ষ্য ছিল, তাঁহারা সব ব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্নদান, ঔষধদান, শুশ্রূষা বা জীবসেবা এ সমস্তই মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষাও মহত্তর কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা সেই দিকে জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যে দান দ্বারা এই ভূতময় স্থূল শরীর মাত্র রক্ষা হয়, আধ্যাত্মিক নিত্য জীবনের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ কোন সাহায্য করে না, তাহাকে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অন্ন দিয়া ক্ষুধাতুরের আজ ক্ষুধার উপশান্তি করা হইল বটে কিন্তু আবার যে ক্ষুধা পাইবে তাহার নিবৃত্তি হইবে কি করিয়া? যে কর্ম্ম-পাশে বদ্ধ হইয়া জীব বিবিধ ক্ষুধার উৎপীড়িত হইয়া দিনরাত জ্বলিতেছে, যে সকল ক্ষুধা এই পার্থিব অন্নে মিটিবার নহে, মানবের সেই চিরদিনকার ক্ষুৎপিপাসা, অশান্তি, উপদ্রব বিদূরিত হইয়া যাহাতে সে সম্পূর্ণ নিরাময়

(রাজসিক দান)

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

অন্বয়। যৎ তু (যাহা) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) বা পুনঃ ফলম্ উদ্দিশ্য (অথবা ফললাভের জন্য) পরিক্লিষ্টং চ (এবং ক্লেশের সহিত বা অনিচ্ছার সহিত) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দানকে) রাজসং স্মৃতম্ (রাজস বলা হয়) ॥ ২১

শ্রীধর। রাজসং দানমাহ—যত্তু ইতি। কালান্তরে অয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতি ইত্যেবং অর্থং—ফলং বা স্বর্গাদিকম্ উদ্দিশ্য যৎ পুনঃ দানং দীয়তে, পরিক্লিষ্টং—চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবতি এবম্ভূতং যৎ তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [রাজস দানের কথা বলিতেছেন]—কালান্তরে এই ব্যক্তি আমার উপকার করিবে এই আশায়, অথবা স্বর্গাদি ফললাভের উদ্দেশ্যে ক্লেশযুক্ত চিত্তে যে দান তাহাকে রাজস দান বলে ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রত্যুপকারের নিমিত্তে ও ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত দেওয়ার সময় ক্লেশে দেয়—তাহার নাম রাজসিক দান—যেমন বেশ্যাকে দেওয়া।—যে দান প্রত্যুপকারের আশায় করা যায়, যে সময় বিশেষে এ লোক আমার অনেক কাজে লাগিবে, অথবা ফললাভের আশায়—এই যে দান করিতেছি এতদ্বারা আমার স্বর্গসুখ ভোগ হইবে, অথবা খেদযুক্ত হইয়া যে দান করা যায় - যাহা দিয়া মনে অনুতাপ হয়, একবারে এত দান না করিলেই হইত এইরূপ খেদযুক্ত চিত্তে যে দান তাহাকে রাজস দান বলে। সাধন

হইয়া যাইতে পারে—দুঃখী জীবকে সেই পথ দেখাইয়া দেওয়া তাহাকে সেই পথে পরিচালনা করা, তাহার সেই অনন্ত জীবন ব্যাপী অভাব মিটাইবার পন্থা ধরাইয়া দেওয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। বাসনার নিদারুণ ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করিবার উপায় যিনি বলিয়া দেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তাঁহার দানই সর্ব্বোচ্চ দান বলিয়া ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন—তাই তাঁহারা সেই দান কোথায় করিতে হইবে, সে দান গ্রহণের কেই বা যোগ্য পাত্র, এবং দাতাই বা সেই দান কি ভাবে দান করিবেন—তাহাই এই জ্ঞানময়ী গীতাগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকে সেই জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়াছেন কেন? কারণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যার ভাণ্ডারী, যিনি জগত জীবের ভবরোগের জ্বালা নিবারণের অমোঘ ঔষধ দানে সমর্থ, তিনি কিন্তু আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উদাসীন, তিনি লোভশূন্য, পরহিতব্রতে সমর্পিত জীবন—শাস্ত্র তাদৃশ মহাত্মাদিগকেই তো দানের যোগ্যতম পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু হায়, এখন আর এ দেশে সে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা সন্ধ্যাজপ-বিবর্জ্জিত, সংযমহীন, তপস্যাহীন, অবিদ্বান, কপটাচারী নামমাত্র ব্রাহ্মণ—সেরূপ ব্যক্তিকে দান করা তো শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন। অত্রিসংহিতায় আছে—

"অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ ॥"

যাহারা ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাশিক্ষা না করে, তাহাদিগকে যে গ্রামের লোক ভোজন করায়, রাজা সেই গ্রামের চৌরোচিত দণ্ড বিধান করিবেন।

সাধু বিদ্বানের প্রাপ্য অন্ন অবিদ্বান ও অতপস্ক লোকে গ্রহণ করিলে তাহার পরস্বাপহরণ হয় এবং যাহারা তাহাদিগকে দান করে তাহারা সেই অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয়দাতা বলিয়া তাহারাও দণ্ডাহ´।]

(তামসিক দান)

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

দিবার মত উপযুক্ত পাত্র নহে, কিন্তু তাহাকে সাধনা দিলে আমাদের দলে একজন ধনীলোক হইবে, তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে, এই সব হিসাব করিয়া যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সাধনা দেওয়া হয় তাহা রাজস দান। পাত্রত্ব বিচার না করিয়া সাধন দেওয়া হইল, পরে তাহার ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়াও তাহাকে যে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়—সে সবই রাজসিক দান ॥ ২১

অন্বয়। অদেশকালে (অপুণ্য দেশে বা অশুচিস্থানে এবং অশৌচাদি সময়ে ; অপুণ্য-জনক কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও মূর্খ, তস্কর এবং নটাদি অপাত্রে) অসৎকৃতং (সৎকার না করিয়া) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞাপূর্ব্বক) যদ্দানং দীয়তে (যে দান দেওয়া হয়) তৎ (তাহা) তামসং উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২২

শ্রীধর। তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশে—অশুচিস্থানে। অকালে—অশৌচাদি সময়ে। অপাত্রেভ্য—বিটনটনর্ত্তকাদিভ্যঃ, যদ্দানং দীয়তে। দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং—পাদপ্রক্ষালনাদি সংকারশূন্যম্। অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্। এবম্ভূতং দানং তামসং উদাহৃতম্—কথিতম্ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [তামসিক দানের কথা বলিতেছেন]—অশুচিস্থানে, অশৌচাদি সময়ে, অপাত্র অর্থাৎ বিট (ধূর্ত্ত) নট (জায়াজীবী বা বর্ণসঙ্কর) এবং নর্ত্তকাদিকে যে দান করা যায় তাহা তামস দান। দেশ, কাল ও সৎপাত্রের সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ভাবনা সত্ত্বেও (উপযুক্ত দেশ কাল পাত্র হইলেও) অসৎকৃত অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালনাদি সৎকারশূন্য ও অবজ্ঞাত অর্থাৎ তিরস্কারযুক্ত ভাবে যে দান দেওয়া হয় —এবম্ভূত দান তামস বলিয়া কথিত ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেশ কাল না বিবেচনা করিয়া অপাত্রেতে ও কুকর্ম্ম করিয়ে দেয়—তাহা তামস দান -যেমন কাহাকে মেরে ফেল্‌বার নিমিত্ত টাকা দেওয়া।—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়াই দান করিতে হয়, কিন্তু যে দান অপুণ্য দেশে, অকালে এবং মূর্খ তস্কর ও নটাদিকে দেওয়া হয় তাহা তামসিক দান। যদি বা উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত পাত্রও হয় কিন্তু দাতা যদি দানগ্রহণকারীকে প্রিয়সম্ভাষণ বা সমাদর না করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক (ব্যাটা দেহি দেহি করে জ্বালিয়ে ফেলে, দাও ওকে একটা টাকা ফেলে) দান করিয়া থাকেন—তাহা তামসিক দান। সেইজন্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্"। গ্রহীতার অসামর্থ্য জানিয়াও চরিত্রহীন, দুষ্ট লোকদিগকে যে সাধন দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার কোন উপকার তো হয়ই না, বরং সে সাধন লইয়া সকলের সমক্ষে সাধনাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে, তাহার অকল্যাণই হয়। তাহারা তামস প্রকৃতির লোক, তাহাদিগকে ক্রিয়া দিতে নাই ॥ ২২

(ব্রহ্মের নির্দ্দেশ)

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা ॥ ২৩

অন্বয়। 'ওঁ তৎ সৎ' ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশঃ (ব্রহ্মের নাম) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে)। তেন (তদ্দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণাদিত্রি বর্ণ) বেদাঃ চ (বেদ সকল) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (পূর্ব্বকালে বা সৃষ্টির আদিতে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে) ॥ ২৩

শ্রীধর। নন্থ এব বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদি প্রয়াসঃ ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ—পরমাত্মনো, নির্দ্দেশো—নাম ব্যপদেশঃ, স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্র তাবৎ "ওমিতি ত্রিবৃৎব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ্যোমিতি ব্রহ্মণো নাম। জগৎ-কারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ, অবিদুষাং পরক্ষোত্বাচ্চ। তৎ শব্দোহপি ব্রহ্মণো নাম। পরমার্থসত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সৎ-শব্দোহপি ব্রহ্মণো নাম। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। অয়ং ত্রিবিধোহপি নামনির্দ্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি। তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ, বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা—সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতাঃ—বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ সগুণীকৃতা ইতি বা। যদ্বা যস্মায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশঃ তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাঃ। তস্মাৎ তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশঃ অতি প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল এরূপ বিচারে তো সমস্ত যজ্ঞ তপস্যা দানাদিই রাজস বা তামস-প্রায় হয়, অতএব যজ্ঞাদির জন্য প্রয়াস বৃথা—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে তথাবিধ হইলেও, তাহাদের সাত্ত্বিকত্ব উপপাদনোপায় অর্থাৎ তাহাদিগকে সাত্ত্বিক করিবার উপায় আছে। সেই উপায় কি, তাহাই বলিতেছেন]—**ওঁ তৎ সৎ** এই তিনটি পরমাত্মার নির্দ্দেশ অর্থাৎ নাম দ্বারা ব্যপদেশ শিষ্টগণকর্ত্তৃক কথিত। তন্মধ্যে অকার, উকার, মকার স্বরূপ এই যে ত্রিবৃৎ ওঁকার ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নাম। জগৎকারণ বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ এবং অবিদ্বান ব্যক্তিদিগের পরোক্ষ (অগোচর) বলিয়া "তৎ" শব্দও ব্রহ্মেরই নাম, আর পরমার্থ সত্তা, সাধুত্ব ও প্রশস্ততা প্রভৃতি বুঝায় বলিয়া "সৎ" শব্দও ব্রহ্মেরই নাম। শ্রুতিতেও আছে—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।' এই ত্রিবিধ নাম বিগুণকেও সগুণ করিতে পারে—এইরূপে প্রশংসা করিতেছেন। এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের নাম দ্বারা সৃষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ-বিহিত অর্থাৎ বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বা গুণান্বিত করা হইয়াছে। অথবা যে ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক পবিত্রতম ব্রাহ্মণাদি সৃষ্ট হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের এই যে ত্রিবিধ নির্দ্দেশ বা নাম ইহা অতি প্রশস্ত ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের তিন স্থান—(১) ওঁকার—এই শরীর রূপ; (২) তৎ—কূটস্থ; (৩) সৎ—ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যিনি থাকিবেন, তিনি শরীরে প্রথমে ক্রিয়া করিবেন যাহার নাম যজ্ঞ। দান—ক্রিয়া করিবার

পর মন দেওয়া অর্থাৎ স্থিতি তপোব্রহ্মেতে থাকা। ক্রিয়া করিলেই ব্রাহ্মণ; ক্রিয়া করিয়া স্থিতি হইলেই জানিতে পারে, সেই জানার নাম বেদ—আত্মা ব্রহ্মেতে লীন করার নাম যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি।—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানেও সময়ে সময়ে অঙ্গহানি হইতে দেখা যায়, সেইজন্য ভগবান বৈগুণ্য নিবারণের উপায় বলিয়া দিতেছেন। প্রকৃত সত্য আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যকে অন্বেষণ করিতে গিয়া যাহা অসত্য, প্রমাদবশতঃ অনেক সময়ে তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে হয়, এ ভুল যাহাতে না হয় ভগবান তাহারই উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। সূর্য্যের আলোকসম্পাতে যেমন সমুদায় বস্তুই আলোকিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ আত্মার প্রকাশ এই দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির মধ্যে প্রকাশ আনিয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই সকলকে চৈতন্যযুক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। এখন যতদিন এই চেতয়িতাকে ধরিতে পারা না যায় ততদিন আত্মেতর বস্তুকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। প্রকাশের আধার অনন্ত, কিন্তু প্রকাশময় বস্তুটি এক অদ্বিতীয়। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে এবং অতীন্দ্রিয় সত্তা সমস্তই তাঁহার রূপ বা প্রকাশ। "সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে" যাহা কিছু সব তিনি, আবার সকলের নিয়ন্তাও তিনি। সমস্ত নামরূপের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ সত্তা যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে সেই আবরণ উন্মোচিত না হইলে তিনি যে কি তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"—সত্যের অনুসন্ধানী আমার জ্ঞানলাভের জন্য হে পরমাত্মন্ "তৎ" সেই চৈতন্য স্বরূপকে উন্মুক্ত অর্থাৎ প্রকাশ কর। সেই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের চৈতন্য ভাব জ্যোতির্ম্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।—ইহাই প্রাচীনতম জ্ঞানীদিগের প্রাণের ঐকান্তিক কামনা। যেই পরমধামের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতিঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইতেছে সেই জ্যোতিঃ যাঁহার তনুভা, তাঁহাকেই যেন সেই জ্যোতিঃ বা বিবিধ প্রকাশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে তন্মধ্যে চৈতন্য স্বরূপকে বুঝিতে পারা যায়,—হে প্রভু, সেই আবরণ তুমি উন্মোচন করিয়া দাও। জ্যোতিঃর জড়ত্ব ঘুচিয়া তাহাতে যেন চৈতন্যের স্ফুরণ হয়, জ্যোতিঃর অন্তরালে যে তুমিই রহিয়াছ ইহা যেন আমি বুঝিতে পারি। এখানে সেই উপায়টি ভক্তসুহৃদ ভগবান ভক্তকে বলিয়া দিতেছেন। ভগবান যেন ভক্তকে বলিতেছেন—আমার অন্বেষণে তোমাকে এখানে ওখানে কোথাও যাইতে হইবে না। তোমার মধ্যেই আমি রহিয়াছি, ভাবিয়া দেখ তুমি আমারই প্রকাশ মাত্র। একবার দিব্য চক্ষু উন্মীলন করিয়া বুঝিয়া লও যে সাধ্য ও সাধক একই বস্তু। তুমি যে শরীরটিকে দিনরাত বহন করিয়া বেড়াইতেছ বুঝিতে পার কি সে কাহার চৈতন্যে চৈতন্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে? এই স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সবই তো জড়। তাহারাই চৈতন্যের ভাণ করিয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছ, তাহারা যে জড় তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। এখন যদি সেই জড়াতীতকে অনুভব করিতে চাও তবে এই দেহসমষ্টিকে ভুলিবার চেষ্টা কর। প্রথমে এই স্থূল দেহের অন্তঃস্থিত সূক্ষ্মদেহকে বুঝিবার চেষ্টা কর, তন্মধ্যে আরও সূক্ষ্ম কারণ দেহ রহিয়াছে তাহাকে অন্বেষণ কর। একসঙ্গে সব জড়াজড়ি করিয়া আছে,—এই ত্রিবিধ দেহকে বুঝিলেই তন্মধ্যে দেহাতীত ব্রহ্ম চৈতন্যকেও বুঝিতে পারিবে। সেই ব্রহ্মের প্রকাশ স্থান তিনটি, তন্মধ্যে

স্থূলতম প্রকাশ যন্মধ্যে হয় তাহাই এই ত্রিদেহের সমষ্টি বা ত্রিপুর—উহাই ওঁ শব্দবাচ্য। ওঁকার ব্রহ্মের নাম ; নামের দ্বারা যেমন ব্যক্তির পরিচয় হয়, এই ত্রিবিধ শরীরস্থ চৈতন্য এই ত্রিবিধ শরীর দ্বারাই আমাদের নিকট পরিচিত, তাই ইহাও ব্রহ্মের নাম। ইহাই ব্রহ্মের কার্য্যরূপ নাম, উহার কারণরূপ নামও আছে। গৃহমধ্যস্থ পুরুষকে দেখিতে হইলে যেমন সেই গৃহে পৌছিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয়, তদ্রূপ এই ত্রিপুর-সমন্বিত দেহটিকেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রথম অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সাধনার জন্য তাই এই দেহটিকেই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তবে সত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই ত্রিপুর দেহই ওঁকারের রূপ বা ওঁকারময়। ওঁ=অ+উ+ম। অ—স্থূলশরীর, উ—সূক্ষ্মশরীর, ম—কারণ শরীর। এই তিনের বিকাশ নাদ বিন্দু কলা হইতে। "ঁ" যাহার সঙ্কেত। এই নাদ, বিন্দু, কলা তিনে মিলিয়াই প্রকৃতিরূপিণী জগন্মাতার রূপ—ইহাই আদ্যাশক্তি বিন্দুরূপা,—ইহাই চিদংশ জীবের সংজ্ঞা,—ইহাই "তৎ" স্বরূপের বাচ্য—ইহাই "এতস্য মহতো ভূতস্য নাম" ইহাই কারণ সৃষ্ট। "সৎ"—ব্রহ্ম, ইহা কার্য্য কারণের অতীত সত্তাময় ভাব—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" –সৃষ্টির পূর্ব্বে এই "সৎ" ই ছিলেন, ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম বা ক্রিয়ার পর অবস্থা দ্বারা উপলক্ষিত।

এই ব্রহ্মই জীবের চরম গতি, "নিধানং বীজমব্যয়ম্"। এই ব্রহ্মভাবকে অনুভব করিতে হইলে প্রথমে এই শরীরে ক্রিয়া করিতে হইবে। সে ক্রিয়া যদিও আপনা আপনিই হইতেছে, সাধককে কেবল তাহার পানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—উহারই নাম যজ্ঞ। সাধন দ্বারা প্রাণকে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন হয়, সেই জ্যোতিতে স্থির লক্ষ্য হইতে হইতে ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। তদ্দ্বারা প্রজ্বালিত আত্মসংযমরূপ অগ্নি দ্বারা প্রাণের স্থিরাবস্থা হয় এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির তিরোধান হয়। ইহাই আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে প্রাণের হোম করা। "ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে"। এই যজ্ঞ যিনি করেন তিনিই সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণই বেদপারগ অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়-বেত্তা। ক্রিয়া দ্বারা স্থিতিপদ লাভ হইলেই সেই সাধকের কোন কিছুই অজানা থাকে না—এই জানা বা জ্ঞানের নামই বেদ।

সাধক এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে ভূতময় প্রাকৃত দেহকে ব্রহ্মে লীন করিবেন। ভূতশুদ্ধি ইহাকেই বলে।

"ওঁ তৎ সৎ" এই তিনটিই পরমাত্মার নাম। এই তিন স্থানে তাঁহাকে বুঝিতে হয়। স্থূলাদি দেহগুলিকে যখন জানিলাম তখন "ওঁ"কারকে বুঝা হইল, পরে যখন কূটস্থ চৈতন্যকে সাধক বুঝিতে পারিলেন তখন তাঁহার "তৎ" নামটি বুঝা হইল। "তৎ"কে বুঝিলেই সাধক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন। পরে আরও উচ্চ অবস্থায় পৌছিয়া সাধক যখন নামরূপময় জগত ও আপনারও নামরূপ বিস্মৃত হইলেন যখন তাঁহাতে ডুবিয়া "অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়" সব এক হইয়া গেল, তখনই তাহা গুণাতীত অবস্থা, ইহাই "সৎ" শব্দের বাচ্যার্থ। এই তিনে মিলিয়াই সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। যখন তিনের প্রকাশ থাকে না কেবল একমাত্র "সৎ" থাকেন, তখন সৃষ্টি স্থিতি লয় কিছুই থাকে না। এই তিন

ভাবে মিলিয়া ব্রহ্মের লীলা বিলাস হইয়া থাকে। সেই জন্য এই তিনটি নামের মত পাবন আর কিছুই নাই। ব্রহ্মের এই পবিত্র নামত্রয় দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

এই ব্রহ্ম নাম অবাচ্য হইলেও ইহার এক প্রকার ধ্বনি আছে যাহা প্রাকৃত শব্দের মত না হইলেও উহা এক প্রকার ধ্বনি। উহা অশব্দের শব্দ। উহা কর্ণরন্ধ্রে শুনা না গেলেও শুনার মত অনুভব হয়। এই প্রণবের ত্রিমাত্রা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ, এবং প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা (৺) বিশ্বকারণ অনাদ্যা প্রকৃতিরূপ, তদুর্দ্ধে পরব্যোম বিদেহরূপ অবাচ্যাবস্থা। প্রণবের সপ্তাবয়বের মধ্যে মূলাধার হইতে বিশুদ্ধ (গুহ্যদ্বার হইতে কণ্ঠ) পর্য্যন্ত প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। আজ্ঞাচক্র বা ভ্রূমধ্য প্রকৃতিপুরুষের মিলন স্থান, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্রার নিরঞ্জন ব্রহ্মের স্থান। উহা কৈবল্য জ্ঞান দেহেরও উর্দ্ধে অতিতুর্য্যাবস্থা বা বিদেহভাব।

এই প্রণবকে জানিতে হইলে বা ইহার সূক্ষ্ম পবিত্র ধ্বনির সহিত পরিচিত হইতে হইলে সাধন শিক্ষার প্রয়োজন হয়। জীবহৃদয়ে যেমন অবিশ্রান্ত "লব ডপ" শব্দ হইতেছে যাহা জীবহৃদয় হইতে সর্ব্বাঙ্গে রক্তস্রোত বা জীবনধারাকে পরিচালনা করিতেছে, বাহিরের ঐ শব্দটি সেই আভ্যন্তরিক শব্দের অভিব্যক্তি মাত্র। এই শব্দ হইতেই সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে, এইজন্য এই শব্দটি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের হৃদয়ের সহিত গাঁথা আছে। বিশ্বের সমুদায় চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্য হইতে এই সুর নিয়ত নির্গত হইতেছে, একটু স্থির হইলেই তাহা শুনা যায়। প্রত্যেকে জীব হৃদয়ের এই "লব ডপ" শব্দ যেমন তাহার জীবনের পরিচায়ক তদ্রূপ বিশ্বরূপ ভগবানের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি অস্ফুট কোমল নাদ ঝঙ্কৃত হইতেছে তাহাই প্রণবধ্বনি। মানুষের হৃদয়ের "লব ডপ" শব্দ যেমন তাহার জীবনের পরিচায়ক, এই প্রণবধ্বনি বা নাদও তদ্রূপ বিশ্বাত্মার অস্তিত্বের স্মারক চিহ্ন। এইজন্য প্রণবই সকল মন্ত্রের প্রধান মন্ত্র, এবং এই মন্ত্রের সাহায্যেই বদ্ধজীব ভবাম্বুধি উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যোগীরা এই প্রণবধ্বনিকেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বলেন। বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরের হৃদয়ের সহিত যে সাধকের হৃদয় মিলিয়া যায় সেই সাধক তখন প্রণবধ্বনি শুনিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, এবং এই ধ্বনির সাহায্যেই সাধক নিজের হৃদয়কে পরমাত্মার হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া দিতে পারেন। প্রণবকে এইজন্যই ঈশ্বরের বাচক বলা হইয়াছে। আমার হৃদয়ের অস্ফুট ধ্বনির (লব ডপ) বাচ্য বা সঙ্কেত যেমন আমার জীবন বা "আমি", তদ্রূপ প্রণবধ্বনির বাচ্য সেই মহাচৈতন্য অবাচ্য, বিদেহ বা অগোচর ব্রহ্ম। ইহাই একমাত্র "সৎ" পদার্থ আর যাহা কিছু সমস্তই "অসৎ" বা পরিণামী। বিশ্বপ্রাণ ওঁকারকে যে বুঝিতে পারে সে আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ বলিয়াও বুঝিতে পারে। এই জ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে বেদ জ্ঞান। এই জ্ঞান যাহার হয় তাহারই মন্ত্র চৈতন্য হয়। তখন "ওঁ তৎসৎ" ভাবনা করিলেই একেবারে বিশ্বাত্মাকে মনে পড়ে, আর অভিমানযুক্ত "আমির" কর্ত্তৃত্বাভিমান লোপ পায়। তখনই চরাচর সমস্ত বিশ্বই বাসুদেবময় বলিয়া বোধ হয়।

তিনটি স্থানে ব্রহ্মের পরিচয় হয় সেইজন্য ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলেও এ তিনটি স্থানে জ্ঞান-প্রকাশেরও পার্থক্য হওয়ায় যেন ঐ তিনটি স্থানে নির্ব্বিশেষ ভাব ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এইজন্য ভজনশীল ব্যক্তিরা ভগবানকে "ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমরূপে" অনুভব করিয়া থাকেন। জাগ্রৎ

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় একই চৈতন্যের তিনটি বিভাব বুঝিতে পারা যায়। আবার বিলোম ভাবে দেখিলে (১) "সৎ" স্বরূপ ব্রহ্ম যাহা নিত্য সত্য অবিনাশী সত্তা তাহাই পরে নামিতে নামিতে বা ফুটিতে ফুটিতে (২) "তৎ" অর্থাৎ কূটস্থ জ্যোতিঃ, পরে আরও স্থূলভাবে ৩) এই ত্রিপুর সমন্বিত দেহ বা প্রকৃতি সেই জন্য ব্রহ্মকে জানিতে হইলে এই দৃষ্ট স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়াই সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। নিবিড় ভাবে সাধন করিতে করিতে যত মন ডুবিয়া যাইবে ততই স্থূলভাবের বিস্মৃতি হইবে। ইহাই নিজেকে দেওয়া বা তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণ যত নিবিড়ভাবে হইতে থাকিবে ততই তপোলোকে কূটস্থে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হইবে। এই স্থিতির পরিমাণের ন্যূনাধিক্য দ্বারাই জাতি নির্ণয় হয়। যাঁহাদের এই স্থিতি অত্যন্ত অধিক তাঁহারাই সাধন রাজ্যের ব্রাহ্মণ। এইরূপ ব্রাহ্মণের পদ-রজেই মানবের ভবব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে॥ ২৩

অন্বয়। তস্মাৎ (সেই জন্য) ওঁ ইতি (ওঁ এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (ব্রহ্মবিদগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম) সততং (নিরন্তর) প্রবর্ত্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়)॥ ২৪

শ্রীধর। ইদানীং প্রত্যেকং ওঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়ন্ ওঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ প্রশস্তঃ, তস্মাৎ ওমিতি উদাহৃত্য—উচ্চার্য্য কৃতা বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সততং—সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [এক্ষণে ওঁকারাদির (শব্দত্রয়ের) প্রত্যেকের প্রাশস্ত্য প্রদর্শন করাইবেন, তজ্জন্য প্রথমে ওঁকারের (প্রাশস্ত্য) বলিতেছেন]—যেহেতু ব্রহ্মের এইরূপ নির্দ্দেশ প্রশস্ত অতএব 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চার করিয়া বেদবাদীদিগের যজ্ঞাদি শাস্ত্রোক্ত যে ক্রিয়া তাহার অঙ্গবৈকল্য হইলেও প্রকৃষ্ট হয় [অর্থাৎ ওঁকার উচ্চারণের ফলে সগুণ হয়]॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা— তন্নিমিত্তে এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়া করিলেই দেখিতে পাইবে যে আত্মা ক্রিয়ার পর আপনা আপনি স্থির হইয়াছে এবং আত্মা ব্রহ্মেতে অর্পণ হইয়াছে ও স্বরূপে কূটস্থ ব্রহ্মে অবস্থিতি হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা—এই রকম কর্ম্মেতে ব্রহ্মবাদী যাঁ'রা সদা সর্ব্বদা থাকেন।—ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা এবং ধ্যান ধারণা করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন সেই সকল আত্মবিৎ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়া করিবে। বাস্তবিক "ওঁ" শব্দ মুখে বলিলে শুধু হইবে না, ইহা অনুচ্চার্য্য, এই ওঁকার যে শরীরত্রয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধীয় একটি সাধন আছে যে সাধন অভ্যাসের ফলে শরীরে যে অহংজ্ঞান আছে তাহা তিরোহিত হয়। ক্রিয়াভ্যাস করিলেই আপনা আপনি সেই স্থিরাবস্থা আসে, যেখানে আমিও থাকে না, আমারও থাকে না; তখনই সমস্ত কর্ম্ম

(তৎ)

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫

ব্রহ্মার্পণ হয় ও স্বরূপে অবস্থান হয়। তাঁহাদেরই যজ্ঞ দানাদি অর্থাৎ ক্রিয়া করা ও ক্রিয়াদানও এই অবস্থায় হইয়া থাকে। কিরূপে তাহা হয় এবং সেই যজ্ঞদানাদি যে কি তাহা ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। এই ওঁকারের সাধনাই কিন্তু ব্রহ্মে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণের উপায় ॥ ২৪

অন্বয়। তৎ ইতি ("তৎ" এই শব্দ) [উচ্চারণ করিয়া] ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলের অভিসন্ধি না করিয়া) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক) বিবিধাঃ (অনেক প্রকার) যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ দান ক্রিয়াঃ চ (যজ্ঞক্রিয়া, তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া) ক্রিয়ন্তে (করা হয়) ॥ ২৫

শ্রীধর। দ্বিতীয়ং নাম প্রস্তৌতি—তদিতি। উদাহৃত্য ইতি পূর্ব্বস্য অনুষঙ্গঃ। তদিতি উদাহৃত্য—উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈঃ মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ, ফলাভিসন্ধিম্ অকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে। অতঃ চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যজনেন মুমুক্ষুত্বসংপাদকত্বাৎ তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ। [দ্বিতীয় নামের (তৎ) প্রশংসা করিতেছেন]—পূর্ব্বশ্লোকস্থ "উদাহৃত্য" এই শব্দের সহিত "তৎ" পদের অনুষঙ্গ অর্থাৎ অন্বয়। "তৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধচিত্ত মোক্ষকাঙ্ক্ষী পুরুষগণ ফলাভিসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন। অতএব চিত্তশোধনদ্বারে (চিত্তশুদ্ধি দ্বারা) ফলসঙ্কল্পত্যাগ দ্বারা মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্ব হেতু (অর্থাৎ ফলকামনা ত্যাগ মোক্ষসাধক বলিয়া এই জন্য) "তৎ" শব্দ নির্দ্দেশ প্রশস্ত ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থেতে প্রবেশ করে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ক্রিয়া করে—ব্রহ্মে থেকে—দান ও বিবিধ রকমের অনুষ্ঠান মোক্ষাকাঙ্ক্ষী লোক—ক্রিয়া করেন।—মোক্ষার্থীরা কূটস্থে লক্ষ্য রাখিয়া যাবতীয় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহার ফলে তাঁহারা কূটস্থে প্রবেশ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া যান। যেমন তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি, সব ঘর্ষণে হয়, তদ্রূপ ক্রিয়া করিলে আত্মার প্রকাশ অনুভব হয়। যে আত্মাকে এমনই দেখিবার, বুঝিবার উপায় নাই, আছেন কি নাই এ সন্দেহও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে আছেন, তিনি যে সত্য তাহাই কূটস্থে থাকিতে থাকিতে অনুভব হয় যেন তাঁহাকে দেখিতেছি। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সেই আত্মাকে জানার মূল কিন্তু কূটস্থে থাকা। ব্রহ্ম অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে হৃদয়স্থ হইয়াও আনখাগ্র কেশ পর্য্যন্ত সকল শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই অণুস্বরূপ আত্মাই অন্যের শরীরেও ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এইজন্য অপরে যাহা মনে করে, নিজ মনে তাহা অনুভব হইতে পারে। সাধারণতঃ অনুভব হয় না মন চঞ্চল বলিয়া। চঞ্চল মন স্থির হইলে সকলকার মনের ভাব নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এ অবস্থাতে জানা, না জানা, এ মন সে মন প্রভৃতি পৃথক ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা পরব্যোমেতে আরোহণ করিতে পারিলে আর নানাত্বের উপলব্ধি নাই, কারণ সেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই ॥ ২৫

(সৎ)

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬

অন্বয়। পার্থ (হে পার্থ) সদ্ভাবে (সৎ অর্থাৎ আছে ; অস্তিত্ব বুঝাইতে) সাধুভাবে চ (সাধুভাব বা শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইতে) সৎ ইতি এতৎ (সৎ এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা (এবং) প্রশস্তে কর্ম্মণি (মাঙ্গলিক কর্ম্মেও) সচ্ছব্দঃ ("সৎ" শব্দটি) যুজ্যতে (ব্যবহৃত হয়) ॥ ২৬

শ্রীধর। সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে অস্তিত্বে; দেবদত্তস্য পুত্রাদিকম্ অস্তি ইতি অস্মিন্নর্থে সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিতি অস্মিন্নর্থে, সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে—মাঙ্গলিকে বিবাহাদি কর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে—প্রযুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [দুইটি শ্লোক দ্বারা "সৎ" শব্দের প্রাশস্ত্য বলিতেছেন]—"সদ্ভাব" অর্থাৎ (১) অস্তিত্ব অর্থে—যেমন দেবদত্তের পুত্র আছে এইরূপ অর্থে এবং (২) "সাধুভাব" অর্থাৎ সাধুত্ব যেমন দেবদত্তাদির পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ অর্থে 'সৎ' এই শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং (৩) প্রশস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ মাঙ্গলিক বিবাহাদি কর্ম্মেও এই কর্ম্মটি সৎ—এইরূপ "সৎ" শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয় ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সৎভাবে ব্রহ্মেতেই কেবল থাকে আটকিয়ে—সাধন ক্রিয়াতেই অনবরত লেগে থাকেন তাঁহারাই ক্রিয়া করিতে করিতে ব্রহ্মেতে লীন হন। প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে-শান্তিপদ অবস্থায় কর্ম্ম আর কিছুই থাকে না, তন্নিমিত্তে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই মনকে যোজনা করেন না।—সৎভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব। সৎভাব তখনই হয় যখন সাধক কেবল ব্রহ্মেতেই আটকিয়া থাকেন, অর্থাৎ সাধারণতঃ সকলের মন সংসারেই আটকাইয়া থাকে যাঁহাদের মন কেবল ব্রহ্মেতেই আটকাইয়া থাকে তাহাই "সৎভাব" বা কৈবল্যস্থিতি। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের প্রত্যয় উদিত হয় না। সাধুভাব—সাধন ক্রিয়াতে যিনি অবিরত লাগিয়া আছেন। তাঁহার কার্য্যই সাধু অর্থাৎ সম্যক্ আর সমস্ত কর্ম্মই বিষম কর্ম্ম, এ সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা সমতা আসিতে পারে না। কেবল প্রাণকর্ম্মে যিনি লাগিয়া থাকেন, তাঁহারই চিত্ত ব্রহ্মলীন হয়। এইজন্য এই প্রাণকর্ম্মকেও "সৎ" বলা হয়। যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ তাহা ব্রহ্মই। প্রশস্ত কর্ম্মও সৎ কর্ম্ম। প্র+শন্‌স্+ত=প্রশস্ত অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য কর্ম্ম, মঙ্গলকর্ম্ম। সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক ও প্রশংসাযোগ্য অবস্থা কি ? ক্রিয়ার পর অবস্থা, কারণ এই অবস্থায় চিত্তে সংসারভাব থাকে না, ইহাই পরম শান্তির অবস্থা সুতরাং এতদপেক্ষা আর কিছুই মঙ্গল জনক হইতে পারে না। লোকে সংসারে তাপে প্রতপ্ত হইয়া কেবলই হাহাকার করিতেছে। চিত্তের বহমুখী বৃত্তিই সংসার, কিন্তু এ অবস্থায় আর বৃত্তি থাকে না, কোন কর্ম্মও থাকে না, এই নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থায় মন কেবল ব্রহ্মেই যুক্ত হইয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়ে মন লাগিতেই পারে

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

না। উহাই শান্তিপদ, সেখানে প্রাণ স্থির সুতরাং কর্ম্ম কিছুই থাকে না। এই পরম মঙ্গলময় অবস্থা যে সাধনার দ্বারা প্রাপ্তি হয় সেই কর্ম্মও সৎ এবং যাঁহারা এই কর্ম্মে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকেন তাঁহারাই সাধু ॥ ২৬

অন্বয়। যজ্ঞে, তপসি, দানে চ (যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে) স্থিতিঃ (যে নিষ্ঠা বা তৎপরতা) সৎ ইতি চ (সং বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। তদর্থীয়ং (ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে) কর্ম্ম চ এব (কর্ম্মও) সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (সৎ বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৭

শ্রীধর। কিঞ্চ -যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু যা স্থিতিঃ—তাৎপর্য্যেণ অবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ—ফলং যস্য তৎ তদর্থং কর্ম্ম—পুজোপহার-গৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপন-রঙ্গ-মাঙ্গলিকাদিক্রিয়া, তৎ সিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে উদ্যান-শালিক্ষেত্র ধনার্জ্জনাদি বিষয়ঃ তৎ কর্ম্ম তদর্থীয়ং। তচ্চ অতিব্যবহিতমপি সদিত্যেব অভিধীয়তে। যস্মাৎ এবং অতিপ্রশস্তম্ এতন্নামত্রয়ং, তস্মাৎ এতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদ্গুণ্যার্থং কীর্ত্তয়েৎ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চ অর্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে। 'বিধেয়ং স্তুয়তে বস্তু' ইতি ন্যায়াৎ। অপরে তু "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি বর্ত্তমানোপদেশঃ "সমিধো যজতি" ইত্যাদিবৎ বিধিত্বয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুঃ। তত্তু 'সদ্ভাবে সাধুভাবে চ' ইত্যাদিষু প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ ন সংগচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—যজ্ঞাদিতে অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যায় ও দানে যে স্থিতি—তাৎপর্য্য বা তৎপরতারূপে যে অবস্থান তাহাও সৎ বলিয়া কথিত হয়। 'ওঁ তৎ সৎ' এই নামত্রয় যাঁহার তিনিই পরমাত্মা সেই পরমাত্মা হন "অর্থ" অর্থাৎ ফল যাহার এইরূপ যে কর্ম্ম—তাহাই তদর্থীয় কর্ম্ম—যেমন পূজোপহার সংগ্রহ, দেবগৃহাঙ্গন-পরিমার্জ্জন, উপলেপন, চিত্রবিচিত্রকার্য্য ইত্যাদি যে মাঙ্গলিক কর্ম্ম, এবং এই কর্ম্মগুলি সিদ্ধির জন্য করা হয় যে পুষ্পোদ্যান, ধান্যক্ষেত্র, ও ধনার্জ্জনাদিরূপ যে কর্ম্ম—তাহাই তদর্থীয় কর্ম্ম', সেই কর্ম্ম অতিশয় ব্যবহিত হইলেও "সৎ" এই বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু (ওঁ তৎ সৎ) এই নামত্রয় অতি প্রশস্ত, সেইজন্য সকল কার্য্য সদগুণযুক্ত করিতে হইলে এই নামত্রয় কীর্ত্তন করাই বিধি—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এ বিষয়ে অর্থবাদ (প্রশংসা) অনুপপত্তি হয় বলিয়া বিধি কল্পনাই উচিত। কারণ 'বিধেয়ং স্তুয়তে বস্তু'—বিধেয় বস্তুর স্তব করা হইয়া থাকে, এই ন্যায়ানুসারে বিধি-কল্পনাই উচিত। অপর কেহ বলিয়া থাকেন যে "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বর্ত্তমান উপদেশ "সমিধো যজতি" ইত্যাদির ন্যায় বিধিরূপে পরিণমনীয় অর্থাৎ বিধিরূপে পরিণত করিতে হইবে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ "সদ্ভাবে সাধুভাবে' এই শ্লোকে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে বিধি-কল্পনাই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ "ওঁ তৎসৎ" কেবল অর্থবাদ বা প্রশংসার্থ ব্যবহার হয় না, উহা কীর্ত্তন করাই বিধি ॥ ২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঃ চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া করবার সময় কূটস্থেতে থাকিবার সময় এবং ক্রিয়াদানের সময় কেবল ব্রহ্মেরই উদ্দেশ থাকে, এইরূপ স্থিতি সদাসর্ব্বদা ব্রহ্মেতে, যিনি আছেন, থাকেন, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ, কিম্বা কোন কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা কিছু করেন সেই ব্রহ্মকেই দেখিয়া এবং তাঁহারই উদ্দেশ করিয়া ব্রহ্মই সর্ব্বদা স্থির বুদ্ধিতে রাখেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—"যজ্ঞে অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্মে যে স্থিতি, তপস্যাতে যে স্থিতি এবং দানে যে স্থিতি তাহারই নাম সৎ। এবং তদর্থীয় অর্থাৎ 'ওঁ তৎসৎ' এই তিনটি শব্দের প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর তাঁহার জন্য যে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই সকল কর্ম্মই তদর্থীয় কর্ম্ম। সৎ এই শব্দটির দ্বারা তদর্থীয় কর্ম্মও অভিহিত হইয়া থাকে"—(শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ)। যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া যে স্থিতি, বা তপোলোক বা কূটস্থে থাকিবার সময় যে স্থিতি, এবং ক্রিয়াদানের সময় অর্থাৎ জীবের কল্যাণার্থ ক্রিয়ার উপদেশের সময় যে স্থিতি ইহা সমস্তই সৎভাব বা ব্রহ্মভাব। কারণ যিনি সদাসর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাকেন তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, সেই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত কার্য্যই ব্রহ্মোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ব্রহ্মকে বাদ দিয়া কিছু করিতে পারেন না। সকল কাজেই তাঁহার ব্রহ্মোদ্দেশ থাকে। যেমন নটী মস্তকে কলসী রাখিয়া হাবভাব দেখায় নৃত্য গীতাদি করে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য থাকে সেই কলসীর উপর, তদ্রূপ যোগীর ক্রিয়াজনিত যে স্থির বুদ্ধি হয়, সেই স্থির বুদ্ধিতে একমাত্র ব্রহ্মই লক্ষিত হন, সুতরাং তাঁহার সমস্ত কার্য্যাদি স্থিরবুদ্ধিতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া হয়। ইহা কিরূপে হয় তাহা যোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। শ্বাস সুষুম্নায় প্রবাহিত না হইয়া যে ইড়া পিঙ্গলায় চলিতেছে ইহাই কর্ম্মের বৈগুণ্য। এই বৈগুণ্য সমাধানার্থ "ওঁ তৎসৎ"এর উপদেশ। ইহা মুখে উচ্চারণ করাও পুণ্যজনক, কারণ ঐ মন্ত্র সত্যভাব ও সাধুভাবের উদ্দীপক। কিন্তু কেবল ঐ মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়াই চুপ থাকিলে উহার সম্যক্ ফল লাভ হইবে না। সেইজন্য আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তি ইহার প্রকৃত রহস্য ও সাধনা সদ্গুরুর নিকট জানিয়া লইবেন। এই সাধনে যিনি সিদ্ধ তিনিই প্রকৃত সাধু, তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদা স্থির ও ব্রহ্মে যুক্ত থাকে, সুতরাং তিনি যাহা করেন বা বলেন সমস্ত কার্য্যই তিনি ব্রহ্মে তন্ময় হইয়াই করেন, তাই তাঁহার কর্ম্ম ও বাক্য সমস্তই ব্রহ্মভাবময় ও সত্যময় হইয়া থাকে ॥ ২৭

অন্বয়। অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাসহকারে) হুতং (হোম), দত্তং (দান) তপ্তং তপঃ (অনুষ্ঠিত তপস্যা) যং চ কৃতং (এবং অন্য যাহা করা হয়) [সে সমস্ত] অসৎ ইতি উচ্যতে (অসৎ কথিত হয়), পার্থ! (হে পার্থ) তৎ (তাহা) ন ইহ (না ইহলোকে) ন প্রেত্য (না পরলোকে) [কোন কাজে লাগে] ॥ ২৮

শ্রীধর। ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থম্ অশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং—হবনং, দত্তং—দানং, তপঃ তপ্তং—নির্ব্বর্ত্তিতং। যচ্চ—অন্যদপি কৃতং কর্ম্ম। তৎ সর্ব্বং অসৎ ইত্যুচ্যতে। যতঃ তৎ প্রেত্য - লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ। নো ইহ—ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।

তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য অশ্রদ্ধাকৃত কর্ম্ম সকলের নিন্দা করিতেছেন]—অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক হুত অর্থাৎ হবন, দত্ত অর্থাৎ দান, আর তপ্ত অর্থাৎ সম্পাদিত তপস্যা। আর অন্য যাহা কৃত কর্ম্ম, সে সমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু তাহা অঙ্গবৈগুণ্য হেতু লোকান্তরে কোন ফল দান করে না আর অযশস্কর হেতু ইহলোকেও ফলপ্রদ হয় না ॥ ২৭

শ্রীধরস্বামী এই অধ্যায়ের সারার্থ বলিতেছেন—

রজস্তমোময়ী শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া সত্ত্বময়ী শ্রদ্ধার যে আশ্রয় করে, সে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হয়—ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রহ্মেতে না থেকে হোম করা (ওঁকারের ক্রিয়া), দেওয়া (ক্রিয়া দান), তপস্যা করা অর্থাৎ কূটস্থে থাকা—ব্রহ্মেতে না থেকে করিলেই অসৎ হইল, তাহার ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ নাই।—কর্ম্ম যদি তদর্থীয় না হয় তবেই অসৎ হইল। কর্ম্ম কিরূপে তদর্থীয় হয়? শ্রদ্ধার সহিত সাধন করিলেই অভিমান নষ্ট হইয়া যায়, অভিমানের সহিত কর্ম্ম যদি ভালও হয় তবুও তাহা শুভফল প্রদান করে না। গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রোপদেশ অমান্য করিয়া যাহারা স্বেচ্ছাচার বশে কার্য্য করে তাহাদের কার্য্য কখনও সাত্ত্বিক হয় না। অর্থাৎ সে কার্য্যের দ্বারা কখনও সুষুম্নায় প্রাণ প্রত্যাবর্ত্তন করে না। সুষুম্নায় প্রাণ পরিচালিত হইলে তবে যে কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা সমস্তই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। এইরূপে যে কর্ম্ম সাত্ত্বিক নহে, তাহাতে প্রবৃত্তির প্রাবল্য থাকায় তাহা ইহকালেও আনন্দজনক হয় না, এবং পরকালেও মঙ্গলদায়ক হইতে পারে না। কেন সাত্ত্বিক ভাবে কর্ম্ম হওয়া আবশ্যক? সাত্ত্বিকভাব অর্থাৎ সুষুম্নায় প্রাণ প্রবাহিত না হইলে কাহারও আত্মপ্রত্যক্ষ হয় না, এবং স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদির অতীত হওয়া যায় না। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহরূপ উপাধি থাকিতে কাহারও প্রকৃত জ্ঞান ভক্তির উদয় হয় না। ইড়া পিঙ্গলায় যাহাদের শ্বাস বহে তাহারা জ্ঞানলাভের অধিকারী নহে, সেইজন্য শ্বাস যাহাতে সুষুম্নায় প্রবাহিত হয় এইরূপ ভাবে সাধনায় প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ হইবে। ব্রহ্মে স্থিতি লাভ না করিয়া ওঁকার ক্রিয়াই কর, আর কূটস্থেই থাক বা সহস্র সহস্র লোককে ক্রিয়াদানই কর তাহাতে কোন প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইবে না। ঐ সকল ক্রিয়া করিলে তজ্জনিত কিছু বাহিক সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু

তাহা কামোপভোগকে অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া তাহা অসৎ অর্থাৎ সে ক্রিয়ায় প্রকৃত কল্যাণ হয় না। কিন্তু যিনি জাগতিক লাভালাভের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণের টানে প্রীতির সহিত নিত্য নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া করেন, তাঁহার সেই পরিশ্রম সফল হয় অর্থাৎ তাহা ভগবদ্প্রীত্যর্থ হয় বলিয়া তাহাতে জাগতিক ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে না, তাহা শুদ্ধ অচ্যুতের চরণ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যায়—এইরূপ সাধকের সমস্ত কর্ম্মই ভগবদোদ্দেশে সাধিত হয়, সুতরাং তৎকৃত আহার বিহার পূজা সাধন করা ও সাধন দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মই সাত্ত্বিক হইয়া যায়। এইরূপে যোগী সত্ত্বশুদ্ধির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি ভক্তি ও জ্ঞান লাভের অধিকার লাভ করেন। এই অধিকার লাভের জন্যই ভগবান "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্রের উপদেশ করিলেন। এই মন্ত্র যে জানে এবং ইহার সাধন করে তাহারই অধিকার প্রাপ্তি হইতে পারে, নচেৎ লোকদেখানো সাধন করিলে কোন ফলই হইবে না॥ ২৮

ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার
সপ্তদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

(মোক্ষযোগঃ)

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। মহাবাহো! (হে মহাবাহো) হৃষীকেশ! (হে হৃষীকেশ) কেশিনিসূদন! (হে কেশিনিসূদন) সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং (সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব) পৃথক (পৃথকরূপে—পরস্পর বিভক্ত ভাবে) বেদিতুম্ ইচ্ছামি (জানিতে ইচ্ছা করি) ॥ ১

শ্রীধর। ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থ বিনির্ণয়ে ॥

অত্র চ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।" "সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা" ইত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টঃ, তথা—"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ"—৪।২০, "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্"—১২।১১, ইত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানম্ উপাদিষ্টম্। ন চ পরস্পর-বিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ উপদিশেৎ। অতঃ কর্ম্মসংন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চ অবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুঃ অর্জ্জুন উবাচ – সংন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ—সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক,হে কেশিনিসূদন—কেশি নাম্নো মহতো হয়াকৃতেঃ দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষয়িতুম্ আগচ্ছতঃ অত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তে নৈব বাহুনা কর্কটিকাফলবৎ তং বিদার্য্য নিসূদিতবান্। অতএব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনম্। সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক—বিবেকেন বেদিতুম্ ইচ্ছামি ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। [পরমার্থ বিনির্ণয় যে অষ্টাদশ অধ্যায় তাহাতে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিভাগ কথন দ্বারা সমগ্র গীতার্থসংগ্রহ স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন]

[৫ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা" এবং ৯ম অধ্যায়ে ২৮শ শ্লোক "সন্ন্যাস-যোগযুক্তাত্মা" প্রভৃতির দ্বারা কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গ" এবং ১২শ অধ্যায়ে "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং" প্রভৃতি শ্লোকে ফলমাত্র ত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু পরম কারুণিক সর্ব্বজ্ঞ ভগবান পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের উপদেশ কথনই দিতে পারেন না, অতএব কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান এতদুভয়ের বিরোধ যাহাতে না হয় তাহাই বুঝিবার জন্য ইচ্ছুক] অর্জ্জুন বলিতেছেন—হে হৃষীকেশ অর্থাৎ হে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন—কেশী নামক বৃহৎ অশ্বাকৃতি এক দৈত্যের বিস্তৃত মুখে বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আবার সেই হস্তকে বিবৃদ্ধ করিয়া সেই বাহু দ্বারা কর্কটিকা (কাঁকুড়) ফলের ন্যায় তাহাকে

বিদীর্ণ করিয়া বধ করিয়াছিলেন। এবং এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে মহাবাহু বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন হে শ্রীকৃষ্ণ! সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক বিচার পূর্ব্বক (অর্থাৎ তাহাদের পার্থক্য) জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখা—শরীরের তেজের দ্বারা প্রকাশ হইতেছেঃ—সন্ন্যাস আর ত্যাগের পৃথক কি?—ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে দ্বিজাতির জন্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে চতুরাশ্রমই বিহিত হইয়াছে। চতুরাশ্রম যথাক্রমে (১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস। প্রত্যেক পরবর্ত্তী আশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিতে হয় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রম হইতে, সুতরাং কোন আশ্রমটিকেই ত্যাগ করা চলে না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগারগুলিতে পৃথক পৃথক শ্রেণী বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক পাঠার্থীকে এক একটি শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিয়া পরবর্ত্তী শ্রেণীর পাঠ্য পড়িবার যোগ্যতা লাভ করিতে হয় এবং যোগ্যতা লাভ হইয়াছে কিনা তজ্জন্য পরীক্ষা দিতে হয়, পরীক্ষার পর যোগ্য বিবেচিত হইলে ছাত্রকে উচ্চ শ্রেণীতে পাঠের অধিকার দেওয়া হয়। ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রম বিভাগকেও উক্তরূপ শ্রেণীবিভাগের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পার্থক্য এই যে শিক্ষাগারের শ্রেণী-বিভাগ সংখ্যায় বহু হইলেও তাহা কয়েক বৎসরের চেষ্টাতেই অতিক্রম করা যায়, কিন্তু ঋষিদের বর্ণাশ্রম বিভাগের উন্নত শ্রেণীর অধিকার লাভ কতিপয় বর্ষের মধ্যে কুলায় না, এমন কি বহু জন্মও লাগিতে পারে। জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এই সংসার-পাঠাগারে পাঠাভ্যাসের জন্য জীবসমূহ প্রেরিত হয়; যেমন পাঠাভ্যাসে নিপুণতা লাভ করিতে থাকে, শিক্ষার্থীগণ পরজন্মে তদনুরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে আসিয়া মিলিত হয়। উদ্দেশ্য আরও উচ্চতর শিক্ষালাভ। এই সংস্কারানুযায়ীই জীব আগামী জন্মের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। যাহার যেরূপ অভ্যাস ও চেষ্টা সে তদনুরূপ ফল লাভ করে। এই শিক্ষার চিহ্ন প্রতি জন্মেই সংস্কাররূপে প্রত্যেক জীবের শরীরে, ইন্দ্রিয়ে ও মনে লাগিয়া থাকে। তাহারই ফলে চারি প্রকারের জীব জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) মুক্ত, (২) মুমুক্ষু, (৩) সংসারী, ও (৪) পাষণ্ড। প্রথম—মুক্ত পুরুষ—ইঁহারা জ্ঞানী, ইঁহাদের পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। মোক্ষরূপ পরমানন্দের অধিকারী হওয়ায় তাঁহাদের আর কর্ম্মের সহিত বাধ্য বাধকতা নাই, সুতরাং কর্ম্মলেপও আর তাঁহাদের থাকিতে পারে না। (২) মুমুক্ষু, (৩) সংসারী ও (৪) পাষণ্ড—এই তিন শ্রেণীর অভ্যুদয়ের নিমিত্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে—এবং বর্ণবিভাগও তাঁহাদের কর্ম্মের আনুকুল্যের জন্যই ব্যবস্থিত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরা মুমুক্ষু, ক্ষত্রিয়েরা মুমুক্ষু ও সংসারী, বৈশ্যেরা সংসারী এবং নীচবৃত্তিযুক্ত ক্রূর পাষণ্ডেরাই শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সর্ব্বনিম্নশ্রেণীরাও কর্ম্মানুযায়ী ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন, শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা আছে, এই ক্রমোন্নতির ফলে তাঁহারা সংসারী ও মুমুক্ষু হইয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ গৃহস্থ হইয়া বর্ণবিহিত গৃহস্থাশ্রমের নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়া ও সাধনায় সফলকাম হইবার জন্য পূর্ণরূপে আত্মবল প্রয়োগের জন্য তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম ও আপনাকে উপযুক্ত বোধ করিলে সন্ন্যাসাশ্রম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। এখন যেমন অধিকার থাক বা না থাক ইচ্ছা হইলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়, পূর্ব্বকালে এইরূপ স্বেচ্ছামত সন্ন্যাসগ্রহণের

উপায় ছিল না। এইজন্য তখন চতুর্থাশ্রমে লোকের সংখ্যা খুবই পরিমিত ছিল। তাহা ছাড়া তিনটি আশ্রমের কার্য্য শেষ করিতে করিতেই অনেকের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া যাইত। তখনকার লোকের এতটা বিচার ছিল যে তাঁহারা অনুপযুক্ত হইয়া উচ্চতর আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমেই সংখ্যাতিরিক্ত লোকের সমাগম হইতে পারিত না। যেমন যেমন সাধনার দ্বারা জ্ঞান বিকশিত হইত তদনুযায়ী তাঁহারা উচ্চাশ্রম গ্রহণ করিতেন। জন্মান্তরের কর্ম্মফলই উচ্চবর্ণের মধ্যে জন্মলাভের কারণ বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। এখনকার মত বইপড়া বিদ্যা তাঁহাদের সম্বল ছিল না। খোঁড়াইয়া উচু হইবার প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না, সেরূপ প্রবৃত্তি থাকিলেও রাজশাসন তাহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়া দিত—সুতরাং আধুনিক সময়ের মত অনধিকারী প্রবেশ করিয়া কোন আশ্রমকেই অযথা কলঙ্কিত করিত না। অবশ্য শ্রুতিতে এরূপ আদেশও আছে—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" যখনই বৈরাগ্য হইবে তখনই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। এই নিয়মের বলে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াও কেহ কেহ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব স্বল্পই ছিল। এইভাবে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ তাহার পক্ষেই বিহিত ছিল যাহার প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত হইত, এবং সে বৈরাগ্য ভাবের গতি কেহ রোধ করিতে পারিত না, কোন বাহ্যিক আকর্ষণই সেরূপ বৈরাগ্যবানকে আর টানিয়া রাখিতে পারিত না, সুতরাং তাহার পক্ষে প্রতি আশ্রমের যে শিক্ষা তাহা আর প্রয়োজন হইত না। এখনও যেমন উৎকৃষ্ট মেধাবী ছাত্রকে দ্বিগুণ উন্নীত করিয়া (double promotion) দেওয়া হয়, শাস্ত্রে উপযুক্ত লোকের জন্য সে ব্যবস্থারও অভাব ছিল না। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত এই ধরণের উন্নতি লাভ কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। তখন রাজশাসন ও সমাজ শাসন শাস্ত্রশাসনের অনুবর্ত্তী ছিল, সুতরাং শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘিত না হয় এ বিষয়ে মনিষী মাত্রেরই একটি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তখন অনধিকার প্রবেশ ছিল না বলিলেই হয়। বৌদ্ধ বিপ্লাবনের পর বেদবিধি সুরক্ষিত ও সমাজ সুপরিচালিত করিবার জন্য লোকশিক্ষকদিগের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হওয়ায় আচার্য্য শঙ্কর সন্ন্যাসী সমাজের আয়তন বিবৃদ্ধ করিবার জন্য উপরোক্ত বেদবিধিকে আশ্রয় করিয়া সমাজে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেন। অবশ্য তখনও লোকে শাস্ত্রবিধি যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করিত। বর্ত্তমান যুগের মত শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত সন্ন্যাসীর সংখ্যা তখনকার কালে একেবারে অবিরল না হইলেও এখনকার মত যে তাহাদের মাত্রাধিক্য ছিল না তাহা নিশ্চয়। সুতরাং তখনকার দিনে যখন ভগবান অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিতেছিলেন—সেই যুগে যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানের অভিলাষও জন্মে নাই—তাহাদের জন্য সন্ন্যাস বিহিতই ছিল না—সুতরাং সেই সব শ্রেণীর লোকদিগের কর্ম্ম-সন্ন্যাসের ব্যবস্থার জন্য যে সন্ন্যাসের অতিরিক্ত আর একটি ত্যাগীর শ্রেণী বিভাগ করিতে হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যাহাদের জ্ঞানের অভিলাষই নাই, তখন তাহাদের পক্ষে ত্যাগ বা সন্ন্যাস কিরূপে সম্ভব হইবে বুঝিয়া উঠা যায় না। আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষেচ্ছার জন্যই সন্ন্যাসাশ্রম, যখন সে ইচ্ছাই তাঁহাদের জন্মে নাই তখন তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বা ত্যাগীর টানিয়া আনিবার প্রয়োজনই বা কি? শ্রুতি বলেন "জ্ঞানাদেব তু

কৈবল্যম্”—জ্ঞান হইলেই কৈবল্য লাভ হয়। এই জ্ঞান সহজলব্ধ নহে। পুঁথি পড়িয়া জ্ঞানের উচ্চ উচ্চ কথা আওড়াইলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। উহার অধিকারী হইতে হয়। যে জ্ঞানে সমস্ত অনৈক্য বা ভেদকে এক করিয়া দেয় তাহা বহু সাধনার ফলে কোনও ভাগ্যবান লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহার জ্ঞানাভিলাষ আছে, তাঁহাকে প্রথমে অধিকারী হইতে হইবে। এজন্য সাধনাভ্যাস চাই। সাধনাভ্যাস দ্বারা হৃদয় কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে তবে হৃদয়ে বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। সেই প্রজ্বলিত বৈরাগ্যানলে সমস্ত বিষয় বাসনা হবিঃরূপে প্রদত্ত হইলে তখন আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে। যে সাধনাভ্যাস আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় তাহাও অধিকারী ভেদে চারি প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম বহিঃপূজা, জপ, শ্রবণকীর্ত্তনাদি। দ্বিতীয় পূজা—প্রাণতত্ত্বের সহিত পরিচিত হওয়া। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে তখন মন ও ইন্দ্রিয়াদি স্থির হইয়া অন্তর্মুখী হয়। এই সময় হইতে অন্তর্পূজা আরম্ভ হয়। বহিঃপূজার মত সেখানেও পুষ্প, ধূপ, দীপ, অঞ্জলি ও আরতি সবই আছে, তবে তাহাতে আর কায়ক্লেশ নাই, কেবল স্থির মনের দ্বারাই ঐ পূজা সম্পাদ্য। এইরূপে ভূতাত্মা ও সূত্রাত্মার পূজা সমাপ্ত হইলেই ভূতে ভূতে যিনি প্রকাশিত রহিয়াছেন সেই একমাত্র প্রকাশ স্বরূপের পূজাই তৃতীয় অধিকারীর পূজা—তখন “ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়”। ইহা কেবল স্থির মনে ধ্যেয় বস্তুর ধ্যান বা তন্মধ্যে তদ্গত হইয়া যাওয়া। চতুর্থ অধিকারে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের অতীত হইয়া আত্মাকারে বা স্ব স্বরূপে অবস্থান। ইহাই প্রপঞ্চাতীত অবস্থা, এই অধিকারে মায়ার লেশমাত্র থাকে না। উহা শুদ্ধ অদ্বৈতানন্দ বা ব্রহ্মভাব বা ক্রিয়ার পরাবস্থা।

যাঁহারা পূর্ব্ব-সুকৃতি বশে বৈরাগ্যবান হইতে পারিয়াছেন, সুতরাং যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহাদের জ্ঞান পরিপাকার্থে সন্ন্যাসকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) বিবিদিষা সন্ন্যাস (২) বিদ্বৎ সন্ন্যাস। যাঁহারা পূর্ব্ব সংস্কারাভ্যাসে মুমুক্ষু হইতে পারিয়াছেন সুতরাং ঐহিক সুখ সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় উদাসীন তাঁহাদের অত্যল্পকাল সাধনেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, কারণ তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই সংসারের লাভালাভের প্রতি উদাসীন, তাঁহাদের চিত্তমল যৎসামান্য থাকায় অল্পদিনের সাধনাতেই তাঁহাদের প্রাণ ও তৎসহ মনের স্থিরতা সহজেই হইয়া থাকে। যাঁহাদের প্রাণ অল্লায়াসেই সুষুম্নায় প্রবেশলাভ করে তাঁহারা শীঘ্রই ব্রহ্মভাব-ভাবিত বা ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত বা আত্মস্থ হইতে পারেন। এইরূপ যাঁহাদের চিত্ত প্রক্ষীণদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে—তাঁহাদের মন হইতে জীর্ণত্বকের মত কর্ম্মাসক্তি স্খলিত হইয়া যায়—এইরূপ সাধকেন্দ্রদের জন্য যে সন্ন্যাস তাহাই স্বাভাবিক সন্ন্যাস, তাহাকেই বিদ্বৎ সন্ন্যাস বলা হইয়া থাকে। এ সন্ন্যাসের জন্য কোন বিধিবিধান বা আয়োজন নাই। ফল অতিশয় পক্ক হইলে যেমন আপনিই বৃন্তচ্যুত হয়, সেইরূপ সংসার হইতে তাঁহাদের মন স্বাভাবিক ভাবেই মুক্ত হইয়া যায়। ইহার জন্য কোন পাঠশালে নাম লিখাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ অধিকারী নহেন অথচ মুমুক্ষুত্ব ভাব আছে, সংসারে অনাসক্তিও কতক পরিমাণে আছে, তাঁহাদের শমদমাদি ও অনাসক্তি ভাবকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে, সেই বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে গ্রহণ

করাকেই "বিবদিষা" সন্ন্যাস বলে। ইহা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস নহে, ইহা সন্ন্যাসের শিক্ষানবিশী মাত্র।

এই অধ্যায়ে "ত্যাগ" ও "সন্ন্যাস" বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই দুইটি শব্দের ধাতুগত অর্থ একই, কিন্তু "ত্যাগ" শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে গৃহীত হইয়াছে। এই "ত্যাগ" কথাটির আলোচনায় দেখা যায় "ত্যাগ" শব্দটি ভগবদ্গীতার নিজস্ব ও সন্ন্যাস হইতে উহার যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের কল্যাণের জন্য ত্যাগের একটি বিশিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করিয়া যেন লোকচক্ষুর সম্মুখে উহাকে নূতন করিয়া ধরিলেন। ইহা বেদবিরুদ্ধ নহে, কিন্তু তখনকার সমাজে উহা অবিজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। বহুপূর্ব্বে কৃত যুগাদিতে ত্যাগ ও সন্ন্যাসকে পৃথক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু কালচক্রের বিড়ম্বনায় জীবের মতিগতি যখন হীন ও অশুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তখন আবার এই সন্ন্যাস ও ত্যাগের কথা জনসমক্ষে প্রচার করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সন্ন্যাস ও ত্যাগের ধাতুগত অর্থ যে একই তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু কালক্রমে সন্ন্যাসের একটা রূঢ় অর্থ সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। যদিও সন্ন্যাসী বলিতে প্রকৃত পক্ষে বুঝায়— "সদয়ে বা কদয়ে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।

সমবুদ্ধির্যস্তশশ্চৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥"

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, কিন্তু পরে সন্ন্যাসীর বেশগ্রহণটাই যেন বড় হইয়া পড়িয়াছিল। যথা:—"দণ্ডকমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।

নিত্য প্রবাসী নৈকত্র ন সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥"

সন্ন্যাসীর এই শেষোক্ত অর্থই যখন বিশেষভাবে প্রবল হইতে লাগিল, তখন সন্ন্যাসীর মধ্যেও বিবিধ ভেদ ও বিবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু অতি প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় উহা অনুমোদিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়। সন্ন্যাসের আসল কথা তো ঘর বাড়ী ছাড়াও নহে, বেশভূষা পরাও নহে। সন্ন্যাসের প্রকৃত কথা বুদ্ধির সমতা। সমবুদ্ধিভাবাপন্ন হইয়া কেহ যদি সদ্গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারীও হন, তবে তিনি বেশধারী সন্ন্যাসী না হইলেও যথার্থরূপে তিনিই সন্ন্যাসী। মুনীশ্বর দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা শুকদেব কেহই গৃহত্যাগী ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা সন্ন্যাসী। গীতায় ভগবান এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥" ৫।৩

যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। যেহেতু, হে মহাবাহো, রাগদ্বেষাদিশূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান আবার বলিয়াছেন—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"

যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য বোধে বিহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী।' নিরগ্নি (অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগী) অথবা অক্রিয় (অনগ্নিসাধ্য কর্ম্মাদি ত্যাগী) সন্ন্যাসীও নহেন, যোগীও নহেন।

এখানে ভগবান স্পষ্টতঃ প্রচলিত সন্ন্যাসের প্রতিবাদ করিলেন। সন্ন্যাসাশ্রম খারাপ বলিয়া যে প্রতিবাদ করিলেন তাহা নহে, অত্যাশ্রমী বা সন্ন্যাসীরাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু অনধিকারে এই আশ্রম গ্রহণ করায় সমাজে বিপ্লব উৎপন্ন হইবে এই আশঙ্কায় তিনি সাজা সন্ন্যাসীদের নিন্দা করিলেন। উপযুক্ত সন্ন্যাসীদের সহিত ত্যাগী গৃহস্থ যোগীদের সমান আসন প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসীরা জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন ও গৃহত্যাগী এবং ত্যাগীরা ভক্ত জ্ঞানী ও কর্ম্মী কিন্তু গৃহী, সেই সকল জ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মযোগীদের কর্ম্ম কিরূপে সন্ন্যাসে পরিণত হয় ভগবান এই কথাই গীতায় বিশেষভাবে বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী বলিলেই একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া থাকে, সেইজন্য যাঁহারা গৃহত্যাগী নহেন অথচ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্ত সাধক, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সম-অর্থবোধক "ত্যাগী" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দটি ব্যবহার করিলে বিশিষ্ট আশ্রমভুক্ত "সন্ন্যাসী" বলিয়া ভ্রম হইবে না, কিন্তু সন্ন্যাসীর সম-উদ্দেশ্যবোধক অর্থ হইবে। অর্থাৎ অত্যাশ্রমী না হইয়াও লোকে সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর মত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারেন, ভগবান "ত্যাগী" শব্দ দ্বারা সেই সব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের যেন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। "সন্ন্যাস ও ত্যাগ" যে পৃথক উদ্দেশ্যবোধক তাহা তিনি এই অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে অতি স্পষ্টভাবে উভয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। "ত্যাগী" শব্দটি প্রাচীন হইলেও ভগবান গীতায় আবার নূতন করিয়া লোকসমাজে উহার প্রচার করিলেন। তাই তাহার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণও করিয়া দিলেন। সমাজে তখন এমন সব মনিষী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহারা সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহারা সংসারও ত্যাগ করেন নাই অথচ ত্যাগের উচ্চ দৃষ্টান্ত তাঁহাদের জীবনে বর্ত্তমান ছিল, হয়তো কাহারও কাহারও সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক অধিকারও ছিল না কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত অত্যাশ্রমীদের পক্ষেও অনুকরণীয় ছিল—যেমন ভীষ্ম,যুধিষ্টির, বিদুর প্রভৃতি। তাঁহাদেরই স্থান নির্দ্দেশের জন্য এই "ত্যাগী" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গীতার এই অধ্যায়ে তাহার লক্ষণাদি ও সন্ন্যাসীর লক্ষণ হইতে যেটুকু তাহার পার্থক্য তাহাও ভগবান বলিয়া দিয়াছেন। "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা, সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ, ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্লোকে ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে পারিলে, এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদবিহীন ব্যক্তির কর্ম্ম-বন্ধন হয় না ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা অত্যাশ্রমী না না হইয়াও তিনি যে সন্ন্যাসীর উচ্চ পদবীতে উঠিতে পারেন এইসব শ্লোকে ভগবান স্পষ্টতঃ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবান ভাগবতেও উদ্ধবকে মোক্ষের তিনটি উপায় বলিয়াছেন—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম। "নির্ব্বিণ্ণানাম্ জ্ঞানযোগঃ ন্যাসিনাম্ ইহকর্ম্মসু"—দুঃখ-বুদ্ধিতে কর্ম্মফলে বিরক্ত অতএব সেই সকল কর্ম্মত্যাগীদের জন্যই জ্ঞানযোগ—ইহাই সন্ন্যাসা-শ্রমের পালনীয় ধর্ম্ম। "তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাম্ কর্ম্মযোগস্তু কামীনাম্"—দুঃখবুদ্ধিশূন্য ফলে

শ্রীভগবানুবাচ।

(কাম্যকর্ম্ম বর্জ্জনই সন্ন্যাস)

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

অবিরক্ত পুরুষের জন্যই কর্ম্মযোগ। আর "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণঃ নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥"—যদৃচ্ছাক্রমে মৎকথাতে জাতশ্রদ্ধ যে পুরুষ বিরক্ত নহে, আর অত্যন্ত আসক্তও নহে, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ। অর্থাৎ যে কামে আসক্ত কর্ম্মযোগই তাহার আশ্রয় স্থান আর যে মৎকথায় জাতশ্রদ্ধ, সর্ব্বকর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ ও কামকে দুঃখাত্মক বলিয়া বুঝিলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই ভেষজ বলিয়া জানিবে, পরন্তু যে কামকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, জ্ঞানযোগ তাহারই অবলম্বনীয়।

বর্ত্তমান কালে মনুষ্যচরিত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে ভক্তিমার্গই বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ লোকের অবলম্বনীয় পথ, তাই ভগবান বিশেষ করিয়া ত্যাগী ও ভক্ত হইবার জন্যই অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্ন্যাসের কঠোরতা নাই অথচ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা আছে, জ্ঞানের অগাধ গাম্ভীর্য্য ও তৎসহ জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যের পরাকাষ্ঠা না থাকিলেও, পরার্থে আত্মত্যাগ ও ভগবদ্‌ভক্তির মৃদুমধুর হিল্লোলে সাধকের প্রাণ এখানে নিরন্তর হিল্লোলিত। বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত বৈষ্ণবদিগের ন্যায় কর্ম্মের দিক মাড়াইবে না, বা জ্ঞানের আলোচনা পর্য্যন্ত করিবে না—এই সব অসার কথার কোন অবতারণা এখানে নাই। ভগবানকে নিজজন বোধে বা আত্মতুল্য বোধে ভালবাসার শিক্ষাই ইহার শেষ কথা, সেইজন্য ভগবানের দিকে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিবার উপদেশই ইহার সাধনা, কারণ যে ভগবদ্ভক্ত সেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং পরিশেষে তাহার নানাত্ব বোধ মিটিয়া যায়। কেহ যোগাভ্যাসই করুক, অথবা বেদান্তালোচনাই করুক অথবা জপপূজাদিতেই মনকে নিবিষ্ট করুক যে উপায়েই হউক ভগবানের দিকে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পারাই জীবনের অপূর্ব্ব সার্থকতা ও সাফল্য—এই কথা জগজ্জীবকে শুনাইবার জন্যই কৃপালু জগদ্‌গুরু যেন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাই সন্ন্যাসের ব্যবস্থা সত্ত্বেও ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া উপযুক্ত জ্ঞানী ও ভক্ত গৃহীদের আসনকে যথেষ্ট উচ্চ করিয়া দিয়াছেন। যে ভাবে জীবনকে পরিচালিত করিলে অনধিকারীরও একদিন অধিকার লাভ হয়, মায়ানিবদ্ধদৃষ্টি সংসারীও ভগবদ্‌কৃপায় একদিন এই বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বত্র ভগবানকে এবং তাঁহার মহিমাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং সে শুভসংযোগ তাহার নিকট একদিন আসিবেই যখন সে বিশ্বের সহিত নিজ আত্মার ঐকান্তিক যোগ বা একাত্মতা বুঝিতে পারিয়া আপনার জন্ম জীবনকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে পারিবে। এই সকল ত্যাগাভ্যাসীরা সকলেই আধ্যাত্মিক মার্গের এক স্থানে দণ্ডায়মান নহেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যেও যে বিবিধ ভেদ থাকা অনিবার্য্য ভগবান সেই সকল ভেদের কথা ও তাহার লক্ষণাদিও এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন ॥ ১

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং

কর্ম্মণাং (কাম্য কর্ম্মসমূহের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং বিদুঃ (সন্ন্যাস বলিয়া জানেন)। বিচক্ষণাঃ (পণ্ডিতগণ) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সকল প্রকার কর্ম্মের ফলত্যাগকেই) ত্যাগং প্রাহুঃ (ত্যাগ বলিয়া থাকেন)॥ ২

শ্রীধর। তত্র উত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। "পুত্রকামো যজেত" "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবং আদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং—পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ, সম্যক্ ফলৈঃ সহ সর্ব্বকর্ম্মণামপি ন্যাসং—সংন্যাসং পণ্ডিতা বিদুঃ—জানন্তি ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুঃ ত্যাগং বিচক্ষণাঃ—নিপুণাঃ। নতু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্।

নন্থ নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবণাৎ অবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ? ন হি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি।

উচ্যতে—যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকাম ইত্যাদিবৎ "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে, তথাপি অপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুম্ অশক্নুবন্ বিধিঃ 'বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদিষু ইব সামান্যতঃ কিমপি ফলম্ আক্ষিপত্যেব। ন চ অতীব গুরুমতশ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনং ইতি মন্তব্যম্। পুরুষপ্রবৃত্তি অনুপপত্তেঃ দুষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদিষু অপি ফলং "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" ইতি, 'কর্ম্মণা পিতৃলোক' ইতি, 'ধর্ম্মেণ পাপম্ অপনুদন্তি' ইত্যেবমাদিষু। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা" ইতি।

নন্থ ফলত্যাগেন পুনরপি নিস্ফলেষু কর্ম্মসু অপ্রবৃত্তিরেব স্যাৎ। তন্ন। সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তমেতম্ আত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি। অতঃ শ্রুতিপদোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা। তাবৎ পর্য্যন্তং চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতম্ আবশ্যকং কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ তৎফলত্যাগ এব কর্ম্মত্যাগো নাম, ন স্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি। ততঃ পরং তু সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি। তদুক্তং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধৌ—

"প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ।
কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥"

উক্তংচ ভগবতা "যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাৎ" ইত্যাদি। বশিষ্ঠেন চোক্তং—

"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ।
কর্ম্মণো মূলভূতস্য সংকল্পস্যৈব নাশতঃ॥" ইতি

জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বম্ আলক্ষ্য ত্যজেদ্বা, তদুক্তং শ্রীভাগবতে—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥"

ইত্যাদি। অলমতি প্রসঙ্গেন, প্রকৃতমনুসরামঃ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রশ্নের উত্তরে]—শ্রীভগবান বলিতেছেন।

"পুত্রকামনায় যাগ করিবে", "স্বর্গকামনায় যাগ করিবে"—ইত্যাদিরূপ কামনার জন্য যে কাম্যকর্ম্ম বিহিত তাহাদের ন্যাস অর্থাৎ পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলে, অর্থাৎ সম্যক্ ফল সহ সর্ব্বকর্ম্মের যে ন্যাস তাহাকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন—ইহাই তাৎপর্য্য। আর বিচক্ষণ অর্থাৎ নিপুণ ব্যক্তিরা কাম ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের ফলমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন, স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগকে তাঁহারা ত্যাগ বলেন না।

যদি বল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ফলশ্রুতি না থাকায় অবিদ্যমান ফলের ত্যাগ কি প্রকারে সম্ভব হয়? বন্ধ্যার পুত্রত্যাগ তো সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে—যদ্যপিও "স্বর্গকামঃ" বা "পশুকামঃ" ইত্যাদির মত "প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে" "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবে" ইত্যাদি স্থলে ফলবিশেষের কথা শ্রুতিতে উল্লেখ নাই, তথাপি অপুরুষার্থব্যাপারে (প্রয়োজন উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্ম্মে) জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করিতে, বিধি অশক্ত হয় বলিয়া "বিশ্বজিৎ নামক যাগ করিবে" এইরূপ স্থলে বিধিতে ফলের কথা উক্ত না থাকিলেও যেমন কিছু ফলের কথা কল্পনা করিতে হয় তদ্রূপ "প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে" ইত্যাদি স্থলেও কিছু ফল আছে বুঝিতে হইবে। এবং গুরু মতে অতিশয় শ্রদ্ধাবশতঃ স্বসিদ্ধিই বিধির প্রয়োজন সুতরাং বিধি কোন ফলের অপেক্ষা করে না—এইরূপ মন্তব্যও ঠিক নহে, যেহেতু পুরুষের প্রবৃত্তির অনুপপত্তি দুষ্পরিহরণীয় হয় বলিয়া (অর্থাৎ পুরুষের ঐরূপ নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব) আর নিত্যকর্ম্মাদিতেও ফলশ্রুতি দেখা যায়, যথা—"ইহারা সকলে পুণ্যলোক হয়," "কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক যায়" ধর্ম্মের দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়" ইত্যাদি। [উক্ত শ্রুতিসকলেও নিত্যকর্ম্মের ফলোল্লেখ রহিয়াছে] অতএব সকল কর্ম্মের ফলত্যাগকেই যে পণ্ডিতেরা ত্যাগ বলেন—

যদি বল ফলত্যাগ করিলে লোকের তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, না—তাহা নহে। যেহেতু "সংযোগপৃথকত্বন্যায় ক্রমে"—সকল কর্ম্ম দ্বারাই বিবিদিষা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা উৎপন্ন হয়—ইহা বলা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি এই যে "ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক (ভোগাদিহীনতা বা সন্ন্যাস) দ্বারা সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। কর্ম্ম ফলবন্ধক, অতএব কর্ম্মের ফলত্যাগ করিয়া বিবিদিষার্থ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছায়) সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করণীয় হইতে পারে। নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক দ্বারা দেহাদিতে অহংবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া বুদ্ধির প্রত্যক্‌প্রবণতা জন্মে, ইহাই বিবিদিষা শব্দের অর্থ। সত্ত্বশুদ্ধির জন্য জ্ঞানের অবিরুদ্ধ যথোচিত আবশ্যক ততটুকু মাত্র বা ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলত্যাগ করিতে পারাই প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ, স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ (অলসের মত আদৌ কর্ম্ম না করা) কর্ম্মত্যাগ নহে। শ্রুতিতে আছে—"ইহলোকে কর্ম্মাদি করিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে"—পরে (চিত্তের প্রত্যক্‌প্রবণতারূপ বিবিদিষা জন্মিলে) স্বতঃই কর্ম্মসকল নিবৃত্ত

হইয়া থাকে। তাই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে বলিতেছেন যে কর্ম্মসকল চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধির প্রত্যক প্রবণতা উৎপাদন করাইয়া কৃতার্থ করে, তখন কর্ম্ম আপনিই অস্তপ্রাপ্ত হয়, যেমন মেঘ প্রাবৃটের (বর্ষার) শেষে আপনা আপনি অস্ত প্রাপ্ত হয়। আর ভগবানও তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন যিনি আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত তাঁহার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে না। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—"যোগী ব্যক্তির কর্ম্মের মূলভূত সঙ্কল্প নষ্ট হয় বলিয়া কর্ম্মসকলকে আর তাঁহার ত্যাগ করিতে হয় না, কর্ম্মই তাঁহাকে ত্যাগ করে। অথবা জ্ঞাননিষ্ঠার বিক্ষেপকত্ব দেখিয়া যোগী কর্ম্ম ত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন —"যতদিন না বৈরাগ্য জন্মে, অথবা যতদিন মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম (নিত্য নৈমিত্তিক) করিতেই হয়। জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ অথবা মদ্ভক্তগণ অনপেক্ষক হইয়া থাকেন (অর্থাৎ কর্ম্মের অপেক্ষা রাখেন না)। তাঁহার লিঙ্গ ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিধিগোচর হইয়া (অর্থাৎ বিধিপরতন্ত্র না হইয়া) যদৃচ্ছা বিচরণ করিবেন। আর বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারা প্রকাশ হইতেছেঃ—বর্ত্তমান অবস্থায় ইচ্ছা রোকার নাম সন্ন্যাস, আর ভবিষ্যতে ইচ্ছা রোকার নাম ত্যাগ সকল কর্ম্মের।—কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ করাকেই সন্ন্যাস বলে এবং সমস্ত ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাকে ত্যাগ বলে। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বা ইচ্ছারহিত অবস্থা। অল্প বাসনা সত্ত্বেও ত্যাগী হওয়া যায় না। যিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার প্রাণ একেবারে আটকাইয়া গিয়াছে, যিনি সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে পারেন, এবং সেইখানে থাকিয়া অনিচ্ছার ইচ্ছায় সংসারধর্ম্ম ও যাবতীয় কার্য্য করিয়া যান তিনিই যথার্থ ত্যাগী। সন্ন্যাসীরা বর্ত্তমানের ইচ্ছা ত্যাগ করেন, বর্ত্তমানের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিতে না পারিলে ক্রিয়ার ফল যে ক্রিয়ার পর অবস্থা বা শান্তি তাহা পাইবেন কিরূপে? অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থা বা শান্তি পাইবার আশায় যাঁহারা বর্ত্তমান সঙ্কল্প বা ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া খুব মন দিয়া ক্রিয়া করেন তাঁহারাই "সন্ন্যাসী"। বাহিরের সন্ন্যাসীকেও সমস্ত কর্ম্ম, অনুষ্ঠান প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হয় কিন্তু তাঁহার মোক্ষেচ্ছা থাকে। ত্যাগীর এই মোক্ষেচ্ছা পর্য্যন্ত থাকে না, কারণ তিনি পরাবস্থা প্রাপ্ত। পরাবস্থা তাঁহারই হয় যাঁহার কোন ইচ্ছা থাকে না। অত্যল্প ইচ্ছা থাকিলে মন একাগ্র হইতে পারে বটে কিন্তু রুদ্ধ হয় না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সমস্তই কাম্য বস্তু, এগুলির দিকে মন দৌড়াইলে মন একাগ্রভূমিকাতে পৌঁছাইতেই পারে না, সেই জন্য যাঁহারা মনের উপরাম বা শান্তি চান তাঁহারা প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মমার্গে এরূপ সতর্কতার সহিত পরিচালনা করিবেন যেন মন বাহ্যবস্তুতে প্রলুব্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয়, বিক্ষিপ্ত হইলে শান্তিলাভ ঘটিবে না। ব্রহ্মমার্গ বা সুষুম্নায় মনসহ প্রাণবায়ুকে প্রবিষ্ট করাইতে হইলে মনের সাধু অসাধু সমস্ত সঙ্কল্প বিকল্পই পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং কূটস্থে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রহ্মমার্গ সুষুম্নার মধ্যে কেবল মনসহ বায়ুকে চালনা করিতে হইবে। অবশ্য তখন আজ্ঞাচক্রে বা বিষ্ণুপদে মনের লক্ষ্য থাকিবেই। সব লক্ষ্যকে ছা

দিয়া শেষ লক্ষ্যের পানে চাহিয়া থাকা বা সেই একমাত্র লক্ষ্যটিকে ধরিয়া থাকার নামই সন্ন্যাস। কিন্তু বর্ত্তমান অন্য সমস্ত লক্ষ্যের প্রতি উদাসীন হইতে না পারিলে চরম লক্ষ্যটিকে মন দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে পারে না, এবং লক্ষ্যটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া না থাকিলেও আজ্ঞাচক্র ভেদ হইবে না। ইহাই সন্ন্যাস—ইহাতে অন্য কোন বস্তু প্রাপ্তির প্রতি লক্ষ্য নাই বটে কিন্তু পরাবস্থায় স্থিতির জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। ত্যাগীরা এ অবস্থার উপরে আছেন, সর্ব্ব কর্ম্মের ফলত্যাগই তাঁহাদের স্বাভাবিক অবস্থা হয়। সন্ন্যাসীদের মত কর্ম্ম জোর করিয়া ছাড়িতে হয় না, কামীদের মত তাঁহার মনে অবিরত সংকল্পের ঢেউও উঠে না, যাহা কিছু সমস্তই সহজভাবে আপনা আপনি তাঁহার মন হইতে গলিয়া পড়ে। সন্ন্যাসীদের মত ক্রিয়ার পরাবস্থার দিকেও টান নাই, কারণ উহা তখন তাঁহার সহজ অবস্থা, সুতরাং মনস্থির হওয়ায় আর আজ্ঞাচক্রে মন রাখিবার তাঁহার আবশ্যক হয় না। সর্ব্ব সঙ্কল্প তখন আপনা হইতেই ছুটিয়া যায় অথচ প্রাণক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে সুষুম্নায় চলিতে থাকে। এইরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইলে যোগীর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মেও বাধা উৎপন্ন করে না। ত্যাগীর ইহাই স্বাভাবিক লক্ষণ, এ অবস্থা তাঁহারাই জানেন যাঁহারা "বিচক্ষণ" অর্থাৎ যাঁহাদের বাহিরে ঈক্ষণ নাই।

ফলোদ্দেশ করিয়া যজ্ঞ, জপ, দানাদি যাহা করা যায় সে সমস্তই কাম্য কর্ম্ম। দেহেন্দ্রিয়াদিতে যতক্ষণ অহং বোধ থাকিবে, ততক্ষণ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ হওয়া অসম্ভব। ফলাকাঙ্ক্ষা মনে থাকিতে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম হইতে পারে না। ইষ্ট সাধনের সঙ্কল্প হইতেই কাম বা ইচ্ছা জন্মে। পুনঃ পুনঃ জন্ম যাতায়াতের কারণই হইল এই কাম সঙ্কল্প। কাম্যকর্ম্মও বেদবিহিত কর্ম্ম, তাহা অনুষ্ঠাতাকে পরলোকে স্বর্গাদি সুখ দান করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে জন্মমৃত্যু ঘুচিতে পারে না। কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগের নামই সন্ন্যাস। কিন্তু একবারে সমস্ত কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না, অন্য কোন সঙ্কল্প না থাকিলেও মোক্ষেচ্ছা থাকিবেই। একটু কামনা থাকিতেও গুণের খেলা রোধ করা যায় না। তবে সঙ্কল্প রোধের উপায় কি? শাস্ত্র বলিলেন যদি কর্ম্মত্যাগ করিতে না পার তবে বিষ্ণু-প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর। কর্ম্ম করিতে করিতে মনে মনে বল হে ভগবন্ আমার এই কর্ম্মে যেন তোমার প্রীতিলাভ হয়, তুমি প্রসন্ন হইলেই আমার কর্ম্ম সার্থক হইবে। বিষ্ণু সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্য্যামীরূপে রহিয়াছেন। নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে এই অন্তর্য্যামীকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। যেখানে মনেন্দ্রিয়াদির সমস্ত চাঞ্চল্য মিটিয়া গিয়া পরাস্থিতি বা পরমানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাঁহার অন্য বাহ্য কর্ম্মাদিতে আসক্তি নাই, কিন্তু এই পরমানন্দধামে প্রবেশ লাভের জন্য ব্যাকুলতা আছে, তিনিই সন্ন্যাসী। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত বাহ্যচেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যায়। উহাই পরমপদ, নিশ্চল-স্থিতি বা অবরুদ্ধরূপ। তখন আর কিছুরই সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইহাই সন্ন্যাসের দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া—"নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি"। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই অধ্যায়ের ৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন। এই অবস্থা পরিপক্ক হইলে তবে ত্যাগী হওয়া যায়, তখন বাহ্য সন্ন্যাস ব্যতীতও সাধক পরমহংস অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারেন। সমাধি অবস্থা লাভের পর মন বুদ্ধি সমস্তই নির্ম্মল হইয়া যায়,

(সাংখ্য ও মীমাংসক মত)

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩

তাহাতে আর বিষয়ের ছাপ পড়ে না। তখন মন কূটস্থে আটকাইয়া থাকিলেও সাধকের অনিচ্ছার ইচ্ছায় সব কাজই চলিতে পারে, কূটস্থ বা বিষ্ণুপদ হইতে বিচলিত না হইয়াও তিনি সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন। সব কাজই তাঁহার হয় কিন্তু তাহাতে নিজের কামনা কিছুই থাকে না। ইহাই প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের অবস্থা। ইহাই সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বোত্তম অবস্থা। সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও—'নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ'। ইহাই বিদ্বৎ সন্ন্যাস, চিত্তশুদ্ধি মনোনাশ দুই-ই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু "কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নৈব দৃশ্যতে"— ক্রিয়াযোগ ব্যতীত এরূপ জ্ঞান হইতে কাহারও দেখা যায় না। কূটস্থে লক্ষ্য রাখা যখন সহজ হইয়া যায় তখন সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায়, তাঁহার মনে আর পাপ জন্মিতে পারে না, তখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ বা ব্রাহ্মীস্থিতি হইয়া থাকে। "জ্ঞানং উৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।" এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখিবার সামর্থ্য লাভ হয়। তাই সহস্র কর্ম্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও যোগীর কর্ম্মবন্ধন হইতে পারে না। এই সকল মহাপুরুষের সমস্ত কর্ম্ম বিষ্ণু প্রীত্যর্থ হইয়া থাকে, এবং তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু হয় সবই ভগবৎ ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। এই সকল পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিয়াছেন—"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি"। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত বলিয়া ইহাদের কালের সীমা নির্দ্দেশ থাকে না, তাঁহারা কালাতীত বা 'অকাল' পুরুষ। কর্ম্ম করিবার বা কর্ম্ম না করিবার কোন ইচ্ছাই থাকে না। সুখাভিলাষ বা দুঃখত্যাগ, জীবিতেচ্ছা বা মরণভয় তাঁহাদের কিছুই থাকে না। এই সকল পুরুষেরা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া গিয়াছেন॥ ২

অন্বয়। একে মনীষিণঃ (কোন কোন পণ্ডিতগণ) কর্ম্ম দোষবৎ (কর্ম্ম দোষবিশিষ্ট) ইতি ত্যাজ্যং (এইজন্য ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলেন); অপরে চ (আবার কেহ কেহ) যজ্ঞদান-তপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যম্ ইতি (ত্যাজ্য নহে এইরূপ বলেন)॥ ৩

শ্রীধর। অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রম্ এব ত্যাগশব্দার্থঃ ন কর্ম্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তরনিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদ দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবৎ—হিংসাদিদোষবত্ত্বেন কেবলং বন্ধকম্ ইতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে—সাংখ্যাঃ প্রাহুঃ মনীষিণ ইতি। অস্য অয়ং ভাবঃ—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' ইতি নিষেধঃ, পুরুষই অনর্থহেতুর্হিংসা ইত্যাহ। "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রত্বুপকারকত্বম্ আহ। অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়াগোচরত্বাৎ বাধ্যবাধকতা নাস্তি। দ্রব্যসাধ্যেষু চ সর্ব্বেষ্বপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ, সোঽপি দৃষ্টোপায়বৎ,

গুরুপাঠাৎ অনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবো বেদঃ তদ্বোধিতঃ। তত্র অবিশুদ্ধিঃ—হিংসা, তথা ক্ষয়ঃ—বিনাশঃ। অগ্নিহোত্রজ্যোতিষ্টোমাদি জন্ত স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ত্ততে। পরোৎকর্ষস্তু সর্ব্বান্ দুঃখী করোতি।

অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ—ক্রত্বর্থাপি সতি ইয়ং হিংসা পুরুষেণ এব কর্ত্তব্যা, সা চ অন্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায় হেতুরেব। যথা হি বিধিঃ বিধেয়স্ত তদুদ্দেশেন অনুষ্ঠানং বিধত্তে। তাদর্থ্যলক্ষণত্বাৎ শেষত্বস্য ন তু এবং নিষেধো নিষেধ্যস্ত তাদর্থ্যম্ অপেক্ষতে, প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ। অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধাৎ নাস্তি দোষবত্ত্বম্। অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি। অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা বার্য্যতে **সামান্য বিশেষন্যায়ং** সম্পাদয়িতুম্॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [অবিদ্বান ব্যক্তির নিকট ফলত্যাগমাত্রই ত্যাগ শব্দের অর্থ, কর্ম্মত্যাগ (প্রকৃত) ত্যাগ নহে—মতান্তরনিরাসদ্বারা ইহার দৃঢ়ীকরণার্থ মতভেদ দেখাইতেছেন]—দোষবৎ—হিংসাদি দোষযুক্ত বলিয়া (কর্ম্মমাত্রই) বন্ধনের হেতু, এইজন্য কোন কোন মনিষী (অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্যগণ) সকল কর্ম্মই ত্যাজ্য বলিয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"—অর্থাৎ ভূতমাত্রকেই হিংসা করিবে না। এই নিষেধ-বিধিতে হিংসাকে পুরুষের অনর্থহেতু বলা হইল, আবার—"অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত"—অগ্নিষোমাখ্য যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে—ইত্যাদি হিংসাবিষয়ক এই যে বিধি ইহাতে হিংসাকে যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গরূপে বলা হইয়াছে। অতএব উক্ত বিধিদ্বয় ভিন্ন বিষয়ক বলিয়া সামান্য বিশেষন্যায়ের বিষয় হইতেছে না, অতএব হিংসা অনর্থসাধক নহে ইহা বলা যায় না। দ্রব্যসাধ্য সকল কর্ম্মেই হিংসার সম্ভাবনা থাকায় কর্ম্মমাত্রই পরিত্যাজ্য। এই সম্বন্ধে উক্তি (সাংখ্যের) এই যে "দৃষ্টাবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ"—অর্থাৎ আনুশ্রবিক (বা বেদবোধিত) উপায় যে জ্যোতিষ্টোমাদি তাহাও দৃষ্টোপায়ের মতই অবিশুদ্ধি বা হিংসাদ্বারা যুক্ত। তদ্রূপ ক্ষয়যুক্ত, এবং অতিশয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের জন্য যে স্বর্গ হয় তাহার মধ্যেও তারতম্য আছে। পরের উৎকর্ষ অপরকে দুঃখী করে।

[আনুশ্রবিক—গুরুর মুখ হইতে যাহা শ্রুত হয় তাহার নাম অনুশ্রব অর্থাৎ বেদ, তদ্বোধিত যাহা তাহাই আনুশ্রবিক।]

অপরে অর্থাৎ মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। তাহার ভাবার্থ এই যে যজ্ঞার্থ হিংসা হইলেও সে কর্ম্মে পুরুষের প্রত্যবায় হয়। যেমন বিধি হইলেই বিধেয় কর্ম্ম যাহার উপকারক হয় তাহার উদ্দেশেই সেই বিধেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিধান করে, যেহেতু যাহা বিধেয় তাহা উদ্দেশ্যের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ। কিন্তু নিষেধবিধি-নিষেধ্য যে হিংসাদি তাহার তাদার্থ্যকে অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ নিষেধ্য কাহারও উপকারক হইতেছে কিনা তাহার অপেক্ষা করে না, শুধু নিষেধের প্রাপ্তিমাত্র থাকিলেই হইল। অতএব হিংসা করিও না বলিলে যে কোনরূপ হিংসা তাহাই নিষেধের বিষয় হইতেছে। ইহা স্বীকার না করিলে অজ্ঞানকৃত বা প্রমাদজনিত হিংসায় দোষাভাব হয়। আবার যজ্ঞার্থ হিংসা করিবে

বলিলে হিংসা পুরুষার্থপ্রাপকও হইল। অতএব এক হিংসায় নিষেধ ও বিধি উভয়ই থাকায় বিশেষশাস্ত্র কর্তৃক সামান্যশাস্ত্রের খণ্ডন হওয়ায় হিংসায় দোষ নাই প্রমাণ হইল। সেইজন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। সামান্যবিশেষন্যায়ানুযায়ী বিধিনিষেধের সমবলভাব বারিত হইল। সাংখ্যমতে উক্ত বিধিনিষেধকে ভিন্ন প্রকরণোক্ত বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই বলা হইয়াছিল, সুতরাং তন্মতে যজ্ঞীয় হিংসাও বর্জ্জনীয় হয়। মীমাংসক সামান্য-বিষয় ন্যায়ের যুক্তি দেখাইয়া সাংখ্যের যুক্তি খণ্ডন করিয়া দেখাইলেন যে যজ্ঞীয় হিংসায় পাপ নাই। [সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন সর্ব্বকর্ম্মই দোষযুক্ত, অতএব বন্ধহেতু—এরূপ কর্ম্মমাত্রই ত্যাজ্য। শ্রুতিতে অহিংসার কথাও আছে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"। হিংসা করিলেই প্রত্যবায় আছে অর্থাৎ তাহাতে পাপ জন্মে। কিন্তু আবার শ্রুতিতে যজ্ঞের জন্য পশুহিংসাও বিহিত। বিশেষ বিধি সামান্য বিধির বাধক, অতএব দ্বিতীয় বিধির দ্বারা প্রথম বিধি বাধিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ বাধক হওয়া সম্ভব হইতেছে না, কারণ উভয় বিধির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিরোধ না থাকা হেতু একটি অপরটির বাধক হইতে পারে না। প্রথমটির অর্থ হিংসাদ্বারা পুরুষকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। দ্বিতীয়টির অর্থ অগ্নিষোমীয় যজ্ঞে পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক। দ্বিতীয় বিধির উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে অগ্নিষোমীয় যজ্ঞে পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক বলিয়া পাপ উৎপন্ন করিবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যজ্ঞদ্বারা পুণ্য ও পাপ উভয়ই উৎপন্ন হয়। সুতরাং যজ্ঞের দ্বারা দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব যে সকল কর্ম্ম দ্রব্যসাধ্য তাহাতে হিংসার সম্ভাবনা থাকায় সর্ব্বকর্ম্মই ত্যাজ্য। কিন্তু মীমাংসকেরা বলেন যজ্ঞ, দান ও তপঃরূপ কর্ম্ম ত্যাজ্য হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে যজ্ঞার্থ যে হিংসা তাহা বিহিত, তদ্দ্বারা প্রত্যবায় হয় না, অন্য উদ্দেশ্যে হিংসা করিলে প্রত্যবায় হইতে পারে। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি", এইটি নিষেধবাক্য, আর "অগ্নিষোমীয়ম্ পশুম্ আলভেত" এইটি বিধিবাক্য। নিষেধবাক্য বিধিবাক্যের বাধক হয় না সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে] ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যজ্ঞ, দান, তপস্যা কর্ম্ম কর্ত্তব্য। ইহা ত্যাগ করা চাই না অর্থাৎ ক্রিয়া দেওয়া ও ব্রহ্মেতে থাকা সর্ব্বদা উচিত।—ক্রিয়া করা, ক্রিয়া দেওয়া এই সমস্তই কর্ম্ম এবং পরাবস্থায় থাকা—ইহা ক্রিয়ারই ফল মাত্র। সুতরাং কর্ম্ম ত্যাজ্য হইতে পারে না। ক্রিয়া না করিলে পরাবস্থা আসিবে কিরূপে? কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মকে দোষবৎ মনে করেন তাঁহারা পরাবস্থাপ্রাপ্ত জ্ঞানী। তাঁহারা যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন সে অবস্থায় আর প্রাণক্রিয়া হইতে পারে না সেইজন্য তাঁহাদের মত অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে কর্ম্ম ত্যাজ্য বলিয়াছেন। যাহারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের কর্ম্ম আর না করিলেও চলে, তবুও তাঁহারা উদ্দেশ্যবিহীন হইয়াও স্বভাবধর্ম্মবশতঃ সর্ব্বদাই ক্রিয়া করেন। এইজন্যই বোধ হয় কবির সাহেব বলিয়াছেন—

কবির রাম নাম সুমিরণ করে, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্।
কহহি কবির সুমিরণ করে নারদ শুকদেব্ শেষ ॥
কবির সনকাদি সুমিরণ করে নাম ধ্রুব প্রহ্লাদ।

সুতরাং সর্ব্বোচ্চাবস্থাতেও স্মরণ চলে, কিন্তু স্মরণ তাঁহাদের জোর করিয়া করিতে হয় না,

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪

ইহা তাঁহাদের আপনা আপনিই হয়। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত এখনও স্থির হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। বরং ত্যাগ করিলে মোক্ষমার্গ অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

যাঁহারা মনকে নিজ বশে আনিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই মনিষী তাঁহাদের প্রাণ স্থির হওয়ায় তাঁহারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। কোনরূপ বাহ্য কর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে আর করা সম্ভব নহে। তাঁহাদের প্রাণ বিনা চেষ্টাতেই তখন স্থির হইয়া থাকে, সুতরাং টানা ফেলার আর প্রয়োজনই হয় না। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ত্যাজ্য নহে, এ উপদেশ তাঁহাদের পক্ষেই বুঝিতে হইবে যাঁহাদের প্রাণ আজ্ঞাচক্রে বা তদূর্দ্ধে স্থির থাকে না। ক্রিয়ার পরাবস্থা যাঁহারা স্থায়ীরূপে প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা ক্রিয়ার অভ্যাস ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের নিদিধ্যাসন (ধ্যান) ফুটিয়া উঠিবে না। সাধনাদ্বারা আত্মবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধন ঠিক ঠিক মত চালাইতে হইবে। অসময়ে ক্রিয়া ত্যাগ করিলে তাহার দুকুলই নষ্ট হয়। সেইজন্যই মীমাংসকেরা সকামীদের (দেহসম্বন্ধী) জন্য কর্ম্মের বিধান করিয়া গিয়াছেন, পরে জ্ঞানলাভের যোগ্যতা লাভ করিবেন বলিয়া। যাহাদের প্রসংখ্যান লাভ হইয়াছে বা যাঁহারা যোগারূঢ় তাঁহাদের কর্ম্ম করিবার আর আবশ্যকতাই নাই। নদীর পর পারে পৌঁছিয়া আর নৌকার প্রয়োজন হয় না বটে কিন্তু তৎপূর্ব্বে নহে ॥ ৩

অন্বয়। ভরতসত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ বিষয়ে) মে নিশ্চয়ং (আমার নিশ্চয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। পুরুষব্যাঘ্র (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ (ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া) সংপ্রকীর্ত্তিত (কথিত হয়) ॥ ৪

শ্রীধর। এবং মতভেদম্ উপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়মিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাৎ শৃণু। ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যম্? ইতি মা অবমংস্থা ইত্যাহ। হে পুরুষব্যাঘ্র—পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগোঽয়ং দুর্ব্বোধঃ। হি—যস্মাৎ অয়ং কর্ম্মত্যাগঃ তত্ত্ববিদ্ভিঃ তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্ বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যং চ "নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপ মতভেদ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন]—এইরূপ বিরুদ্ধরূপে প্রতিপন্ন ত্যাগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহা আমার বাক্য হইতে শ্রবণ কর। ত্যাগের অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই জানে অতএব তদ্বিষয়ে আর শুনিবার কি আছে—এরূপ অবজ্ঞা করিও না। তাই বলিতেছেন - হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বড় দুর্ব্বোধ্য বিষয়, যেহেতু এই কর্ম্মত্যাগ তত্ত্বদর্শিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক তামসাদি ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ত্রৈবিধ্য 'নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ত্যাগী ব্যক্তি সকল ইচ্ছাকেই খেয়ে ফেলেছে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের, তন্নিমিত্তে সে ব্যাঘ্রের মতন পুরুষ। তাহা তিন প্রকারের।—ত্যাগটি সুবিজ্ঞাত বিষয় নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক,

(যজ্ঞ, দান ও তপ অনুষ্ঠেয়—কারণ উহারা পাবন)

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ত্যাগ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিলে সাধকের যে ত্যাগ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে তাহাই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, এই ত্যাগের জন্য মনের উপর কোন জোর জবরদস্তি করিতে হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের যে ত্যাগ তাহা সাধকের স্বাভাবিক নহে, তাহা অর্জ্জিত, অর্থাৎ তাহা স্মরণ মননাদি সাধন প্রভাবে ও বিচারের দ্বারা ধীরে উৎপন্ন হয়, এবং তজ্জন্য সাধককেও অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। এরূপ ত্যাগ নির্গুণ না হইলেও সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিকত্যাগে অভ্যস্ত না হইলে কেহই জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহন করিতে সক্ষম হন না। তৃতীয় প্রকারের যে ত্যাগ—তাহা সকাম বা রাজসিক, তখনও চিত্ত অশুদ্ধ, তাই ইঁহাদের যাহা কিছু ত্যাগ তাহা কাম্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য। অনেকে সাধনা করেন যোগাভ্যাস করেন আত্মদর্শনের জন্য নহে, শুধু কিছু ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য, তাহাতে চিত্তকে উন্নত ও উদার করিতে পারে না আর যাহা সাধনার প্রধান লক্ষ্য আত্মসাক্ষাৎকার তাহা এই শ্রেণীর সাধকদের কদাচিৎই ঘটিয়া থাকে। রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য ধ্রুবের গৃহত্যাগ ও তপস্যা এই শ্রেণীর ত্যাগের মধ্যে গণ্য। আর একপ্রকারের ত্যাগ আছে যাহা চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ—উহাই তামসিক ত্যাগ। ইহা বৈরাগ্যবশতঃ ত্যাগ নহে, কর্ম্ম ক্লেশসাধ্য বলিয়া ভ্রান্তিবশতঃ যে কর্ম্মত্যাগ তাহাই তামসিক ত্যাগ। যেমন উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া বা গৃহে ভর্ৎসিত হইয়া মনের যে নির্ব্বেদ ভাব হয়, তজ্জন্য পুত্রকলত্রগৃহাদির যে ত্যাগ তাহাই নিকৃষ্ট ত্যাগ। প্রকৃত ত্যাগী যিনি তাঁহার কোন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প থাকে না—ইহার আর প্রকার ভেদ নাই, ত্যাগী মাত্রেরই একই রকম অবস্থা॥ ৪

অন্বয়। যজ্ঞদান তপঃ কর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) তৎ (তাহা) কার্য্যম্ এব (করাই কর্ত্তব্য)। যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাই) মনীষিণাং (বিবেকী বা মুমুক্ষুগণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকারক)॥ ৫

শ্রীধর। প্রথমং তাবৎ নিশ্চয়মাহ-যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। মনীষিণাং—বিবেকিনাং, পাবনানি-চিত্তশুদ্ধিকরাণি॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [প্রথমতঃ দুইটি শ্লোকদ্বারা সেই নিশ্চয়টি বলিতেছেন] যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু অনুষ্ঠেয়, কারণ উহা বিবেকিগণের চিত্ত-শুদ্ধিকর॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া, ক্রিয়া দেওয়া, ব্রহ্মেতে থাকা কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহাতে মন পবিত্র হয়।—মন পবিত্র না হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। মনের পবিত্রতা যে কি তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে অনেক বার বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না, সেই মনই পবিত্র মন। স্থিরাবস্থাই মনের সে পবিত্র ভাব। ক্রিয়াদ্বারা মন

(কিরূপ ভাবে অনুষ্ঠান করিলে নিত্যকর্ম্ম পাবন হইয়া থাকে)

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬

শুদ্ধ হইতে হইতে এতদূর শুদ্ধ হইয়া যায় যে তাহাতে আর সঙ্কল্পের উদয়ই হয় না। এই সঙ্কল্পশূন্য মনকেই শুদ্ধচিত্ত বলা হয়, তখনই উহা আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। ক্রিয়া দ্বারাই মন সঙ্কল্পশূন্য হয়, এইজন্য চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়া করাই কর্ত্তব্য। ক্রিয়াদানও চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে। অন্যের উপকারার্থ যে ত্যাগ তাহাতে সত্ত্বশুদ্ধি হইবারই কথা। সকল দানের অপেক্ষা ইহাই বড় দান। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অল্প অল্প করিয়া থাকিতে পারিলেও সে চিত্ত নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে সকল ক্রিয়াবানদের ক্রিয়ার পর-অবস্থার আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের মন আর অবিশুদ্ধ হয় না। ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি"—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটি ধর্ম্মের স্কন্ধ। "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি"—এই সকল কর্ম্মের দ্বারাই লোকে পবিত্র হয়। যে সকল কর্ম্ম সদ্ভাবের উদ্দীপক তাহাতেই জ্ঞানোৎপত্তির সহায়তা করে। সুতরাং প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াযোগগুলি যাহা সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞানের উৎপাদক, তাহা কখনই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না॥ ৫

অন্বয়। পার্থ (হে পার্থ!) তু (কিন্তু) এতানি কর্ম্মাণি অপি (এই সকল কর্ম্মও) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফলাকাঙ্ক্ষা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্ত্তব্যানি (করা উচিত) ইতি মে (ইহাই আমার) নিশ্চিতং উত্তমং মতং (নিশ্চিত উত্তম মত)॥ ৬

শ্রীধর। যেন প্রকারেণ কৃতানি এতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়ন্ আহ—এতান্যপি ইতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানি ইত্যুক্তানি এতানি এব কর্ত্তব্যানি। কথং? সঙ্গং—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলং ঈশ্বরারাধনতয়া কর্ত্তব্যানি ইতি। ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি চ মে মতং নিশ্চিতং। অতএব উত্তমম্॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [যে প্রকারে কৃত হইলে এই সকল কর্ম্ম পাবন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিকর হয়, তাহারই প্রকার (ভেদ) দেখাইবার জন্য বলিতেছেন]—যে সকল যজ্ঞদানাদি কর্ম্মকে আমি পাবন বলিয়াছি সেই সকল কর্ম্মই করা উচিত। কর্ম্ম কি ভাবে করিলে চিত্তশুদ্ধিকর হইবে তাহাই বলিতেছেন। সঙ্গ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া এবং ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরারাধনা রূপে কর্ম্ম করা উচিত—ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত, অতএব উহা উত্তম। [অর্থাৎ এইভাবে কর্ম্ম না করিলে কর্ম্ম পাবন হইবে না; সেইজন্য উহা উত্তম]॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ সকল কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ত্তব্য; এই আমার মত।—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিতে না পারিলে ক্রিয়ার ফল যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা, তাহা লাভ করা যায় না। কেন লাভ করা যায় না—তাহা বলিতেছি। ক্রিয়াতে আসক্তি থাকা যে খারাপ তাহা নহে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা-হেতু যে-

(নিত্যকর্ম্মের সংন্যাস অবৈধ)

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

ক্রিয়াতে আসক্তি তাহা ভাল নহে। কারণ ঐ ভাব লইয়া যে ক্রিয়া করে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় না বা মনঃস্থির হয় না। সুতরাং ও ভাবে ক্রিয়া-করা না করারই সমান দাঁড়ায়। সেইজন্য সাধকের মনে থাকা চাই—তিনি যে ক্রিয়া করিতেছেন, তাহা কোন জাগতিক লাভ বা অভ্যুদয়ের জন্য নহে। যেহেতু ক্রিয়া করা গুরুর আদেশ, সেই জন্যই ক্রিয়া করিতে হইবে। ফল কিছু নাই বলিয়া যে তাহাতে অবহেলা আসিবে তাহা হইলেও চলিবে না। সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়াই ক্রিয়া করিতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া ক্রিয়া করিলেই চিত্ত-মল অপনোদিত হয় এবং তাহাতেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। নির্ম্মল চিত্তেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণ অন্য বিষয় দ্বারা অনুরঞ্জিত না হইলে যে জ্ঞান সমুদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই জীবের মুক্তির কারণ ॥ ৬

অন্বয়। তু (কিন্তু) নিয়তস্য কর্ম্মণঃ (নিত্যকর্ম্মের) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নহে)। মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য পরিত্যাগঃ (সেই নিত্য কর্ম্মের পরিত্যাগ) তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৭

শ্রীধর। প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যম্ ইদানীং দর্শয়তি—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসঃ যুক্তঃ। নিয়তস্য তু—নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসঃ—ত্যাগঃ, ন উপপদ্যতে। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ। অতঃ তস্য পরিত্যাগঃ উপাদেয়েঽপি ত্যাজ্যং ইতি এবং লক্ষণাৎ মোহাদেব ভবেৎ। স চ মোহস্য তামসত্বাৎ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [প্রতিজ্ঞাত ত্যাগের ত্রিবিধত্ব এখন তিনটি শ্লোকে দেখাইতেছেন]—কাম্য কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, এজন্য তাহার ত্যাগ যুক্ত অর্থাৎ উচিত, কিন্তু নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ উপপন্ন নহে অর্থাৎ অনুচিত, কারণ সত্ত্বশুদ্ধিকর বলিয়া উহা মুক্তির হেতু হয়। [সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষ হয় কিন্তু কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধির বাধক] অতএব নিত্য কর্ম্মেরও পরিত্যাগ উপাদেয় এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ভাব মোহবশতঃই হইয়া থাকে। মোহের তামসতা আছে বলিয়া ঐরূপ পরিত্যাগকেও তামস বলা হইয়া থাকে ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—নিঃশেষরূপে ধারণা ধ্যান, সমাধিপূর্ব্বক ইচ্ছারহিত হওয়া আপনা আপনি, তাহার নাম সন্ন্যাস। মোহেতে ত্যাগ করা সে তামস ত্যাগ অর্থাৎ সকল মরে গিয়েছে সেই মোহেতে কাশীতে এসে সন্ন্যাসী।—মনুষ্য-প্রকৃতি পূর্ব্বস্বভাব-বশতঃ পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই সংস্কার রুদ্ধ হয়। নিত্যকর্ম্ম ত্যাগে পাপপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করে। কাম্যকর্ম্ম ত্যাজ্য হইলেও চিত্তশুদ্ধির অভাববশতঃই প্রায় সকলেই কাম্যকর্ম্ম করিতে উৎসুক হইয়া থাকে। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের এই অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, সুতরাং যতদিন জ্ঞানলাভ না হয় ততদিন নিত্যকর্ম্ম (সাধন, সন্ধ্যা বন্দনাদি) ত্যাজ্য নহে। সংসারাসক্তিই জ্ঞানের পরিপন্থী, বিচারের দ্বারা সেই আসক্তি কিছু

(রাজস ত্যাগ—উহাতে মোক্ষ লাভ হয় না)

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

কিছু হ্রাস হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে যায় না। ব্রহ্মচর্য্য পালনের ও তৎসহ সাধনাভ্যাস দ্বারা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি স্থির হইলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি হয়। সমস্ত সংসারাসক্তির মূল দেহ ও দেহে আত্মবোধ। দেহাতীত অবস্থার সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত এই দেহাত্মবোধ কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না। এই দেহাভিমান নষ্ট করিবার চেষ্টাই মুমুক্ষুদের সর্ব্বপ্রধান সাধনা। ধারণা, ধ্যান, সমাধি ব্যতীত এই দেহাভিমান নষ্ট হইবার নহে। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা দেহস্থ বায়ু স্থির হইলে মন অন্তর্মুখ হইতে থাকে,—উহাই ধারণা; এই যোগধারণা যত অধিক হইতে থাকে, ততই মূলাধারস্থিতা সুপ্তা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া সাধককে অনাস্বাদিত নেশায় বিভোর করিয়া রাখে,—ইহাই ধ্যান। এই ধ্যানাবস্থা প্রগাঢ় হইতে হইতে তাহা সমাধিতে পরিণত হয়। এই অবস্থাতে কোনরূপ ইচ্ছা না থাকায় সাধক দেহ-সম্বন্ধরহিত হন,—ইহাই যথার্থ ত্যাগের অবস্থা, সাময়িক উত্তেজনা-বশতঃ যে আমরা সংসার ত্যাগ করি, তাহা তামস ত্যাগ, তদ্দ্বারা জীবের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, সংসার-সংস্কার নষ্ট হয় না। একমাত্র সমাধি অভ্যাসের দ্বারাই প্রকৃত ত্যাগ হইতে পারে।

"আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ" আপনার দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলে তবে মানব মুক্তি লাভ করে। এই আপনাকে আপনি জানিবার জন্য "সহজ" সাধনা অভ্যাস করিতে হয়; যাহা জন্মের সহিত পাওয়া গিয়াছে, তাহাই "সহজ" সাধনা। সেই সাধনা করিতে করিতে চিত্ত-মল ক্ষালন হয়, তখন একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যে প্রাণের স্থিতি হয়। এই চিত্ত-মল মার্জ্জিত না হইলে কাহারও দিব্যচক্ষু লাভ হয় না। দিব্যচক্ষু লাভ না হইলে যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকারে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝিবে কি করিয়া? মন অত্যন্ত চঞ্চল থাকিতে এই নিত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাণের চাঞ্চল্য বিদূরিত করিতে হইলে শ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাই বুঝি চণ্ডীদাস বলিলেন—

"প্রেমের যাজন, শুন সর্ব্বজন, অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন কবিবে তখন, ইড়ায় টানিবে শ্বাস।
তাহা হ'লে পরে মনবায়ু সে যে আপনি হইবে বশ॥" ৭

অন্বয়। দুঃখম্ ইতি (দুঃখকর বলিয়া) [যিনি] কায়ক্লেশভয়াৎ (দৈহিক ক্লেশের ভয়ে) যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ (যে কর্ম্মের ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং কৃত্বা (রাজস ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল লাভ করিতে পারেন না) ॥ ৮

শ্রীধর। রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি। যঃ কর্ত্তা আত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং জ্ঞাত্বা শরীরায়াসভয়াৎ নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেৎ ইতি যৎ তাদৃশঃ ত্যাগঃ রাজসঃ, দুঃখস্য রাজসত্বাৎ। অতঃ তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা রাজসঃ পুরুষঃ ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভেত ইত্যর্থঃ ॥ ৮

(সাত্ত্বিক ত্যাগ)

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [রাজসত্যাগ কাহাকে বলে তাহাই বলিতেছেন]—যে কর্ম্মকর্ত্তা আত্ম-বোধ ব্যতীত কর্ম্মকে দুঃখকর জানিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্মত্যাগ করে, তাহার তাদৃশ যে ত্যাগ তাহা রাজস, কারণ দুঃখটিই রাজস। অতএব সেই রাজস ত্যাগ করিয়া রাজস পুরুষ জ্ঞান-নিষ্ঠালক্ষণরূপ ত্যাগফল লাভই করে না—ইহাই অর্থ ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কর্ম্ম করিতে বড় দুঃখ, শরীরের বড় ক্লেশ হবে—আর ভয় কি রকমে বা ক'রে উঠ্‌বো—এইরূপ যে ত্যাগ করে সে রাজসিক ত্যাগ—সে ত্যাগের ফল নাই।—যে কর্ম্ম দুঃখবোধে ত্যাগ করা হয় তাহা রাজস ত্যাগ, উহাতে ত্যাগের ফল যে শান্তি তাহা লাভ হয় না। অনেকের সাধন ভজন বা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার একটু একটু ইচ্ছা আছে কিন্তু শীতের ভয়ে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, বা গ্রীষ্মকালে দারুণ উত্তাপ বশতঃ সুনিদ্রা না হওয়ায় শয্যা হইতে উঠিবার যে অনিচ্ছা এবং তজ্জন্য নিত্যকর্ম্মের যে ত্যাগ—তাহা রাজসিক ত্যাগ। তাঁহারা অবশ্য এই প্রকার ত্যাগের এক অভিনব হেতু আবিষ্কার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এই নিত্যকর্ম্ম যে তাঁহারা করেন না, তাহা দ্বেষবশতঃ বা অনিচ্ছাবশতঃ নহে, এ সকল কর্ম্মে আর তাঁহাদের প্রয়োজন নাই, এইজন্যই এ সকল কর্ম্ম আর তাঁহারা করেন না। কিন্তু আসল ত্যাগের কারণ যে আলস্য বা প্রমাদ এ কথা স্বীকার করিতে তাঁহারা লজ্জা অনুভব করেন। তাই লোকের নিকট খুব জোর গলায় বলিয়া থাকেন "এখন আর ও সব কোশা ঠক্‌ঠক্ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি না", বা "তিন ঘণ্টা ধ'রে মেরুদণ্ড সোজা করে ব'সে থাকা বা আয়াস-সাধ্য প্রাণায়ামাদি সাধনের আর কোন আবশ্যক নাই, ও সব খাটাখাটির সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।" আবার কেহ কেহ অতি চতুর ব্যক্তি বলিয়া থাকেন—"অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়ণম্‌"—ব্রহ্মাকারা বৃত্তির নিশ্চলতা সম্পাদনই প্রকৃত প্রাণায়াম, আর যাহারা অজ্ঞ তাহাদের এই নাক টেপাই প্রাণায়াম, কিন্তু এই সকল মৌখিক ব্রহ্মজ্ঞানীরা ত্যাগের ফল যে স্থিতি—যাহা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অনুভব হয়—তাহা তাঁহারা কখনই লাভ করিতে পারেন না। কায়ক্লেশের ভয়ে যাহারা সাধন ত্যাগ করে, তাহাদের ত্যাগকে রাজসিক ত্যাগ বলে ॥ ৮

অন্বয়। অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন) সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিমান বা আসক্তি) ফলং চ এব (এবং ফল কামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্য্যম্ ইতি এব (ইহা কর্ত্তব্য এইরূপ ভাবনা করিয়া) যৎ (যে) নিয়তং কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ ত্যাগঃ (সেই ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ মতঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৯

শ্রীধর। সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্য্যমিতি। কার্য্যং ইত্যেবং বুদ্ধ্বা, নিয়তং—অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম, সঙ্গং ফলং চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে ইতি যৎ—তাদৃশঃ ত্যাগঃ স সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

(সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ)

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [সাত্ত্বিক ত্যাগের কথা বলিতেছেন]—"অবশ্য কর্ত্তব্য",—এই বুদ্ধিতে আসক্তি এবং ফলত্যাগ করিয়া যে বিহিত কর্ম্ম করা যায়, তাদৃশ ত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা যায়। [রাজসিক ও তামসিক ত্যাগীরা কর্ম্মকেই ত্যাগ করিয়া বসে কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ কর্ম্মত্যাগ করেন না, তাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা মাত্র ত্যাগ করেন। সাত্ত্বিকদের ত্যাগ কর্ম্মত্যাগ নহে, ফলমাত্র ত্যাগই তাঁহাদের লক্ষ্য। প্রশ্ন হইতে পারে--নিত্য কর্ম্মের জন্য শাস্ত্রে কোন ফলোল্লেখ নাই, তবে তাহার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইবে ? সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম যথাবিহিত ভাবে করিলে সকাম কর্ম্মের ন্যায় তাহতেও কিছু ফল হয়। কোন বৃক্ষে ফল পাওয়া না যাইলেও তাহার ছায়া না চাহিলেও যেমন পাওয়া যায়, তদ্রূপ নিত্যকর্ম্মের অন্য কোন ফল না থাকিলেও, তাহাতে যে পাপক্ষয় হয় এবং তাহা হইতে যে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রসম্মত। সুতরাং কর্ম্মফলে লোভ না রাখিয়া যে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। ফলকামনা দ্বারাই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে, হৃদয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, এই জন্যই মুমুক্ষুগণ ফলাভিসন্ধানরহিত হইয়া নিত্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন। সন্ধ্যোপাসনাদি বিহিত কর্ম্মে ফল কামনা না থাকিলেও অনুষ্ঠাতার একটি ফল হইবেই। তাহা এই যে, ত্রিগুণের তাড়নাবশতঃ জীব অবিরত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবের পাপ প্রবৃত্তির বেগ হ্রাস হইয়া যায়] ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা সব করা চাই—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিঃশেষরূপে সংযত হইয়া করিবে—সব করিবে—ইহার নাম সাত্ত্বিক ত্যাগ।—সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারেও যে সকল বিহিত কর্ম্ম আমাদিগকে প্রতিদিন করিয়া যাইতে হয়—তাহা সমস্তই করিতে হইবে। কোন কর্ম্ম বাদ দিলে চলিবে না। কর্ম্মে দ্বেষ বুদ্ধি থাকিলে সে কর্ম্ম না করাই স্বাভাবিক। যোগীর কোন কর্ম্মেই দ্বেষ নাই, সেজন্য কোন কর্ম্ম করিতে তাঁহার মন বিদ্রোহী হয় না, আবার আসক্তিবশতঃ কর্ম্মে যত্নশীল হওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি সব কর্ম্মই করিয়া যান অথচ তাঁহার কোন সঙ্কল্প থাকে না। যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম্ম অবিশ্রান্ত চলিতেছে অথচ তাহাতে যেমন সঙ্কল্প নাই, ঠিক তদ্রূপ। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কোন কর্ম্মই থাকে না, ক্রিয়ার পর-অবস্থার পরাবস্থায় কর্ম্ম হয়, কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না,—এইরূপ ফলাভিসন্ধানশূন্য অবস্থাতেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়। নচেৎ মনে করিয়া ত্যাগ করিতে হইলে প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয় না, একটু ফলের গন্ধ তাহাতে থাকিবেই। কিন্তু প্রাণ সুষুম্নায় চলিলে অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছু কিছু কর্ম্ম হইলেও, তাহাতে আসক্তি আদৌ থাকে না। অবিশ্রান্ত ভগবৎ-স্মরণে যোগীর চিত্ত মত্ত মাতালের মত হইয়া যায়, সে অবস্থায় আর সঙ্কল্প করিয়া কোন কর্ম্ম করা চলে না ॥ ৯

অন্বয়। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়-

রহিত) ত্যাগী (ত্যাগী ব্যক্তি) অকুশলং কর্ম্ম (অকল্যাণকর বা দুঃখকর কর্ম্ম) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) [এবং] কুশলে (সুখকর বা কল্যাণকর কর্ম্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ১০

শ্রীধর। এবম্ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্তলক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ—সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী, অকুশলং—দুঃখাবহং,—শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং, কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি। কুশলে চ - সুখকরে কর্ম্মণি—নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ, ন অনুষজ্জতে—প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ, মেধাবী—স্থিরবুদ্ধিঃ, যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে, স্বর্গাদি সুখঞ্চ ত্যজতি, তত্র কিয়দেতৎ তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চ, ইত্যেবম্ অনুসন্ধানবান্ ইত্যর্থঃ। অতএব ছিন্নঃ-সংশয়ঃ—মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখ-দুঃখয়োঃ উপাদিৎসা-পরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রকার সাত্ত্বিকত্যাগ-পরিনিষ্ঠ ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন]—সত্ত্বসমাবিষ্ট—সত্ত্ব দ্বারা সম্যক্ ব্যাপ্ত অর্থাৎ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল অর্থাৎ দুঃখাবহ কর্ম্মকে (যেমন শীতকালে প্রাতঃস্নানাদি) দ্বেষ করেন না, আর কুশল বা সুখকর কর্ম্মে (যেমন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নস্নানাদিতে) প্রীতি করেন না। তাহার কারণ এই যে, তিনি মেধাবী অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি,—যে অবস্থায় পরিভবাদি মহৎদুঃখও সহ্য করিতে পারেন এবং স্বর্গাদি সুখকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন ; তদবস্থায় তাৎকালিক সুখ-দুঃখকে ক্ষণিক বলিয়া যিনি মনে করেন, তাঁহার আর সেই সুখ-দুঃখের জন্য মনে অনুসন্ধান আসিবে কেন ? [অর্থাৎ কেন সুখ আসিল বা দুঃখ কেন হইল, তাহার কারণ কি—এ সকল বিষয়ে যাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও অনুসন্ধান আসে না], অতএব তিনি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ দৈহিক সুখ-দুঃখের গ্রহণেচ্ছা বা পরিহারেচ্ছারূপ লক্ষণ যাঁহার থাকে না তিনিই ছিন্নসংশয় ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল কর্ম্ম করিতে দ্বেষ করে না—ভাল কর্ম্মের ইচ্ছাও করে না—সকল কর্ম্মেরই ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করে—ক্রিয়াতে থেকে (যাহা গুরূপদেশগম্য) তাহাতেই আট্‌কিয়ে থেকে সব কর্ম্ম করা—এইরূপ স্থিরবুদ্ধি হইয়া ভিতরে ভিতরে ধারণা পূর্ব্বক আট্‌কিয়ে থেকে সমুদয় কর্ম্ম করে সংশয় রহিত হইয়া।—প্রাণকর্ম্মই "স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম" তাহা "সহজ কর্ম্ম" ও "স্বভাবজ কর্ম্ম"। প্রতিক্ষণে আমরা শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া থাকি অথচ তাহাতে কোন ইচ্ছা থাকে না—এই স্বভাবনিয়ত কর্ম্মে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে যিনি ইচ্ছারহিত হইয়া যান, তিনি সাংসারিক সকল কর্ম্ম করিলেও কোন বিশেষ কর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রীতি বা দ্বেষ হয় না। অকুশল কর্ম্মের উপরও বিদ্বেষ থাকে না এবং কুশল কর্ম্মের প্রতিও আসক্তি থাকে না। তিনি যাহা কিছু মনে করেন সমস্ত কর্ম্মই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করেন। তাহার কারণ—তিনি সাধন করিতে করিতে সত্ত্বসমাবিষ্ট হন ; অর্থাৎ মন দিয়া অধিকক্ষণ ক্রিয়া করিলে শ্বাসের গতি হ্রাস হয় এবং সুষুম্নাবাহী হইয়া থাকে, তাহার ফলে সত্ত্বগুণ তাঁহাকে অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিও স্থির হয় অর্থাৎ তিনি মেধাবী হন। আত্মজ্ঞানরূপ প্রজ্ঞাই মেধা, এই মেধা যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই তাঁহার

দেহাভিমানীর কর্ম্মত্যাগ হয় না, ফলত্যাগই মুখ্য ত্যাগ।

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ হয়, এই স্থিতিলাভ হইতেই মনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। কূটস্থে লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং তাঁহার চিত্তের লয়-বিক্ষেপ দূরীভূত হওয়ায় তাঁহার আত্মা ও অনাত্মা-সম্বন্ধীয় সমস্ত সংশয় শূন্য হইয়া যায়। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে থাকাই পরমার্থ আর দেহাদিতে আসক্ত থাকাই অনর্থ—ইহা তিনি জানেন, এবং তাহা জানেন বলিয়াই তিনি কুশল কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না, এবং যদিও অকুশল কর্ম্মও কখন করেন না তবুও তাহাতে কোনরূপ দ্বেষবুদ্ধি থাকে না। এই জন্য মেধাবী হওয়া আবশ্যক। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই আসল মেধা, তাহাতে তাঁহার মন সর্ব্বদা আট্‌কানো থাকে, সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম করিলেও কোন কর্ম্মের দাগ তাঁহার চিত্তে পড়িতে পারে না, ইহার নামই **ভগবদর্পিত চিত্ত**। এ চিত্তে আর ভাল-মন্দের বিচার আসে না। নেশাখোরের মত তাঁহার মন নেশায় সর্ব্বদা ভোঁ হইয়া থাকে, করিতে হয় তাই করেন, তাহাতে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে—এ সব তরঙ্গ তখন মনেই উঠে না। তাঁহার মনই নাই, সুতরাং তাহাতে সংকল্পের ঢেউ উঠারও সম্ভাবনা নাই। দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত মনেই বিবিধ সংশয় উৎপন্ন হয়, সেই মন প্রাণায়ামাদি সাধন-সাহায্যে সমতা প্রাপ্ত হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, তখন মন আর মর্কটের মত বিষয়-বৃক্ষের শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়ায় না। এইরূপে চিত্ত স্থিরতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১০

অন্বয়। দেহভৃতা (দেহধারী বা দেহাভিমানী জীব) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকল) অশেষতঃ ত্যক্তুং (অশেষ প্রকারে ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যং (সমর্থ হয় না)। যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) কর্ম্মফলত্যাগী (কর্ম্মফলত্যাগী) সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (সেই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়)॥ ১১

শ্রীধর। ননু এবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্ বরং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগঃ তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাসুখং সম্পদ্যতে তত্রাহ—নহীতি। দেহভৃতা—দেহাভিমানবতা, নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যং। তদুক্তম্—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি কর্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগী ইত্যভিধীয়তে॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [তাহা হইলে তো এইরূপ কর্ম্মফলত্যাগ অপেক্ষা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ। উহাতে বিক্ষেপের অভাববশতঃ জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সুখ পাওয়া যাইতে পারে—তাহাতেই বলিতেছেন]—দেহাভিমানী জীব নিঃশেষে সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না;—তৃতীয় অধ্যায়ে "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি সকল কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের ফলত্যাগী হন, তিনিই মুখ্য ত্যাগী বলিয়া কথিত হন॥ ১১

(কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল—এই ত্রিবিধ ফল কাহার হয় ?)

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই দেহ ধারণ ক'রে সম্পূর্ণরূপে বিনা কর্ম্ম করিয়া থাকিতে পারে না—সমুদয় কর্ম্ম করিয়া ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া যে সমুদয় কর্ম্ম করে তাহারই নাম ত্যাগী—স্থির বুদ্ধির সহিত—অন্যলোকে স্থির বুদ্ধির সহিত না ত্যাগ করিয়া চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত পুনর্ব্বার গ্রহণও করে।—যাহাদের বুদ্ধি স্থির হয় নাই, তাহারা "আমি কর্ত্তা নহি" মুখে বলিলেও তাহাদের কর্ম্মের উপর অভিমান থাকে। যেখানে দেহাভিমান রহিয়াছে, সেখানে দেহকৃত কর্ম্মের উপর অভিমান থাকিবেই। ক্রিয়ার পর-অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীর দেহে অভিমান কেন, দেহ যে তাঁহার আছে, সে বোধও থাকে না, তবে তাঁহার কর্ম কি ভাবে হয় ? (কারণ তাঁহাকেও কর্ম করিতে দেখা যায়)। তিনি কর্ম করেন বটে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য যেরূপ আসক্তির সহিত কর্ম করে, তিনি সে ভাবে কর্ম করিতে পারেন না। প্রয়োজন না থাকিলে কেহ কর্ম করিতে পারে কি ? জ্ঞানী পুরুষের কোনও প্রয়োজন নাই—এইজন্য তাঁহার পক্ষেও সাধারণ লোকের মত কর্ম করা সম্ভব নহে। তবে যে তাঁহাকে কর্ম করিতে দেখা যায়, তাহা এই ভাবে হয়,—সর্পের খোলসটা (ইচ্ছা না থাকিলেও) বায়ুবশে যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ যোগীর সঙ্কল্প না থাকায় কর্ম্মপ্রবৃত্তির বেগ থাকা সম্ভব নহে, কিন্তু বায়ুতাড়িত নির্ম্মোকের ন্যায় প্রারব্ধবশে তাঁহার কর্ম্মসকল সম্পন্ন হয়, অথচ কর্ম্মে আসক্তি না থাকায় কর্ম্মের ভাল মন্দ ফলে তিনি আবদ্ধ হন না,—জ্ঞানীর কর্ম্মত্যাগ এই ভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু দেহ যতদিন আছে, নিঃশেষে সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ কাহারও হইতে পারে না। তাই ভগবান বলিতেছেন—যখন কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই, তখন যাঁহারা কর্ম্মও করেন অথচ কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না—তাঁহারাই প্রকৃত ত্যাগী। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিব মনে করিলেই যে তাহা করিতে সক্ষম হইবে, তাহা মনে করিও না। যে মনের খেয়ালে বিষয়াদি ত্যাগ করে, তাহার পক্ষে পুনরায় বিষয় গ্রহণ করাও কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। সুতরাং কামনা ত্যাগের জন্য সাধনা করিতে হইবে। প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা যাঁহার প্রাণ ও তৎসহ মন এবং বুদ্ধি স্থির হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে আর কিছুতেই বিচলিত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না। অভিমান ত্যাগ অন্য কোন কৌশলে হইতে পারে না, প্রাণ স্থির হইলেই তাহা সহজলভ্য হইয়া থাকে॥ ১১

অন্বয়। অনিষ্টং (অকল্যাণকর) ইষ্টং (কল্যাণকর) মিশ্রং চ (এবং ইষ্টানিষ্ট মিশ্র) ত্রিবিধং (তিনপ্রকার) কর্ম্মণঃ ফলম্ (কর্ম্মের ফল) অত্যাগিনাং (সকাম ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (পরলোকে যাইয়া) ভবতি (হইয়া থাকে)। তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (ফলত্যাগি-গণের) ন ক্বচিৎ (কখনও হয় না)॥ ১২

শ্রীধর। এবম্ভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টম্—নারকিত্বম, ইষ্টং—দেবত্বং, মিশ্রং—মনুষ্যত্বম্। এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্ম্মণো যৎ ফলং

প্রসিদ্ধং, তৎ সর্ব্বং অত্যাগিনাং—সকামানামেব, প্রেত্য—পরত্র ভবতি। তেষাং ত্রিবিধকর্ম্মসম্ভবাৎ, ন তু সংন্যাসিনাং কচিদপি ভবতি। সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনঃ গৃহ্যন্তে, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চ যোগী চ" ইত্যেবমাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ। তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভবাৎ ঈশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [এইপ্রকার কর্ম্মফলত্যাগের ফল কি তাহা বলিতেছেন]—অনিষ্ট অর্থাৎ নারকিত্ব, ইষ্ট অর্থাৎ দেবত্ব, মিশ্র অর্থাৎ মনুষ্যত্ব—এই তিনপ্রকার পাপ, পুণ্য ও উভয়-মিশ্র কর্ম্মের—এই ত্রিবিধ ফল প্রসিদ্ধ। সেই সব অত্যাগীদের অর্থাৎ সকামকর্ম্মীদের পরকালে গিয়া হইয়া থাকে। যেহেতু তাহাদেরই ত্রিবিধ কর্ম্মের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ঐ সকল ত্রিবিধ কর্ম্মের কখনও সম্ভাবনা হয় না। ফল-ত্যাগবিষয়ে তুল্যতাবশতঃ সন্ন্যাসীশব্দে এখানে প্রকৃত কর্ম্মফলত্যাগীকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ে "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং" ইত্যাদি শ্লোকে কর্ম্মফলত্যাগীতে সন্ন্যাসীশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ঐ সকল সাত্ত্বিকগণের পাপের সম্ভাবনা নাই এবং ঈশ্বরার্পণ-হেতু পুণ্যফল তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ত্রিবিধ কর্ম্মফলই নাই—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল, মন্দ, আর ভাল মন্দ মিশ্রিত, তিন রকমের কর্ম্মের ফল—ইহা তিনই ঐ কর্ম্মের ফল যাহারা ত্যাগ করিয়াছে—বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে যে ত্যাগী—সেই এ তিনেরই ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সন্ন্যাসী, যিনি কেবল বর্ত্তমান অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কখনই ঐ তিনকে ত্যাগ করিতে পারেন না—কারণ তাঁহার ভবিষ্যতের মোক্ষপদাদির ইচ্ছা রহিয়াছে।—কর্ম্ম তিন প্রকার অনিষ্ট, ইষ্ট এবং উভয় মিশ্রিত। যাঁহারা ত্যাগী নহেন অর্থাৎ যাঁহারা সংসারাসক্ত তাঁহাদের এই সকল কর্ম্মের ফল মৃত্যুর পরে বা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। ইষ্টকর্ম্মের দ্বারা দেবলোকে, অনিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা তির্য্যগ্‌যোনিতে এবং মিশ্রকর্ম্মের ফলে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই তিন প্রকারের কর্ম্মই ত্যাগ না করিতে পারিলে জন্মান্তর-পরিগ্রহ ও তজ্জনিত সুখদুঃখাদি ভোগ অনিবার্য্য। এই জন্য বিবেকসম্পন্ন পুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা এই কর্ম্মের বন্ধন কাটাইতে চান। কিন্তু কর্ম্মবন্ধন কাটাইতে চাহিলেই যে কর্ম্মবন্ধন কাটে—তাহা তো নহে। কারণ পূর্ব্বাভ্যাসজনিত সংস্কার ও স্বভাব মনুষ্যকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, এবং তাহাকে বাধ্য হইয়া ফলভোগ করিতে হয়। কর্ম্মফল-ভোগে ভীত হইয়া যাঁহারা সংসারগতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ত্যাগ অভ্যাস করিতে হয়। যাঁহারা এই ত্যাগ অভ্যাস করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের বৈরাগ্য হইয়াছে, অর্থাৎ বিষয় তাঁহাদের নিকট স্বাদু বোধ হয় না বুঝিতে হইবে। এই ত্যাগ ভাবটিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বিত হয়, শাস্ত্র তাহাকেই "বিবিদিষা সন্ন্যাস" বলেন। এই বিবিদিষা সন্ন্যাসে সংসার অনুপাদেয় অথবা হেয় বিবেচিত হয়, এবং তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে—কি প্রকারে এই সংসারগতি রুদ্ধ হয় ? কিন্তু আত্ম-জ্ঞান ব্যতীত সংসারগতি রুদ্ধ হয় না। এইজন্য বিবিদিষা সন্ন্যাসের প্রধান সাধন—বিচার।

আত্মানাত্মবিবেক না হইলে অনাত্ম বস্তুর ত্যাগ হইতে পারে না। তাই যে মন পূর্ব্বে কেবল বিষয়াদি গ্রহণে ব্যাপৃত থাকিত, এখন সেই মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা করাইবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহার উপায়—শ্রবণ ও মনন। এই শ্রবণ ও মনন হইতে সংসার-বিষয়ে আসক্তির হ্রাস হয় ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্য সমধিক আগ্রহ হয়। শাস্ত্রানুমোদিত সন্ন্যাস এমন একটি আশ্রম—যে আশ্রমে অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, তাই যাঁহারা বিরক্ত পুরুষ তাঁহারা এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রবণ মনন দ্বারা বৈরাগ্যভাবকে পুষ্ট করেন এবং সাধনাদি দ্বারা ঐকান্তিকভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু তখনও তাঁহার মনে সংসারের প্রতি বিদ্বেষ ও মোক্ষের প্রতি আগ্রহ থাকে। এই গ্রহণ ও ত্যাগেচ্ছা যতদিন মনোমধ্যে বিরাজ করে, ততদিন তিনি সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহাকে ত্যাগী বলা যাইবে না। কারণ তখনও তিনি সম্যক্ জ্ঞানী বা ত্যাগী পদবীতে আরূঢ় হন নাই। সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগী বা সর্ব্বভাবনা-বিনির্মুক্ত যাঁহারা হইতে পারেন না, এই অবস্থায় তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি রুদ্ধ হইবে না। কিন্তু যাঁহারা ত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাস না লইয়াও পরমার্থ-সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, এইজন্য ত্রিবিধ কর্ম্মের ফলভোগ তাঁহাদিগকে কখনই করিতে হয় না। ইচ্ছা-দ্বেষ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আমরা প্রকৃতি বা মহামায়ার শাসনক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি না, ততদিন জন্ম-মরণ ও কর্ম্মভোগও ফুরায় না। এক কথায় যাঁহাদের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাঁহারাই ত্যাগী —তাঁহারা গৃহেই থাকুন বা অরণ্যেই থাকুন, এই ত্যাগভাব সুদৃঢ় হওয়ায় তাঁহাদের মনে আর কোন সঙ্কল্পের তরঙ্গ উত্থিত হয় না, ইঁহাদের রাগদ্বেষ ক্ষীণ হইতে হইতে একবারে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের স্থিতিকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। তাঁহাদের বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতের কোন কামনা বা সঙ্কল্প থাকে না। দেহেন্দ্রিয়-মনের সঙ্গে যতদিন সম্বন্ধ থাকে ততদিন সংসার গেল কি করিয়া? সুতরাং মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? সংসারে আমরা বাঁধা পড়িয়াছি কেন? আমাদের ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে যে সকল কর্ম্ম সম্ভূত হয়, তাহার ভোগ ও প্রতিবিধানের জন্য তত্তৎ বিষয়ের নিকট আমরা বাঁধা পড়ি। ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব এই ত্রিপুর বা দেহাদিতে অভিমান বর্ত্তমান থাকিতে বিনষ্ট হয় না। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহই ত্রিপুর, এই ত্রিপুরে অভিমান থাকিতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। এই ত্রিপুর বা প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন—তাহা বুঝিতে হইবে এবং তাহার একমাত্র উপায়—স্থির প্রাণের উদ্বোধন। প্রাণ চঞ্চল হইয়া মনকে, মন ইন্দ্রিয়গণকে এবং ইন্দ্রিয়গণ দেহকে কর্ম্মে বিনিযুক্ত করে, সুতরাং প্রাণের চাঞ্চল্য থাকিতে সন্ন্যাস লইলেও সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হইতে পারে না। কিন্তু যিনি ত্যাগী তিনি কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য, ব্রহ্মলক্ষ্যে তিনি সর্ব্বদা অবহিত, তাই জাগতিক লাভালাভ ভালমন্দ কিছুতেই তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। এই ত্যাগীর আসনই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ত্যাগী হইতে হইলে মনকে সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে হইবে এবং মন তখনই নিরুদ্ধ হওয়া সম্ভব যখন প্রাণ স্পন্দনশূন্য হইবে। প্রাণের এই নিষ্পন্দন ভাব ত্যাগীর স্বাভাবিক। সন্ন্যাসীর অন্য ইচ্ছা না থাকিলেও মোক্ষের ইচ্ছা থাকে কিন্তু ত্যাগীর মোক্ষলাভের আশাও থাকে না। প্রাণ স্পন্দিত হয় পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে,

(কর্ম্মের কারণ—পাঁচটি)

পঞ্চৈতানি * মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ১৩

সেই প্রাণ স্পন্দিত হইলেই মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় স্পন্দিত হইয়া উঠে। এই স্পন্দনের নামই কর্ম্ম চেষ্টা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,—এই কর্ম্ম চেষ্টার বেগ আসে প্রাণ হইতে, সেই প্রাণকে সুষুম্নামুখী করিতে পারিলেই মূলাধারস্থ জীবশক্তি আজ্ঞাচক্রে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই নিরোধভাবের দ্বারাই মন-ইন্দ্রিয়ের বিষয়গতি নিরুদ্ধ হয়। যাঁহার এই নিরোধভাব সম্যক্ ও সহজ হইয়াছে, বিষয়-ত্যাগও তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকেন্দ্রকেই ত্যাগী বলে। তিনি যে ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করেন তাহা নহে, ত্যাগ তাঁহার আপনা আপনি হয়। সে ত্যাগে তাঁহার কোন কষ্ট নাই। মন স্বভাবতঃই অচঞ্চল হইয়া আর বিষয় গ্রহণ করে না—ক্রমে ত্যাগীর গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাবও থাকে না। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাব ক্ষীণ হইলে গ্রহণের বিষয়ও থাকে না। সুতরাং কি লইয়া আর মনের স্পন্দন হইবে? ইহারই নাম সমতা বা সমাধি। এখন যাহাকে জীবাত্মা বলিতেছে, তখন তাহা পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে স্থিতিলাভ করে॥ ১২

অন্বয়। মহাবাহো! (হে মহাবাহো) সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে (সকলপ্রকার কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য) কৃতান্তে সাঙ্খ্যে (কর্ম্মের পরিসমাপ্তিসূচক বেদান্ত বা সাংখ্যশাস্ত্রে) প্রোক্তানি (কথিত বা বর্ণিত) ইমানি (এই) পঞ্চকারণানি (পাঁচটি কারণ) মে নিবোধ (আমার নিকট অবগত হও)॥ ১৩

শ্রীধর। নমু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কর্ম্মফলেন লেপো নাস্তি ইতি উপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে—নিষ্পত্তয়ে, ইমানি—বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি, মে বচনাৎ নিবোধ—জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থম্ অবশ্যম্ এতানি জ্ঞাতব্যানি ইতি এবং, তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে—জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং—তত্ত্বজ্ঞানম্, তস্মিন্। কৃতং—কর্ম্ম, তস্য অন্তঃ—সমাপ্তিঃ অস্মিন্ ইতি কৃতান্তঃ তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বানি অস্মিন্ ইতি সাংখ্যম্। কৃতঃ অন্তঃ—নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং—সাংখ্যশাস্ত্রমেব, তস্মিন্ প্রোক্তানি। অতঃ সম্যক্ নিবোধ ইত্যর্থঃ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, তাহার কর্ম্মফল হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে সঙ্গত্যাগী নিরহঙ্কার ব্যক্তির যে কর্ম্ম লোপ হয় না—ইহাই পাঁচটি শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন]—(হে মহাবাহো) সর্ব্বকর্ম্মের নিষ্পত্তির জন্য এই বক্ষ্যমাণ পাঁচটি কারণ আমার বাক্য হইতে জানিয়া লও। আত্মার কর্ত্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তির জন্য এই সকল কারণগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য। এইরূপে সেই সকল কারণের স্তুত্যর্থ বলিতেছেন। সম্যক্‌রূপে খ্যাত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় যাহাতে—তাহাই সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। কৃত অর্থে কর্ম্ম তাহার অন্ত অর্থাৎ সমাপ্তি হয় যাহাতে—তাহাই কৃতান্ত, তাহাতে অর্থাৎ বেদান্ত সিদ্ধান্তে। অথবা সংখ্যাত বা

* পঞ্চেমানি ইতি বা পাঠঃ।

গণিত হয় তত্ত্ব সকল যাহাতে—তাহা সাংখ্য, আর কৃত হয় অন্ত অর্থাৎ নির্ণয় যাহাতে—তাহাই সাংখ্যশাস্ত্র. তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত হও ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এখন সকলে যে কর্ম্ম করে তাহার পাঁচটী কারণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল কারণ জন্য কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত করিতেছে।— কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য যে পাঁচটি কারণ আছে, তাহা জ্ঞাতব্য বলিয়া বলিতেছেন। তাহা জ্ঞাতব্য এইজন্যই,—যে আত্মার কর্ত্তৃত্বাভিমান জন্য এই সংসারলীলা চলে, সেই সংসার নিবৃত্ত হয় না এই কর্ত্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত। এই আত্মবস্তুই সত্য, উহা এক ও অদ্বিতীয়। আত্মার এইরূপ সত্য পরিচয় থাকে না বলিয়াই আত্মাকে বহু বলিয়া মনে হয়, আত্মাতে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখরূপ সংসার অধ্যারোপিত হয়। আত্মার যাহা স্বরূপ, সেই সত্যজ্ঞান না হইয়া অন্য বোধ হয় কেন? অনাত্মবস্তু—যাহা মিথ্যা, তাহাকে সত্যবোধ করিয়া অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধ ও মিথ্যাবস্তুতে যে সত্যবোধ হইয়া থাকে উহাই অবিদ্যার কার্য্য। এই অবিদ্যা নষ্ট না হইলে আত্মার স্বরূপ বোধ হয় না। অবিদ্যা নষ্ট হয় বিদ্যা দ্বারা। অসংখ্য তরঙ্গের অভিঘাত হেতু যেমন সমুদ্রের স্থিরত্বকে লক্ষ্য করা যায় না, তদ্রূপ অবিদ্যার অসংখ্য তরঙ্গ ভঙ্গ হেতু স্থির আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। এইজন্য আত্মজ্ঞানের যাহা যাহা আবরক, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্যক। সেই জ্ঞানলাভ যে শাস্ত্রদ্বারা হয় তাহাকে সাংখ্যশাস্ত্র বলে। এইজন্য সাংখ্যকে কৃতান্ত বলা হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়। তখনই আত্মার সম্যক্ খ্যাতি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। কৃত অর্থাৎ কর্ম্মের অন্ত বা পরিসমাপ্তি। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু এ অবিদ্যার খেলা যতদিন রুদ্ধ না হয়, ততদিন কর্ম্মের গতিও রুদ্ধ হয় না, এবং কর্ম্মের গতি রুদ্ধ না হইলে জন্ম-যাতায়াতরূপ সংসার-খেলাও নিরন্তর প্রবহমান থাকে। আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে অবিদ্যাজনিত কর্ম্মও নিবৃত্ত হয়, এবং জন্ম-যাতায়াতরূপ যে কর্ম্মের ফল—তাহাও বিলুপ্ত হয়। ক্রিয়ার পরাবস্থাই সম্যক্ জ্ঞান, সে অবস্থায় কোন ক্রিয়া থাকে না। ইড়া পিঙ্গলায় যতক্ষণ শ্বাস বহিতে থাকে ততক্ষণই অবিদ্যা। সে সময় কর্ম্মও থাকে, কর্ম্মের ফলও থাকে। ইহাই অনাত্ম দৃষ্টি বা মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানের যাহা কারণ, সেই কারণ পঞ্চ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হইলে আর অবিদ্যার উৎপত্তিই হইতে পারে না। যেমন সতর্ক থাকিলে চোর চুরি করিতে পারে না, তদ্রূপ মিথ্যাজ্ঞানের কারণগুলিকে জানিলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্য মুগ্ধ হইতে হয় না। "ক্রিয়া, কারক এবং ফল অজ্ঞানের দ্বারাই আত্মাতে আরোপিত হয়, যে অজ্ঞ সে অধিষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিয়াসম্পাদক কারকগুলিকেই আত্মা বলিয়া বুঝে, তাহার পক্ষে অশেষরূপে কর্ম্মসন্ন্যাস সম্ভব হয় না"—(শঙ্কর)। ভগবান বলিতেছেন—এই অনাত্মজ্ঞান যাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেই কারণগুলিকে বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। ইহা সম্যক্ জানা থাকিলে আর আত্মবিস্মৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। ভগবান গীতাতে পূর্ব্বেও বলিয়াছেন—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" কিন্তু ওঁকার ক্রিয়ার সাহায্যে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই "তৎ" কে ও "সৎ" কে লক্ষ্যই করিতে পারে না। "তৎ" ও "সৎ"এর অভেদ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান ॥ ১৩

(কারণ পঞ্চ)

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্‌।
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্‌॥ ১৪

অন্বয়। অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা কর্ত্তা (আর অহঙ্কার) পৃথক্‌বিধং চ করণং (কর্ম্মসাধন বিবিধ ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৃথক্‌ চেষ্টাঃ চ (পৃথক পৃথক চেষ্টা বা ব্যাপার), অত্র (এই কারণ সমূহের মধ্যে) দৈবম্‌ এব চ (দৈব—ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার বা সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্য্যামী) পঞ্চমঃ (পঞ্চম স্থানীয়) ॥ ১৩

শ্রীধর। তান্যেব আহ—'অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং—শরীর', কর্ত্তা—চিদচিদ্‌ গ্রন্থিঃ অহঙ্কারঃ। পৃথগ্বিধম্‌—অনেক প্রকারং করণং - চক্ষুঃশ্রোত্রাদি। বিবিধাঃ - কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ, পৃথগ্‌ভূতাঃ চেষ্টাঃ—প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ। অত্র এতেষু এব দৈবং চ পঞ্চমং কারণং—চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকম্‌ আদিত্যাদি সর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্য্যামী বা ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদনের সেই কারণগুলি কি তাহাই বলিতেছেন]—(১) অধিষ্ঠান—শরীর, (২) কর্ত্তা—চিৎ অচিতের গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার, (৩) করণম্‌—অনেকপ্রকার করণ, চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ, (৪) কার্য্যতঃ ও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা অর্থাৎ প্রাণ-পঞ্চের ব্যাপারাদি। (৫) দৈবম্‌—অত্র অর্থাৎ ইহার মধ্যে দৈবই পঞ্চম অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক বা সহকারী সূর্য্যাদি, অথবা সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্য্যামী। [দৈব অর্থাৎ অনুগ্রাহক দেবতা। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং প্রাণকে দিক্‌দেবতা, বায়ুদেবতা, অর্কদেবতা, বরুণ-দেবতা ও অশ্বিনীকুমার প্রেরণা করেন। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি যথাক্রমে বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে প্রেরণা করেন। চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণু, যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পঞ্চ প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণের দেবতা যথাক্রমে—সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। এই সমস্ত দেবতাগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই সকল ইন্দ্রিয়াদি স্থূল বিষয় অনুভব করেন। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কারকেও কেহ কেহ দৈব বলেন] ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমেই একটী কর্ম্ম মনে মনে স্থির করে সে কর্ত্তা বলিয়াই স্থির করে—স্থির ক'রে করিতে আরম্ভ দেয়—করিতে আরম্ভ ক'রে নানাপ্রকার চেষ্টা করে—করিলে কি হইল—দৈবের দ্বারায় যা কিছু হবার তাই হয়—অতএব বুদ্ধি, অহঙ্কার করা, বিবিধ চেষ্টা, ও দৈব এই সকল কর্ম্মের কারণ হইতেছে। তবে সমুদয় কর্ম্মেরই কারণ মনই, সেই মনকে ক্রিয়ার দ্বারায় স্থির করিলেই কোন কর্ম্মই নাই—ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত।—কোন কর্ম্ম করিতে হইলে প্রথমে মনে সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্পের উদয় মন হইতেই হয়, এবং বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে—ইহাই অন্তঃকরণের কার্য্য। মনের সঙ্কল্প (১) ইন্দ্রিয় যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে। এই যন্ত্রগুলি পরিচালনা করেন (২) প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। এই সকল ক্রিয়া নিষ্পত্তির জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ধারক একটি আধারের প্রয়োজন, (৩) এই আধার বা অধিষ্ঠানটি হইল

দেহ। এই দেহরূপ আধারটিকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্ম চেষ্টার অভিব্যক্তি হয়। এখন এই কর্ম্মগুলি যাহার উদ্দেশ্যে (প্রয়োজন সাধনের জন্য) সম্পাদিত হয় তিনিই (৪) কর্ত্তা—তিনিই চিদাভাস বা জীব। ইনিই আত্মার সহিত তাদাত্ম্য বা অধ্যাসযুক্ত হইয়া চিৎলক্ষণান্বিত হন। অর্থাৎ তিনি চিৎ নহেন, অথচ চিতের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ চিতের মত প্রতীত হন বা নিজেকে চেতন বলিয়া মনে করেন -ইহাকেই দর্শনশাস্ত্রে "অহঙ্কার" বলে। ইনিই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা। (৫) দৈব—ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বর, বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার। অহঙ্কার এই সংস্কারের অনুরূপই হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের ছাপই অবিদ্যারূপ গ্রন্থি বা অজ্ঞান। এই অবিদ্যাগ্রন্থি চিতের সহিত সংযুক্ত হইয়াই "আমি" "আমি" করে। এই অহঙ্কার না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না, এইজন্য ইহাকে কর্ত্তা বলা হয়। একটি ঘর তৈয়ারী করিতে হইলে, ইট, কাঠ, চুন, মিস্ত্রী, কুলি সবই প্রয়োজন, কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে বা যাহার ইচ্ছায় এই ঘর প্রস্তুত হইবে—তিনি কর্ত্তা। এই কর্ত্তা চিৎ জড়ের মিলিত গ্রন্থি বা অহঙ্কার। কিন্তু পঞ্চম দৈবটিই সৃষ্টির প্রধান কারণ, তিনি প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য বা তাদাত্ম্যভাবে যুক্ত মহামহেশ্বরী মহাপ্রাণ, বা সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর। জগৎ যদি অজ্ঞান কল্পিত হয়, তবে এই অজ্ঞতা কাহার এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু শ্রুতিতে আছে - ব্রহ্মের সঙ্কল্পই "একোঽহং বহুস্যাম" এই বিরাট বিশ্বপ্রকাশের মূল কারণ। ব্রহ্মের এই সঙ্কল্পরূপ কারণ না থাকিলে আদৌ সৃষ্টি হইতে পারিত না। ভাগবতে আছে, ব্রহ্মা বলিতেছেন—"চতুষ্পদাদি জন্তুগণ নাসিকায় বদ্ধ হইয়া মনুষ্যের জন্য তাহার ইচ্ছামত যেমন কার্য্য করে, আমরাও সেইরূপ ত্রিগুণে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করি"—(ভাঃ ৫।১।১৫) সুতরাং জীবের প্রথম অদৃষ্ট লিখিত হইয়াছে—ব্রহ্মের সঙ্কল্প দ্বারা। ঈশ্বরের এই অনাদি আদি-সঙ্কল্পই মহানিয়তি বা দৈব। এই নিয়তি লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই নিয়তিই ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কাররূপে প্রাণের দ্বারা স্পন্দিত হইয়া জীবের মনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাণের স্পন্দনরূপ ক্রিয়া দেহক্ষেত্রেই সম্পাদিত হয়, দেহক্ষেত্র তাহাতেই সংস্কারানুরূপ কার্য্য করিতে যেন প্রবৃত্ত হয়। কারণ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম প্রাণদ্বারাই শরীর-ইন্দ্রিয়-মনে দৈবরূপ বীজসংযুক্ত হইয়া ফলরূপে প্রকাশিত হয়। পুরুষকার দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে তাহাতে দৈবরূপ বীজ সংযুক্ত হয়, এবং তাহাতেই জীব কর্ম্মানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট ফলই নিয়তি। রুদ্রাদিরও এই নিয়তি লঙ্ঘনে সামর্থ্য নাই। এই নিয়তিই ঈশ্বর-সঙ্কল্প। পুরুষ প্রযত্নের দ্বারা মিলিত হইয়াই এই নিয়তি ফলপ্রদ হয়। সমস্ত জীবের সম্মিলিত অদৃষ্টই ঈশ্বর-সঙ্কল্প, নচেৎ তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজনবশে এই জগৎ সৃষ্টি হয় না। সুতরাং দৈব অখণ্ডনীয় হইলেও পুরুষকারের স্থান আছে। পুরুষকার ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, দৈবই বীজস্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্ষেত্রস্বরূপ। বীজে সমস্ত শক্তি নিহিত থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্র-ব্যতীত যেমন তাহা প্রকাশিত হয় না, তদ্রূপ অদৃষ্ট বীজশক্তি হইলেও ক্ষেত্রকর্ষণাদিরূপ পৌরুষ ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না।

সুতরাং আমরা যে সকল কর্ম্ম করি তাহার কর্ত্তা কে নিরূপণ করিতে হইলে দেখা যায় —(১) দেহ বা অধিষ্ঠান, (২) ইন্দ্রিয়াদি করণ, (৩) প্রাণাপানাদির চেষ্টা, (৪) কর্ত্তা বা অহঙ্কার

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫

এবং (৫) দৈব—ইহাই মহানিয়তির প্রেরণা। এই পঞ্চ কারণ মিলিয়াই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। আত্মা কিন্তু এই সকলের সাক্ষী মাত্র, কারণ নহেন। মায়া ব্যতীত জগৎ কল্পনা হয় না; এই জন্য সংসার মায়িক বস্তু। ব্রহ্মে মায়া নাই, সুতরাং তাঁহার মধ্যে জগৎ নাই। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এইজন্য জগতের অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু সত্তাভাবের অভাব হয় না। ক্রিয়া থাকিলে তবে তো কর্ত্তার প্রয়োজন। পরাবস্থায় কোন ক্রিয়াই থাকে না, এই জন্য আত্মা চিরদিনই অকর্ত্তা। সুতরাং নামরূপময় দৃশ্যবস্তু কল্পিত মাত্র, সত্য নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় বটে, কিন্তু রজ্জু কোন দিনই সর্প হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইলেও ব্রহ্ম কখনও জগৎরূপে পরিণত হন না। রজ্জুতে সর্পবোধ যেমন দ্রষ্টার দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মেতে সংসার কল্পনা অজ্ঞের বুদ্ধি-বিভ্রম মাত্র। এই ভ্রম ব্রহ্মাশ্রিত নহে, কারণ পূর্ণজ্ঞানময় ব্রহ্মে ভ্রম থাকিতে পারে না, জ্ঞানের মধ্যে অজ্ঞান থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, সেইজন্য ভ্রম জীবাশ্রিত। জীবত্বও যেমন কল্পিত, তদাশ্রিত ভ্রমও তদ্রূপ কল্পনা মাত্র। জ্ঞানোদয় হইলেই অবিদ্যা তিরোহিত হয় এবং তৎসহ জীবভাবও অন্তর্হিত হয়, সুতরাং জীবাশ্রিত যে ভ্রম—তাহাও আর তখন থাকিতে পারে না। চিরস্থির নিত্য সত্য ভাবই ব্রহ্মভাব তরঙ্গায়িত সলিলের মধ্যে চন্দ্রিকা যেরূপ চঞ্চল বলিয়া মনে হয় ব্রহ্মে সেইরূপ অনিত্য সংসার দৃষ্ট হয় এবং তাহাতেই জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখাদির অনুভব হয়। সর্পরূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান যেমন সত্য স্বরূপ রজ্জু, তেমনই চিরস্থির আত্মাই এই চঞ্চল মনের আশ্রয়। চাঞ্চল্য তিরোহিত হইলেই, মনও থাকে না, কল্পনাও থাকে না, যাহা চিরস্থির অখণ্ড অবিনাশী, তিনিই প্রকাশিত হন। ইনিই মনের আশ্রয়, মনের মন পরমাত্মা, সাধনার দ্বারা এই চঞ্চল মন যখন চিরস্থির আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার সহিত এক হইয়া যায়—তখন তাহার মন উপাধিও আর থাকে না, সৃষ্টিও থাকে না ॥ ১৪

অন্বয়। নরঃ (মনুষ্য) শরীরবাঙ্মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা (ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোন কর্ম্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করে) এতে পঞ্চ (এই পাঁচটি) তস্য হেতবঃ (তাহার হেতু) ॥ ১৫

শ্রীধর। এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম্ম ত্রিধৈব অন্তর্ভাব্য শরীর-বাঙ্মনোভিঃ ইত্যুক্তম্। শারীরং বাচিকং মানসং চ ত্রিবিধং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভিঃ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যম্ অধর্ম্ম্যং বা করোতি নরঃ তস্য সর্ব্বস্য কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [সর্ব্বকর্ম্মের হেতুত্ব যে এই পাঁচেরই, তাহা বলিতেছেন]—যথোক্ত পঞ্চ কারণ দ্বারা প্রারভ্যমান যে কর্ম্ম, তাহা শরীরাদির অন্তর্ভুক্ত করিয়া শরীর বাক্য ও মন-দ্বারা এইরূপ বলা হইল] যেহেতু ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে কর্ম্ম শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক

হইয়া থাকে। শরীরাদি দ্বারা যে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম্য কর্ম্ম মানুষ করিয়া থাকে, সেই সকল কর্ম্মের এই পাঁচটিই হেতু ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই সকল কারণের হেতু পাঁচ। এ শরীর রহিয়াছে বলিয়া মনস্থিরপূর্ব্বক অন্যদিকে দৃষ্টি করে—সে দৃষ্টি বাক্যের দ্বারা শুনিয়া —অমুক বস্তু এই—বড় ভাল, সে ভাল আছে সে ভালই থাকুক—কিন্তু তাহা না বিবেচনা করিয়া আমি সেই জিনিসের কর্ত্তা হইব অর্থাৎ সে জিনিস আমার অধীন হয়—তাহার পর মন সেই জিনিস পাবার জন্য চলিলেন—চলিবার নিমিত্ত জুতা কাপড় চাদর লওয়া হইল এবং পাদব্রজন হইতে লাগিল—দোকানের নিকট পর্য্যন্ত গেলেন—গিয়া লেডিকেনি আছে? দৈবক্রমে লেডিকেনি ফুরিয়ে গিয়াছে—এটা বিপরীত কর্ম্ম। ইহা না লইয়া অন্য জিনিস নিতে পারেন—অতএব শরীর, বাক্য, মন দ্বারায় ন্যায্য কর্ম্ম বা বিপরীত কর্ম্ম—সকল কর্ম্মের হেতু এই পাঁচ হইতেছে।—মনুষ্য যাহা কিছু কায়িক, বাচিক, মানসিক কর্ম্ম করে, ঐ পাঁচটিই তাহার হেতু। তাহা হইলে জীবের মোক্ষ সম্ভাবনা কোথায়? জীবের সঙ্গে এই পাঁচটির সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখ। জীব স্বয়ং চিদংশ সুতরাং তাহার কর্ম্ম নাই। প্রকৃতি কর্ম্ম করে, জীব প্রকৃতির কর্ম্মে অভিমান করিয়া সুখদুঃখাদিতে জড়িত হয়। জীব প্রকৃতির কর্ম্মে অভিমান না করিলেই সুখদুঃখাদিতে সংলিপ্ত হয় না। জীবকে কর্ত্তা না বলিয়া তবে অহঙ্কারকে কর্ত্তা বলা হয় কেন? অহঙ্কার যদিও প্রাকৃত বস্তু কিন্তু ব্রহ্মের চৈতন্যে সে চেতনবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। ঘটস্থ জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, এইজন্য জলমধ্যে চন্দ্র দেখা যাইলেও বাস্তবিক চন্দ্র জলের সহিত যুক্ত হন না। তদ্রূপ অহঙ্কাররূপ জলে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া অহঙ্কারকে চৈতন্যযুক্ত করে। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় মায়াতে প্রতিবিম্বিতই চৈতন্যই জীব। সেই মায়া বা অজ্ঞান নাশ হইলে জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়। যদি বলা যায় অজ্ঞান নাশ হইলেও জীবভাব নষ্ট হয় না, তবে মুক্তি সিদ্ধ হইবে কিরূপে? অজ্ঞানশূন্য জীবভাব নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন জীবকেও ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বহু জীবের যখন মুক্তির কথা শুনা যায়, তখন ঈশ্বরও বহু হইবেন না কেন? কিন্তু তাহা সত্য নহে। অজ্ঞান জন্যই জীবভাব কল্পিত হয়, অজ্ঞান নষ্ট হইলে তৎসহ জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়। ঘটভগ্নে ঘটাকাশের যেমন পৃথক সত্তা থাকে না, অজ্ঞান নষ্ট হইলে জীবেরও তদ্রূপ পৃথক সত্তা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম তো সর্ব্বদাই জ্ঞানস্বরূপ, তবে এই জগদাদি প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় কিরূপে, এবং উৎপন্ন হইয়া তাহার স্থিতিই বা হয় কিরূপে? ব্রহ্মের অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি দ্বারাই এই বিশ্বলীলা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এই মায়াশক্তি নিতান্তই দুস্তরা, কিন্তু তবুও জীবের যখন মুক্তি হয় বলিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে এই মায়া দুস্তরা হইলেও নিত্যা নহে। ভগবান প্রকৃতি পুরুষের নিয়ামক ত্রিগুণের অধীশ্বর এবং সংসারস্থিতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি উভয়েরই তিনিই হেতু। সুতরাং ভগবানের অশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—

"স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতির্গুণেশঃ
সংসার মোক্ষ স্থিতিবন্ধ হেতুঃ ॥"

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববিদ্, যিনি সকলের আত্মা ও যোনি অর্থাৎ কারণ, যিনি চেতন, কালের প্রবর্ত্তক, অপহত পাপ্মত্বাদিগুণসম্পন্ন ও সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন। অধিকন্তু তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক, ত্রিগুণের অধীশ্বর, এবং সংসার স্থিতি, মোক্ষ-প্রাপ্তি ও বন্ধনের হেতুভূত। এই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সকলের নিয়ন্তা।

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।"

যেহেতু পরমাত্মা একই সেইজন্য পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না। মূলে তিনিই একমাত্র সত্তারূপে বিদ্যমান, আর এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়াকল্পিত।

ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকারী হইলেও তাঁহার মায়াশক্তিই জগত প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়, আর চৈতন্যরূপে তিনি সৃষ্টি স্থিতির কারণ রূপে উল্লিখিত হন। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ ব্রহ্ম ভাবের মধ্যে জীবও নাই, জগৎও নাই; মায়াকে আশ্রয় করিলে তবে ব্রহ্মের ঈশনভাব হয় অর্থাৎ তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। আবার মায়া হইতে অবিদ্যা উৎপন্ন হইয়া সেই চৈতন্যই জীবভাবে সংসারী হইয়া বন্ধনযুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা পরাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবরূপে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া দুঃখ ও শোকগ্রস্ত হইতেছেন। জীব-ভাবের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এই বাহ্য প্রপঞ্চ একেবারে মিথ্যা নহে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবভাব মিটিয়া গেলে আর এই প্রপঞ্চের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। তাই যোগীরা শিব শক্তির একত্র সম্মিলন করিয়া এই মায়াবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। জড় চেতনের মিলনস্থান এই বিশ্ব ও জীব। জড়ত্বের দিকে দৃষ্টি থাকিলে আপনাকে আপনি বদ্ধ মনে হয়, আবার দৃষ্টি চৈতন্যমুখী হইলেই বন্ধন খসিতে আরম্ভ করে।

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥" শ্বেতাঃ উঃ

সেই পরমেশ্বরই এই ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্তময় বিশ্বকে পোষণ বা ধারণ করিয়া থাকেন। মায়াধীন জীব ভোক্তৃভাব হেতু আবদ্ধ হয়, জীব ঈশ্বরে ভেদ উপাধিকৃত, উপাসনা-দ্বারা যোগ্যতা লাভ হইলে নিরুপাধিক পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান হয়—তখন জ্ঞানলাভের পর জীবভাব তিরোহিত হইলেই মুক্তিলাভ হয় ॥ ১৫

(আত্মা "অকর্ত্তা" "কেবল")

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানাং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬

অন্বয়। তত্র এবং সতি (যখন সকল কর্ম্মের হেতুই ঐ পাঁচটি তখন) যঃ তু (যে ব্যক্তি) কেবলং (নিঃসঙ্গ) আত্মানং (আত্মাকে) কর্ত্তারং পশ্যতি (কর্ত্তা বলিয়া দেখে) অকৃত-বুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃতবুদ্ধি হেতু) সঃ দুর্ম্মতিঃ (সেই দুর্ব্বুদ্ধি) ন পশ্যতি (সম্যক্‌রূপে দর্শন করে না) ॥ ১৬

শ্রীধর। ততঃ কিম্? অত আহ—তত্রেতি। তত্র—সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতবঃ ইতি। এবং সতি, কেবলং—নিরুপাধিকম্ অসঙ্গং আত্মানং তু যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি, শাস্ত্রাচার্য্যঃ উপদেশত্যাগেন অসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ, দুর্ম্মতিঃ অসৌ সম্যক্ ন পশ্যতি ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [তাহাতে কি হয় ? ইহার উত্তর বলিতেছেন] সেই কর্ম্ম সকলের ঐ পাঁচটি হেতু হইলেও,নিরুপাধি অসঙ্গ আত্মাকে যে মূঢ় কর্ত্তা বলিয়া দেখে, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ ত্যাগ করায়—অতএব তাহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হওয়ায়, সেই ব্যক্তি সম্যক্ দর্শনে অসমর্থ ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ সকল কর্ম্মেরই কর্ত্তা আত্মা হইতেছে তাঁহাকেই ক্রিয়া দ্বারায় দেখা যায়, ধরা যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় – যে কেহ আত্মার ক্রিয়া না করে সে দেখিতে পায় না—কাজে কাজেই আত্মা হইতে অন্যদিকে মন আসক্তিপূর্ব্বক যায়।—আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া দেখাই আমাদের দুর্ম্মতি, আত্মা কর্ত্তা নহেন, কর্ম্মাদি সম্পাদন পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হেতু দ্বারাই হয় – এই সকল কথা প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকারেরা বলিয়াছেন, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় একটু নূতন কথা বলিলেন। পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত পাঁচটি হেতুই কর্ম্মের কর্ত্তা স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতেই কি আত্মার প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল ? আত্মা না থাকিলে ঐ পঞ্চের কর্ম্ম করিবার সাধ্য কোথায় ? সুতরাং আত্মা কোন কর্ম্ম করুন বা নাই করুন প্রকৃত কর্ত্তাই কিন্তু আত্মা। কিন্তু আত্মা কর্ত্তা হইয়াও যে অকর্ত্তা—যাহারা ক্রিয়া করে না তাহারা উহা জানিতে পারে না, তাই যাহারা দুর্ম্মতি তাহারা অসঙ্গ আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে, তাহারা বলিয়া থাকে আত্মাই আসক্তিপূর্ব্বক যেন সমস্ত করিতেছেন; আত্মার আসক্তি না থাকায় কোন কর্ম্মেতেই তাঁহার অভিমান হয় না—এইটি বুঝিতে না পারাই দুর্ম্মতি, নচেৎ আত্মাই তো সব, সুতরাং তিনি যে সকল কর্ম্মেরই কর্ত্তা— ইহা মনে করা দোষের হইতে পারে না। আত্মার শক্তিতেই ঐ পঞ্চজন কাজ করে বটে, কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ মুক্ত, তাঁহাকে কর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু যাহারা মন বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বভাব আত্মাতে আরোপ করে, তাহারা আত্মার অকর্ত্তৃত্বভাব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারে না। তিনি কাজ করিয়াও কাজ করেন না, চলিয়াও চলেন না, বলিয়াও বলেন না। কঠোপ-নিষদ্ বলিতেছেন—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ, কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥"

আত্মা স্থির থাকিয়াও গমন করেন, নিশ্চেষ্টবৎ হইয়াও সর্বত্র গমন করেন, হর্ষযুক্ত ও হর্ষহীন— এইরূপ স্বপ্রকাশ আত্মদেবকে আমি ব্যতীত আর কে জানিতে সমর্থ হয়? অর্থাৎ এইরূপ আত্মার জ্ঞাতা আত্মাই অথবা আত্মজ্ঞ পুরুষ। এই আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণ—"যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ"। ক্ষীণদোষ হইলেই অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য মিটিলেই বা মনের বিষয় গ্রহণ প্রবৃত্তি থামিলেই যোগী পুরুষেরা সেই আত্মাকে দেখিতে পান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সব এক হইয়া যায় সেই অবস্থায় আত্মাকে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার সহিত মিলিতে পারা যায়। কিন্তু যাহারা "অকৃতবুদ্ধি"—অর্থাৎ যাহারা ক্রিয়া করিয়া স্থির হইতে না পারে, তাহাদের প্রকৃত বুদ্ধি নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত স্থিরবুদ্ধি হইবার উপায় নাই ; যাহাদের বুদ্ধির স্থিরতা হয় নাই, তাহারা অকৃতবুদ্ধি, সুতরাং তাহারা আত্মাকে দেখিতে পায় না, এবং আত্মা সকল বিষয়ের কর্ত্তা হইয়াও তিনি যে নির্লিপ্ত তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা না পাওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধি স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় না, অতএব তাহাদের আত্মদর্শন হয় না।

আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু বস্তু নাই, অনাত্মা বলিয়াও কোন বস্তু থাকিতে পারে না। আত্মদৃষ্টির অভাব হেতুই জড় পদার্থের উপলব্ধি হয়। চক্ষু নিরাময় না থাকিলে যেমন এক বর্ণকে অন্য বর্ণ বলিয়া বোধ হয় তদ্রূপ মনের বিকৃত অবস্থায় জড় অজড়ের ভেদ বোধ হয়। আত্মা ব্যতীত আর কিছু নাই বলিয়াই আত্মা অসঙ্গ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন কিছুই থাকে না তখনই আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে যদি অন্য কিছু থাকিত, আত্মা অসঙ্গ হইতে পারিতেন না। অবিদ্যা প্রভাবেই এক আত্মাকে জগদাদি নানা রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কোন সত্য বস্তু নাই। নানা বস্তুর দর্শন কালেও সেই এক আত্মাই অসংখ্য ভাবে বুদ্ধির গোচর হন। বুদ্ধি স্থির না হওয়ায় মরীচিকাকে বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়। যাহারা সাধন করে না তাহাদের বুদ্ধি স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় মুখে বলিলেও এ ভ্রম নষ্ট হয় না বা বহু এক হইয়া যায় না। একমাত্র ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বুদ্ধি যখন স্থির হইয়া যায় তখন নানাত্বের কোন অস্তিত্বই বুঝিতে পারা যায় না। ইহার নামই সম্যক্ দর্শন। আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তু দেখাই অসম্যক্‌দর্শন। যতক্ষণ মন চঞ্চল, বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন, ততক্ষণ অবিদ্যার খেলা নিরস্ত হয় না, সংসারদর্শনও লুপ্ত হয় না, ততক্ষণ শত সহস্র ভেদ বর্ত্তমান, তখন জীবও আছেন, ব্রহ্মও আছেন। জীব যতক্ষণ জীব, ততক্ষণ তিনি অনীশ, অর্থাৎ কর্ত্তা নহেন। কর্ত্তৃত্ব তখন মায়া-শবলিত ঈশ্বরের। সেই ঈশ্বরকে কর্ত্তা মনে না করিয়া যে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে সে দুর্ম্মতি। খেলা মিথ্যা বা স্বপ্নমাত্র হইলেও যতক্ষণ তাহা আছে ততক্ষণ তাহা ঈশ্বরে অধ্যাসিত। যেই স্বপ্নদর্শন ভঙ্গ হয়, তখন কর্ম্মও থাকে না, কর্ত্তাও থাকে না, থাকেন এক পরমাত্মা, ইহাকেই আত্মার স্বরূপে অবস্থান বলে বা শুদ্ধভাব বলে। আত্মা যদিও স্বতঃ শুদ্ধ, কিন্তু মায়াকে স্বীকার করিলে তাঁহার যে ভাব হয়— উহাই চিদ্ জড়ের মিশ্রণ, উহাকেই অশুদ্ধভাব বলে। মায়াধীন জীব মাত্রেই এই অশুদ্ধভাব রহিয়াছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অশুদ্ধভাব যেমন তিরোহিত হয়, জীব তখনই অকর্ত্তা ও নিঃসঙ্গ বলিয়া কথিত হন। তখন আর জীবত্ব থাকে না, তাঁহার শিবত্বলাভ হয়। জীবাবস্থায়

(কাহার কর্ম্মলেপ হয় না ?)

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭

নিজ মহিমা অবিজ্ঞাত থাকে বলিয়াই তাহাকে চেতন করিলেও তাহার চৈতন্য হয় না। তখন সে নিজেরও অধীন নহে ঈশ্বরেরও অধীন নহে, তখন সে দুষ্ট-অশ্ববাহিত রথের মত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রেরণায় কেবল ভোগ সুখের জন্য লালায়িত হইয়া ভোগ্যবস্তুর পানেই ছুটিয়া বেড়ায়।

ব্রহ্ম এক, সেখানে দ্বিতীয় বস্তু নাই, তবে এই যে জগৎ দর্শন হয় কাহার? দ্বিতীয় বস্তু আসে কোথা হইতে? ইহা অন্য কোন পৃথক সত্তা নহে, একমাত্র সত্তার মধ্যেই এই বিচিত্র শক্তি রহিয়াছে, তাহাই কখন কখন প্রকট হয় মাত্র। ইহাই ব্রহ্মের নিজের মধ্যে নিজ শক্তির স্ফুরণ। যদিও শিব এক, তথাপি তাঁহার নিজশক্তির যখন স্ফুরণ হয় তখন একের মধ্যেই দ্বিতীয়কে যেন দেখা যায়। ইহাই শিবশক্তি-সম্মিলিত ভাব। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে যেন দুইটি সত্তা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় একটি অন্যটির সহিত অভেদ সম্বন্ধে সম্মিলিত, একেবারে অভিন্ন। পরে শক্তির সাতিশয় স্ফুরণ বা বহির্ম্মুখী ভাব—"একোঽহং বহুস্যাম"—ইহাই ব্রহ্মের সঙ্কল্প বা মায়াশ্রয়। ইহা হইতে প্রাণ শক্তির স্ফুরণ, আবার প্রাণ হইতে মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্প্রসারণ ভাব। "প্রাণো হ্যেষঃ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী"—মুণ্ডক। যঃ—যে পরমাত্মা, সর্ব্বভূতৈঃ বিভাতি—ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থেই প্রকাশ পাইতেছেন, এষ হি প্রাণঃ—তিনিই আমাদের অচঞ্চল স্থির প্রাণ, বিজানন্—ইহাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় জানিতে পারিয়া, বিদ্বান্—জ্ঞানী সাধক, অতিবাদী ন ভবতে—আত্মাতিরিক্ত আর কিছু পদার্থ আছে বলিবারও তাঁহার সামর্থ্য নাই।

যাহা এক ছিল তাহাই আবার বহুরূপ ধারণ করিল। ইহাই ভগবৎ মায়া। এই শক্তি প্রভাবে আত্মবিস্মৃত আত্মা আত্মাকে বহু বলিয়া মনে করে, এবং একের সহিত অপরকে ভিন্ন বলিয়া ভ্রম করে—এইখানে আত্মদর্শনের লোপ হয়, চৈতন্যের ক্ষীণতা ও জড়ের প্রসারতা লাভ হয়। সহস্রার হইতে ব্রহ্মশক্তি অবতরণ করিতে করিতে প্রাণ সত্তায় স্পন্দমান হইয়া পরিশেষে জগদাদিরূপে পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে মূলাধার পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে। এইখানেই জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত যে স্পন্দন তাহাতে মায়া তত আচ্ছন্ন করে না, সেখানে মায়া আছে, কিন্তু মায়াধীন ভাব নহে। তখনও জ্ঞানের পূর্ণতা। তখন পর্য্যন্ত ঐশ্বরিক সৃষ্টি। কণ্ঠ, অনাহত, নাভি পর্য্যন্ত বৈকারিক ভাব, নাভির নীচে মায়িক সৃষ্টি, তখন একেবারে আত্মবিস্মৃত ভাব। প্রাণ তখন স্পন্দিত হইয়া মনকে, এবং মন ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখে পরিচালিত করে, ইহাতেই অনন্ত খেলা ও অনন্ত জীব জগতের সম্প্রসারণ হইয়া অনন্ত জগত লীলা চলিতে আরম্ভ করে॥ ১৬

অন্বয়। যস্য (যাঁহার) অহংকৃতভাবঃ ('আমি কর্ত্তা' এই ভাব) ন (নাই), যস্য বুদ্ধিঃ (যাঁহার বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না), সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ (এই সকল লোককে) হত্বা অপি (হনন করিয়াও) ন হন্তি (হনন করেন না), ন নিবধ্যতে (সুতরাং আবদ্ধ হন না)॥ ১৭

শ্রীধর। কঃ তর্হি সুমতিঃ ? যস্য কর্ম্মলেপো নাস্তি ইত্যুক্তম্ ইতি অপেক্ষায়াম্ আহ—যস্যেতি। অহমিতি কৃতঃ অহঙ্কর্ত্তা ইতি এবম্ভূতো ভাবঃ—অভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি। যদ্বা অহংকৃতঃ—অহঙ্কারস্য ভাবঃ—স্বভাবঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি। শরীরাদীনামেব কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ, অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে—ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে। সঃ—এবম্ভূতো দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মদর্শী ইমান্ লোকান্—সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্ততয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি। ন চ তৎফলৈঃ নিবধ্যতে—বন্ধনং প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধি-দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিঃ তস্য বন্ধশঙ্কা ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—

'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥' ইতি॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [তবে সুমতি কে ? (ইহার উত্তর)—যাঁহার কর্ম্মলেপ নাই—ইহা বলা হইল। এতদর্থে বলিতেছেন]—অহমিতিকৃত অর্থাৎ আমি কর্ত্তা যাহার এইপ্রকার ভাব বা অভিপ্রায় নাই। অথবা শরীরাদিই কর্ম্মের কর্ত্তা এইরূপ আলোচনা হেতু যাঁহার অহংকৃতভাব (অর্থাৎ আমি কর্ত্তাভাব বা কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ) নাই, অতএব যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না (ইষ্টানিষ্ট-বুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মসমূহে যিনি আসক্ত হন না) এইরূপ দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মদর্শনকারী ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণিগণকে হত্যা করিয়াও শুদ্ধভাবে আত্মদৃষ্টিতে কাহাকেও হনন করেন না। না সেই হনন ফলেই আবদ্ধ হন—অর্থাৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। সেই লোক যে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হেতু কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ হইবে, এ আশঙ্কাও নিষ্প্রয়োজন—ইহাই তাৎপর্য্য। সেইজন্য বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভগবদর্পিতচিত্তে কর্ম্ম করিয়া থাকে, পদ্মপত্র যেমন জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, তিনিও সেইরূপ পাপপুণ্যময় কর্ম্মে লিপ্ত হন না [কেন কর্ম্ম-লেপ হয় না ? তাহার কারণ—"কর্ম্মচোদনা" ও "কর্ম্মসংগ্রহ" সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। নির্গুণ আত্মার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মজ্ঞ ব্যক্তি যিনি নিরহঙ্কার, তাঁহার কর্ম্মলেপও সেইরূপ সম্ভব নহে]॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যখন আপনাতে আপনি থেকেও নেই—সেই আশ্চর্য্যদশায় থাকিয়া আর কোন বিষয়েতে আসক্তিপূর্ব্বক স্থির বুদ্ধির দ্বারায় লিপ্ত হয় না—সে সমুদয় লোককে মেরে ফেল্লেও সে হনন করে না—না সে হনন কর্‌বার জন্য আবদ্ধ হইতে পারে—কারণ, সে আপনাতে আপনি ছিল না—সে ব্রহ্মের নেশাতে যেমন মাতাল মদের নেশায়।—আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন—"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ—(মাণ্ডুক্য ৭ম মন্ত্রঃ)। প্রপঞ্চোপশমং—জগদ্বিকাশের নিবৃত্তিরূপ অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি সম্বন্ধশূন্য, শান্তং—বিকারশূন্য, অবস্থান্তর প্রাপ্তি তাঁহার হয় না, শিবং—মঙ্গলময়, অদ্বৈতং—দ্বিতীয়ের অভিনিবেশশূন্য, চতুর্থং—জাগ্রদাদি পাদত্রয় হইতে ভিন্ন, সঃ আত্মা—তিনিই আত্মা, মন্যন্তে—যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বলেন সঃ বিজ্ঞেয়ঃ—তিনিই জ্ঞেয়, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। ইহাই আসল জ্ঞান। এই জ্ঞান তাহার হয়—যিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকেন, সে অবস্থায় ক্রিয়া থাকে না, সেখানে কর্ত্তাও থাকে না। সে এক আশ্চর্য্য অবস্থা, নিজ

অনুভবস্বরূপ। এই অবস্থায় বুদ্ধি স্থির থাকে, অর্থাৎ আত্মাকারা হইয়া যায়, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মে বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। অহঙ্কার বা কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিলেই কর্ম্মফলে বুদ্ধি লিপ্ত হয়। যাঁহার অহংভাব নাই তাঁহার কর্ত্তৃত্বভাবও থাকে না। সুতরাং সে অবস্থায় কর্ম্ম করিলে কর্ম্মজনিত সুখ-দুঃখরূপ ফলে আবদ্ধ হইতে হয় না। যাঁহার অপরোক্ষানুভূতি হয় নাই, তিনি এরূপ অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিতে পারেন না। মুখে অনাসক্তি দেখানো বা সেইভাবে কর্ম্ম করিতে যাওয়া—সেও অহঙ্কারেরই নামান্তর। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—"হে রাম, তুমি বাহিরে রাজা সাজিয়া রাজ্য শাসন কর, কিন্তু ভিতরে অকর্ত্তা বলিয়া আপনাকে বুঝিও"। পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া যাহাদের গতি বা বুদ্ধি শুদ্ধ বা সুন্দর হইয়াছে, তাহাদের "আমি কর্ত্তা" এই প্রকার ভাবনাই আসিতে পারে না, তাহাদের বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না বলিয়া তাহারা কর্ম্মজনিত ফলে হৃষ্ট বা তাপযুক্ত হয় না। তাঁহার বুদ্ধি তো শরীর ইন্দ্রিয়ের আচারের সহিত মিলে না; সেইজন্য মাতাল যেরূপ মদের নেশায় দেহাভিমানশূন্য হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিও অভিমানরহিত হইয়া যায়—ইহাকেই নিরহঙ্কার ভাব বলে। আত্মার কোনরূপ অবস্থান্তর হয় না বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্মা অন্য কাহারও সহিত তদ্ভাবাপন্ন হইতে পারেন না। কাজেই হনন বা অহনন কোনরূপ কর্ম্মেই তিনি লিপ্ত হন না। অবশ্য "আমি কর্ত্তা" ইহাও যেরূপ মনোভাব, "আমি কর্ত্তা নহি" ইহাও সেইরূপ আর একটি মনোভাব, অহংকার-বিবর্জ্জিত আত্মস্থ পুরুষের এ দুই ভাবই থাকে না। আত্মার শুদ্ধস্বরূপে কিছু অধ্যাস নাই, এই জন্য সে অবস্থায় এ দুই ভাবের কোন ভাবই থাকে না। দেহেন্দ্রিয়াদিতে তখন অহংভাব না থাকায় দেহাদি-কৃত হনন কার্য্যের তিনি হন্তা হন না, এবং বুদ্ধিও আত্মস্থ বলিয়া ঐ সকল কার্য্যে বুদ্ধিও লিপ্ত হইতে না পারায় তত্তৎ কার্য্যে আত্মা বদ্ধও হইতে পারে না। এখন আবার সেই একই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, তবে এ-সব কাণ্ড করে কে? এ ভোজ-বাজী দেখায় কে? কেই বা কর্ম্ম করিয়া দণ্ড পুরস্কার লাভ করে? দণ্ড পুরস্কার তাহাকে দেয়ই বা কে? 'সু' বা 'কু' কর্ম্ম করিতে তাহাকে বলেই বা কে? নিষেধই বা কে করে? ঈশ্বর সকলের বুদ্ধিস্থ হইয়া সকলকে সব কর্ম্ম করাইতেছেন, ইহারই বা অর্থ কি? যদি ঈশ্বরই সব করান তবে আমরা ফল ভোগ করিয়া মরি কেন?

এখন কে ভোগ করে এবং কেই বা ভোগ করায়—ইহা বুঝিতে গেলেই "আমি কে" এবং আমার 'স্বরূপ কি' বুঝিতে হইবে। একটা কথা অতি সত্য; শুভাশুভ যে কোন কর্ম্মই আমরা করি না কেন, তাহা আমরা করিতেই পারিতাম না—যদি আমাদের মধ্যে কোন চেতন বস্তু বা আত্মা না থাকিতেন। চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ভিন্ন কোন অচেতনেরই প্রবৃত্তি বা কার্য্য হইতে পারে না। সকল প্রবৃত্তির মধ্যেই একটি চেতনের প্রেরণা রহিয়াছে, সেই চেতন-প্রেরকই আত্মা বা ব্রহ্ম। অতএব আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে কেন? "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে"—তুমি প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, কালবশে যাহা কিছু রূপান্তরিত হইতেছে, কালের সে শক্তি ভগবান হইতেই। আবার গীতাতে ইহাও আছে—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

হে অর্জ্জুন, সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর স্বকীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় জীবগণকে পরিভ্রমণ করাইয়া তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর হৃদ্দেশে অবস্থান পূর্ব্বক শরীরযন্ত্রে আরূঢ় জীবগণকে নানা কর্ম্ম করাইতেছেন—সেই কর্ম্ম না করিয়া জীবের অন্য কোন উপায় তো নাই! যদি এই চরকীর পাক হইতে বাঁচিতে চাও তবে তোমাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। তিনি যদি প্রসন্ন হন, তবেই তুমি মুক্তিলাভ করিয়া শান্তি পাইবে। আবার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে জীব স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাক্তন-জন্মের সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিয়াও কিছু হইবে না। কুকর্ম্মের কুফল জানিয়াও তাই পূর্ব্বসংস্কার-বশে জীব কুকর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং জীবের মত এত বড় নিরাশ্রয় আর কে আছে? কিন্তু জীবের হৃদয়ে কর্ম্মেচ্ছার মূল সেই ব্রহ্মের সঙ্কল্প—'একোঽহং বহু স্যাম্"—এক আমি বহু হইব। সেই তিনিই বহু জীব হইয়া তাঁহার সঙ্কল্পের ফল ভোগ করিতেছেন, তিনিই জীব হইয়া ভুগিতেছেন। ঈশ্বর স্বভাব জীবের কর্ম্মলেপ হইতে পারে না, তাই তিনি ত্রিগুণের জাল নির্ম্মাণ করিয়া নিজেই নিজে আবদ্ধ হইয়াছেন। কি অদ্ভুত কাণ্ড তাঁহার! আবার এই কর্ম্ম করিতে যতদিন ভাল লাগে, জীবরূপে আনন্দেই তিনি সেই কর্ম্ম করিয়া যান। কিন্তু ধীরে ধীরে কর্ম্মের বিবিধ ফল উৎপন্ন হইয়া যখন জীবকে বিড়ম্বিত ও প্রপীড়িত করে, তখন আবার জীবের জাগরণ হয়, ধীরে ধীরে তাহার মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। জীব শকটবাহী বলীবর্দ্দের মত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া তখন নিজের স্কন্ধের বন্ধন খসাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলেও তখনি তখন সে স্কন্ধের ভার নামাইতে পারে না। কারণ তখন জীব অনীশ্বর ভাবাপন্ন। যদিও মূঢ়তা-বশতঃ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজের ভার নিজেই নামাইতে পারিবে বলিয়া মনে করে, কিছু দিনের চেষ্টায় সে বুঝিতে পারে যে, উহা তাহার সামর্থ্যের বাহিরে, এতদিন যে বৃথা আস্ফালন দেখাইতেছিল, উহাই তাহার দুর্ম্মতি। কিন্তু বার বার বিফল প্রয়াস তাহাকে তাহার নিজ-সামর্থ্যের উপর সন্দেহ উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে, এখন সে যেন কাহারও শরণ লইতে চায়। বুঝিতে পারিয়াছে—এতদিন চক্ষে ঠুলি পরিয়া সে তাহার নিজ কর্ত্তৃত্ব, অভিমানকেই বড় বলিয়া ভাবিয়াছিল, আজ তাহার সে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। সে এখন বুঝিয়াছে—তাহাকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় যিনি ঘুরাইতেছেন, তিনিই তাহার মালিক, তিনিই ঈশ্বর, সে স্বয়ং শক্তি-সামর্থ্যহীন একটি অহঙ্কৃত বদ্ধ জীব, তাহার রোদনই সার কিন্তু কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে জীব তখন কাঁদিয়া উঠে এবং বলে "প্রভো! এই শরণাগত দীন আর্ত্তকে রক্ষা কর"। তখন শ্রীভগবানই শ্রীগুরুরূপে আসিয়া ভবসিন্ধুতে নিমজ্জনোন্মুখ তাহার দেহ-তরণীর কাণ্ডারী হন। জীব প্রথমে নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ—তাহার যাহা কিছু সমস্তই তাহার দেহ-প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির সহিত সে তাদাত্ম্যভাবে মিলিত, এখন কিছুতেই আর প্রকৃতি হইতে সে আপনাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না। প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ জীব সমস্ত কর্ম্মে আপনার কর্ত্তৃত্ব দেখে, সেই জন্য তাহার বুদ্ধি সকল কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার সুখ-দুঃখরূপ ফলভোগ করিতে সে বাধ্য হয়। দেহাত্মভাবে মগ্ন জীব আর কাহাকেও দেখিতে পায় না, সুতরাং সকল কর্ম্মের কর্ত্তা সাজিয়া পুনঃ পুনঃ এই জগতে যাতায়াত করিতে থাকে, এবং

জন্মমৃত্যুর পাশে বদ্ধ হইয়া কেবল রোদন করিতে থাকে। শ্রীগুরু আসিয়া যখন তাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন, তখন জীব বুঝিতে পারে—এই দেহেন্দ্রিয়রূপ প্রকৃতি হইতে সে কত ভিন্ন,—প্রকৃতি অশ্ব, সে যে অশ্বারোহী! প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানিয়া এতদিন জীব কি ভুলই করিয়াছিল, কোথায় অশ্বস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া সে আনন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, তা না হইয়া সে নিজেই অশ্বকে স্কন্ধে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে! জীব যখন বিচার করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে, তখই তাহার স্বরূপ-সন্ধান আরম্ভ হয়। তাহার প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তমোমিলিত, জীব ঈশ্বরাংশ হইয়াও এই গুণের সহিত জড়িত হইয়া গুণ হইতে আপনাকে কখন অতিরিক্ত বা পৃথক মনে করিতে পারে না। ভগবানের চৈতন্যময়ী প্রাণময়ী শুদ্ধশক্তি হৃদয়ে আসিয়া ঐশভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বর্তমান থাকেন আবার ঐ শক্তি যখন নাভির নীচে মূলাধারাদিতে অবতরণ করিতে থাকেন, তখন জীব-ভাবে বদ্ধ হইয়া আপনি আপনার স্বরূপকে ভুলিয়া যান। ইহাকেই মায়াদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া বলে। তখন সূক্ষ্ম জগতের বা সূক্ষ্ম শক্তির কথাও মনে পড়ে না, কেবল স্থূলভাবে লক্ষ্য থাকে, এবং সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে নিজেকেই তখন স্থূল বলিয়া মনে করে, একেবারে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া অনীশ্বর ভাবে দিন যাপন করে। যে স্পন্দন প্রথমে আজ্ঞাচক্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাই পুনঃ স্পন্দিত হইয়া হৃদয়দেশে অবতরণ করে, তখনও তাহার সম্যক্ জ্ঞান বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু যখন অন্তঃকরণ ব্যূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ তস্করের মত সেই বেগ নাভির নীচে অবতরণ করিতে লাগিল, তখন তাহার মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ হইয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন তাহার যে ঐশী শক্তি ছিল, তাহা সুপ্তবৎ হইয়া প্রচ্ছন্ন হইযা গেল। তখন জীব মায়ার ঘোরে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া জড়বৎ হইয়া গেল। তখন জীব যখন এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল-বিরচিত মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া জীবভাবের খেলা আরম্ভ করিয়া দিল, তখন যে সে কে, কোথায় সে, এবং কাহার খোঁজে ফিরিতেছে, কি খেলা খেলিয়া দিন কাটাইতেছে—এ সমস্ত তাহার চিত্তপট হইতে কে যেন মুছিয়া ফেলিয়া দেয়। মায়াভিভূত বদ্ধজীব প্রথম প্রথম রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। যে দিন হইতে আবার গুরুকৃপায় তাহার স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেদিন নূতন পথ পাইয়া যেন সে নূতন দেশের লোক হইয়া যায়—সেদিন হইতে তাহার চিরাভ্যস্ত মার্গ ছাড়িয়া দিয়া সে নূতন পথের যাত্রী হয়—একেবারে উল্টাপথ ধরে। এই উল্টা পথই নিবৃত্তি মার্গ, তাহার স্বস্থানে ফিরিবার পথ। এ পথে যে চলে তাহার সত্ত্বশুদ্ধি হওয়া অনিবার্য্য, সত্ত্বশুদ্ধি যত অধিক হইতে থাকে, ততই সে নিজ নিত্য-নিকেতনের সন্নিকটে উপনীত হইতে থাকে। এখনও পথ বহু বিঘ্ন-পূর্ণ; সেই বিঘ্নবহুল মার্গে চলিতে চলিতে তাহাকে অপ্রত্যাশিত অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। স্থূল জগতে স্থূল বিষয় সমূহকে এতদিন নিজের মনে করিয়া কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এখন আবার সূক্ষ্মজগতের সূক্ষ্ম বিষয়ানুভবগুলিকে তৃপ্তিকর বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই সকল শক্তিকে আপনার মনে করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে লাগিল। তখন কত শক্তি সত্ত্বকিরণোদ্ভাসিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই সকল শক্তি যেন তাহারই অধীন ভাবিয়া জীব অধীর হইয়া উঠিল। আবার

জীবকে আঘাতের পর আঘাত খাইতে হইল ; এইরূপে তাঁহার মধ্যে আবার সত্যের প্রকাশ হইতে লাগিল। সত্যের আলোকে সে আপনার স্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া আবার সাধনাতে প্রাণপণ যত্ন করিয়া নিজ-অন্তঃপুরের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। এইবার তাহার বহুদিনের আশা সফল হইবার সম্ভাবনা হইল, ভগবৎকৃপায় স্থূলের নেশা তাহার ছুটিয়া গেল, তখনই অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। সাধকের অন্তঃকরণ তখন যত শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই পরা বৈরাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। তখন আর ভুল হয় না, কিন্তু এখনও বিভীষিকা দেখা শেষ হয় না, তাই আর কোথাও যায় না, কিছুই চাহে না, নিজের মধ্যে নিজে শুদ্ধ হইয়া থাকে,—ইহাই সর্ব্বধর্ম্ম-সন্ন্যাস। ইহাই সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়স্থ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ! এইবার সব কর্ম্মাকর্ম্ম এবং তাহাদের সমস্ত ফলাফল নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, প্রপঞ্চের উপশম। এইখানেই ঈশ্বরের সহিত জীবের তাদাত্ম্য-ভাবে মিলন বা স্বরূপ-কেন্দ্রের সহিত নিজ-কেন্দ্রের (অহঙ্কারের) সম্মিলন হয়। যখন ঐশ শক্তির সহিত জীবশক্তি মিলিয়া এক অভিন্ন হইয়া যায়, সেই শুভ মুহূর্ত্তে সাধক সহস্রারে পরব্যোমে উত্থিত হইয়া আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে। সেই শিবশক্তির সম্মিলনক্ষেত্রে জীব নিজের স্বরূপাবস্থা লাভ করে, সে যাহা ছিল আবার তাহাই হইয়া যায়। তখন সেই সহস্রারে নীল-পীত-পঙ্কজের উপরে সর্ব্বশুদ্ধাতীত নিরাকার পরমাত্মার সহিত এক হইয়া সোঽহং ব্রহ্ম বা সর্ব্ববেদ-অগোচর বিদেহ ভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-নিরঞ্জনরূপে জন্মমৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করেন।

এই সময় মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বরও মায়াতীত হইয়া অন্তর্হিত হ'ন। অহঙ্কার যে প্রকৃতির পরিণাম, অহঙ্কার সেই প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যান। ইহাই "অবরুদ্ধ ভাব"। এখানে আত্মাই আত্মা, আত্মকিরণোদ্দীপ্ত শুদ্ধ সত্ত্বভাবও গুণাতীত-ভাবে পর্য্যবসিত হয়। তখন উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধও বিলুপ্ত হয়।

"নির্মোহমোহপদবীতি ন মে বিকল্পো, নিঃশোকশোকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ।
মনো ন বুদ্ধির্ন শরীরমিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রভূতানি ন ভূতপঞ্চকম্।
অহঙ্কৃতিশ্চাপি বিয়ৎস্বরূপকং তমীশমাত্মানমুপৈতি শাশ্বতম্॥
ন ত্বং ন মে ন মহতো ন গুরুর্ন শিষ্যঃ।
সচ্ছন্দরূপ-সহজং পরমার্থতত্ত্বং, জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥"

অবধূতগীতা

মন, বুদ্ধি, শরীর, ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চমহাভূত—আত্মা এ সকলের কিছুই নয়। সেখানে না তুমি না আমি, সেখানে মহৎ বলিয়াও কিছু নাই, সেখানে গুরুও নাই শিষ্যও নাই। সেই পরমার্থতত্ত্ব সহজ ও সচ্ছন্দ অর্থাৎ কোন আয়াসপূর্ব্বক জানিতে হয় না। জ্ঞানামৃত সমরসপূর্ণ আত্মা, একমাত্র তাহার তুলনা গগন, আমি সেই গগন সদৃশ।

জীব যখন নিজ নিকেতনের দিকে যাত্রা করে, তখন হইতেই তাহার ভাব শুদ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইতে থাকে,—এইরূপ বিশুদ্ধতার উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সে বিশুদ্ধসত্ত্বের মধ্য হইতেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বরের

সাড়া পাওয়া যায়। তখন সাধক বুঝিতে পারেন যাহা কিছু জগতে হইতেছে—সে সব তাঁহার ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের আশ্রয় পাইয়াই জীবের জড়ত্বের বন্ধন খসিয়া যায়। কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষাদি পশুভাব সমস্তই তখন বিগলিত হইয়া যায়। সাধনার দ্বারা ইহা যেরূপে সম্ভব হয়, তাহাই ক্রমে লিখিত হইতেছে। ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হয়, সেই অবস্থায় থাকাই সন্ধ্যা। সম্+ধা—সম্যকরূপ ধারণা তখনই হয়। প্রানের নিরোধ হইতেই এই ধারণা হয় "সুখং যদ্ বায়ু-ধারণম্"—ইহাই স্থিতি বা অবরুদ্ধরূপ বা ক্রিয়ার পর-অবস্থা। অভ্যাস করিতে করিতে এই অবরুদ্ধভাবে সহজে থাকা যায়। ইহাই প্রকৃত ধ্যান-সন্ধ্যা, যাহাতে কায়ক্লেশ কিছু নাই। এইরূপ ব্রহ্মভাব-ভাবিত চিত্তই সকল ভূতের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। সাধন করিতে করিতে সাধকের যখন সুষুম্নার মধ্যে প্রাণের গতি হইতে থাকে, তখন সেই সাধককে "একদণ্ডি" বলা হয়। তখন ইড়া পিঙ্গলা ছাড়িয়া প্রাণ সুষুম্নায় থাকে, এবং সুষুম্নায় থাকিতে থাকিতে সাধকের সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ হইলেই তাঁহার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অনুভবের বিষয় হয়। এই অব্যক্ত ব্রহ্মসিন্ধু হইতেই সমুদ্রে হিল্লোলের মত আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। "অব্যক্তাৎ জায়তে প্রাণঃ"। যেরূপ পুরুষের ছায়া সেইরূপ প্রাণের ছায়া মন, এবং মন হইতে ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রকাশিত হয়। এইরূপে আত্মা স্থূল হইতে স্থূলতম পিণ্ডে পরিণত হ'ন। আবার যখন স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইতে হয়, তখন উল্টা পথ ধরিতে হয়, এইরূপে উল্টা পথে চলিতে চলিতে "আমি"র সঙ্কীর্ণবোধ চলিয়া গিয়া "আমি"র ব্যাপক ভাবের বোধ হয়। তখন স্থূল জাগ্রদাদি ভাবও থাকে না। স্থূলবোধ রহিত হইবার পরে সূক্ষ্ম স্বপ্নবোধও রহিত হইয়া যায়। তাহার পর সুষুপ্তাবস্থায় জ্ঞানের সব পার্থক্য মিটিয়া যায়, সমস্ত পৃথক জ্ঞান একীভূত হইয়া যায়, তখন আর প্রকাশের নানাত্ব ভাবও থাকে না। "যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয় পাদঃ" অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে যে সুষুপ্তি হইয়াছে, সেখানে আর স্বপ্নদর্শন নাই. মন সেখানে একাগ্র হইয়া নিরোধমুখী হইয়াছে; সুতরাং সঙ্কল্পের তরঙ্গ নাই বলিয়া সেখানে মনও নাই। সেই সুষুপ্তিস্থানে থাকিতে থাকিতে নিজে নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, সব দৃশ্যপ্রপঞ্চ তিরোহিত হইয়া এক ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদ বলিয়াছেন—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্"—ইনিই সর্ব্বেশ্বর বা সর্ব্ব জগতের ঈশ্বর বা শাসনকর্ত্তা, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, ইনিই অন্তর্য্যামী, ইনিই সকলের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান, ইনিই চরাচর জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।

ক্রিয়ার দ্বারা যখন এই প্রজ্ঞান ঘন অবস্থা লাভ হয়, তখন সেই অবস্থায় সাধক সবই জানিতে পারেন। ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার ফলস্বরূপ প্রথমে স্থৈর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, অধিকক্ষণ স্থায়ী ঘণ্টাদি ধ্বনির স্ফুট হয়, এবং সেই ঘণ্টাধ্বনি অধিককাল স্থায়ী হইলেই স্থৈর্য্যভাব বৃদ্ধি পায়, এবং সেই পরমানন্দ ভোগ করিতে করিতে সাধক আনন্দময় হইয়া যান। এইখানেই সাধক ব্রহ্মের তৃতীয় পাদের সহিত পরিচিত হইয়া "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" কি বুঝিতে পারেন। এই

(কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ক্রিয়ার আশ্রয়)

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

অবস্থাপ্রাপ্ত সাধককেই প্রাজ্ঞ বলা হয়। পরে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিলেই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" ভাবের বোধ হয়। সেখানে মন, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমস্ত ব্রহ্মলীন হয়। প্রাণায়ামাদি সাধনদ্বারাই এই নিরোধশক্তি বর্দ্ধিত হয়। প্রাণনিরোধ হইলেই মন আপনাপনি নিরুদ্ধ হয়। মন প্রাণেরই ছায়া। বাম নাড়ী ইড়া ও দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলাই সোম ও সূর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। প্রাণ-চেষ্টা যখন এই দুই মার্গকে ত্যাগ করে তখনই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুষুম্নাতে তখন স্থিতি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। চিত্তও তখন আর ইতঃস্ততঃ ধাবিত হয় না। প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিয়া স্থির হইলেই রাগ-দ্বেষাদি পশুধর্ম্ম থাকে না—এইজন্য সর্ব্ব ধর্ম্মত্যাগের উপদেশ এই অধ্যায়ে ভগবান দিবেন, কারণ সাধককে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার অতীত হইয়া যাইতে হইবে। এই অবস্থাকেই "অমাবস্যা" বলে. এই অমাবস্যাতেই মহাকালী জগন্মাতার পূজা প্রশস্ত। যখন চন্দ্র সূর্য্যের সহিত এক রাশিতে একত্রে বাস করেন, তখনই অমাবস্যা হয়। "অমা সহ বসতঃ চন্দ্রার্কৌ অত্র"। সূর্য্যই প্রাণ, এবং চন্দ্রই মন। এই দুই নাড়ীতে প্রাণ যখন প্রবাহিত হয়, তখনই জীবভাব বা বদ্ধ ভাব। চন্দ্র মন এবং সূর্য্য প্রাণ—ইহারা পৃথক থাকিতে আর দেহাত্মবোধ নষ্ট হয় না। যখন চন্দ্র-নাড়ীস্থ (ইড়া) শক্তি সূর্য্যনাড়ীস্থ (পিঙ্গলা) শক্তির সহিত মিলিয়া যায়, অর্থাৎ যখন মন ও প্রাণ এক হইয়া যায়, তখন সৃষ্টি-ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়,—ইহার নামই প্রলয়। এই শিব-শক্তিসম্মিলিত অবস্থাই অমাবস্যায় কালীপূজা বা সাধকের চিদাকাশে স্থিতি। এই স্থিতি হইলেই তিনি স্বয়ং আনন্দরূপ হইয়া পরমানন্দ সমরস-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হন। ইহাই পরম গুরুর নিজ-শক্তির সহিত সংযুক্ত হওয়া। ইহাই পঞ্চ-মকারের মৈথুনতত্ত্ব। এই মিথুনভাব হইতেই পরম শিব সাম্যরসোদ্ভূত অমৃতদ্বারা জীবশক্তি পরিপ্লুতা হইয়া শক্তি শিবের সহিত এক হইয়া যান। তখন আর সৃষ্টিক্রিয়া থাকে না। ইহাই রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন। এই মিলন-রসকে অনুভব করিবার জন্যই বৈষ্ণবেরা শ্রীরাধিকার অনুগা হইয়া সাধন করেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তর্মুখী হইয়া যখন অলক্ষ্যের দেশে গমন করে, তখনই গোপাঙ্গনারূপ ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণাভিসারে প্রবৃত্ত হন। এই অভিসার সম্পূর্ণ হইলেই বাস্তব জীবনের পরিসমাপ্তি হয়,—ইহাই অসীমের সহিত সসীমের মিলন ॥ ১৭

অন্বয়। জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা (জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা) ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তির এই তিন প্রকার হেতু) ; করণং. কর্ম্ম, কর্ত্তা (করণ. কর্ম্ম এবং কর্ত্তা) ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম-সংগ্রহঃ (এই তিনটি কর্ম্ম-সংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়) ॥ ১৮

শ্রীধর। "হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে" ইতি এতদেব উপপাদয়িতুং কর্ম্মচোদনায়াঃ কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কর্ম্মফলাদীনাং চ ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ নিগুর্ণস্য আত্মনঃ তৎসম্বন্ধো নাস্তি ইত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মচোদনাং কর্ম্মাশ্রয়ঞ্চাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানম্—ইষ্টসাধনমেতৎ ইতি বোধঃ। জ্ঞেয়ম্—ইষ্টসাধনং কর্ম্ম। পরিজ্ঞাতা—এবংভূতজ্ঞানাশ্রয়ঃ। এবং ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা। চোদ্যতে

প্রবর্ত্ত্যতে অনয়া ইতি চোদনা—জ্ঞানাদি ত্রিতয়ং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা চোদনেতি বিধিঃ উচ্যতে। তদুক্তং ভট্টৈঃ—"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ" ইতি।

ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়ম্ অবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্ততে ইতি। তদুক্তং—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" ইতি। তথাচ করণং—সাধকতমম্। কর্ম্ম চ—কর্ত্তুরীপ্সিততমম্। কর্ত্তা—ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্তকঃ। কর্ম্ম সংগৃহ্যতে অস্মিন্ ইতি—কর্ম্ম-সংগ্রহঃ। করণাদি ত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি কারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক-মেবঃকেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [কর্ম্মতে কর্ত্তৃত্বাভিমান যাহার নাই এবং যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না—তাহার বন্ধন হয় না, তিনি কাহাকেও বিনাশ করিয়াও বিনাশ করেন না আর বন্ধন প্রাপ্ত হন না।—এই পূর্ব্বোক্ত বিষয়টির প্রমাণ বলিতেছেন যে—কর্ম্মচোদনা, কর্ম্মাশ্রয় ও কর্ম্মফলাদির ত্রিগুণাত্মকতা হেতু নির্গুণ আত্মার সহিত এগুলির কোন সম্বন্ধ নাই—এই অভিপ্রায়ে কর্ম্মচোদনা ও কর্ম্মাশ্রয় কি তাহা বুঝাইতেছেন]—(১) জ্ঞান—ইহা ইষ্ট-সাধন—এইরূপ যে বোধ। (২) জ্ঞেয়—ইষ্ট-সাধন যে কর্ম্ম—তাহাই জ্ঞেয়। (৩) পরিজ্ঞাতা—এবম্ভূত জ্ঞানের যিনি আশ্রয়—তিনিই পরিজ্ঞাতা। এই ত্রিবিধই কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। চোদনা শব্দের অর্থ—যাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই ত্রিতয় কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। অথবা চোদনা শব্দে বিধি বুঝায়; ভট্ট তাহাই বলিয়াছেন যে "চোদনা, উপদেশ ও বিধি—এই তিনটি একার্থবাচী"।

তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইল—উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানাদি ত্রয়কে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—"ত্রিগুণান্বিত সকাম পুরুষদিগের জন্য বেদ কর্ম্মফল প্রতিপাদন করিয়াছেন" ইত্যাদি। "করণ"—ক্রিয়া-সাধক, "কর্ম্ম"—কর্ত্তার ঈপ্সিততম (অর্থাৎ অতিশয় অভিলষিত), এবং "কর্ত্তা"—ক্রিয়া-নিবর্ত্তক বা সম্পাদক। "কর্ম্মসংগ্রহ"—ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে ইহাতে গৃহীত হয়, অতএব করণাদি ত্রিবিধ কারকই ক্রিয়াশ্রয়। সম্প্রদানাদি কারকত্রয় সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্তক নহে, পরম্পরারূপে কেবল ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক মাত্র। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ক্রিয়াশ্রয় নহে, এজন্য করণাদিত্রয়কেই ক্রিয়াশ্রয় বলা হইল॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—(১) জানা—(২) জানিবার বস্তু ব্রহ্ম—(৩) আর যিনি জানিবেন এই আত্মা—এই তিন কর্ম্ম কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে কূটস্থ ব্রহ্মের জ্ঞান—আপনারই হওয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই হ'ল কর্ম্ম। করণ মানে ক্রিয়া করা, কর্ম্ম ক্রিয়া ক'রে কূটস্থ ব্রহ্মেতে যাওয়া, ঐ আত্মার যিনি কর্ত্তা বলিয়া মানেন।—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় "আমি" নাই, "তুমি" নাই, "ক্রিয়া" নাই সুতরাং কর্ত্তাও নাই। কিন্তু তথাপি ব্যবহারিক অবস্থায় কর্ম্ম আছে, সুতরাং তাহার কর্ত্তাও আছে। সে কর্ত্তা আত্মা কিনা? আত্মা না থাকিলে কিছু হয় না বটে, এবং সে হিসাবে আত্মা কর্ত্তা হইলেও কর্ম্মের লেপ তাঁহাতে হয় না—এজন্য কর্ম্মের সহিত আত্মার সংশ্রব নাই বলিয়াই মানিতে হইবে। তবে কর্ম্ম-সমূহের প্রবর্ত্তক কাহাকে মানা

যাইবে? সুতরাং জ্ঞান, (যাহার দ্বারা বিষয় সমূহ প্রকাশিত হয়) জ্ঞেয় (যাহা কিছু জ্ঞাতব্য), পরিজ্ঞাতা (বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা বিশেষিত অবিদ্যাকল্পিত ভোক্তা)—এই তিনটিই সামান্যভাবে সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সুতরাং কর্ম্মচোদনা ত্রিবিধ। জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই তিনের সংযোগ হইতে কর্ম্মের আরম্ভ হইয়া থাকে, ইহারাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ—ইহারাই ক্রিয়ার আশ্রয়।

মনে কর—আমি যোগতত্ত্বটি জানিতে চাই ও যোগাভ্যাস করিতে চাই। তাহা হইলে প্রথমে "যোগ" বিষয়টি কি তাহা আমাকে জানিতে হইবে। যোগ কত প্রকার ও কোন পদ্ধতিটি আমার অবলম্বনীয়—এ সমস্ত জানিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে সাধুরা কি বলেন, শাস্ত্র কি বলেন, তাহারও ধারণা থাকা আবশ্যক, নচেৎ যোগের নামে অন্য কিছু অভ্যাসও করিতে পারি। যোগসম্বন্ধীয় আবশ্যকতা বুঝাই হইল জ্ঞান। যোগপন্থা বা যোগক্রিয়াটি জ্ঞেয় বস্তু, উহার সাধনা কি প্রকার—তাহা আমার এক্ষণে জানা নাই, উহাই গুরুর নিকট হইতে আমাকে জানিয়া লইতে হইবে। সুতরাং সাধনমার্গ ও ক্রিয়ার ফলাদি হইল "জ্ঞেয় বস্তু"—যাহা না জানিলে ক্রিয়ায় উৎসাহ আসিবে না। জ্ঞেয় বস্তুটি সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনিই তাহার পরিজ্ঞাতা। ক্রিয়ার পরিজ্ঞাতা ব্যতীত কে আমাকে ক্রিয়ার উপদেশ দিবে? আবার আমি যখন উপদেশ পাইলাম, তখন আমিও ক্রিয়ার জ্ঞাতা হইলাম। এই জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতাই কর্ম্মের চোদনা—ইহা হইতেই ক্রিয়া করিবার জন্য প্রেরণা আসে। তাহার পর কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, —ইহারা কর্ম্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়। এই তিনটি বস্তুতেই সকল কর্ম্ম একত্রিত হয়, এইজন্য এই তিনটিকে কর্ম্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয় বলে। ক্রিয়া হইবে কাহাদের দ্বারা তৎসম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমাদের বুদ্ধি এত তমসাচ্ছন্ন যে, গুরু তো ক্রিয়া দিলেন কৃপা করিয়া, এখন ক্রিয়া করাইয়া দিতে হইবেও তাঁহাকে। এত অলস, এত অনিত্য বস্তুতে মুগ্ধ যে আমাদিগকে শিশুর মত কাণে ধরিয়া পাঠে বসাইয়া দিতে হইবে, পাঠ কণ্ঠস্থ করাইয়া দিতে হইবে। ইহার কারণ আর কিছু নহে, ক্রিয়া করার আবশ্যকতা পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। নিজ-শরীরের বা পুত্রের ব্যাধি হইলে ঔষধ খাইব, ডাক্তার ডাকিব—কিন্তু এ ভব-ব্যাধির প্রতীকার ঔষধ নির্ব্বাচন, ঔষধ খাওয়া—এ সমস্তই গুরু করিবেন! তবু যদি গুরুতে সেরূপ শ্রদ্ধাবুদ্ধি থাকিত! এ সমস্তকেই অজ্ঞান মোহ বলে, ইহা পরিপূর্ণ তামসিকতারই ফল। প্রথমে জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা দ্বারা ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিলাম, ক্রিয়ার ফল কিরূপ হয় তাহা বুঝিলাম, এবং যাহাকে ক্রিয়া করিতে হইবে, সেই পরিজ্ঞাতা যে আমি—এই তিনে মিলিয়া সাধন কর্ম্মে আমাকে নিয়োগ করিবে। সাধনার প্রয়োজনীয়তা যখন ঠিক হইয়া গেল, তখন সাধন কাহার কাহার উপর নির্ভর করিয়া সম্পন্ন হইবে—তৎসম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। (১) যাহাদের দ্বারা ক্রিয়া সাধিত হয়, সেইগুলি করণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলি ও প্রাণ এখানে করণ, উহাদের সাহায্যেই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে। (২) কর্ত্তার অভিলষিত প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়াগুলি কর্ম্ম। (৩) আর যিনি ক্রিয়া করিবেন—অন্তঃকরণ বা অহং অভিমানী জীব—তিনিই কর্ত্তা। এই তিনটির উপর ক্রিয়া করা নির্ভর করে এজন্য এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান ও ক্রিয়া কিরূপে করিতে হয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান

না থাকিলেও যেমন ক্রিয়া হয় না, তেমনই ক্রিয়ার আশ্রয় না থাকিলে বা আশ্রয়গুলি দোষ-দুষ্ট হইলেও ক্রিয়া সাধন হইবার উপায় নাই। ক্রিয়ার জ্ঞাতা ও ক্রিয়া করিবার কর্ত্তা—দুই এক জন, ইহাই আমাদের 'অহং' এর সহিত তাদাত্ম্যযুক্ত অন্তঃকরণ বা মনোবুদ্ধি বা অহং-অভিমানী জীব।

সংক্ষেপে আবার বলিতেছি—(১) প্রথম যাহাকে জানিব তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা, তাহাকে জানিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি, (২) যাহা জানিবার বস্তু—তিনিই স্থির প্রাণ বা ব্রহ্ম (৩) আর যিনি জানিবেন—তিনিই চঞ্চল আত্মা, বিষয়বিমূঢ় আত্মা, বা জীব। ইনিই প্রকৃত "অহং" বা "আমি"র সহিত তাদাত্ম্যযুক্ত। তাহার পর ক্রিয়ার আশ্রয়—(১) যিনি ক্রিয়া করিবেন, (২) যে সকল ইন্দ্রিয় মনঃপ্রাণাদি যন্ত্রদ্বারা ক্রিয়া করিতে হইবে, (৩) ক্রিয়া—যদ্বারা কূটস্থ ব্রহ্মেতে যাওয়া যায়। আসল কর্ত্তাই এই কূটস্থ ব্রহ্ম। এই কূটস্থ ব্যতীত কিছুই হয় না, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার যোগ না থাকিলেও, আসল কর্ত্তাই তিনি।

আত্মাকেই জ্ঞেয় বলা হয়। "আত্মাই জানিবার বস্তু, তিনি নিত্যসর্ব্বব্যাপক চৈতন্যস্বরূপ। চঞ্চলত্বপ্রযুক্ত আপনাতে আপনি না থাকায় অচৈতন্য (জীবভাব), সেইজন্য আপনি যে কে—তাহা জানি না সুতরাং নিজ-বোধ হয় না। এই আত্মাই অন্যদিকে মন দেওয়াতে অচৈতন্য এবং ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকাই চৈতন্য। জীব আপনার স্বরূপ তখনই বুঝিতে পারে, যখন ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকে,—উহাকেই পরমাত্মা বলে। ক্রিয়া করিতে করিতে যোনিমুদ্রায় মণির অণুর ন্যায় সেই ব্রহ্মের অণু কূটস্থের মধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই অণুর পরিমাণ দৃষ্ট হওয়ায় তাহা ব্রহ্ম কিরূপে হইবে সন্দেহ আসে, কারণ পরিমাণ থাকিলেই আকার হইল কিন্তু ব্রহ্ম নিরাকার। কিন্তু যতক্ষণ সব আছে, ততক্ষণ সবের মধ্যে তাঁহার প্রবেশও আছে এই অণু-স্বরূপে ব্রহ্ম সর্ব্ব-ব্যাপক, সর্ব্বত্রে ও সবের মধ্যে সেই অণু। যোগশিখোপনিষদে আছে,—

"দ্বিতীয়ং সুষুম্নাদ্বারং পরিশুদ্ধং বিসর্পিতম্।
কপালংসং পুটং ভিত্ত্বা ন তু পশ্যন্তি তৎপরম্॥"

মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নার অতি সূক্ষ্ম দ্বারের বিস্তাররূপ গমন হইলে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ মন তৃপ্ত হয়। তখন কপালে দণ্ডবৎ ভার বোধ হইবে, তাহার পর বায়ুর দ্বারা ভেদ হইলে আর কিছুই দেখা যায় না, কারণ তখন ইন্দ্রিয় সকল ও মন আত্মার সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হওয়ায় 'সর্ব্বংব্রহ্মময়ং জগৎ' হয় অর্থাৎ জানিবার যে বস্তু তাহাই হইয়া যায়। তখন আর নিজে থাকিল না, সুতরাং সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই।

যোগশিখোপনিষদে আছে,—"আদিত্যমণ্ডলং দিব্যং রশ্মিজালসমাকুলম্।
তস্য মধ্যগতো বহ্নিঃ প্রকাশে দীপবর্ত্তিবৎ॥"

কূটস্থের মধ্যে ভাল রকমের জ্যোতির্বিশিষ্ট আকাশের মণ্ডল, চারিদিকে সেই আকাশ-মণ্ডলের মধ্যে প্রদীপের সলিতার ন্যায় আলো জ্বলিতে থাকে, তাহারই মধ্যে ত্রিলোক। সেই ত্রিলোক সমস্তই ব্রহ্মময় এবং ত্রিলোকস্থিত চরাচর ও যত কর্ম্ম—সমস্তই ব্রহ্ম।

"যোনিমুদ্রাতে শ্বেতদ্বীপনিবাসী পরব্যোমস্বরূপ ব্রহ্মমধ্যে অগ্নিশিখা দেখিতে যে সময় লাগে, পরমেশ্বর পুরুষোত্তমকে দেখিতেও সেই সময় লাগে। **যোগীরা এইরূপে সূর্য্য—কূটস্থ ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া যোগাভ্যাসের ধারণাদ্বারা পুরুষোত্তমের জ্ঞানলাভ করেন।** "যোসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"। এই আদিত্যান্তর্গত পুরুষই "আমি"। যখন আমিই সেই এক পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপ—তখনই 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং' হয়। সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ হইলে আর আপনিও থাকে না।

"ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার অবস্থায় থাকা—এই প্রথম ক্রিয়া। এইরূপ থাকিতে থাকিতে সর্ব্বদা ধ্যান করিলেই ব্রহ্মপদকে পায়—মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সুষুম্নার এক টান থাকে—ইহাই দ্বিতীয়মাত্রা, ইহাকে বিষ্ণুদৈবত বলে, অর্থাৎ যোনিমুদ্রায় অধিকক্ষণ স্থিতি থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ কূটস্থের মধ্যে সকল দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, পুরুষোত্তম—যিনি নিত্য পুরাণ পুরুষ—তাঁহাকে দেখা যায়। ইহাই বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ লিঙ্গমূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু থাকে। আর যে ঈশান দেবতা অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়াদ্বারা যখন সমস্ত জানা যায়—তাহাই তৃতীয় মাত্রা অর্থাৎ ব্রহ্ম অধিপতি ও ঈশ্বর—সকল ভূতের মধ্যে আছেন বলিয়া সকল জানা যায়, তখন ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ুর টান থাকিবে—এইরূপ ধ্যানে ঈশানপদকে পাইবে। অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে বিন্দু অথবা বাহ্যবিন্দুতে [যাহা ভ্রূর সামনে দেখা যায়) থাকিবে—সে বিনা ইচ্ছা—অনিচ্ছার ইচ্ছা—যাহা বোধগম্য নহে, কেবল তাঁহারই মহিমা—তাহার দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিবে। আর যাহা অর্দ্ধমাত্রা বা চতুর্থমাত্রা—তখন হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থিতি অনুভব হয়, যেখানে সকল দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে বিচরণ করিতেছে; শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। গগন-মণ্ডলে সে ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহস্রদল পদ্ম নামক নিধি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম আত্মাস্বরূপ, তাঁহার পর আর কিছু নাই।"

(লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শন ২য় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ)

উপরোক্ত বিষয়টির সারার্থ এই—

(১) প্রথম কাজ ক্রিয়া করা, (২) ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি, উহাই জ্ঞেয়,—ব্রহ্মবস্তু। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হয়। (৩) ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিতে থাকিতে যে ধ্যানাবস্থা হয়, তদ্দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ হয়—তখন সুষুম্নার মধ্যে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত একটা টান অনুভব হয়। ইহাই প্রণবের প্রথম মাত্রা। (৪) যোনিমুদ্রায় কৃষ্ণবর্ণ কূটস্থের মধ্যে সমস্ত দেবতার সাক্ষাৎ হয়, পরে পুরুষোত্তম দর্শন হয়। ইহাই বিষ্ণুপদ—তখন লিঙ্গমূল হইতে (মূলাধার ছাড়িয়া গেল) মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু স্থির। ইহাই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা। (৫) ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা যখন নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত টান হয়—(স্বাধিষ্ঠান ছাড়িয়া গেল) তখন যে একটি অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ হয়—উহাই প্রণবের তৃতীয় মাত্রা। তখন সর্ব্বভূতস্থিত ঈশ্বরকে জানা যায় (এইবার ঈশ্বর দর্শন হইল)। ঈশ্বর সর্ব্বভূতস্থ বলিয়া সাধকও তখন সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি তখন সকলের সব কথা

[সাংখ্যমত—সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। আত্মা নিগুর্ণ।)

জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ত্রিবিধ।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯

জানিতে পারেন। এই সময় মন কূটস্থের মধ্যে বিন্দুতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে, এবং তাঁহার সর্ব্বদা বিন্দুদর্শন হয়। (৬) হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থিতি যখন অনুভব হয়, তখনই চতুর্থ মাত্রা, তখন আকাশে সমস্ত দেবতার তেজোময় রূপ দর্শন হয়। শুদ্ধ স্ফটিকের মত বর্ণ দেখা যায়—উহাই শিবরূপ। আবার উহাই ধ্যান করিতে করিতে সহস্রদল পদ্মে স্থিতি অনুভব হয়, তখন এক আত্মাই পরব্রহ্মস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী এই অনুভব পদ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৮

অন্বয়। গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং, কর্ম্ম চ, কর্ত্তা চ (জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা) গুণভেদতঃ (সত্ত্বাদিগুণভেদে) ত্রিধা এব (তিনপ্রকারই) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে) তানি অপি (সে সকলও) যথাবৎ শৃণু (যথাযথভাবে শ্রবণ কর) ॥ ১৯

শ্রীধর। ততঃ কিম্? অত আহ—জ্ঞানং কর্ম্ম চেতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপদ্যন্তে অস্মিন্ ইতি 'গুণসংখ্যানং—সাংখ্য শাস্ত্র'। তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈব উচ্যতে। তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবৎ শৃণু। ত্রিধৈবেতি এব কারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণ আত্মনঃ স্বতঃ কর্ম্মাদি-প্রতিষেধার্থঃ। চতুর্দ্দশাধ্যায়ে "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ" ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্ব প্রকারো নিরূপিতঃ। সপ্তদশাধ্যায়ে "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদিনা গুণকৃত-ত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃ স্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদি-সেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্। ইহ তু ক্রিয়া-কারক-ফলাদীনাম্ আত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বম্ উচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। "গুণসংখ্যানে" অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—এই তিনটি সত্ত্বাদি গুণভেদে যে ত্রিবিধ হয়, তাহা উক্ত আছে, সেই জ্ঞানাদির বিষয় বলিতেছি যথাযথভাবে শ্রবণ কর। "ত্রিধৈব"—এই "এব" শব্দটি গুণত্রয়ানুরূপ উপাধি ব্যতিরেকে আত্মার স্বতঃ কর্ম্ম প্রতিষেধার্থ অর্থাৎ আত্মার নিজের যে কর্ম্মাদি নাই—ইহাই বলিবার জন্য। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ" ইত্যাদির দ্বারা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বন্ধকত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" শ্লোকদ্বারা গুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণদ্বারা রজঃ ও তমঃস্বভাব সম্পাদনই কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। ইদানীং ক্রিয়াকারক ও ফলাদির সহিতও যে আত্মার সম্বন্ধ নাই—ইহাই দেখাইবার জন্য সকল বস্তুর ত্রিগুণাত্মকতা বলিতেছেন; ইহাই বিশেষ বলিয়া জানিবে ॥ ১৯

[আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে যদ্যপি বিরুধ্যতে, তদপি গুণভোক্তৃ-বিষয়ে প্রমাণমেব"—পরমার্থ ব্রহ্মৈকত্ব বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রে বিরুদ্ধ মত থাকিলেও গুণ ও গুণ-ভোক্তার স্বরূপ-নির্ণয়বিষয়ে এই শাস্ত্রই প্রমাণ।]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্ঞান কর্ম্ম কর্ত্তা—তিনরকমের তিন গুণেতে তাহাদিগের গুণ সব যেমন যেমন তাহা বলিতেছি।—আত্মা অকর্ত্তা, তবে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার গুণভেদে ত্রিবিধ অবস্থা হয়; ইহা কিরূপে সম্ভব হয় বলিয়া বুঝিব? এই কর্ত্তা ও জ্ঞেয় বস্তু কি একই বস্তু নহে? ক্রিয়া ব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা নাই। গুণাতীত যে আত্মা তাহার আবার ক্রিয়া কোথায়? সুতরাং ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। এ কর্ত্তা গুণাতীত নহে বরং ত্রিগুণযুক্ত।

আত্মা অকর্ত্তা হইলেও গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তারও ত্রিবিধ অবস্থা হয়। এই কর্ত্তা ও জ্ঞেয় বস্তু (আত্মা) কিন্তু এক বস্তু নহে। ক্রিয়াব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু গুণাতীত যিনি, তাঁহার আবার ক্রিয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং এ কর্ত্তা গুণাতীত নহেন, বরং ত্রিগুণযুক্ত। বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা আভাস চৈতন্যই সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা, সাধন দ্বারা এই আভাস চৈতন্য যখন শুদ্ধ হইয়া যান, তখন তিনিও অকর্ত্তাই হইয়া যান। দৃশ্য বস্তু থাকিলে তাহার দ্রষ্টাও আছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু যখন দৃশ্য বস্তুর অভাব হয়, তখন দ্রষ্টৃত্ব-ভাবও থাকে না। চিত্তস্পন্দন হেতুই বহুবিধ বস্তু কল্পিত হয়, প্রাণ-স্পন্দন ব্যতীত চিত্তস্পন্দন হয় না, সুতরাং বহুবিধ দৃশ্য বস্তু উহা প্রাণের বিবিধ স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাণ নিস্পন্দিত হইলে তাহার বহু বস্তুরূপ পরিণামও ক্ষীণ হইয়া যায়, এইরূপে চিত্তস্পন্দনও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে তাহার ভোক্তৃভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহাই দ্রষ্টার স্বস্বরূপে অবস্থান। বৃত্তির সম্যক্ নিরুদ্ধাবস্থা দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়। এই অবস্থাকেই কৈবল্যাবস্থা বলে। তখন বুদ্ধির তখন অভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধি-বোধাত্মক ভাবও থাকে না। কিন্তু ব্যুত্থিত অবস্থায় "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র"—পুরুষ যেন বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত অভিন্ন ভাবে প্রতীত হন। দর্পণ থাকিলেই যেমন দর্পণের সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি রূপ দর্পণ থাকিতে প্রতিবিম্ব দর্শন দূর হয় না। দ্রষ্টা পুরুষই চৈতন্য-স্বরূপ; এই দ্রষ্টা যাহা জ্ঞাত হন, তাহাই দৃশ্য বা জ্ঞেয় বস্তু। দ্রষ্টা-চৈতন্যের দ্বারা চেতনযুক্ত হইয়া বুদ্ধি বিষয়-সমূহকে প্রকাশ করে। তাহা হইলে দ্রষ্টা-পুরুষ বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জ্ঞাতা-পুরুষ, এবং বিষয়সমূহ জ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়যুক্ত চিত্ত হইল বিষয় জ্ঞানের করণ বা দর্শন শক্তি। চিত্তের সহিত মিলিত হইয়াই আত্মার ভোক্তৃত্ব ভাব হইয়া থাকে। এই ভোক্তৃ-ভাবই অস্মিতাখ্য অভিমান হইতে সঞ্জাত। চিত্ত মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহা অভিমানেরই প্রকার-বিশেষ। দ্রষ্টা-পুরুষের সন্নিকর্ষ হইতে বুদ্ধিতে বিষয় সকল প্রকাশিত হয়, সেই জন্য বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত পুরুষ অভিন্নভাবে যেন অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, এই জন্য বিষয়ের সহিত পুরুষেরও সারূপ্য প্রতীত হয়। নিরুদ্ধ অবস্থায় যেমন তাঁহার স্বরূপে অবস্থান হয়, তেমনই ব্যুত্থিত অবস্থায় বিষয়রূপে তিনিই প্রতীত হন। সেই জন্য জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাতা পুরুষ হইতে অভিন্ন। দৃশ্য না থাকিলে যেমন দ্রষ্টা নাই, দ্রষ্টা না থাকিলেও তেমনই দৃশ্য নাই। সত্তাবান বস্তু মাত্রেই কর্ত্তৃ-নিরপেক্ষ হইয়া অস্তিত্বযুক্ত হইতে পারে না। বস্তুর সত্তা দ্রষ্টার সত্তার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে বস্তুর সত্তাও দ্রষ্টৃ-পুরুষ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। আত্মার এইরূপ বহুভাবে প্রকাশই হইল—তাঁহার মায়া বা লীলা। বাস্তবিক দ্রষ্টা ও "আমি"

(একাত্ম-জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান)

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥ ২০

একই বস্তু, মাঝখানে 'মন' আসিয়া সমস্ত বস্তুকেই দুর্জ্ঞেয় করিয়া তুলিয়াছে। তাই দৃশ্য বস্তু দর্শনে মূঢ় ভীত-কম্পিত-চিত্ত কাঁদিয়া বলে—"হে আবিঃ, হে প্রকাশ স্বরূপ, তুমি আমার বুদ্ধিতে প্রকাশিত হও। মা, তুমিই তো প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, এই বুদ্ধির দ্বারাই তুমি বস্তু-মাত্রকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছ, তোমার এই বহু রূপ দেখিয়া ভয় লাগিয়া গিয়াছে। একবার তুমি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়া নিজভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। তুমিই যে আমি এবং আমিই যে এই সমস্ত দৃশ্যরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, তোমার কৃপা-কটাক্ষে আমাদের সেই দর্শন শক্তি প্রস্ফুটিত হউক, তাহা হইলেই বহুত্বের খেলায় আর মুগ্ধ হইতে হইবে না।"

সাধক! এইরূপ শরণাগত ভাবে প্রাণময়ী অভয়া চিতি-শক্তির নিকট আত্মনিবেদন কর, তাহা হইলেই তুমি তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারিবে। এ বাহ্য-জগৎ যে তোমারই রূপ, তোমার আত্মারই প্রকাশ—তাহা বুঝিতে পারিবে। তখন আর এই বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া ভয় হইবে না।

যে লীলাময়ীর লীলাই 'তুমি' 'আমি'—বাহ্য জগতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার গুণের খেলা। সত্ত্বাদি-ভেদে এই গুণের কত যে খেলা হয় তাহাই ভগবান এই বার দেখাইবেন॥ ১৯

অন্বয়। যেন (যে জ্ঞান দ্বারা) বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতে) অবিভক্তম্‌ (অবিভক্ত ভাবে স্থিত) একং অব্যয়ং ভাবং (এক অদ্বয় নিত্য বস্তুরূপে) ঈক্ষতে (দৃষ্ট হয়) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞান) সাত্ত্বিকং বিদ্ধি (সাত্ত্বিক বলিয়া জানিও)॥ ২০

শ্রীধর। তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্ব্বভূতেষু ইতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু, বিভক্তেষু—পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তং অনুস্যূতম্‌, একম্‌ অব্যয়ম্‌ নির্ব্বিকারং, ভাবং—পরমাত্মতত্ত্বং, যেন—জ্ঞানেন, ঈক্ষতে আলোচয়তি, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [তিনটি শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞান বলিতেছেন]—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত পরস্পর ব্যাবৃত্ত (খণ্ডিত) ভূতসকলের মধ্যে এক অবিভক্ত নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্ব যে জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করা (দেখা) যায়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া ক'রে সবভূতের মধ্যে এক কূটস্থ ব্রহ্ম অব্যয় অবিনাশী যে দেখে—ভিন্ন ভিন্নতেও এক করিয়া দেখে ও ভিন্ন ভিন্ন সব জীব ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বত্রেতে দেখে—ইহারই নাম সাত্ত্বিক জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই জ্ঞান হয়।—দেশ, কাল, বস্তু দ্বারায় বিভিন্ন ভূত সকলের মধ্যে পরিচ্ছিন্নরূপে যে সত্তা দৃষ্ট হন, তিনি এক অখণ্ড নির্ব্বিকার, এইরূপ যে জ্ঞানদ্বারা এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সত্তা আলোচিত হয়,

তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান ; ইহার নামই সম্যক দর্শন। আপাততঃ আমাদের যে জ্ঞান রহিয়াছে সেই জ্ঞানে বস্তুসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল অসংখ্য বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটী অবিভক্ত চিৎবস্তু রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বদাই দ্বৈত-বিবর্জ্জিত। এই অদ্বিতীয় তত্ত্ব বস্তুটীকে যে জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। এই পরম জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে আমার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের যে বিভিন্ন শক্তি-সকল বহির্ম্মুখী হইয়া বস্তু-সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহাদের সেই বিভিন্ন শক্তিকে সংপিণ্ডিত করিয়া একমুখী করিতে হইবে। এইরূপ ইন্দ্রিয়গণের একীকরণ দ্বারাই যাহা সত্তা-সামান্য ভাব, তাহাই ফুটিয়া উঠিবে। আমার মন ও প্রাণ চঞ্চল বলিয়া ইন্দ্রিয়দের বহির্ম্মুখ বৃত্তিকে নিবৃত্ত করা যায় না, সুতরাং বহু জ্ঞানও নিরস্ত হয় না। বহু জ্ঞান নিরস্ত করিতে হইলে মনের লয়-বিক্ষেপ ভাব যদ্দ্বারা দৃশ্য দর্শন হইয়া থাকে, সর্ব্বাগ্রে মনের এই চঞ্চল ভাবকে বিদূরিত করা আবশ্যক। প্রাণের চাঞ্চল্যেই মনের চাঞ্চল্য, সেই প্রাণকে প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে। তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মধ্যে তাহার চিরস্থির ভাবটিকে ধরিতে হইলে তাহার তরঙ্গভঙ্গের চাঞ্চল্যকে যেমন প্রশমিত করা আবশ্যক হয়, তদ্রূপ যে এক অখণ্ড জ্ঞেয় বস্তুটী আপাততঃ বহু বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা যে প্রকৃতই বহু নহে, তাহা যে স্থির সমুদ্রের তরঙ্গায়িত ভাব মাত্র—তাহা বুঝা যাইবে যখন প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইয়া যাইবে। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা শ্বাস স্থির হইলেই প্রাণ স্থির হইয়া থাকে, প্রাণের স্থিরতার সহিত মনও স্থির হইয়া যাইবে। মন অচঞ্চল বা প্রাণস্থির হইলেই তাহা আত্মমুখী হয়। তখন বহুভাব বা নানাত্বের তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়া যায়, ইহাকে নিরোধ ভাবও বলে। এই নিরোধ ভাব হইতেই একাত্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই দ্বৈতপ্রপঞ্চে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই অবস্থায় স্থিত যোগী

"জিতাহারো জিতক্রোধো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥"

"জিতাহার" অর্থে ইহা নহে যে, ক্ষুধাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এই অবস্থায় অবস্থিত যোগীর রসনায় তৃপ্তিকর বস্তুতে আসক্তি থাকে না, তিনি যাহা পান, তাহাই খান, ইহা খাইতে ভাল লাগে, উহা ভাল লাগে না, যোগীর এরূপ ইচ্ছার সম্যক্ অভাব হয়। সাধারণতঃ আমাদের ক্রোধ হয়—নিজের অভিলষিত বস্তু না পাইলে, কিন্তু যোগাভ্যাসীর ক্রিয়ার পর-অবস্থায় মন বা ইচ্ছা না থাকায় ক্রোধ হইবারও সম্ভাবনা থাকে না। তিনি সঙ্গদোষবর্জ্জিত। আসক্তিপূর্ব্বক কাহারও সঙ্গ করেন না বা বৃথালাপের জন্য কাহারও সহিত কথা বলেন না, এই জন্য তাঁহার নিকট অন্য বস্তু থাকিয়াও নাই। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার আয়ত্তাধীন, তাঁহাকে সময়ে অসময়ে তাহারা বিপথে লইয়া যাইতে পারে না—তাহাব কারণ তিনি জিতেন্দ্রিয়, কোন ইন্দ্রিয়ের তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব নাই। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ বশীভূত হইলে, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার থাকিয়াও নাই। এমন কি বাক্য, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও আপন আপন কর্ম্মের প্রতি স্পৃহা থাকে না। তিনি নির্দ্বন্দ্ব—কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনই থাকে না, সুতরাং অন্য কোন লক্ষ্য বা ভাব না থাকায় দ্বন্দ্ব হইবে কিরূপে? তিনি সর্ব্বদাই নিরহঙ্কার"—কারণ "আমি আমি" করিয়া সর্ব্বদা ক্ষিপ্তের মত যে বিচরণ করিত, সেই অহঙ্কারও

(পৃথক বা অনৈক্যের জ্ঞানই রাজস জ্ঞান)

পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

থাকে না। সুতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় সৃষ্টি সমুদায় থাকিয়াও থাকে না। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মেতে সংসার ভ্রম হয়, চঞ্চল মনের। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনও নাই সুতরাং সৃষ্টিও নাই আর রজ্জুতে সর্পবোধও নাই। তখন এক অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত আর কোন কিছুরই সত্তা থাকে না সুতরাং নির্দ্বন্দ্ব নিরহঙ্কার যোগীর কোন ভোগেচ্ছা বা কোন বস্তুর প্রতি লোভও থাকে না সুতরাং তাঁহার পরিগ্রহের সম্ভাবনা নাই বা কিরূপে হইবে? তাই বলিতেছি সাধক তোমার সকল দরজা খোলা থাকুক, তুমি প্রাণক্রিয়া দ্বারা মনকে বশ করিতে পারিলেই এই জগৎ, জীব, মায়া, ঈশ্বর বা আত্মার সমস্ত রহস্যই অবগত হইতে পারিবে। ইহাই প্রকৃত সাত্ত্বিক জ্ঞান॥ ২০

অন্বয়। তু (কিন্তু) পৃথক্ত্বেন (পৃথক পৃথকরূপ) যৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) পৃথকবিধান্ নানাভাবান্ (পৃথক্‌বিধ নানাভাব সমূহকে) বেত্তি (জানে) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) রাজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে)॥ ২১

শ্রীধর। রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানং ইত্যস্যৈব বিবরণম্। সর্ব্বেষু ভূতেষু—দেহেষু, নানাভাবান্—বস্তুত এব অনেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্, পৃথগ্বিধান্—সুখিত্বদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [রাজস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন]—পৃথক্‌রূপে যে জ্ঞান হয়, ইহা তাহারই বিবরণ। যে জ্ঞানে পৃথকরূপে সর্ব্বভূতে পৃথক্‌বিধ (সুখী দুঃখী আদি রূপে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন) নানাভাব বস্তুতঃ-ই অনেকানেক ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অনুভূত হয়, সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিবে॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথক করে নানা বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়াও এক ব্রহ্মস্বরূপ দেখে—সে রাজসিক জ্ঞান।—অপরিবর্ত্তনীয় এক আত্মস্বরূপেরই জ্ঞান হইতে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবিভক্তরূপে দৃষ্ট হইলেও যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে এক ও নিরন্তর আকাশের ন্যায় বোধ হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান—যাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় বোধ হয়, ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। এ শ্লোকে বলা হইতেছে যে পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত একাত্মবোধ নাই বটে, নানা বস্তুকে নানা ভাবে দেখা ও তত্তৎবস্তুতে আসক্তি বা কখন বিরক্তিও প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহা যে একেরই বহুরূপ—এইরূপ জ্ঞান যখন হয়, তাহা রাজস জ্ঞান। একাত্মভাবের চিন্তা থাকিলেও যত দিন দেহের পার্থক্য ভাবের লোপ না হয়, তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে না; উহা এক প্রকার মল-মিশ্রিত জ্ঞান—সুতরাং রাজস জ্ঞান। কারণ জ্ঞানের শুদ্ধতা হইলে আর তাহাতে পৃথকত্বের ভাণ থাকিতে পারে না। এখানে ব্রহ্মেরই পৃথক পৃথক ভাব মনে হইলেও পৃথক দৃষ্টি

(স্থূল দেহাদিতে যে আত্মজ্ঞান, তাহাই তামস জ্ঞান)

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

নষ্ট হয় না, সুতরাং এ জ্ঞানও রাজসিক জ্ঞান। রজোগুণের ধর্ম্ম চঞ্চলতা, একত্বের বিচার মনে থাকিলেও অনুভবে তখনও দ্বৈতভাব মিটে নাই। ভিন্ন দেহের বোধ থাকিলে দেহস্থিত দেহীকেও পৃথক বলিয়া ধারণা থাকে। সত্তার একত্ব পরোক্ষ ভাবে দর্শন হইলেও সত্তার স্বরূপে অবস্থানরূপ পৃথক্‌বিধ বৃত্তির নিরোধ ভাব স্ফুরিত হয় না, সুতরাং সে জ্ঞান সত্ত্বমুখী হইলেও সাত্ত্বিক জ্ঞান নহে। নানাত্বের জ্ঞান থাকায় উহাকে রাজস জ্ঞানই বলিতে হইবে ॥ ২১

অন্বয়। যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্য্যে (কোন একটী বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণ বলিয়া) সক্তম্ (অভিনিবিষ্ট বা আসক্ত হয়) [এই দেহই আত্মা অথবা এই প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত] অহৈতুকম্ (যুক্তি-বিরুদ্ধ) অতত্ত্বার্থবৎ (যাহা তত্ত্বার্থকে প্রকাশ করে না বা যাহা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী পরমার্থ-অবলম্বনশূন্য) চ অল্পং (এবং তুচ্ছ) তৎ (সেই জ্ঞান) তামসং উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২২

শ্রীধর। তামসং জ্ঞানমাহ—যত্বিতি। একস্মিন্, কার্য্যে—দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ—পরিপূর্ণবৎ, সক্তম্—এতাবানেব আত্মা ঈশ্বরো বা ইতি অভিনিবেশযুক্তম্, অহৈতুকম্—নিরূপপত্তিকম্; অতত্ত্বার্থবৎ—পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্, অতএব অল্পং—তুচ্ছম্, অল্প বিষয়ত্বাৎ অল্প ফলত্বাৎ চ। যৎ এবম্ভূতং জ্ঞানং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [তামস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন]—কিন্তু যাহা একমাত্র কার্য্যে দেহে বা প্রতিমাদিতে—পরিপূর্ণবৎ আসক্ত (অর্থাৎ এই দেহই আত্মা* বা এই প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ অভিনিবেশ যুক্ত), নিরূপপত্তিক অর্থাৎ অযৌক্তিক, পরমার্থ-অবলম্বনশূন্য

---

* ভগবানকে সকলে আমরা দেখিতে পাই না, সুতরাং আমাদের ভগবদ্ উপাসনার জন্য কোনও অবলম্বন আবশ্যক, বিনা অবলম্বনে ভগবদ্ধ্যান সকলের পক্ষে সুকর নহে। তাই যোগীরা কূটস্থের মধ্যে যে সকল রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, মৃৎ-কাষ্ঠাদিতে তাহারই প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া অল্পজ্ঞ মানবদের কল্যাণের জন্য তাহারই ধ্যান পূজাদির ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, সাধারণ লোকেরা তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল লাভ করিয়া প্রতিমাদিতে ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিবে। এইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিমাদির অর্চ্চনা শাস্ত্রসম্মত, সুতরাং তাহা তামসিক নহে। কিন্তু দেবার্চ্চনার প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত না হইয়া মৃৎ-শিলাময় প্রতিমা মাত্রকে ঈশ্বর ভাবিলে তাহা তামসিকতায় পরিণত হয়। প্রতিমা মাত্র অবলম্বন করিয়া যদি চৈতন্যসত্তা বা ঈশ্বর ভাব অনুভব হয়, তাহা কখনও সামান্য জিনিষ হইতে পারে না। আমাদের দেশে বহু সাধক এই মৃৎ-শিলাময় প্রতিমার মধ্যে পূর্ণচৈতন্যময় পরম পুরুষের সাড়া পাইয়াছেন। উক্ত প্রকার সাধকাগ্রগণ্যদের নিকট সেই মৃৎশিলা আর তখন কেবল মৃৎ-শিলা মাত্র নহে—সে পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে তখন চিন্ময়ী মূর্ত্তির স্পন্দন অনুভব হইতে থাকে, সে প্রতিমার ভজনাদিতে সত্য-জ্ঞান আবৃত হয় না সুতরাং সে পূজা তামসিক হইতে পারে না। যদি মৃৎ-শিলার মধ্যে কোন প্রকার চৈতন্যের সাড়া পাওয়া না যায়, যে পূজা কেবল লোকাচার-সম্ভূত অনুষ্ঠান মাত্র, তাহা আমাদের অন্তরস্থিত শুদ্ধ চৈতন্য ভাবকে জাগ্রত করিয়া তুলে না—তাহা অবশ্যই তামসিক।

(সাত্ত্বিক কর্ম্ম)

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

অতএব অল্পবিষয়ক বা অল্প-ফলজনক বলিয়া অতি তুচ্ছ—এবম্ভূত যে জ্ঞান—তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন কর্ম্মের নিমিত্তে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করে বিনা কারণে—সে তামসিক।—দেহ-সর্ব্বস্ব অবিবেকী জীবের যে জ্ঞান—তাহাই তামসিক জ্ঞান। ইহাদের সব ধারণাই মন-মানা, তাহাতে যুক্তিও নাই বিচারেরও স্থান নাই, অথচ নিজের ধারণার প্রতি অটুট বিশ্বাস। তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি হইতেই এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। শঙ্করাচার্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—যেমন জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে জীব দেহ-পরিমাণ মাত্র কিম্বা ঈশ্বর কাষ্ঠাদি পরিমাণ মাত্র; এরূপ জ্ঞান অযৌক্তিক এবং তাহা কখনও সত্য পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং উহার ফলও অতি তুচ্ছ, অর্থাৎ যাহারা ঐ মতের অনুবর্ত্তন করে, তাহাদের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প। তামসিকেরা সত্য বস্তুকে দেখিতে পায় না, কারণ তমোগুণের ধর্ম্ম জ্ঞানকে আবরণই করিয়া থাকে ॥ ২২

অন্বয়। অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাভিলাষশূন্য ব্যক্তিকর্ত্তৃক) সঙ্গরহিতং (অনাসক্তভাবে) অরাগদ্বেষতঃ (অনুরাগ বা দ্বেষদ্বারা প্রেরিত না হইয়া) কৃতং (অনুষ্ঠিত) যৎ নিয়তং কর্ম্ম (যে নিত্যকর্ম্ম) তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে (তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৩

শ্রীধর। ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্ম আহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং—নিত্যতয়া বিহিতম্, সঙ্গরহিতম্—অভিনিবেশ-শূন্যম্, অরাগদ্বেষতঃ কৃতং—পুত্রাদি প্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি। ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেন কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং তিনটি শ্লোকে ত্রিবিধ কর্ম্মের বিষয় বলিতেছেন]—যে কর্ম্ম (১) নিয়ত অর্থাৎ নিত্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত, এবং (২) সঙ্গরহিত অর্থাৎ অভিনিবেশশূন্য, (৩) অরাগদ্বেষতঃ কৃত—অর্থাৎ পুত্রাদির প্রীতির নিমিত্ত বা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ যাহা কৃত নয়, (৪) অফলপ্রেপ্সু—অর্থাৎ যে কর্ত্তা ফল ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ত্তা দ্বারা যে কর্ম্ম কৃত, সেই কর্ম্মকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত হ'য়ে—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ধ্যান ধারণা সমাধিপূর্ব্বক ইচ্ছারহিত, হিংসারহিত—এমত যে কর্ম্ম তাহার নাম সাত্ত্বিক কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে যাওয়া।—ভগবান এইবার ত্রিবিধ কর্ম্মের কথা বলিতেছেন। কর্ম্ম (১) প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় যে ভাবে কৃত হয়, (২) প্রাণের কথঞ্চিৎ স্থিরতা হইলে এবং (৩) প্রাণের পূর্ণ স্থিরতায় কর্ম্ম যে ভাবে কৃত হয়—তাহারই কথা এখানে বলিতেছেন। (১) প্রথমাবস্থায় যখন শ্বাস ইড়া পিঙ্গলায় চলে, (২) ইড়া পিঙ্গলায় চলিয়াও সামান্যভাবে যখন সুষুম্নায় চলে, এবং (৩)

(রাজস কর্ম্ম)

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

যখন পরিপূর্ণভাবে প্রাণ সুষুম্নামার্গ দিয়া চলে, তখন যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়—তাহাই সাত্বিক কর্ম্ম। শ্বাস কখন ইড়ায়, কখন পিঙ্গলায় এবং কদাচিৎ সুষুম্নায় বহিতে থাকে, এই শ্বাসের প্রতি যে সাধক লক্ষ্য রাখিতে শিখিয়াছেন, তিনি শ্বাসের প্রবাহের সহিত কর্ম্মেরও সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবকে লক্ষ্য করিতে পারিবেন। এজন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া শ্বাসের গতিকে সুষুম্না মুখে চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেইরূপ ভাবে চালাইবার কৌশল এই—সাধনায় অগ্রসর সাধক গুরূপদেশ মত সাধনা পথে চলিতে চলিতে যখন তাঁহার প্রাণ কণ্ঠ ও তদূর্দ্ধে থাকে, তখন তাঁহার মনে, প্রাণে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সাত্বিকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং মন উর্দ্ধে অবস্থিত হওয়ায়, সে মনে কোন প্রকার কাম-সঙ্কল্প থাকে না, সুতরাং তৎকৃত কর্ম্মেও কোন কামনার দাগ নাই। এই সকল সাধক পুরুষদের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মই থাকে না, এবং এতদ্বারায় ধারণা ধ্যানের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একেবারে পূর্ণ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত অবস্থায় তাঁহারা প্রবেশ করেন; এই অবস্থাতেই যোগীর যোগসমাধি হইয়া থাকে। এ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতেই সঙ্গরহিত হওয়া সম্ভব নহে। সঙ্গরহিত অবস্থায় যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাতে অভিনিবেশ হয় না, সুতরাং দ্বেষভাবও থাকিতে পারে না। আর "অমুক লোক ক্রিয়া করিয়া কত সাংসারিক উন্নতি লাভ করিয়াছে, অতএব আমিও খুব বেশী করিয়া ক্রিয়া করিব, যাহাতে তদপেক্ষাও অধিক লাভবান হইতে পারিব"—এইরূপ ভাব লইয়া যাহারা সাধনায় চেষ্টাশীল হয়, তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ, তাহারা ক্রিয়ার ফল যে শান্তি—তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। অথবা "আমার বেশ দর্শন হয় বা অন্যের মত আমার তেমন দর্শন হয় না, আমার ক্রিয়া ঠিক হইতেছে না"—ইত্যাদি ভাব লইয়া যাহারা সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই কর্ম্মফলপ্রেপ্সু। যাহাদের এ ভাব আদৌ উদয় হয় না তাহারাই "অফলপ্রেপ্সু"। এই "অফলপ্রেপ্সু" ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া যোগীকে পূর্ণ নিষ্কাম করিয়া তুলে, তখন তাঁহার প্রাণের গতিও পূর্ণভাবে সুষুম্নার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু প্রাণকর্ম্ম বহু পরিমাণে করিতে না পারিলে এরূপ অবস্থালাভও সহজ হয় না, তাই দৃঢ়াভ্যাসী সাধকের ইহা নিয়ত-কর্ম্ম বা নিত্য অনুষ্ঠেয় হইয়া থাকে। তাহারই ফলে সাধকের এই ক্রিয়া আপনাপনি চলিতে থাকে এবং অবিরাম ভাবে চলিতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি যাঁহার স্থির লক্ষ্য থাকে, তাঁহার মন অতি সহজে স্থিরভাব ধারণ করে এবং অতি অনায়াসে উহা সুষুম্নামার্গে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কৃত কর্ম্মই সাত্বিক কর্ম্ম ॥ ২৩

অন্বয়। তু (কিন্তু) কামেপ্সুনা (ফলকামী ব্যক্তিকর্ত্তৃক) সাহঙ্কারেণ বা (অথবা "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) পুনঃ বহুলায়াসং (এবং বহু ক্লেশ ও

(তামস কর্ম্ম)

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

পরিশ্রম সহকারে) যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে (যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়) তৎ রাজসং উদাহৃতম্ (তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২৪

শ্রীধর। রাজসং কর্ম্ম আহ—যত্ত্বিতি। যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা—ফলং প্রাপ্তুং ইচ্ছতা, সাহঙ্কারেণ বা—মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তি ইত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে তচ্চ পুনঃ বহুলায়াসং—অতিক্লেশযুক্তং, তৎ কর্ম্ম রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [রাজস কর্ম্ম কি তাহাই বলিতেছেন]—যে কর্ম্ম ফললাভেচ্ছু ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, অথবা সাহঙ্কার অর্থাৎ আমার সমান আর কে শ্রোত্রিয় আছে এইরূপ নিতান্ত অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় কিম্বা যদি ঐ কর্ম্ম অতি ক্লেশযুক্ত হয় তাহাকে রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অনেক প্রয়াস পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত দেমাক্ ক'রে কর্ম্ম করা—রাজসিক কর্ম্ম।—যে কর্ম্ম করিতে অনেক ছুটাছুটি ও হৈ চৈ ব্যাপার করিতে হয়, এবং সকলকেই বুঝিতে দেওয়া হয় যে এ বাড়ীতে একটা কর্ম্ম হইতেছে—তাহাই রাজস কর্ম্ম। অনেক ক্রিয়াবান্‌ও এই প্রকারের হইয়া থাকেন। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আসন পাতা, স্থান পরিষ্কার, দরজা বন্ধ করার ধুম দেখে কে! গলায় মালা, ফুলের থালা সাজানো, চন্দনের ফোঁটা, উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ এবং লোককে দেখাইয়া পদ্মাসন করিয়া শিব-চক্ষু হইয়া বসিয়া থাকা—এই রকম ভাব। তার পর তাঁহার ক্রিয়া করার আসল উদ্দেশ্য যে, উহা দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, শরীরটা ভাল থাকে, ক্ষুধা বাড়ে—এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যিনি ক্রিয়া করেন এবং হয়তো আসনে পা টন্ টন্ করিতেছে—তবুও বদ্ধ-পদ্মাসনে শরীর মুখ বিকৃত করিয়া বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া দীর্ঘকাল আসনে বসিয়া থাকার যে প্রয়াস—তাহাই রাজস কর্ম্ম ॥ ২৪

অন্বয়। অনুবন্ধং (ভাবি শুভাশুভ ফল) ক্ষয়ং (ধনক্ষয়) হিংসা (প্রাণিগণের পীড়ন) পৌরুষং চ (এবং নিজ-সামর্থ্যের) অনপেক্ষ্য (অপেক্ষা বা বিচার না করিয়া) মোহাৎ (অবিবেক বশতঃ) যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে (যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়) তৎ তামসম্ (উচ্যতে তাহাকে তামস কর্ম্ম বলা হয়) ॥ ২৫

শ্রীধর। তামসং কর্ম্ম আহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যতে ইতি অনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভম্, ক্ষয়ং—বিত্তব্যয়ম্। হিংসা—পর-পীড়নম্। পৌরুষ—চং স্ব-সামর্থ্যম্, অনপেক্ষ্য—অপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ। [তামস কর্ম্ম কি তাহা বলিতেছেন] পশ্চাৎ বদ্ধ করে যে তাহা

অনুবন্ধ অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবি শুভ ও অশুভ, বিত্তক্ষয়, পরপীড়া এবং নিজ-সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ঘুমাবার পূর্ব্বে বেঁধে ফেলে যে রকম—এমনতর কর্ম্মে যাহাতে নাশ হয়—আর অন্যের ভাল দেখিতে পারে না—অনপেক্ষ—কাহারও উপেক্ষা করে না অর্থাৎ চারিদিক দেখে করে না এইরূপ পুরুষত্ব প্রকাশ ক'রে মোহেতে ক'রে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে—ইহাকে তামস কর্ম্ম কহে।—ভগবান তামস কর্ম্মের ফল দেখাইতেছেন। তামস কর্ম্মের দোষ এই যে তাহাতে একেবারে বিচার থাকে না। একজন হয়তো ভাল কর্ম্মই করিতেছে, উহাতে কর্ত্তার মঙ্গল হইবে; কিন্তু তামস কর্ত্তার অন্যের মঙ্গল ভাল লাগে না সুতরাং অপরের ভাল কাজেও তাহার দোষ দৃষ্টি থাকিবেই। ছোট ছেলের ঘুম আসিলে যেমন সে আর স্থানাস্থান বিচার করিতে পারে না, ঘুমের ঘোরে বিবশ হইয়া যায়, এইরূপ তামসিক কর্ত্তা এমনতর কর্ম্ম করিতে উদ্যত হ'ন যাহাতে হয়তো তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু এমনই জেদের বশ যে, নিজের হিত বুঝিতে পারেন না এবং সেইরূপ কর্ম্ম করিতে গিয়া আপনারই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ফেলেন। বিচার বুদ্ধি থাকে না বলিয়াই এমন সব কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়, যাহাতে পশ্চাতে তাঁহাকেই বিপদে পড়িতে হয়। নিজের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে গিয়া হয়তো যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া ফেলেন। ইহার পশ্চাতে সর্ব্বদাই দুঃখের বা ভয়ের বন্ধন থাকে, নিজের শক্তি-সামর্থ্যেরও অযথা ক্ষয় হইয়া যায় এবং তাহা অন্যেরও ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে। তামসিক কর্ম্ম তখনই হয়, যখন মন নাভির নীচে থাকে—যেমন কামে উন্মত্ত, তখন আর অগ্র-পশ্চাৎ জ্ঞান থাকে না। উহাতে শরীর, মন, ধর্ম্ম সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি ঐ সকল কর্ম্মে বহু বিত্তেরও অপব্যয় হয়, তথাপি সে সকল কর্ম্ম করিবার জন্য কর্ত্তার কত যে জেদ তাহার আর সীমা নাই! যে সকল কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে নিজের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অন্যকে অযথা পীড়ন করিবার আবশ্যক হয়, মোহবশতঃ মনের আবেগে কেবল কর্ম্মই করা হয় মাত্র, তাহাতে ভাবী সুফল কিছুই নাই—উহাই তামসিক কর্ম্ম। মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতিও এই শ্রেণীর কর্ম্ম। কেবল হিংসা দ্বেষ ও লোভ বশতঃ আপনার সামর্থ্যের বাহিরে হইলেও যে কর্ম্ম করিতে কর্ত্তার প্রবৃত্তি হয় এবং তাহাতে আপনার ও অপরের লাভ ক্ষতির পর্য্যালোচনা নাই, বিচার-শূন্য হইয়া মনের খেয়াল-অনুযায়ী যে কর্ম্ম করা হয়—তাহা তামসিক কর্ম্ম। সাত্ত্বিকাদি ভেদে কর্ত্তার যেরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, কর্ম্মও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। উপরে উপরে কর্ম্মকে বিচার করিলেও চলিবে না। কর্ত্তার আশয় (motive) দেখিয়া কর্ম্মের বিচার করিতে হয় নচেৎ বিচারে ভ্রম হইতে পারে। একজন শুদ্ধান্তঃকরণে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার বাহ্যিক আকার রাজসিক বা তামসিক হইলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে রাজসিক বা তামসিক নাও হইতে পারে। যুদ্ধ-বিমুখ অর্জ্জুন "কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ" বলিয়া যুদ্ধ-বিমুখ হইলে তাহা আপাত-দৃষ্টিতে সাত্ত্বিক মনে হইলেও ভগবান তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম মনে করিতে পারেন নাই। উহা অর্জ্জুনের বিচারবিমূঢ়তার তামসিক ফল দেখিয়া ভগবান অর্জ্জুনের ঐরূপ যুদ্ধ নিবৃত্তিতে উৎসাহ দেখাইতে পারেন নাই ॥ ২৫

(সাত্ত্বিক কর্ত্তা)

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

অন্বয়। মুক্তসঙ্গঃ (ফলে আসক্তিশূন্য) অনহংবাদী ("আমি কর্ত্তা" এইরূপ ভাব যাহার নাই) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদি-বিকারশূন্য) কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে (কর্ত্তা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হন) ॥ ২৬

শ্রীধর। কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গঃ—ত্যক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী—গর্ব্বোক্তিরহিতঃ, ধৃতিঃ—ধৈর্য্যম্, উৎসাহঃ— উদ্যমঃ, তাভ্যাং সমন্বিতঃ—সংযুক্তঃ। আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারঃ—হর্ষ-বিষাদশূন্যঃ। এবম্ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ কর্ত্তার বিষয় তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন]—(১) মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ ত্যক্তাভিনিবেশ, আসক্তি বা ফলসন্ধানশূন্য, (২) অনহংবাদী অর্থাৎ গর্ব্বোক্তি-রহিত, (৩) ধৈর্য্য এবং (৪) উদ্যমযুক্ত বা অধ্যবসায়শীল (৫) এবং আরব্ধ কার্য্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য—এবম্ভূত কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলা যায় ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত ব্রহ্ম করিতেছেন ক্রিয়ার পর স্থিতি সর্ব্বদা ভিতরে ভিতরে স্থির থাকে। উৎসাহ—উর্দ্ধের সহিত অর্থাৎ কূটস্থেতে সর্ব্বদা লেগে থাকে, কোন একটা বিষয় আপনা আপনি দেখিতে পাইলে অথবা হইয়া উঠিল কিম্বা হইলই না—এ দুয়েতেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে স্থির—কোন মনের বিকার নাই—এমত কর্ত্তার নাম সাত্ত্বিক কর্ত্তা।—সাত্ত্বিক কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন। তিনি স্বয়ং ইচ্ছারহিত, যাহা কিছু হয়, তাহা ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই হয়, ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদা তাঁহার এইরূপ অচঞ্চল ভাব থাকে, ক্রিয়া করিবার সময় মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না। প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে অধিকক্ষণ ক্রিয়াও করিয়া থাকেন এবং ক্রিয়ার পর স্থিতিও বেশ হয়, অন্য কোন সঙ্কল্প মনে উঠে না, মন কেবল চক্রে চক্রে উঠা নামা করে। এতদিন ধরিয়া ক্রিয়া করিতেছি বা এতক্ষণ ক্রিয়া করি, তবুও তেমন অনুভব হইতেছে কৈ ?—ইত্যাদি চিন্তা যাঁহার মনে আসে না, গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়া চলিতেছি—এই মনে করিয়া প্রত্যহ স্থিরভাবে ধৈর্য্যযুক্ত ও উৎসাহযুক্ত হইয়া ক্রিয়া করিয়া যান, ক্রিয়া করিয়া কিছু অনুভব হইল বা হইল না, মন স্থির হইল বা তেমন হইল না—এজন্য যিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন না বা উৎসাহ উদ্যম কমিয়া যায় না—এরূপ কর্ত্তাই সাত্ত্বিক কর্ত্তা। উক্তরূপে যাঁহারা ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা সমাধি গভীরতর ভাবে উদিত না হইলেও ক্রিয়ার পর স্থিতি কিছু কিছু করিয়া হয়-ই, এবং ক্রিয়ার নেশাও বেশ জমিয়া আসে, মনটা যেন কোন অননুভবনীয় বিষয়ে আটকাইয়া যায়, বাহিরের বিষয় তেমন মনে পড়ে না, মনটা অনেক-ক্ষণ বৃত্তিরহিত অবস্থায় স্থির হইয়া থাকে। এই অবস্থা পর্য্যন্ত হইলে ক্রমে মনটা কূটস্থেতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। সেই সময় তিনি কূটস্থের মধ্যে কত কি দেখিতে পান, অথচ দেখিব

(রাজস কর্ত্তা)

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭

বলিয়া কোন কামনা করেন না। দেখিতে না পাইলেও মনটা বিষাদে বা নিরানন্দে ভরিয়া যায় না বা তজ্জন্য মনও নিরুদ্যম হইয়া সাধনায় শিথিলতা প্রকাশ করে না। মন দিয়া ক্রিয়া করায় ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা স্থিরতার বেশ উদয় হয়, বুদ্ধিও তাঁহার সেইজন্য খুব স্থির, কোন কিছুতেই উৎফুল্ল বা বিষণ্ণ হন না। হয়তো একটা কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু কর্ম্মটী সফল হইল না—এজন্য তাঁহার চিত্তে অপ্রসন্ন ভাব ফুটিয়া উঠে না, বরং সর্ব্বদা তাঁহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকে। চেষ্টা ব্যর্থ হইল ভাবিয়া ক্ষণার্দ্ধের জন্যও চিত্তে বিষাদের দাগ পড়ে না—ইহারই নাম মুক্তসঙ্গ। তাঁহাদের অহংভাব থাকে না, সুতরাং কর্ম্ম করিয়া সফলতা লাভ করিলেও চিত্তে কোন অহঙ্কার বা বিকার আসে না, এইরূপ অনহংবাদী পুরুষেরা সাধন করিয়া কখনও কিছু অনুভব করিলেন কিন্তু সে অনুভব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—এজন্যও বিষণ্ণ হইয়া পড়েন না। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া চলেন এবং বহুকর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াও কূটস্থে লক্ষ্য রাখিতে কখনও তাঁহার ভুল হয় না। কিছু ফল লাভ হউক বা না হউক সাধনায় কোন দিন তাঁহার অপ্রবৃত্তি আসে না, এইরূপ প্রমাদশূন্য ব্যক্তিই সাত্ত্বিক ক্রিয়াবান ॥ ২৬

অন্বয়। রাগী (যাহার রাগ অর্থাৎ আসক্তি আছে), কর্ম্মফল-প্রেপ্সুঃ (কর্ম্মের ফল প্রার্থনা যে করে) লুব্ধঃ (পরদ্রব্যে যাহার তৃষ্ণা আছে), হিংসাত্মকঃ (পরকে পীড়ন করাই যাহার স্বভাব), অশুচিঃ (বাহ্য এবং আন্তর শৌচাচার বর্জ্জিত), হর্ষ-শোকান্বিতঃ কর্ত্তা (হর্ষ ও শোকযুক্ত কর্ত্তা) রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (রাজস বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২৭

শ্রীধর। রাজসং কর্ত্তারমাহ—রাগীতি। রাগী—পুত্রাদিষু প্রীতিমান্, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ—কর্ম্মফলকামী, লুব্ধঃ—পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকঃ—মারকস্বভাবঃ, অশুচিঃ—বিহিত-শৌচশূন্য, লাভালাভয়োঃ হর্ষ-শোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ। [রাজস কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন]—রাগী অর্থাৎ পুত্রাদিতে প্রীতিমান, কর্ম্মফলকামী, পরস্বাভিলাষী, মারকস্বভাব, বিহিত শৌচশূন্য, লাভালাভে হর্ষশোকযুক্ত—এইরূপ কর্ত্তা রাজস ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছার সহিত ফলাকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা, অশুচি, সুখী, এবং দুঃখী, এমন যে কর্ত্তা তিনি রাজস কর্ত্তা।—যাহাদের অত্যধিক বিষয়াদিতে প্রীতি, তাহারা সর্ব্বদা পুত্রকন্যাদির লালন পালনে ব্যতিব্যস্ত এবং বিষয়লাভে সতৃষ্ণ থাকে, সুতরাং তাহারা নিয়মিত ভাবে ক্রিয়াদি সাধনে তৎপর নহে। যেটুকু ক্রিয়া করে, তাহাতে ফললাভের আকাঙ্ক্ষাই থাকে অর্থাৎ এ কাজ করিলে শরীর ভাল থাকিবে, কিংবা সিদ্ধ গুরু হয়তো তাঁহার আশীর্ব্বাদে অনেক বিপত্তির হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে, তাঁহার সুপারিশে কিছু

(তামস কর্ত্তা)

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

অর্থাগমও হইবে—এই সব ভাব লইয়া যাহারা সাধনা করিতে আসে, সেই সকল লোভী ফলাকাঙ্ক্ষীরা রাজস কর্ত্তা। এই সকল ব্যক্তিদের পর-ধন হরণে প্রবৃত্তি খুব প্রবল, নিজের সামান্য লাভের জন্য পরের অনিষ্ট করিতেও প্রস্তুত, ধন যথেষ্ট থাকিলেও ত্যাগ করিতে পারে না—এজন্য কর্ত্তব্য পালনেও পরাঙ্মুখ, ইহাদের অন্তর-শৌচ অর্থাৎ মনের স্থিরতা নাই, এবং বাহিরেও ভোজনাদিতে অসংযম হেতু অনাচারী ও অত্যাচারী, ইহারা স্বকার্য্য-সিদ্ধিতে হর্ষান্বিত এবং অসিদ্ধিতে শোকগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া ইহাদিগকে রাজস কর্ত্তা বলা হয় ॥ ২৭

অন্বয়। অযুক্তঃ (অসমাহিত বা মনোযোগশূন্য) প্রাকৃতঃ (অসংস্কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন—যখন যা মনে আসে, তাই করে) স্তব্ধঃ (অনম্র, উদ্ধত, কাহাকেও নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে না) শঠঃ (মায়াবী, বঞ্চক) নৈষ্কৃতিকঃ (পরবৃত্তি ছেদনকারী বা পরাপমানকারী) অলসঃ (অবসন্নস্বভাব) বিষাদী (শোকযুক্ত) দীর্ঘসূত্রী চ (এবং দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ যে কাজ করা এখনই উচিত, তাহা করিতে যাহার একমাস লাগে) কর্ত্তা তামস উচ্যতে (এবম্ভূত কর্ত্তাকে তামস বলে) ॥ ২৮

শ্রীধর। তামসং কর্ত্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তঃ—অনবহিতঃ, প্রাকৃতঃ—বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধঃ—অনম্র, শঠঃ—শক্তিগূহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ—পরাপমানকারী, অলসঃ—অনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী—শোকশীলঃ, যৎ অদ্য বা শ্বঃ বা কার্য্যং তৎ মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ স দীর্ঘসূত্রী। এবংভূতঃ কর্ত্তা তামসঃ। কর্ত্তৃ-ত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যম্ উক্তং জ্ঞাতব্যম্। কর্ম্মত্রৈবিধ্যেনৈব চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যম্ উক্তং বেদিতব্যম্। বুদ্ধেঃ ত্রৈবিধ্যেন করণস্যাপি উক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৮

বঙ্গানুবাদ। [তামস কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন] অযুক্ত অর্থাৎ অনবহিত বা অসাবধান, বিবেকশূন্য, অনম্র—গুরুর প্রতিও নম্র ব্যবহার নাই। শঠ অর্থাৎ শক্তি-গোপনকারী মনের ভাব গোপন করে, পরাপমানকারী, অনুদ্যমশীল, শোকশীল এবং দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ যাহা অদ্য বা কল্যই করা উচিত তাহা যিনি এক মাসেও সম্পন্ন করেন না—এইরূপ কর্ত্তা তামস। কর্ত্তার ত্রৈবিধ্য হেতু জ্ঞাতারও ত্রিবিধতা বুঝিতে হইবে। এবং কর্ম্মের ত্রৈবিধ্য বলায় জ্ঞেয়-মাত্রেরও ত্রিবিধতা উক্ত হইল জানিতে হইবে, পরে বুদ্ধির ত্রিবিধতা হেতু করণেরও ত্রিবিধতা বলা হইবে ॥ ২৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকে না—আটকিয়া না থেকে যাতে তাতে আটকায়, আটকিয়ে চিত্ত পুত্তলিকার ন্যায় ভেকা চেকা লেগে যায়—কোন একটা কর্ম্ম করিতে পারে না—সকলের সঙ্গেই ঠকামি—আলসেই

* নৈকৃতিকঃ ইতি বা পাঠঃ

সর্ব্বদা—সর্ব্বদাই দুঃখেই মন ভার—আজ না হয় কাল্ করব—ইহার পর বুড়া হইলে ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি দেবো—এইরূপ অবস্থা তামস কর্ত্তা।—তামসিকদের মন বিষয়ে আটকাইয়া পড়ে, সাধনায় আটকায় না। তাহারা মনে মনে অনেক প্রকার জল্পনা কল্পনা করে কিন্তু কাজে কিছুই করে না। মনে মনে খুব ইচ্ছা—যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা হয়, কিন্তু ক্রিয়া করিলে তবে তো ক্রিয়ার পর-অবস্থা আসিবে? ক্রিয়াতে কিন্তু মোটেই মনোযোগ নাই। ক্রিয়া করিতে বসিলেও মন যাহাতে তাহাতে পড়িয়া থাকে, সুতরাং স্থিরতা আসে না এবং মনও নিরুদ্ধ হয় না। ক্রিয়া করিবার সময় একটা যা তা সামান্য দৃশ্য দেখিয়াই মনে করে একটা মস্ত কিছু হইয়াছে এবং তাহাতেই মনে মনে খুব সন্তুষ্ট, কখন কখনও তাহার জন্য কত গর্ব্ব অনুভব করে। সব দিন ক্রিয়া করেও না, জিজ্ঞাসা করিলে বলে—এত কাজের ঝঞ্ঝাট একটুও সময় করে উঠতে পারি না। অথচ সে সব কাজের মাথাও নাই মুণ্ডুও নাই, কেবল আপনাকে আপনি ফাঁকি দেওয়া। লোক দেখিলেই দুই চারিবার ফোঁস ফোঁস করে, মনে ইচ্ছা লোকে জানুক সে কত ক্রিয়া করে, এইরূপ লোক ঠকানো প্রবৃত্তি। হয়তো আসনে বসিয়াই ঘুমাইতেছে, কিন্তু লোককে বলা হয়, 'ক্রিয়ায় মন বসিয়া যায় কিনা! তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কোথায় কি হইতেছে বা কে কি করিতেছে—কিছুই বুঝিতে পারি না, ডাকিলেও শুনিতে পাই না।' অথচ মন সকল দিকেই আছে, কেহ কিছু তাহার বিরুদ্ধে বলিলে সে সব কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। কোন মঙ্গল-কর্ম্মেই যোগ দিতে পারে না, কারণ তাহাতে কাজ করিতে হয় এবং পয়সা খরচ আছে, তাই লোককে বলিয়া বেড়ায়—ওই সব কাজ করিতে গেলে মন বিক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্য ও-সব কাজ টাজ আর ভাল লাগে না। আমি সর্ব্বদা বেশ কূটস্থ লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকি, আমার ইহাই ভাল লাগে, আর এখন বাজে কাজে সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। মন সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট, কিছুতে হয়তো দু-পয়সা লাভ হইল, তবুও তাহাতে খুসী নয়, মনে হয় আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল। মুখে সর্ব্বদা এমন একটা বিষাদের ভাব থাকে—যেন তাহার একটা বিপদ আসন্ন হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। যখনই কথা বলে, কেবল ঘ্যান ঘ্যান করিয়া নিজের দুঃখের গীতই গাহিতে থাকে। দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দিলেও সে পথ কখনও মাড়াইবে না। দেখা হইলেই কেবল নিজের কাঁদুনী গাহিতে থাকিবে, এবং এই-রূপ ধারণা—পৃথিবী শুদ্ধ লোক যেন এক জোটে পরামর্শ করিয়া তাহার শত্রুতা সাধন করিতেছে এবং তাহার উন্নতির পথে বাধা জন্মাইতেছে। সামান্য একটা কাজ তাহা করিয়া ফেলিলেই হয়, সে জন্য সময়েরও বেশী প্রয়োজন নাই এবং সে জন্য ব্যয় বাহুল্যও নাই কিন্তু তবুও তাহা লইয়া কত মাথাই ঘামাইবে, কত লোকের সহিতই পরামর্শ আঁটিবে; এইরূপে যে সময়ের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া ফেলা উচিত ছিল সদা সন্দিগ্ধচিত্তে সে সময়ের মধ্যে তাহা তো করিতেই পারে না বরং কর্ম্মের যথোপযুক্ত সময় পার হইয়া যায় কিন্তু তাহার চিন্তার শেষ হয় না। ক্রিয়া লওয়া

(বুদ্ধির ভেদ ত্রিবিধ)

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

উচিত কি অনুচিত এই চিন্তা করিতে করিতে দশ বৎসর কাটিয়া গেল, তবু মন নিঃসংশয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না—এইরূপে একদিন অতর্কিত ভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িল, আর সব শেষ হইয়া গেল—এই সব কর্ত্তারাই তামস কর্ত্তা ॥ ২৮

অন্বয়। ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয়) বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ (বুদ্ধির এবং ধৃতির) গুণতঃ এব (গুণানুসারেই) ত্রিবিধং ভেদং (তিন প্রকার ভেদ) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ পৃথক্‌রূপে) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (যাহা বলা হইবে) শৃণু (তাহা শ্রবণ কর) ॥ ২৯

শ্রীধর। ইদানীং বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে—বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯

বঙ্গানুবাদ। অধুনা বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধতা বিষয়ে বলিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট [হে ধনঞ্জয়, সত্ত্বাদিগুণ-ভেদ বশতঃ বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন প্রকার ভেদ—তাহা পৃথক পৃথক ভাবে সুস্পষ্টরূপে বলিতেছি—শ্রবণ কর] ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বুদ্ধি, ধৃতি তিন প্রকার—তাহার গুণ বলি পৃথক পৃথক ক'রে।—সত্ত্বাদি গুণ-ভেদে বুদ্ধিরও ত্রিবিধ ভেদ হয়, সেই কথাই ভগবান অশেষরূপে অর্থাৎ কিছু বাদ না দিয়া এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক ভাবে বলিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। জীব বা আত্মাকে আমরা বুঝি—বুদ্ধির ভিতর দিয়া। যদিও আত্মাকে ইহাদের বিকার স্পর্শ করিতে পারে না, তবুও অসিদ্ধাবস্থায় অন্তঃকরণের ধর্ম্মই জীবে আরোপিত হয় এবং তদ্দ্বারাই জীবকে বিচার করা হয়। তাই যেন ভগবান বলিতেছেন—আত্মার কর্ম্মবিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব তো বুদ্ধি আত্মস্থ না হইলে বুঝা যাইবে না, কিন্তু গুণের মধ্যেই যাঁহারা পড়িয়া আছেন, তাঁহারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবেন কি ভাবে—তাহা জানা না থাকিলে উন্নত অবস্থায় তাঁহারা পৌছিবেন কিরূপে ? বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলেই না রাগ দ্বেষ ত্যাগ হইবে ? চিত্ত শান্ত হইয়া উপরাম লাভ করিবে ? তাই ভগবান বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ দেখাইয়া অর্জ্জুনের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ও ধৃতি যাহাতে প্রাপ্তি হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে বলিতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মুক্তসঙ্গ, ধৃতিযুক্ত ও অহঙ্কারশূন্য কর্ত্তাই সাত্ত্বিক। সমস্ত কর্ম্মের মূলেই আমরা বুদ্ধিকে দেখিতে পাইতেছি, বুদ্ধি ব্যতীত শুভ বা অশুভ কোন কর্ম্মই হয় না। বুদ্ধিই জ্ঞানশক্তি এবং ধৃতি ধৈর্য্য বা ধারণার শক্তি—যাহা না থাকিলে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। মনে হইতে পারে কর্ত্তার কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন আর বুদ্ধি বা ধৃতি-সম্বন্ধে পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি ? কর্ত্তাকে বাদ দিয়া বুদ্ধি বা ধৃতির অস্তিত্ব কোথায় ? ইহা সত্য বটে, কিন্তু আত্ম-সত্তায় কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব কিছুই নাই, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বেরই যখন আলোচনা চলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে আত্মা কি ভাবে অবস্থান করেন তাহা অবশ্যই প্রণিধান-যোগ্য। আত্মা ঐ অবস্থায় বুদ্ধিরূপ হইয়া বর্ত্তমান থাকেন। বুদ্ধির সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা, তামসিকতার অনুরূপ বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত আত্মাকেও তখন সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক

(সাত্ত্বিক বুদ্ধি)

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধি যদি রাগ-দ্বেষশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হয়, তবে আত্মাও তখন গুণ-মলশূন্য হইয়া প্রকাশিত হইবেন। বুদ্ধিতে গুণ-মল না থাকিলে, তখন সেই বুদ্ধিও আত্মকারা হইয়া যায়। গুণ-মলশূন্য হইলেই মনোবুদ্ধির তরঙ্গ শান্ত হইয়া আত্মা নিজ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। চৈতন্যময় জ্ঞানই আত্মা, এই আত্মাই যাবতীয় বস্তুকে প্রকাশ করেন। জ্ঞানই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-রূপে প্রকাশিত হ'ন। অজ্ঞানের দ্বারাই এই তিনের পৃথকত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় হইতে পৃথক রূপে জানা যাইবে, তখন জ্ঞেয় বস্তুও ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলে জ্ঞাতার দৃশ্যদর্শনও থাকিবে না, তখন জ্ঞাতা আর কাহারও সাক্ষিরূপে না থাকিয়া কেবল সত্তা-মাত্র রূপে স্থিতি লাভ করিবেন। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান, যাহা ক্রিয়া পর-অবস্থায় হইয়া থাকে ॥ ২৯

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ (কর্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং মোক্ষং চ বেত্তি (বন্ধ ও মোক্ষকে বিদিত হয়—অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা কিসে বন্ধন হইবে বা কিসে মুক্তি হইবে, জানা যায়) সা সাত্ত্বিকী (সেই বুদ্ধি—সাত্ত্বিকী বুদ্ধি) ॥ ৩০

শ্রীধর। তত্র বুদ্ধেঃ ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিং ইতি ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে, নিবৃত্তিং অধর্ম্মে। যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যম্ অকার্য্যঞ্চ। ভয়াভয়ে—কার্য্যাকার্য্য-নিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ। কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিঃ—অন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্তৃত্বোপচারঃ, কাষ্ঠানি পচন্তি ইতিবৎ ॥ ৩০

বঙ্গানুবাদ। [এ বিষয়ে বুদ্ধির ত্রৈবিধ্য তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন]—ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্মে নিবৃত্তি, এবং যে দেশে যে কালে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য আর ভয়াভয়ে অর্থাৎ কার্য্য ও অকার্য্য হেতু অর্থ এবং অনর্থ এবং কিরূপে বন্ধন হয় বা কিরূপে মোক্ষ হয়—এই সকলকে যে বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ জানে, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। এই শ্লোকে যে বুদ্ধি দ্বারা পুরুষ জানে বলা উচিত ছিল, কিন্তু করণে কর্তৃত্বারোপ যেরূপ হয়, (যেমন কাষ্ঠসকল পাক করিতেছে,) তদ্রূপ এখানে করণরূপ বুদ্ধিতে কর্তৃত্বারোপ হইয়াছে ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই কর্ম্মেতে প্রকৃষ্টরূপে থাকা উচিত অর্থাৎ ক্রিয়া; ক্রিয়া না ক'রে থাকা অনুচিত ক্রিয়াই কার্য্য—না করা অকার্য্য; ক্রিয়া না করিলে ভয়; ক্রিয়া করিলে ভয় নাই—ক্রিয়া না করিলে বন্ধন, ক্রিয়া করিলে মোক্ষ—এমত যে বুদ্ধি তাহা ক্রিয়া করিয়াই হয় অর্থাৎ সুষুম্নায় থাকিলে সাত্ত্বিক বুদ্ধি হয়।—সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কিরূপ? তাহাই ভগবান বলিতেছেন। নর-তনু লাভ করিয়া আমরা পশুর মত যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব—এরূপ কখনই সঙ্গত

হইতে পারে না। অবশ্য পশুদের মত আহার নিদ্রা-ভয়-মৈথুন প্রভৃতিতে যথেষ্ট প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু এই প্রবৃত্তির বশে পড়িয়া থাকিলে জীবনে কখনই কৃতকৃত্যতা লাভ হয় না, এই জন্ম মরণ পাশ হইতে মুক্তি লাভ হয় না, সেইজন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে বোধ থাকা আবশ্যক। বিষয়-বিনিবৃত্ত চিত্তই মোক্ষের কারণ, এবং ইন্দ্রিয়সুখাদির জন্য যে আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই—তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। অথচ কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। সেই জন্য যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ এবং যাহা মোক্ষের কারণ, তৎসম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ ধারণা না থাকিলে, ইন্দ্রিয়গণ নাবিকহীন তরণীর মত আমাদিগকে কুকর্ম্মের আবর্ত্তে ডুবাইয়া দিবে। আবার কার্য্য করিতে হইলে শাস্ত্র-দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, শাস্ত্রে কতকগুলি কর্ম্মকে বিহিত এবং কতকগুলিকে প্রতিষিদ্ধ বলা হইয়াছে সুতরাং যাহা বিহিত তাহাই কর্ত্তব্য, এবং যাহা অবিহিত তাহা অকর্ত্তব্য। যখন এই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে মনের দৃঢ় ধারণা হয় এবং বুদ্ধি দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিনির্ণয় করে, তখনই তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। সেইরূপ কতকগুলি কর্ম্ম রহিয়াছে, যাহাতে ভয় উৎপাদন করে, যেমন চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি, এবং এমন কর্ম্মও রহিয়াছে, যাহাতে অভয়লাভ হয় যেমন তপস্যা, ঈশ্বরপ্রণিধান, ইন্দ্রিয়সংযম, পরোপকার প্রভৃতি। যে বুদ্ধির দ্বারা অনিষ্টজনক কার্য্য পরিত্যজ্য এবং ইষ্টজনক কার্য্য গ্রাহ্য—এইরূপ প্রেরণা লাভ হয় তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—"তত্র জ্ঞানং বুদ্ধেঃ বৃত্তিঃ বুদ্ধিস্তু বৃত্তিমতী"—জ্ঞান বুদ্ধিরই বৃত্তি, জ্ঞানরূপ বৃত্তি বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। এখন দেখিতে হইবে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হয় কিরূপে? মন বিষয়ে ধাবমান হইলেই প্রবৃত্তির কার্য্য হইল, আর যখন মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় তাহাই নিবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির দিকেই জীবের স্বাভাবিক টান, কারণ তাহা আপাত-মনোরম। কিন্তু এই বিষয়-প্রবৃত্ত চিত্তে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা জীবের অতিশয় ক্লেশ ও জন্ম-মরণাদির কারণ হয়। সেইজন্য—"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি"—ক্রিয়াযোগের দ্বারা সেই ক্লেশসমূহকে ক্ষীণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ক্রিয়াদ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হয়, এইজন্য ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত থাকা উচিত এবং ক্রিয়া না করিয়া থাকা অনুচিত। যেহেতু সূক্ষ্ম ক্লেশসমূহ চিত্তলয়ের দ্বারা ত্যাজ্য। আবার এই চিত্তলয় হয়—ক্রিয়ার দ্বারা, অতএব ক্রিয়া করাই কর্ত্তব্য, এবং না করাই অকর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্মসংস্কারই কর্ম্মাশয়। কর্ম্মাশয় যতদিন থাকিবে, ততদিন ক্লেশের মূল থাকিয়া গেল। এই কর্ম্মাশয় বর্ত্তমান থাকিতে কেহই নির্ভয় হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দিয়া ক্রিয়া করেন, তাঁহার দেহবন্ধন ক্ষীণ হইয়া যায়, অর্থাৎ মনের দেহাভিমান ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদির বোধ থাকে না, আর যিনি ক্রিয়া না করেন, তাঁহার দেহাভিমান নষ্ট হয় না বরং বৃদ্ধি পায় সুতরাং উহা জন্ম-মৃত্যু-ভয়ের কারণ হয়। জন্ম-মরণাদি ক্লেশই জীবের মহাভয়, এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া মুক্তিদান করিতে পারে একমাত্র ক্রিয়া। এইজন্য ক্রিয়া করা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কাহারও যদি নাই থাকে, কিন্তু তিনি যদি ক্রিয়া নিয়মিতরূপে করিতে থাকেন, তখন তাঁহার প্রাণের সুষুম্নায় গতি হইবে। প্রাণ

(রাজসী বুদ্ধি)

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

সুষুম্নাবাহী হইলেই বুদ্ধি স্থির হয় অর্থাৎ বুদ্ধি সাত্ত্বিকী হয়॥ সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারাই বন্ধন মোচন হইয়া থাকে ॥ ৩০

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) যয়া (যে বুদ্ধির দ্বারা) ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) কার্য্যম্ অকার্য্যম্ এব চ (কার্য্য ও অকার্য্য) অযথাবৎ (অযথার্থরূপে) প্রজানাতি (বুঝে) সা (তাহা) রাজসী বুদ্ধিঃ (রাজসী বুদ্ধি) ॥ ৩১

শ্রীধর। রাজসীং বুদ্ধিং আহ—যয়েতি। অযথাবৎ—সন্দেহাস্পদত্বেন ইত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১

বঙ্গানুবাদ। [রাজসী বুদ্ধির বিষয় বলিতেছেন]—অযথাবৎ অর্থাৎ সন্দেহাস্পদতা হেতু [যাহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায়] অযথাবৎ। অন্য সমস্ত স্পষ্ট। [হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য যথাযথরূপে জানা যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি]॥ ৩১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ ক্রিয়া করা **ধর্ম্ম**—ক্রিয়া না করা **অধর্ম্ম**; ক্রিয়া করা **কর্ম্ম**— ক্রিয়া না করা **অকর্ম্ম**—যে এইরূপ যথার্থ জানে না এমত যে (অ) **স্থিরবুদ্ধি তাহার নাম রাজসিক বুদ্ধি।**—যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত ভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কার্য্যাকার্য্যের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি। স্বরূপ বুঝিতে পারে না বলিয়া সন্দেহ থাকিয়া যায়, ইহা সত্যই ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য—এইরূপ নিঃসংশয় হওয়া যায় না, সব কিছুতেই অস্পষ্ট অস্পষ্ট ভাব। আমাদের মধ্যে প্রাণরূপ যে সূত্র রহিয়াছে, তাহাই সর্ব্বভূতের পোষক বা ধারক। এই ধর্ম্মরূপী প্রাণসূত্রই যে সব, প্রাণ না থাকিলে সমস্ত লোক নিশ্চল নিস্পন্দবৎ হইয়া পড়ে, তাহা আমরা বুঝি না বলিয়াই প্রাণের প্রতি কোন আস্থা নাই। মনে হয় এই প্রাণ-ধর্ম্ম কলের ইঞ্জিনের মত কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহার সহিত আবার ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ কি ? কিন্তু এই প্রাণরূপেই ভগবান প্রতিঘটে বিরাজমান, সূত্রাত্মরূপে প্রাণই জগতের পোষক ও চালক। প্রাণ না থাকিলে কিছুই থাকে না। তাই প্রাণ-ক্রিয়া দ্বারা এই প্রাণকে দীর্ঘ করিতে হয়। প্রাণায়াম করিতে করিতে শ্বাসের আভ্যন্তরিক ও বহির্গতির রোধ হয়, এইরূপ রোধের দ্বারা জ্ঞানের অজ্ঞানমূলক আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। অজ্ঞান নষ্ট না হইলে জীবের ভববন্ধন মোচন হয় না, সেই জন্য ক্রিয়া করাই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম, এবং না করাই অধর্ম্ম। এই ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহার স্থির বুদ্ধি নাই অর্থাৎ বিশ্বাস নাই, যখন ভাল লাগে করে, যখন ভাল লাগে না করে না—এইরূপ ভাবের যে বুদ্ধি তাহাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, আত্মদর্শন হয় না, সুতরাং তাহা সাংসারিক বুদ্ধি বা রাজসিক বুদ্ধি ॥ ৩১

(তামসী বুদ্ধি)

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) যা (যে বুদ্ধি) অধর্ম্মং (অধর্ম্মকে) ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে (ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে) চ (এবং) সর্ব্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ (বিপরীত) [বলিয়া মনে করে] তমসা আবৃতা (অজ্ঞান আচ্ছন্না) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) তামসী (তামসী বুদ্ধি) ॥ ৩২

শ্রীধর। তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্ম্মমিতি। বিপরীত-গ্রাহিণী বুদ্ধিঃ তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিঃ—অন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তং। জ্ঞানং তু তদ্‌বৃত্তিঃ। ধৃতিরপি তদ্‌বৃত্তিরেব। যদ্বা—অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মিণো বুদ্ধিরপি অধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব। ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্‌বৃত্তীনাং বহুত্বেঽপি ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভয়াভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাৎ এতাসাং ত্রৈবিধ্যম্ উক্তম্। উপলক্ষণং চ তৎ অন্যাসাম্ ॥ ৩২

বঙ্গানুবাদ। [তামসী বুদ্ধি কি তাহাই বলিতেছেন]—বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিই তামসী বুদ্ধি। পূর্ব্বোক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি, জ্ঞান কিন্তু তাহার বৃত্তি, ধৃতিও তাহার বৃত্তিই। অথবা অন্তঃকরণরূপ ধর্ম্মির বুদ্ধি ও অধ্যবসায়লক্ষণই বৃত্তি। ইচ্ছাদ্বেষাদি অন্তঃকরণ-বৃত্তি-সমূহের বহুত্ব থাকিলেও ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভয়াভয়-সাধনরূপ বুদ্ধ্যাদির প্রাধান্যহেতু ইহাদের ত্রৈবিধ্য কথিত হইল। ইহা অন্যান্য বৃত্তি সকলেরও উপলক্ষণ ॥ ৩২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া না করাটাই ধর্ম্ম—সকল বস্তুতে দৃষ্টি আর ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বত্রেতে রয়েছেন তাঁহাকে দৃষ্টি করে না - এরূপ যে বুদ্ধি তাহাকে তামসিক বুদ্ধি কহে।—যে বুদ্ধি সমস্ত বিষয়কে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করায় সেই বুদ্ধি তামসী-বুদ্ধি। তামসী বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। এই বুদ্ধির নিকট দুঃখপ্রদ বস্তুকে সুখপ্রদ বলিয়া এবং যাহা অসত্য এবং অনিত্য, তাহাকে সত্য ও নিত্য বলিয়া মনে হয়, এবং যাহা যথার্থই সত্য ও নিত্য তাহাকেই অসত্য অনিত্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের এই দেহটি কিরূপ অনিত্য—কবে আছে, কবে নাই; অথচ এই দেহকে নিত্য মনে করিয়া রক্ষা করিতে আদর-যত্ন করিতে আমরা কত ব্যস্ত—যেন উহা চিরকাল থাকিবে। তামসী বুদ্ধি হেতুই ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি এবং শাস্ত্রকথিত কর্ম্ম ও আচার সমূহকে অন্ধসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। কদর্য্য ও কদন্ন গ্রহণই অকাল মৃত্যুর কারণ—এই সকল শাস্ত্রবাক্যের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া থাকি, এবং শাস্ত্রকথিত সদাচার বর্জ্জন করিয়া আস্ফালন করিয়া থাকি। শ্রেয়ঃসাধনকে ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃসাধন লইয়া জীবন অতিবাহিত করি। ক্রিয়া করা যাহা পরম ধর্ম্ম এবং প্রকৃত সুখশান্তি লাভের উপায়, তাহাকে তামসিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অহঙ্কার ও অজ্ঞতা-বশতঃ উপেক্ষা করিয়া যোগাভ্যাসাদির নিন্দা করে এবং আপনার ও অপরের কল্যাণের পথে কণ্টক রোপণ করিয়া আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করে; এবং যিনি সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, আমার অন্তরে বাহিরে যিনি বিরাজমান, যিনি নিত্য পরমপদার্থ; বিবেকান্ধতা হেতু সেই আত্মাকে বুঝিবার বা জানিবার চেষ্টা না করিয়া যাহা অনিত্য ও কষ্টদায়ক—

(সাত্ত্বিকী ধৃতি)

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ-প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

সেই সকল ভোগ্যদ্রব্যাদির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তাহা পাইলে আপনাকে ভাগ্যবান এবং না পাইলে আপনাকে দুর্ভাগা বলিয়া মনে করে। এ সমস্ত বিপরীত ভাবই তামসী বুদ্ধির লক্ষণ, কলিযুগে এইরূপ তামসী বুদ্ধির প্রভাবই অধিক হইয়া থাকে * ॥ ৩২

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) যোগেন (যোগবল প্রভাবে,একাগ্রতা বশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (বিষয়ান্তর ধারণা ব্যতিরেকে) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ (মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সমূহ) ধারয়তে (নিয়মিত হয়) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী (সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩

শ্রীধর। ইদানীং ধৃতেঃ ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতিত্রিভিঃ। যোগেন—চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনা, অব্যভিচারিণ্যা—বিষয়ান্তরম্ অধারয়ন্ত্যা, যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়া ধারয়তে—নিযচ্ছিতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

---

* ভক্ত তুলসীদাস তাঁহার রামচরিতমানসে কলিযুগের এই মোহান্ধ লোকের সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

কলিমল গ্রসে ধর্ম্ম সব গুপ্ত ভয়ে সদ্‌গ্রন্থ। দম্ভিন্‌হ নিজমতি কল্পি করি প্রগট কিয়ে বহুপন্থ ॥
ভয় লোগ সব মোহবস লোভ গ্রসে শুভকর্ম্ম। সুনু হরিজান সুজ্ঞাননিধি কহউঁ কছুক কলিধর্ম্ম ॥
বরণ-ধরম নহিঁ আশ্রম চারী। শ্রুতি-বিরোধ-রত সব নর নারী ॥
দ্বিজ শ্রুতিবেচক ভূপ প্রজাসন। কোউ নহিঁ মান নিগম-অনুশাসন ॥
মারগ সোই জা কহঁ জোই ভাবা। পণ্ডিত সোই জো গাল বজাবা ॥
মিথ্যারম্ভ দম্ভরত জোঈ। তা কহঁ সন্ত কহহিঁ সব কোঈ ॥
সোঈ সয়ান জো পর-ধনহারী। জো কর দম্ভ সো বড় আচারী ॥
জো কহ ঝুঠ মসখরী জানা। কলিজুগ সোই গুণবন্ত বখানা ॥
নিরাচার জো শ্রুতিপথ ত্যাগী। কলিজুগ সোই জ্ঞানী বৈরাগী ॥
জাকে নখ অরু জটা বিশালা। সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা ॥
অসুভ বেষ ভুষণ ধরে ভচ্ছাভচ্ছ জে খাহিঁ। তেই তাপস তেই সিদ্ধ নর পূজ্য তে কলিযুগ মাহিঁ ॥
নারিবিবস নর সকল গোসাইঁ। নাচহিঁ নটমরকট কী নাঈঁ ॥
সুদ্র দ্বিজন্‌হ উপদেশহিঁ জ্ঞানা। মেলি জনেউ লেহিঁ কু দানা ॥
সব নর কামলোভ-রত-ক্রোধী। বেদ বিপ্র গুরু সন্ত বিরোধী ॥
গুণমন্দির সুন্দর পতি ত্যাগী। ভজহিঁ নারী পরপুরুষ অভাগী ॥
* * * * * *
গুরু সিষ বধির অন্ধ কর লেখা। এক ন সুনহিঁ এক নহিঁ দেখা ॥
হরই শিষ্যধন সোক ন হরঈ। সো গুরু ঘোর নরক মহঁ পরঈ ॥
মাতুপিতা বালকন্‌হ বোলাবহিঁ। উদর ভরই সোই ধর্ম্ম সিখাবহিঁ ॥
ব্রহ্মজ্ঞান বিনু নারিনর কহহিঁ ন দুসরি বাত। কৌড়ি কারণ লোভবস করহিঁ বিপ্রগুরু ঘাত ॥

(রাজসিক ধৃতি)

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

বঙ্গানুবাদ। [অধুনা তিনটি শ্লোকে ধৃতির ত্রিবিধতা বলিতেছেন]—চিত্তের একাগ্রতা হেতু বিষয়ান্তরের ধারণা না করিয়া যে ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সমূহকে নিয়মন বা নিরোধ করা যায়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনা আপনি যখন ধারণা হ'য়ে মনের এবং প্রাণবায়ুর এবং দশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সমুদয় রহিত হ'য়ে যাবে—ধারণা ধ্যান সমাধি পূর্ব্বক স্থির—তখন আপনা আপনি থাকিবে, অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি তখন হইবে না—এ রকম ধারণা, এরই নাম সাত্ত্বিক ধারণা।—"ধ্রিয়তে অনয়া ইতি ধৃতিঃ ইতি যত্নবিশেষঃ"—(আনন্দগিরি), যে যত্ন-বিশেষদ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের ক্রিয়া নিয়মিত হয়। এই ধারণা যোগ ধারণা হওয়া চাই, সমাধিসাধন ব্যতীত ইহা হয় না। সমাধিসাধন ব্যতীত ধারণা হইলে তাহা অসিদ্ধ। সুতরাং যে ধারণা প্রাণায়াম করিতে করিতে প্রাণ বায়ুর নিরোধ হেতু মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন অন্য দিকে দৃষ্টি থাকে না, আপনাতে আপনি থাকে, তাহাই সাত্ত্বিক ধৃতি।

সাধারণতঃ আড়াই দণ্ড ইড়ায়, আড়াই দণ্ড পিঙ্গলায় ও সামান্য ক্ষণ সুষুম্নায় শ্বাস বহে। ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়া দ্বারা সুষুম্নায় শ্বাসের গতি হয়, তখন ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা স্থিরত্ব পদ লাভ হয়। এইরূপ স্থির হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনের বিষয়-গমন নিবৃত্তি হয়। ইহাই পাপশূন্য অবস্থা। ক্রিয়া করিতে করিতে মনের চাঞ্চল্য ক্ষয়ের সহিত পাপেরও ক্ষয় হইয়া থাকে, তখন মন মনেতেই লীন হইয়া যায়। ব্রহ্ম সম, সাধকও সম-ভাবাপন্ন হইয়া যান। তখন আপনার হৃদয়কে ও হৃদয়স্থ দেবতাকে অনুভব করা যায়, পরমানন্দের অবস্থা। সাধকের তখন অন্য কোন আশ্রয় বা অবলম্বন থাকে না। এইরূপ নিরাবলম্ব স্থিতিই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হয়। এই স্থিতি দ্বারাই যোগীরা মণিবন্ধের পর যে পদ তাহা লাভ করেন, ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ। শরীরেতে সর্ব্বদাই বায়ু চলিতেছে, সেই বায়ু দ্বারা ক্রিয়া করিলে সাধক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হন। এই স্থির পদই ঈশ্বর; তিনি প্রাণস্বরূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন। এই স্থিরভাব যখন বিস্তৃত হয়, তখনই মহৎ পদ লাভ হয়, তখনই ঈশ্বরের মহিমা সাধক অবগত হইতে থাকেন। এই স্থিতিপদ যত বাড়িবে, তত সাত্ত্বিকী ধৃতি হইতে থাকিবে। তখন মন বিনাবলম্বনে স্থির হইবে, বিনা চেষ্টায় বা বিনাবরোধে বায়ু স্থির হইয়া যাইবে এবং কোন বিষয়ে লক্ষ্য না থাকিলেও দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইবে। ইহারই অপর নাম—খেচরী সিদ্ধি ॥ ৩৩

অন্বয়। অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন,) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) ধর্ম্মকামার্থান্ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সকল) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ ত্যাগ করে না) তু (কিন্তু) প্রসঙ্গেন (কর্ত্তৃত্বাদি-অভিনিবেশ বশতঃ) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলাকাঙ্ক্ষী হয়) পার্থ! (হে পার্থ) সা ধৃতিঃ রাজসী (সেই ধৃতি রাজসী) ॥ ৩৪

(তামসিক ধৃতি)

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

শ্রীধর। রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া তু ইতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থ-কামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে—ন বিমুঞ্চতি, তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪

বঙ্গানুবাদ। [রাজসী ধৃতির কথা বলিতেছেন]—যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রধান বলিয়া অবধারিত হয় অর্থাৎ তাহা ত্যাগ করে না কিন্তু তৎপ্রসঙ্গ-ক্রমে ফলাকাঙ্ক্ষীও হয়—সেই ধৃতি রাজসী ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ধর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম এবং অন্যসব কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে ধারণা সে রাজসিক ধারণা।—ধর্ম্ম, অর্থ কাম লইয়াই যাহারা মগ্ন, মোক্ষ চিন্তা যাহাদের মনে স্থান পায় না, ফলাকাঙ্ক্ষাই যাহাদিগকে কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত করে ; তাহারা মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল ভোগসুখের কথাই আলোচনা করে, তাহাদের ধৃতিই রাজসিক ধৃতি। সাধনাদি অভ্যাস করিলেও ইহাদের চিত্ত বাসনারহিত হইতে চাহে না, সাধনার দ্বারা ফল কখন্ কি ফল লাভ হইবে—এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকে। ক্রিয়া করিয়া একটু স্থির হইলে, সে সময়েও ফলাকাঙ্ক্ষা করে এবং প্রসঙ্গক্রমে যদি ঐরূপ চিন্তায় কামনা সিদ্ধ হয়, তবে তাহা খুব মনে করিয়া রাখে—যদি ঐ অবস্থা পুনরায় আসে, আবার সে সময় কিছু চাহিতে হইবে। ইহা মোক্ষমার্গে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে ॥ ৩৪

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) দুর্ম্মেধা (অবিবেকী, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতির দ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিষাদং (বিষাদ) মদং চ এব (এবং গর্ব্ব) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ তামসী (সেই ধৃতি তামসী) ॥ ৩৫

শ্রীধর। তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টা—অবিবেকবহুলা মেধা যস্য সঃ দুর্ম্মেধাঃ পুরুষঃ, যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ ন বিমুঞ্চতি—পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তয়তি। স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা। সা ধৃতিঃ তামসী ॥ ৩৫

বঙ্গানুবাদ। [তামসী ধৃতির কথা বলিতেছেন]—অবিবেক-বহুলা মেধা যাহার—সেই দুর্ম্মেধা পুরুষ যে ধৃতি দ্বারা স্বপ্নাদিকে অর্থাৎ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদকে ত্যাগ করে না অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আগমন করে (প্রাপ্ত হয়) সেই ধৃতি তামসী ॥ ৩৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—স্বপ্ন, ভয়, বিষাদ, দেমাক্, এরূপ কর্ম্মেতে ধারণা সে তামসিক।—ধৃতির অর্থ ধারণা। বিগত সুখ-দুঃখাদির বা বিষাদ-শোকের যে স্মৃতি বা ধারণা আমাদের চিত্ত মধ্যে লাগিয়া থাকে, তাহাই সময়ে সময়ে মনোমধ্যে উদিত হয় এবং হইয়া আবার শোক-দুঃখ-মোহ উৎপন্ন করে—যে ধৃতি দ্বারা এইরূপ শোক-মোহকর-বিষয় মনে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়, কিছুতে ভুলিতে দেয় না—তাহাই তামসী ধৃতি। বিষয় ব্যাপারকে দুঃখকর জানিয়াও এই তামসী ধৃতির সংস্কার বশতঃই আমরা বিষয় চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত হইতে পারি না। নিদ্রাও আমাদের একটি তামসিক বৃত্তি, এবং

তাহাকে আমরা তামসী ধৃতি দ্বারা ধরিয়া রাখি ও প্রত্যহ যথানিয়মে ঘুমাইয়া পড়ি। নিদ্রা মনের এক প্রকার আচ্ছন্ন বা তমোভাব, সে সময় মনের ক্রিয়াশীলতা লোপ পায়; কিন্তু আমরা যে নিদ্রাকে ত্যাগ করিতে পারি না, তাহা নহে। ঋষি পতঞ্জলি নিদ্রাকেও মনের একটি বৃত্তি-বিশেষ বলিয়াছেন। নিদ্রাতেও এক প্রকারের প্রত্যয় হয়, যদ্দ্বারা আমরা নিদ্রা-কালীন অবস্থাকে জাগ্রত অবস্থায় স্মরণ করিতে পারি। যেমন সুখে শায়িত ছিলাম, ঘুমাইয়া মনটি আজ বেশ প্রসন্ন বোধ হইতেছে বা "প্রজ্ঞা মে বিশারদী করোতি" আমার প্রজ্ঞাকে বেশ শুদ্ধ করিতেছে—এইরূপ নিদ্রার ভাবই সাত্ত্বিক নিদ্রা, এইরূপ নিদ্রাতেই দেব-দর্শন হয়, ইষ্ট ফল লাভ হয়। আর এক প্রকারের নিদ্রা আছে তাহা রাজসিক। তাহাতে মনে হয়—আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সে মনে কিছুই ভাল লাগে না, সুখে বা সহজে কিছু স্মরণ হয় না, মন যেন অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করে; ঘুমাইতে ঘুমাইতে যা তা স্বপ্ন দেখে, জাগিয়া উঠিয়া মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইতে থাকে, ইহাই রাজসিক। আর তমোভাবাপন্ন নিদ্রায় ঘুম খুব গাঢ়ই হয় কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া মন প্রসন্ন থাকে না, শরীরের ক্লান্তি দূর হয় না বরং শরীরে যেন একটা ভার বোধ হয়, চিত্তের জড়তা ও আলস্য যেন কাটিতে চাহে না, ইহাই তামসিক ভাবের নিদ্রা। সুতরাং নিদ্রার নিরোধ না হইলেও যোগ-লাভ হয় না। আমাদের দেশে সে কালের মহাত্মারা অনেকেই জিতনিদ্র ছিলেন।

আত্ম-বিচারশীল এবং যোগীশ্বর পুরুষদের নিদ্রা, ভয়, শোক ও বিষাদ অল্পই হইয়া থাকে, কারণ এ গুলি প্রকৃতির ধর্ম্ম, আত্মার নহে। তামসিক প্রকৃতির লোকদিগের এই সকল বিষয় স্বাভাবিক ও অধিক মাত্রায় থাকে বলিয়া তাহারা ভাল হইবার চেষ্টাও ভালরূপে করিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তিরা বড় একটা সাধনের ক্লেশ সহিতে চাহে না। একদিন দৈবাৎ যদি রাত্রি জাগিয়া সাধন অভ্যাস করে, পরে তিন দিন দিবা ভাগে নিদ্রিত হয় এবং উহাতে শরীর ও মন এত জড়-ভাবাপন্ন হইয়া যায় যে, পরে কয়েক দিন আর নিয়মিত সময়ে উঠিতেই পারে না। অনেকের ধারণা নিদ্রা ভাল রূপে না হইলে রোগ হয় কিন্তু যাঁহারা রাত্রি জাগিয়া সাধনাভ্যাস করিয়া থাকেন, সেই সকল সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের অতিরিক্ত পরিশ্রমেও ক্লান্তি আসে না, এমন কি উপর্য্যুপরি দুইচারি দিন না ঘুমাইলেও দিনের বেলা ঘুম আসে না। আলস্য, নিদ্রা, ভয়—তামসের ধর্ম্ম, তমোগুণ থাকিতে যোগী বা আত্মজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। ভগবান এই ধৃতির কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হইবেন, সেই সকল পুরুষের রাজসিক তামসিক ধৃতি থাকিলে চলিবে না। রাজসিক ও তামসিকদের আত্মায় বা ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস থাকে না, তাঁহাদের সঙ্কল্পেরও কোন নিশ্চয়তা নাই, এই জন্য তাঁহারা সাধনার ফল লাভে চির-বঞ্চিত থাকেন। সাত্ত্বিক ধৃতিসম্পন্ন পুরুষ ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহাদের সাধনাভ্যাসেও আলস্য নাই, আত্মাতেও কোন সন্দেহ নাই তাঁহারা এজন্য তাঁহাদের সঙ্কল্পে অটল।

(ত্রিবিধ সুখ)

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

জ্ঞানী পুরুষ দেহ-সম্বন্ধী নহেন, সেইজন্য দেহধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। চেষ্টা করিলে লোকে জিতনিদ্র বা মৃত্যু-ভয়শূন্য হইতে পারে, কারণ যিনি যতটা আত্মস্থ, তিনি ততটা প্রকৃতির কারাগার হইতে মুক্ত। মৃত্যু ভয়, শক্তির স্বল্পতা বা দেহের অস্বাস্থ্য এ সমস্তই দেহ প্রকৃতির নিজস্ব; যিনি দেহ-প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত, তাঁহাকে প্রকৃতি-জাত গুণে বিকল হইতে হইবে কেন? আমাদের মধ্যে যে জীব রহিয়াছেন, তিনি প্রকৃতির সহিত মিলিয়াই এতটা জড়ভাবাপন্ন ও শোক-ভয়-গ্রস্ত হইয়া রহিয়াছেন। এখন তিনি তাঁহার আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনই করিতে পারেন না, এবং রোগে, শোকে, বিপদে পড়িয়া তিনি আপনাকে এত অসহায় মনে করিয়া থাকেন। আত্মা যে জন্ম-জরা রোগ-শোক-মৃত্যুরহিত, আত্মা যে অভয় ও অমৃত-স্বরূপ—এই আত্ম-কথা আলোচনা করিয়া তাঁহার সেই নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। নিজ প্রকৃত স্বরূপের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিলে এই রোগ-শোক-পরিপূর্ণ বদ্ধ জীবই আবার শোকাতিগ অবস্থা লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারে ॥ ৩৫

অন্বয়। ভরতর্ষভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) ইদানীং তু (এক্ষণে) ত্রিবিধং সুখং (তিন প্রকার সুখের বিষয়) মে শৃণু (আমার নিকট শুন), যত্র (যে সুখে) অভ্যাসাৎ রমতে (অভ্যাস দ্বারা আনন্দ লাভ করে) দুঃখান্তং চ (ও দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩৬

শ্রীধর। ইদানীং সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্দ্ধেন—সুখমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ। তত্র সাত্ত্বিকং সুখং আহ—অভ্যাসাদিতি। যত্র—যস্মিন্ সুখে, অভ্যাসাৎ—অতিপরিচয়াৎ রমতে, ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি, যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্য অন্তম্—অবসানং, নিতরাং গচ্ছতি—প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং অর্দ্ধশ্লোকদ্বারা সুখের ত্রিবিধতা বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন] —এই অর্দ্ধশ্লোকার্থ স্পষ্টই। [তাহাতে সাত্ত্বিক সুখের বিষয় বলিতেছেন] যত্র—অর্থাৎ যে সুখে নিয়ত অভ্যাস বশতঃ লোকে পরিচিত হয় এবং রতি প্রাপ্ত হয়, অথচ বিষয় সুখের মত সহসা রতি পাওয়া যায় না, এবং যাহাতে রত হইলে দুঃখের অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সুখ তিন প্রকার—অভ্যাসের দ্বারায়, ক্রিয়া করিয়া যেখানে পৌঁছায় সেখানে সুখ কিনা সুন্দর পরব্যোম দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে—দুরের অর্থাৎ দুঃখ অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দেখা।—দুঃখ কিনা দুরের খ-শূন্য; পঞ্চতত্ত্বের শূন্যাকার রং চং দেখে আসক্তিপূর্ব্বক তাহাতেই লেগে থেকে বিব্রত লোকে হয়, ইহারই নাম দুঃখ—ইহা সর্ব্বদাই সকলের হইতেছে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই দুঃখের অন্ত হয়।—ভগবান এখানে

(সাত্ত্বিক সুখ)

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

কর্ম্মতত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—জ্ঞান, কর্ম্মের আশ্রয়—কর্ত্তা, এবং কর্ম্মের সাধন—বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতির ত্রিবিধ ভেদ বর্ণনা করিলেন, এক্ষণে কর্ম্মের ফল সুখাদিরও ত্রিবিধ ভেদ দেখাইতেছেন। সুখের ত্রিবিধ ভেদ বলিতে গিয়া কিরূপ সুখ মানুষের বাঞ্ছনীয় এবং কোন সুখ অগ্রাহ্য তাহাই বলিতেছেন। ভগবান বলিতেছেন—বিষয় সুখ গ্রাহ্য নহে, তাহা পরিচিত, এবং সহজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সুখ শেষ পর্য্যন্ত সুখকর নয়, সুতরাং তাহার প্রতি আসক্ত না হইয়া এমন সুখের সন্ধান কর—যাহা সহসা পাওয়া যায় না, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং প্রকৃতই দুঃখের অবসান হয়। ইহাই সমাধি-জনিত সুখ। অভ্যাস কাহাকে বলে? যোগদর্শনে আছে,—"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।" চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলে সেই নিরোধ-প্রবাহের নাম স্থিতি। সেই স্থিতির জন্য যে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ সহকারে প্রযত্ন—তাহারই নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসের দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশের অবসান হয়। আধ্যাত্মিক ক্লেশ—মানসিক; দৈব-প্রতিকূলতায় কিম্বা পূর্ব্ব জন্ম-ফলে যে প্রতিবন্ধকাদি বিঘ্ন আসে—তাহাই আধিদৈবিক; এবং বাত-পিত্ত-কফজনিত যে শারীরিক ক্লেশ—তাহাই আধিভৌতিক। এই সব দুঃখের অন্ত হইলে যে সুখ লাভ হয়, সেই সুখ গুণ-ভেদে তিন প্রকার। সেই সুখ পাইতে হইলেও তাহার অভ্যাস করা আবশ্যক হয়। ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধককে সেই সুখময় স্থানে পৌছাইয়া দেয়, যেখানে পৌছিলে (ক্রিয়ার পর-অবস্থায়) অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দেখা, যাহা দুঃখেরই নামান্তর, তাহা আর থাকে না। কারণ সুখ হইল—সু+খ=সুন্দর আকাশ অর্থাৎ পর ব্যোম। এই পরব্যোমে স্থিতির তুল্য আর উৎকৃষ্টতর সুখ কিছু হইতে পারে না। আর দুঃ+খ তাহাই যাহা সেই পরব্যোম হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। বিষয়াসক্তি যাহার যত অধিক, সে পরব্যোম হইতে তত দূরে থাকে। পঞ্চতত্ত্বের রং চং দেখিয়াই তো লোকে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের পানে ছুটিয়া যায়, কিন্তু সেখানে শূন্য ভাণ্ড ঢং ঢং করিতেছে, সুখের আভাস আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু জীব আপাতমনোহর বস্তু পাইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পরম সুখের প্রতি উদাসীন হইয়া সমস্ত জীবনকে দুঃখ-ময় করিয়া তুলে। বিষয় পাইলে দুঃখ নষ্ট হয় না, ক্রিয়ার পর-অবস্থাই এক মাত্র দুঃখের নিবর্ত্তক ॥ ৩৬

অন্বয়। যৎ তৎ (যাহা কিছু) অগ্রে বিষম্ ইব (প্রথমে বিষের ন্যায়) পরিণামে (পরিশেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃত তুল্য) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (যাহা আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতার ফলস্বরূপ) তৎ সুখং (সেই সুখ) সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩৭

। কীদৃশং তৎ ?—যত্তদিতি। যত্তৎ কিমপি অগ্রে—প্রথমং, বিষমিব—মনঃ-সংযমাধীনত্বাৎ দুঃখাবহমিব ভবতি। পরিণামে তু অমৃতসদৃশম্। আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ আত্মবুদ্ধিঃ, তস্যাঃ প্রসাদঃ—রজস্তমো-মলত্যাগেন স্বচ্ছতয়া অবস্থানং, ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

বঙ্গানুবাদ। [সেই সুখ কিরূপ ? তাহাই বলিতেছেন]—যে সুখ মনঃ-সংযমাধীন বলিয়া প্রথমে বিষের মত দুঃখাবহ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সে সুখ পরিণামে অমৃত-সদৃশ। এবং যে সুখ আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজ—আত্মবিষয়ক যে বুদ্ধি, তাহা আত্মবুদ্ধি, তাহার যে প্রসাদ অর্থাৎ রজস্তমোরূপ মলত্যাগ হইলে বুদ্ধির স্বচ্ছরূপে যে অবস্থান, তাহা হইতে জাত যে সুখ, যোগিগণ তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলেন ॥ ৩৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—প্রথমেতে বিষের যেমন জ্বালা তদ্রূপ সৎদিগের মতি বা ক্রিয়ার কথা শুনিলেই অহংকারে আবৃত হইয়া মন গ্রাহ্য করিতে কখনই সম্মত হয়না প্রায়—কিন্তু একবার ঘাড় গুঁজে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে অমৃত অমৃত সকলেই শুনিয়াছেন কিন্তু কেহ কখন দেখেনওনি অনুভবও করেননি—তাহা ক্রিয়ার পর গুরুবাক্যের দ্বারায় উপদেশ পাইয়া তাহার অনুভব করিতে পারেন—সেই অনন্ত সুখ পাইলেই অমর পদ পায়—যাহা সুষুম্নায় থাকিয়া সেই ক্রিয়া হয়—তন্নিমিত্তে তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ কহে। সে কেবল আত্মাতে বুদ্ধি স্থির করিয়া ক্রিয়ার দ্বারায়—আত্মারই কৃপাতে পরমানন্দ লাভ হয়।—সাত্ত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ নহে। তাহা তপঃ-ক্লেশ, বৈরাগ্য, ধ্যান দ্বারা সাধিত হয়। ইহার সাধন সেই জন্য সহজ বা অনায়াসলভ্য নহে। ইহার পথ খুঁজিয়া পাওয়াও সহজ নহে এবং পথটিও সুগম নহে। ভুক্তভোগীরা জানেন, ক্রিয়া প্রথম প্রথম এমন কি—দুই পাঁচ বৎসরও ভাল লাগে না ; যদি বা কেহ এ পথ প্রথমে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেও, কিছুদিন করিয়াই কিন্তু পথের দুর্গমতা ও নীরসতা বুঝিতে পারে এবং তখন আর তাহার চিত্ত অগ্রসর হইতে চাহে না। প্রথমে একটু একটু প্রযত্নের শৈথিল্য হয়, শেষে আর সেদিকে মাড়াইতে ইচ্ছা করে না, এমন কি অনেকের সাধনায় বসিতেও ভয় বোধ হয়। কিন্তু যিনি গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া 'যা হবার হবে' বলিয়া আর ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া ঘাড় গুঁজিয়া ক্রিয়ার অভ্যাসে চিত্তকে লাগাইয়া রাখেন, তিনি একদিন না একদিন সাধনার উত্তপ্ত মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সাধনার পরাবস্থারূপ সুশীতল শান্তিময় হ্রদে অবগাহন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তিনি অমৃত পান করিয়া তখন অমর হইয়া যান। তাঁহাই সম্বন্ধে ভক্তিসূত্রের এই কথা সার্থক হয়—'স তরতি স তরতি স লোকান্ তারয়তি'—তিনি পার হইয়া যান, তিনি তো পার হনই, অন্যকেও পারে লইয়া যান। যে অমৃতের কথা আমরা মুখে বলি বা কাণে শুনি মাত্র, সেই অমৃতকে তিনি সাক্ষাৎভাবে লাভ করেন। কিন্তু এ অভ্যাস সহজ নহে ; এক তো বড় তিক্ত লাগে প্রথম প্রথম, তাহার পর দীর্ঘ কাল অভ্যাস করিতে হয়, তাহাতে স্বল্প প্রেমযুক্ত ব্যক্তির ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া

(রাজস সুখ)

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

যায়। আবার দীর্ঘকাল ও বহুদিন ধরিয়া সাধন না করিলে প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করে না। প্রাণ সুষুম্নামুখী না হইলে সে পরম সুখের আস্বাদ কেহই পায় না। মন দিয়া বহুদিন ধরিয়া ক্রিয়া করিলে আত্ম-গুরুর কৃপায় আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হইয়া যায় এবং যাহাকে শাস্ত্রে পরমানন্দ বলেন, সেই পরমানন্দ তখন সাধকের প্রাপ্তি হয়। ইন্দ্রিয়-সুখ শরীরকে লইয়া হয় কিন্তু এ সুখে শরীরকে ভুলিয়া যাইতে হয়। এ সুখসম্ভোগ কালে মনের সঙ্কল্প থাকে না, তখন মন বুদ্ধির সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, প্রাণও স্পন্দনশূন্য হয়, সুতরাং বুদ্ধিতে অন্য কোন বিচারের ঢেউ থাকে না। তখনই বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলন হয়, ইহাই সু— সুন্দরং, খং—শূন্যং। বিষয়-সংশ্রবশূন্য হেতু বুদ্ধিতে বিন্দুমাত্র বিষয়ের দাগ পড়ে না, তাহাতে কেবল আত্মাই লক্ষিত হন। নিদ্রা আলস্য হইতে যে তামসিক সুখ, বিষয়েন্দ্রিয়যোগে যে রাজসিক সুখ হয়, ইহা সে সব সুখ নহে। বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলনে যে সুখ—ইহা সেই সাত্ত্বিক সুখ। এখানে শরীরে চাঞ্চল্য নাই, মনে চাঞ্চল্য নাই, বুদ্ধিতেও চাঞ্চল্য নাই। বুদ্ধি তখন একাগ্র হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন অন্য অনুভব কিছু থাকে না,—প্রকৃত সুখ ইহাকেই বলে। আত্মা আনন্দস্বরূপ সুতরাং এক আনন্দ ব্যতীত তখন আর কিছুরই অনুভব থাকে না। বুদ্ধি তখন সেই আনন্দে মাখা হইয়া আনন্দরূপ হইয়া যায়॥ ৩৭

অন্বয়। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ) যৎ তৎ (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমম্ (অমৃত তুল্য) [কিন্তু] পরিণামে বিষম্ ইব (শেষে বিষতুল্য) তৎ সুখং (সেই সুখ) রাজসং স্মৃতম্ (রাজস বলিয়া কথিত হয়)॥ ৩৮

শ্রীধর। রাজসং সুখমাহ—বিষয়েতি। বিষয়াণাম্ ইন্দ্রিয়াণাং চ সংযোগাৎ যৎ তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখম্, অমৃতম্ উপমা যস্য তাদৃশং ভবতি, অগ্রে—প্রথমম্। পরিণামে বিষতুল্যম্। ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ। তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

বঙ্গানুবাদ। [রাজস সুখ কি, তাহা বলিতেছেন]—বিষয় আর ইন্দ্রিয়, তাহার সংযোগ জন্য যে সুখ—যেমন প্রসিদ্ধ স্ত্রীসংসর্গাদি সুখ—যাহা প্রথমে অর্থাৎ অমৃতোপম যাহার উপমা অমৃত, আর পরিণামে বিষতুল্য, কারণ ইহকালে ও পরকালে দুঃখের হেতু বলিয়া। সেই যে সুখ—তাহা রাজস বলিয়া কথিত॥ ৩৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বিষয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত আসক্তি পূর্ব্বক দেখাতে প্রথম বোধ হয় বাঁচলাম এমন উত্তম বস্তু পাইয়াছি বলিয়া মৈথুন করিতে থাকে কিন্তু এই মন স্থির করিয়া যে আমি অমর মরব না, আমি কি মরব? যে আমাকে মর বলে, সে মরুক—যিনি মৃত্যু কখন বিবেচনা

করেন না তিনিও মরবেন ও যিনি মর্ বলিতেছেন, তিনিই কোন্ বেঁচে থাকবেন—অর্থাৎ দুই জনেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত, তথাপি ছেলে মানুষের মতন মিথ্যা কথাবার্ত্তাকে সত্য বিবেচনা করেন, অতএব কথাই মন্দ যাহা না বলিয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি মৌন হইয়া যায়। পরিণামেতে ঐ মৈথুনের পর কোন পচা যোনিতে লিঙ্গ দিয়া বিষের মত জ্বালা উপস্থিত হয়—ইহারই নাম রাজসিক সুখ।—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদির সহিত শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দের সংযোগ হইলেই যে এক প্রকার সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম বলিয়া মনে হয় এবং উহা পাইবার জন্য আমাদের চিত্ত কি ব্যগ্রই না হয়! মনে হয় এমন সুখকর বস্তু আর নাই—কিন্তু স্ত্রী-সঙ্গম প্রভৃতি এই সব সুখের সমাপ্তি কালে এক পরিণাম-বিরস-ভাব আনিয়া দেয়, যাহাতে ঐ সকলকেই আবার ক্ষণকাল পরে বিষতুল্য বলিয়া মনে হয়,—মনে কত ঘৃণা ও সেই সকল সুখকে কত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে—এইরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পরিণাম আরও ভয়াবহ, কারণ উহাতে বল, বীর্য্য, রূপ, মেধা, ধন ও উৎসাহ সবই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কত অধর্ম্মের আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহার পরিণামে জীবকে নরকাদি মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মানুষ এই সামান্য সুখের মোহে পাগলের মত নিজের কত অনিষ্ট করে, নিজের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত করিয়া তুলে, তাহা স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে হৃৎকম্প হইতে থাকে। এখন সাত্ত্বিক সুখের সহিত রাজসিক সুখের তুলনা করিলে দেখা যায় রাজসিক সুখ সাত্ত্বিক সুখের ঠিক বিপরীত। রাজসিক সুখ অগ্রে অমৃততুল্য পরে বিষের মত জ্বালাপ্রদ, সাত্ত্বিক সুখ প্রথমটা বিষের মত অনুভব হয় বটে, কিন্তু পরে অমৃতের মত বোধ হয়। রাজসিক সুখের সাধনায় কোন কষ্ট নাই, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই হইল, কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ সহসা লাভ করা যায় না, এজন্য সাধন করিতে হয়; অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণ তিক্ত হইয়া উঠে কিন্তু যখন একবার আরম্ভ হইয়া যায়, তখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয় এবং সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। তখন মনে যে প্রসন্নতা আসে, তাহার সহিত আর কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না, এবং সে সুখ একমাত্র আত্মজ্ঞান হইতেই লাভ হইতে পারে। আত্মজ্ঞানে যাহাদের নিষ্ঠা নাই, তাহারা বাহ্যবস্তু হইতে সুখের আশা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল সুখের জন্য বহু দুর্গতি তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় এবং তাহার পরিণামেও নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগ ভোগ করিতে হয়, এবং পরকালেও নিরয় গমন হইয়া থাকে। রাজসিক সুখ মাত্র বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন, সেইজন্য তাহা চঞ্চল, এবং এই সুখের জন্য অন্য বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয় না, তাহা মন, প্রাণ ও বুদ্ধির স্থিরতা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাহা অচঞ্চল, এবং তাহা বিষয়মিশ্রিত নহে, এজন্য উহা নির্ম্মল এবং আকাশবৎ স্বচ্ছ ও সর্ব্বতোমুখী। তাহা কেবল পরমানন্দ স্বরূপ, তাহাতে দুঃখের ঢেউ উঠে না। রাজসিক সুখ দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগজাত এবং সাত্ত্বিক সুখ দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত অবস্থা হইতেই লাভ হয়॥ ৩৮

(তামস সুখ)

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯

অন্বয়। যৎ চ সুখং (আর যে সুখ) অগ্রে অনুবন্ধে চ (প্রথমে ও পশ্চাতে) আত্মনঃ মোহনং (বুদ্ধির মোহকর হয়) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে জাত) তৎ (সেই সুখ) তামসম্ উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়)॥ ৩৯

শ্রীধর। তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রেচ—প্রথমক্ষণে, অনুবন্ধে চ—পশ্চাদপি, যৎ সুখং আত্মনো মোহকরং। তদেবাহ—নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ—কর্ত্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যম্ এতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্॥ ৩৯

বঙ্গানুবাদ। [তামস সুখের কথা বলিতেছেন]—যাহা প্রথমে ও পশ্চাতে আত্মার মোহকর এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ—কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনবধানতা বশতঃ মনোগ্রাহ্য—এই সকল বিষয় হইতে উৎপন্ন যে সুখ তাহা তামস বলিয়া কথিত॥ ৩৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমেই মনটাকে বেঁধে ফেলে কিঞ্চিৎ অল্প সুখের জন্য মোহিত করিয়া দেয়—সে নিদ্রাতে প্রথমেই অনুভব হয়—যদ্যপি কেহ যখন বাধা করে তখন অনুভব হয়। আলস্যেতেও তদ্রূপ। এবং রাগেতেও কিম্বা কোন বিষয়ে প্রমত্ততা পূর্ব্বক আসক্তির সহিত দৃষ্টি করা—ইহাকে তামসিক সুখ কহে অর্থাৎ কিছুই দেখিতে পায় না।—যে সুখ আত্মজ্ঞান হইতেও উৎপন্ন নহে কিম্বা বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃও নহে, যাহা নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই তামসিক সুখ। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়াও আবার দিনের বেলায় ভোঁস ভোঁস করিয়া ঘুমায়, সামান্য জপ ধ্যানেও মনোনিবেশ করিতে পারে না, যদি করে কেবল ঢুলে। অথবা না ঘুমাইলেও বিছানায় পড়িয়া আছে, অল্পক্ষণও বসিতে পারে না, একটু বসিলেই শুইতে ইচ্ছা করে। জাগিয়া আছে অথচ একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত তাহা কিছুতেই করিবে না, করিতে বলিলে রাগিয়া উঠে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় শুইয়া বসিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিয়া লোকে কি সুখ পায়? অবশ্য ইহাতে কোন বস্তু লাভ নাই, ভোগাদির মত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা চিত্তবিশ্রান্তি হেতু এ সুখ নহে, মনে হয়তো শত কল্পনা করিতেছে, কিন্তু উঠিতে বলিলে বা কিছু করিতে বলিলেই রাগিয়া যাইবে—তাহাতেই মনে হয় এই আলস্য জড়তার মধ্যেও একপ্রকার সুখ আছে, নচেৎ ছাড়িতে চায় না কেন? কিন্তু তাহা বস্তুতত্ত্বতা শূন্য। ইহা এক প্রকার বুদ্ধির আচ্ছন্ন ভাব মাত্র। মাদক দ্রব্য গ্রহণেও এই জাতীয় সুখানুভব হয়। ইহাতে কিন্তু বড় ক্ষতি করে, এই তমোভাব হেতু দেহ ও মনের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসে, জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া যায়, কোন কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারে না। আলস্য ও অতিনিদ্রার ফলে অনেক শক্তিমান পুরুষও জীবনে সফলতা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। তীক্ষ্ণ প্রতিভা থাকিলেও আলস্যে তাহার গতি সুমন্দ হইয়া যায়। তমোগুণে একপ্রকার মত্ততা আনে, কোন প্রকার বিচার থাকে না,—মদ খাইয়া সারারাত নালায়

(ত্রিগুণ হইতে কেহই মুক্ত নহে)

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০

পড়িয়া গড়াগড়ি যায়, আবার সকালে উঠিয়া শুঁড়ি বাড়ী ছুট্! এই দশা দেখিয়া লোকে কত ঘৃণা করে, আত্মীয়েরা কত গালাগালি করে, স্ত্রী পুত্রের কষ্টের সীমা থাকে না, তবুও এই সামান্য সুখের লোভ ছাড়িতে পারে না—এই শ্রেণীর সুখকেই তামসিক সুখ বলে॥ ৩৯

অন্বয়। পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (অথবা দেবগণের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং নাস্তি (সেরূপ প্রাণী বা বস্তু নাই) যৎ (যাহা) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) এভি ত্রিভিঃ গুণৈঃ (এই তিনটী গুণ কর্তৃক) মুক্তঃ স্যাৎ (বিমুক্ত)॥ ৪০

শ্রীধর। অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থম্ উপসংহরতি—ন তদিতি। এভিঃ প্রকৃতিসম্ভবৈঃ—সত্ত্বাদিভিঃ গুণৈঃ, মুক্তং—হীনং, সত্ত্বং—প্রাণিজাতম্। অন্যৎ বা যৎ স্যাৎ তৎ পৃথিব্যাং—মনুষ্যলোকাদিষু দিবি দেবেষু চ ক্বাপি নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৪০

বঙ্গানুবাদ। [যাহা পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই তাহা সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনটী শ্লোক দ্বারা প্রকরণার্থ উপসংহার করিতেছেন]—এই প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্বাদি ত্রিগুণ হইতে মুক্তপ্রাণ যে সত্ত্ব (প্রাণি সমূহ) বা "অন্য" অর্থাৎ প্রাণহীন বস্তু কেহই নাই। পৃথিবীতে মনুষ্যের মধ্যে বা স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যেও কেহ নাই যিনি গুণমুক্ত হইতে পারেন॥ ৪০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গে দেবতারা অর্থাৎ ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিরা—এই প্রকৃতিতে তিনগুণ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণ হইতে মুক্ত তাহার তুল্য কেহই নাই।—প্রকৃতির পরিণাম এই জগৎ, সুতরাং জগতের কোন বস্তু বা কোন প্রাণীই সত্ত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত নহে। সত্ত্বাদি গুণ যখন রহিয়াছে তদনুযায়ী তখন কর্ম্মও হইতে থাকিবে। এই সকল ভেদ দেখাইবার জন্য ভগবান জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখেরও ত্রৈবিধ্য দেখাইলেন। যদ্দারা লোকে বুঝিতে পারিবে কোন্ প্রকার কর্ম্ম করণীয় এবং কোন প্রকার কর্ম্ম ত্যাজ্য। সর্ব্বভূতে একাত্মতার জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। এবং যিনি সাত্ত্বিক কর্ত্তা হন, সাত্ত্বিক জ্ঞান হেতু আসক্তিরহিত হইয়া কর্ম্ম করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহার বুদ্ধিও সাত্ত্বিক এইজন্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান নিশ্চয় সুদৃঢ়, সুতরাং যে কর্ম্মে বন্ধন হইবে তাঁহার বুদ্ধি সে কর্ম্মে কখনই প্রবৃত্ত হইবে না। কেন তাঁহার এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না? তাহার কারণ তাঁহার ধৃতি সাত্ত্বিক অর্থাৎ সমাধিসাধন দ্বারা বুদ্ধি মালিন্যরহিত সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ যে তাঁহাকে বাত্যাভিহত তরণীর ন্যায় যেথায় সেথায় নিক্ষেপ করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এবং এইরূপ সংযমের ফল যে পরমানন্দ তাহা সাত্ত্বিক কর্ত্তা নিশ্চয় পাইবেন, অতএব এ নির্ম্মল আনন্দ ছাড়িয়া তিনি যে আবার বিষয়ের মলিন বারি পান করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। তাই ভগবান এই সকল গুণজাত কর্ম্ম, বুদ্ধির ভেদ দেখাইয়া সাধককে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে আত্মা নির্গুণ

(কর্ম্ম বিভাগ ও তদনুযায়ী ত্রিবর্ণ)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১

সুতরাং কোন কর্ম্মের ফল তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব সেই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে কিছুতেই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যাইবে না। কিন্তু এই গুণত্রয়ই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান অন্তরায়। তাই বলিতেছেন গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বই নির্ম্মল ও প্রকাশধর্ম্মী, সুতরাং যদি সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিতে পার তবে ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ করিবে, ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভব করিবে। তাঁহার প্রকাশ অনুভূত হইলেই আর গুণত্রয় জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ইড়া পিঙ্গলায় যতদিন প্রাণের প্রবাহ চলিতে থাকে ততদিন সংসার দৃষ্টি নষ্ট হয় না। এইজন্য ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রিয়ার অভ্যাসে প্রাণ সুষুম্নাবাহী হইলেই বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র শব্দের দর্শন ও শ্রবণ হইতে থাকে। অচেনা অজানা দেশের সেই সব বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিতে পারিলে চিত্ত আর বাহ্য জগতের চিত্র দর্শনে তখন ব্যাকুল হইবে না, পরে সুষুম্নায় প্রাণ থাকিতে থাকিতে আপনা আপনিই গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইবে। যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, দধির মধ্যে ঘৃত থাকে, স্রোতর মধ্যে জল ও কাষ্ঠে অগ্নি থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতির মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন এবং প্রকৃতিও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে, ক্রিয়া দ্বারা দেহ-প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে পরাবস্থারূপে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কূটস্থে থাকিতে থাকিতে অনুভব হয় যেন আত্মাকে দেখিতেছি, পরে আর দ্রষ্টা আমিও থাকে না। যেমন দুগ্ধের প্রতি অণুর মধ্যে ঘৃত থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মা সর্ব্বের মধ্যেই প্রকাশিত রহিয়াছেন। কূটস্থে থাকিতে থাকিতে এই বোধ নিশ্চয় হইয়া যায়। সুতরাং ক্রিয়ার অভ্যাস করিয়া কূটস্থ দর্শনের যোগ্যতা আবশ্যক। তাহা হইলে সাধক ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণকে অতিক্রম করিতে পারিবেন। এই তিনগুণে দেবতা, মনুষ্য, ইতর প্রাণী সকলেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে জীবের দুঃখভোগের অবসান হইবে না॥ ৪০

অন্বয়। পরন্তপ! (হে পরন্তপ) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (স্বভাবজাত গুণানুসারে) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে)॥ ৪১

শ্রীধর। নমু চ যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব তর্হি কথম্ অস্য মোক্ষঃ? ইতি অপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাৎ তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ইত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকরণান্তরং আরভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। হে পরন্তপ—হে শত্রুতাপন, ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং চ শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি—প্রকর্ষেণ বিভাগতো নিহিতানি। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ। স্বভাবঃ—সাত্ত্বিকাদিঃ,

প্রভবতি—প্রাদুর্ভবতি যেভ্যঃ তৈঃ গুণৈঃ উপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা, স্বভাবঃ—পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারঃ, তস্মাৎ প্রাদুর্ভূতৈঃ ইত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ। সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃ-প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ। তম উপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্যাঃ। রজ উপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১

বঙ্গানুবাদ। [যদি ক্রিয়া, কারক, ফলাদি এবং প্রাণিসমূহ—এ সমস্তই ত্রিগুণাত্মক হয়, তবে প্রাণীর মুক্তি কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে স্ব স্ব অধিকার বিহিত কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিলে তৎ প্রসাদলব্ধ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়—এইরূপ সর্ব্বগীতার্থসার সংগ্রহ করিয়া দেখাইবার জন্য "ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে অধ্যায়সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রকরণানন্তর বলিতেছেন] হে শত্রুতাপন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কর্ম্ম সকল প্রবিভক্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বিভাগত বিহিত হইয়াছে। [দ্বিজত্বরূপে ত্রিবর্ণের একত্ব থাকায় উঁহাদের সমাস হইয়াছে, দ্বিজত্বের অভাব হেতু "শূদ্রাণাং" পদটীর সহিত সমাস করা হয় নাই] বিভাগের উপলক্ষণ (অর্থাৎ কিসের দ্বারা বিভক্ত হইল) বলিতেছেন—"স্বভাব প্রভবৈগুণৈঃ"—স্বভাব যে সাত্ত্বিক রাজসিকাদি তাহা হইতে প্রভূত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হয় যে সকল গুণ, সেই সকল গুণের লক্ষণ দ্বারা; অথবা স্বভাব-পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার তাহা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় যে সকল তাহাদের দ্বারা। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান। ক্ষত্রিয় সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান। বৈশ্য তমো উপসর্জ্জিত (মিশ্রিত) রজঃ-প্রধান। শূদ্র রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান ॥ ৪১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যিনি যেমন যেমন কর্ম্ম করেন তাঁহাদিগের সেই সেই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—স্বভাব অর্থাৎ আত্মাতে থেকে আটকিয়ে থাকা ক্রিয়ার পর অবস্থা ইহার দ্বারায় যাহার যে রকম গুণ হয়, সে সেই রকম জাতিতে বিভক্ত।—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই এই সংসারের কারণ, মায়া যদি সেই ভগবানেরই হয় তবে সেই মায়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছে ও থাকিবে, সুতরাং তাহার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব হইতে পারে না—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য কি উপায়ে এই সংসার-কারণের নিবৃত্তি হইতে পারে ভগবান সেই উপায় এইবার বলিবেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্বরজস্তমোগুণ এই অব্যয় দেহীকে আবদ্ধ করে। সুতরাং এই গুণত্রয়কে যে অতিক্রম করিতে না পারে তাহার স্ব স্বরূপে অবস্থান বা মুক্তিলাভের আশা নাই। কঠিন হইলেও গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায়, ভগবদ্ভক্তি ও অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা। তবে অসঙ্গ-শস্ত্র লাভের জন্য ও ভগবদ্ভক্তির জন্য জীবকে উপযুক্ত হইতে হয়। জীবকে ইহার অধিকারী করিবার জন্যই বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আবশ্যকতা। সমস্ত জীবই একবারে ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে না, এই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিজন্মে মানুষকে প্রযত্ন করিয়া যাইতে হয়। এই প্রযত্নের ফলে বেদমার্গে অধিকার জন্মে। তখন নিজ নিজ সাধন ও চেষ্টানুযায়ী কেহ বৈশ্য, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বা ব্রাহ্মণ হয়। এই অধিকার লাভের পূর্ব্বে সকলেই শূদ্র থাকে। এখন এখানে সংশয় হইতে পারে ভগবান সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তবে তিনি আবার পৃথক পৃথক বর্ণ ও ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন কেন? সেই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন যে

চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির জন্য কেহই দায়ী নহে,—ইহা "স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ" পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারই স্বভাব, সেই স্বভাবানুযায়ী সকলের জন্ম হয়। কেহ তাহাদিগকে ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্রাদিরূপে সৃষ্টি করে নাই; বা ইহা কাহারও স্বকপোলকল্পিত নহে। স্বভাবই ইহার কারণ। এই স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে থাকিলে গুণের তারতম্যানুসারে কর্ম্মেরও পৃথক পৃথক বিভাগ হইবে এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি চতুর্ব্বর্ণও উৎপন্ন হইবে। যেখানে সত্ত্বগুণাধিক্য থাকে সেখানে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণ যেখানে—সেখানে ক্ষত্রিয়, তমোমিশ্রিত রজোগুণই বৈশ্যস্বভাবের কারণ, এবং রজোমিশ্রিত তমোগুণই শূদ্রস্বভাবের কারণ। মনুষ্যের পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কারই স্বভাব, সেই স্বভাব হইতে গুণ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টপদার্থ সমূহ (স্থাবর জঙ্গম) চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। যাহারা স্ববর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহারা পরজন্মে আরও উচ্চবর্ণের মধ্যে জন্মলাভ করেন, এবং এইরূপে ব্রাহ্মণকুলে আসিয়া ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিয়া মুক্তিলাভের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া যদি সদাচারভ্রষ্ট হন, তবে তাঁহার উন্নতির পথে বিঘ্ন আসিয়া পড়ে, তিনি হয়তো আবার পরজন্মে শূদ্রত্ব লাভ করিতেও পারেন, এবং "শূদ্রও সদাচার-নিরত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তিনি পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন"—(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব)। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে এই জন্মেই তাঁহার পতন অনিবার্য্য। এইজন্য বোধ হয় ব্রাহ্মণকে অত্রিসংহিতায় দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাই দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন পুরুষকেও ব্রাহ্মণ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। তবে ব্রাহ্মণসন্তানের শুভ মার্গে চলা অন্যবর্ণ অপেক্ষা সহজসাধ্য, কারণ তিনি যে স্বাভাবিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন তাহার পক্ষে সৎপথে চলা অন্যবর্ণ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়াই মনে হয়। অন্তর্লক্ষ্যের কথা এই—যখন পিঙ্গলায় শ্বাস বহে তখন যে সকল কর্ম্ম হয় তাহা শূদ্রের অনুরূপ তমোগুণান্বিত অর্থাৎ সে তখন শোকে মোহে মুহ্যমান থাকে। যখন আবার ইড়ায় শ্বাস চলে তখন রজোগুণ প্রবল হয়, কর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়বাসনার তখন আর অন্ত থাকে না—ইহাই বৈশ্যভাব, তখন মন কেবল ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত, কিসে দুপয়সা লাভ হইবে, কিরূপে ধন বৃদ্ধি হইবে এইরূপ বিবিধ তৃষ্ণায় জীব তখন ব্যাকুল। তখন ধর্ম্মকার্য্য কিছু করিলেও তাহার লাভালাভের হিসাবের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি থাকে। যখন সুষুম্নায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হয় এবং মধ্যে মধ্যে অন্য পথেও চলে, তখনই ক্ষত্রিয় ভাব। তখন ইচ্ছা থাকে, কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম তখন ভগবৎ-প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হয়। সত্ত্বগুণ প্রবল বলিয়া লোকে বিপদে পড়িলে যতদূর পারে ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন জীব বিপন্নকে সাহায্য করিবেই। পরের দুঃখ মোচনের জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্ব লুটাইয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। যাহাতে জীবের ভবরোগ নিবারণ হয় এজন্য সকলকে সদুপদেশ দান করিয়া নিরুপায় জীবকে সাধনার পথ দেখাইয়া দিয়া তাহার যথার্থ উপকার সাধন ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন সাধক করিয়া থাকেন। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন তাই সকল জীবকে আত্মোপম বলিয়া দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন। যাঁহাদের শ্বাস বেশীর ভাগ

(ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক বা গুণ কর্ম্ম)

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

সুষুম্নায় চলে এবং মধ্যে মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত অবস্থাও লাভ করে, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা আরও প্রযত্ন করিলে গুণাতীত অবস্থায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। তখন তাঁহারা সর্ব্ব বর্ণের অতীত হইয়া প্রকৃত ত্যাগী হইয়া থাকেন। বাহিরের দেহটী তাঁহার শূদ্র, বৈশ্য অথবা ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি তখন ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্ববর্ণের নমস্য। এই সকল মুক্ত পুরুষদের প্রকৃতপক্ষে কোন জাতি নাই, তাঁহারা গুণাতীত, এইজন্য গুণকর্ম্মের বিভাগের কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটে না। সেইজন্য দেখা যায় কবির, দাদু, নানক, যবন হরিদাস নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণবৎ পূজিত হইয়াছেন এবং অনেক সদ্ব্রাহ্মণ তাঁহাদের চরণাশ্রয় করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছেন ॥ ৪১

অন্বয়। শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ মনঃসংযম), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম), তপঃ (তপস্যা), শৌচং (শৌচ), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জ্জবং (সরলতা, কুটিলতা-শূন্য) জ্ঞানং (জ্ঞান, পাণ্ডিত্য), বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান—তত্ত্বানুভব) এবং চ আস্তিক্যম্ (ও আস্তিকতা,—পরলোক ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস এবং বেদাদিতে শ্রদ্ধা) ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ (ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত কর্ম্ম) ॥ ৪২

শ্রীধর। তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি। শমঃ—চিত্তোপরমঃ। দমঃ—বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ। তপঃ—পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি। শৌচং—বাহ্যাভ্যন্তরং। ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা। আর্জ্জবম্—অবক্রতা। জ্ঞানং—শাস্ত্রীয়ং। বিজ্ঞানম্—অনুভবঃ। আস্তিক্যম্—অস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ। এতৎ শমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাৎ জাতং কর্ম্ম ॥ ৪২

বঙ্গানুবাদ। [তাহাতে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম সকলের কথা বলিতেছেন]—শম চিত্তের উপরম, দম বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরম, তপঃ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শরীর সম্পাদ্য তপস্যাদি, শৌচ বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি, ক্ষান্তি ক্ষমা, আর্জ্জব অবক্রতা, জ্ঞান শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান অনুভব, আস্তিক্য পরলোক আছে এইরূপ নিশ্চয়। এই সকল শমাদি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এক্ষণে সকলের কর্ম্ম বিশেষ করিয়া বলিতেছি :—শম—ক্রিয়ার পর অবস্থা সকলকে সমানরূপে দেখা ও ষড় ইন্দ্রিয় দমন করা; কুটস্থ ব্যোমেতে থাকা—শৌচ—ব্রহ্মেতে থাকা, সব বিষয় হইতে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম হইতে নিরস্ত—যাহা মনে তাহাই বলে—জ্ঞান—যোনিমুদ্রায় দেখে—দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যেখানে দিনরাত কিছুই নাই সেখানে সব দেখে কিছু বস্তু বা ঈশ্বর ব্রহ্ম আছেন এরূপ যে জানে সেই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করে—আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি থাকিয়া।—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভা-

(ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম)

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

বিক ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় হইয়া থাকে। তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন এজন্য তিনি সকলকে সমানভাবে দেখিতে পারেন। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার স্বভাবতঃই অন্তর্মুখ এইজন্য তাঁহার বাহ্য ক্রিয়া অধিক হয় না। কূটস্থে তাঁহার স্বাভাবিক লক্ষ্য, এইজন্য মন তাঁহার শূন্যবৎ হইয়া যায়। তাঁহার ব্রাহ্মী স্থিতি সর্ব্বদা, কোন কর্ম্মেই সেইজন্য তাঁহার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, কাহারও দোষ তিনি গ্রহণ করেন না সুতরাং সর্ব্বদা ক্ষমা তাঁহাকে ভজনা করে। তিনি যোনিমুদ্রায় কত কি দেখেন, দেখিয়া কত নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেন; যে জ্ঞান বাহ্য চেষ্টায় হইতে পারিত না, কূটস্থের ভিতর তিনি সেই সব দেখেন। তিনি বিজ্ঞান পদে আরূঢ় হন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নেশায় ভোর হইয়া সকলের মধ্যে যে এক ঐক্য রহিয়াছে তাহা তিনি অনুভব করেন। সেই অবস্থায় যোগীর অনুভব হয় যে তথায় দিবা রাত্রি কিছুই নাই অথচ একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে কোন সন্দেহই আসে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনাতে আপনি থাকিয়া তিনি ব্যবহারিক কর্ম্মাদি যাহা কিছু করেন তাহা সবই তখন ব্রাহ্মকর্ম্ম। ভগবানের অস্তিত্বে 'বিশ্বাসই সাধকের চরম উপলব্ধি। "অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি"—"আত্মা আছেন" ইহার নিশ্চিত উপলব্ধি যাহার হয় সেই উপলব্ধিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমাধি-সাধন দ্বারাই এই অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতে পারে। (১৩শ ও ১৭শ অধ্যায়ে এগুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)॥ ৪২

অন্বয়। শৌর্য্যং (পরাক্রম), তেজঃ (বীর্য্য), ধৃতি (ধৈর্য্য), দাক্ষ্যং (কার্য্যে কুশলতা) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্ (এবং যুদ্ধে অপলায়ন), দানম্ (মুক্তহস্ততা, ঔদার্য্য) ঈশ্বরভাবঃ চ (প্রভুশক্তি বা নিয়ন্তৃত্ব), ক্ষাত্রং (ক্ষত্রিয়ের) স্বভাবজং কর্ম্ম (স্বভাবজাত কর্ম্ম)॥ ৪৩

শ্রীধর। ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং—পরাক্রমঃ। তেজঃ—প্রাগল্ভ্যং। ধৃতিঃ—ধৈর্য্যম্। দাক্ষ্যং—কৌশলং। যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্—অপরাঙ্মুখতা। দানম্—ঔদার্য্যম্। ঈশ্বরভাবঃ—নিয়মনশক্তিঃ। এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম॥ ৪৩

বঙ্গানুবাদ। [ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিতেছেন]—পরাক্রম, তেজঃ প্রাগল্ভ্য অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, উদারতা, শাসন ক্ষমতা এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম॥ ৪৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শৌর্য্যং—ক্রিয়া করা—তদ্দ্বারায় ক্ষমতা দেখান; ধৃতি—আপনা আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, দাক্ষ্যং অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়া করা গুরুবাক্যের দ্বারা যাহা লভ্য—ক্রিয়া করিতে হটে না অর্থাৎ দিবারাত্রি ক্রিয়া করে, ক্রিয়া দান করে, সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর হৃদয়েতে স্থিতি—

(বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম)

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

এই ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম, এই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া।—ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম (১) শৌর্য্য—অষ্টপ্রহর ক্রিয়া করা এবং (২) তেজঃ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার ফল বিভূতি ইত্যাদি দেখাইতে পারা। ক্রিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক করিতে করিতেই সাধকের অন্তঃশক্তির বিকাশ হয়। যদিও শক্তিলাভই যোগাভ্যাসের লক্ষ্য নহে, কিন্তু শক্তির বিকাশ হইতে বুঝা যায় সাধকের সাধনা ঠিক পথেই চলিতেছে। কিন্তু যোগীর পরিশেষে গুণ-বৈতৃষ্ণ্যরূপ পরবৈরাগ্য হইতে বিষয়ের প্রতি পরম উপেক্ষা আসিয়া যায়। তখন যোগী মনে করেন—"প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নঃ শ্লিষ্টপর্ব্বা ভবসংক্রমঃ"—(যোগভাষ্য)—যাহা প্রাপণীয় তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে সকল ক্লেশ ক্ষয় করা উচিত সে সকল ক্ষীণ হইয়াছে, ভবসংক্রম অর্থাৎ জন্ম মরণরূপ প্রবাহ ছিন্ন এবং শ্লিষ্টপর্ব্ব হইয়াছে। (৩) ধৃতি—যাহা লাভ করিলে সাধক আর কিছুতেই অবসন্ন হন না। যাঁহার লক্ষ্য স্থির হইয়া গিয়াছে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিলাভ হইয়াছে, তাঁহারই প্রকৃত ধৃতি লাভ হইয়াছে। আজ্ঞাচক্রে অবিচ্ছেদে স্থিতি হইতেই ইহা সম্ভব, অত্যন্ত উগ্রসাধক না হইলে ইহা হইবার নহে। (৪) দক্ষতা—অর্থাৎ চতুরতা, যিনি সর্ব্বদা ক্রিয়া করেন একেবারে সময় নষ্ট করেন না, লাগিয়াই আছেন ক্রিয়াতে—তিনিই চতুর। (৫) অপলায়ন—সাধন পথে সময়ে সময়ে প্রভূত বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন কি মৃত্যু আসন্ন তবুও তিনি সাধনা ছাড়িয়া দেন না। (৬) দান—একদিকে যেমন বিষয়াদির প্রতি নিস্পৃহভাব হেতু মুক্তহস্ত, অপরদিকে লোককে সৎপথে আনিবার চেষ্টা, ক্রিয়াদান যাহাতে জীবের ভবক্ষুধা নিবারণ হয়। (৭) ঈশ্বরভাব—ক্রিয়ার পর হৃদয়ে স্থিতিলাভ, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ। কূটস্থে সোনার মত যে বর্ণ দেখা যায় তাহার মধ্যে সূর্য্যের মত রথচক্র যাহাকে সুদর্শন চক্র বলে, তাহারই মধ্যে যে দেব বা পুরুষোত্তম রহিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর। পুরুষোত্তম রূপ যখন দেখা যায় তখন এক ব্রহ্ম বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু তখনও এক হওয়া যায় না। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় দ্রষ্টাও ব্রহ্ম হইয়া যান, তখন পুরুষোত্তম ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান॥ ৪৩

অন্বয়। কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম (বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম)। শূদ্রস্য অপি (আর শূদ্রের) পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম (সেবা কর্ম্ম) স্বভাবজম্ (স্বভাব সিদ্ধ)॥ ৪৪

শ্রীধর। বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্ম আহ—কৃষীতি। কৃষিঃ—কর্ষণম্। গাং রক্ষতীতি গোরক্ষঃ তস্যভাবো গোরক্ষ্যং—পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং—ক্রয় বিক্রয়াদি, এতৎ বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিক পরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম্ম। ৪৬

বঙ্গানুবাদ। [বৈশ্য ও শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিতেছেন]—কৃষি—কর্ষণ, গোরক্ষ্য—গোরক্ষা যে করে সে গোরক্ষ, তাহার ভাব অর্থাৎ পশু-পালন। বাণিজ্য—ক্রয়বিক্রয়াদি, ইহা বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ৪৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কেবল ক্রিয়া করে. গো শব্দে জিহ্বা. তাহাই উপরে উঠিয়া রাখে আর ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ক্রিয়া করে. এরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যাহারা করে তাহারা বৈশ্য। আর কেবল আত্মাতে থাকে এই উপযুক্ত ক্রিয়া পাইবার নিমিত্তে যে কর্ম্ম করে সে শূদ্রেরই—ঐ আত্মাতেই থেকে স্থির থাকে।—তমঃ সংমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্যই বৈশ্যত্ব, তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। কৃষি কর্ষণ করা, যিনি দেহরূপ ক্ষেত্রকে কর্ষণ দ্বারা উন্নত করেন। প্রাণায়ামই কর্ষণ ক্রিয়া—তাহা দেহরূপ ক্ষেত্রে করিলে দেহপ্রকৃতির জড়ত্ব ঘুচিয়া যায় এবং স্বভাবচরিত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধন হয়। এইজন্য ইঁহাকে গোরক্ষা করিতে হয়। গো শব্দে জিহ্বা এবং ইন্দ্রিয়। জিহ্বাকে তালুমূলে রাখিয়া প্রাণায়ামাদি করিলে প্রাণায়ামের উৎকর্ষ সাধন হয়, এবং সেই সাধককে যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিবার চেষ্টা করিতে হয় নচেৎ ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি বা গো-পালন হয় না। গো-পালন না হইলে কর্ষণ ক্রিয়া ভালরূপে সুসম্পন্ন হয় না এবং কর্ষণের যে ফল জ্ঞান বা শান্তি তাহাও লাভ হয় না। বৈশ্যদের বাণিজ্যও একটি স্বাভাবিক কর্ম্ম—অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা করা। প্রকৃতির মধ্যে রজঃ ও তমোভাব থাকিলেই কিছু পাইতে ইচ্ছা করে, কারণ তখনও অন্তঃকরণ মলযুক্ত। কিন্তু এই কর্ষণের ফলে তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আর শূদ্র যাহারা তাহারা ক্রিয়া পাইবার জন্য সকলের পরিচর্য্যা করে।

এই সেবা-ভাব বা গুরু-শুশ্রূষা না থাকিলে কেহই সাধন পাইবার অধিকারী বিবেচিত হন না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সত্তা সাগর বিশেষ, তাহার মধ্যে অনন্ত জীবরূপ বুদ্‌বুদ্ প্রতিনিয়ত উত্থিত হইতেছে। যে জীব বুদ্‌বুদটির মধ্যে শম দম তপঃ শৌচাদি বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক ভাবে স্ফুরিত হয় তাহাই সাত্ত্বিকভাব, এই সাত্ত্বিকভাব যে মানব শ্রেণীদের মধ্যে অধিক মাত্রায় থাকে তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের প্রাণ-প্রবাহ স্বভাবতঃই সুষুম্নাবাহী হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার মধ্যে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে থাকে। এইজন্য ব্রাহ্মণ শান্ত, ব্রাহ্মণ ধীর, ব্রাহ্মণ বিষয়াদিতে নিস্পৃহ হইবেন এবং সাধনায় সিদ্ধ হইয়া সকলকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিবেন। আবার প্রকৃতি সত্তাসাগরের মধ্যে যে বুদ্‌বুদগুলিতে শৌর্য্য, বীর্য্য, দক্ষতা, দান ও প্রভুত্বের ভাব প্রকাশ পায়, বুঝিতে হইবে তাহা সত্ত্ব ও রজোমিশ্রিত ভাব, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। তাঁহারা লোক সকলকে সুশাসনে রাখিয়া সকলকে সৎপথে পরিচালিত করেন, তাঁহাদের প্রাণপ্রবাহ সুষুম্নায় স্থায়ীভাবে না থাকিলেও প্রায়ই সুষুম্নায় থাকে। এইরূপ গুণকর্ম্মের ফলে বৈশ্য ও শূদ্র ভাব স্ফুরিত হয়। ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এই ক্রম বা প্রণালী সকলকেই অবলম্বন করিতে হয়। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুরূপ আমাদের চিত্তে তত্তৎ সংস্কার সঞ্চিত থাকে, যাহাতে চিত্ত সংস্কারানুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৪

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

অন্বয়। স্বে স্বে কর্ম্মণি (নিজ নিজ কর্ম্মে) অভিরতঃ নরঃ (তৎপর মনুষ্য) সংসিদ্ধিং লভতে (সিদ্ধি লাভ করে)। স্বকর্ম্মনিরতঃ (স্বকর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি) যথা (যে প্রকারে) সিদ্ধিং বিন্দতি (সিদ্ধিলাভ করে) তৎ শৃণু (তাহা শুন)॥ ৪৫

শ্রীধর। এবম্ভূতস্য ব্রাহ্মণাদিকর্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বে স্বে ইতি। স্বস্বাধিকার-বিহিতে কর্ম্মণি অভিরতঃ—পরিনিষ্ঠিতো নরঃ, সংসিদ্ধিং—জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে। কর্ম্মণাং জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রকারমাহ—স্বকর্ম্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্ম্ম পরিনিষ্ঠিতো যথা—যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃণু॥ ৪৫

বঙ্গানুবাদ। [ব্রাহ্মণাদির এবম্ভূত কর্ম্মসকল যে জ্ঞানের হেতু, তাহা বলিতেছেন]—স্ব স্ব অধিকার বিহিত কর্ম্মে পরনিষ্ঠিত ব্যক্তি সংসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে। স্বকর্ম্মদ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রকার অর্দ্ধশ্লোকে বলিতেছেন। স্বকর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি কি প্রকারে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তাহার প্রকার বলিতেছি শুন॥ ৪৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনার আপনার কর্ম্মেতে যে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া করে, সে নর ক্রমশঃ সম্যক প্রকারে সিদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে কিছুতেই ইচ্ছা থাকে না, আপনার কর্ম্মতে সর্ব্বদা থাকিতে থাকিতে নিঃশেষ-রূপে ক্রিয়া করিতে করিতে ইচ্ছারহিত হয়। তাহা বলিতেছি শুন।—গুণভেদে যে যে কর্ম্মের অধিকারী, সদ্গুরু শিষ্যকে তদনুরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন, এবং শিষ্য যদি গুরূপদেশ মত কার্য্য করিয়া যায় তাহাতেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে। সিদ্ধিলাভ অর্থে ইচ্ছারহিত অবস্থা যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে। এখন ক্রিয়ার প্রকার ভেদ আছে। সদ্গুরু সমস্ত ক্রিয়ার উপদেশ একসঙ্গে শিষ্যকে দেন না, যে যেমন উন্নতি করিতে পারে, তাহাকে আবার তখন নব নব ক্রিয়ায় দীক্ষিত করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে করা যাক প্রথম দীক্ষার পর কাহারও জিহ্বা উঠিল না সুতরাং তাহার বৈশ্যত্ব লাভ হইল না—আর নূতন ক্রিয়া কিছু পাইল না—তবুও সে যাহা পাইয়াছে তাহাই যদি মনঃ প্রাণ দিয়া করিয়া যায় তবে ক্রিয়ার ফল যে পরাবস্থা তাহা তাহার লাভ হইবেই। এই পরাবস্থা লাভের জন্যই ক্রিয়া করা, শুধু ক্রিয়া করিয়া যাওয়াই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভের যোগ্যতা হয় বলিয়াই ক্রিয়া করা আবশ্যক। তবে যে রামগীতায় বলিয়াছেন—"ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্"—অখিল কর্ম্মাপেক্ষা ত্যাগই প্রশস্ত, কারণ "জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনম্"—মুক্তি জ্ঞান দ্বারাই হয়, কর্ম্ম জ্ঞানের সাধন নহে। ইহা দ্বারা কেহ যেন না বুঝেন তবে আর ক্রিয়া করিয়া ফল কি ? জ্ঞান লাভের চেষ্টাই ভাল। জ্ঞান ভাল সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা কর্ম্ম ত্যাগ ব্যতীত হইবার নহে। ক্রিয়া দ্বারাই কর্ম্মত্যাগ হয়। ক্রিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে পরাবস্থার কারণ না হইলেও ক্রিয়া দ্বারায় প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিলেই বাহ্য ক্রিয়া আপনা হইতে ত্যক্ত হইয়া যায়। তখনই এক প্রকার নেশার উদয় হয়। সেই নেশাতেই জগৎ ভুল হইয়া

(অধিকারানুরূপ কর্ম্মই সিদ্ধিলাভের হেতু)

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

যায়। দৃশ্য বিস্মৃতি ঘটিলেই ধ্যাতার ধ্যেয়াকারে অবস্থিতি হয়। তবে বাহ্য কর্ম্ম বা সাংসারিক কর্ম্ম মনের খেয়াল বশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাণ কর্ম্ম সেরূপ নহে—উহা মনের খেয়াল বশতঃ হয় না, তাহা আপনা আপনিই হয়। সেই প্রাণে লক্ষ্য রাখিতে পারিলেই আপনা আপনি ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। যেরূপ ভাবে উহা হয় তাহা বলিতেছি॥ ৪৫

অন্বয়। যতঃ (যাঁহা হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম-চেষ্টা), যেন (যৎকর্ত্তৃক) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত বিশ্ব) ততং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে), তং (তাঁহাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে) স্বকর্ম্মণা অভ্যর্চ্চ্য (নিজ কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া) মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি (মানব সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে॥ ৪৬

শ্রীধর। তমেবাহ—যত ইতি। যতঃ—অন্তর্য্যামিণঃ পরমেশ্বরাৎ, ভূতানাং—প্রাণিনাং, প্রবৃত্তিঃ—চেষ্টা ভবতি। যেন—আত্মনা, সর্ব্বমিদং—বিশ্বং, ততং—ব্যাপ্তম্। তং—ঈশ্বরং স্বকর্ম্মণা অভ্যর্চ্চ্য—পূজয়িত্বা, সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ॥ ৪৬

বঙ্গানুবাদ। যে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিসকলের কার্য্য চেষ্টা হয় এবং যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ঈশ্বরকে স্বকর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে॥ ৪৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেখান হইতে সমুদয় প্রবৃত্তি হইতেছে অর্থাৎ যে আত্মা দৃষ্টি অন্যদিকে আসক্তি পূর্ব্বক থাকিতেছে—যাহা না থাকিলে যিনি মহাদেব হইতেছেন—কখনই কোন বস্তুতে দৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ মরার মধ্যে জীব সুখস্বরূপ নেই, তন্নিমিত্তে তাহার পক্ষে কিছুই নাই—অতএব জীবাত্মাই মূলীভূত কারণ সমুদয় দ্রব্যের, অতএব স্বকর্ম্ম অর্থাৎ আপনার কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ক্রিয়া—ইহা আদর পূর্ব্বক ভক্তির সহিত সর্ব্বতোভাবে করার নাম অর্চ্চনা—এইরূপ ক্রিয়া গুরুবাক্যের দ্বারা লভ্য হইয়া সমুদয় বস্তুর সিদ্ধি মনুষ্য লোকে পায়—অর্থাৎ যে বস্তুর ইচ্ছা হইল সে বস্তু পাইলে আর ইচ্ছা থাকে না—তদ্রূপ আত্মাতেই আত্মা যখন থাকেন ক্রিয়ার পর অবস্থায়, তখন সব বস্তু পাইলেই যেরূপ ইচ্ছা রহিত হয় তদ্রূপ হয়। যেমন আম খাইলে যে তৃপ্তি হইবে, সেই তৃপ্তিরূপ ফল যদ্যপি সে প্রাপ্ত হইল বিনা খাইয়া; তখন আমের দিকে দৃষ্টি অর্থাৎ আম পাইবার চেষ্টা কেন করিবে। তাহা সকলেরই ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুভব হইয়া থাকে, যাহা গুরুবক্ত্রগম্য।—বর্ণ-বিভাগ অনুযায়ী মনুষ্যের যে ধর্ম্ম, তাহা বাহিরের কথা। তাহাও মানিয়া চলিতে হইবে, নচেৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কর্ম্ম-ফল ও জন্মান্তর-বাদকে ভারতীয় আর্য্য জাতিগণ মাত্র

করিয়া চলেন। এই দুইটিকে কেন্দ্র করিয়াই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-সমূহ ব্যবস্থিত হইয়াছে। কর্ম্মফলানুযায়ী যিনি যে বর্ণের মধ্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাকে সেই বর্ণের জন্য শাস্ত্রানুযায়ী যে বিধিব্যবস্থা আছে, তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। এজন্য অসন্তোষ প্রকাশ করাও যা, ঈশ্বরের বিধিকে অস্বীকার করাও তাই। যাঁহারা ভগবানকে শ্রদ্ধা করেন তাঁহারা যেমন আপনার দুঃখ-দারিদ্র্য নিজ-কর্ম্মের ফল বলিয়াই মনে করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করাও নিজ-নিজ কর্ম্মেরই ফল মাত্র, তাহাও ভগবানেরই ব্যবস্থা, সুতরাং তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে ভগবানের ব্যবস্থাকেই অমান্য করা হয়। যিনি যে দেহেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, উহা তাঁহার প্রাক্তন কর্ম্মেরই ফল, সুতরাং উহাই তাঁহার ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট স্থান। এবং সেই সেই কুলের কুলধর্ম্মানুসারে যেরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম অবলম্বনীয়—তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। মনে হইতে পারে যদি কেহ শূদ্র বা বৈশ্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তো ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে তাঁহার কোন অধিকার রহিল না, সুতরাং ভগবদ্-প্রাপ্তির আশা তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত রহিল!—এই মনে করিয়া কাহারও কাহারও ক্ষোভ হইতে পারে। তাহাদিগকে করুণানিধান ভগবান কৃপা করিয়া বলিতেছেন—"এজন্য তোমাদের ভয় নাই। তোমরা যে কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাক না কেন, শাস্ত্র-ব্যবস্থানুযায়ী নিজ-নিজ কুল-ধর্ম্মানুরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিলেই এবং তাহা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইলেই তোমাদের চিত্তশুদ্ধি হইবে। হওনা তুমি ব্যাধ, হওনা তুমি চণ্ডাল, হওনা তুমি নীচ শূদ্র; তুমি আপন আপন কুলধর্ম্মের অনুশাসনে থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও, কেবল এইটী মনে রাখিও তোমার স্বকুল বা স্ববর্ণ বিহিত সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা কেবল তাঁহারই পূজা করিতেছ।" ভগবান অর্চ্চিত হইতেছেন ইহা ভাবিতে পারিলেই কর্ম্মের শুদ্ধি হয়। তুমি যে নীচ কর্ম্ম করিতেছ—ইহাতে ক্ষোভ করিবার কিছু থাকিবে না। তাঁহার জন্য পাইখানা পরিষ্কারই করি বা দেবপূজাই করি, তাহা সমস্তই একের উদ্দেশ্যে কৃত হয় বলিয়া তাহাতে আর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার থাকে না। বর্ণাশ্রমের অধিকারানুরূপ কর্ম্ম করিয়া যদি তুমি মনে করিতে পার যে, আমার কর্ম্ম আমার সুখ-শান্তির জন্য নহে—উহা ভগবানের অভিপ্রেত, তাঁহার প্রীতির জন্যই ইহা করিতেছি, তাহা হইলে উচ্চ নীচ কোন কর্ম্মের ফলই তোমার ঊর্দ্ধগতিকে রোধ করিতে পারিবে না। যে যেখানে আছে. সে যদি মনে করিতে পারে আমার কৃত কর্ম্ম আমার প্রীতির জন্য নহে, ইহা ভগবৎপ্রীত্যর্থ সম্পাদিত হইতেছে, তবে সে কর্ম্ম আর কর্ম্ম মাত্র নহে, তাহা ভগবদর্চ্চনার অঙ্গরূপে গণ্য। এবং এইভাবে যে কর্ম্ম করিতে পারে সে উচ্চজাতির উচ্চ কর্ম্মের যে ফল সেই ফলই সে লাভ করিবে। সে সিদ্ধি লাভ করিবে—অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান লাভের যোগ্যতা লাভ করিবে এবং সে কিছুদিন পরেই মুক্তি পদবীতে আরূঢ় হইতে পারিবে। অন্তর্লক্ষ্যে এই শ্লোকের অর্থ এই—আত্মা না থাকিলে আমাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছুই থাকিতে পারে না। আত্মাই সকলের মূল, তিনি আছেন বলিয়া মন সঙ্কল্প করিয়া এই বিরাট বাহ্য জগৎকে ব্যক্ত করিতেছে, এবং নানাবিধ বাসনার বশে সুখদুঃখে পুনঃ পুনঃ মথিত হইতেছে; আবার মন সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আপনার মধ্যে আপনি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমের অধিকারানুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে তখন সেই ধীর পুরুষ আর কোন বস্তুতেই আসক্ত হন না। তখন তিনি

(স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ, স্বভাবজ কর্ম্মে পাপ হয় না)

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

মহাদেব, আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন। এই যে ইন্দ্রজালসদৃশ মায়া-প্রপঞ্চের প্রকাশ—ইহাও সেই আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই ব্যক্ত হইতেছে। এই চঞ্চল প্রাণই ভগবানের সেই মায়া-রূপ। জল স্থির থাকিলে তরঙ্গ থাকে না, কিন্তু বায়ুর সংযোগে যেমন স্থির জলে তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ আত্মার স্বকীয় মায়াশক্তি প্রভাবে আত্মাকে তরঙ্গায়িত বলিয়া মনে হয়। আত্মার সেই চঞ্চল ভাবই চঞ্চল প্রাণ। বায়ু থামিলেই যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ কমিয়া যায়, প্রাণের হিল্লোল রুদ্ধ হইলেও প্রাণ সেইরূপ স্থির হয়। স্থির প্রাণই আত্মা, স্থির প্রাণে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান। সাধক কিরূপে সেই আত্মজ্ঞান লাভে সিদ্ধ হইবেন—তাহারই উপায় বলিতেছেন যে স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে। বাস্তবিক আত্মার তো কোন কর্ম্ম নাই, তাঁহার কর্ম্ম আমরা কল্পনা করি চঞ্চল প্রাণের দ্বারা—সুতরাং এই চঞ্চল প্রাণই আত্মার কর্ম্ম, এবং এই চঞ্চল প্রাণই জগৎ-প্রকাশের মূল কারণ। এই প্রাণের দ্বারাই তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। আদর করিয়া ভক্তির সহিত যিনি এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আত্ম-কর্ম্ম (শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ম্ম) করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহারও আর ফলাসক্তি থাকে না, তিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া ইচ্ছারহিত হইয়া যান॥ ৪৬

অন্বয়। স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে) বিগুণঃ (অসম্যক্ অনুষ্ঠিত) স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ (নিজধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ) ; স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম (স্বভাববিহিত কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ (করিতে করিতে) কিল্বিষং ন আপ্নোতি (পাপ প্রাপ্ত হয় না)॥ ৪৭

শ্রীধর। স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যক্ অনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠঃ। ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাৎ ভিক্ষাটনাদি-পরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং—নিয়মেন উক্তং, কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি॥ ৪৭

বঙ্গানুবাদ। [স্বকর্ম্মণা—এই বিশেষণের ফল অর্থাৎ সার্থকতা বলিতেছেন]—স্বধর্ম্ম বিগুণ (অঙ্গহীন) হইলেও সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম বন্ধুবধাদি যুক্ত বলিয়া তাহা হইতে ভিক্ষাটনাদিরূপ পর-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—ইহা মনে করা উচিত নয়। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত স্বভাবনিয়ত (স্বীয় আশ্রমানুযায়ী) কর্ম্ম করিলে কেহ পাপ-প্রাপ্ত হয় না॥ ৪৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া করাতে যদ্যপিস্যাৎ মধ্যে মধ্যে অন্যদিকে মন যায় সেও ভাল, কিন্তু একেবারে অন্য (আত্মা ব্যতীত অন্য) বস্তুতে দৃষ্টি রাখা আগ্রহ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত, তাহাতে মৃত্যুর ভয় আছে, কারণ মৃত্যু না হইলে সে ফলের ভোগ কে করিবে। ক্রিয়া করিতে করিতে যে অমর

পদ অর্থাৎ অষ্টপ্রহর ক্রিয়ার পর স্থিতি তাহা না হইয়া যদি মৃত্যুও হয় সেও ভাল—কিন্তু আত্মা ব্যতীত অন্যদিকে দৃষ্টি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত করিলে মৃত্যু হইবে বটে কিন্তু ফলভোগ করিবার নিমিত্ত জন্ম মৃত্যুরই ভয় থাকিল অর্থাৎ ক্রিয়া কিছুদিন করিলেই ইচ্ছারহিত হইয়া যায়—ক্রমশঃ তাহা সকলেরই অর্থাৎ ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিদের অনুভব হইতেছে—লেখা বাহুল্য—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে ধ্যান-ধারণা-সমাধিপূর্ব্বক—অন্যদিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি যায় না, সুতরাং কোন পাপও হয় না।—[স্বভাব-নিয়ত কর্ম্মটী আগে বুঝিতে হইবে। বাহিরের দিক দিয়া ইহা বুঝিতে গেলেও আধুনিক সমাজে দুই দলে ইহার দুই প্রকার ধারণা করেন। যাঁহারা শাস্ত্রমতাবলম্বী—তাঁহারা বলেন, স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম হইতেছে—যে যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণের পক্ষে শাস্ত্রে যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই তাহার স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। যাঁহারা স্বাধীন চিন্তাশীল তাঁহারা বলেন জাতিগত অধিকার পরিবর্ত্তন করিয়া যে ব্যক্তি যে বর্ণের উপযুক্ত তাহাকে সেই বর্ণধর্ম্মানুযায়ী চলিতে দেওয়াই তাহার প্রকৃত স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। ইহা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও কে বসিয়া বসিয়া সকলের জাতি নির্দ্দেশ করিয়া দিবে এবং কেই বা তাহার সে কথা মানিবে? নিজে নিজে ব্যবস্থা করিতে গেলেই পদে পদে ভুল হইতে পারে। তখন সে ভুলের সংশোধন করিবে কে? সুতরাং এই ভাবের চেষ্টার ফল আরও বিপরীত হইবে। বর্ত্তমান যুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে সত্য, তাই বলিয়া আমরা নিজ-নিজ মনোমত ধর্ম্ম পালন করিলেই যে তাহা স্বভাব-নিয়ত হইবে—তাহা নহে। এক মনুষ্যের মধ্যেই কালে কালে কত পরিবর্ত্তন ঘটে; তাহার দেহ, মন ও স্বভাবের কত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তাই বলিয়া প্রতি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ণ ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে—এরূপ চিন্তা করা অনুচিত। তাহা হইলে সমাজ ও ধর্ম্মের কোন শৃঙ্খলা থাকে না, বিশেষতঃ যে সমাজ কত যুগ-যুগান্তর হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুগত পন্থাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার পক্ষে ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পরিবর্ত্তন-প্রথার অনুসরণ করা আত্মহত্যার তুল্যই অনিষ্টজনক বলিয়া মনে হয়। ঐরূপ যথেচ্ছ অনুসরণই ভয়াবহ পরধর্ম্ম, উহাতে সমাজ-দেহ সমস্ত ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। যুগধর্ম্ম-প্রভাবে জীবের চিন্তার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সে স্থলেও নিজ খেয়ালমত ধর্ম্মানুসরণ অপেক্ষা যথাসাধ্য শাস্ত্রসম্মত স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান পালন করিবার চেষ্টাই স্বধর্ম্ম-পালন। কলিযুগে বিশেষতঃ কোন বর্ণই পূর্ণরূপে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মপালনে সক্ষম থাকিবে না, তাহা জানিয়াই ঋষিগণ যুগ-ধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠানের সদ্ব্যবস্থা করিয়াছেন। এজন্য আবার ব্রাহ্মণকেই অনেকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। কতক পরিমাণে ব্রাহ্মণেরা দোষী হইলেও সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যেই যে দোষ আসিয়া পড়িয়াছে এবং তজ্জন্য প্রত্যেক আশ্রমেই ধর্ম্মের অঙ্গহানি পরিলক্ষিত হইতেছে,—ইহা কালকৃত; কালের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই যুগে সেই সকল জীবেরই অধিক পরিমাণে আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের পূর্ব্ব কর্ম্ম এই দুষ্ট যুগেরই উপযোগী। তথাপি বিচারশক্তি-সহযোগে পুরুষকার-প্রভাবে, মনুষ্য আপনার দৈন্য হইতে আপনাকে উত্তোলন করিতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্র-

সমস্ত আচার, অনুষ্ঠান ও সাধনাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এজন্ত নূতন করিয়া বর্ণাশ্রম বিধির পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সকল বর্ণই স্ব-স্ব-স্থান হইতে নীচে নামিয়া গিয়াছে, আবার সকল বর্ণই চেষ্টা দ্বারা স্ব-স্ব-বর্ণোচিত ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারে। এজন্য সদাচারসম্পন্ন শূদ্র বা নীচ জাতিকে উপনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। পতিত ব্রাহ্মণও সদাচারসম্পন্ন হইলে আবার ব্রাহ্মণই হইবে, পতিত ক্ষত্রিয় তদ্রূপ সদাচারসম্পন্ন হইয়া আবার ক্ষত্রিয়ই হইবে, এবং শূদ্রও শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবদ্ভজনা করিতে করিতেই বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু তাই বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার গলায় উপবীত পরাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ করা চলিবে না। ইহাতে সমাজ-শৃঙ্খলার বিশেষ হানি হইয়া থাকে। কাল-প্রভাবে আম্রবৃক্ষের শাখা পত্রও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে ফল-সমাগমও না হইতে পারে, এমন কি তাহাকে আম্রবৃক্ষ বলিয়া চিনিতে পারাও কঠিন হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম ও যত্ন করিলে এবং বিবিধ উপায়ে উত্তম পাট করিলে আবার তাহাতে নব পত্র ও ফলোদ্গম হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে ফল ধরিবে, তাহা তাহার স্ব-জাতির অনুরূপই হইবে, উহা কখনও অন্য জাতীয় ফল প্রসব করিবে না। তদ্রূপ নিজ-নিজ-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালন করিলে এই কলিযুগেও স্ব-স্ব-বর্ণানুগত উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। অতএব সেইরূপ পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট না হইয়া নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা করিলে বা নিজ-ইচ্ছামত সমাজে পরিবর্ত্তন আনিবার চেষ্টা করিলে, আমাদের আশা সফল হইবে না, উহাতে ধর্ম্ম-রক্ষাও হইবে না, সমাজ রক্ষাও হইবে না। বরং ইহাই সমীচীন হইবে—যিনি যে বর্ণেই উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রসম্মত বর্ণানুরূপ ধর্ম্ম পালনই কর্ত্তব্য, এইরূপ কর্ত্তব্য পালনে যিনি যতটা সচেষ্ট হইবেন, তাঁহার তদনুরূপ গুণের উৎকর্ষ এবং উন্নতি লাভ হইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যদি পূর্ণভাবে স্বধর্ম্ম পালনে যত্নশীল হ'ন, তবে তাঁহারা নিজ-জীবনেই উচ্চভাবের অনুকূল নিজ-নিজ-স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, অতঃপর পরজন্মে ইঁহারা উচ্চতম বর্ণের মধ্যেই জন্মলাভ করিবেন। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে যদি বর্ণ-বিগর্হিত নীচ ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয় বা তাঁহাদের চরিত্র দূষিত হইয়া নিজ উচ্চবর্ণের অনুপযুক্ত হইয়া উঠে তবে তাঁহাদিগকেও পর-জন্মে নীচকুল ও নীচবর্ণের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র (ভৃগুসংহিতা) মতেও একথা সুসিদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বভাবানুযায়ী জাতি-নির্ণয় করিতে হইলে সমস্ত সমাজ ও শাস্ত্র-ব্যবহার অচল হইয়া উঠিবে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে আছে বটে—"শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহাকেও ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য"; তাহা এখনও লোকে করিয়া থাকে, নীচকুলে সৎলোক উৎপন্ন হইলেও লোকে তাহাকে ব্রাহ্মণের মতই সমাদর করে। জন্মসংস্কার ও বংশ দেখিয়াই সব সময়ে মর্য্যাদা নিরূপিত হয় না, সদাচার দ্বারাই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য; সেই সদাচার ব্রাহ্মণের মধ্যে না থাকিলে সে ব্রাহ্মণকে কেহই তো সমাদর করে না, পরন্তু ব্রাহ্মণোচিত সদাচার শূদ্রের মধ্যে থাকিলে সে শূদ্রকেও লোকে ব্রাহ্মণের মত সম্মান দিয়া থাকে। শম-দমাদি সাধনে সকলেরই অধিকার আছে, সকলেই তাহা করিতে পারেন এবং শম-দমাদিসম্পন্ন শূদ্রকে সকলেই সম্মান করিয়া থাকে,

কিন্তু সদাচারসম্পন্ন শূদ্রকে ব্রাহ্মণের আসনে বসাইয়া ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করাইতে হইলে এক বিরাট উচ্ছৃঙ্খলতায় সমাজ ভরিয়া যাইবে, এবং তাহাতে এত অনর্থ উৎপন্ন হইবে যে পরিশেষে তাহা আর সামলানো অসম্ভব হইয়া পড়িবে]।

এইবার অন্তর্লক্ষ্যের কথা বলি :—

স্বধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম, পরমানন্দরূপে স্থিতি লাভই জীবের স্বধর্ম্ম। এই পরিস্থিতি লাভের যে চেষ্টা **তাহার নামই স্বধর্ম্ম রক্ষা বা পালন**। কিন্তু অধিকাংশ জীবই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মস্থিতি তাহার নাই, তাই বহির্ম্মুখ জীব আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট না হইয়া প্রতিনিয়ত সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই স্থিতিলাভের উপায় আছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মহিতে রত হওয়াই স্বধর্ম্ম পালন। এই আত্মহিতের চেষ্টা হইতেই জীব আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় এবং তাহার এই পশুপাশ মোচন হয়। যতদিন জীব আত্মার দিকে লক্ষ্য না করে, ততদিন সে ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পশুর মতই জীবন যাপন করে। এই ইন্দ্রিয়াসক্তিই পর-ধর্ম্ম, (পরের ধর্ম্ম,) ইহা বাস্তবিকই ভয়াবহ। ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকিতে জীবের আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব নহে, সুতরাং তাহার "মহতী বিনষ্টি" বা মহাবিনাশ হইয়া থাকে। এখানে একটি সন্দেহ আসে যাহাকে স্বধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম বলা হইতেছে, তাহা আবার বিগুণ কি করিয়া হয়? যেমন জলের শৈত্যগুণ, অনলের উষ্ণতা—তাহাদের স্বধর্ম্ম, তেমনই আত্মারও একটা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আছে, তাহা আত্মাতেই নিহিত। মনে হইতে পারে আত্মা বা ব্রহ্ম তো নির্গুণ, নির্গুণের ধর্ম্ম কেমন করিয়া থাকে? অবশ্য শুদ্ধ ব্রহ্মে গুণের কল্পনা নাই, কিন্তু মায়াশবলিত যে ব্রহ্ম তন্মধ্যে ভাব আছে সুতরাং তাঁহাতে গুণ বা ধর্ম্মের অভাব কেন হইবে? সগুণ ব্রহ্মও সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ স্বভাব ও নিস্পৃহ। তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছু না থাকিলেও—"নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি" —এবং প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও আমি কর্ম্মে ব্যাপৃতই রহিয়াছি। তাঁহার কোন সঙ্কল্প বা কামনা নাই, তবুও যে তাঁহাকে কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হয়—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহাকেই যোগীরা অনিচ্ছার ইচ্ছা বলেন। উপনিষদে আছে—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি॥" মুণ্ডক

যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিসদৃশ উজ্জ্বলকণা নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে নানা প্রকার ভাবযুক্ত জীবগণ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই প্রলয় কালে বিলীন হয়।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" মুণ্ডক

এই পুরুষ হইতে প্রাণশক্তি, মনঃ অর্থাৎ চিন্তাশক্তি, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সর্ব্ববস্তুর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মের সম্বন্ধে এত সব কাণ্ড হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিজ-প্রয়োজন কিছু নাই, যাহা কিছু হয়—সমস্তই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছায়। এই অনিচ্ছার ইচ্ছাটিই আত্মার স্বধর্ম্ম। এই

("সহজ" কর্ম্মের ত্যাগ বৈধ নহে)

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

অনিচ্ছার ইচ্ছাই ব্রহ্মের মায়া বা নিজশক্তি। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই এই বিশ্ব পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও লীন হইতেছে। ব্রহ্ম যখন আপনাকে আপনি বিশ্বরূপে প্রকাশ করেন, তখন প্রথম যে স্পন্দন হয়—তাহাই প্রাণ। "প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি"। যে ঈশ্বর প্রাণরূপে সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন।

এই প্রাণের দুইটী বিভাব, একটী স্থির ও অপরটী চঞ্চল। স্থির প্রাণেই পরমাত্মা এবং চঞ্চল প্রাণই জীব। প্রাণের এই চাঞ্চল্য ও স্থিরতা—উভয়ই প্রাণের স্বধর্ম্ম। প্রাণের স্থিরতাতেই মুক্তি ও চাঞ্চল্যই প্রাণের বদ্ধ ভাব। প্রাণে কাহারও লক্ষ্য নাই, তাই জীব ভব-বন্ধনে আবদ্ধ। অথচ জীব প্রাণের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল, অথচ প্রাণ যে কি—তাহা বুঝিবার চেষ্টা নাই। এই প্রাণ প্রতিনিয়ত জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রবাহিত হইতেছে। প্রাণের এই বহির্গমনাগমন যতদিন চলিতে থাকে, তত দিন মনের চাঞ্চল্য মিটে না, প্রাণে শান্তি থাকে না, মরণের করাল ছায়া ততদিন জীবকে ব্যাকুল করিয়া রাখে। চঞ্চল প্রাণ হইতেই মনের উৎপত্তি। মন যখন বুঝিতে পারে, তাহার প্রাণরূপা জননী যতদিন স্থির না হন ততদিন তাহার সুখ শান্তির আশা নাই, তখন সে মায়ের কৃপালাভের জন্য প্রাণরূপা জননীর শরণাপন্ন হয়। এতদিন পরধর্ম্ম (ইন্দ্রিয়দের বিষয়মুখী চেষ্টা) লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল, এইবার উৎপীড়িত হইয়া আবার নিজধর্ম্মের দিকে জীবের লক্ষ্য পড়িল। এই স্বধর্ম্ম (শ্বাসগতিতে লক্ষ্য) সাধন করিতে গেলে প্রথমে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না, অভ্যাসবশে কিন্তু পুনর্ব্বার ঠিক হইয়া যায়। এইজন্যই ভগবান বলিতেছেন প্রাণায়ামাদি যোগ-ক্রিয়া তোমার স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম, জন্মের সহিত ইহা তোমার সঙ্গেই আছে, অনভ্যাস বশতঃ যদি ইহা বিগুণই কিছু হয়,—তাহাও ভাল, তথাপি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম লইয়া খেলা করা ভাল নহে। যদিও এই প্রাণের সাধনা করিতে গিয়া মন তাহাতে ঠিক ভাবে নাও বসে, তবুও তাহা ছাড়িতে নাই, কারণ অভ্যাস করিতে করিতে উহার বৈগুণ্য ভাব মিটিয়া যাইবে এবং আরও কিছুকাল পরে আর আসক্তি-পূর্ব্বক অন্যদিকে দৃষ্টি যাইবেই না, অন্যদিকে দৃষ্টি না যাইলে পাপও হইবে না। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা শুদ্ধপাপ হইয়া ক্রমশঃ অমর পদ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তখন অষ্টপ্রহর ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিতে পারিবে, এবং যে বাসনা-মলের জন্য এখন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, সে ইচ্ছা বা বাসনার নাম গন্ধও আর থাকিবে না ॥ ৪৭

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং কর্ম্ম (জন্মের সহিত উৎপন্ন কর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই); হি (যেহেতু) সর্ব্বারম্ভাঃ (সকল কর্ম্মই) ধূমেন অগ্নিঃ ইব (ধূম দ্বারা অগ্নি যেরূপ, তদ্রূপ) দোষেণ আবৃতাঃ (দোষ দ্বারা আবৃত) ॥ ৪৮

শ্রীধর। যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে, তর্হি সদোষত্বং পরধর্ম্মেঽপি তুল্যম্, ইতি আশয়েনাহ—সহজমিতি। 'সহজং—স্বভাব-বিহিতং কর্ম্ম, সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি—যস্মাৎ, সর্ব্বেঽপি আরম্ভাঃ—দৃষ্টাদৃষ্টানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি, দোষেণ কেনচিৎ আবৃতা—ব্যাপ্তা এব। যথা সহজেন ধূমেন অগ্নিঃ আবৃতঃ তদ্বৎ। অতো যথা অগ্নেঃ ধূমরূপং দোষম্ অপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৪৮

বঙ্গানুবাদ। [যদি পুনরায় সাংখ্যমতানুসারে স্বধর্ম্মে (ক্ষাত্রধর্ম্মে) হিংসা-লক্ষণ দোষ আছে মনে করিয়া পরধর্ম্ম (ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্ম) শ্রেষ্ঠ মনে কর, তাহা হইলে পরধর্ম্মেও তো ঐরূপ তুল্য দোষ আছে, এই আশয়ে বলিতেছেন]—সহজ অর্থাৎ স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম, তাহা দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করা উচিত নহে। যেহেতু দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্ম্মই কোন না কোন দোষ দ্বারা ব্যাপ্ত। যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি আবৃত থাকে—তদ্রূপ। অতএব অগ্নির ধূমরূপ দোষ পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন অন্ধকার শীতাদি নিবৃত্তির জন্য অগ্নির তাপই সেবা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মেরও দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্ব-শুদ্ধির জন্য গুণাংশই গ্রহণীয়—ইহাই তাৎপর্য্য॥ ৪৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জন্মের সঙ্গে যে কর্ম্ম হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া (যাহা কেবল গুরুবাক্যের দ্বারাই লভ্য হয়) তাহাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য (দোহাই দোহাই)—তাহা প্রথমে করিতে গেলে ঠিক্ ঠিক্ সমুদয় হয় না অর্থাৎ ভালরূপে ক্রিয়া করিতে পারে না, কিন্তু তাহা বলিয়া ত্যাগ করা উচিত নয়—যেমত আগুন জ্বালিতে গেলে প্রথমেতে চোখে ধোঁয়া লেগে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয় পরে রসুই করিয়া খেয়ে তৃপ্ত হন—তদ্রূপ আত্মাতেই মন রাখার স্বরূপ কিঞ্চিৎ ক্লেশ প্রথমে হয় কিন্তু ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইলে সে ধোঁয়ার ক্লেশের অনুভব হয় না, তাহা ভুলিয়া বরং অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি লাভ করে।—জন্মের সহিত যে কর্ম্মটি হয় তাহাই সহজ কর্ম্ম। প্রাণক্রিয়াই জন্মের সহিত জন্মায়, এইজন্য প্রাণক্রিয়াই মানুষের সহজ কর্ম্ম। জীব যতদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ না হয়, ততদিন তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকে না। তবে কি তখন তাহার প্রাণ থাকে না? প্রাণ না থাকিলে গর্ভস্থ জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়? প্রাণ নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু প্রাণের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকে না, মাতৃ-শরীরের সহিত তাহার নাড়ী সংযুক্ত থাকে, সুতরাং মাতৃশরীর হইতে শরীর-পুষ্টির উপযুক্ত খাদ্য পাইয়া থাকে; প্রাণ-প্রবাহ তখনও থাকে কিন্তু সুষুম্নার মধ্যে বহিতে থাকে, এইজন্য গর্ভস্থ শিশুর জ্ঞান রুদ্ধ হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার সহিত তাহার প্রাণ-প্রবাহ নাসা-রন্ধ্রে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে বহির্ম্মুখ হয়। প্রথম প্রথম প্রাণ-প্রবাহ ক্ষীণভাবে বহির্ম্মুখ হয়, তখনও অন্তঃপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায় না, তাই অনেক সময় শিশুর দিব্য জ্ঞান বা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত থাকে, প্রাণ প্রবাহ বাহ্য শ্বাস-বায়ুর সহিত যত বেশী পরিমাণে মিলিত হয়, ততই তাহার পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয়। বাহিরটাই তখন তাহার নিকট বড় হইয়া যায়, আন্তর ভাব স্মৃতি-পথ

হইতে সরিয়া যায়। প্রাণের অন্তঃপ্রবাহটাই সহজ কর্ম্ম, উহা বহির্ম্মুখ হইলেই দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দোষযুক্ত হইলেও উহা পরিত্যাগ করিয়া লাভ নাই। পরিত্যাগ করিলে আবার সেই সহজ জ্ঞান লাভ হইবে না। বহিঃপ্রবাহটাকে অন্তর্ম্মুখ করিবার প্রচেষ্টাই প্রাণায়ামাদি কৌশল। কিন্তু উহা অনায়াসসাধ্যও নহে এবং তাহা সুখকর সাধনাও নহে। তবুও যাঁহারা প্রাণ-প্রবাহের গতি ফিরাইবার জন্য ঐরূপ সাধনা অভ্যাস করিতে থাকেন, প্রথম প্রথম তাহা সর্ব্বতোভাবে ঠিক হয় না, এইজন্য অনেকের মন বিগড়াইয়া যায়, কিন্তু তবু ক্রিয়া ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ এই ক্রিয়া ব্যতীত প্রাণকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া দিবার আর কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই, সুতরাং প্রথম প্রথম তাহা যত নীরসই বোধ হউক কল্যাণকামী সাধকের তবুও তাহা করিয়া যাওয়া উচিত। সমস্ত কর্ম্মের প্রথম চেষ্টা দোষযুক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি কিছু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই কার্য্যে লাগিয়া থাকেন, তিনি অনতিবিলম্বেই ইহার আনন্দ নিজে নিজেই বুঝিতে পারেন। কোথায় বিশ্বঘোরা মন! আর কোথায় স্থির প্রশান্ত আত্মস্থ মন! মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই প্রাণের বহির্ম্মুখী গতি আরম্ভ হয়, তখন দেহে আত্মবোধ হয় এবং দেহজনিত ও দেহের অক্ষমতাজনিত কত ক্লেশ হয়,—শিশু কেবলই রোদন করে—ভিতরের থাইটী হারাইয়া যায়, বাহিরের সঙ্গেও তেমন মিশ খায় না—জীবের এই শোকাবহ অবস্থাটীই শূদ্রভাব। তারপর বালকের উপনয়ন হয় অর্থাৎ গুরুর নিকট উপনীত হয়, গুরু তখন তাহার প্রাণক্রিয়া যাহাতে অন্তর্ম্মুখ হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করেন। গুরু বলপূর্ব্বক শিষ্যের চিত্তকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া দিয়া ক্ষণিকের জন্য "তৎপদং" দর্শন করাইয়া দেন। প্রাণের বহির্ম্মুখ গতি হইতেই মনে যেমন বিষয়াকারা বৃত্তির উদয় হয়, আবার অন্তর্ম্মুখে চালনার অভ্যাসে তেমনই ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয় হইতে থাকে। প্রথম প্রথম সাধনা করিতে গিয়া সাধকেরা অনেক কিছু পাইবার আশা করে, নিজের শক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয়—তখনই বৈশ্যভাব, ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম হইতে থাকে। পরে ক্ষত্রিয়ভাব—আত্মজ্ঞান লাভের জন্য রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন করিতে হয়। এই যুদ্ধ ব্যাপারটীই হৃদয়গ্রন্থি-ভেদের সাধনা। ঐ অবস্থায় সাধকের যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, তাহাই তখন তাহার স্বভাবজ কর্ম্ম। বৈশ্যাবস্থায় সাধনার ভাব মৃদু হইবে। ধীরে ধীরে প্রাণকে উঠাইতে নামাইতে হইবে, তাহার মধ্যে কোন তীব্রতা বা বল-প্রয়োগ থাকিবে না। এইভাবে সাধনে কিছুকাল অভ্যস্ত হওয়ার পর শ্বাসের আকর্ষণ বিকর্ষণে যখন কোন কষ্ট থাকিবে না, টানা ফেলা দীর্ঘ হইয়া যাইবে, তখন সাধক এ অবস্থা হইতে উন্নততর দীক্ষায় দীক্ষিত হইবেন। ক্রমে ক্রমে সাধনার কঠোরতা বাড়িবে, উহাই ক্ষত্রিয় ভাব। এইখানে শ্বাসের উপর বল প্রয়োগ করিতে হইবে, কুম্ভকের দ্বারা বলপূর্ব্বক বায়ুকে সুষুম্নার মুখে পরিচালিত করিতে হইবে, "বলাৎকারে গৃহীয়াৎ" ইহাই ক্ষত্রিয়ের দিগ্বিজয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ। এই প্রকার করিতে করিতে একদিকে যেমন শৌর্য্য, তেজঃ, যোগধারণা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আসিবে, তেমনই অন্যদিকে রিপুদের সহিত প্রবল ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, মনে হইবে আর যেন পারিলাম না, তখনও যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে চলিবে না, যুদ্ধে অপলায়ন ভাবটীই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। তাহার পর যোগীর অনেক প্রকার

(সাত্ত্বিকত্যাগ ও সংযমের দ্বারা যোগীর নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি)

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

শক্তিলাভ হয়, মেরুদণ্ডের মধ্যে এক চক্রের পর আর এক চক্রে উত্থান হইতে থাকে তত্ত্বজয় হইতে থাকে, ইহার নামই পররাজ্য জয়। যোগী তখন অনাসক্ত হইয়া সমস্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করিবেন। ইহাই ঈশ্বর ভাব এবং অন্যকে সৎপথ দেখাইয়া দেওয়া—উহাই শ্রেষ্ঠ দান। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইলেই ক্ষত্রিয়ভাব শেষ হইয়া গেল-তখন যোগী সর্ব্ব বিষয়ে স্থির, তখন তিনি শান্ত, দান্ত, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংসারে স্থিত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন। তখন মনের কোন সঙ্কল্প না থাকায় -"যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে"।—এই ত্যাগ কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বা জোর করিয়া করিতে পারে না, উপযুক্ত সময়ে সাধকের আপনা আপনিই সমস্তই ত্যাগ হইয়া যায়,—ইহাই ব্রাহ্মণ ভাব, সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বোচ্চ অধিকার! ॥ ৪৮

অন্বয়। সর্ব্বত্র (সর্ব্ববিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিশূন্য), জিতাত্মা (জিতেন্দ্রিয় বা বশীকৃতান্তঃকরণ), বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি), সন্ন্যাসেন (কর্ম্ম ও তাহার ফলে আসক্তি ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস লক্ষণ দ্বারা), পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং (আত্মজ্ঞান রূপ পরমাসিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৪৯

শ্রীধর। ননু কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পদ্যতে, ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য। জিতাত্মা—নিরহঙ্কারঃ। বিগতস্পৃহঃ—বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ সঃ। এবম্ভূতেন সঙ্গত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ— ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তেন কর্ম্মাসক্তি তৎ ফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং—সর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিম্, অধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োঃ ত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্ম্যমেব। কর্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তদুক্তং—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদি শ্লোক-চতুষ্টয়েন। তথাপি অনেন উক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" ইত্যেবং লক্ষণাং পারমহংস্যচর্য্যাম্ প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকলে। দোষাংশ পরিত্যাগে কিরূপে গুণাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন]—অসক্ত অর্থাৎ সঙ্গশূন্য যাঁহার বুদ্ধি। জিতাত্মা অর্থাৎ নিরহঙ্কার। যে ব্যক্তি হইতে ফলবিষয়ক স্পৃহা বিগত হইয়াছে তিনি বিগতস্পৃহ। আসক্তি ও ফলত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ-এইরূপ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকোক্ত কর্ম্মাসক্তি ও ফলত্যাগ রূপ যে সন্ন্যাস, তদ্দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের নিবৃত্তিরূপ যে সত্ত্বশুদ্ধি তাহা প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি সঙ্গ ও ফলত্যাগপূর্ব্বক যে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহা নৈষ্কর্ম্ম্যই, যেহেতু ঐরূপ কর্ম্মা-

সুষ্ঠানে কর্তৃত্বাভিনিবেশের অভাব হয়। আর তাহাই "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি" ৪টী শ্লোক দ্বারা পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। তথাপি এই শ্লোকোক্ত সন্ন্যাসের দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি যাহা পঞ্চম অধ্যায়ে "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" সেই পরমহংসচর্য্যারূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহাই বিশেষত্ব ॥ ৪৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন বিষয়ে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিবে না বর্ত্তমান অবস্থায়, ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থেকে আত্মাকে আত্মার দ্বারায় ক্রিয়ার স্বরূপ লড়াই ক'রে জিতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যখন সব বিষয়ে ইচ্ছা হইতে রহিত হইয়া যায় তখন আর কোন কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত থাকে না—যখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা না থাকিল যাহা ইচ্ছা করিয়া পাইয়া হইত, সুতরাং সব বিষয়ের প্রাপ্তি হইল যাহার নাম সিদ্ধি তো সেই পরম অর্থাৎ সকলের পর ব্রহ্মস্বরূপ হইলে তিনি যেমত অকর্ত্তা অথচ কর্ত্তা তেমনি ইচ্ছারহিত হইয়া সমুদয় ইচ্ছা সম্পন্ন (ইচ্ছা না করিয়া) হয়—ইহারই নাম সিদ্ধি ও সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাহা কিছুই ইচ্ছা হয় বর্ত্তমান অবস্থায় অনাবশ্যক কর্ম্মের তাহা করে না —এইরূপ স্থির বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়।—আত্মাতে মন রাখিতে রাখিতে আর কোন বাহ্য বিষয়ে আসক্তি আসিবে না। এজন্য প্রথমে খুব যুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু ক্রিয়া করিয়া ক্রমশঃ ক্রিয়ার দ্বারা যখন পরাবস্থা লাভ হয়, সব ইন্দ্রিয় জয় হওয়ায় তখন আর বিষয়ে স্পৃহা থাকে না। স্বকর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা করিলেই উক্তরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। তখন তিনি অনিচ্ছার ইচ্ছায় সকল কর্ম্ম করেন, কিন্তু কর্ম্মে আর আসক্তি থাকে না এবং ফলের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। তখন তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা অথচ সব কাজ ঠিকমত হইয়া যাইতেছে, এবং ইচ্ছারহিত হইলেও কোন কাজ তাঁর আটকায় না, সব কে যেন করিয়া দেয়। এই অবস্থার নামই "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি"—সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি কারণ ইচ্ছারহিত, অথচ সর্ব্বকর্ম্ম ফলা-কাঙ্ক্ষা করিয়া করিলে যে ফল, ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াও তাঁহার তাহাই হয়। সাধারণতঃ সকামী ব্যক্তিদের কামনার পূর্ত্তিতে যে কৃতকৃত্যতা বোধ হয়, তাঁহার স্পৃহা না থাকায় বস্তুর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে তাঁহার আনন্দের কোন বিঘ্ন উৎপন্ন করে না। প্রথমে ক্রিয়াভ্যাস করিতে হইবে, এই ক্রিয়া করিতে করিতে মন ও ইন্দ্রিয়ের যে এক প্রকার উপরাম হয়, অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় বাহ্য বস্তুতে প্রসক্তি দেখায় না তাহাই কর্ম্মজা-সিদ্ধি, এতদ্বারা জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠাই ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকা। এইরূপ থাকা অধিকক্ষণ ও ইচ্ছামত হইলেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি যাহার হয় তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল ফুটিয়া উঠে। তাহার তখন ধন, জন গৃহ বা পুত্র দারাদিতে আসক্তি থাকে না। অন্তঃকরণ তখন তাহার বশীভূত হইয়া গিয়াছে। দেহ, ভোগ বা জীবনধারণেও তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। তখন তাঁহার মন কল্পনার অভাবে আত্মাকারে স্থিত হয়। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির চরম বা পরমাবস্থা হইতেছে—তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদা স্থির। ক্রিয়ার পর অবস্থা অষ্টপ্রহর এইরূপ থাকিলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাব হইয়া যায় ॥ ৪৯

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির সাধনক্রম বলিবার প্রতিজ্ঞা)

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

অন্বয়। কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয়) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) ব্রহ্ম আপ্নোতি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন) তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) মে নিবোধ (আমার নিকট শ্রবণ কর), যা (যাহা অর্থাৎ যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা (জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি) ॥ ৫০

। এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্, যথা—যেন প্রকারেন, ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। তথা—তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনাৎ নিবোধ—শৃণু ॥ ৫০

বঙ্গানুবাদ। [এবম্ভূত পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা যে ব্রহ্মভাব হয় তাহারই প্রকার ছয়টি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন]—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন সেই প্রকারটি [যাহা জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি] সংক্ষেপেই বলিতেছি শুন ॥ ৫০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া সমুদয় সিদ্ধিকে পায় যেরূপ করিয়া তাহা বোঝ—নিঃশেষরূপ স্থিতি, আর ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মেতে থেকে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরা অর্থাৎ যাহার পর আর কিছুই নাই ব্রহ্ম ব্যতীত।—বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি মিলিত হইয়া কর্ম্ম উৎপন্ন করে। যখন এগুলি আর কর্ম্ম উৎপত্তি করিতে পারে না তখনই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়। কিরূপ সাধনায় এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হইতে পারে তাহাই ভগবান এইবার বলিবেন। জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিসমাপ্তি,—জ্ঞান হইল ব্রহ্মদর্শন আত্মাকারে স্থিতি যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিঃশেষরূপে স্থিতিই পরমা সিদ্ধি। জ্ঞানই জ্ঞেয়াকারে প্রকাশিত হয়, এইজন্য জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভেদ। সূর্য্যের কিরণ যেমন দ্বার, ছিদ্র ও গবাক্ষ পথ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আত্মচৈতন্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকলকে চৈতন্যযুক্ত করে। চৈতন্য উহাদের ধর্ম্ম নহে। দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত জড় পদার্থে চৈতন্যের আভাস বর্ত্তমান বলিয়া ঐ সকল বস্তুতে আত্মভ্রম হয়। সেইজন্য আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাহাতে যে নামরূপময় গুণের আরোপ করা হয় তাহার নিবৃত্তি করিতে পারিলেই আর দেহাদিতে আত্মভ্রম হইতে পারিবে না। আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সুতরাং তাহার জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। প্রযত্নের প্রয়োজন হয় অনাত্মজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন কিছু চিন্তা করিবার বস্তু নাই, অচিন্তাও নাই। ব্রহ্মপদ চিন্তা করিয়া আনিবার উপায় নাই, কারণ নিশ্চিন্ত অবস্থাই ব্রহ্মপদ। যখন হাঁ না দুইই থাকে না তখনই ব্রহ্ম সম্পাদন হয়। এই নিশ্চিন্ত অবস্থা প্রাপ্তির যে সাধনা তাহাই বলা হইতেছে ॥ ৫০

(পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠা)

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১

অন্বয়। বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (ধৃতির দ্বারা) আত্মানং নিয়ম্য (মনকে নিয়মিত অর্থাৎ আত্মসংযম করিয়া) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা (শব্দাদি বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিয়া) রাগদ্বেষৌ চ (ও রাগ দ্বেষকে) ব্যুদস্য (পরিত্যাগ পূর্ব্বক)—॥ ৫১

শ্রীধর। তদেবাহ—বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া—পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিকবুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা আত্মানং—তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য—নিশ্চলাং কৃত্বা, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য। 'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত' ইত্যাদীনাং 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' ইতি তৃতীয়েন অন্বয়ঃ ॥ ৫১

বঙ্গানুবাদ। [তাহাই বলিতেছেন]—উক্ত প্রকারে পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইয়া, সাত্ত্বিকী ধৃতি দ্বারা সাত্ত্বিক বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া, শব্দাদি বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ করতঃ (তদ্বিষয়ক যে রাগ আর দ্বেষ সেই ভাবগুলিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক) [ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন]। ৫৩ শ্লোকস্থ "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" এই বাক্যের সহিত "বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত" ইত্যাদি শ্লোকের অন্বয় ॥ ৫১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির করিয়া ব্রহ্মেতে থেকে আটকিয়া, আত্মাতে আপনা আপনি স্থির থাকার নাম ধারণা ধ্যান সমাধি পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত শব্দাদি অগ্রাহ্য করিয়া—ইচ্ছা ও হিংসা যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় কাজে কাজেই থাকে না।—পারমহংস্যনিষ্ঠ পুরুষের যে সাধনাগুলি করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন—(১) বিশুদ্ধবুদ্ধি—যাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় তাঁহার বুদ্ধিতে আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু ভাসে না এবং আত্মা সম্বন্ধে কোন সংশয়ও আসে না। (২) ধৃতি—প্রাণায়ামাদি দ্বারা যে স্থির অবস্থা আসে তাহাতেই বৃত্তি রুদ্ধ হয়। প্রাণকে নিয়মিত না করিলে শরীর ও ইন্দ্রিয় চঞ্চল থাকিবে, নিশ্চল হইবে না। প্রাণ স্থির হইলেই বুদ্ধি আত্মাতে আপনা আপনি স্থির হইয়া যাইবে—সেই অবস্থায় থাকার নামই ধৃতি। (৩) শব্দাদি বিষয় ত্যাগ—যোগাভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল অন্তর্মুখ হয়, সুতরাং তখন বাহ্য বিষয় আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না। (৪) রাগ দ্বেষ ত্যাগ—যাঁহার কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগও নাই বিরাগও নাই। মন থাকিতে এ ভাব আসা কঠিন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন নিশ্চল হয়, কোন সঙ্কল্প বা বাসনাই থাকে না—তিনিই তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হন ॥ ৫১

(পরমহংস কিরূপে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন)

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২

অন্বয়। বিবিক্তসেবী (নির্জ্জনস্থানবাসী), লঘ্বাশী (মিতভোজী), যতবাক্-কায়-মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া), নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (নিত্য ধ্যানযোগ-পরায়ণ হইয়া), বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্যকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া)—॥ ৫২

শ্রীধর। কিঞ্চ—বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী—শুচিদেশাবস্থায়ী, লঘ্বাশী—মিতভোজী। এতৈঃ উপায়ৈঃ যতবাক্কায়মানসঃ—সংযত-বাগ্দেহচিত্তো ভূত্বা, নিত্যং—সর্ব্বদা, ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শঃ তৎপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগ্ উপাশ্রিতো ভূত্বা॥ ৫২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—শুচিদেশ অর্থাৎ পবিত্র দেশবাসী, মিতভোজী, এই সকল উপায় দ্বারা বাক্য দেহ ও চিত্তকে সংযত করিয়া, সর্ব্বদা ধ্যান দ্বারা ব্রহ্ম সংস্পর্শ-রূপ যোগে তৎপর হইয়া ধ্যানের অবিচ্ছেদের জন্য পুনঃপুনঃ দৃঢ় বৈরাগ্যকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া—॥ ৫২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সর্ব্বদা আপনাতে আপনি থাকে, অল্প আহার করে, পারগ পক্ষে কথা বলে না, শরীরেতে আপনা আপনি ছোট বিবেচনা করিয়া দেমাক ক'রে চলে না, মনকে অন্যদিকে না নিয়ে গিয়ে আপনা আপনি ছোট বিবেচনা করিয়া আপনাতে থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া করে—যাহা গুরুবক্ত্রগম্য—১৭২৮ বার প্রাণায়াম প্রত্যহ করে ও মধ্যে মধ্যে ২১৭৩৬ বার প্রাণায়াম করে অর্থাৎ দিন রাত্র সর্ব্বদাই প্রাণায়াম করে অর্থাৎ ইহাতেই থাকে নিত্য—যাহা ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা হতেই হয়—যখন সর্ব্বদাই আপনাতে থাকিল এইরূপ অভ্যাস পাইয়া, তখন অন্যদিকে আর ইচ্ছা ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুতেই হয় না—ইহারই নাম বৈরাগ্য, ইহা যাহার আছে সেই বৈরাগী।—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে সাধককে (৫) বিবিক্ত সেবী হইতে হইবে। নির্জ্জন দেশে বসিয়া সাধনাভ্যাস না করিলে ধ্যান জমে না। এই জন্য সাধকের অপেক্ষাকৃত কোলাহলশূন্য স্থানে থাকা আবশ্যক, কিন্তু বাহিরের গোলমাল হইতেও বেশী গোলমাল করে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলি। তাহাদিগকে বশে রাখিতে হইলে প্রাণকে স্থির করিতে হইবে, প্রাণ স্থির হইয়া এমন স্থানে অবস্থান করেন যদ্দ্বারা "আমি আমার" সব মিটিয়া যায়—ইহার নামই আপনাতে আপনি থাকা। এইরূপ নিঃসঙ্গাবস্থা না হইলে কেবল জনশূন্য স্থানে থাকিলেও কাম, ক্রোধাদি দস্যুগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। (৬) লঘু আহারও সাধকের পক্ষে উপকারী। অতিভোজনে আলস্য ও নিদ্রায় সাধককে ঘেরিয়া ফেলে। মন তমের দ্বারা

অভিভূত হয়, এইজন্ত আহারে ও নিদ্রায় সংযম রক্ষা করিতে হয়। সাধকপ্রবর কবির বলিয়াছেন—

'নীদ নিশানী নীচ কি উঠো কবিরা জাগি
ঔর রসায়ন ছোড় কী রামরসায়ন লাগি ॥'

নিদ্রা নীচলোকের চিহ্ন, কারণ তমোগুণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণ, যাঁহারা প্রাণকে উপরে উঠাইয়া রাখিতে পারেন তাঁহাদের আর নিদ্রা হয় না, হে কবির, তুমি জাগিয়া উঠ, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় উপরে উঠিয়া থাকিতে পারাই বাহাদুরী। তুমি সামান্ত ধাতুর রসায়ন ছাড়িয়া দিয়া আত্মারামের রসায়ন কর। দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইলে এক বস্তুতে পরিণত হয় বা গুণান্তর প্রাপ্ত হয় যাহা দ্বারা—তাহাই রসায়ন। আমরা সংসারে বাসনা ও চেষ্টা দ্বারা অবিরত আমাদের অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করাইতেছি। দরিদ্র ব্যক্তি বহু পরিশ্রম, চেষ্টা, ব্যাপার বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা খুব ধনী হইয়া নিজের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ সাধন করিতে পারে, কিন্তু কবির বলিতেছেন এ সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তুমি রাম-রসায়ন কর। যে রসায়ন দ্বারা এই মোহবদ্ধ জীব জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া আত্মারাম হইয়া যায়—ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই সেই রাম-রসায়ন হইয়া থাকে, অতএব সেই রসায়ন ক্রিয়ায় তুমি লাগিয়া থাক। (৭) কায়-মন বাক্যের সংযম—স্বরূপ, বলবান ও ধনীরা নিজ শরীরটাকেই খুব বড় করিয়া দেখে। নিজের মনে খুব দেমাক থাকে যে সে বড়লোক অথবা দেখিতে সুন্দর, কিম্বা সে খুব বলিষ্ঠ,—কিন্তু বাস্তবিক এই দেহটার মত ঘৃণিত ন্যক্কারময় জিনিষ আর কিছুই নাই, জ্ঞানহীন পশুতুল্য ব্যক্তিরাই ইহার গর্ব্ব করে। এক দণ্ডের মধ্যে ইহার কি পরিণাম হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর ইহার জন্য গর্ব্ব করিতে ইচ্ছা করে না। মনেতে এইরূপ বিচার রাখিয়া আসনাদি সাধনে চেষ্টা করিলে শরীরকে সংযত করা যাইতে পারে। মনঃসংযম হয়—মনকে অন্ত দিকে যাইতে না দিয়া আপনাতে আপনি থাকিতে পারিলেই প্রকৃত মনের সংযম হয়। বাক্যসংযম—বাক্যসংযমের জন্য জিহ্বাকে তালু-মূলে রাখিয়া চক্রে চক্রে স্মরণ করিতে থাকিবে ও অনাবশ্যক কথা বলিবে না, এইরূপে বাক্যসংযম হয়। বাক্যসংযমে ইচ্ছার নাশ হয়। শক্তি ক্ষয় না হওয়ায় কোন এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ সংযম করা যায় ও কার্য্য সিদ্ধি করা যায়। (৮) প্রত্যহ ধ্যানাভ্যাস ও যোগাভ্যাস করিবে। আমাদের মনে সর্ব্বদা বহু প্রত্যয়ের উদয় হইতেছে, সেই প্রত্যয়ের রোধ দ্বারাই যোগযুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যয় রোধ হইবে একাগ্রতা দ্বারা, একাগ্রতা আসিবে প্রাণসংযম হইতে, সুতরাং প্রত্যহ বেশী করিয়া মন দিয়া প্রাণায়াম করিবে। যে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ১৭২৮ বার করিয়া প্রাণায়াম করে এবং মধ্যে মধ্যে অবিরাম কয়েক দিন ধরিয়া ১৭২৮ বার করিয়া ২১৭৩৬ বার পূর্ত্তি করে সে ক্রিয়ার পরাবস্থার আস্বাদন পায় এবং যে এইরূপ ক্রিয়াতে লাগিয়া থাকে তাহার নিত্যই এই অবস্থা হয়। (৯) বৈরাগ্য —উক্তরূপ অভ্যাসের ফলে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন ইচ্ছাই থাকে না, ইহারই নাম বৈরাগ্য ॥ ৫২

(ব্রহ্মলাভের যোগ্যতা)

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

অন্বয়। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং (অহঙ্কার, পাশবিক বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, এবং শরীরধারণ বা ধর্ম্মার্থ লোকের নিকট অর্থাদি গ্রহণ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্ম্মমঃ (মমতাহীন) শান্তঃ (ও বিক্ষেপশূন্য হইলে) [সাধক] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন) ॥ ৫৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরক্তোঽহং ইত্যাদি অহঙ্কারং, বলং—দুরাগ্রহং, দর্পং—যোগবলাৎ উন্মার্গ-প্রবৃত্তিলক্ষণং। প্রারব্ধবশাৎ অপ্রাপ্যমাণেষ্বপি বিষয়েষু কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং চ, বিমুচ্য—বিশেষেণ ত্যক্ত্বা। বলাৎ আপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্, শান্তঃ—পরমাং উপশান্তিং প্রাপ্তঃ। ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেন অবস্থানায়, কল্পতে—যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—তাহার পর অহঙ্কার অর্থাৎ আমি বিরক্ত বা বৈরাগ্য-যুক্ত এই অহঙ্কার, বল—দুরাগ্রহ বা ঘৃণিত বিষয়ে স্পৃহা, দর্প—যোগবল হেতু উন্মার্গপ্রবৃত্তি, কাম—প্রারব্ধবশে অপ্রাপ্ত বিষয়াদিতে অভিলাষ, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ—এই সকলকে বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, এবং এই সমস্ত বিষয় বলপূর্ব্বক আসিয়া পড়িলেও তিনি নির্ম্মম অর্থাৎ মমতাবিহীন, এবং পরম উপশান্ত হইলে তখন তিনি "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ নিশ্চল ব্রহ্ম ভাবে অবস্থানের যোগ্য হইতে পারেন ॥ ৫৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অহংকার, বল, দর্প অর্থাৎ বুক চাড়া দিয়ে চলা, ইচ্ছা, ক্রোধ, অন্যের বাড়ী অর্থাৎ অন্য ব্যস্তুতে মন না দেওয়া ব্রহ্ম ব্যতীত, ইহা সকল হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া বিশেষরূপে এই উপযুক্ত সমুদয় বিষয় হইতে মুক্ত হয়, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমিও থাকে না, আমারও থাকে না—যাহা ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিদিগের সকলেরই অনুভব হইতেছে, ইহারই নাম শান্তি অর্থাৎ ক্রিয়ারই অন্ত—ইহা করিতে করিতে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায় অধিক কালে।—(১০) অহঙ্কার—দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের উপর যে আত্মজ্ঞান, তাহাই অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে হইবে (শঙ্কর)। (১১) বল—যে সামর্থ্য কাম-রাগাদিযুক্ত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহরূপ বল তাহাই পরিত্যাজ্য। (১২) দর্প—ধর্ম্মকে অতিক্রম। যোগাভ্যাস হেতু বিভূতি লাভ হইয়া উন্মার্গগামী হওয়া—এই দর্প লব্ধভূমিক হইলেও যোগীকে ভ্রষ্ট করিতে পারে। (১৩, ১৪) কাম, ক্রোধ—চিত্ত অশুদ্ধ থাকিলে পার্থিব বিষয় লাভে অভিলাষ হয় এবং বাসনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে। (১৫) পরিগ্রহ—অন্যপ্রকার পরিগ্রহ তো নয়ই, কেবল শরীর ধারণ জন্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও উচিত নহে। (অবশ্য ইহা কেবল সন্ন্যাসীদের পক্ষেই সম্ভব)। (১৬) নির্ম্মম—মমত্ব-বুদ্ধির পরিহার করিতে হইবে। কারণ মমত্ব

(ব্রহ্মভূতের পরাভক্তি লাভ)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪

বুদ্ধি যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ হর্ষ বিষাদাদিতে চিত্তের বিক্ষেপ হইবেই। (১৭) শান্ত—উপরত, এই মনের স্থিরতা না আসিলে ব্রহ্ম দর্শনে সামর্থ্য হয় না। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন সাধকের আত্মা ব্যতীত আর কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না, এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কোন বিষয়েই চিত্ত ধাবিত হয় না, তখন সাধক নির্ম্মম হইয়া যান, অর্থাৎ তাঁহার 'আমি ও আমার' থাকে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সাধক প্রশান্ত হইয়া যান, চিত্তে কোন উদ্বেগের তরঙ্গ উঠে না, ইহাই পরম নিবৃত্তিরূপ উপশান্তি। এই অবস্থা-প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান॥ ৫৩

অন্বয়। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্ত, অথবা শ্রবণমননাদি দ্বারা "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত), প্রসন্নাত্মা (লব্ধ-অধ্যাত্মপ্রসাদ ব্যক্তির) [কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে বা না থাকিলেও] ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি (শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না), সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ (তখন সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া) পরাং মদ্ভক্তিং (আমাতে পরমা ভক্তি) লভতে (লাভ করেন)॥ ৫৪

শ্রীধর। ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেন অবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মণি অবস্থিতঃ। প্রসন্নাত্মা—প্রসন্নচিত্তঃ, নষ্টং ন শোচতি ন চ অপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি, দেহাদি অভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষু অপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগ দ্বেষাদিকৃত বিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবলক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে॥ ৫৪

বঙ্গানুবাদ। ["আমি ব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চল অবস্থিতির ফল বলিতেছেন]—ব্রহ্মেতে অবস্থিত, প্রসন্নচিত্ত (যে ব্যক্তি নষ্ট বিষয়ে অনুশোচনা করে না এবং অপ্রাপ্ত বিষয়েরও আকাঙ্ক্ষা করে না,) যেহেতু তাঁহার দেহাভিমান নাই। অতএব সকল ভূতেই সমভাব হওয়ায় রাগ দ্বেষাদিকৃত বিক্ষেপের অভাব বশতঃ সর্ব্বভূতে "মদ্ভাবনা" রূপ পরা ভক্তি লাভ করেন॥ ৫৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রহ্ম হয়ে প্রসন্ন আত্মা কাজে কাজেই হন, কারণ সে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টিই করে না, যখন আসক্তি-পূর্ব্বক দৃষ্টি কোন বস্তুতে না করিল তখন সেই অন্য বস্তুর শোচনা থাকে না, আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলেই তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়—যখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে দৃষ্টিই নাই, তখন তাহার আকাঙ্ক্ষাও কাজে কাজেই নাই—সব ভূতেতেই সেই কূটস্থ ব্রহ্ম দেখে চর এবং অচরে, তখন অনুভব সব আপনা আপনি হয়—গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া আপনাতে আপনি থাকিয়া ক্রিয়া সর্ব্বদা করে এবং তাহাকেই লাভ বিবেচনা করে, যে লাভ সকলের উপর ইহা জ্ঞান করে।—যিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপই হইয়া যান তাঁহার কি কি লক্ষণ

ফুটিয়া উঠে? ভগবান এখানে সেই কথা বলিতেছেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইলে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে, কেননা কোন বস্তুর প্রতিই তাঁহার তখন আসক্তি থাকে না, এবং এইজন্য অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্যও আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং প্রাপ্ত বস্তুও যদি নষ্ট হইয়া যায় সেজন্যও তাঁহার কোন শোক হয় না। চর অচর সর্ব্বভূতে কূটস্থ দর্শন করিয়া চর অচর সমস্তই তাঁহার নিকট সমান বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত যাহার অন্য বস্তুতে লক্ষ্যই নাই তাহার আবার বস্তুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেমন করিয়া? সুতরাং তিনি অন্য কোন লাভকে লাভই মনে করেন না। ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় যখন ভোঁ হইয়া থাকেন তখন তিনি পরমানন্দে অবস্থিত, তখন অন্য বস্তু আছে কি নাই তাহাও তাঁহার মনে থাকে না। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতেও (যখন ঈষৎ ব্যুত্থিত ভাব) তাঁহার চিত্ত নির্ব্যাকুল, তখনও তিনি সর্ব্ববস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, এক পরমানন্দে সবই যেন ভরিয়া আছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয়। তখন বহু অর্থ বা প্রেমাস্পদ আত্মীয়ের সমাগমে, বা ঘোরতর কায়িক, মানসিক দুঃখ সমুপস্থিত হইলেও তাঁহার চিত্ত মথিত বা বেগযুক্ত হয় না। তিনি কোন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখেন; যাহাতে এই স্বরূপ স্থিতির বিচ্যুতি না ঘটে, এইজন্য সর্ব্বদা ক্রিয়া করাকেই লাভের বিষয় মনে করেন। সর্ব্বদা যে ক্রিয়া করে তাহার সর্ব্বত্রে কূটস্থ দর্শন হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি না হইলে কাহারও সমভাব বা সমদৃষ্টি হইতে পারে না। ক্রিয়া করিয়া যাঁহার অন্তঃকরণ যত বিশুদ্ধ হয় তাঁহার তত সমদৃষ্টি লাভ হয়। বহু বাসনা থাকিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না। প্রাণ বেগযুক্ত থাকিলে মনেরও বহু বাসনা বা স্পন্দন থাকিবেই। এইজন্য ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে স্থির করিয়া মনকে নিস্পন্দিত করাই সর্ব্ব প্রথমে আবশ্যক। মন নিস্পন্দিত হইলেই আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই স্বরূপের সাক্ষাৎকারই আত্মার অপরোক্ষানুভূতি। সেখানে আমি আমার কিছুই থাকে না। এই অভেদ ভাবই প্রকৃত জ্ঞান বা মুক্তি। পরা ভক্তিও ইহাকেই বলে। ইহা সহজলভ্য বস্তু নহে। ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

জ্ঞানপন্থ কৃপান কৈ ধারা। পরত খগেশ হোঈ নহিঁ বারা॥
জোঁ নিরবিঘন পন্থ নিরবহঈ। সো কৈবল্য পরমপদ লহঈ॥

জ্ঞান মার্গ তরবারির শাণিত ধারের মত তীক্ষ্ণ। এই ক্ষুরধারের পথ পার হওয়া বড় কঠিন। যদি নির্ব্বিঘ্নে কেহ এই পথ পার হইয়া যায় তবে তাহার পরমপদ কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু—

অতি দুর্ল্লভ কৈবল্য পরমপদ। সন্ত পুরাণ নিগম আগম বদ॥
রামভজন সোই মুক্তি গোসাঈঁ। অনইচ্ছিত আবই বরিয়াঈঁ॥

পরমপদ কৈবল্য যে কত দুর্লভ, সাধুগণ পুরাণ ও বেদ সকলেই উহা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু রামভজনের দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহা সাধকের নিকট উপস্থিত হয়।

ক্রিয়া করিয়াও ঐরূপ দুর্লভ পরমপদ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রত্যেক ক্রিয়াবানই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত কেহই

(পরাভক্তির দ্বারা আত্মার স্বরূপ জ্ঞান বা মুক্তি)

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌॥ ৫৫

অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। মানবের বিষয়াসক্ত চিত্ত পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত করে, কিন্তু যাঁহারা আত্মক্রিয়া দ্বারা আত্মারামের ভজন করেন, সেই তৎপর ক্রিয়াবানের নিকট ক্রিয়ার পর অবস্থা রূপ কৈবল্য জ্ঞান আপনা আপনই সমুদিত হইয়া থাকে। সাধক বুঝিতেও পারেন না উহা কিরূপে আসিল। সাধারণতঃ বস্তু প্রাপ্তি হইলে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয়, কিন্তু যাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্তের ক্রিয়াশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায় সুতরাং কোন সংস্কারের স্ফুরণ থাকে না এবং এই জন্য ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে না, পাইলেও তাহার প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ আসে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চিত্ত তরঙ্গশূন্য হওয়ায় আর নানাত্বের উপলব্ধি হয় না। এই সমতার নাম **পরাভক্তি**। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভগবদ্ভাবমীক্ষতে।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

যিনি সর্ব্বভূতে এক ভগবদ্ভাব ও ভগবদাত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম। অবশ্য ক্রিয়ার পর অবস্থায় এ সকল কথার কোন আলোচনা করাই সম্ভব নহে, কারণ তখন ভূতও থাকে না—আর সর্ব্ব কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু পরাবস্থার পরাবস্থাতে সর্ব্বভূতে যে এক আত্মাই রহিয়াছেন এবং এই সব অনন্ত ভাব যে সেই আত্মভাবের মধ্যে পরিসমাপ্তি হইতেছে তাহা বুঝা যায়॥ ৫৪

অন্বয়। [ব্রহ্মভূত ব্যক্তি] ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) [অহং—আমি] যাবান্‌ (যে প্রকার) যঃ চ অস্মি (এবং যাহা হই) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) অভিজানাতি (জানিতে পারেন); ততঃ (অনন্তর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (তত্ত্বতঃ জানিয়া) তদনন্তরম্‌ (তৎপরে) বিশতে (আমাতে প্রবেশ করেন)॥ ৫৫

* সাম্প্রদায়িকেরা এই শ্লোকটিতে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে বলিতে চান। ভক্তির প্রাধান্য তো আছেই, নচেৎ কিসের জোরে লোক ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করিবে? কিন্তু যাঁহাদের মতে জ্ঞান বা মুক্তি কিছুই নহে তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—'তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং,—সেই অদ্বয় জ্ঞান বস্তুকেই তত্ত্ববিদের তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ বলিয়াছেন। অদ্বয় অর্থাৎ যাহার দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ একমাত্র সেই বস্তুই আছে, আর বিশ্বে অন্য কোন বস্তু নাই, সুতরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা জ্ঞানেরই প্রকার ভেদ মাত্র। এই জ্ঞান বা তত্ত্বই তৎ বস্তুর স্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানও চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ভগবানের মতে "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌"—কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ। জ্ঞানী কিরূপে তাঁহার স্বরূপ হন তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা" যেহেতু তিনি যুক্তাত্মা অর্থাৎ আমার সহিত যোগযুক্ত সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি যে আমি সেই আমাকেই তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মভূত পুরুষ "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু" হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া থাকে।

শ্রীধর। ততশ্চ—ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মাম্ অভিজানাতি। কথম্ভূতং? যাবান্—সর্ব্বব্যাপী, যশ্চ অস্মি—সচ্চিদানন্দঘনঃ তথাভূতং। ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা, তদনন্তরং—তস্য জ্ঞানস্য উপরমে সতি, মাং বিশতে—পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৫৫

বঙ্গানুবাদ। [তাহার পর কিরূপ হয় তাহা বলিতেছেন]—সেই পরা ভক্তি দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া থাকে আমি কিরূপ? যাবান্ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী এবং যেরূপ সচ্চিদানন্দঘন আমি তথাভূত আমাকে জানে, এবং এইরূপে যথার্থ ভাবে জানিয়া তদনন্তর—সেই জ্ঞানের উপরম হইলে—আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ পরমানন্দ রূপ হইয়া যায়॥ ৫৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক আমি যে কি তাহা সাদর পূর্ব্বক জানিতে পারে, যত কিছু সব আমি যাহা আর যাহা কেহ আমি—তত্ত্বতঃ অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া তারপর আমি যে কে তাহা জানিয়া আমাতেই লয় হয় পরে।—আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন পরমাত্মবিষয়ে জ্ঞানধারা যাহাতে নিরন্তর প্রবাহিত হয় তাহারই জন্য যে চেষ্টা তাহারই নাম জ্ঞাননিষ্ঠা। এই জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা পরস্পর বিরুদ্ধ। তাহা হইলে ক্রিয়া সাধন দ্বারা এইরূপ জ্ঞানের প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব? অতএব ক্রিয়া সাধন দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি কল্পনা করা অনুচিত। জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। আত্মাই সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। আত্মা উৎপত্তি-নাশ-বর্জ্জিত, তাহা স্বতঃই বিদ্যমান। এবং তাহা স্বপ্রকাশ-স্বরূপ। যাহা স্বয়ং প্রকাশিত তাহাকে প্রকাশিত করিবার চেষ্টাও বিফল প্রয়াস মাত্র। প্রাণ পরমাত্মার মায়াশক্তি, সেই মায়াশক্তি হইতে মন উৎপন্ন হইয়া নানাবিধ কল্পনা করে, সেই কল্পনাগুলি প্রাণের কম্পন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারই প্রভাবে অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে হয়। ক্রিয়াদ্বারা এই প্রাণস্পন্দ নিরোধ হইলেই মনের মননশক্তি বা কল্পনারাশি উন্মূলিত হইয়া যায়, তখন আত্মার যাহা স্বাভাবিক ভাব তাহাই ফুটিয়া উঠে। এই প্রকাশ পূর্ব্বে ছিল না এখন হইল—তাহাও নহে, তাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে। মেঘমালা যেমন স্বপ্রকাশ ভাস্করকে আবৃত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক মেঘমালা সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না—ঘনাচ্ছন্ন দৃষ্টি দ্বারা সূর্য্যকে ঘনাছন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র, স্বরূপতঃ তাহা কখনই ঘনাছন্ন হয় না। তদ্রূপ মনের সঙ্কল্প-বিকল্পাদি থাকা হেতু আত্মাকে অপ্রকাশিত বলিয়া মনের ধারণা হয় মাত্র, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি মনের কল্পনারাশি এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গ্রহণরূপ কার্য্যও হইতে পারিত না, আত্মসত্তার অস্তিত্ব না থাকিলে। উহাদের কার্য্যগুলি তাই আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণ করে। সুতরাং যাহা আছে, যাহা পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত—তাহাকে পাইবার জন্য আবার প্রয়াসের কি প্রয়োজন? সুতরাং আত্মলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য সাধন অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তবে সাধনের জন্য শাস্ত্রাদি এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি কেন করিতে বলেন? তাহার কারণ মনের বৈকাল্পিক ভাব। হস্তেই দ্রব্য রহিয়াছে, ভ্রমবশতঃ মনে হইতেছে তাহা আমার নাই। এইজন্য অন্বেষণের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। যখন মনের চাঞ্চল্য ঘুচিল, স্থির হইলাম, তখন দেখি যাহাকে খুঁজিতেছিলাম তাহা হস্তের মধ্যেই রহিয়াছে। এইরূপ আত্মার চিরস্থির নিত্য অবিচল রূপ

স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু মনের বিক্ষেপবশতঃ তাহা মনে পড়িতেছে না। মনের এই চাঞ্চল্যই প্রাণশক্তির স্পন্দনের ফল। তাই শাস্ত্র, সাধু ও গুরু একবাক্যে সকলে বলিতেছেন "প্রাণকে" স্থির কর। প্রাণ স্থির হইলেই মনের মনন্ শক্তি থাকিবে না, তখন দেখিবে তুমি আত্মারূপে চিরদিন বিরাজিত রহিয়াছ। তোমার শান্ত শুদ্ধভাব, অবিচল অবিকৃত রূপ কেহই অশুদ্ধ, চঞ্চল বা বিকৃত করিতে পারে না। এই স্মৃতির স্ফুরণ হয় প্রাণস্পন্দনের নিরোধ হেতু, তাই সাধনার জন্য এই সকল সাধনপথ অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিরূপে প্রাণ স্পন্দিত হয় এবং তাহা কিরূপে মন ও পরে ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদিরূপে পরিণত হইয়া এই অনর্থ সংসারভাবকে বিকশিত করিয়া তুলে, তাহা অসত্য হইলেও তাহার কার্য্য কারণের ধারার মধ্যে এক স্বতঃ-সিদ্ধ শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে ; এবং প্রাণ যেরূপে বিষয়াকারে পরিণত হইয়াছে তাহা অবগত হইয়া এবং তাহা হইতে মনকে সরাইয়া বিপরীত ভাবনা দ্বারা প্রাণধারাকে বিপরীত মুখে প্রবাহিত করিয়া দিতে পারিলে অতি সহজে প্রাণের সহিত মনও আত্মার মধ্যে সংলীন হয়। তখনই বুঝিতে পারা যায় যাহা পূর্ব্বে ছিল পরে তাহাই রহিয়াছে, মধ্যাবস্থায় স্বপ্নদর্শনের ন্যায় যে একটু ক্ষণিকের চাঞ্চল্য হইয়াছিল তাহাই জগৎ রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল মাত্র, নচেৎ আদি অন্তে সেই এক অব্যক্ত সত্তাই রহিয়াছে ও থাকিবে। এই মহাসত্যের পরিচয় পাইলেই জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয়। ইহাই বিপরীত রতি। তখন কাল হইতে সমুত্থিত এই যে অনন্ত প্রকাশ তাহা মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে বিলীন হইয়া যায় এবং মহাকালীও তুরীয়-ব্রহ্ম মধ্যে আত্মসংগোপন করিয়া পুরুষ প্রকৃতি উভয়ে একরূপতা লাভ করেন। আত্মার এই অবিকারী স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। এতদ্দারাই জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভেদ ভাব সূচিত করে। এই দ্বৈতবর্জ্জিত চৈতন্যরূপই আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এবং তাহা স্বতঃই জন্ম-জরা-মরণাদি বর্জ্জিত অবস্থা। আত্মার এই অভয় পরমভাব জানিতে পারিলেই আর জীবের জীবত্ব থাকে না। জীবের এই অবিনশ্বর গতিকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই জীব তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন। এই আত্মাই সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত, আকাশকল্প, ইনিই শাস্ত্রে "উত্তম পুরুষ" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই জ্ঞাননিষ্ঠাই চতুর্থী ভক্তি, ইহা অপর ত্রিবিধ ভক্তি হইতে বিলক্ষণ। এইরূপ ভক্তিদ্বারাই "আমি" যে কি তাহা জানা যায়, এবং যাহা কিছু সমস্তই যে সেই "আমি" হইতে অভিন্ন তাহাও জানিতে পারা যায়। ইহাই তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইবামাত্রই "আমিও" থাকে না, "আমারও" থাকে না। এইরূপ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয় এবং জীব ঈশ্বর বিভিন্ন এই প্রকার ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। ইহাই "আমি" কে জানিয়া "আমি"-তে লয় হওয়া বা পরমাত্মার মধ্যে প্রবেশ করা ॥ * ৫৫

* "তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং"—"আমার যে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আমি অভয় ও অবিনাশী—এই ভাবে তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে পারে, তাহার পর আমাকে এই ভাবে জানিয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মের স্বরূপকে জানা ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া একই কথা। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। আত্মা আকাশকল্প, কেন না সেখানে কিছুই নাই। চিত্তাকাশও আকাশ, চিত্তাকাশের চিত্ত ক্ষয় হইলে আকাশই অবশিষ্ট থাকে, তখন এই আকাশ ও আত্মাকাশ একই হইয়া যায়, কোন ভেদ লক্ষিত হয় না। আমি বা আমার স্বরূপ যে আকাশ

(ভগবদাশ্রিতের মোক্ষ)

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

অন্বয়। সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি (সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (মৎপরায়ণ বা আমাকে আশ্রয় করিলে) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতং অব্যয়ম্ পদং (নিত্য অক্ষয়পদ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫৬

শ্রীধর। স্বকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাৎ উক্তং মোক্ষপ্রকারম্ উপসংহরতি—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি—নিত্যানি নৈমিত্তিকাণি চ কর্ম্মানি, পূর্ব্বোক্তক্রমেন সর্ব্বদা কুর্ব্বাণঃ। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য সঃ, মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্—অনাদি, অব্যয়ং—নিত্যং, সর্ব্বোৎকৃষ্টপদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬

বঙ্গানুবাদ। [স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনাজনিত উক্ত যে মোক্ষপ্রকার --তাহার উপসংহার করিতেছেন]—নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মই পূর্ব্বোক্ত ক্রমে করিয়াও যে মদ্ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ আমি যাহার আশ্রয়ণীয়, স্বর্গাদি ফল যাহার আশ্রয়ণীয় নহে, সে আমার প্রসাদে অনাদি নিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সমুদয় কর্ম্ম সে ক'রে ও আমার আশ্রয়ে থেকে অর্থাৎ আত্মাতে থেকে ক্রিয়া করে—এই আত্মক্রিয়া করিতে করিতে আনন্দলাভ করতঃ নিত্য সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে ব্রহ্মপদে অবিনাশী হইয়া যায়।—ভিতরটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ মলশূন্য হওয়ায় সাধকের ধ্যানভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তখন আর তিনি বাহিরের কর্ম্ম কিছু করিতে পারেন না, ইহাই কর্ম্মসন্ন্যাস, তখন এক আত্মাকারা বৃত্তি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না। কিন্তু অন্তঃকরণ এতটা শুদ্ধ যাহার না হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা গভীরতম ভাবে এখনও যাহার হয় নাই বা পূর্ব্ব প্রারব্ধ বশতঃ যাহার মন ততটা নির্ম্মল হইতে পারে নাই সুতরাং সেরূপ উচ্চ অবস্থা ইহজন্মে লাভের আশা নাই, তিনি কি ভাবে কর্ম্ম করিলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন সেই শরণাগতি ভাবের কথাই ভগবান এখানে বলিতেছেন। অর্থাৎ যে সাধককে এখনও

তাহা জানিতে পারাই তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ জানিলেই যে উপাধিশূন্য আকাশকল্প অবস্থার মধ্যে দ্রষ্টা আমিও ডুবিয়া যায়—তাহাই 'বিশতে তদনন্তরম্'। প্রথমে সাধন করিতে করিতে সাধক এই স্থূলদেহাতীত এক জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গদেহের অনুভব করেন, পরে ঐ জ্যোতিঃর অন্তর্গত আর একটী শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু দেখিতে পান—তাহাই আমার "আমি" বা "জীব"। পরে ঐ জীব-বিন্দুও অনন্ত অরূপ স্থির সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার নাম রূপ বিস্মৃত হয়। সকল নামরূপের মূলে এই বিন্দু রহিয়াছে। অনন্ত জীব অনন্ত বিন্দুরূপে অবস্থিত। পরে দীর্ঘ সমাধিস্থিতি লাভ করিলে সাধক দেখিতে পান এই অনন্ত বিন্দু একটী বিন্দুরই বিম্ব প্রতিবিম্ব মাত্র। এই সমষ্টিভূত অব্যাকৃত চিদাকাশকে অনুভব করিতে পারিলেই সাধকের দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, কিন্তু তখনও "দ্রষ্টা আমি" থাকিয়া যায়—ইহাই তত্ত্বতঃ জানা। পরে এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিন্দু ও অব্যাকৃত চিদাকাশ সমস্তই আত্মসত্তায় বিলীন হয়। তখন এক অদ্বিতীয় আত্মসত্তা মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। তখন তাহা দেখিবারও কেহ থাকে না। কবির সাহেব বলিয়াছেন—"হেরত হেরত হে সখি হেরত গয়া হেরায়"—ইহাই "বিশতে তদনন্তরম্"।

(মচ্চিত্ত হও এবং তজ্জন্য বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কর)

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

সংসারের সকল কর্ম্মই করিতে হয় কিন্তু মনটা তাঁহার দিকেই পড়িয়া থাকে, অবসর পাইবা মাত্রই যিনি একটুও সময় নষ্ট না করিয়া ক্রিয়াতে বসিয়া যান, অথবা সকল কর্ম্ম করিতে করিতেও যিনি প্রাণের গতিকে লক্ষ্য করিতে ভুলেন না, অথবা চক্রে চক্রে মনকে সর্ব্বদা লাগাইয়া রাখেন—তাঁহার মন ক্রমে ক্রমে স্থির, বিশুদ্ধ ও প্রসন্ন হয়। ইহার নামই মদ্ব্যপাশ্রয় বা শরণাগতি। পূর্ব্ব সুকৃতির অভাববশতঃ যাহার চিত্তমল একেবারে অপগত হয় নাই, এমন কি যিনি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মও করিয়া ফেলেন, তিনিও যদি দৃঢ়ভাবে গুরূপদিষ্ট উপায় দ্বারা স্মরণে তৎপর হন তিনিও পরমগতি লাভ করিতে পারেন। কারণ সর্ব্বদা স্মরণের ভাব হইতেই মন স্থির ও প্রসন্ন হইতে থাকে। ইহাই ভক্তির নামান্তর। এইরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভের পর বৈরাগ্য অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুতে মন না যাওয়া এবং জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্বদা অবিনাশী ব্রহ্ম পদে সাধক প্রবেশ লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৬

অন্বয়। চেতসা (মনের দ্বারা অথবা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি সন্ন্যস্য (আমাতে সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য (বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক, সমত্ববুদ্ধিরূপ যে যোগ তাহা আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সমাহিত হইয়া) মচ্চিত্তঃ সততং ভব (সতত মচ্চিত্ত হও অর্থাৎ আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও) ॥ ৫৭

শ্রীধর। যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সন্ন্যস্য—সমর্প্য, মৎপরঃ—অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ। ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগম্ উপাশ্রিত্য, সততং—কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইতি ন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য তথাভূতো ভব ॥ ৫৭

বঙ্গানুবাদ। [যেহেতু নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রহ্মলাভ হয়, অতএব বলিতেছেন]—কর্ম্ম-সকলকে চিত্ত দ্বারা আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপর অর্থাৎ আমিই পরম প্রাপণীয় পুরুষার্থ যাহার তাদৃশ হইয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা যোগকে আশ্রয়পূর্ব্বক সতত মচ্চিত্ত হও. অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইত্যাদি ৪র্থ অধ্যায় শ্লোকোক্ত চিত্ত যেরূপে হয়, তুমিও তদ্রূপ হও ॥ ৫৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিত্তের দ্বারায় সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রহ্মই করিতেছেন বলিয়া জেনে থাকিলে সব কর্ম্মেরই নাশ, কারণ অন্য এক ব্যক্তি করিতেছে কোন কর্ম্ম., সে কর্ম্ম তুমি না করিলে তোমার সে কর্ম্মের নাশ—মৎপরঃ—সর্ব্বদাই আত্মাতেই থাকিবে ও ক্রিয়া করিবে ; বুদ্ধি দ্বারায় অর্থাৎ স্থির চিত্তে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আপনাতেই আপনি সকল কর্ম্ম করিয়াও থাকিবে যাহা সাধুদিগের বিচিত্র দশা, যাহা আপনা আপনি ক্রিয়া করিতে করিতে হয়।—

(আত্মনিমগ্ন চিত্তের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্গতির নাশ
এবং সাহঙ্কারের বিনাশ)

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮

কর্ম্ম যদি কর্ম্মফল প্রসব না করে তবে তাহা কর্ম্ম না করারই তুল্য। কর্ম্মেতে মমত্ব বুদ্ধি না থাকিলে সে কর্ম্মের ফলভোগ কর্ত্তাকে করিতে হয় না, শাস্ত্র, গুরু ও বিচার দ্বারা ইহা জানিয়া রাখিলে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল দ্বারা আবদ্ধ হইতে হয় না। ব্রহ্মই করিতেছেন আমি করিতেছি না এই ভাব থাকা চাই, তাহা হইলে সে কর্ম্ম তোমার কৃত হইল না, সুতরাং তোমার কর্ম্ম নাশ হইয়া গেল। এই ভাব আসিবে কিরূপে? এজন্য "মৎপর" হইতে হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বদা আমাকে লইয়া থাকিতে হইবে বা আত্মাতেই থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা যে ক্রিয়া করে তাহার মন অন্য কোথাও যাইতে পারে না। এইরূপ সর্ব্বদা যে ক্রিয়া করে তাহার বুদ্ধি স্থির হয় অর্থাৎ যিনি অযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি স্থির নহে, সেই বহুমুখী বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মচিন্তা হয় না। যাহার ব্রহ্মমুখী বুদ্ধি বা স্থির বুদ্ধি তিনি আপনাতে আপনি থাকেন। এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়াও অনিচ্ছার ইচ্ছায় যোগমগ্ন সাধকের সকল কর্ম্মই হইয়া যায়। সে এক বিচিত্র অবস্থা—তাহা না হইলে কেহই বুঝিতে পারে না। বুদ্ধিকে সমাহিত করাই বুদ্ধিযোগ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে বুদ্ধির স্থিরতা তাহাই বুদ্ধিযোগ। তখন ভেদবুদ্ধি থাকে না, বুদ্ধিতে সমতা আসে। এইরূপ সমতায় চিত্ত সংলগ্ন হইলেই "মচ্চিত্ত" হওয়া যায়। মচ্চিত্ত হইতে হইলেই 'মৎপর' হইতে হয়। আত্মাতে সর্ব্বদা থাকিবার উপায় সর্ব্বদা ক্রিয়া করা। ইহাই আসল শরণাগতির অবস্থা (যাহা পূর্ব্বশ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলেই স্থিরবুদ্ধির আবির্ভাব হয়। যাহার বুদ্ধি স্থির তাহার সর্ব্বদাই অসংমূঢ় ভাব হইয়া থাকে, তখন লাভালাভ, জয় পরাজয় ইত্যাদিতে বুদ্ধির বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য লক্ষিত হইবে না। বুদ্ধির সমতা হইতেই সাধকের সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকের দেহাত্মবোধ বা আপন পর বোধ কিছুই থাকে না। এইরূপ সতত-যুক্তের সর্ব্বকর্ম্মার্পণ আপনা আপনিই হইয়া যায়। কারণ যিনি "মচ্চিত্ত" হইতে পারিয়াছেন তাঁহার চিত্তে অন্য প্রত্যয় সমুদিত হয় না, কেবল আত্মাকারা বৃত্তিরই প্রত্যয় হইতে থাকে। এই মচ্চিত্ততাই তত্ত্ববুদ্ধি বা জ্ঞান লাভের উপায়। মনোমল বা চিত্ত-বিক্ষেপ থাকিতে এই প্রকার বিশুদ্ধ স্থির ভাবের উদয়ই হয় না। আত্মার সহিত বুদ্ধির যোগ হইলে সাধক অনন্যশরণ হইতে পারেন। আত্মার সহিত বুদ্ধির যোগ রাখিবার প্রধান উপায়ই হইল ক্রিয়াযোগ। অন্য কর্ম্মের ন্যায় এ কর্ম্মে কোন বন্ধন নাই এবং এই কর্ম্ম দ্বারাই বুদ্ধি স্থির ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৭

অন্বয়। মচ্চিত্তঃ (মদ্গত চিত্ত হইলে) ত্বং (তুমি) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্ব্বদুর্গাণি (সকল প্রকার দুঃখ দুর্গতি) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। অথ চেৎ (আর যদি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) ন শ্রোষ্যসি (না শুন), বিনঙ্ক্ষ্যসি (তবে বিনষ্ট হইবে) ॥ ৫৮

শ্রীধর। ততো যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু—মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি—দুস্তরাণি সাংসারিকাণি দুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেৎ—যদি পুনঃ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ—জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ, মদুক্তং এতৎ ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি—পুরুষার্থাৎ ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি॥ ৫৮

বঙ্গানুবাদ। [তাহার পর যাহা হইবে তাহা শুন]—মদ্‌গতচিত্ত হইলে আমার প্রসাদে সমস্ত দুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিবে। বিপরীতাচরণে যে দোষ হয় তাহাও বলিতেছেন—যদি পুনরায় তুমি জ্ঞাতৃত্বাভিমান বশতঃ (অর্থাৎ নিজেকে যদি তুমি পণ্ডিত মনে করিয়া) মদুক্ত বাক্য না শুন, তবে তুমি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে॥ ৫৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমাতে সর্ব্বদা চিত্ত রাখিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে, যাহা গুরুবক্ত্র গম্য, সকল শক্রুর মধ্যে কেল্লাতে যে পড়িয়া যায় মন তাহা হইতে মুক্ত হইবে। যদ্যপিস্যাৎ আমি বড়লোক বলিয়া অহংকার হইয়া আমার কথা না শুন তাহা হইলে মরুবে অর্থাৎ অবস্থান্তর হ'বে—জন্মগ্রহণ করিতে হ'বে—আমার কথাটা শুনো, পাগলার মাতালের কথাটা শুনো।—বাহ্য "আমির" বেষ্টনের মধ্যে আসিলেই চিত্ত অহঙ্কৃত হয় অর্থাৎ তখন আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত "আমি"তে চিত্ত নিমজ্জিত হইলেই আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। এই অবস্থায় সব কেল্লাই পার হওয়া যায়। মনকে বাঁধিবার জন্য ষড়রিপুবর্গ কত স্থানে থানা পাতিয়া বসিয়া আছে। তাই নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ নিরাবলম্ব করিয়া ফেলিতে হইবে, মনের যেন কোন আশ্রয় বা অবলম্বন না থাকে। নিজের চিত্তকে তাঁহার চিত্তের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হইবে। প্রাণ বহির্ম্মুখী থাকিলে প্রাণস্পন্দনের সহিত চিত্তেও স্পন্দন উঠিবে, তাহাতে কেবল রাশি রাশি বাসনার ফেনই উত্থিত হইবে। সে অবস্থায় চিত্ত বিষয়াকারাকারিত হইয়া কেবল বিষয়েরই অনুসন্ধান করিবে, সে চিত্ত কখন শান্ত বা শুদ্ধ হইতে পারিবে না বা আত্মভাবে মগ্ন হইতে পারিবে না। ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে জীব কখনও তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারে না। স্বধর্ম্মই আত্মভাব—উহাই জন্মজরামৃত্যুবিহীন স্থির প্রশান্ত ভাব। এই স্বধর্ম্মে যে আপনার মতিকে বাঁধিতে না পারে, সেই ধর্ম্মহীন ব্যক্তি কখনও তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারে না। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন—"তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো, ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ"—যাঁহারা অক্রতু অর্থাৎ কামনাশূন্য, যাঁহারা বীতশোক অর্থাৎ শোকদুঃখাদিরহিত, তাঁহারাই শরীরধারক ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রভৃতির প্রসন্নতা বা স্থিরতা বশতঃ আমার বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বভাব বা নির্ব্বিকার ভাব সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

সুতরাং ভগবানের শরণাগত হইতে হইলেও পুরুষার্থের আবশ্যক। পুরুষের প্রযত্নই পৌরুষ, সেই পৌরুষও ভগবদ্‌শক্তি। এই আত্মশক্তির প্রভাবেই মন সর্ব্বপ্রকার আসক্তি শূন্য হইয়া যাইতে পারে। আত্মসাক্ষাৎকার পৌরুষ-প্রযত্নেরই ফল। যে চেষ্টা করিবে, যে লাগিয়া থাকিবে, তাহারই হইবে, এবং তাহাও ঈশ্বরশক্তি বা আত্মশক্তি, সুতরাং তাহা করিয়া কাহারও অহঙ্কার করিবার কিছু থাকে না। যাঁহারা দিনরাত ক্রিয়ায় লাগিয়া থাকেন, তাঁহাদের ক্রিয়ার পরাবস্থা আসিবেই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবের জীবত্ব থাকে না, তখন

(জীবের প্রকৃতি পরতন্ত্রতা)

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯

জীব শিবের সহিত মিলিয়া শিব হইয়া যান। তাই আত্মাতে চিত্ত রাখিয়া সর্ব্বদা ক্রিয়া করিবার উপদেশ লাহিড়ী মহাশয় দিয়াছেন। স্থানে স্থানে ষড় রিপুবর্গের অভেদ্য দুর্গ এবং নিজকৃত পূর্ব্বকর্ম্মের সংস্কার, এ সব ভেদ করিয়া বাহির হওয়াই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তখনই মন তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইতে পারে, যদি মচ্চিত্ত হয় অর্থাৎ কূটস্থে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখে। অভিমান বশতঃ নিজেকে বড় মনে করিয়া যদি সারাৎসার এই কথা না শুন ও তদনুরূপ কাজ না কর তাহা হইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ বারবার জন্মমরণের বশীভূত হইতে হইবে। ভগবৎ কৃপা সেখানে ভরা, যেখানে সেই আপনাতে আপনি—সেখানটিতে মনোবুদ্ধিকে পৌঁছাইয়া দাও। মন হইতে সব আশা সব কল্পনা নিঃশেষে দূর করিয়া দাও, তবে তুমি অকিঞ্চন হইতে পারিবে। এই অকিঞ্চনের প্রতি ভগবানের অসীম কৃপা ॥ ৫৮

অন্বয়। অহঙ্কারং আশ্রিত্য (অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি যৎ মন্যসে (এইরূপ যে মনে করিতেছ) তে (তোমার) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা এব (মিথ্যাই) [কারণ] প্রকৃতিঃ ত্বাং (প্রকৃতি তোমাকে) নিয়োক্ষ্যতি (যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে) ॥ ৫৯

শ্রীধর। কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেৎ ? তত্রাহ—যদহঙ্কারমিতি। মদুক্তম্ অনাদৃত্য কেবলম অহঙ্কারম্ অবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামি ইতি যং মন্যসে—ত্বম্ অধ্যবস্যসি। এষ তে ব্যবসায়ো মিথ্যৈব, অস্বতন্ত্রত্বাৎ তব। তদেবাহ—প্রকৃতিঃ ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি—যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥ ৫৯

বঙ্গানুবাদ। [আমার স্বাভিলাষ নষ্ট হউক, তথাপি বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ করিব না—যদি এইরূপ বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন]—আমার বাক্য অনাদর করিয়া, কেবল অহঙ্কার অবলম্বন পূর্ব্বক "আমি যুদ্ধ করিব না" এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার ঐ অধ্যবসায় মিথ্যা কারণ তোমার স্বাধীনতা নাই। তাহাই বলিতেছেন—যে তোমার প্রকৃতি রজোগুণরূপে পরিণত হইয়া (কারণ তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব) তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবেই ॥ ৫৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যত্তপিস্যাৎ দেমাক্ করে না ক্রিয়া কর যে আমি বড়মানুষ আমি আবার ক্রিয়া কি করব—তবে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত আমি স্বর্গে যাই আমি কৈলাসপুরে যাই—আমার হেন হ'ক, আমার তেন হ'ক, এ সমুদয়ই মিছে কিন্তু ঐ প্রকৃতি দ্বারায় মিথ্যা ব্যবসা করিলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এবং কাজে কাজেই পরে এই ক্রিয়াই আপনা আপনি করিতে হইবে, যখন দুঃখ ব্যতীত সুখ স্থায়ী কিছুতেই দেখিবে না।—"যুদ্ধ করিব না"—এ নিশ্চয় তোমার টিকিবে না। কারণ জীব মাত্রেই প্রকৃতির দাস। তুমি ইচ্ছা

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০

না করিলেও তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবেই। আমার আত্মদর্শনে কাজ নাই, আমি যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদির দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিব, আত্মদর্শনে যে হাঙ্গামা সে হাঙ্গামা পোহাইতে রাজি নহি—একথা বলিলেও চলিবে না। বারবার জন্ম মৃত্যুর দুঃখ দর্শন করিয়া এবং সংসারে বিবিধ ক্লেশ তাপ ও বিরহের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া আত্মানুসন্ধানের জন্য একদিন আমাকে বাধ্য করিবেই! কারণ যাহারা জন্মজন্মান্তরীয় সংস্কার বশতঃ রজঃ সত্ত্ব মিশ্রিত স্বভাব লাভ করিয়াছে, তাহারা একান্ত আসক্তচিত্তে সংসার লইয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের নিজ প্রকৃতিই আত্মজিজ্ঞাসার জন্য নিজেকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। সেইজন্য আত্মজ্ঞান লাভার্থ চেষ্টা বা যুদ্ধ করা যাহা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক তাহা করিবে না কেন বলিতেছ? তুমি ক্রিয়া কর, তবে এইটুকু বিচার রাখিও যে ক্রিয়াতে তোমার যেন ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলেই কৌশলে প্রকৃতিকে বশ করিতে পারিবে। এখন যাহা অসাধ্য মনে করিতেছ ক্রিয়াভ্যাসে সতত সচেষ্ট থাকিলে (যাহা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক) তুমি একদিন এরূপ অবস্থা লাভ করিবে যখন আর তোমাকে এজন্য হানাহানি লড়াই করিতে হইবে না। তোমার স্বভাব আপনা আপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব বলিয়া চিরদিনই যে তোমাকে ক্রিয়া করিয়াই যাইতে হইবে, স্থির নিশ্চল আর হইতেই পারিবে না, তাহা নহে। কিন্তু এখনই যদি শান্ত স্থির হইয়া বসিয়া থাক এবং তজ্জন্য ক্রিয়ার চেষ্টা পর্য্যন্ত ত্যাগ কর তাহা হইলে চলিবে না! তোমার স্বভাবই তোমাকে ক্রিয়া করাইয়া তবে ছাড়িবে। ক্ষত্রিয় স্বভাব তোমার, তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণের মত ঠিক শান্ত ভাবে ধ্যান মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না, এখন যদি ক্রিয়ারূপ যুদ্ধ ছাড়িয়া চুপ করিয়াই বসিয়া থাক, তথাপি তুমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। যদি শূদ্র হইতে তাহা হইলে ঢুল আসিত, বৈশ্য হইলে কত প্রকার লাভালাভের খতিয়ান করিতে! কিন্তু তুমি যে ক্ষত্রিয়, তুমি চুপ করিয়া থাকিলেও তোমার মন ক্রিয়া করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে, এইজন্য নিজ প্রকৃতিমত কাজ কর। ক্ষত্রিয়স্বভাবে শান্ত শুদ্ধ স্থির ভাব মধ্যে মধ্যে আসে, এইজন্য সেই অবস্থার প্রতি লোভ আছে কিন্তু এখনও তো পরাবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পার না! এজন্য তোমার মনে ক্লেশ হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু ক্রিয়া (যুদ্ধ) ব্যতীত যখন ঐ ক্লেশ উপশমের আর কোন ঔষধ নাই, তখন ক্রিয়া না করিয়া আর উপায় কি? যদি একান্তই গোঁয়ারতুমি করিয়া ক্রিয়া না কর, তবে জন্ম মরণের হাত এড়াইবে কিরূপে? এই জন্মমরণের অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া আবার একদিন নিজে নিজেই ক্রিয়া করিবার জন্য শ্রীগুরুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। গুরুই লক্ষ্যভেদের সাধন দেখাইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। তবে প্রকৃত শিষ্য হওয়া চাই॥ ৫৯

অন্বয়। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি (যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন কর্ম্মণা (স্বীয় কর্ম্মদ্বারা)

নিবদ্ধঃ (আবদ্ধ তুমি) [সুতরাং] অবশঃ অপি (অবশ হইয়াও) তৎ করিষ্যসি (তাহা করিবে) ॥ ৬০

শ্রীধর। কিঞ্চ—স্বভাবজেনেতি। স্বভাবঃ—ক্ষত্রিয়ত্বে হেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারঃ, তস্মাৎ জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা—শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধঃ—যন্ত্রিতঃ, ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম—যুদ্ধলক্ষণং, কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি, অবশঃ সন্ তৎ কর্ম্ম করিষ্যসি এব ॥ ৬০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন] স্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব হেতু পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারজাত শৌর্য্যাদি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তুমি নিয়ন্ত্রিত। মোহবশতঃ এখন যে যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ হইয়াও ঐ সকল কর্ম্ম পরে তোমাকে করিতে হইবে ॥ ৬০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনার আপনার আত্মা আপনার কর্ম্মেতেই নিঃশেষরূপে বদ্ধ যেমন তুমি ব্রহ্মেতে থাক ত ব্রহ্মেতে যাবে, অন্য দিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি কর ত সেইখানে যাবে—তুমি ভালরূপ ক্রিয়া কর ভালরূপ ফল পাইবে, যদিস্যাৎ মোহেতে ক'রে অন্য বস্তুতে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া থাক আত্মাতে না থাক—পরে জন্ম মৃত্যু দুঃখভোগ করিয়া শান্তিযুক্ত হইয়া এই ক্রিয়া করিতে বাধিত হইবে—কারণ ইহা ব্যতীত অন্য গতি নাই।—জীব পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারজাত স্বভাবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ, প্রকৃতির সে বেষ্টন উলঙ্ঘন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। জীবত্ব যেখানে, সেখানে সে স্বাধীন নহে, প্রকৃতির অধীন। তাঁহার নিজ স্বরূপে তিনি সদা মুক্ত, সেখানে প্রকৃতিও নাই। আত্মার স্বরূপে কখন দাগ লাগে না, তাহা সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র, প্রকৃতি-পরতন্ত্র নহে। তবে রক্তবর্ণ কাচের পাত্রের মধ্যে জলকে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মাকে দেখিলে (জীবভাবে আত্মা প্রকৃতি যুক্ত) প্রকৃতির গুণে আত্মাকে লিপ্ত বলিয়া মনে হইবেই। তাহা অন্যথা করিবার উপায় নাই। যখন সাধক ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মন যখন শরীর, প্রাণবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন সেখানে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অনুভব থাকিবে না, প্রকৃতিও থাকিবে না, প্রকৃতির অনুভবও থাকিবে না। তখন প্রকৃতি থাকিলেও আত্মার সহিত প্রকৃতি যুক্ত না থাকায় প্রকৃতির কার্য্য আর আত্মাতে অধ্যাসিত হইবে না। প্রকৃতি-মুক্ত আত্মার উপর আর প্রকৃতির কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। আমি মুক্তিলাভ করিব বলিলেও আমার মুক্তি হইবে না, আমি বদ্ধ থাকিব বলিলেও আমি বদ্ধ থাকিতে পারিব না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবশতঃ যাহার যেরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নিষ্ঠা বা কর্ম্ম চেষ্টাও তদ্রূপ হয়। যাহার জ্ঞান-বৈরাগ্যের সংস্কার আছে, সে সাধনার দিকে মুক্তির পথে চলিবেই, তাহার সাময়িক ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর উহা নির্ভর করে না। সকলেরই স্বভাব নিজ-নিজ-কর্ম্মানুযায়ী গঠিত, সে স্বভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। যদি বল জীবের স্বাধীনতা তবে কোথায়? তাহার উত্তর এই বলি যে—জীবভাবে জীবের স্বাধীনতা নাই, জীব সকল স্ব-স্ব-কর্ম্মজ প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ, সুতরাং জীবভাব থাকিতে জীবের স্বাধীনতা নাই। তবে জীবের জীবত্ব মোচনের উপায় আছে। জীব স্ব-স্বরূপে শুদ্ধ চৈতন্য, নিষ্ক্রিয় ও নিরুপাধিক। তিনি প্রকৃতির কর্ম্মকে

অঙ্গীকার করিয়া আবদ্ধ হন। প্রকৃতি আপনার কর্ম্ম করিবেই, কিন্তু সে অবস্থাতেও আত্মা তাহাতে লিপ্ত নহেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়।

"মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো, মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥
যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ, মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥"

দর্পণে দৃশ্যমান মুখ-প্রতিবিম্ব যেমন প্রকৃত মুখ হইতে পৃথক বস্তু নহে, সেইরূপ বুদ্ধিদর্পণে আত্মপ্রতিবিম্বরূপ আভাস যাহা জীব নামে কথিত, তিনিও পরমাত্মা হইতে পৃথক নহেন। সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাই আমি।

যেরূপ দর্পণের অভাব হইলে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তখন একমাত্র কল্পনাহীন মুখই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ দর্পণের অভাবে যিনি প্রতিবিম্বশূন্য বা আভাসহীন হইয়া বিদ্যমান থাকেন, সেই নিত্যবোধ স্বরূপ আত্মাই আমি।

এরূপ হয় না যে প্রকৃতির গুণ এবং সেই হেতু তাহার কর্ম্ম সমুদয়কে আত্মা সর্ব্বদা শাসন করিয়া বেড়াইবেন। প্রকৃতির গুণানুরূপ কর্ম্ম হইবেই, কিন্তু আত্মা তাহাতে কখনও লিপ্ত নহেন ইহা জানিতে পারিলেই আত্মা প্রকৃতির নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করেন।

পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ জীব বিষয়ে আসক্তদৃষ্টি হইলে তাহার কষ্ট-ভোগও অনিবার্য্য, কিন্তু কষ্ট ভোগ করিয়া জীব সেই কষ্ট-ভোগ হইতে পরিত্রাণ চায়, তখনই তাহার সাধনার দিকে লক্ষ্য পড়ে। জন্ম-জরা-মৃত্যুর কষ্ট দেখিয়া জীবের নিজ প্রকৃতিই তাহা হইতে মুক্তির সোপান অন্বেষণে তৎপর হয়। তাই সদ্‌গুরুগণ বলেন, যদি এখন হইতে ভাল করিয়া ক্রিয়ার অভ্যাসে মন দাও, তবে তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, যদি আলস্য বা প্রমাদবশতঃ ক্রিয়া করা কষ্টকর বোধ কর, তবে তোমাকে এখনও অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সেই সব দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর তোমার চিত্ত তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য স্বতঃই উদ্যোগী হইবে। যাহা পরে করিতেই হইবে, তাহা এখনই অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই কল্যাণ লাভ করিবে॥ ৬০

---

* আত্মার উপর প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব কোন কালেই নাই। কোন দিনই আত্মা প্রকৃতির কার্য্যে লিপ্ত নহেন। তবে যেমন কোন সাধু পুরুষ কোন উদ্দেশ্য বশতঃ নহে, কেবল খেলার ছলে যদি চুরি করেন, এবং তখন যদি তাঁহাকে শান্তিরক্ষকেরা ধরিয়া ফেলে, তবে তিনি ধৃত হন সত্য; কিন্তু সে অবস্থাতেও ঐ কর্ম্ম তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কারণ সে কর্ম্মের প্রতি তাঁহার আসক্তি নাই এবং তিনি চৌর্য্য কর্ম্মের ভান করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি প্রকৃতি-পরতন্ত্র হইয়া যাইবেন তাহাও নহে। শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে বদ্ধ মুক্তি কিছুই চিন্তনীয় নহে, কারণ প্রকৃতি হইতে তিনি সদা মুক্ত, তবে যেখানে প্রকৃতির বশ্যতা আছে সেখানে প্রকৃতির বশে অবশ ভাবেই জীবকে কর্ম্ম করিতে হয়। সাংখ্য মতানুযায়ী প্রকৃতিই সেই কর্ম্ম করান, আর বেদান্ত মতে ঈশ্বরই মায়া দ্বারা এই সব কর্ম্ম করিবার প্রেরণা দেন। সুতরাং অবশ হইয়াই জীবকে স্বভাবের বশে বা ঈশ্বরেচ্ছার অনুসরণ করিতে হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রকৃতি পৃথক হইয়া যান অথবা ঈশ্বর নিজ মায়া সংহরণ করেন। মোটের উপর উহা একই কথা। প্রকৃতি পৃথক হইয়া যাইলেও তাহার কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য থাকে না, তখন প্রকৃতির থাকা না থাকা সমান হইয়া দাঁড়ায়।

(জীব ঈশ্বরাধীন, অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরই পরিচালক)

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

অন্বয়। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) মায়য়া (মায়াশক্তিদ্বারা) যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়) সর্ব্বভূতানি (ভূত সকলকে) ভ্রাময়ন্ (ভ্রমণ করাইয়া) সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে (সর্ব্ব জীবের হৃদয় দেশে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন) ॥ ৬১

শ্রীধর। তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং কর্ম্মপারতন্ত্র্যং চোক্তম্। ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতানাং হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরঃ—অন্তর্য্যামী তিষ্ঠতি। কিং কুর্ব্বন্? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া—নিজ শক্ত্যা, ভ্রাময়ন্—তত্তৎ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্। যথা দারুযন্ত্রম্ আরূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। যদ্বা যন্ত্রাণি—শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানি—দেহাভিমানিনঃ জীবান্, ভ্রাময়ন্ ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি।

অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণঞ্চ—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানং অন্তরো যময়তি" যম্ আত্মা ন বেদ, যস্য আত্মা শরীরম্, এষ তে অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক)

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে দুইটি শ্লোকে সাংখ্যাদি মতে জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য (প্রকৃতির অধীনতা) ও স্বভাবপারতন্ত্র্য এবং কর্ম্মপারতন্ত্র্যের কথা বলা হইল। এখন দুইটি শ্লোকে স্বীয় মত বলিতেছেন]—সকল ভূতের হৃদয়-মধ্যে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর রহিয়াছেন। কিরূপে আছেন? (ইহার উত্তরে বলিতেছেন) যে সমস্ত ভূতগণকে মায়াদ্বারা অর্থাৎ স্বীয়শক্তি প্রভাবে নিজ নিজ কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তমান করতঃ (রহিয়াছেন)। যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূতগণকে ভ্রমণ করায় তদ্রূপ। অথবা যন্ত্র শব্দে শরীর, তাহাতে আরূঢ় দেহাভিমানী জীবগণকে ভ্রমণ করাইয়া—ইহাই অর্থ। এ বিষয়ের প্রমাণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্র যথা—"এক দেব অর্থাৎ পরমাত্মা যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে স্থিত এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ বা সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা এবং ভূতগণের অধিবাস অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ। তিনি সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা ও চেতয়িতা এবং কেবল অর্থাৎ নিরুপাধিক ও নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে আছে—"যিনি আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়াও বুদ্ধির অন্তর এবং বুদ্ধিকে যিনি পরিচালিত করিতেছেন (তবুও) বুদ্ধি যাঁহাকে জানিতে পারে না, এবং বুদ্ধিই যাঁহার শরীর অর্থাৎ উপাধি, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্য্যামী এবং অমৃত" ॥ ৬১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ঈশ্বর ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়েতে স্থিতি সকল জুড়েই আছেন, চর এবং অচরে ব্রহ্ম স্বরূপে, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না স্বরূপ যন্ত্রের

দ্বারায় সব ভূতকে অর্থাৎ হইয়াছে যাহারা আর হ'বে যারা তাহাতে আবৃত হইয়া—আরূঢ় অর্থাৎ অন্য বস্তুতঃ যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্য জ্ঞান করিয়া—ভ্রমণ—মায়া অর্থাৎ আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করিতেছে।—প্রকৃতির প্রেরণায় জীবকে অহরহঃ কর্ম্ম-চক্রে ঘুরিতে হয়, এবং তাহারই ফলে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ইচ্ছা না থাকিলেও জীবকে প্রকৃতির বশে পড়িয়া জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার ঘুরিতে হয়। বদ্ধ জীবের আত্মস্বাতন্ত্র্য নাই; তবে উপায় কি? জীবের কি তবে মুক্তি নাই? না, ইহা নহে, জীব মুক্তি লাভ করে, এবং মুক্তি লাভ করিয়াই জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য ঘুচিয়া যায়। অনাদি কর্ম্ম-বশে বা যে কারণেই হউক জীব প্রকৃতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। বেদ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র বলেন—জীব এই অধীনতা-জাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, যদি সে সচেষ্ট হয়। জীব বদ্ধ বলিয়াই তাহার মুক্ত হইবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। ভগবান বা পরমাত্মা সকল অবস্থাতেই প্রকৃতির অধীশ্বর, তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন নহেন, জীবও সেই পরমাত্মারই অংশ। যতদিন জীব পরমাত্মা হইতে আপনাকে স্বতন্ত্ররূপে দেখে, ততদিন সে বদ্ধ, ততদিন প্রকৃতির বশ্যতা তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যখন সে জ্ঞান লাভ করে, আপনার স্বরূপ অবগত হয়, তখন তাহার প্রকৃতিপরতন্ত্রতার অবস্থা শেষ হইয়া যায়। কেন যে চেতন জীব মায়ার বশীভূত হয়—সে অতি রহস্য ব্যাপার! অধ্যাত্ম শাস্ত্র চিত্তকেই মায়ার নাভি-দেশ কল্পনা করিয়াছেন, সেই চিত্ত-চক্র অবরুদ্ধ হইলে মায়ার খেলাও থামিয়া যায়। অনাত্ম-বিষয়ে আত্ম-বুদ্ধি এবং আত্ম-বিষয়ে অনাত্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন করাই মায়ার কার্য্য। এই মায়াই বিষ্ণু-শক্তি বা ভগবানের কার্য্য উৎপাদকসমর্থা শক্তি। সেই শক্তির শরণ গ্রহণ করিলেই জীব মৃত্যুরূপ সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পারে। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। বিষ্ণু-মায়া ও বিষ্ণু-শক্তি—একই কথা। বিষ্ণু ও মায়া অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, এই মায়ামিশ্রিত চৈতন্যই নারায়ণ বা নারায়ণী। তন্ত্রে ইঁহাকেই মহামায়া বলিয়াছেন, বেদ ইঁহাকেই মুখ্য প্রাণ বলেন, যোগীরা ইঁহাকেই স্থির প্রাণ বলিয়াছেন। মায়ার কার্য্য—এই দেহ। এই দেহকে অবলম্বন করিয়াই জীবের জন্ম যাতায়াত,—ইহাই মায়ার খেলা। মনুষ্যদেহটী (প্রকৃতি) যে ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং জীব দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপে বদ্ধ হইয়াছে, আবার সেই দেহটাকে যথাযথ ভাবে জানিতে পারিলেই জীব তাহাতেই মুক্তির অবকাশ দেখিতে পাইবে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই দেহের গঠনপ্রণালীর নির্ম্মাণ ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবিধ নাড়ী-মুখে প্রাণের গতি হইলেই মন উন্মত্তের মত সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে,—উহা রোধ করিবার একমাত্র উপায়—প্রাণকে স্থির করা। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে—"মনুষ্যদিগের দেহে বাতাদি-বাহিনী দশটী নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী—ঐ দশটী নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া শরীর-মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী-সমুদয় যেমন যথাকালে সাগরকে পরিবর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শিরা দেহের বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। মানবগণের হৃদয়-মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহাদের সর্ব্ব গাত্র হইতে সঙ্কল্প শুক্র গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্ব্বগাত্রব্যাপিনী অন্যান্য শিরা-সমুদয় ঐ শিরা হইতে বহির্গত হইয়া তৈজসগুণ বহনপূর্ব্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন

করে। মন্থন-দণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রী-দর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসত্ত্বেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—নাড়ী-মুখেই বাহ্যপ্রবৃত্তি স্ফুরিত হইয়া এই গুণময়ী সংসার-লীলা চালাইতে থাকে। তাহার নিরোধের কি উপায়—তাহাও শান্তি-পর্ব্বের ঐ স্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে—"বাহ্য-প্রবৃত্তিশূন্য মহাত্মাগণ যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্ত-কালে সত্য-লোকপ্রদ সুষুম্না-মার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণপূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন নির্বাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদয় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্র-সিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়"। যোগ-ক্রিয়া অভ্যাসের ফলে বাহ্য সঙ্কল্পাদি রুদ্ধ লইলে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হৃদয়ে যে একপ্রকার স্থিতি বোধ হয়, তাহাই ঈশনশীল বা ঈশ্বর ভাব। যোগীরা এই অবস্থাটী প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারেন—জগতের নিয়ন্তা কে? কাহার শক্তিতে এই জগৎ চলিতেছে? তখনই বুঝিতে পারা যায়—

"জগত্বং জগদাধারস্ত্বমেব পরিপালকঃ।
ত্বমেব সর্ব্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে॥" অধ্যাত্মরামায়ণ

দেহমধ্যেই রহিয়াছেন সেই ঈশ্বরকে বুঝা যায় কিরূপে? জগৎ যাঁহার কটাক্ষপাতে চলিতেছে, সেই জগতের শাসক বা ঈশ্বর সকলের হৃদয় দেশে স্থিতিরূপে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে জানিবার উপায় এই যে মূলাধারাদি পঞ্চচক্র ভেদ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে যে সুষুম্না নাড়ী প্রবাহিত হইয়াছে এবং সেই সুষুম্নানাড়ীমধ্যস্থ যে ব্রহ্মনাড়ী বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার অন্তর্গত যে শক্তি বা ব্রহ্মাকাশ রহিয়াছেন,—উহাই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর, তাঁহারই শাসনে পঞ্চতত্ত্ব-মন-ইন্দ্রিয়াদি ভূতনিচয় স্ব-স্ব-কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, উহা না থাকিলে পঞ্চতত্ত্ব কর্ম্মক্ষম হইতে পারিত না।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" কঠ উঃ

প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত জগৎ কারণ ব্রহ্মের ভয়ে বা নিয়মে বাধ্য হইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে তপন উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু স্ব-স্ব-কার্য্যে ধাবমান হইতেছে। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে প্রাণশক্তির শাসনে এই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম বা মেরুদণ্ড মধ্যগত পঞ্চ-চক্রস্থ শক্তি স্ব-স্ব-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। মহাপ্রাণ বা ব্রহ্মাকাশ সর্ব্বত্র অর্থাৎ মূলাধারাদি পঞ্চভূতময় স্থানেই লক্ষিত হইতে পারেন, কিন্তু প্রধানতঃ ইনি আজ্ঞাচক্রেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত আছেন। এই চক্রগুলির হৃদ্দেশে অর্থাৎ মধ্যস্থলেই কূটস্থ জ্যোতিঃ নির্ব্বাত স্থানে প্রদীপশিখার মত প্রজ্বলিত রহিয়াছেন। আবার প্রত্যেক চক্রের কূটস্থই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থের সহিত সমসূত্র ভাবে মিলিত, যেন সকল চক্রে আজ্ঞাচক্রের জ্যোতিঃই দীপ্যমান রহিয়াছে। এইজন্য এক আজ্ঞাচক্রে লক্ষ্য রাখিলেই সমস্ত চক্রস্থ কূটস্থের প্রতিই লক্ষ্য করা হয়। এই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থে লক্ষ্য করিতে পারিলেই সর্ব্বভূতস্থিত

(সর্ব্বচক্রের অন্তর্গত) ব্রহ্মনাড়ী দিয়া গমনাগমন হয় এবং তাহা হইলেই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ লওয়া হয়। (এই কথা পর শ্লোকে বলিবেন)।

ক্রিয়ার পর-অবস্থার স্থিতিই বিষ্ণুপদ, উহাতে স্থিত হইলেই ধ্রুব বিশ্বাস হয়। সর্ব্বদা চন্দ্রের মত জ্যোৎস্না দেখা যায়, সূক্ষ্ম বায়ু (অনিল) সুষুম্নায় সর্ব্বদা থাকে, এবং প্রত্যূষের মত প্রকাশ অনুভব হয়, সেই প্রকাশের মধ্যে যাহা ইচ্ছা করা যায়, সমস্তই দেখা যায়। জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি দেখা যায়, সূর্য্যস্বরূপ কূটস্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র, নক্ষত্রের মধ্যে গুহা এবং গুহা মধ্যস্থ আকাশে ত্রিভুবন রহিয়াছে দেখা যায়। প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুষুপ্তা রহিয়াছেন,—উনিই সুষুম্নাস্থ-শক্তি। ক্রিয়া দ্বারা ঐ শক্তি জাগ্রত হইলে সাধকের তখন অতি সূক্ষ্মরূপে শরীরের মেরুদণ্ডে স্থিতিরূপে পঞ্চতত্ত্বে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা হয়। এই স্থিতি হইতেই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" বলিয়া বোধ হয়, তখন আর কিছু আবরণ থাকে না, সুতরাং ভিতর বাহির—সব এক হইয়া যায়। সুষুম্নায় থাকিতে থাকিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আটকাইয়া থাকে, তখন প্রাণের বাম, দক্ষিণ ও মধ্য স্রোত একস্রোত হওয়ায় কুলকুণ্ডলিনী তখন আত্মাস্বরূপে সর্ব্বব্যাপক হইয়া যান, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেখানে সেই জন্ম করাকরিও কিছুই থাকে না। এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্যই ক্রিয়া করা উচিত। ক্রিয়া না করিলে প্রাণের অচল বা স্থির অবস্থা বুঝা যায় না। এই পঞ্চপ্রাণের প্রাণস্বরূপ যে মুখ্য প্রাণ—তিনিই কূটস্থ।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥" মুণ্ডক

এই মুখ্য প্রাণ হইতেই প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চ প্রাণের উৎপত্তি হয়। সঙ্কল্প দ্বারা চঞ্চল হইলেই মুখ্য প্রাণ বিভিন্ন প্রাণরূপে মন ইন্দ্রিয় ও দেহাদির মধ্যে শক্তি বিস্তার করে। এই পঞ্চ প্রাণ স্থির হইলেই উহা মুখ্য প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়, তখন মনও স্থির হইয়া অমন হইয়া যায়—উহাই ব্রহ্মপদ। হৃদয়স্থ বায়ুই জীবের বল বা জীবন, সেই বায়ুই স্থানে স্থানে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে স্থির করিতে পারিলেই প্রাণ'ও তৎসহ মন স্থির হয় এবং বহু জন্মের সংস্কার বশতঃ যে বাসনা বীজ সঙ্কল্প রূপে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে সেই বাসনা বীজ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতেই জীব মুক্তি লাভ করে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥" কঠ উঃ

যাহারা মন দিয়া ক্রিয়া করেন ও ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পরাবস্থায় গমন করেন, তাঁহাদের প্রথমেই তৃতীয় নেত্ররূপ কূটস্থকে লাভ হয় এবং সেই তৃতীয় নেত্র পাইয়া তাঁহারা শিবরূপ হইয়া যান, পরে সেই কূটস্থে স্থির হইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহারা বিষ্ণুরূপ হইয়া যান, তাঁহাদের মূলাধারে কুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠে।

যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক ও কষ্ট সহন করিয়া ক্রিয়া করিয়া চলেন তাহাদের সকলেরই এই অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ হইতে পারে। তখন যে সকল কামনা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া ছিল তাহা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর তাঁহারা জলবৎ স্বচ্ছ অথচ দুগ্ধের ন্যায় সুস্বাদু অমৃত

ক্রিয়ার পর অবস্থায় পান করিয়া থাকেন। এই অমৃতরূপ সুরা পান করিয়া তাঁহারা অমরপদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। তখন প্রকৃতি পুরুষ সেই পরমব্রহ্মপদে লীন হয় এবং সেই স্থিতি দ্বারাই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়া যায়। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া তখন প্রাণের গতি হয়, তখন প্রাণে চাঞ্চল্য থাকে না, মনের পরিকল্পনা থাকে না—সুতরাং জগদ্দর্শন ভাব তিরোহিত হইয়া যায়।

অব্যক্ত রূপে ভগবান যে চরাচর সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহা অনুভব হয়। এই স্থিতি সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্নারূপ ত্রিগুণ যন্ত্রে প্রাণের গতি হওয়ায় সেই অব্যক্ত স্থির ভাবকে অনুভব করা যায় না। ত্রিগুণে আরূঢ় হইয়া লক্ষ্য বহির্ম্মুখ হওয়ায় সেই স্থির অব্যক্তাবস্থা যাহা জীবরূপে পরিণত হইয়াছে এবং এই জীবভাব বশতঃ অসত্য প্রপঞ্চ জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে এবং তাহাতে আসক্তি হওয়ায় বার বার জন্মমৃত্যুরূপ ভংভ্রমণ নিবারিত হইতেছে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন সমস্ত ব্যক্ত ভাব অব্যক্ত-সত্তায় লীন হইয়া যায়।

জীবের দেহটাই হইতেছে যন্ত্র, যখন জীব স্বস্থানচ্যুত হয় তখনই মায়া তাহাকে আক্রমণ করে, জীবের ভ্রম উৎপন্ন হইয়া দেহে অভিমান হয়। এই দেহকে আমি বা আমার বলিয়া স্বীকার করাই যন্ত্রারূঢ় হওয়া। কিন্তু প্রকৃতিকে অতিক্রম করা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। ভগবান যেমন প্রকৃতির সাক্ষী মাত্র, সাধককেও সেইরূপ প্রকৃতির দ্রষ্টা মাত্র হইতে হইবে। এই দ্রষ্টা রূপে থাকিতে পারিলেই মায়া অতিক্রম করা যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থার সময় সব হইতে বন্ধন খসিয়া পড়ে, তখন মায়ার কার্য্য স্থির ভাবে দেখা যায়, এবং মায়ায় মোহিত হইতে হয় না। এই মায়া তবে কি?—জগৎ জীব যাহার দ্বারা সংসার চক্রে অবিরত ঘুরিতেছে। এই মায়া তাঁহার স্বরূপের নীচে থাকে, মায়া স্বরূপ স্পর্শ করিতে পারে না, সেখানে "সদা নিরস্ত কুহকং।" সেখানে কেবল আত্মা, আর কিছুই নাই। কিন্তু "ব্রহ্মের একোঽহং বহুস্যাম" এই সঙ্কল্পই মায়া বা ভগবদিচ্ছা। দুইদিকে দর্পণ রাখিয়া নিজেকে দেখিলে যেমন একেরই অসংখ্য অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মের সঙ্কল্পই সেই মায়াদর্পণ, উহাই তাঁহার অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি—তাহাতে ব্রহ্ম আপনাকে বহুরূপে অবলোকন করেন—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—ইহাই যেন তাঁহার সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্ট পদার্থে তাঁহার অনুপ্রবেশ। যতক্ষণ মায়া-দর্পণ থাকিবে ততক্ষণ এক আত্মাই অনন্ত দৃশ্য-পদার্থরূপে পরিদৃষ্ট হইবেন। এই মায়াকে কেহ জগৎলীলার কারণ বলেন, কেহ ঈশ্বরের শক্তি বলেন। কিন্তু এই মায়া বড় অচিন্ত্য, ইনি আছেন কি নাই কিছুই বলা যায় না। মায়ার স্বরূপ এই :—

"অনাত্মনি শরীরাদৌ আত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।
সৈব মায়া তয়ৈ বাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে॥"

অনাত্মা বা শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই মায়া। তাহার দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হয়। জ্ঞানীরা বলেন সমুদ্রে যেমন তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয় তদ্রূপ পরমাত্মাতে এই বিশ্ব কল্পিত হয়। এই পরিকল্পনা কেন হয়? তাহাকেই জ্ঞানীরা ভ্রান্তি বলেন। কারণ পরমার্থতঃ তাহার

(শরণাগত ভাবই মায়া হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়)

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২

কোন সত্তা নাই। "রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন"। ভ্রান্তিবশতঃ যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ভ্রান্তি সরিয়া যাইলে তখন রজ্জু রজ্জুই থাকে, তাহাতে সর্পজ্ঞান অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম বিচারণা করিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত সংসার-সত্তার কোন বোধই থাকে না। হস্তামলকে আছে—

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থ যথা ভানুরেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥

নানা পাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় যে প্রকাশ স্বরূপ পদার্থ নানা বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও শুদ্ধচিত্তে যিনি এক অদ্বিতীয় ভাবেই প্রকাশিত হন, সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাই আমি।

ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥

মেঘের দ্বারা আচ্ছন্নদৃষ্টি অতিমূঢ় ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে করে সেইরূপ মূঢ়দৃষ্টি অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট যাঁহাকে বদ্ধের ন্যায় বোধ হয়, সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাই আমি ॥ ৬১

অন্বয়। ভারত! (হে ভারত) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও)। তৎ প্রসাদাৎ (তাঁহার প্রসাদেই) পরাং শান্তিং (পরমা শান্তি) শাশ্বত স্থানং (ও নিত্য ধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২

শ্রীধর। তমিতি। যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাঃ তস্মাৎ অহংকারং পরিত্যজ্য সর্ব্ব ভাবেন—সর্ব্বাত্মনা, তম্ ঈশ্বরমেব শরণং গচ্ছ। ততঃ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরাম্—উৎকৃষ্টাং, শান্তিং স্থানঞ্চ—পারমেশ্বরং, শাশ্বতং—নিত্যং, প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২

বঙ্গানুবাদ। [যেহেতু সর্ব্বজীবই পরমেশ্বর-পরতন্ত্র,]—অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হও। পরে তাঁহারই প্রাসাদে পরা-শান্তি এবং শাশ্বত নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই যিনি ত্রিগুণান্বিত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই আত্মা তাঁহাকেই স্মরণ কর গুরুবাক্যের দ্বারা ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া সকল বস্তুতে ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মকে দেখিয়া এইরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আনন্দ লাভ করতঃ যাহার পর আর নাই এমত শান্তিপদ শীঘ্রই পাইবে এবং বুদ্ধি দ্বারায় স্থির করিতে পারিবে যে ইহা ব্যতীত অন্য

কোন পথ শান্তির আর নাই—নিত্যই এই বোধ থাকিবে।—যিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে স্থিতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন সংসারের চপল সুখ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দেহ, মন, প্রাণ, বাক্য ও বুদ্ধি দিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, তবে তাঁহার অনুগ্রহরূপ পরমা শান্তি লাভ করিতে পারিবে। প্রাণিগণ শুভ বা অশুভ যে সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার মূলে ঈশ্বরের শক্তিই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং প্রথমতঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দিকে না তাকাইয়া, যিনি এই সকলের কারণ, সেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহারই কৃপায় অবিদ্যা বা সংসারের পরপারে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সেই আত্মারূপী ভগবান তোমার অতি সন্নিকটে, কারণ তিনি তোমার আত্মা, তিনি না থাকিলে তুমি থাক না। সেই ভগবান পরমাত্মা নিজ স্বভাবে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ, যদি তাঁহার শরণাপন্ন হও তবে তুমিও জ্ঞানানন্দ-সিন্ধুতে ডুবিয়া থাকিবে। এই নাম-রূপময় জগৎও তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া নির্গুণ পুরুষ যখন ত্রিগুণান্বিত হন, তখনই অব্যক্ত চিৎরূপ হইতে জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়া উঠে। চিরস্থির আনন্দসিন্ধুর মধ্যে একটু হিল্লোল বা স্পন্দন আরম্ভ হয়। এই স্পন্দনাত্মিকা ভাবই প্রাণশক্তি, উহাই মায়ার রূপ। প্রাণশক্তির প্রথম বিকাশ সময়ে স্পন্দন থাকিলেও সে স্পন্দন ততটা বেগযুক্ত নহে, সে সময়ে তাই আত্মার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান একেবারে আবরিত হইয়া যায় না। তখনও মায়া শুদ্ধশক্তিরূপে, বিদ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাই তখনও তাহাতে অজ্ঞানান্ধকারের কুহেলিকা ঘনীভূত হইয়া জ্ঞানদৃষ্টিকে অবরোধ করিতে পারে না। তখনও সুষুম্নার মধ্যে প্রাণের সঞ্চরণ হইতে থাকে। পরে যখন মায়ার স্পন্দন অতিমাত্রায় বেগযুক্ত হইয়া নিম্নে অবতরণ করে, যখন সুষুম্না ছাড়িয়া প্রাণশক্তি নৃত্য করিতে করিতে ইড়া পিঙ্গলায় আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখনই মায়া নিজ বিদ্যারূপকেও আচ্ছন্ন করিয়া অবিদ্যারূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন। তখনই প্রাণমধ্যে অস্বাভাবিক রূপে কম্পন বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্কল্পময় মন জাগিয়া উঠে, দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠে, এবং সচঞ্চল মন কর্তৃক বুদ্ধি দর্পণে নানাত্বের প্রতিবিম্ব পড়ে। দেহের সহিত আত্মার যোগ হইয়া হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয় এবং তখনই প্রাণ অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া শ্বাসরূপে বহির্গমনাগমন করিতে থাকে। যদিও সমস্তই চিন্ময় তবুও বস্তুরূপে সেই সমুদয়কে জড় বলিয়া অনুভব হয় এবং আত্মা বহির্মুখ হইয়া ঐ সকল বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য মনোবেগরূপে ধাবমান হয়। এবং জীব মনের সহিত সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া বিবিধ ভোগলালসায় মগ্ন হয় এবং আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়। এখন এই অবস্থা হইতে জীবের কিরূপে উদ্ধার হইবে, তাই কৃপাময় ভগবান গুরুরূপে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, যে ব্রহ্মাকাশ বা ঈশ্বর সমস্ত শক্তিপুঞ্জের মধ্যবিন্দু, যিনি অমূর্ত্ত হইয়াও—"স বাহ্যাভ্যন্তরস্থজঃ" সমস্ত বস্তুর বাহিরে ও ভিতরে বর্ত্তমান অর্থাৎ জ্ঞানরূপে বুদ্ধির অভ্যন্তরে এবং নামরূপে বহির্দ্দেশে বিদ্যমান—তিনি পূর্ণ জ্ঞানরূপ জন্ম মরণাদি ষড় বিকার বর্জ্জিত, কিন্তু তাঁহা হইতেই প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং আকাশ (বিশুদ্ধাখ্য) বায়ু (অনাহত) তেজঃ (মণিপুর) জল (স্বাধিষ্ঠান) ও সর্ব্ব ভূতের আধার পৃথিবী (মূলাধার) উৎপন্ন হইয়া থাকে।—

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥
তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ॥
তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ॥
অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দতে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥" মুণ্ডক

এই পুরুষের মস্তক হইতে দ্যুলোক বা আকাশ, দুইটী চক্ষু হইতে চন্দ্রসূর্য্য, কর্ণ হইতে দিকসমূহ, তাঁহার বাগিন্দ্রিয় হইতে ঋগাদি বেদ সমূহ, তাঁহার প্রাণ হইতে বায়ু এবং তাঁহার হৃদয় হইতে এই বিশ্ব এবং পদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে॥ সেই নির্ব্বিকার পুরুষ হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, এবং হোমকাষ্ঠ সদৃশ সূর্য্য এই আকাশরূপ প্রথম অগ্নি হইতে উৎপন্ন। জলময় অমৃত হইতে মেঘরূপ দ্বিতীয় অগ্নি, এবং মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হইলে পৃথিবী হইতে তৃতীয় অগ্নিরূপে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, অনন্তর অন্নাদি আহার দ্বারা পুষ্ট হইয়া চতুর্থ অগ্নিরূপে পুরুষ পঞ্চম অগ্নিরূপ স্ত্রীতে বীর্য্যরূপ আহুতি প্রদান করে। এইরূপ পরমাত্মা হইতে মনুষ্যাদি বহু প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে॥ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বসু আদি দেবগণ, সাধ্য নামক দেবগণ, মনুষ্য, গ্রাম্য ও আরণ্য পশু এবং পক্ষী সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। জীবদিগের প্রাণন ক্রিয়া প্রাণ ও অপান, ধান্য ও যব এবং ব্রতাদি রূপ তপঃ, সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্তিরূপ শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি বিধি সমুদয় সেই সত্য পুরুষ হইতে উদ্ভূত॥ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই সমুদ্র সকল, পর্ব্বত সকল, নানারূপ নদী প্রবাহিত হইয়াছে, এবং এই পুরুষ হইতেই সকল প্রকার ধান্য যবাদি শস্য, মধুর অম্ল রসাদি সম্ভূত হইয়াছে॥

সঙ্কল্পনস্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেন দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহুনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চঃ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ শ্বেতাশ্বতর উঃ

প্রথমে সঙ্কল্প—মনে মনে ভালমন্দ কর্ম্মের চিন্তা হয়, তাহার পর স্পর্শন অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয়, অনন্তর দৃষ্টিপাত, তাহার পর মোহ জন্মে। উক্ত সঙ্কল্পন, স্পর্শন, দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। অনন্তর দেহী কর্ম্মানুযায়ী স্ত্রীপুরুষাদিভাবে কর্ম্মফলের পরিপাক অনুসারে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানা দেহ প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—অন্নপান ভোজনে যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, ইহাও ঠিক তেমনই হইয়া থাকে।

সেই দেহী স্বকৃত পাপ পুণ্যের ফলে স্থুল সূক্ষ্ম বহুবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং স্বকৃত কর্ম্ম ও জ্ঞানজনিত শুভাশুভ বাসনা বশে ভোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া অপর জীব বলিয়া প্রতীত হয়।

এই আত্মা যদিও সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত তথাপি তাঁহার অনাদি অবিদ্যা মায়াশক্তি বশতঃ তাঁহাকে গুণময় ও তাঁহার গুণক্রিয়ার ফল স্বরূপ এই জগদাদি কার্য্যকে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্বপ্নজাত পুত্রের যেরূপ অন্তঃকরণের অতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নাই, তদ্রূপ অবিদ্যাসৃষ্ট বিষয়াদিরও পুরুষাতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নাই।

সেই অবিদ্যা-বিরহিত আত্মস্বরূপে ফিরিয়া যাওয়া যায় কি প্রকারে? পুরুষের সেই নির্ব্বিকার সত্তায় ফিরিয়া যাইতে হইলেও যেমন ভাবে কূটস্থ পুরুষ হইতে এই বাহ্য ব্যাপার সমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছে, ঠিক সেই সেই ভাবের মধ্য দিয়া আবার জীবকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। উহাই ক্ষিতিতত্ত্ব জলতত্ত্বে, জলতত্ত্ব তেজস্তত্ত্বে, তেজঃকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশের মধ্যে এবং আকাশকে স্থির প্রাণের মধ্যে এবং স্থির প্রাণকে অব্যক্তে লয় করিবার যে প্রণালী সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এতাবৎ সমস্ত বাহ্য বস্তুর মধ্যে প্রাণ-শক্তিরই ক্রীড়া দেখা যাইতেছে, প্রাণই চঞ্চল হইয়া জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, আবার সেই অব্যক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই স্থির প্রাণকে ধরিতে হইবে, যিনি ত্রিগুণান্বিত হইয়া এই জীব ভাব ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মধ্যেও সেই অব্যক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন নচেৎ কিছুই হইতে পারিত না। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, না পারিলে আর মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। তাই সর্ব্বভাব তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া যাইতে হইবে। সমস্ত ভাবময় সঙ্কল্প প্রাণ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে, সেই প্রাণকে ঢালিয়া দিতে হইবে তাঁহাতে। তাহা হইলে আর এ ব্যক্ত জগতের কোন স্ফুরণ লক্ষিত হইবে না, তখন সমস্তই অব্যক্তের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সবই অব্যক্ত হইয়া যাইবে। এই অব্যক্তই পরমপদ, এই অব্যক্তে প্রবেশ করাই সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য। ভগবানও তাই উপদেশ দিতেছেন—সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর, যেন তিনি ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা না থাকে, প্রাণাপানের সমতা সাধন দ্বারাই সুষুম্নাস্থিত ব্রহ্মাকাশ প্রকাশিত হইবে, তখন তোমার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি আপন আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইবে। তখন অব্যক্ত পরমপদ প্রকাশিত হইয়া পরাশান্তিরূপ শাশ্বত স্থান যাহার উপর আর কিছু নাই এমন স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সেই মুখ্য প্রাণে যাইতে হইলে এই ব্যক্ত প্রাণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, এই প্রাণের সাধনাতেই বাহ্য প্রকৃতির উপশম লাভ হইবে, তাহা হইলেই আপনার মধ্যে আপনি থাকিয়া পরমানন্দ লাভ করিবে। উহাই পরমাত্মার প্রসাদ। যে ক্রিয়া করিবে না, সে তাঁহার প্রসাদ কি তাহা কখন অনুভব করিতে পারিবে না॥ ৬২

(গীতা-কথিত জ্ঞানই গুহ্যতর জ্ঞান)

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেন যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

অন্বয়। ইতি (এই) গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং (গুহ্য হইতেও গুহ্যতর তত্ত্বজ্ঞান) তে (তোমার নিকট) ময়া আখ্যাতং (মৎ কর্ত্তৃক উক্ত হইল) এতৎ (ইহা) অশেষেণ বিমৃশ্য (অশেষ প্রকারে আলোচনা করিয়া) যথা ইচ্ছসি (যেরূপ ইচ্ছা হয়) তথা কুরু (তাহাই কর)॥ ৬৩

শ্রীধর। সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্ আহ—ইতীতি। ইতি অনেন প্রকারেণ তে—তুভ্যং, সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া, জ্ঞানং আখ্যাতং—উপদিষ্টম্। কথম্ভূতং? গুহ্যাৎ—গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং। এতৎ ময়া উপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রম্ অশেষতঃ বিমৃশ্য—পর্য্যালোচ্য, পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহঃ নিবর্ত্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ৬৩

বঙ্গানুবাদ। [সমস্ত গীতার্থের উপসংহার করিতেছেন]—এইরূপে তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক যে আমি, সেই আমাকর্ত্তৃক জ্ঞান উপদিষ্ট হইল। সেই জ্ঞান কিরূপ? তাহা গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় রহস্যমন্ত্রযোগাদি অপেক্ষাও গুহ্যতর। এই মদুপদিষ্ট গীতা শাস্ত্রকে পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ যাহা ইচ্ছা হয় কর। ইহা (গীতাশাস্ত্র) পর্য্যালোচিত হইলে তোমার মোহ নিবৃত্তি হইবে—ইহাই ভাবার্থ॥ ৬৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই তোমাকে জ্ঞান সমুদয় বলিলাম—এখন তোমার যা ইচ্ছা হয় তা কর—যাহা গুহ্য হইতে গুহ্যতম অত্যন্ত গুহ্য—যাহা বলিলাম ইহা অত্যন্ত গুহ্য।—যাহাতে মোহ অন্ধকার নষ্ট হয় এবং জ্ঞানদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ও গুহ্যতম জ্ঞান ও তাহার সাধনার কথা তোমাকে বলিয়াছি। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সকল ক্রিয়া-যোগ এবং তাহার ফলস্বরূপ যে সকল জ্ঞান ও অনুভব পদ লাভ হয় তাহা সমস্তই তোমাকে শুনাইয়াছি। এখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য অবধারণ কর। জীবের মধ্যে তিনটী ভাব রহিয়াছে—(১) অজ্ঞতা বা দেহাত্মভাব, তখন দেহ এবং দেহের ভোগকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয়। (২) সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাত এবং জন্মমরণের দারুণ ক্লেশ এবং তাহার প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া জীবের নিজ কর্ত্তৃত্বের প্রতি অনাস্থা জন্মে। তখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি ধারণা হয়, তখন জীব তাঁহাতে আত্মসমর্পণের জন্য মোক্ষানুকূল সাধন ও বিচার অবলম্বন করে। ইহার ফলে (৩) ঐকান্তিক চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে এবং তখন বুঝিতে পারে যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আত্মা হইতে সে স্বতন্ত্র নহে (ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভব)। এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই প্রকৃতির অধীনতা ত্যাগ করিবার সামর্থ্য জন্মে। তখন আমার "আমি"কে বুঝিতে পারে, তখন আত্মার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ হয়, এবং আত্মা ব্যতীত আর কিছুরই অন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষারই উদয় হয় না—ইহাই ভক্তি যোগ। পরে

(গুহ্যতম রহস্য কথা)

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

নিরাকাঙ্ক্ষ যোগীর মনে আর কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না তখন মনও থাকে না। তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে এক সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ ব্যবধান ছিল তাহা বিলীন হইয়া যায়—ইহাই চরম জ্ঞান। এই অবস্থায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, মুক্তি তাঁহার নিজ আয়ত্তের মধ্যেই থাকে ॥ ৬৩

অন্বয়। মে (আমার) সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম) পরমং বচঃ (উৎকৃষ্ট বাক্য) ভূয়ঃ শৃণু (পুনরায় শ্রবণ কর) [ত্বং—তুমি] মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি (আমার অত্যন্ত প্রিয় হও) ততঃ ইতি (সেই হেতু) তে (তোমাকে) হিতং (সেই হিতকর কথা) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ৬৪

শ্রীধর। অতি গম্ভীরং গীতাশাস্ত্রম্ অশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুম্ অশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচঃ তত্র তত্র উক্তমপি ভূয়ঃ—পুনরপি, বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃপুনঃ কথনে হেতুমাহ। ত্বং দৃঢ়ম—অত্যন্তম্ ইষ্টঃ—প্রিয়োঽসীতি মত্বা। তত এব হেতোঃ তে হিতং বক্ষ্যামি। যদ্বা ত্বং মম ইষ্টোঽসি। ময়া বক্ষ্যমাণং চ দৃঢ়ং—সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততঃ তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪

বঙ্গানুবাদ। [অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র অশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে অসমর্থ (অর্জ্জুনের প্রতি) কৃপা করিয়া স্বয়ংই তাহার (গীতার) সার সংগ্রহ করিয়া তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন] —সর্ব্ব প্রকার গোপনীয় হইতেও গুহ্যতম আমার বাক্য পূর্ব্বে উক্ত হইলেও পুনরায় বলিতেছি শ্রবণ কর। পুনঃ পুনঃ বলিবার হেতু কি বলিতেছেন। তুমি আমার অত্যন্ত ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয় ইহা মনে করিয়া সেই জন্যই তোমার হিত যাহা তাহা বলিতেছি। অথবা তুমি আমার নিতান্ত প্রিয় বলিয়া এই বক্ষ্যমাণ বিষয়টী দৃঢ় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রমাণ যুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তোমাকে আমি বলিতেছি। "দৃঢ়মিতি" স্থলে কেহ কেহ "দৃঢ়মতি" পাঠ বলিয়া থাকেন ॥ ৬৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফের অত্যন্ত গুহ্য যাহা, তাহা বলিতেছি—কারণ তুমি ইষ্ট সখা এটা ভালরূপ জানি, তোমার ভালর নিমিত্ত বল্‌ছি।—তোমাকে রহস্য কথা অনেকবার বলিয়াছি, এবং সেই গোপনীয় আত্মতত্ত্ব জানিবার যে রহস্যময় সাধনা তাহাও বলিয়া দিয়াছি, আবার যে তত্ত্ব-বস্তুর সাধনাই গুহ্যতর কথা, সেই গুহ্যতম তত্ত্ব-বস্তুকে জানিতে হইলে যাহা করা আবশ্যক ও যেরূপ হওয়া আবশ্যক সেই সর্ব্ব গুহ্যতম তত্ত্ব আবার অর্জ্জুনকে বলিতেছেন। অর্জ্জুনকে কেন তিনি এত আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন ? কারণ তিনি ভগবানে দৃঢ়শ্রদ্ধ। শ্রদ্ধালু না হইলে গুরু শিষ্যকে রহস্য কথা বলিতে পারেন না, কারণ শ্রদ্ধাহীনকে উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল। ভাগবতে তাই ঋষিরা সূতকে বলিলেন— "ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত"। শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সর্ব্বত্রে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ

(সর্ব্বসার উপদেশ—ভগবানের প্রতিজ্ঞা)

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫

হইলেও যে সকল শিষ্য স্নিগ্ধ অর্থাৎ গুরুভক্তিপরায়ণ, তাহাদিগকে গুহ্য গভীর তত্ত্ব সকল গুরু বলিয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন—তুমি যে আমার ইষ্ট সখা, তোমাতে আমাতে যে কোন ভেদ নাই, তুমি সংসার-বৃক্ষের ফল খাইয়া মুহ্যমান হইয়া আপনার স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার বদ্ধ ভাব দেখিয়া আমার কষ্ট হইতেছে, নিজেই নিজেকে না বুঝাইলে আর কে তাহাকে বুঝাইবে? তাই আমি তোমার মঙ্গলের জন্য আবার গুহ্যতম কথা বলিতেছি। যে ইষ্ট সাধনায় দৃঢ়, ভগবানের কৃপা সে-ই বুঝিতে পারে। যে ভজনশীল, সাধনায় খুব দৃঢ়, তাহারই নিকট তো পরম রহস্য প্রকাশিত হয়। প্রথমে পরোক্ষ জ্ঞানের কথা বলিয়া গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই পথানুবর্ত্তনের যে সম্বল গোপনীয় সাধনা—তাহাও তোমাকে বলিয়া দিয়াছি। এখন তুমি আমি যে এক তাহাই যে ভাবে বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ জ্ঞান যেরূপে অপরোক্ষ হইয়া থাকে সেই পরম জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়—যাহা অপেক্ষা আর কল্যাণতম কিছু নাই—তাহাই তোমাকে বলিতেছি ॥ ৬৪

অন্বয়। [ত্বং—তুমি] মন্মনাঃ (মদ্‌গত-চিত্ত), মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীল বা আমার পূজক) ভব (হও), মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর); [ততঃ—তাহা হইলে] মাম্ এব এষ্যসি (আমাকেই পাইবে), তে (তোমার নিকট) সত্যং প্রতিজানে (সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি)। [যতঃ ত্বং—যেহেতু তুমি] মে প্রিয়ঃ অসি (আমার প্রিয় হইতেছে) ॥ ৬৫

শ্রীধর। তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব—মচ্চিত্তো ভব। মদ্ভক্তঃ—মদ্ভজনশীলো ভব। মদ্‌যাজী—মদ্‌যজনশীলো ভব। মামেব নমস্কুরু। এবং বর্ত্তমানঃ ত্বং মৎপ্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞানেন মাম্ এব এষ্যসি—প্রাপ্স্যসি। অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ। ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি। অথ সত্যং যথা ভবতি এবং তুভ্যম্ অহং প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫

বঙ্গানুবাদ। [তাহা কি তাহাই বলিতেছেন]—তুমি মচ্চিত্ত হও, আমার ভজনশীল হও, মদ্‌যজন (বা পূজনশীল) হও, আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপ হইলে তুমি মৎপ্রসাদ-লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই পাইবে। এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিও না। তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রিয়, এ বিষয়ে তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ॥ ৬৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমাতেই মন রাখ অর্থাৎ ক্রিয়া কর, আমারই যজন কর অর্থাৎ ক্রিয়া কর, নমস্কুরু অর্থাৎ ওঁকারের ক্রিয়া কর—যাহা গুরুবক্ত্র-গম্য—সত্য ক'রে আমি তোমায় বলছি যে তুমি আমারই হবে—প্রতিজ্ঞা ক'রে বলচি—কারণ তুমি আমার প্রিয়।—গীতায় ভগবান কত সাধনার উপদেশই দিয়াছেন এইবার তিনি নিজেই তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছেন। (১) তুমি মন্মনা অর্থাৎ মচ্চিত্ত

হও, (২) তুমি মদ্ভক্ত অর্থাৎ আমাতে আত্মসমর্পণ কর, ভক্তির সহিত আমাকে ভজনা কর। (৩) মদ্‌যাজী হও অর্থাৎ আমার পূজার্চ্চনায় মন দাও। (৪) আমাকে নমস্কার কর।

প্রথমেই ভগবানের 'মন্মনা' কথাটি লইয়াই আলোচনা করা যাক। "মন্মনা" হওয়াই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়। ব্রহ্মে চিত্ত বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই "মন্মনা" হইতে পারে না। ভগবানে মনটী সমর্পণ করিতে হইবে, তবেই মন আর তোমার থাকিবে না, ভগবানের হইয়া যাইবে। চিত্ত সর্ব্বদা স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া আমরা বুঝিয়াও তবু তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করিতে পারি না। সুতরাং প্রথমেই চিত্তের যে নিরন্তর স্পন্দন হইতেছে তাহা থামাইতে হইবে। মনের সঙ্কল্প বিকল্পই সেই স্পন্দন—ইহা মনের ধর্ম্ম, সুতরাং মনকে সহজে সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য করা যায় না। এইজন্য চিত্তকে একমুখী করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন ধ্যেয় বিষয়ে মনকে রাখিয়া মনে অন্য কোন বৃত্তির উদয় হইতে না দেওয়া। কিন্তু ইহাতেও চিত্তের বহির্ম্মুখ ভাব একেবারে যায় না। সেই জন্য মনকে কোন আধ্যাত্মিক স্থানে রাখিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয়। মনুষ্যদেহে সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্থান হইতেছে সহস্রার ও আজ্ঞাচক্র, কিন্তু সহস্রারে প্রথম অভ্যাসীর মন রাখা তত সহজও নহে, নিরাপদও নহে। সেইজন্য আজ্ঞাচক্রে মন রাখাই সর্ব্বোত্তম। আধ্যাত্মিক স্থানগুলি বা ষট্‌চক্রে মনকে নিবিষ্ট করিতে হইলেও প্রথম প্রথম মনে স্পন্দন হইবেই, কিন্তু আজ্ঞাচক্রে বা কোন একটী স্থানে চিত্তকে রাখিতে রাখিতে মনের বেগ বা স্পন্দন একেবারে কমিয়া যাইবে। এইরূপ নিয়মিত অভ্যাসে চিত্তের স্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন যে কোন ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা সুকর হয়। কোন একটী বাহ্য বিষয় লইয়াও চিত্ত স্থির করা যায় এবং সাধকের সে বাহ্য বিষয়টী আয়ত্তও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ক্লেশ ক্ষীণ হয় না, সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক লাভ নাই। সেইজন্য শুদ্ধ ও সদাচার-সম্পন্ন হইয়া এবং বিষয়ের হেয়ত্ব আলোচনা করিয়া ভগবদ্ভক্তি সহকারে প্রত্যগাত্মার ধ্যানে মনকে নিবেশ করিতে পারিলে মন সহজেই স্থির হয়। সাধনা বা ধ্যানাদির সময় সাবধান হওয়া আবশ্যক যেন মন সে সময় অন্য বিষয় চিন্তা না করে। বিষয়-ধ্যানে চিত্ত গাঢ় নিবিষ্ট হইতেও পারে, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক শক্তির তখনই বিকাশ হওয়া সম্ভব যখন চিত্তে স্পন্দন থাকিবে না এবং তাহা কোন আধ্যাত্মিক চিন্তা বা আধ্যাত্মিক স্থানে স্থির হইয়া থাকিবে। মনের এই প্রকার নিরোধ ভাবই তাহাকে কৈবল্য অভিমুখে উপনীত করে। তখন মনের মনন না থাকায় মনও লয় হইয়া যায়, মন লয় হওয়ায় বিষয়েরও অভাব হইয়া থাকে। বিষয়ের অভাব বশতঃ পুরুষের বুদ্ধি বোধাত্মক ভাবও থাকে না। মনের এইরূপ নিরুদ্ধাবস্থাই প্রকৃত "মন্মনা" অর্থাৎ আপনাতে আপনি। যাঁহারা "মন্মনা" হইতে পারেন নাই, তাঁহারা "মদ্ভক্ত" অর্থাৎ ভজনশীল হইবেন। যাঁহারা এইরূপে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান যাহাতে হয় তজ্জন্য দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে প্রযত্ন করেন, তাঁহারাই ভক্ত। তাঁহাদের সব চেষ্টা তখন প্রযুক্ত হয় "মন্মনা" হইবার জন্য, যেন মন অন্য কিছুতে বাঁধা না পড়ে। এইজন্য মনকে সর্ব্বদা কূটস্থ চিন্তায় রাখা আবশ্যক। যদি মন স্বভাববশে অন্যত্র ছুটিয়া যায় তবুও তাহাকে ধীরে ধীরে ধরিয়া আনিয়া কূটস্থ চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে। এইভাবে সাধনা চালাইলে দিব্য জ্যোতিঃ ও নাদ প্রকটিত হইবে,

(পরম গুহ্য ভগবদ্‌বাণী)

"আত্মনিবেদন"

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

তখন মনকে শান্ত করা আর তেমন কঠিন হইবে না। এমন কি ঐরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে বা দিব্য সুমধুর নাদ শুনিতে শুনিতে মন একেবারে তন্ময় হইয়া যাইবে। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" এই ভক্তি লক্ষণ তখন ফুটিয়া উঠিবে। ইহারই জন্য "মদ্‌যাজী" অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে হইবে। এই "মদ্‌যাজী'র সহিত "মাং নমস্কুরু" ওঁকারের ক্রিয়া কর (উহা এক প্রকার সাধনার অঙ্গ)। ক্রিয়ার সহিত যাঁহারা "ওঁকার ক্রিয়া" নিয়মিত ভাবে করেন তাঁহাদের প্রাণ-শক্তি (শ্বাস) মাথায় চড়িয়া বসে। তাহা হইলেই আত্মা কি এবং তাঁহাকে পাওয়াই বা কিরূপ এ সমস্ত কথা তখন বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত দেবতারা ও ঋষিরা এই পূজাই করিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও আপনাকে আপনি পূজা করেন। এই আত্মপূজার অধিকার লাভ হইলে তুমি কৃতার্থ হইবে। সেই পূজার অধিকার লাভের জন্য তোমার মনঃপ্রাণকে ক্রিয়াতে নিযুক্ত কর। ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই তুমি আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইবে, তুমি তখন তুমি থাকিবে না, তোমার "আমি" আমাতে মিশিয়া এক হইয়া যাইবে, তুমি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ক্রিয়ার ফল। সে কথা শ্রীগুরু প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে-ছেন, সুতরাং তাহার আর অন্যথা হইবে না।

"সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বধিয়া সর্ব্বসংরম্ভরংহসা।
স এব শরণং দেবো গতিরন্যেহ নান্যথা॥" যোগবাশিষ্ঠ

সমস্ত মনটি দিয়া, সমস্ত বুদ্ধি দিয়া, সমস্ত কার্য্য চেষ্টা দ্বারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, সেই পরমদেব ব্যতীত জীবের আর কোন উপায় নাই॥ ৬৫

অন্বয়। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সকল প্রকার অনুষ্ঠানমূলক ধর্ম্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ নিয়মের খুঁটি নাটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছাড়িয়া দিয়া,) একং মাং (একমাত্র আমাকে, অর্থাৎ সকলের আত্মারূপে যে আমি সেই আমাকে) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর); অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সমুদয় পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না)॥ ৬৬

শ্রীধর। ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যা এব সর্ব্বং ভবিষ্যতি ইতি দৃঢ়-বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাৎ ইতি মা শুচঃ—শোকং মা কার্ষীঃ। যতঃ ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যঃ অহং মোক্ষয়িষ্যামি॥ ৬৬

বঙ্গানুবাদ। [আরও গুহ্যতম তত্ত্ব বলিতেছেন]—আমাকে ভক্তি করিলেই সমস্ত হয়—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা বিধিনিয়মের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। এরূপ হইলে (অর্থাৎ আমাকে ধরিয়া থাকিলে) কর্ম্মত্যাগনিমিত্ত পাপ

হইবে ভাবিয়া শোক করিও না। যেহেতু মদেকশরণ তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে আমি মুক্ত করিব ॥ ৬৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন দিকে তাকিও না আসক্তি পূর্ব্বক, কেবল আত্মাতে মন রেখে গুরুবাক্যের দ্বারায় ক্রিয়া পেয়ে ক'রে চল—স্মরণ ক'রে চল —ওঁ—এই ক্রিয়া করিতে করিতে আমি অন্য দিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করা হইতে মুক্ত করিয়া দিব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্য দিকে দৃষ্টিই যায় না, ইহার নিমিত্ত তুমি কিছু ভেবো না।—যোগীর কোন দিকে তাকাইলে চলিবে না এমন কি বেদ বা বিধিশাস্ত্রও যোগাভ্যাসের অনুকূল নহে। কেবল গুরুবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া চলিতে হইবে। কেন করিতেছি, কত দিন করিতে হইবে, করিয়া কি হইবে—এ প্রশ্ন মনে আসিতে দিও না। গুরু বলিয়াছেন তাই করিতেছি, ইহাতে কি হইবে তাহা তিনিই জানেন। এইরূপ দৃঢ়চিত্ত হইয়া গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রিয়া করিয়া যাইতে হইবে।

"সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর"—ইহাই গীতার্থের সার কথা। ভগবান এই কথা বলিয়া গীতোক্ত উপদেশের উপসংহার করিতেছেন। সুতরাং এ শ্লোকটী একটু বিশেষ ভাবে আলোচ্য। ধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া ধর্ম্মের অন্যান্য উপদেশ পালনে কি তাঁহার শরণ গ্রহণ হয় না ? জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি অনেক কথাই গীতায় বলিয়াছেন, এখন শরণাগতির সহিত পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান. ভক্তি, কর্ম্মাদির কোন যোগ আছে কি না ? শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র আমাদিগকে অনেক কর্ম্মই করিতে বলেন এবং অনেক কর্ম্ম করিতে নিষেধও করেন। এতদিন কি করিব এবং কি করিতে হইবে না লইয়া অনেক পুঁথি পত্র ঘাঁটা হইল, শাস্ত্রারণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথভ্রম হইয়া গিয়াছে, কত লোকের কাছে গিয়া কত কথাই শুনিলাম, কত জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের উপদেশ মত কিছু কিছু কার্য্যও করিলাম, কিন্তু মনের ধাঁধা, মনের সন্দেহ মিটিল না। তাই ভগবান পুঁথিপত্রের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণের কথা বলিলেন—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—ওগো, তোমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছাড়িয়া একবার আমাকে জড়াইয়া ধর, উদ্দেশ্য ইহা নহে যে ধর্ম্মোপদেশ পালন করিতে হইবে না। কিন্তু ভগবানকে ভাল না বাসিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই বৃথা, তাই আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যাহাতে ব্যর্থ না হয় এইজন্য ভগবৎ শরণাগতির কথা বলিলেন। কারণ ভগবানকে বাদ দিয়া যে কর্ম্ম করা যাক তাহাতে আত্মবিনাশ হয় কিন্তু সংসারপাশ মোচন হয় না। অতএব কর্ম্ম কি ভাবে করিতে হইবে, শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসকে নারদ বলিতেছেন "যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ পরিতোষণম্। জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥" অর্থাৎ লোকে যদি অনুভব করে যে, তাহার সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রহ্মের শক্তি দ্বারাই হইতেছে, এবং তাহার প্রার্থিত ভোগ্য বস্তুও ব্রহ্মময় এবং তিনিই কর্ম্মফল দাতা তবেই কর্ম্ম সমর্পণ করা সম্ভব হয়; নচেৎ হইতে পারে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে জ্ঞানোদয় হয় এইরূপ অনুভূতি সেই জ্ঞানেরই প্রকাশ মাত্র ভগবৎসাধনার দ্বারা ঐ জ্ঞান অনুভূতির বিষয় না হইলে উহা মৌখিক জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। অতএব ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান আমার সুখাদি ভোগের জন্য নহে, এতদ্বারা যেন ভগবান প্রসন্ন

হন ইহাই আসল শরণাগতি। ভগবান সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু এই ধর্ম্মত্যাগকে কেহ যেন কর্ম্মসন্ন্যাস মনে না করেন। ভগবানের এই উদ্দেশ্য হইলে তিনি তাঁহার শরণগ্রহণরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিলেন কেন? সর্ব্ব শাস্ত্রের সর্ব্ব সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। প্রত্যেক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই এক একটী ফল আছে, যদি সেই সব ফলের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে জ্ঞান বা মোক্ষ-লাভ হইবে না, সুতরাং পরমতত্ত্ব অবিদিতই থাকিবে। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—"ধর্ম্ম শব্দেনাত্র অধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে, সর্ব্বধর্ম্মান্ সর্ব্বকর্ম্মানি ইত্যেতৎ"—অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম যতদিন থাকিবে ততদিন দেহ সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না, পুনঃপুনঃ জন্ম যাতায়াত ঘুচিবে না—এই জন্য সাধককে ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন

"ইহ চেদশকোদ্বোদ্ধুং প্রাক্‌শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥"

এই দেহে যদি সে ব্রহ্মকে বুঝিতে সমর্থ হয় তবে সে দেহপাতের পূর্ব্বেই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। যদি অবগত হইতে সমর্থ না হয় তবে তাহাকে আবার এই পৃথিবীতে শরীর গ্রহণ করিতে হয়।

অবশ্য "ধর্ম্ম" বলিতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম, ইত্যাদি অনেক প্রকার ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। শ্রুতিও বলিতেছেন—"ধর্ম্মঞ্চর" ধর্ম্মাচরণ করিও; এখন ধর্ম্ম বলিতে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। কিন্তু মনুষ্য জীবনের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য "আত্মদর্শন", অথচ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের কোনটীই আত্ম-দর্শনের মুখ্য উপায় নহে। তাই এগুলিকে যথাকালে গ্রহণ ও যথাসময়ে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত আত্মান্বেষণে সচেষ্ট হইতে হইবে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—ইহাদের সকলেরই নিজ নিজ ধর্ম্ম আছে, এবং তাহাদিগকে জোর করিয়া ছাড়াইবারও উপায় নাই, অথচ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যক্ত না হইলেও আত্মদর্শন হইবার উপায় নাই। তাই ভগবান বলিতেছেন এক্ষণে তুমি আর ইহাতে পাপ হইবে, উহাতে পুণ্য হইবে এই ভাবিয়া বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িও না। এই সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইলে তোমাকে কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিত হইতে হইবে। দেখা যাইতেছে আমাদের মধ্যে যাঁহারা বেশ ভাল লোক বা ধার্ম্মিক লোকও হ'ন তাঁহারাও অনেক সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের বহুবিধ শাখার ও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রীয় মতের বিচার করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন মনে হয় কিছুই বুঝি করা হইল না, সবই আধ্‌খাপচা রহিয়া গেল। তখন তাঁহাদের প্রতি সাধুদের এই উপদেশ যে প্রারব্ধ বশে যে কর্ম্মই কৃত হউক না কেন, তাহার ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল তাঁহার স্মরণে মন লাগাইয়া রাখ। আর ভাল মন্দ কর্ম্মের ভাল মন্দ সব ফলই জগদ্‌গুরু পরমাত্মার চরণে অর্পণ করিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কেবল ক্রিয়া করিয়া চল। আর যাহা হইবার হউক সেদিকে তোমার লক্ষ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল ক্রিয়া করিতে বসিলেও মন যে বারবার বিষয়ের দিকে ছুটিয়া যায় তাহাতে যে স্মরণের বিঘ্ন হয়, তাহাতে যে মন আসক্তিপূর্ব্বক কত কি ভাবনা করে, না জানি তাহাতে কত পাপই হয়, এই

পাপের বোঝা হইতে কিসে রক্ষা হইবে ? তাই গুরুর উপদেশ এই যে তুমি একটু মন দিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, এই স্মরণ বা ক্রিয়ার ফলে তোমার মন আর অন্য দিকে যাইবে না। ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যে আসিবেই ; তিনিই যে ভগবান, তাঁহার স্বল্প মাত্র প্রকাশেও যে তুমি পাপমুক্ত হইবে।

আমাদের মধ্যে পাপ পুণ্য কর্ম্ম করে কে জান ? দেহেন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি সমন্বিত প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত। তুমি ক্রিয়া দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের গ্রন্থি খুলিয়া ফেল, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃতির অতীত হইয়া আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রাণ দিয়া এবং প্রাণপণে ক্রিয়া করিতে পারিলেই তাঁহার শরণ লওয়া হইবে। এইরূপ শরণ গ্রহণ যে করে সেই তো তাঁহার ভক্ত। ভক্ত বিপন্ন হইলে বা সাধক নিরাশ হইলে ভগবানই তাহাকে অভয় দান করেন। যে এতকাল ধরিয়া তাঁহার ভজন করিয়া আসিল, যে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহার আবার ভাবনা কি ? যাহা কিছু ত্রুটি যাহা কিছু পাপ হইয়া থাকুক, তবুও তিনি শরণাগত সাধককে মুক্তিদান করেন। তিনি যে বলিয়াছেন—

"সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥"

"তোমার আমি" বলিয়া একবারও যে আমার শরণাগত হইয়া আমার কৃপাপ্রার্থী হয়, আমি তাহাকে অভয় প্রদান করি—এই আমার ব্রত।

তাই নিজ ভক্তকে ভগবান বলিতেছেন তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির বশে না চলিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। আত্মার শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং সর্ব্বধর্ম্মের সেরা ধর্ম্ম। যে তাঁহাকে চায়, সে বিষয়কে চাহে না। প্রাণের সহিত বিষয়কে না চাহিলেই মন বিষয়ের পানে অযথা ছুটিয়া যাইবে না। অনেকে মনে করেন ভগবানই জীবকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত মায়ার দ্বারা নাচাইতেছেন—জীবের স্বতন্ত্রতা কোথায় ? ভগবান কৃপা করিলে তবে তো মুক্তি হইবে ? মুক্তি ভগবদ্ কৃপার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু এজন্য জীবকেও প্রযত্ন করিতে হয়। বিনা প্রযত্নে, বিনা তপস্যায় কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যে তাঁহাকে পাইতে চাহে তাহাকেই কিছু মূল্য দিতে হইবে, যদিও সে মূল্য ভগবদ্প্রাপ্তির তুলনায় কিছুই নহে—তথাপি ঐ মূল্য দিতেই হয় ; ঐ সাধনার ক্লেশই সেই সামান্য মূল্য। সাধনপথের দুর্গমতা ও ক্লেশ দেখিয়া অনেকে বিচলিত হইয়া যান। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত কবি বলিয়াছেন—

"ক্ষণ আধদুঃখ জনম ভরি সুখ
কাহে তু বিনোদিনী মোড়য়সি মুখ"।

কেন তুমি তপস্যার ভয়ে সাধনে বিমুখ হইয়া রহিয়াছ ? তাঁহাকে নিশ্চয় পাইবে। তাঁহার প্রাপ্তির তুলনায় সাধনার ক্লেশ অতি সামান্য, অতএব বিমূঢ়ের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া আলস্যে সময়ক্ষেপ করিও না। একবার কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও—তারপর অনন্ত সুখ, আত্মসমুদ্রে নিরন্তর সন্তরণ ! অতএব "নাত্মানং অবসাদয়েৎ"—মনকে অবসন্ন হইতে দিও না। বেগে সাধন করিয়া চল, সাধনের বেগ যত বৃদ্ধি হইবে, যত বৈরাগ্যে প্রাণ ভরিয়া যাইতে

থাকিবে, ততই তোমার আত্মসাক্ষাৎকার আসন্ন হইবে। কিন্তু তোমার শ্রম না দেখিলে আত্মদেব সন্তুষ্ট হইবেন না। আত্মদেবের সন্তোষের জন্যই গুরুপ্রদত্ত সাধনা প্রচণ্ডবেগে করিয়া চল, কিছুতেই অবহেলা করিও না। অবহেলা করিলেই ঠকিবে। বেদে একটী মন্ত্র রহিয়াছে—"ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ"—সাধনার পরিশ্রমে যতদিন আপনাকে পরিশ্রান্ত করা না যায়, ততদিন দেবতারা অনুকূল হন না। হে সাধক! পরিশ্রমে ক্লেশ বোধ করিও না। তোমার পরিশ্রম দেখিয়া আত্মদেব অনুকূল হইবেন, তিনি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন।

জগদাদি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম রহিয়াছে তাহাই সর্ব্বধর্ম্ম বা পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির ধর্ম্ম। এই প্রাকৃত ধর্ম্মের অনুসরণ করিলে সুখ, দুঃখ, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ তাপে জীবকে তাপিত থাকিতে হয়। সেইজন্য প্রকৃতি ও প্রকৃতির সর্ব্বধর্ম্মের উপরে উঠিতে হইবে। পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতিই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম বা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য—এই পঞ্চচক্রস্থিত পঞ্চ ভূতময় ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাদের কোন একটী স্থানে বাঁধা পড়িয়া গেলে সাধকের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে বটে, কিন্তু বন্ধনমুক্তি হইবে না। তাই সাধককে আজ্ঞাচক্রে ও তাহার উপরে উঠিতে হইবে। ইহাই সব ছাড়িয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা—ইহাই "মামেকং শরণং ব্রজ"। অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় যে শক্তি সহস্রারে অবস্থিত, তাহার আশ্রয় লইতে হইবে। উহাই তাঁহার পরম ধাম ও পরম পদ। ওস্থানে যে সাধক পৌঁছিতে পারেন তাঁহাকে আর সংসারে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না।

ভাগবতে শ্রীশুকদেব তাই বলিতেছেন—

"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরংপদং পদংপদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥"

পুণ্যযশঃ মুরারির পদপল্লব-নৌকা যে আশ্রয় করিয়াছে, ভবসমুদ্র তাহার নিকট গোস্পদের ন্যায় বোধ হয়, সেই পরমপদে যাহারা স্থানলাভ করিয়াছে তাহাদের আর পদস্খলন হয় না, অর্থাৎ তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

মুর শব্দের অর্থ বেষ্টন, সংসার বা জন্মজরা মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ যাহা জীবকে সতত বেষ্টন করিয়া আছে তাহা যিনি নাশ করেন তিনিই মুরারি।

"মুরঃ ক্লেশে চ সন্তাপে কর্ম্মভোগে চ কর্ম্মিণাম্।
দৈত্যভেদেঽপ্যরিস্তেষাং মুরারিস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর জীবকে সংসারে যাতায়াত রূপ ক্লেশ সন্তাপ সহ্য করিতে হয় না। উহাই জীবদেহে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল কমল। ঐ স্থানে স্থিত সাধকেরই পরমগতি লাভ হয়।

"ব্রহ্মরন্ধ্রে মনো দত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥"

ব্রহ্মরন্ধ্রে মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণার্দ্ধকালও অবস্থিতি করিতে পারে, তাহা হইলে সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করে।

(গীতাশাস্ত্র শুনিবার যোগ্য নয় কাহারা ?)

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
না চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

"অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অণিমাদি গুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ ॥"

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হয়, তিনিই পুরুষোত্তম। তিনি স্বেচ্ছানুসারে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ করিয়া শেষে আমাতেই বিলীন হইয়া যান।

অতএব যিনি আত্মচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে আমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার আর অন্যদিকে দৃষ্টিই যায় না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে আর কিছু শোক করিবার থাকিল না ॥ ৬৬

অন্বয়। ইদং (ইহা) তে (তোমার) অতপস্কায় (তপস্যাহীন ব্যক্তির নিকট) ন বাচ্যং (বলা উচিত নহে), ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকে নহে), ন চ অশুশ্রূষবে (শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি বা গুরুবিদ্বেষী ব্যক্তিকেও নহে), ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি (যে আমাকে অসূয়া করে তাহাকেও বলা উচিত নহে) ॥ ৬৭

শ্রীধর। এবং গীতার্থতত্ত্বম্ উপদিশ্য তৎ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। ইদং—গীতার্থতত্ত্বং, তে—ত্বয়া, অতপস্কায়—স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যম্। ন চ অভক্তায়—গুরৌ ঈশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যম্। ন চ অশুশ্রূষবে—পরিচর্য্যাম্ অকুর্ব্বতে, শ্রোতুম্ অনিচ্ছতে বা বাচ্যম্। মাং—পরমেশ্বরং, যঃ অভ্যসূয়তি—মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি, তস্মৈ চ ন বাচ্যম্ ॥ ৬৭

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপ গীতার্থতত্ত্ব উপদেশ করিয়া তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তনে (অর্থাৎ কীদৃশ ব্যক্তিকে গীতার্থতত্ত্ব বলিবে) নিয়ম বলিতেছেন]—এই গীতার্থতত্ত্ব (যেন) স্বধর্ম্মানুষ্ঠাহীন ব্যক্তিকে বলা না হয়, এবং গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকেও কদাচিৎ বলা না হয়। যে পরিচর্য্যা না করে বা শুনিতে ইচ্ছা না করে তাহাকেও বলিবে না। আমি পরমেশ্বর আমাকে যে মনুষ্যদৃষ্টিতে দোষারোপ পূর্ব্বক নিন্দা করে তাহাকেও বলিবে না ॥ ৬৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কেহ আমাকে হিংসা নিন্দা করে তাহাকে ক্রিয়ার কথা বলিবে না।—অর্জ্জুনের মোহ নাশের জন্য গীতায় আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ যে যোগার্থ তত্ত্ব ভগবান ব্যাখ্যা করিলেন এইবার সেই সব সাধনা কাহারা পাইবে এবং কাহারা পাইবে না তাহার উপদেশ করিতেছেন। গীতা যোগশাস্ত্র, ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যোগবিষয়ক সকল নিগূঢ় কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান উপদেশ করিলেন বলিয়াই যে এই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকলেই জানিবার সমান অধিকারী তাহা নহে। যাঁহাদের জানিবার অধিকার আছে তাঁহাদিগকেই বলিতে হইবে। অধিকারী যে কাহারা তাহাই এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন। স্বধর্ম্মে যাহাদের আস্থা নাই, যাহারা অসংযমী সুতরাং তপঃ-সাধনে অযোগ্য, গীতার সাধনা তাহাদের জন্য নহে। আর যাহারা ভক্তিহীন, গুরু ও ঈশ্বরে

(ভগবদ্ভক্তের নিকট গীতা ব্যাখ্যার ফল)

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

শ্রদ্ধাশূন্য, শাস্ত্রে যাহাদের অবিশ্বাস—তাহাদিগকেও সাধনার কথা বলিবে না। যাহাদের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস দৃঢ় নহে, যাহারা সর্ব্বদেবময় বাসুদেবকে না জানিয়া বিশেষ বিশেষ দেবতাকে হিংসা ও নিন্দা করে, তাহারা গীতোক্ত সাধনা পাইবার অযোগ্য। সুতরাং তাহাদিগকেও গীতার উপদেশ বলিতে নাই। আর একটী বড় কথা গুরুশুশ্রূষা। গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত গীতার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিবার উপায় নাই এবং যে তপঃসাধনে প্রমাদযুক্ত এবং ঈশ্বরের প্রতি যাহারা ভক্তিশূন্য তাহারাও গীতোক্ত উপদেশ গ্রহণে অনধিকারী। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, কারণ তাহার নিকট বিদ্যা আত্মগোপন করেন, কখনও প্রকাশিত হন না। যথা :—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ॥ শ্বেতাশ্বতর উঃ।

যাহার নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি পরম ভক্তি আছে এবং গুরুতেও তদ্রূপ ভক্তি থাকে সেই মহাত্মার নিকটেই পূর্ব্বকথিত উপনিষদ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়।

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় মা মা ব্রূয়াদ্বীর্য্যবতী তথা স্যাম্ ॥" মুক্তিকোপনিষদ।

ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে গোপন রাখিও তাহা হইলে তোমরা ইষ্ট অর্থাৎ ভোগ ও মুক্তি উভয়ই লাভ করিবে। কিন্তু [যদি সকলের নিকট গোপন না-ও রাখিতে পার] অসূয়াযুক্ত, সরলতাশূন্য ও অসংযমী বা অতপস্বীদিগকে কদাপি বলিবে না, বলিলে বিদ্যার শক্তি থাকিবে না ॥ ৬৭

অন্বয়। যঃ (যিনি) ইদং পরমং গুহ্যং (এই পরম গুহ্য বিষয়) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের নিকট) অভিধাস্যতি (ব্যাখ্যা করিবেন) [সঃ—তিনি] ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা (আমাতে পরা ভক্তি করিয়া) মাম্ এব এষ্যতি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন), অসংশয়ঃ (ইহাতে সন্দেহ নাই) ॥ ৬৮

শ্রীধর। এতৈঃ দোষৈঃ রহিতেভ্যঃ গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি—মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

বঙ্গানুবাদ। [এই সকল দোষরহিত ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার যে কি ফল তাহা বলিতেছেন]—যে ব্যক্তি আমার ভক্তগণকে এই গীতার উপদেশ দিবেন সে ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি করে, পরে নিঃসংশয় হইয়া (তাহার সকল সংশয় ছিন্ন হওয়ায়) আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

(গীতা পাঠের ফল জ্ঞানযজ্ঞের তুল্য)

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে এই ক্রিয়া পাবে—সে আমারই হ'বে।—অধ্যাত্মশাস্ত্র গীতার উদ্দেশ্য লোককে আত্মবিৎ করা। আত্মবিৎ সে-ই হইবে যে ক্রিয়া করিবে। এই ক্রিয়া জন্মমরণ হইতে উদ্ধার করিয়া লোককে মুক্তি পদবী দান করেন। সমস্ত ক্রিয়ারহস্য গীতায় আছে, তাই যে কেহ এই গীতা পড়িয়া লোককে শুনায় ও ইহার রহস্য বুঝাইয়া দেয় সে-ও নিশ্চয় একদিন আত্মবিৎ হইয়া যাইবে ইহাতে সন্দেহ করিও না। আত্মক্রিয়াশীল পুরুষ আত্মাকেই লাভ করিবেন ॥ ৬৮

অন্বয়। মনুষ্যেষু (মনুষ্যের মধ্যে) তস্মাৎ (তাঁহাপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন (অধিক প্রিয়কারী আর নাই)। তস্মাৎ অন্যঃ (তাঁহা হইতে অন্য কেহ) মে প্রিয়তরঃ চ (আর আমার অধিক প্রিয়) ভুবি ন ভবিতা (পৃথিবীতে হইবে না) ॥ ৬৯

শ্রীধর। কিঞ্চ—নেতি। তস্মাৎ মদ্ভক্তেভ্যঃ—গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাৎ অন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমঃ—অত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি। ন চ কালান্তরে ভবিষ্যতি। মম অপি তস্মাৎ অন্যঃ প্রিয়তরঃ অধুনা ভুবি তাবৎ নাস্তি। ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—সেইজন্য গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাকর্ত্তার ন্যায় অন্য কেহই মনুষ্য মধ্যে আমার অত্যন্ত পরিতোষকর্ত্তা নাই, কালান্তরেও হইবে না। পৃথিবীতে তাঁহা হইতে অন্য প্রিয়তর অধুনা নাই, কালান্তরেও হইবে না ॥ ৬৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ ক্রিয়া কল্লে তাকে আমি বড় ভালবাসব। তার মত পৃথিবীতে আর ভাল লোক নাই।—মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া যে ক্রিয়া পায় এবং ভক্তি সহকারে ক্রিয়া করিয়া যায় তাহাপেক্ষা আর আত্মার প্রিয়তর কেহ নাই। কারণ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত যোগী আত্মার যত নিকটে এত নিকটে আর কেহ হইতে পারে না। বাহ্যবিষয়ে চিত্ত যত উৎক্ষিপ্ত হয় ততই সে আত্মা হইতে দূরে সরিয়া যায়, যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার দিকে যত অগ্রসর হইতে পারে, ততই সে আত্মার সান্নিধ্য লাভ করে। যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, সে আত্মার সহিত এক হইয়া যায়, সুতরাং তদপেক্ষা প্রিয়তর আত্মার আর কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৬৯

অন্বয়। যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদম্ (এই ধর্ম্ম সংবাদ) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তৎকর্ত্তৃক) অহং (আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা) ইষ্টঃ স্যাম্ (অর্চ্চিত হইব), ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমার মত) ॥ ৭০

(গীতা শ্রবণের ফল)

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১

শ্রীধর। পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ—শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ, ইমং ধর্ম্ম্যং—ধর্ম্মাৎ অনপেতং সংবাদং যঃ অধ্যেষ্যতে—জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহম্ ইষ্টঃ স্যাম্—ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থম্ অবুধ্যমান এব কেবলং জপতি, তথাপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেব অসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধিঃ ভবতি। যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কস্যচিৎ নাম গৃহ্লাতি, তদাসৌ মাম্ আহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বম্ আগচ্ছতি, তথা অহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্। অতএব অজামিল-ক্ষত্রবন্ধু-প্রমুখানাং কথঞ্চিৎ নামোচ্চারণ মাত্রেণ যথা প্রসন্নোঽস্মি তথৈব তস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০

বঙ্গানুবাদ। [গীতাপাঠকারীর ফল বলিতেছেন]—আমাদের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই ধর্ম্মসংযুক্ত সংবাদ, যিনি জপরূপে পাঠ করেন সেই পুরুষ কর্ত্তৃক আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকি, ইহাই মনে করি। সে ব্যক্তি গীতার্থ না বুঝিয়াও যদি কেবল গীতা পাঠ করে, তথাপি তাহা শুনিয়া আমার বোধ হয় যেন সে আমাকেই প্রকাশ করিতেছে (ডাকিতেছে), যেমন যদৃচ্ছাক্রমে কেহ যদি কোন সময়ে কাহারও নাম গ্রহণ করে, সে যেমন 'আমাকেই ডাকিতেছে' মনে করিয়া সেই লোক তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হয়, সেইরূপ আমিও তাহার সন্নিহিত হই। অতএব অজামিল ও ক্ষত্রবন্ধু (ধ্রুব) প্রভৃতির কোনরূপ নামোচ্চারণমাত্রেই তাহাদের উপর যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলাম সেইরূপ অর্থজ্ঞানহীন গীতাপাঠকারীর প্রতিও আমি প্রসন্ন হইয়া থাকি—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৭০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে একথা শুনবে (পড়বে) তার ভাল হ'বে।—আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্মজনক সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার ভাল হইবে। কেন? যে বিদ্যার সাধনে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় সেই সাধনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে এই সংবাদ পাঠ করিলে। ভগবানকে পূজা করিবার সর্ব্বোত্তম উপায় জ্ঞানযোগ, গীতাধ্যয়নে জীবের অন্তঃকরণে সেই জ্ঞানলালসার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যিনি স্বয়ং জ্ঞানরূপ তিনি যে গীতাধ্যয়নের দ্বারা সংপূজিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? জ্ঞানযজ্ঞের মহাফল পরমপদ লাভ, যিনি গীতা পাঠ করিবেন তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধ বুদ্ধির ফল যে মোক্ষ তাহাও তিনি লাভ করিবেন ॥ ৭০

অন্বয়। শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ (শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য) যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (কেবল শ্রবণও করে) সঃ অপি মুক্তঃ (তিনিও মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্ম্মণাম্ (পুণ্যকর্ম্মকারিগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভলোক সকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন) ॥ ৭১

শ্রীধর। অন্যস্তু জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিৎ শৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি, শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থং অয়ং উচ্চৈঃ জপতি, অবদ্ধং জপতীতি বা দোষদৃষ্টিং করোতি, তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনসূয়শ্চ অসূয়ারহিতঃ যঃ শৃণুয়াৎ সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ মুক্তঃ সন্ অশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

(ভগবানের অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা)

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

বঙ্গানুবাদ। [অন্য ব্যক্তি পাঠ করিতেছে তাহা যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহারও যে ফল হয় তাহা বলিতেছেন]—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কেবল শ্রবণও করে, এবং শ্রদ্ধাবান হইয়াও (যদি কেহ কি জন্য উচ্চস্বরে অবিশ্রান্ত ভাবে ও ব্যক্তি কেন পড়িতেছে আর কি জন্য অবাধে পাঠ করিতেছে এইরূপ দোষদৃষ্টি করে তাহার ব্যাবৃত্ত্যর্থ অর্থাৎ তাহারা যে ফল পায় না তাহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন)—অসূয়ারহিত ভাবে (অর্থাৎ দোষ দৃষ্টি না করিয়া) যে ব্যক্তি ইহা শুনে সে-ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যাত্মাদিগের শুভ লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শুন্‌লে সেও মুক্ত হ'বে:—রসজ্ঞ ভক্তেরা ভগবৎ কথা যত শুনেন ততই তাঁহাদের আরও ভাল লাগিতে থাকে—"যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে"। কিন্তু রসজ্ঞান তো সব সময়ে সকলের হয় না। ভাগবতী কথায় শ্রদ্ধা ও রুচি জন্মিলে রসজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু আমাদের ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা ও রুচি কোথায়? ভবব্যাধির তাড়ণে উৎকৃষ্ট ও সুমধুর যে হরিকথা তাহাও অনেক সময়েই ভাল লাগে না। এ রোগের ঔষধ কি? শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ নিষেবণাৎ ॥"

হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থ গঙ্গাদি স্নান অথবা গুরুপদকমলরূপ মহাতীর্থে স্নান করিলে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় এবং ভগবৎ কথা শ্রবণে আগ্রহের উদয় হয়। এই আগ্রহের উদয় হইলেই ভগবৎ কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। ভগবৎ কথা শ্রবণ এবং তাহার অনুধ্যানের ফলে ভগবৎ শক্তি প্রভাবে কাম ক্রোধাদির প্রবল উত্তেজনা হ্রাস হইতে থাকে, এবং কাম ক্রোধ দ্বারা আর তাহার চিত্ত বিদ্ধ হয় না; তখন জ্ঞানের স্ফুরণ হয় এবং ভগবৎতত্ত্বের অনুভূতি হইয়া বাহ্য বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে, সুতরাং হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর প্রতি আসক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭১

অন্বয়। পার্থ (হে পার্থ) ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (ইহা কি শুনা হইয়াছে?)। ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়) তে অজ্ঞানসংমোহঃ (তোমার অজ্ঞানজনিত সংমোহ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল কি?) ॥ ৭২

শ্রীধর। সম্যক্ বোধানুৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামি ইত্যাশয়েন আহ—কচ্চিৎ ইতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে। অজ্ঞানসংমোহঃ—তত্ত্বাজ্ঞানকৃতঃ বিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭২

বঙ্গানুবাদ। [সম্যক বোধের অনুপপত্তি হইলে অর্থাৎ সম্যক বোধ না জন্মিয়া থাকিলে পুনরায় উপদেশ দিব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—কচ্চিৎ শব্দ প্রশ্নার্থে ব্যবহৃত হয়।

(অর্জ্জুনের উত্তর —তাঁহার মোহনাশ হইয়াছে)

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

অজ্ঞানসংমোহ—তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ বিপরীত বুদ্ধি। অন্য সব স্পষ্ট। [হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শুনিলে ত ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইল ত ?] ॥ ৭২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ শুন্‌লে সব অজ্ঞান নাশ হয়। (তোমার হইয়াছে তো ?)।—অর্জ্জুনের মোহ নষ্ট হইয়াছে কি না হইয়াছে ভগবান তাহা কি জানেন না ? তবে আবার এ প্রশ্ন কেন ? সর্ব্বমোহ-নাশন, সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ ভগবান যাহার উপদেষ্টা তাহারও কি আবার মোহ থাকিতে পারে ? গীতাশ্রবণের ফলই অজ্ঞান মোহের নাশ, অর্জ্জুনেরও নিশ্চয়ই তাহা হইয়াছে—সেই কথা অর্জ্জুন নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া জগৎ জীবকে শুনাইয়া দিন, তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে—এই প্রশ্নের ইহাই উদ্দেশ্য। অজ্ঞান বশতঃই জীবের ভ্রান্তি হয়, শ্রীগুরুকৃপায় শিষ্যের সেই ভ্রান্তি নাশ হয়। শিষ্য সাধনায় কৃতকৃত্য হইলে গুরুর যে আনন্দ, সে আনন্দ বুঝি শিষ্য সাধকেরও হয় না। শিষ্য প্রাণের সহিত উপদেশ ধারণ করিতে পারিলেন কিনা, যদি গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে উপায়ান্তর দ্বারা তাঁহাকে বুঝানো হইবে ইহা সদ্‌গুরুর চিরদিনের অভিপ্রায়। শিষ্যের উপদেশ গ্রহণ ও গুরুর উপদেশ দান এই-জন্যই। যদি শিষ্যের মোহ নষ্ট হইয়া থাকে, তবে গুরু শিষ্য উভয়ের প্রয়াসই সার্থক! গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া সাধকের স্বরূপ জ্ঞান হয় ও নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়, অর্জ্জুনেরও তাহা হইল কিনা সে পরিচয় আমরা পর শ্লোকে পাইব ॥ ৭২

অন্বয়। অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। অচ্যুত ! (হে অচ্যুত) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) মোহ নষ্টঃ (মোহ নষ্ট হইয়াছে), ময়া (মৎকর্ত্তৃক) স্মৃতিঃ লব্ধা (স্মৃতিলাভ হইল—অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ হইল) গতসন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়া) স্থিতঃ অস্মি (আমি স্থির হইয়াছি), তব বচনং করিষ্যে (তোমার উপদেশ মত কার্য্য করিব) ॥ ৭৩

শ্রীধর। কৃতার্থঃ সন্ অর্জ্জুন উবাচ—নষ্টো মোহ ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ। যতঃ অয়ম্ অহমস্মি ইতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিঃ ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া লব্ধা। অতঃ স্থিতোঽস্মি যুদ্ধায় উত্থিতোঽস্মি, গতঃ ধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তব আজ্ঞাং করিষ্য ইতি ॥ ৭৩

বঙ্গানুবাদ। [কৃতার্থ হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন]—আত্মবিষয়ক যে মোহ তাহা নষ্ট হইল, যেহেতু "এই আমি" এই স্বরূপসন্ধান-রূপ স্মৃতি তোমার প্রসাদে লাভ করিলাম। অতএব স্থিত হইলাম অর্থাৎ যুদ্ধার্থ উত্থিত হইতেছি। গত হইয়াছে ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ যাহার সেই আমি তোমার আদেশ মত কার্য্য করিব ॥ ৭৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের তেজ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছেঃ—আমার মোহ আর সন্দেহ সব গেল—যা বল্‌বেন তাই কর্‌ব।—কুলক্ষয়কৃত দোষের চিন্তা ও

আত্মীয়দিগের বধ জনিত কাতরতা অর্জ্জুনের স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও জ্ঞানকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া শোকাকুল চিত্তে সশর গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া মোহবিভ্রান্ত চিত্তে রথের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। এই মোহ নষ্ট করিবার জন্যই ভগবানের প্রয়াস। দেহাত্মজ্ঞানরূপ মোহ অর্জ্জুনকে কাতর করিয়াছিল, তাই তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষ করিয়াছিলেন। ভগবানের উপদেশে আবার তাঁহার সেই আত্মবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তাঁহার স্মৃতি দৃঢ় হইল যে তিনি দেহ নহেন, তিনি আত্মা। সুতরাং অজর অমর আত্মার আবার জীবন মরণের জন্য ভয় কি? মন্দাকিনীর শুভ্র কুলকুল ধারার মত যখন এই আত্মস্মৃতিধারা অর্জ্জুনের মনঃপ্রাণ বুদ্ধির মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল তখন তিনি সর্ব্ব প্রকার সন্দেহশূন্য হইয়া অভয় লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি এইবার জোর করিয়া বলিলেন—"আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমার আত্ম-স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছি।" যে আত্মবিস্মৃত হইয়া জীব কতবার এই ভবে আসে আর যায়, আজ সেই বিস্মৃতি সেই ভুল ছুটিয়া গেল! আমার কত জন্মের সেই নামরূপ-দেহ যাহা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় কেবল অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, আজ সেই মোহ, সেই অজ্ঞান আমার নষ্ট হইয়া গেল! আর এই সংসারে কর্ত্তৃত্বাভিমান, আমার কত শত সাজা বেশ, জাগ্রত অবস্থায় যেমন স্বপ্ন জ্ঞান সরিয়া যায়, তেমনই করিয়া অজ্ঞান সম্মোহ আমার জ্ঞানদৃষ্টি হইতে সরিয়া গেল। যে স্মৃতি লাভ হইলে "সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিমোক্ষঃ"—সমস্ত গ্রন্থির মোচন হয়, আমার সেই হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হইল। চিৎজড়ের যে অভেদ জ্ঞান আমাকে কত কাল হইতে জীবভাবে বদ্ধ করিয়াছিল; আজ সে অনর্থ ঐক্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। মায়ার কৌশল আজ আমার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আর অনাত্ম দেহাদিতে আমার আত্ম বুদ্ধি নাই। এখন বুঝিয়াছি, হে আত্মদেব! তুমিই সব, আমিও তুমি। তোমাতে আমাতে আর এই জীব ও জগতের সঙ্গে অজ্ঞানজনিত যে ভেদ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ তোমার প্রসাদে সব তিরোহিত হইয়া গেল! সবই আত্ম স্বরূপ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্থিতি লাভ করিয়া আমার স্বরূপ যে কি তাহা বুঝিয়া লইয়াছি। আমি যে অর্জ্জুন এ বোধ চলিয়া গিয়াছে, আমার পৃথক কর্ত্তব্যের ধারণা যাহা দেহবোধ হইতে হয়, সে ধারণা লোপ পাইয়াছে। দেহবোধের ধারণা ততদিন থাকে যতদিন আত্মবোধ না হয়। ততদিন কত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বোধ জীবকে আকুল করিয়া রাখে। তখন দেহের চাঞ্চল্য, মনের চাঞ্চল্য, প্রাণের চাঞ্চল্য জীবকে অস্থির করিয়া রাখে, আজ মায়ার সে তাণ্ডব নৃত্য তোমার কৃপায় থামিয়া গিয়াছে! এইবার তোমার উপদেশ মত শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণের সাধনা করিতে করিতে এক দিব্য অবস্থা লাভ করিয়াছি। **উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা।** প্রাণ স্থির হইয়া যেমনই সুষুম্নায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল, অমনি জগৎ দর্শন ক্ষীণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখের ধারণাও থামিয়া গেল! এখন মরণ বাঁচনই বা কি, সুখ দুঃখই বা কার? সব স্বপ্ন যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল! স্ব-স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া প্রকৃত সুখের আজ পরিচয় পাইলাম। আর বিষয়সুখকে বড় মনে করিয়া একদিন যে সাধনাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলাম, সাধন-সমরের সাজ মেরুদণ্ড-গাণ্ডীবকে অবনত করিয়া

সঞ্জয় উবাচ।

(অদ্ভুত রোমহর্ষণ সংবাদ)

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥ ৭৪

পাগলের মত শুধু হা-হুতাশ করিতেছিলাম এবং নির্লজ্জের মত আর যুদ্ধ করিব না বলিয়া তোমার নিকট নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এখন সে সব দুর্ব্বুদ্ধি তোমার প্রসাদে ও ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রসাদে, সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে—এখন তোমার বাক্য, হে গুরুদেব, আমি নিশ্চয় পালন করিব। এই দেখ "স্থিতোঽস্মি"—আমি আবার যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলাম। আমার মেরুদণ্ড সোজা হইয়াছে এবং তাহাতে একটি টান অনুভব করিতেছি।

নাভিচক্রের তেজস্তত্ত্ব, বড় আদরের জীব আবার মেরুদণ্ড সরল করিয়া সাধনার্থ উঠিয়া বসিলেন! এইবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—"করিষ্যে বচনং তব—গুরু বাক্য যেমন করিয়াই হউক পালন করিবই"। জীবশক্তি যখন এই ভাবে কোমর বাঁধিয়া সাধন সমরে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য সাধনার্থ সোজা হইয়া আসনে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করে, তখন ক্রিয়ার পর অবস্থা বা আত্মজ্ঞান লাভের আর বিলম্ব থাকে না। তখন জগদ্গুরু আত্মদেব কূটস্থ চৈতন্যও নিজ মাধুরী সাধককে আস্বাদন করাইয়া দেন, জীব তখন "রসো বৈ সঃ"-কে আপনা হইতে অভিন্ন জানিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। আর সন্দেহের লেশ থাকে না। এইরূপে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় চিরদিনের জন্য তাঁহার সংসার লীলারও অবসান হয়॥ ৭৩

অন্বয়। সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। অহং (আমি) ইতি (এইরূপে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) চ পার্থস্য (এবং অর্জ্জুনের) ইমং রোমহর্ষণং (এই রোমাঞ্চকর) অদ্ভুতং সংবাদম্ (অদ্ভুত কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছিলাম)॥ ৭৪

শ্রীধর। তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথাম্ অনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। রোমহর্ষণঃ—রোমাঞ্চকরঃ সংবাদম্, অশ্রৌষং শ্রুতবান্ অহম্। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭৪

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ বলিয়া প্রস্তাবিত কথার অনুসন্ধানার্থ (উপসংহরার্থ) সঞ্জয় বলিতেছেন]—রোমহর্ষণ শব্দে রোমাঞ্চকর সংবাদ। (মহাত্মা বাসুদেবের ও পার্থের এই রোমাঞ্চকর কথোপকথন) আমি শ্রবণ করিয়াছি॥ ৭৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই যে সম্বাদ এ অদ্ভুত।—কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাধনার অতি গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে এইজন্য এ সম্বাদ বাস্তবিকই অদ্ভুত। আর ইহাতে যে সব অনুভবের কথা বলা হইল তাহার কিছু কিছুও যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। এই অস্থি-মজ্জা-মেদপরিপূর্ণ দেহ ইহার মধ্যে প্রাণের সঞ্চরণ, মন বুদ্ধির খেলা, তাহার মধ্যে আবার এই সব দৃশ্য দর্শন, এই সব কত অজানা জিনিসের অনুভব—ইহা মনে হইলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে!

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

এই অদ্ভুত সংবাদ দিব্য দৃষ্টি হইতেই ফুটিয়া উঠে। এ সমস্ত অনুভব অন্তঃকরণেই হইয়া থাকে, তাই ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ মনকে লইয়াই এই সব কথোপকথন। দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি মনে মনেই এই সব সাধন-সংবাদ প্রত্যক্ষ করেন। সাধকের চৈতন্য সমাধিতেই এই সব দিব্য জ্ঞান স্ফুরিত হয় এবং সেই অবস্থায় পৌঁছিয়া সাধকেন্দ্রগণ সব তত্ত্বই জানিতে পারেন! ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত! যতক্ষণ দেহদৃষ্টি ও জীবভাব থাকে ততক্ষণ এই শরীর, মন বুদ্ধি ও প্রাণের মধ্যে কত খেলাই চলিতে থাকে। কিরূপে ব্রহ্ম হইতে এই জগত লীলাকারিণী মহাশক্তি প্রাণ উদ্ভূত হইয়া থাকে, এবং সেই প্রাণধারার সহিত ব্রহ্ম ভাসিতে ভাসিতে আপনাকে আপনি কত সূক্ষ্ম ও কত স্থূলের মধ্যে প্রকটিত করেন, যেন ব্রহ্ম স্থূলই হইয়া গিয়াছেন! আবার সদ্গুরু কৃপায় সাধন সাহায্যে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া জীব আবার কেমন প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত ভাবকে পরিত্যাগ করে, তাহা আলোচনা করিলে অত্যন্ত অদ্ভুতই মনে হয়। যাহা ব্যক্ত ছিল না, কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর ছিল না, সেই সব অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞাত বস্তু সাধকের জ্ঞানগোচর হইয়া আবার কিরূপে তাহাকে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়—এই সব সংবাদ শ্রোতাকে বিস্ময়াভিভূত করেই তো। আনন্দে বিস্ময়ে তাহার যে রোমাঞ্চ হইবে তাহা আর বেশী কথা কি? সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব তো বাসুদেবই আছেন, কিন্তু জীব অর্জ্জুনের আত্মাও যে দেহ সম্বন্ধী নহে, সেও যে বাসুদেবেরই অংশ, সেও যে মহান্—এই পরম গুহ্য সংবাদে জীবের মন প্রকৃতই পুলকিত হয় এবং দেহ প্রকৃতই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ॥ ৭৪

অন্বয়। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (আমি ব্যাসদেবের অনুগ্রহে) এতৎ পরং গুহ্যং যোগং (এই পরমগুহ্য যোগতত্ত্ব) স্বয়ং কথয়তঃ (স্বয়ং বর্ণনায় প্রবৃত্ত) যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ (যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে) সাক্ষাৎ শ্রুতবান্ (প্রত্যক্ষ ভাবেই শুনিয়াছি) ॥ ৭৫

শ্রীধর। আত্মনঃ তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্। ততো ব্যাসস্য প্রসাদাৎ এতৎ অহং শ্রুতবানস্মি। কিং তৎ ইতি অপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্। পরত্বম্ আবিষ্করোতি। যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫

বঙ্গানুবাদ। [সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে থাকিলেও তাহা শ্রবণে যে সম্ভাবনা আছে, তাহাই বলিতেছেন]—ভগবান ব্যাসদেব আমাকে দিব্যচক্ষু ও শ্রোত্রাদি প্রদান করেন অতএব ব্যাসের অনুগ্রহেই আমি (বহুদূরে থাকিলেও) শুনিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি তাহা কি? এই আশয়ে বলিতেছেন যে তাহা পরম যোগ। পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) কি সে? তাহা বলিতেছেন—যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বক্তা, তাঁহারই মুখ হইতে আমি শুনিয়াছি ॥ ৭৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্যাসের-প্রসাদাৎ শোনা গেল এই যোগ।—এই সংবাদ পরম গোপনীয় কেন? বিনা সাধনায় বা বাহ্য ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কেহ ইহা বুঝিতে পারে না। ইহা শুনা যায় ব্যাসদেবের প্রসাদে। এই ব্যাসদেব কে? শ্রীকৃষ্ণও যা ইনিও তাই। ব্যাসে ও শ্রীকৃষ্ণে প্রভেদ কি? উভয়েই ভগবানের অবতার কূটস্থ চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ "তৎ" স্বরূপ অর্থাৎ আপনাতে আপনি। সেখানকার কথা ভাষায় ব্যক্ত হয় না এবং সে কথা এই কর্ণেও শুনা যায় না। তাই সেই কূটস্থ চৈতন্যই যখন একটু বাহ্যেন্দ্রিয়-মিলিত হইয়া ব্যক্ত হ'ন (যেমন পরাবস্থার পরাবস্থায় হইয়া থাকে) তখন যে দিব্যজ্ঞান আমাদের মনোগোচর হয় তাহাই ব্যাসের প্রসাদ। ব্যাস হইলেন বেদবিভাগ কর্ত্তা, সুতরাং যেখানে বিভাগ সেখানে কিছু ভেদজ্ঞান আছেই। যেখানে জ্ঞানের পূর্ণতাও আছে এবং কিছু ভেদজ্ঞানও আছে, সেই স্থান হইতেই এই সব সংবাদ শুনা যায়— ব্যাস তাই ভগবানের অংশাবতার। ঘনীভূত পরাবস্থায় কিছুই জানিতে পারা যায় না, কারণ সেখানে দ্বিতীয় বস্তুর অভাব, জ্ঞাতা জ্ঞেয় বলিয়া সেখানে কিছু নাই, সেখানে থাকিয়া কোন বস্তুর বর্ণনা করা অসম্ভব। ব্রহ্ম ভাবের নিম্ন অবস্থাই ঈশ্বর ভাব, পরমাত্মা নির্গুণ, সেখানে মাত্র একটিই ভাব। যেখানে সর্ব্বের কথা আসে, জগত জীবের কথা আসে সেখানে তিনি পুরুষোত্তম বা নারায়ণ, সেখানে তিনি মায়ার অধীশ্বর সর্ব্বময়। অবতারাদি যত কিছু এই নারায়ণ হইতেই হইয়া থাকে। অবতারেরাও মায়া মনুষ্যরূপে দৃষ্ট হইলেও পুরুষোত্তম নারায়ণ হইতে অভিন্ন। পরমাত্মাই মূর্ত্তি গ্রহণ করেন এবং সেই মূর্ত্তি গ্রহণ কালেও তিনি পরমাত্মাই। পরমাত্মারই ঘনীভূত মূর্ত্তি অবতারেরা। এই অবতার সমূহের মধ্যে যাহাতে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয়, তিনিই পূর্ণাবতার। আর যেখানে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাকৃত কম তাঁহাকে অংশাবতার বলা হয়। অংশাবতারের মধ্যেও জ্ঞানের পূর্ণতা বিদ্যমান। ইঁহারা জ্ঞানভূমিকার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত, এইজন্য ঐশ্বর্য্য বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। জ্ঞানভূমিকায় বা সমাধির উচ্চতম অবস্থাই ব্রহ্ম ভাব, তন্নিম্ন ভাবই ঈশ্বর ভাব। এই ঈশ্বর ভাবের আংশিক বিকাশ যেখানে তাহাই ব্যাস, এখানে মায়ার মিশ্রণ অপেক্ষাকৃত অধিক—এইজন্য এখানে কিছু ভেদ ভাব দৃষ্ট হয়। ব্যাসের অর্থও বিভাগকর্ত্তা। ভেদ ভাব না থাকিলে বিভাগ করা সম্ভব হয় না। উহাতে সমাধি প্রজ্ঞাও থাকে, সাংসারিক জ্ঞানও থাকে। কূটস্থের যে মণ্ডলে জ্ঞানাত্মিকা ভাবের বিকাশ হয়, তাহা হইতে আরও একটু নিম্নে অবতরণ করিলে তখন উহা সাধকের বোধগম্য হয়, কিন্তু তখনও দিব্যদৃষ্টি থাকে—**তাহাকেই পরাবস্থার পরাবস্থা** বলে। এই অবস্থায় যে দিব্যজ্ঞান হয় তাহাই ব্যাসের প্রসাদে সঞ্জয়ের শ্রবণ। ইহা পরম যোগতত্ত্বও বটে, কারণ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন করিয়া দেওয়াই এই সংবাদের উদ্দেশ্য। ইহা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখের কথা। শ্রীকৃষ্ণই নিখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ নামও সার্থক। কারণ পরাবস্থায় জীব যখন পরমাত্মার সহিত এক হইয়া জীবন্মুক্তি অবস্থা ভোগ করে—তখন সে বুঝিতে পারে ইহার কি প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি। সে শক্তির টানে পড়িলে ধন জন গৃহ পুত্র কলত্র

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতং।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬

সমস্তই তখন বিস্বাদ বলিয়া মনে হয়। আর মন সে দিকে ফিরিতেই চায় না। তাই গোপীগণ বলিয়াছিলেন—

"চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু।
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা॥"

পূর্ব্বে আমাদের মন যেমন আনন্দের সহিত গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট থাকিত, তুমি আমাদের সেই মন অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং পূর্ব্বে আমাদের যে হস্ত গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত, মন না থাকায় সে হস্তও অপহৃত হইয়াছে। আমাদের পা তোমার চরণ সমীপ হইতে এক পাও চলিতে চায় না. বল দেখি তবে আমরা ব্রজেই কিরূপে যাই এবং গিয়াই বা করিব কি ?

যে মন সংসার লইয়া নিয়ত ব্যস্ত এবং সামান্তক্ষণও সংসার হইতে বিচ্যুত হয় না, সেই মন ক্রিয়ার পর অবস্থায় পরম শান্ত হইয়া সমস্ত তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে, তাই রাসপঞ্চাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ সাক্ষাৎ পাইল তখন তাহাদের অবস্থা হইল—"তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ"॥

কৃষ্ণ দর্শন জন্য আনন্দে গোপীদিগের হৃদ্‌রোগ (কামানুবন্ধন) নষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং তাঁহাদের মনোরথের অন্ত হইল—অর্থাৎ সে মনে পূর্ব্বেকার মত আর মনন ধর্ম্ম রহিল না, এই মনোরথের অন্ত হওয়াই সাধনার শেষ কথা—বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ এই পর্য্যন্ত। তাহার পরও সাধক যে কি কি অবস্থা লাভ করেন তাহা বেদের অগোচর অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় নহে।

"সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোক পরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনঃ॥"

জীবসমূহ সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ নামক চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া যেমন সন্তাপশূন্য হয়, গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনজনিত পরমানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া সেইরূপ বিরহসন্তাপ ত্যাগ করিলেন।

এখানে স্পষ্টতঃ সমাধির কথা উল্লেখ করা হইল, সাধারণ লোকে সুষুপ্তির ক্রোড়ে অভিভূত হইয়া যেমন তাপশূন্য হয়—এই কৃষ্ণদর্শন জনিত (পরাবস্থাজনিত সমাধি) পরমানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া গোপীরা (ইন্দ্রিয়বৃত্তি) বিরহসন্তাপ পরিত্যাগ করিল।

এই সময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে যোগ হয়, সেই অবস্থাতেই ইহা শুনা যায় এবং উহা তখন আত্মবাণী বলিয়া বুঝা যায়। এই জন্যই ইহার নাম শ্রুতি। উহাই ভগবানের নিজ মুখের কথা। তাহা লোকপরম্পরায় শুনা কথা নহে, উহা নিজ অনুভবগম্য॥ ৭৫

অন্বয়। রাজন্! (হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র), কেশবার্জ্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জ্জুনের) ইমং পুণ্যং (এই পবিত্র) অদ্ভুতং সংবাদং (অদ্ভুত কথোপকথন) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (স্মরণ

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

করিয়া করিয়া) মুহুঃ মুহুঃ চ (ক্ষণে ক্ষণেই) হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি বা হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৬

শ্রীধর। কিঞ্চ—রাজন্নিতি। হৃষ্যামি—রোমাঞ্চিতো ভবামি, হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—"হৃষ্যামি"র অর্থ রোমাঞ্চিত হইতেছি, অথবা হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। অন্য সব স্পষ্ট। [রাজন্, কেশবার্জ্জুনের এই বিস্ময়কর পুণ্য সংবাদ (পুণ্য—শ্রুতিমাত্র পাপহর) স্মরণ করিয়া প্রতিক্ষণেই আমি হর্ষপ্রাপ্ত হইতেছি] ॥ ৭৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ কথা শুনে মন বড় সন্তুষ্ট হ'ল।—কেশবার্জ্জুনের এই যে সংবাদ ইহা পুণ্য কথা। ইহা চিত্তকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধ করে। সাংসারিক কথায়, ভোগের কথায় আমাদের চিত্তকে আবদ্ধ করে এই জন্য উহা পাপ। আর এই কেশবার্জ্জুনের কথায় পাপ মুক্ত করে। অর্জ্জুন বিশুদ্ধ তেজস্তত্ত্ব, তাহার দ্বারাই জগদ্ব্যাপার চলিতেছে, সেই তেজঃ যখন ঈশ্বরমুখ বা আত্মমুখ হয় তখনই তাহা ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়ক হয়।

কেশব—ক—মস্তক, ঈশ—প্রভুত্ব করা, ব—প্রাপ্তি। সহস্রারে যিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়াছে যাঁহার—তিনিই কেশব। এই কেশব আর অর্জ্জুন পরস্পর সখ্য ভাবে মিলিত। সাধক সাধনশক্তি বলে যখন নির্ম্মল হইয়া যান তখনই সহস্রদল কমলস্থিত গুরুশক্তির সহিত তিনি মিলিত হইতে পারেন। এই মিলন না ঘটিলে দেহেন্দ্রিয়াদি প্রকৃতি-ক্ষেত্র জয় করা অসম্ভব। সুতরাং যখনই এই পুণ্যময় ভাব আবির্ভূত হয়, তখনই ক্লেদপূর্ণ শরীরকে সাধক বিস্মৃত হইয়া যান, তখন অন্তর্জগতের কত রূপ, কত শব্দ, কত ঐশ্বর্য্য, কত জ্ঞান প্রকটিত হইয়া সাধককে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব চিন্ময় রাজ্যের বিমলানন্দে মগ্ন করিয়া দেয়। আমাদের এই বিষয়-মগ্ন মনটা বিষয়ক্লেদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তির আরাম অনুভব করে। শুদ্ধচিত্তের এ কথায় যত আনন্দ হয় এমন আর অন্য কিছুতে হয় না ॥ ৭৬

অন্বয়। রাজন্ (হে রাজন্) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং রূপং (অতি অদ্ভুত রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (স্মরণ করিয়া করিয়া) মে (আমার) মহান্ বিস্ময়ঃ (অতিশয় বিস্ময় হইতেছে) চ (আর) পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি (পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৭

শ্রীধর। কিঞ্চ—তচ্চেতি। বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—তৎশব্দে পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিশ্বরূপ। অন্য সব স্পষ্ট। [হে রাজন্, হরির সেই সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া করিয়া আমার মহা বিস্ময় জন্মিতেছে ও আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছে] ॥ ৭৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফের খুব খুসি হ'চ্ছি।—ভগবানের সগুণ রূপই বিশ্বরূপ, যাহা অর্জ্জুনের ধ্যান সৌকর্য্য হেতু দেখানো হইয়াছিল। সেই অত্যদ্ভুত রূপ স্মরণ করিয়া

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের আনন্দের আর সীমা নাই। এত আনন্দের কারণ কি? কারণ এই জগদ্ব্যাপারের মধ্যে জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সাময়িক তৃপ্তি লাভ করিলেও জীব প্রকৃত তৃপ্ত হয় না, বহুভাবের মধ্যে এক ঐক্য ভাবকে দেখিতে না পাইলে জীব শান্ত হয় না। নানাত্ব ও অনৈক্য তাহাকে অভয় দান করিতে পারে না। যতক্ষণ জীব নানাত্ব দর্শন করে ততক্ষণ জীব কিছুতেই সন্তাপমুক্ত হয় না। তাই শ্রুতি বলিলেন—

"যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥" (কঠ)

যে আত্মচৈতন্য ইহ অর্থাৎ এই বিশ্বে বা দেহস্থ অন্তঃকরণে প্রকাশিত সেই আত্মচৈতন্যই অমুত্র তথায় অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায়; যে চৈতন্য মায়াতীত ভাবে, সেই চৈতন্য এই এখানে অর্থাৎ দেহ বা দেহস্থ অন্তঃকরণে অনুস্যূত রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মচৈতন্যে নানা ভাব (অর্থাৎ অন্তঃকরণের ভিন্নতা বশতঃ আত্মা বা ব্রহ্মের ভিন্নতা) দর্শন করে, সে ব্যক্তি পুনঃপুনঃ মৃত্যুর পর মৃত্যু লাভ করিতে থাকে। অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুর হস্ত হইতে সে মুক্তি লাভ করে না। এখন এই এক বিশ্বাত্মার মধ্যে যখন সমস্ত নরনারী, দেবতা, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নদী সমুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ একাধারে সমস্ত অবস্থিত দেখিতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, সেই নানাভাব যখন এক মহাজ্যোতিঃর মধ্যে আত্মহারা হইয়া গেল—তখন পৃথক পৃথক দৃশ্য পদার্থের আর পার্থক্য রহিল কোথায়—এই ভাবিয়া সঞ্জয়ের বিস্ময় উৎপন্ন হইল। যে ভেদভাব নানা উপদেশ ও বিচার বিতর্কেও যাইবার নহে তাহা যখন বিশ্বরূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে এক হইতে দেখা গেল, তখন বিশ্বের মহান ঐক্য দেখিয়া ভেদবুদ্ধিবিমূঢ় চিত্ত নির্ব্বাক হইয়া গেল। এ কথা যতবার স্মরণ হয় ততই বিস্ময়ে চিত্ত অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৭৭

অন্বয়। যত্র (যেখানে বা যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যেখানে) ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ (ধনুর্দ্ধর পার্থ), তত্র (সে স্থানে) শ্রীঃ (রাজলক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (অভ্যুদয় বা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি) ধ্রুবা নীতিঃ (অখণ্ডিত বা অব্যভিচারী ন্যায়) [বর্ত্তমান] ইতি মে মতিঃ (ইহা আমার নিশ্চয়) ॥ ৭৮

শ্রীধর। অতঃ ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজ ইত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র —যেষাং পক্ষে, যোগানাম্ ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধরঃ, তত্রৈব শ্রী—রাজ্যলক্ষ্মী : তত্রৈব বিজয়ঃ, তত্রৈব চ ভূতিঃ—উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ, নীতিঃ—ন্যায়োঽপি, তত্রৈব ধ্রুবা—নিশ্চিতা, ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ইতি মম মতিঃ—নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রঃ ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণম্ উপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুরু ইতি ভাবঃ।

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্ত তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥

তথা হি "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া," "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন"—ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তেঃ মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্ব শ্রবণাৎ তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারমাত্র যুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তম্।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥"

ইত্যাদি বচনাৎ। ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং,

"সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥"

ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ। ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবান্তর ব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য। ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতি ইত্যুক্তে জ্বালানাম্ অসাধনত্বম্ উক্তং ভবতি। কিঞ্চ—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-পুরাণবচনানি, এবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাৎ ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ ॥
পরমানন্দ শ্রীপাদ-রজঃ শ্রীধারিণাধুনা।
শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতা সুবোধিনী ॥
স্ব প্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্ গীতাং তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অম্বু স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্মণী
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
পরমার্থনির্ণয়ো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। [অতএব তুমি (ধৃতরাষ্ট্র) পুত্রগণের পক্ষে রাজ্যাদি লাভের আশঙ্কা পরিত্যাগ কর, এই আশয়ে বলিতেছেন]—যাহাদের পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, এবং যেখানে গাণ্ডীব-ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেখানেই রাজলক্ষ্মী, সেখানেই বিজয় আর সেখানেই

উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি, নীতি বা ন্যায্য বিচারও সেইখানে। ধ্রুবা শব্দের অর্থ নিশ্চিতা। (ইহার সহিত শ্রী, বিজয় প্রভৃতি সকলের অন্বয়) ইহাই আমার নিশ্চয়। অতএব এখনও পুত্রগণসহ তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া পাণ্ডবদিগকে প্রসন্ন করতঃ এবং সর্ব্বস্ব তাহাদিগকে অর্পণ করিয়া পুত্রগণের প্রাণরক্ষা কর—ইহাই তাৎপর্য্য।

ভগবদ্‌ভক্তিযুক্তের ঈশ্বর প্রসাদলব্ধ আত্মজ্ঞানবশতঃ সুখে বন্ধ বিমুক্তি হয়—ইহাই গীতার সারসংগ্রহ। ভক্তির মুক্তিসাধকত্ব বিষয়ে প্রমাণ এই—"হে পার্থ, একান্ত ভক্তিদ্বারা সেই পুরুষ লভ্য হন"। "হে অর্জ্জুন একান্ত ভক্তি দ্বারা এইরূপ আমি জ্ঞাত ও দৃষ্ট হই"—ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ভগবদ্ভক্তির মোক্ষসাধকত্ব শ্রুত হয় বলিয়া সেই একান্ত ভক্তিই মৎপ্রসাদজনিত তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে অবান্তর ব্যাপার তাহার সহিত যুক্ত হইয়া মোক্ষের হেতু হয়—ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীত হইল। (তত্ত্বজ্ঞানের যে অবান্তর ব্যাপারতা) সে বিষয়েও ১০।১০ শ্লোকে—'সতত যুক্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারীদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে পায়" এবং ১৩।১৯ শ্লোকে "আমার ভক্ত ইহা জানিয়া মদ্ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হয়"—ইত্যাদি বচন হইতে প্রমাণিত হইতেছে জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার। আর জ্ঞানই ভক্তি ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ—"সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি আমার পরা ভক্তি লাভ করেন" এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে—"ভক্তির দ্বারা আমাকে বিশেষরূপে জানে"—এই শ্লোক দুইটী দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞানের ভেদ নির্দ্দেশ করিতেছেন। আর এরূপ হইলে "তাঁহাকে জানিবার পর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, মুক্তির অন্য উপায় নাই"—এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইল এইরূপ আশঙ্কা করা যায় কি ? না। যেহেতু জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার। যেমন "কাষ্ঠৈঃ পচতি"—কাষ্ঠ দ্বারা পাক করে এই কথা বলিলে অগ্নির অসাধনত্ব উক্ত হইল না, অগ্নিও কাষ্ঠের ন্যায় যেরূপ সাধন হইয়া থাকে, জ্ঞানও সেইরূপ সাধন। এইজন্যই 'যাহার দেবতাতে পরা ভক্তি এবং যেমন দেবতাতে সেইরূপ গুরুতে, সেই মহাত্মার নিকটেই এই সকল কথিত তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।'' আর "দেহান্ত হইলে দেবতা (ইষ্টদেব) তারক ব্রহ্মের উপদেশ করেন" এবং "যাহাকে এই ভগবান কৃপা করেন তৎকর্ত্তৃকই তিনি লভ্য হন"—ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বাক্যগুলির সামঞ্জস্য হয়, অতএব ভক্তিই যে মোক্ষের হেতু ইহা সিদ্ধ হইল।

তাঁহারই প্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার গীতার বিবৃতি (সুবোধিনী টীকা) করা হইল, এতদ্বারা পরমানন্দ মাধব প্রীত হউন।

সেই পরমানন্দের শ্রীপাদরজের শোভাধারী শ্রীধরস্বামী যতি কর্ত্তৃক এই সুবোধিনী টীকা অধুনা সম্পন্ন হইল।

নিজের প্রাগল্‌ভ্য বলে ভগবদ্গীতা আলোড়ন করিয়া তত্ত্বলাভেচ্ছু ব্যক্তি কি গুরুকৃপারূপ অমৃতদৃষ্টি ব্যতিরেকে তদন্তর্গত তত্ত্বলাভ করিতে পারে ? যেমন নিজ অঞ্জলি দ্বারা সমুদ্রজল

আলোড়ন করিয়া জলমধ্যস্থ মণিগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি কি সংকর্ণধার ব্যতীত আবর্ত্ত মধ্যে ডুবিয়া যায় না ? সেইরূপ গুরুকৃপা না পাইলে গীতাতত্ত্ব জানা যায় না ॥ ৭৮

ইতি ভগবদ্গীতার সুবোধিনী টীকার বঙ্গানুবাদ পরিসমাপ্ত ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কৃষ্ণ যে দিকে সে দিকে জয় অর্থাৎ কূটস্থেরই জয়।— অর্থাৎ মানুষ যতই দেহভাবে মত্ত থাকিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকুক, একদিন দেহাতীত কূটস্থ চৈতন্যের প্রতি নজর পড়িবেই। সেদিন আসিবেই যেদিন সব ভুলিয়া, প্রকৃতির সুদৃঢ়-বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করিয়া জীব পরমাত্মার সন্নিধানে তাঁহার চরণ প্রান্তে আসিয়া মিলিত হইবেই। সেই সাধু ক্রিয়াবানেরা যাঁহাদের রজস্তম প্রক্ষীণ হইয়া সত্ত্বগুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে—তাঁহারাই একদিন গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবেন —অতএব হে ক্রিয়াবানগণ, গুণবিধ্বংসী এই ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হও ও নিজ জীবন সফল কর।

এই পরমানন্দের সংবাদ যে সকল মহাপুরুষেরা চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছেন--সেই সকল হতত্রপ আত্মজ্ঞ পুরুষেরা, ও যে মহাপুরুষ এই পথের দীপবর্ত্তিকা হস্তে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া জগৎ জীবের কল্যাণ করিয়াছেন সেই যোগীশ্বর পুরুষ জয়যুক্ত হউন ॥ ৭৮

ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীগুরুপদ ভরসা ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ও সমস্ত গীতার সারাংশ.

ভক্তি বা শ্রদ্ধা না হইলে যোগাভ্যাসাদিতে প্রবৃত্তিই হয় না। যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত পুরুষেরই প্রাণ, মন, বুদ্ধি স্থির হয়, এবং এই স্থির মনেই আত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার বা প্রিয়তম বলিয়া মনে হয়। ভগবান বা আত্মা ব্যতীত আমার অস্তিত্বই নাই ভক্তি দ্বারা এই ধারণাই দৃঢ় হয়। আমার প্রভুই সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত এইরূপ ধারণার ফলেই বিশ্বের সর্ব্ব পদার্থে তাঁহাকে ধারণা করা সম্ভব হয়, এইরূপে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন হইলে পৃথক ভাবে জগৎ বস্তুর জন্য বা দেহাদিতে আর তেমন আসক্তি থাকিতে পারে না। এই অবস্থাতেই সাধকের সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ততার উদয় হয়। এই নির্লিপ্ত-ভাব হইতেই জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা লাভ হয়, পরে স্বরূপে অবস্থান হয়। যোগাভ্যাস দ্বারা সাধক যোগ-বলে বিভূষিত হন এবং যোগ-বলে সাধকের অসামান্য দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়, সেই দিব্য দৃষ্টি হইতেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয় এবং তাহাতেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। এই পুরুষ-দর্শন ব্যতীত আত্মভাবনা (নিজের সম্বন্ধে বহুবিধ জল্পনা) নিবৃত্ত হয় না। পুরুষ জ্ঞান হইলে ভগবান বাসুদেবের মায়াশক্তির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং জীবও যে ভগবানের সহিত অভেদ ভাবে সম্বদ্ধ সে জ্ঞানও সাধকের হইয়া থাকে, এবং এই জ্ঞান দ্বারাই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয়। ভাগবতে শ্রীনারদ বলিতেছেন—

"যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছন্তি তৎপদম্॥"

যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিশ্বব্যাপী বাসুদেবের মায়াপ্রভাব বুঝিতে পারিলাম; এবং সেই জ্ঞানদ্বারাই বিষ্ণুর পরম পদ সাক্ষাৎ করা যায়। কিন্তু যতদিন মায়া উপরতা না হন ততদিন জীব নিজেকে সম্পন্ন মনে করিতে পারে না। মায়া নিবৃত্ত হইলে সাধক বুঝিতে পারেন কিরূপে ভগবানের অচিন্ত্য মায়াশক্তি প্রভাবে পুরুষ হইতে কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহময় প্রকৃতির আবির্ভাব ও তাহার ক্রম-বিকাশ হয়। গুণত্রয়েরই বিবিধ সংযোগ হইতে এই অনন্ত রূপময় জগত প্রস্ফুটিত হয়, তাহা বাস্তবিক একেরই বিবিধ পরিণাম মাত্র এবং গুণত্রয়ের কার্য্য-পরম্পরা হইতে এই সব বিবিধ দৃশ্যবস্তু ও পৃথক ভাবাদির অনুভব হয়। কিন্তু সকলের মূল সেই একটী বস্তুই এবং সেই এক হইতে সমস্ত বস্তু অভিন্ন। যতদিন সকলের মূল-স্বরূপ এই একে পৌঁছিতে পারা না যায়, ততদিন নানাত্ব দর্শন নষ্ট হয় না। নানাত্ব দর্শনই অজ্ঞানের নামান্তর। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥" কঠোপনিষদ্

যে আত্ম চৈতন্য এই দেহ-পুর মধ্যে প্রকাশিত, সেই আত্মাই আবার অমুত্র অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায় রহিয়াছেন, আবার সে ব্রহ্ম-চৈতন্য মায়াতীত ভাবে বিরাজ করিতেছেন, সেই

চৈতন্যই এই দেহের মধ্যে রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্ম-চৈতন্যে পৃথক্ পৃথক ভাব, অর্থাৎ অন্তঃকরণের বা দেহের ভিন্নতা বশতঃ দেহস্থিত আত্মা ও ব্রহ্মের ভিন্নতা দর্শন করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

গুণত্রয় হইতে জীবের নানাত্ব দর্শন হয়। ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতিরই গুণ, ইহারা সর্ব্বদা বাহ্য পদার্থ দর্শী, অন্তরাত্মাকে ইহারা বুঝিতেই পারে না, সুতরাং বহির্দ্দৃষ্টি হইতে ইহাদের এতদূর জড়তা আসিয়া যায় যে, ইহারা স্থূল জড়ভাব ব্যতীত অন্য কিছু যে রহিয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারে না। প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গুলির সেবা করিয়া জীবেরও এই জড়তা বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং তাহার আন্তর জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। ইহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনাদের প্রকৃতি মধ্যে যাহাতে সত্ত্বগুণ অধিক পরিমাণে স্ফুরিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রেও তজ্জন্য বহুবিধ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রজস্তমোগুণ-জনিত আবরণ ও বিক্ষেপ এত অধিক হয় যে, তাহা স্বরূপ দর্শন করা অসম্ভব হয়। সত্ত্বগুণও আবরক বটে, কিন্তু তাহা এত স্বচ্ছ যে, তাহাতে স্বরূপ দর্শনের বিঘ্ন উৎপন্ন করে না। স্বরূপ দর্শন হইলেই অজ্ঞান, জড়তা, প্রমাদ প্রভৃতি তমোভাব এবং লোভ কর্ম্মোদ্যম বিষয়স্পৃহা প্রভৃতি রজোভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া থাকে। যে আত্ম-চৈতন্য সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকেও এই রজস্তমোভাব বিদূরিত না হইলে কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। এই রজস্তমোভাবকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিবার জন্যই জ্ঞানীরা নিষ্কাম ভাবে বা ভগবদর্পিতচিত্তে কর্ম্ম করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। ক্রিয়াভ্যাসই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিষ্কাম কর্ম্ম। এই ক্রিয়ারূপ নিষ্কাম সাধনা হইতেই **পরাবস্থারূপ** জ্ঞানে স্থিতি লাভ হয়। এই পরিস্থিতি সুদীর্ঘকালব্যাপী হইলেই সাধককে জীবন্মুক্ত করিয়া দেয়। যোগাভ্যাসরূপ উপায় দ্বারাই উহা সাধ্য। রজস্তমের বহুলতাই বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবরক। যখন বুদ্ধি সত্ত্বরজস্তম দ্বারা আর অভিভূত হয় না, তখনই বৈশারদী সমাধির উদয় হয়। এতদ্দ্বারায় যোগীর আত্মসাক্ষাৎকারজনিত অধ্যাত্ম-প্রসাদ লাভ হয়। ইহাকেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলে, এ প্রজ্ঞায় মিথ্যার লেশ মাত্র থাকে না। যেমন নদী উত্তীর্ণ হইলে আর তরণীর আবশ্যকতা থাকে না, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় জ্ঞেয়-পরমাত্মার সহিত নিজ-আত্মার অভিন্নতা প্রত্যক্ষীকৃত হইলে তখন আর ক্রিয়া-সাধনের আবশ্যকতা থাকে না। তাহার পূর্ব্বে ক্রিয়া ত্যাগ অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই কথাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বহু প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। "ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ" (ঋক্ বেদ)—সাধনার পরিশ্রমে যতদিন আপনাকে পরিশ্রান্ত করা না যায়, ততদিন দেবতারাও কোন সাহায্য করেন না।

এই অষ্টাদশ অধ্যায়ই গীতার সার সংক্ষেপ। ইহার আলোচনায় বুঝা যায় মানুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করে। ইহা কিরূপে লাভ করিতে হইবে তাহাই ভগবান ১৮শ অধ্যায়ে ৫০ হইতে ৫৩ শ্লোকে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। প্রথমতঃ স্বকর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বর-আরাধনায় রত হইলে ভগবদ্কৃপায় সাধকের সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হয়। কারণ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সাধকের যখন স্থিতি হইতে থাকে, তখন তাহারই প্রসাদে অন্তঃকরণ

শুদ্ধ হইয়া থাকে, আর বিষয় বাসনায় চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হয় না। চিত্তশুদ্ধিই জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা প্রমাণ করে। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যাহার যতটুকু স্থিতি হয়, তাহার সেই পরিমাণে জ্ঞানোদয় হয়। ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা নিঃশেষরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিই এই সাধনানুষ্ঠানের বা ক্রিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিসমাপ্তি। তজ্জন্য সাধককে করিতে হইবে (১) কায়মনোবাক্য সংযম (২) লঘু আহার (৩) নির্জ্জন স্থানে বাস বা জনসঙ্গ ত্যাগ (৪) দর্প, ক্রোধ ও পরপীড়াবর্জ্জন এবং নিরহঙ্কার হইয়া সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে লাগিয়া থাকা অর্থাৎ ধ্যান ধারণার অভ্যাস করা—তাহা হইলে চিত্ত মমতারহিত হইবে ও শান্ত হইবে—এইরূপে যোগী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সামর্থ্য লাভ করিবেন।

ব্রহ্মভূত যোগীর কি কি লক্ষণ ফুটিয়া উঠে তাহাই ৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাঽস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

পরাভক্তি দ্বারা আমি যে অখণ্ডানন্দ দ্বৈতরহিত ব্রহ্ম, তাহার সাক্ষাৎকার হয়। পরে প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসানে (অজ্ঞান কার্য্য দেহাদির নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে) ঘট-নাশের সহিত যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের সহিত এক হইয়া যায় তদ্রূপ উপাধি বিনির্ম্মুক্ত সাধক আত্মাকারেই স্থিতিলাভ করেন। দর্পণ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্ব যেমন থাকে না, সেইরূপ আত্মাকারে স্থিত সাধকের সর্ব্বোপাধির ক্ষয় হইয়া যায়।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ক্রিয়া করিতে করিতে মন যখন বিক্ষেপশূন্য হইয়া স্থির হয়, তখন চিত্তাকাশের সমস্ত মল বিধৌত হইয়া যায়, তখন আর দ্বিতীয় কিছু সত্তার চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকে না, সমস্ত তত্ত্বই তখন তত্ত্বাতীত অবস্থায় বিলীন হইয়া যায়, তখনই নিজের স্বরূপ সত্তার প্রকৃত জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের আর পৃথক্ বোধ থাকে না, সমস্তই তখন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। "আমি" যে কি—তাহা জানিয়া জ্ঞাতা-আমি জ্ঞেয়-আমিতে লয় হইয়া যায়। উহাই দ্বৈতাদ্বৈত-শূন্য চিদ্ঘনানন্দরূপ আত্মপ্রত্যয়, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুঝিতে পারা যায়। গীতায় বলা হইয়াছে—

চিত্তরূপ যন্ত্রে ভাবনাময় যে সমস্ত কর্ম্মবীজ রহিয়াছে, তাহার স্ফুরণ হইতেছে ঈশ্বরেচ্ছায়,—ইহা জানিতে পারিলেই জীবের কর্ম্ম নষ্ট হয়। যতদিন আমি কর্ম্ম করিতেছি এই ধারণা থাকে, ততদিন সে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল আমাকেই ভোগ করিতে হয়, যখন বুঝিতে পারিলাম আমার কর্ম্ম নাই, তখন কর্ম্মের নাশ হইয়া গেল, তখন আর কর্ম্ম আমাকে জড়াইতে পারিবে না। কর্ম্ম কেন যে হয় এবং কেনই বা ঈশ্বরকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বা মালিক বলে তাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হৃদয়ে স্থিতি হইলেই বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥"

যে "মৎপরঃ" অর্থাৎ সর্ব্বদা আত্মাতে থাকে, তাহার মনে হয় সব কর্ম্ম ব্রহ্মই করিতেছেন, ইহা জানিতে পারা যায় বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিরচিত্ত (বুদ্ধিযোগ)

যোগী আপনাতেই আপনি থাকেন অথচ সকল কর্ম্মই হইয়া যায়। "মচ্চিত্ত" হইতে পারিলে সে চিত্তে আর সংসারবীজ থাকে না, সুতরাং জন্ম যাতায়াত বা পুনঃ পুনঃ দেহধারণরূপ অশেষ দুর্গতির শেষ হয়।

এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বভূতস্থিত ঈশ্বরের শরণাগত হইতে হইবে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—এইগুলিই তো সর্ব্বভূত, ইহাদের স্থান দেহস্থ মেরুদণ্ড মধ্যে যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধাখ্য চক্র। সাধনকালে সাধককে এই পথ দিয়াই আনাগোনা করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মা সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে বা চক্রগুলির ঠিক কেন্দ্র মধ্যে অবস্থিত। প্রতি চক্রের ক্রিয়া সেই কেন্দ্রমধ্যস্থ শক্তির প্রেরণা। তাহাতেই আমাদের ভূম্যাদি পদার্থ নিচয়ের জ্ঞান হইতেছে। এই জ্ঞানের দ্বারাই চিত্ত বহির্ম্মুখ হয়। কিন্তু মূলাধারাদি পঞ্চ চক্রের মধ্যে ব্রহ্মাকাশ (সুষুম্নার মধ্যে বজ্রা, বজ্রার মধ্যে চিত্রা এবং চিত্রার মধ্যে ব্রহ্মাকাশ) রহিয়াছে, উহাই ঈশ্বর,—উঁহারই শাসনে চক্রমধ্যস্থ তত্ত্বগুলি স্ব স্ব কার্য্য নিরন্তরভাবে করিয়া যাইতেছে; যতক্ষণ ক্রিয়া দ্বারা সেই চক্রের কেন্দ্রভূত ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে চিত্ত প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ হয় না, এইরূপ শরণ গ্রহণ যে করে সে-ই ভাগ্যবান ক্রিয়াবান, তাহারই ঈশ্বর প্রসাদে পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন আসিতে পারে সূত্রধার যেমন যন্ত্রদ্বারা পুত্তলিকাদিগকে যথেচ্ছ ক্রীড়া করায়, ঈশ্বরও তদ্রূপ সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়া দ্বারা সংসারস্থ জীবসমূহকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণা দিয়া থাকেন, জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই —এ কথা শুনিলে ভয় হইবার কথা, কারণ তাহা হইলে মুক্তিলাভের চেষ্টা জীবের পক্ষে এক বিপুল ব্যর্থতা, এবং সমস্ত শাস্ত্রবাক্যেরও কোন মূল্য থাকে না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, আত্মা স্বয়ং প্রকৃতি-পরবশ নহেন, তিনি মুক্ত ও সদা স্বাধীন। তিনি মুক্ত বলিয়াই চিতের প্রতিবিম্ব যে জীব, তাহারও মুক্তি-ইচ্ছা স্বাভাবিক, সেইজন্য প্রকৃতি যতই প্রবল হউক, জীবকে আত্মানুসন্ধান হইতে বিরত করিতে পারে না। কারণ আত্মাই জীবাত্মার প্রাণ, এবং এই নিজ প্রাণ হইতে জীব কখনও বিযুক্ত হইবারও নহে; তবে মায়াবশ হইয়া দেহেন্দ্রিয়ের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হওয়ায় জীব আপন স্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। সে অবস্থাতেও জীব ও পরমাত্মা পরস্পর এক ও অভিন্ন। জীব প্রকৃতি-পরবশ সত্য কিন্তু জীবকে মুগ্ধ করিবার প্রেরণা প্রকৃতিও যেমন ঈশ্বর হইতে পাইয়া থাকে, আবার প্রকৃতির বশ্যতা বিচূর্ণ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণাও জীব ঈশ্বর হইতেই পাইয়া থাকে। ঈশ্বরের এক দিকটা যেমন জন্মমৃত্যু তরঙ্গ-হীন, সদা অচ্যুত ও মুক্ত, বহির্দিকটা আবার তেমনই জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সদা স্পন্দিত ও বিভীষিকাময়ী। জীব অজ্ঞানবশতঃ যতদিন বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন থাকে, ততদিন সে প্রকৃতিপরবশ থাকে, ততদিন কলের পুতুলের মত প্রকৃতির আদেশ মান্য করিতে বাধ্য হয়, ততদিন কিছুতেই সে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। প্রকৃতির এ প্রেরণাও ভগবদ্‌শক্তি, সুতরাং যে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে, সেই ভক্ত যোগীর ঈশ্বর প্রসাদেই সংসারবন্ধন মোচন হইতে পারে। এজন্য ঈশ্বরকেও বেগ পাইতে

হয় না এবং তাঁহার কোন সঙ্কল্প করাও আবশ্যক হয় না। সমুদ্রের নিকটে উপনীত হইতে পারিলে রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেমন সমুদ্রের স্বাভাবিক স্নিগ্ধ বায়ু দ্বারা সুস্নিগ্ধ হয়, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যে পৌছিতে পারে, ঈশ্বরে স্থিত স্বতঃসিদ্ধ শান্তিও তদ্রূপ ভক্ত সাধককে সংসার তাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া দেয়, এবং ভগবানেরও এজন্য কোন সঙ্কল্প করিতে হয় না। তাহার প্রমাণ—যোগী যখন ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনিও সেইরূপ শান্তিলাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন, বাসনা সঙ্কল্প তাঁহারও তখন থাকে না। ক্রিয়ার পরাবস্থার ঘনীভূত স্বরূপই মদনমোহন শ্যামসুন্দর রূপ। এই পরাবস্থায় যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, সে আনন্দ আর কিছুতে পাইবার সম্ভব নহে—উহা সত্যই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ। উহাই পুরুষোত্তম নারায়ণের নিত্য শাশ্বত মূর্ত্তি, সুতরাং উহা মোক্ষ ও নিত্য অখণ্ডিত আনন্দের একমাত্র আশ্রয়।

যিনি অধিষ্ঠানরূপে এই সমস্ত জগত ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। দেহী কূটস্থ ও নিত্য, শরীর নষ্ট হইলেও কূটস্থ নষ্ট হন না। তিনি অচ্ছেদ্য অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য, ইনি নিত্য সর্ব্বব্যাপী, রূপান্তর শূন্য এবং অনাদি। ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর এবং মনেরও অগোচর, এই কূটস্থ দেহীই ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি যেমন তেমনই আছেন ও থাকেন, এই দেহটীরই যৌবন জরাদি বিবিধ অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়। যাঁহার এই কূটস্থ ব্রহ্মে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তিনি এই সকল বিকার দেখিয়া মুগ্ধ হন না। পঞ্চ তন্মাত্রেরই ব্যক্তভাব এই শরীর। ইহাই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চ সূক্ষ্ম-ভূতের সমষ্টি। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধাখ্য চক্র ইহাই ভূতপঞ্চকের লীলাস্থল। প্রণবাখ্য দেহই অকার, উকার, মকার ও নাদ বিন্দুর অধিষ্ঠান। এই সকলের অতীতই কূটস্থ ব্রহ্ম, যাহার স্থান আজ্ঞাচক্রে, ঐখানে যখন বায়ু স্থির হয়, তখন উহা যে মাত্রা-রহিত শব্দাতীত ও নাদ বিন্দু কলাতীত—তাহা সাধকেরা বুঝিতে পারেন। মাত্রাস্পর্শ বোধ হয় বায়ুর চাঞ্চল্য হেতু, ক্রিয়া দ্বারা যখন সেই বায়ু স্থির হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগ ছিন্ন হয়। মাত্রাস্পর্শ বর্ত্তমান থাকিতে সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত হওয়া যায় না। যখন মাত্রাস্পর্শ বর্জ্জিত হইতে পারা যায়, তখন সুখ দুঃখের স্পর্শও থাকে না। তখন এক পরমানন্দ অবস্থার সাক্ষাৎ হয়, তখন মন মত্ত মধুকরের মত নেশায় ভোঁ হইয়া বসিয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে উহারই বর্ণনা আছে। উত্তমপুরুষ তিনি সকলের অতীত, বায়ু সর্ব্বদা স্থির হইলেই উহা অনুভব হয়। মৃতদেহে যেমন কোন ব্যথা অনুভব হয় না, যাহার বায়ু স্থির হইয়া যায় তাহারও তেমনই কোন ব্যথা অনুভব হয় না। কূটস্থের কোন ব্যথা নাই, কারণ উহা স্থির অথচ অমর। এই ওঁকাররূপ শরীরে প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ যে না করে, সে স্বভাবরূপ স্থিরপদ বা ব্রহ্মপদকে জানিতে পারে না। স্থিরপদ জানিতে না পারাই অজ্ঞান, এই অজ্ঞান যাহার যত, তাহার ক্লেশভোগও ততই অনিবার্য্য।

গীতায় জীবের স্বরূপ

গীতায় কর্ম্মতত্ত্ব, পুরুষোত্তম যোগ, দৈবাসুর সম্পদ ও সন্ন্যাস ত্যাগেরও বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ঐগুলিই গীতায় বিশেষত্ব।

এই কর্ম্মতত্ত্ব এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক। জীবের কর্ম্মই দেহাদিরূপে পরিণাম লাভ করে, এজন্য ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ অষ্টম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নে কর্ম্ম কি, তাহার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন :—

গীতার বিশেষত্ব (১) কর্ম্মতত্ত্ব

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"

জীবের মধ্যে যে বহুধা শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার বিকাশসাধন এবং তাহা দেবোদ্দেশে ত্যাগ করার নামই কর্ম্ম। দেবোদ্দেশে ত্যাগ করিতে না পারিলেও কর্ম্ম হয়, কিন্তু তাহা বাহ্যকর্ম্ম, তদ্দ্বারা জীবের কেবল বন্ধন হয়; কিন্তু যে কর্ম্ম দ্বারা কূটস্থ অক্ষরে মন স্থির থাকে এবং সেই স্থিরতা হইতে যে উত্তম-পুরুষের দর্শন হয়, তাহাই আসল আধ্যাত্মিক কর্ম্মের উদ্দেশ্য। উহা বিনা ত্যাগে হইবার নহে। মন যদি ভোগাসক্তি লইয়া কর্ম্ম করে, তাহা হইলে সে কর্ম্মের ফলে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়া উঠে না। এইজন্য ক্রিয়াসাধনই একমাত্র কর্ম্ম, যদ্দ্বারা দৈবী শক্তি প্রবুদ্ধ হয়। ইহা তো হইল কর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য; এখন কর্ম্ম সম্পাদিত হয় কিরূপে—তাহা জানিলে আপনাকে আর কর্ম্মের কর্ত্তা ভাবিয়া বিড়ম্বিত হইতে হয় না। তাই ভগবান বুঝাইলেন—কর্ম্মসাধনের জন্য কর্ম্মের (১) অধিষ্ঠান, এই দেহ, (২) সদসৎ অহঙ্কারই কর্ম্মের কর্ত্তা, (৩) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিই কর্ম্ম করিবার করণ বা যন্ত্র (৪) কর্ম্ম করিবার জন্য কর্ত্তার যে বিবিধ চেষ্টা যাহা দেহমধ্যস্থ প্রাণাপানাদি বায়ু সমূহের দ্বারাই হইয়া থাকে, (৫) ইহা ছাড়াও কর্ম্ম করিবার জন্য প্রেরণা দিবার কোন অজ্ঞাত শক্তি কাজ করিয়া থাকে, যাহাকে দৈব বলে। কেহ কেহ ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কারকেই উহার কারণ বলেন, এবং কেহ কেহ উহা জীবের হৃদয়স্থ অন্তর্য্যামীরই প্রেরণা বলেন, এক কথায় যাহাকে ভগবদিচ্ছা বলে। এই ভগবদিচ্ছাই কর্ম্মের মূলীভূত বীজস্বরূপ। কত কল্প-কল্পান্তর হইতে কত জন্ম ধরিয়া জীবমাত্রই এই মূল কারণকে আশ্রয় করিয়া বিচিত্র কর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, কাহারও তাহা "না" করিবার উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

"বয়ং ভবস্তে তাত মহর্ষির্বহাম সর্ব্বে বিবশা যস্য দিষ্টম্॥
ন তস্য কশ্চিত্তপসা বিদ্যয়া বা ন যোগবীর্য্যেণ মনীষয়া বা।
নৈবার্থধর্ম্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ॥
ভবায় নাশায় চ কর্ম্ম কর্ত্তুং শোকায় মোহায় সদা ভয়ায়।
সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগমব্যক্তদিষ্টং জনতাঙ্গ ধত্তে॥
যদ্বাচি তন্ত্যাং গুণকর্ম্মদামভিঃ সুদুস্তরৈর্বৎস বয়ং সুযোজিতাঃ।
সর্ব্বে বহাম বলিমীশ্বরায় প্রোতানসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ॥"

শিব, নারদ প্রভৃতি আমরা সকলেই তাঁহার আজ্ঞা বিবশ হইয়া বহন করিতেছি। কোন জীবই বিদ্যা, যোগ, বা বুদ্ধি বলে তাঁহার আদেশ অন্যথা করিতে সমর্থ নহে। হে প্রিয়ব্রত! জীবসমূহ জন্ম মরণাদি সুখ দুঃখ ভোগের জন্য ঈশ্বরদত্ত দেহাদি ধারণ করে। চতুষ্পদাদি

জন্তু যেমন নাসিকায় বদ্ধ হইয়া মনুষ্যের ইচ্ছায় তাহার কর্ম্ম করে আমরাও তেমনই গুণকর্ম্মে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকি।

যতদিন দেহ ধারণ করিতে হয়, ততদিন এই মহানিয়তি ঈশ্বর-সঙ্কল্প বা দৈবকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। এ মূলীভূত বীজের কখনও ধ্বংস নাই। এমন কি জীব মুক্ত হইলেও তাহার প্রকৃতির মধ্যে তখনও এই বীজ বা সংস্কার কর্ম্ম করে। তবে মুক্ত হইয়া কি হইল যদি মনে কর, তাহার উত্তর এই যে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন মনে করেন, এই জন্য প্রকৃতির কার্য্যকে কখনও তাঁহার স্বকার্য্য বলিয়া ভ্রম জন্মে না। ভগবান তাই বলিয়াছেন—

"যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্নহন্তি ন নিবধ্যতে॥"

শরীরাদি কর্ম্মের কর্ত্তা এইরূপ আলোচনা হেতু যাঁহার "নাহংকৃতঃ" অর্থাৎ আমি কর্ত্তা এইরূপ ভাব নাই, এবং যাঁহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয় না, সেই আত্মদর্শী পুরুষ লোকদৃষ্টিতে সকল প্রাণীকে হনন করিয়াও হনন কর্ম্মের ফলে বদ্ধ হন না।

এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়—বশিষ্ঠ নারদাদিকেও যেমন মুক্তপুরুষ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ মহর্ষি ভৃগু দুর্ব্বাসাকেও মুক্ত পুরুষ বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই যে মুক্ত পুরুষ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতির মধ্যে যে বীজ নিহিত ছিল, তাহার কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত হইয়াছে ও হইবে। বদ্ধ ও মুক্তের পার্থক্য এই ;—বদ্ধজীব প্রকৃতির কার্য্যকে স্বকার্য্য মনে করিয়া সন্তুষ্ট ও ব্যথিত হয়। মুক্ত পুরুষ সে সকলকে স্বকার্য্য মনে না করায় তিনি প্রকৃতির কার্য্যে ব্যথা বা আনন্দ প্রাপ্ত হন না। যিনি প্রকৃতিকে কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া জানেন, তিনি কর্ম্মের শুভাশুভ ফলে কখনই বদ্ধ হইতে পারেন না।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু। এই তিনটীর অভাবেও কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না। জীবন্মুক্ত অবস্থায় এই ত্রিপুটী এক হইয়া যাওয়ায় মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম প্রবৃত্তির আর উদয়ই হয় না।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা

কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ এই তিনটী ক্রিয়ার আশ্রয়। সাত্ত্বিকাদি গুণ-ভেদে ইহারা ত্রিবিধ এবং ত্রিবিধ বলিয়াই কর্ম্ম-কর্ত্তার মধ্যে বহু ভেদ লক্ষিত হয়, এবং তৎকৃত কর্ম্মেরও তিন প্রকার ভেদ হয়। এই জন্য যাঁহারা সাত্ত্বিক কর্ত্তা তাঁহারা উৎসাহের সহিত ক্রিয়া করেন এবং তাঁহাদের বাহিরে কিছু চাঞ্চল্য থাকিলেও ভিতরটা খুব স্থির। তাঁহারা কোনরূপ ফলে আসক্ত হন না, কূটস্থের মধ্যে তাঁহারা কত কি দেখিলেও আহ্লাদে আটখানা হইয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধির জন্য জয়ডঙ্কা বাজাইয়া বেড়ান না। রাজসিক কর্ত্তাদের ইহার বিপরীত মনোভাবই হইয়া থাকে, কিন্তু সাত্ত্বিক কর্ত্তারা কূটস্থের মধ্যে কিছু দেখিতে পান বা না পান, তাঁহারা সকল অবস্থাতেই স্থির, তাঁহাদের মনে কোন বিকার আসে না, কিন্তু তামসিক কর্ত্তাদের উক্ত অবস্থাতে মন দুঃখে ভার হইয়া যায়, তাঁহাদের ক্রিয়াতে আর তেমন উৎসাহ থাকে না।

কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ

সমুদায় কর্ম্ম মন হইতেই হয়, সেই মন ক্রিয়া দ্বারা স্থির হইলে কর্ম্ম হইলেও কর্ম্ম-লেপ হয় না। যিনি ক্রিয়াদ্বারা এক অবিনাশী কূটস্থ ব্রহ্মকেও সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখিতে পান, তাঁহারই জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম বা ক্রিয়ার দ্বারা যে ধারণা ধ্যান সমাধিরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। যাহাদের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, তাহারা বুঝিতে পারে যে ক্রিয়া করিলেই ভয় দূর হয়, সুতরাং ক্রিয়া করাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। উহার ফলে তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন। যাহারা ক্রিয়া করে না, তাহারা বন্ধন-দশাতেই থাকে। তাহাদের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি থাকে না বলিয়া তাহাদের প্রাণ সুষুম্নায় বিচরণ করে না। যাহারা তামসিক বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা আলস্য ও প্রমাদবশতঃ ক্রিয়ার অভ্যাস করে না, সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র থাকা সত্ত্বেও তাহাদের ব্রহ্মদৃষ্টি হয় না। যাহারা শ্রদ্ধার সহিত ক্রিয়া করে সাত্ত্বিক ধারণা তাহাদেরই হয়। তাঁহাদের মন-প্রাণের বেগ থাকে না এবং তাঁহাদের অন্তর্লক্ষ্য হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়, সুতরাং আসক্তি পূর্ব্বক কোন বস্তুতেই তাঁহাদের লক্ষ্য পড়ে না। তখন তাঁহারা আপনাতে আপনি ডুবিয়া থাকেন, স্থিরত্বের আনন্দে তাঁহারা ভোঁ হইয়া যান। কিন্তু পঞ্চতত্ত্বের রং চং দেখিয়া যাহারা তাহাতেই আসক্তি প্রকাশ করে, তাহাদের কোন কালে দুঃখের অন্ত হয় না। অনাসক্ত যোগীর চিত্ত ক্রিয়ার পরাবস্থায় সুন্দর পরব্যোমে স্থিতি লাভ করে, তাহাতেই তাহার সর্ব্বদুঃখের পরিসমাপ্তি হয়। তাঁহারাই অভয় অমৃতপদ লাভ করেন।

বিষয়াসক্ত দৃষ্টিই প্রবৃত্তির পথ, তাহাই সংসার। ইহার বিপরীতভাবে যাঁহার মনের স্থিতি হয় —তিনিই মহাদেব।

স্বকর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম

প্রাণ কর্ম্মই "স্বকর্ম্ম", এই স্বকর্ম্মের দ্বারা বিশ্বপ্রাণ বাসুদেব অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যে এইভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে পারে, সেই মনুষ্যের বাক্‌সিদ্ধি হয়, সমস্ত বাসনা সিদ্ধি হয়। ক্রমে আরও উচ্চস্তরে উঠিলে তখন সাধকের আর কোন ইচ্ছাই থাকে না; তখনই তিনি মুক্তিলাভ করেন। ইচ্ছাই জীবের বন্ধন-রজ্জু, ক্রিয়া দ্বারা ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্তি হইলে আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে দৃষ্টি থাকে না, তখন তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন বলা যায়। তাঁহার আর তখন মরণের ভয় থাকে না। ইহাই আত্মার ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মের প্রতি যাহাদের আস্থা নাই তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ তাহাদের কখনও পিছন ছাড়ে না; ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং ব্রহ্মই জীব, তবে জীবকে এত দুর্গতি ভোগ করিতে হয় কেন? ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব স্বরূপাবস্থায় এক, পরস্পরের কোন ভেদ নাই। "ইদন্তু বিশ্বং ভগবানিবেতরো"—এই দৃশ্যমান বিশ্ব ও জীব সমস্তই ব্রহ্মময় তবে যখন ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করেন তখন তিনি জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত হন, আবার যখন অবিদ্যার অধীন হন, তখনই ব্রহ্মের জীবভাব হয়। তখন তিনি বদ্ধ, জন্ম মৃত্যুর বশীভূত এবং তখন তিনি কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গ-নরকাদিও ভোগ করেন। কিন্তু এ সমস্ত ভাবের কোনটাই নিত্য সত্য নহে। ত্রিতাপের জ্বালা তবে কাহার

ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব

হয় এবং কেই বা তাহা হইতে মুক্ত হয়? এবং কেই বা তাহাকে মুক্ত করেন? এইটীই বিশেষ ভাবে আলোচ্য। প্রকৃতি বা মায়ার তিনটী গুণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। রজস্তমঃ যখন সত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হয় তখন সেই সত্ত্বপ্রধান গুণটীই শুদ্ধসত্ত্ব। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল ও প্রকাশক, উহাতে জ্ঞান কখনও আচ্ছাদিত হয় না। এই শুদ্ধ সত্ত্বভাবের উপর যে ব্রহ্মচৈতন্যের লীলা দেখা যায়, তাহাতে ব্রহ্মের নিগুর্ণ ভাব যেন ঢাকা পড়ে, এবং তাহাতেই সগুণ ভাবের খেলা আরম্ভ হয়। এই শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে দেখিলে তাঁহাকে সগুণ মনে হয়, তখন তিনি ঈশ্বর,—এই বিরাট বিশ্বের অধিপতি, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা। এই শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া যে খেলা হয়, তাহাতে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহাই ঈশ্বর ভাব। শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য এখানে মায়ামিশ্রিত। মায়ামধ্যস্থ সত্ত্বগুণের শক্তি এখানে লীলান্বিত বলিয়া ব্রহ্মকে লীলাময় ঈশ্বর বলিয়া মনে হয়। লাল কাচের মধ্য দিয়া যে আলোক আসে তাহাকে যেমন লাল আলোক বলি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আলোক লাল বা সবুজ নহে, তদ্রূপ শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া যে চৈতন্যের স্ফুরণ তাহা নিগুর্ণ হইয়াও শুদ্ধ সত্ত্ব সগুণ রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। আবার রজস্তমের মধ্য দিয়া যে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় তাহাই চিজ্জড়ের মিশ্রণ ভাব। উহাই জীব ও জগত রূপ। যদিও তিনটী গুণই প্রকৃতির, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। সত্ত্ব গুণটী স্বচ্ছ, ভাস্বর ও শান্ত বলিয়া আমি সুখী, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি মনোধর্ম্মগুলিকে ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত যোজনা করিয়া দেয়। আর রজোগুণ বিক্ষেপশক্তিযুক্ত, সুতরাং রাগাত্মক বলিয়া কর্ম্মাসক্তি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান বলিয়া দেহীকে অকার্য্যে প্রযুক্ত করে এবং অনুদ্যম, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতির দ্বারা বদ্ধ করে। গুণগুলি জড় হইলেও চৈতন্যদীপ্ত বলিয়া তাহাদিগকেও চেতন বলিয়া ধারণা করে। সত্ত্বগুণের গতি নিরন্তর উর্দ্ধমুখে বা আত্মাভিমুখী বলিয়া উহা জীবকে নিরন্তর নিবৃত্তিমার্গের দিকে পরিচালিত করে এবং রজস্তমোগুণ ইহার বিপরীত মুখে বা প্রবৃত্তিমার্গের দিকে পরিচালিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ত্রিগুণ সাম্মিলিত ভাবেই সমস্ত কার্য্য করে, তবে এক এক সময়ে এক একটীর প্রাধান্য থাকে. তখন সে অপর দুইটী গুণকে অভিভূত করে। তাই যখন রজস্তমোগুণ প্রবল হইয়া বিষয় সুখে তীব্র বেগে প্রধাবিত হয়, তখন সত্ত্বের ক্ষীণ কণ্ঠ অনুচ্চস্বরে তাহাদিগকে প্রবৃত্তিমার্গে যাইতে নিষেধ করে, আবার যখন সত্ত্ব প্রবল হয় তখন রজস্তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ জীবকে নিবৃত্তি পথে পরিচালিত করে, তখন রজস্তমের গুণ কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ, আলস্য জড়তাকে সত্ত্বগুণ বাধা দেয়। এই শুদ্ধ সত্ত্ব প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর—তিনিই জীবকে পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া লন। শুদ্ধ সত্ত্বে থাকিতে থাকিতে জীবের জ্ঞান এত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়, যদ্দ্বারা সে আপনাকে আপনি মুক্ত মনে করে এবং যতদিন রজস্তমোগুণে জীব অভিভূত থাকে, ততদিন এই প্রবৃত্তি ও মোহমূলক গুণদ্বয়ে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই শোকমোহগ্রস্ত হইয়া দুঃখভোগ করে। রক্তপুষ্প বা নীলপুষ্প যেমন শুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিককে রক্ত বা নীলবর্ণে অনুরঞ্জিত করে, কিন্তু রক্ত বা নীলবর্ণ কখনই স্ফটিককে তাহার স্বাভাবিক ভাব হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ শুদ্ধ চৈতন্যটি মায়াযুক্ত ঈশ্বরভাব বা মায়ামিশ্রিত জীবভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহা

সদা কালই শুদ্ধ ও সুনির্ম্মল থাকে। আপনাকে আপনি এইরূপ দেখিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌছান যায়।

প্রাণের মধ্যেই এই ত্রিগুণ যুক্ত হইয়াছে। এই প্রাণের স্পন্দনই গুণত্রয়ের স্পন্দন। প্রাণ যখন ইড়ায় বহে তখনই রজোগুণ, যখন পিঙ্গলায় বহে তখনই তমোগুণ এবং যখন সুষুম্নায় বহে তখনই সত্ত্বগুণ। আবার প্রাণ যখন ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত হইয়া স্থির হয় তখনই ব্রহ্মভাব, সেখানে আর গুণের খেলা নাই, সুতরাং জন্ম মরণ সুখ দুঃখাদিও তখন আর অনুভবের বিষয় হয় না। গুণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাই ঈশ্বর বা শুদ্ধ সত্ত্বভাবের শরণ লইতে বলা হইয়াছে। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, তেমনই ব্রহ্মাত্মার মধ্যে প্রাণলীলা। প্রাণের বিবিধ স্পন্দনই বিবিধ কর্ম্ম; তাহাতেই জীব বদ্ধ হয়। আবার কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের ন্যায় যে প্রাণকর্ম্ম দ্বারা প্রাণকে স্থির করিতে পারে তাহারই কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় এবং ভববন্ধন কাটিয়া যায়। এইজন্য যাহাতে প্রাণ স্থির হয় তাহার চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। ক্রিয়াভ্যাস দ্বারাই প্রাণের স্থিরতা আসে। প্রাণ স্থির হইলেই মন ও মনের স্থিরতার সহিত বুদ্ধির স্থিরতা আসে। অতএব নিরহঙ্কার হইয়া (আমি সকলের চেয়ে ছোট) অন্য বস্তু হইতে মনের লক্ষ্যকে ফিরাইয়া কেবল ক্রিয়াতে মনকে নিবদ্ধ কর, অল্প আহার কর, বেশী কথা বলিও না বা মনে বিবিধ জল্পনা কল্পনা করিও না—এইরূপে বাক্য মন ও রসনাকে সংযত করিতে পারিলেই আপনাতে আপনি থাকিতে পারিবে এবং তাহা হইলেই যাহাতে ক্রিয়ার অন্ত হয় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ শান্তি লাভ করিয়া স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইবে। তখন অন্য কোন ব্যাপারই তোমার মনের অপ্রসন্নতা আনয়ন করিতে পারিবে না। যাহার চিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় লীন হইয়া যায় তাহার আর উদ্বেগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, কোন লাভ ক্ষতির হিসাব নাই—সে চরাচর সর্ব্বভূতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যায়। যাহা কিছু হইতেছে সবই ব্রহ্ম করিতেছেন এই অনুভব তাহার স্থির হয় সুতরাং অকর্ত্তা বলিয়া তাহার কর্ম্মলেপ হয় না, সুতরাং ফলভোগও করিতে হয় না তাই তাহাদের সর্ব্ব কর্ম্মেরও নাশ হয়। যদিও তাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল কর্ম্মই হইতে পারে তথাপি তাঁহার বুদ্ধি ব্রহ্ম লক্ষ্যে স্থির থাকে বলিয়া কোন কর্ম্মই তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। সাধু ক্রিয়াবানদের এইরূপ বিচিত্র দশা হইয়া থাকে। ইহা তর্ক দ্বারা বা বুদ্ধি খাটাইয়া বুঝিতে পারা যায় না, এ অবস্থা যাহার হয় সেই বুঝিতে পারে।

ঈশ্বর সাধুদিগের হৃদয়ে যেমন আছেন, অসাধুদিগের হৃদয়েও তেমনি ভাবে আছেন, এবং তাঁহারই আদেশে বা ইঙ্গিতে ভূতমাত্রই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া স্ব স্ব নিয়তি অনুসারে পরিচালিত হয়। সাধুরা ক্রিয়ার উপদেশ পাইয়া গুরু-উপদেশ অনুযায়ী চলিতে চলিতে তাঁহাদের প্রাণ সুষুম্নায় ও পরে সুষুম্নার অতীত অবস্থায় স্থির হইয়া যায়, কিন্তু সংসারাসক্ত অসাধুগণের প্রাণ ইড়া পিঙ্গলা অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং অজ্ঞান ও বিষয়ে আসক্তি হেতু তাহারা বারবার নূতন দেহে সংযুক্ত হইয়া জগতে যাতায়াত করে। আত্মা ত্রিগুণরহিত, আবার সেই আত্মাই গুণকে আশ্রয় করিয়া শ্বাসরূপে চঞ্চল হইয়া কত কষ্টই

ভোগ করেন, আবার গুরূপদেশ মত চলিয়া যখন তাঁহার শ্বাস স্থির হয় তখন তিনি শান্তিপদ লাভ করিয়া সুখদুঃখ পাশ হইতে মুক্ত হন। ইহাই গুহ্যাৎগুহ্যতর জ্ঞান।

যিনি মহামায়া, তিনিই মায়াধীশ চৈতন্য, তাঁহাকে কেহ কেহ অর্দ্ধনারীশ্বরও বলেন; এবং কেহ তাঁহাকে পুরুষ, কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরের স্বকীয় প্রকৃতিও বলিয়া থাকেন। তিনি যাহাই হউন, সেই মহাশক্তিই সংসার স্থিতির কারণ। যিনি আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই মহামায়া ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবপ্রসবিনী এই বিশ্বজগতের জননীরূপা, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, তিনিই আমার "আমি"। জ্ঞানীরা নিজাত্মার সহিত পরমাত্মার এই অভিন্নভাব উপলব্ধি করেন বলিয়াই তাঁহারা "সোঽহং" বলিয়া থাকেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর এবং তাহার অতীত পরব্রহ্মই ওঁকার পদবাচ্য। সেই ওঁকারই আনন্দরূপে, পরে মহাশূন্যরূপে এবং পরিশেষে নিত্যজ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

ক্রিয়াভ্যাস দ্বারা লয়বিক্ষেপরূপ অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে আর ফলাভিসন্ধান থাকে না, তখন আমার "আমি"র সহিত পরিচয় হয়, এবং মিথ্যা অহঙ্কৃত "আমি" চিরদিনের জন্য সেই "পরম আমি"র মধ্যে আত্মগোপন করে। তখন মায়া নাই, সুতরাং মায়াতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, এইরূপে জীব ভাব চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়।

দৈব ও আসুর সম্পদ্

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুযায়ীই জীব আসুরী সম্পদ অথবা দৈবী সম্পদের অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিলেই ইহা উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। যাহারা আসুরসম্পদযুক্ত তাহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে ভগবদ্ ভজন করা বা জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। অর্জ্জুনও সেইরূপ অধিকারী কিনা তাঁহার মনে এই সন্দেহ হইতেছিল, তাই ভগবান অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তুমি ভয় পাইও না, তুমি যে দৈবী সম্পদের অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভগবৎপ্রবণতা তোমার পক্ষে তাই স্বাভাবিক। এই দৈবী সম্পদের অধিকার যাহাদের না থাকে, তাহারা সাধন পথে আসিতেই চায় না, যদি বা আসে সাধন পথে অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য এই কথা শুনিয়া অনেকেই ভীত হইবেন, কিন্তু ভয় পাইয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। জন্মজন্মার্জ্জিত সাধনাভ্যাসের সংস্কার যাহার থাকে, তাহার পক্ষে এ যোগপথ তত কঠিন বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু এ অধিকার লইয়া না আসিলেও এই জন্মের পুরুষকার দ্বারা যথেষ্ট দৈবী সম্পদ অর্জ্জন করিয়া লইতেও পারা যায়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যখন দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই বরং আসুর সম্পদ লইয়াই আসিয়াছে, তখন তাহার চিত্ত ভগবদ্ মুখে কেনই বা যাইবে? যাওয়া কঠিন নিশ্চয়ই, কিন্তু একেবারেই যাইবে না তাহা নহে, অবশ্য কিছু চেষ্টা করিতে হইবে। যদি বল চেষ্টা আসিবে কেন? তাহার উত্তর এই যে আমাদের প্রকৃতিটী ত্রিগুণময়ী; আমার মধ্যে রজোভাব তমোভাব হয়তো অধিক প্রবল, কিন্তু সত্ত্বভাব সামান্য হইলেও কিছু থাকিবে নিশ্চয়ই। ইহাতেই অনেক কাজ হইতে পারে। যদি কোন

শুভ মুহূর্ত্তে রজস্তম অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলিত হয়, তবে সেই শুভ মুহূর্ত্তে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বীজ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, আমি ভগবদারাধনার সুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। যদি মনের বেগ একবারও ভগবন্মুখে ধাবিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে অত্যল্পভাবেও দৈবীসম্পদের অধিকারী করিবেই! এক জন্মের সামান্যমাত্র চেষ্টাও পরজন্মে দৈবরূপে উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে, এবং এই দৈবানুগ্রহই আমাকে ভগবৎজিজ্ঞাসু করিয়া আমার জীবনকে সফলতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। এ জন্মের দৈব পূর্ব্বজন্মের পুরুষকারেরই ফল মাত্র, তখন সেই দৈবই আবার পুরুষকারকে বেগযুক্ত করিবে। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য অধিক তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে; দৈবই বীজস্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্ষেত্রস্থানীয়। ক্ষেত্র ভাল হইলে অপকৃষ্ট বীজও উৎকৃষ্ট শস্য উৎপন্ন করে, ক্ষেত্র ভাল না হইলে উৎকৃষ্ট বীজও উত্তম ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হয়, কিন্তু উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কিছুই হয় না। পুরুষকার প্রবল হইলে যদি দৈব ক্ষীণবলও হয় তথাপি হতাশ হইবার কারণ নাই, কারণ ভগবান স্বয়ং পৌরুষরূপেই প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং আমার কর্ম্মোদ্যম বা আত্মচেষ্টাকে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে বলিয়া যেন শিথিল করিয়া না ফেলি। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

"পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥"

প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া দন্তে দন্ত চাপিয়া এ জন্মের শুভকর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তন অশুভ কর্ম্মফল জয় করিতে হইবে।

সুতরাং আমার অদৃষ্ট ভাল নহে বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যে উদ্যোগী পুরুষ তাহার উদ্যোগের ফলই দৈবরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইবে এবং প্রাক্তন অশুভ ফলও ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতে থাকিবে।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এইগুলি আসুরী সম্পদ। যাহারা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক, তাহাদের ঐগুলি স্বভাবজাত গুণ। আর যাহারা নির্ভীক, শুদ্ধচিত্ত, যাহাদের কর্ম্মে তৎপরতা ও জ্ঞানে নিষ্ঠা আছে, যাহাদের বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত, যাহারা দান করে, যজ্ঞ করে, শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তপস্যা করে এবং যাহারা সরল, লোভহীন, দয়ালু, অক্রূর, অচঞ্চল, তেজস্বী, ক্ষমাশীল, শুচি, অনভিমানী ও অহিংসক,—যাহাদের কুকর্ম্ম করিতে লজ্জা হয়, পরনিন্দা, পরদ্রোহ করিতে ভাল না লাগে, যাহাদের চিত্ত ভগবদ্ভজনা করিতে আনন্দ পায় এবং ভজনার ফলে যাহাদের চিত্ত স্থির ও শান্ত হইয়াছে তাহারাই দৈববলে বলীয়ান হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তাহাদের তপস্যা ও আত্মান্বেষণ সাফল্যমণ্ডিত হইবেই। এজন্য উদ্যোগ চাই, নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না,—ভগবান গীতার মধ্যে কোন স্থানেই নিশ্চেষ্টতার প্রশ্রয় দেন নাই।

গীতার "পুরুষোত্তম তত্ত্ব"টী গীতার একটী বিশেষত্ব। এই জীব ও জগতের মধ্যে

দুইটী শক্তি খেলা করিতেছে দেখা যায়। একটী স্থির ও নিত্য এবং অন্যটী চঞ্চল, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল।* কিন্তু এই স্থির বস্তুটী না থাকিলে যেটী নিত্য পরিবর্ত্তনশীল তাহার অস্তিত্বই কল্পনা করা যাইত না। এই নিত্য ও অনিত্য বস্তু দুইটির একটীকে ক্ষর ও অপরটীকে অক্ষর বলা হইয়া থাকে। আত্মার কূটস্থ অপরিণাম ভাবটীই পুরুষ এবং আত্মার বহুরূপে প্রকাশ বা পরিণামশীল ভাবটীই ক্ষর পুরুষ। এই অক্ষর অপরিণামী কূটস্থ ভাবটীকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। অক্ষর পুরুষই আত্মার সত্য বিম্ব এবং তাহা হইতে যে সহস্র সহস্র (যথা পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ) প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় তাহাই ক্ষরভাব। পুরুষোত্তমের সহিত অক্ষরের বহু সাদৃশ্য আছে বলিয়া পুরুষোত্তমকেও অক্ষর বলা হইয়া থাকে। ক্ষরকেও পুরুষ বলা হয় কারণ চিতের প্রতিবিম্ব পড়িয়া তাহাকেও চৈতন্যময় করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্ষর পুরুষ সর্ব্বদা বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন, সেই জন্য তিনি নিজ স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এক আত্মাই বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন, তাহা না বুঝিয়া যিনি নানাত্বরূপ ভেদদর্শন করেন তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত তাঁহার কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, ইহাই প্রকৃত পক্ষে বিনাশ।

পুরুষোত্তম যোগ

"তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।
অন্তরোঽন্তরো ভাতি পশ্যতং মায়য়োরুধা॥" ভাঃ, ১ম স্কঃ

এই সমস্ত বিশ্বই জগৎ প্রকাশক পরমেশ্বরের স্বরূপ, পরমেশ্বর ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। তিনি এক, তাঁহাতে নানাত্ব নাই, তিনিই ভোক্তা এবং তিনিই অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, কেবল মায়াবশে নানারূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন।

পরিণামী সকল বস্তু ও জীবের মধ্যে যে একটী অপরিণামী নিত্য বস্তু রহিয়াছে যাঁহাকে এই চক্ষু দেখিতে পায় না, যাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষু প্রয়োজন, ত্রিকূটীতে যাঁহার স্থিতি যাহা যোগীদের যোগপথানুগম্য, লোকে তাঁহাকে বুঝিতে না পারিলেও যিনি নিত্য, সত্য অবিনাশী, তিনিই কূটস্থ অক্ষর। এই কূটস্থ অক্ষর হইতেও আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন এই কূটস্থকে দেখিতে দেখিতে পরে উত্তমপুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়াছেন—ইনি স্বর্গ মর্ত্ত, পাতাল, ত্রিভুবন ব্যাপিয়া এবং তাহার অতীত হইয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনিই কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম। এই পুরুষেরই যে দিকটি গুণহীন অপরিণামী তাঁহাকেই অক্ষর পুরুষ বলে। তাঁহার অপর দিকটি পরিণামী ও বহুরূপ বিশিষ্ট, চেতন অচেতন সমস্ত জীব ও জগৎ তাঁহা হইতে প্রতিনিয়ত সম্ভূত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি বিভাবই যখন তাঁহার, তখন তিনি ক্ষরের অতীত হইবেন কিরূপে? তাঁহাকে বাদ দিয়া ক্ষর ভাবও হইতে পারে না—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—চেতন অচেতন যাহা কিছু রহিয়াছে, সেই সমস্তই পরমেশ্বর সত্তায় পরিপূর্ণ, তদ্ব্যতীত

অন্ত কিছুই নাই। তবে তাঁহাকে ক্ষরের অতীত এই জন্য বলা হইয়াছে যে ভাবটী তাঁহার দেহরূপে পরিণাম লাভ করিয়াছে তাহার উপাসনা করিয়া (অর্থাৎ সংসারভোগে আসক্ত হইয়া) কেহই তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ভাবটীকে ধরিতে পারে না, এবং তাহা ধরিতে না পারিলে (যাহাদের সংসারে আসক্ত দৃষ্টি থাকে) তাহাদের মহাবিনাশ হয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর কবল হইতে তাহাদের পরিত্রাণ হয় নাই। কেনোপনিষদ্ বলিতেছেন—"ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"—ইহলোকে থাকিয়া বা এই দেহেতে থাকিয়া যদি ব্রহ্মস্বরূপকে বিদিত হওয়া যায় তাহা হইলেই জীবনের সফলতা হইল। এই সফলতা প্রাপ্তিই প্রকৃত জীবন এবং যদি তাঁহার অবিনাশী অটল ব্রহ্মভাবকে জানিতে পারা না যায় তাহাই মৃত্যু।

এই পুরুষোত্তম এক অদ্বিতীয় ও অবিনাশী এবং তিনিই সমস্ত ভূতজাত বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত হইতেছেন অথচ তাঁহার কোন পরিণাম বা পরিবর্ত্তন নাই, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আবার জীবরূপে সর্ব্বত্রে সব হইয়া সব করিতেছেন—এই জীবভাবটী কিন্তু চিরন্তন নহে, উহার নাশ হয়। যিনি সর্ব্বরূপে, তিনিই আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সর্ব্বাতীত অরূপ ব্রহ্ম ভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহাই শাশ্বত অবিনশ্বর ভাব। সেখানে কোন ইচ্ছা নাই, সুতরাং করাকরিও কিছু নাই। এই অক্ষর ভাবটী অমাত্র অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত, যাহাকে তুরীয় অবস্থা বলে। তিনি বাক্য মনের অগোচর বলিয়া তথায় কোন লৌকিক ব্যবহার নাই। উহা প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ জগৎসম্বন্ধ-রহিত, ইহা শিব স্বরূপ ও অদ্বৈত-স্বরূপ। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তবে এই চৈতন্যরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করা যায়।

যখন আবার এই অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ব্রহ্ম মায়ামিলিত ভাবে আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তখন তিনি অন্তর্য্যামী কর্ত্তা ও ঈশ্বর বলিয়া চিন্তিত হন। তখন তাঁহার রূপ আছে আবার নাই-ও। তখন তিনি ভূতজাত বস্তু মাত্রেই মিলিয়া থাকেন, অথচ তাহারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রলয় নিশায় সমস্তই ভগবৎ প্রকৃতিতে সুষুপ্ত থাকে, তখন সৃষ্ট পদার্থ কিছুই থাকে না, গুণ ক্ষোভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তখন একমাত্র নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই বিরাজ করেন; নামরূপের কোন চিহ্নমাত্রও থাকে না। সেই ভগবানই সৃষ্টি কালে আবার—

"স এবভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং, স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী, বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ॥"

সেই ভগবানই জীবের ভোগের জন্য নামরূপবর্জ্জিত জীবাত্মার নামরূপাদি উপাধি সৃষ্টি করিবার বাসনায় স্বীয় কালশক্তিপ্রেরিতা নিজের অংশভূত জীবগণের বিমোহিনী সৃষ্টি-কার্য্যাভিলাষিণী প্রকৃতির অনুসরণ করেন, এবং সকলের কর্ম্মবিধান করিবার জন্য বেদাদি শাস্ত্রও নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

"য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যত্ত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে।"

যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, আত্মলীলা প্রকাশ করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন ও

সংহার করেন, অথচ অনাসক্ত হেতু সেই সকল কার্য্যে তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। তখন তিনি জাতকর্ত্তা, অন্তর্য্যামী ও ঈশ্বর।

তিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন, প্রকৃতি তাঁহার বশীভূত, তাই তখন তাঁহাকে প্রভবিষ্ণু বা স্রষ্টা, নিখিলভূতগণের পালক ও তাহাদের গ্রাসকারী বলা হয়। কিন্তু এই সকল কার্য্য করিয়াও তিনি সদা নির্লিপ্ত।

বেদান্ত সূত্রে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাঁহা হইতে হয়। যিনি না থাকিলে কিছুই হইতে পারিত না, কিন্তু ঐ সকল কর্ম্মের মূলে তাঁহার কোন নিগূঢ় সঙ্কল্প নাই, কারণ তাঁহার অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছায় এই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, অস্তিত্ববান হইতেছে ও তাঁহার মধ্যেই লীন হইতেছে—ইহাই তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী বিচিত্র মায়াশক্তির প্রভাব। "যথা পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ"—তদ্রূপ তাঁহা হইতে এই অনন্ত বিচিত্র জগত উৎপন্ন হইতেছে।

কি আশ্চর্য্য তাঁহার মধ্যে আবার বিচিত্র রসগ্রাহিতা-ভাবও কি অপূর্ব্বরূপে ফুটিয়াছে দেখা যাইতেছে, তাই যেন জগত খেলায় উদ্দেশ্যবিহীন হইয়াও তিনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি তাঁহার মধ্যে রসভাব না থাকিত তবে তাঁহারই প্রতিচ্ছবি এই যে জীব আমরা, আমরা কেহ কখন কাহাকেও ভালবাসিতে পারিতাম না। এই রসের প্রতি আকর্ষণ আছে বলিয়াই আজ আমরা পরস্পরের সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেছি, পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলন আবেগ আজ আকাশে, স্বর্গে ও অবনীতে এক মহানন্দের প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এই যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলন আবেগ সেই আত্মার সহিত পরমাত্মার মহামিলনের আশাই সূচিত করিতেছে।

জাগতিক যত সম্বন্ধ তাঁহাতেই আরোপ করা হইয়া থাকে, তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, পতি, পুত্র সব, কারণ চৈতন্য হইতে বিযুক্ত হইয়া কেহই আমাদের পিতা, মাতা, পতি, পুত্র বা প্রিয়জন হইতে পারে না। এই প্রিয়ভাবগুলি তাঁহাতে আরোপিত হইলে তখন তাঁহাকে আরও অন্তরতর মনোজ্ঞ বলিয়াই মনে হইবার কথা।

এই সুন্দর পবিত্র ভাবরসে বিমুগ্ধ হইয়াই দ্বারকার প্রজামণ্ডলী ভগবানের নিকট আপনাদের হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—

"নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্য সুরেন্দ্রবন্দিতং।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পর প্রভুঃ॥
ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন!
ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।
ত্বং সদাগুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং
যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম॥"

হে নাথ! ব্রহ্মাদিরও প্রভু সে কাল, তিনিও যেখানে আপনার প্রভাব দেখাইতে অসমর্থ, ব্রহ্মা সনকাদি সেবিত ও সুরেন্দ্রবন্দিত সেই পদারবিন্দে আমরা প্রণাম করি। হে বিশ্বভাবন্! আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। আপনিই আমাদিগের মাতা, পিতা, বন্ধু, সদ্‌গুরু এবং পরম দেবতা, আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। সেই নরদেবতার কৃপা কিরূপে লাভ করিতে হয়? তাই বলিতেছেন—

"স বা অয়ং যৎপদমত্র সুরয়ো
জিতেন্দ্রিয়া নির্জ্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎ কলিতামলাত্মনা,
নম্বেষ সত্ত্বং পরিমাষ্ট মর্হতি ॥"

এই কর্ম্মভূমিতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ প্রাণায়ামাদির দ্বারা অন্তঃশ্বাস রোধ করতঃ, ভক্তিবশে উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইয়া, বুদ্ধির নির্ম্মল অবস্থায় যাঁহার স্বরূপ জানিতে সক্ষম হন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমাদের অগ্রে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এই ভগবানই সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির নির্ম্মলতা ব্যতীত তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় না। এই অন্তঃশ্বাস রুদ্ধ না হইলে বুদ্ধির নির্ম্মলতা সাধিত হয় না, এবং বুদ্ধি নির্ম্মল না হইলে তাঁহাকে ঐকান্তিকভাবে ভালবাসিতে পারা যায় না।

এই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবদ্‌ভাবের উপরেও আর এক ভাবাতীত ভাব রহিয়াছে। যেখানে কেবল তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই, সেখানে সৃষ্টিও নাই সংহারও নাই, কার্য্যও নাই কারণও নাই, এই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মভাবকেই শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিবর্গ পরমতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রযত্নশীল যোগীরা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকিয়া আপনার মধ্যে আপনার এই নিজ স্বরূপকে উপলব্ধি করেন, এবং উপলব্ধি করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। সমস্ত বেদশাস্ত্রের মধ্যে এই কথাই আলোচিত হইয়াছে, 'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি'। সমস্ত বেদ যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং যে পরমপদলাভের জন্যই তপস্যা ও কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং যে পদপ্রাপ্তির জন্য সাধুগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

তিনি সাকার, নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ এইরূপ বহুভাবে চিন্ত্যমান হইয়া থাকেন। এজন্য পরস্পরের মধ্যে বিবাদেরও অন্ত নাই, কিন্তু যিনি তাঁহার পুরুষোত্তমরূপ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহার মনে আর এ সব সন্দেহ থাকে না। তিনি জানেন সেই এক পরম পুরুষই সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, ও সর্ব্বময় হইয়া সর্ব্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আছেন বলিয়াই অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, আদিত্য চন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত তেজঃ ও রস দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্নরূপেও তিনি, তাহার ভোক্তা-রূপেও তিনি—আবার তিনিই অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

প্রকৃত সাধক পুরুষেরা জানেন যে সেই এক পরমপুরুষই সাকার ভাবে, নিরাকার ভাবে, সগুণ ও নির্গুণ ভাবে সর্ব্ব সময়েই প্রকাশিত রহিয়াছেন। যাঁহার যতটুকু অধিকার তিনি তাঁহাকে ততটুকুই বুঝিতে পারেন। যাঁহারা তাঁহাকে পুরুষোত্তমরূপে অনুভব করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, সকল ভাবই তাঁহার তাহা জানিয়া তাঁহাকে সর্ব্বভাবে ভজনা করিয়া থাকেন। মোটামুটি সাংখ্য, যোগ, ভক্তি এই তিন মতের যে কোন একটীকে লইয়া ভগবানকে অন্বেষণ করা যাইতে পারে। ভক্তিমূলক ধর্ম্মেও জ্ঞানলাভ হয় এবং যোগ প্রভাবেও ঈশ্বর দর্শন হইয়া থাকে। নিত্যানিত্য বিবেক হইতেই জ্ঞান জন্মে, বিচার দ্বারা প্রপঞ্চাদি মিথ্যা প্রপন্ন হইলেই পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু কেবল মৌখিক বিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সম্যক্ স্থিতি হইতেই নিত্যবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাতে যে শাশ্বতী শান্তি রহিয়াছে তাহার প্রভাবেই মানুষের চিত্ত আর অনিত্য বিষয়ে গমন করে না, কারণ জগদাদি সমস্ত পদার্থই মনঃকল্পিত অবস্থামাত্র, মনের উত্থানের সহিত উহারা উত্থিত হয় এবং মনের বিলয়ের সহিতই উহারা বিলীন হয়। এই মন জীবিত থাকিতে কাহারও শান্তিলাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। যে জগদ্ব্যাপার মনেরই কল্পনা মাত্র, উহাই আবার জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাত হয়। জাগ্রতে যাহা স্থূলরূপে প্রকাশিত, স্বপ্নে তাহাই সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত, সুষুপ্তিতে তাহা একেবারে রূপশূন্য, তুরীয় অবস্থা তাহারও অতীত। এই তুরীয় ব্রহ্মই অবস্থা ভেদে সগুণ ও নির্গুণ হন। এই তুর্য্যাবস্থাই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় শূন্য অবস্থা, উহা সদা একরূপ। অথচ সকল প্রকারের প্রকাশের তিনিই আশ্রয়। সুষুপ্তিও প্রকৃতির একটী অবস্থা মাত্র, সুষুপ্তিতে সমস্ত প্রকাশ আচ্ছাদিত থাকিলেও তাহাতেই সকল প্রকাশের বীজ বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং প্রকৃতিরূপতা প্রাপ্তিই মুক্তি নহে, মুক্তির স্বরূপ অন্যরূপ—তাহা প্রকৃতির অতীত অবস্থা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই চৈতন্য সমভাবেই থাকেন। কোন অবস্থাতেই চৈতন্যের কোন বিকৃতি হয় না, অবস্থাত্রয়ে কেবল বুদ্ধিরই অবস্থান্তর হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির অধীন বলিয়া বুদ্ধির অবস্থান্তরের সহিত তাহাদেরও অবস্থান্তর হইয়া থাকে। দেহাভিমানবশতঃ জীব সেই সকল অবস্থাকে আপনার অবস্থান্তর বলিয়াই মনে করে। কিন্তু বুদ্ধির বিকার ঘটিলেও জীব তাহাতে বিকৃত হয় না, জীব সকল অবস্থাতেই আত্মারাম, জীব তাহা জানিতে পারিলেই তাহার ভববন্ধন মোচন হয়—"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।" জীবভাব হইতে ভিন্ন আত্মস্বরূপ ভগবান শুদ্ধচিত্তে মাত্র লক্ষিত হন, সমাধিযোগে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মায়াতীত পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষিত হইলেই জীবের ঈশ্বর হইতে ভিন্নতারূপ ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, তখন জীব আর আপনাকে দেহাদিতে আবদ্ধ মনে করে না, **উহাই মুক্তি**। অবিদ্যা উপাধি হেতুই জীবের সংসারিত্বভাব হইয়া থাকে। কিন্তু এই দেহাভ্যন্তরে সূর্য্য-কিরণের মত যে কূটস্থ জ্যোতিঃ সকল সময়েই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহাতেই দেহকে স্বপ্রকাশ ও চৈতন্যযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেই তেজঃই ব্রহ্মের রূপ, তাহা দেহাভ্যন্তরে আসিয়া দেহকেও তেজোময় এবং প্রকাশময় করিয়া তুলে। সমস্ত আকাশও সেই তেজে

পরিপূর্ণ। আকাশের মধ্যে সূর্য্যরশ্মিকে যেমন দেখা যায় না, কিন্তু আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া যখন কোন বস্তুর মধ্যে নিপতিত হয় তখনই সেই তেজঃকে বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মতেজঃ ঘটস্থ হইলেই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়, তখন তাহার ঘটানুরূপ নামরূপের প্রকাশ হয়। নামরূপময় এই ঘটই ক্ষরভাব, ঘটমধ্যস্থ আকাশ বা তেজঃই অক্ষরভাব। আকাশের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে পরব্যোম রহিয়াছে তন্মধ্যে কত ব্রহ্মাণু রহিয়াছে, সেই এক একটী ব্রহ্মাণুর মধ্যে আবার ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে; যখন সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও সমস্ত বস্তুর মধ্যে সেই ব্রহ্মাণুর বোধ হইবে তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। ক্রিয়ার পরাবস্থাতেই উহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, হৃদয়েতেই এই পরাবস্থার স্থিতি অনুভূত হইয়া থাকে। যদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে চাও তো ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবার জন্য প্রযত্ন কর। হৃদয়ে এই স্থিতি ঘনীভূত হইলেই আর কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা থাকে না, উহাই সকল জ্ঞানের অন্ত বা বেদান্ত - **উহাই পুরুষোত্তম ভাব**। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা ব্যতীত মোটের উপর অন্য সমস্ত বস্তুই ক্ষর, এই ক্ষরভাবই জন্মমরণের অধীন। কূটস্থ অক্ষরই অবিনাশী পুরুষ। যিনি কূটস্থে দৃষ্টি না রাখিয়া জগদ্বস্তুতে আসক্ত হন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেহান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়। আর যিনি অষ্ট প্রহর কূটস্থেতে লাগিয়া থাকেন তিনি অবিনাশী কূটস্থই হইয়া যান। এই ক্ষর ও অক্ষরের উপর পরমাত্মা বা পরমেশ্বর তিনিই পুরুষোত্তম, ক্ষর ও অক্ষর এ দুই-ই তাঁহার বিভিন্ন ভাব, উহারা উভয়ই তাঁহার শক্তি একটী পরিণামী ও অন্যটী পরিণামহীন এইমাত্র প্রভেদ। গীতাতে ইঁহাদিগকেই পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। চঞ্চল শ্বাসপ্রশ্বাসে এই পরিণামী ভাবটীই বিশেষরূপে ব্যক্ত, শ্বাসের স্থিরতাই অচঞ্চল কূটস্থের রূপ, এই স্থিরভাবকে অবলম্বন করিয়াই চঞ্চল ভাবটী প্রবহমান হইতেছে। তাই পুরুষোত্তম একদিকে যেমন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সদামুক্ত, অন্যদিকে তিনি আবার ভর্ত্তা, ভোক্তা মহেশ্বর। এই জগত ও জীবভাব উভয়ই তাঁহার নাম রূপ, কিন্তু তিনি স্বয়ং নামরূপ-বিবর্জ্জিত।

লয় বিক্ষেপই চিত্তের অশুদ্ধি, যোগাভ্যাস দ্বারা লয় বিক্ষেপ নষ্ট হইলে তবে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে ফলাভিসন্ধি থাকে না, তাহা সর্ব্বদাই ঈশ্বরমুখী, সুতরাং সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে যাহা কিছু কৃত হয় তাহা সমস্তই ভগবদর্পিত হইয়া থাকে।

ভগবদর্পণ

এই ভগবদর্পণ সম্পূর্ণ হইলেই চিত্ত নিরন্তর শুদ্ধ থাকে, তাহাই সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের হেতু। জীবের বিবিধ বাসনাই সংসার, ঘনীভূত বাসনাই গৃহ, দার, পুত্র, মিত্র, বন্ধু, দ্বেষ্য, শত্রু প্রভৃতি রচনা করে। বাসনা ক্ষয় না হইলে জীব মৃত্যুর পর সেই সব লোকে গমন করে যেখানে তাহার বাসনানুকূল ভোগলালসা পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু তীব্রতর সাধন প্রভাবে যাহার চিত্ত যত স্থির হইতে থাকে, তাহার তত ভগবদ্‌নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, এইরূপ নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আপনাকে আপনি স্থিতিরূপ পরমা নিবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে। সেখানে আর সংসার নাই। কিন্তু এজন্য ব্রহ্ম বাসনাও তীব্র হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সংসার বাসনা সম্যক্‌রূপে নষ্ট হয় না। যাহারা বলে প্রযত্ন

করিলেও কাম, ক্রোধ ও লোভ মোহাদি কিছুতেই নিরস্ত হইতে চাহে না, তাহাদের প্রযত্নের মধ্যে হয় বৈরাগ্য নয় সম্যক্ সাধনার নিশ্চয়ই কোন ত্রুটী থাকে নচেৎ বিষয়বাসনা নির্ব্বাপিত হয় না কেন ? বিষয়বাসনা হইতেই সংসার, সেই বাসনা যাহার যত দৃঢ় তাহার সংসারে ও ভোগলোকাদিতে পুনরাগমন ততটা সুনিশ্চিত। যাঁহারা প্রযত্ন সহকারে ক্রিয়াভ্যাসে রত হন এবং যাঁহাদের মন কূটস্থে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে পারে তাহাদের বিষয়বাসনা বা রজস্তমোভাব সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে। সুষুম্নাবাহিনী প্রাণ না হইলে বাসনাবীজ নষ্ট হয় না, এইজন্য আলস্য ও প্রমাদরহিত হইয়া ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। বাসনা-পিঞ্জর হইতে যিনি মুক্ত না হইয়াছেন তিনি কখনও আত্মবিৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। বাসনার ক্ষয় হইলেই মনোনাশ হয় এবং মনোনাশ হইলেই স্বরূপে স্থিতি বা মুক্তি লাভ হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও কর্ম্ম করেন, কিন্তু তাঁহারা অভিসন্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহাদের আত্মচিন্তার ধারা কোন কর্ম্মদ্বারাই বিচ্ছিন্ন হয় না, এইজন্য তাঁহাদের আত্মবোধ সদা জাগ্রত। জাগ্রত, স্বপ্নে চৈতন্য থাকিয়াও যেমন চৈতন্য সেই সকল অবস্থা হইতে নির্লিপ্ত থাকে, জীবন্মুক্তের সাংসারিক স্থিতিও তদ্রূপ। কূর্ম্মের অঙ্গ যেমন প্রয়োজন মত অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, জীবন্মুক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ থাকিয়াও ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে সর্ব্বদা অন্তর্মুখী হইয়া স্থিরত্ব ভাব প্রাপ্ত হয়।

সমাধি সাধনার অভ্যাস করিতে হইবে, কিন্তু সমাধিস্থ হওয়া সহজ নহে, এই জন্য প্রযত্ন সহকারে সাধনা করিতে হইবেই এবং সেই সঙ্গে মনে মনে আত্মবিচার করিতে হইবে, যাহা কিছু স্থূল তাহা মনোময় কল্পনারই ঘনীভূত অবস্থা। প্রাণের স্পন্দনই মন বা কল্পনার আশ্রয়। প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইলেই মন আকাশবৎ হইয়া যায়। সেই আকাশ বা নাদ (নাদ আকাশের গুণ) নিঃশব্দ বিন্দুতে প্রবিষ্ট হয়। বিন্দুই মায়াতীত অবস্থা, উহাই ব্রহ্মদ্বার। সুতরাং তোমার নিজ স্বরূপ সর্ব্বদাই নিঃসঙ্গ। এই ভাবটী অনুভব করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে তুমি দেহ নহ। "ন কিঞ্চিদেব দেহাদি ন চ দুঃখাদি বিদ্যতে।" দেহাদি বাস্তবিকই নাই, সুতরাং দেহজনিত দুঃখাদির ও অস্তিত্ব নাই।

সমাধি সাধনা

যাঁহারা বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য সুদৃঢ়চেষ্ট, তাঁহাদের বশিষ্ঠগীতার এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—

"আসক্তিমাহুঃ কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তু রপি তত্ত্ববেৎ।
মৌর্খ্যে স্থিতে হি মনসি তস্মান্মৌর্খ্যং পরিত্যজেৎ॥"

মন যদি মূঢ় হয় তবে সেই সঙ্গে আসক্তি থাকিবেই, অতএব মূর্খতাই প্রথমে পরিত্যজ্য। আসক্তিই আসল কর্ত্তৃত্ব, যদি কর্ম্ম নাও কর তথাপি আসক্তি যতদিন আছে, ততদিন তুমি কর্ম্ম না করিলেও কর্ত্তা। কর্ত্তৃত্ব হেতু সুতরাং বন্ধনও অনিবার্য্য, এইজন্য ভগবানের ও বশিষ্ঠদেবের এই উপদেশ—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।" নিঃসঙ্গ হইয়া সিদ্ধি অসিদ্ধি সমভাবে গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম কর।

"শান্ত ব্রহ্মবপুর্ভূত্বা কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং কুরু।
ব্রহ্মার্পণসমাচারো ব্রহ্মৈব ভবসি ক্ষণাৎ॥"

ব্রহ্ম যেমন শান্ত, ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা তুমিও সেইরূপ শান্ত হইয়া কর্ম্ম কর। জল ও জলের তরঙ্গ যেরূপ অভিন্ন, কর্ম্মও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইরূপে কর্ম্ম ব্রহ্মার্পিত হইলে তুমি ক্ষণেকের মধ্যেই ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে।

যদি ইহা করিতে না পার তবে সর্ব্বত্র সগুণ ঈশ্বরভাব দর্শন করিবার চেষ্টা কর—

ঈশ্বরার্পণ

"ঈশ্বরার্পিত সর্ব্বার্থ ঈশ্বরাত্মা নিরাময়ঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতাত্মা ভব ভূষিতভূতলঃ॥"

ঈশ্বরাত্মায় সর্ব্ব কর্ম সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরেই মন নিমগ্ন কর, তাহা হইলেও তুমি নিরাময় হইতে পারিবে। সর্ব্বভূতের আত্মাই যে ঈশ্বর, ঈশ্বরার্পিত চিত্তে কর্ম্ম করিতে পারিলেও তুমি জগতের ভূষণস্বরূপ হইবে।

"সংন্যস্ত সর্ব্বসঙ্কল্পঃ সমঃ শান্তমনা মুনিঃ।
সংন্যাসযোগ যুক্তাত্মা কুর্ব্বন্ মুক্তমতির্ভব॥"

তুমি সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া শান্তমনা হইয়া দেখ তুমিই সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। এইরূপ সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ হইলেই তুমি যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে।

"সর্ব্বসঙ্কল্পসংশান্তৌ প্রশান্তঘনবাসনম্।
ন কিঞ্চিদ্ভাবনাকারং যৎ তদ্ ব্রহ্মপরং বিদুঃ॥"

যখন সঙ্কল্প সম্যক্‌রূপে শান্ত হয়, বাসনাসমূহ প্রশান্ত হয়, চিত্তে কোন প্রকার ভাবনার উদয় হয় না, তাহাকেই ব্রহ্মভাবে অবস্থিত বলিয়া জানিবে। অনাদি কাল হইতে চিত্তে যে কর্ম্ম-সংস্কার সঞ্চিত থাকে তাহাই বাসনা। জলের মধ্যে মৃত্তিকা থাকিলেও জলকে স্বচ্ছ দেখায়, কিন্তু জলটী যদি আলোড়িত হয় তাহা হইলেই অস্বচ্ছ হয়। চিত্তে বাসনা থাকেই, তাহাকে আলোচনা করিলেই তদ্বিষয়ক সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্পকে আলোড়ন করিলেই তাহা ভাবনারূপে পরিণত হয়—এই সঙ্কল্প, বাসনা ও ভাবনা চিত্ত হইতে মুছিয়া গেলেই চিত্তের চিত্তত্ব থাকে না, চিত্তের এইরূপ প্রশান্ত ভাবই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। চিত্তই অজ্ঞানে বাসস্থান, চিত্ত ক্ষয় হইলেই অজ্ঞান নাশ হয়। চিত্তই কর্ম্মময় বাসনা দ্বারা কার্য্যরূপে পরিণত হয় এবং উহাই সমস্ত কর্ম্মভাব বা শক্তির মূল, এবং ব্রহ্মই চিত্তের আশ্রয়। যখন চিত্ত হইতে কর্ম্মবাসনা বিলুপ্ত হয়, তখন চিত্তও ক্ষয় হইয়া যায়, সুতরাং তখন এক ব্রহ্মভাব ব্যতীত অন্য কিছু থাকিতে পারে না। তখন অন্তর বহিঃ সমস্তই ব্রহ্মময়।

সঙ্কল্প, বাসনা ও ভাবনা

কি করিয়া কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণ করিতে হয়?

"সমস্ত কলনাজালমেশ্বরৈক ভাবনা।
গলিতদ্বৈতনির্ভাসমেতদেবেশ্বরার্পণম্॥"

যদিও জড় ও চৈতন্যকে বিচারার্থ পৃথক করিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু বাস্তবিক জড় বলিয়া কোন বস্তু নাই। চৈতন্য যখন তমঃ দ্বারা অভিভূত হন তখনই তাহা জড় দৃশ্যরূপে প্রতীত হয়। জড় পৃথক কিছু বস্তু নহে। বোধরূপে সমস্ত বস্তুই এক চিৎস্বরূপ। সমস্ত বস্তুই

ঈশ্বর, এই ভাবনায় যখন দ্বৈতভাব বিগলিত হয়, তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরার্পণ। দ্বৈতভ্রম বিদূরিত হইলেই আর শোক তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না। অর্জ্জুনের এই অবস্থা হইয়াছিল, ভাগবতে বর্ণিত আছে :—

"বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যান-পরিবৃংহিত রংহসা।
ভক্ত্যা নির্ম্মথিতাশেষ-কষায়ধিষণোঽর্জ্জুনঃ॥
গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্বিভুঃ॥
বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ।
লীন প্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের পর অর্জ্জুনের হৃদয় অত্যন্ত শূন্য হইয়া গেল, তখন তিনি বাসুদেবের চরণযুগল নিয়ত ধ্যান দ্বারা বর্দ্ধিত ভক্তিবেগ দ্বারা, কামাদি বিষয়বাসনা-বিরহিত নির্ম্মল অন্তঃকরণ দ্বারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন যাহা কাল ও কর্ম্মরূপ অন্ধকার দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই তত্ত্বজ্ঞান আবার লাভ করিলেন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি লীন হইলে সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও গুণত্রয়ের কার্য্যভূত লিঙ্গশরীরবিষয়ক জ্ঞান থাকে না ও তন্নিবন্ধন স্থূলশরীরেও অভিমান তিরোহিত হয়। এইরূপ দ্বৈতভ্রমের মূলীভূত অবিদ্যাবিলয়ে অর্জ্জুন সম্যক্‌রূপে শোক বিরহিত হইলেন।

ভগবানের অরূপ চিন্ময় ও রূপময় বিগ্রহ

ভগবানের রূপময় ভাবটীও বড় সুন্দর। আমাদের রূপ দেখাই অভ্যাস, এইজন্য অরূপের কথা শুনিলেই ভয় হয়। তাই রূপ-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মভাবকে আমাদের শূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে; অরূপের মধ্যেও যাঁহাদের চিত্ত মগ্ন হইয়া যায় তাঁহারাও এমন একটি বস্তুর সন্ধান পান যাহা রূপের মধ্যেও দুর্লভ। এই রূপময় ভাবের দুইটী স্বরূপ আছে। একটী সমস্ত এক করা জ্যোতির্ম্ময় রূপ, তাহা শুদ্ধ জ্যোতিঃ মাত্রই। ত্রিভুবনের সমস্ত রূপ ঐ জ্যোতিঃর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাহাও রূপ বটে কিন্তু ঘোর প্রচণ্ডরূপ—এ রূপের মধ্যে অন্য বিবিধ বিচিত্র রূপ সব এক হইয়া যায়। তাই বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত অর্জ্জুনকে ভগবান তাঁহার মানব মূর্ত্তি দেখাইয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এ রূপ মানুষের মতই অথচ ঠিক মানুষও নহে, নবনীরদ শ্যামলতনু; এ রূপ বড় চিত্তাকর্ষক। ভক্ত ভাবুকেরা এই রূপ বড় পছন্দ করেন। "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" রূপের প্রতি যে জীবের স্বাভাবিক মোহ আছে, এই শ্যামসুন্দর রূপ দেখিয়া জীবের সেই রূপের মোহ কাটিয়া যায়। এ রূপ দেখিয়া আর অন্য রূপের দিকে আঁখি ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। এই রূপ কখনও চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে, কখনও রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্ত-ভাবানুরূপ চিন্ময় বিগ্রহে তাঁহার অরূপসুন্দর রূপখানি ফুটিয়া উঠে। তাহাতে মানুষের মতই প্রাণভরা ভালবাসা, সেই হাসিমাখা প্রেমবীক্ষণ কি অপূর্ব্ব শোভাই না বিকীর্ণ করে। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, এ মূর্ত্তি সেই আনন্দের

ঘনীভূত মূর্ত্তি, তাহা পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, তাহা অপ্রাকৃত চিদানন্দরূপ ভাবময় বিগ্রহ। সাংসারিক বিবিধ সম্বন্ধের আদর্শেই সেই ভগবদ্‌ভাব শিক্ষা করিতে হয়। আমরা পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী পুত্রের নিকট যে ব্যবহার পাইয়া থাকি, এবং তাঁহাদের জন্য যে অনুরাগ পোষণ করি, সেই অনুরাগ, সেই ব্যাকুলতা ভগবানের নিমিত্ত হইলেই তাঁহাকে অনায়াসে লাভ করা যায়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বময়, এবং ইন্দ্রিয় মনের অগোচর, তিনিই আবার মায়া-মনুষ্যরূপে ভক্তের স্থুল দর্শন-স্পর্শ-লালসাকেও চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে যে যে ভাবে ভজনা করে তিনিও তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করেন। যে তাঁহার নিকট সামান্য বিষয়ের প্রার্থী হয় তিনি তাহার সেই বিষয়াভিলাষ মিটাইয়া দিয়া তাহাকে তাঁহার চরণসেবার অধিকারী করিয়া দেন। এতই তাঁহার করুণা! আমাদের চিত্ত যতদিন গুণময় পদার্থে অভিনিবিষ্ট থাকিবে ততদিন তাঁহার সব-ভুলানো আনন্দময়-স্বরূপে আসক্ত হইতে পারিবে না। যেমন আত্মসত্তায় তেমনই মায়াতনু বিগ্রহে তাঁহার সেই পরমানন্দ স্বরূপ সর্ব্বত্রই আস্বাদনীয়। গোপীরাও তাই গোপীজন-বল্লভের দর্শনলাভে আনন্দে বিহ্বল হইয়া সর্ব্বপ্রকার তাপশূন্য হইয়াছিলেন।

ভগবানের ধ্যান

"তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাশ গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতঃ
ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেক পদং বপুর্দধৎ॥"

যোগীশ্বরগণ আপনাদের হৃদয়পদ্মে যাঁহার আসন কল্পনা করিয়া থাকেন সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান গোপীসভা মধ্যে তাঁহাদের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর শোভাস্পদ রূপ ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ॥"

যখন কৃষ্ণদর্শনে ব্যাকুলা হইয়া গোপীরা কাতরচিত্তে রোদন করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের সম্মুখে সস্মিতমুখে ভগবান মদনমোহনরূপে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণই আনন্দের সেই ঘনীভূত মূর্ত্তি, পরমানন্দের নিরাবরণ রূপ।

ইহাই লোকবিমোহনীয় মায়াতনু, গুণসম্বন্ধশূন্য, ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়—অথচ তাহাতে কামগন্ধ নাই। ইহা জড় নহে, সাক্ষাৎ চিন্ময় বস্তু। এখানে ফুল নাই অথচ ফুলের গন্ধ ও শোভা আছে, দ্রব্যত্ব নাই অথচ মিষ্টতা আছে, দেহ নাই অথচ রূপ আছে। দেহ ও দ্রব্য লইয়াই কামের খেলা, তাহা প্রাকৃতভাব মাত্র। কিন্তু ঐ রূপ ঐ হাসি, ঐ ভালবাসা অপ্রাকৃত, তাই ভগবান মদনমোহন। ইহাই স্বরূপের রূপ। ভগবানের আর একটী রূপ আছে, তাহা বর্ণ বা রূপ নহে তাহা কেবল অরূপ, তাহা ভাবময়ও নহে তাহা বিশুদ্ধ সত্তা মাত্র। তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারে না। তাহাই আপনাতে আপনি, উহাকেই শ্রীগুরুদেব ক্রিয়ার পর-অবস্থা বলিয়াছেন। প্রথমটিকে

সামান্য বা মায়াতনু বলে, শেষেরটাই তাঁহার পরম রূপ এবং উহা নিত্য, আদ্যন্তরহিত ও মায়ার পরপার। প্রথম রূপটী ভক্তের প্রাণকে আকর্ষণ করে, ভক্ত যখন সেইরূপ দেখিতে দেখিতে বা স্মরণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান, তখন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, সেই শুদ্ধচিত্তেই পরমরূপ প্রকাশিত হয়, চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে কিছুতেই বুঝা যায় না। এইজন্য প্রথম ভাবের পূজা ও যোগাদি অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত যখন লয়-বিক্ষেপরূপ মল শূন্য হয়, সেই নির্ম্মল সত্ব হইতেই আদ্যন্তরহিত জ্ঞানময় পরমরূপটীকে বুঝা যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই পরমরূপের পরিচয় দিতেছেন—

"সামান্যং পরমং চৈব দ্বে রূপে বিদ্ধি মেঽনঘ।
পাণ্যাদিযুক্তং সামান্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্॥
পরং রূপমনাদ্যন্তং সন্মমৈকমনাময়ম্।
ব্রহ্মাত্মপরমাত্মাদি শব্দৈনৈতদুদার্য্যতে॥"

হে অনঘ, আমার সামান্য ও পরম দুইটী রূপ আছে জানিও। যেটী হস্তপদাদিবিশিষ্ট শঙ্খচক্রগদাধারী রূপ তাহাই আমার সামান্য রূপ, আর যেটী আমার পরমরূপ সেইটী আদি-অন্তহীন ও অনাময়, উহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা শব্দে অভিহিত।

"যাবদপ্রতিবুদ্ধস্ত্বং অনাত্মজ্ঞতয়া স্থিতঃ।
তাবচ্চতুর্ভুজাকারং দেবপূজাপরো ভব॥
তৎক্রমাৎ সম্প্রবুদ্ধস্ত্বং ততো জ্ঞাস্যসি তৎপরম্।
মম রূপমনাদ্যন্তং যেন ভূয়ো ন জায়তে॥"

আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু যতদিন তুমি প্রবুদ্ধ না হও, ততদিন তুমি চতুর্ভুজাকার আমার সামান্য রূপের পূজাদি করিও। এইরূপ বাহ্য পূজাদি করিতে করিতে যখন তুমি প্রবুদ্ধ হইবে তখন তুমি আমার আদ্যন্তরহিত পরমরূপটী জানিতে পারিবে, যাহা জানিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

"প্রতিবিম্বেষ্বিবাদর্শসমং সাক্ষিবদাস্থিতম্।
নশ্যৎসু ন বিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

আমি সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত, দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় লোকে আমাতে জগত দর্শন করে। আমার মায়াদর্পণে প্রতিবিম্বিত জগতরূপের আমি সাক্ষী মাত্র; মায়াদর্পণ সঙ্কুচিত হইলেই আর প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না, সুতরাং প্রতিবিম্ব নষ্ট হইলেও সাক্ষীস্বরূপ আত্মা চির-বর্ত্তমান—ইহা যিনি জানেন তিনিই ঠিক জানেন। অতএব—

"ন কুর্য্যাদ্ভোগ সন্ত্যাগং ন কুর্য্যাদ্ভোগভাবনম্।
স্থাতব্যং সুসমেনৈব যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তিনা॥"

দেহ ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় সেইটুকু ভোগ ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, এবং ভোগের বিচিত্রতার জন্যও চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। মনে সর্ব্বদা সমতা রক্ষা করিয়া যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিবে।

"নানাত্ব মলমুৎসৃজ্য পরমাত্মৈকতাং গতঃ।
কুর্ব্বন্ কার্য্যমকার্য্যঞ্চ নৈব কর্ত্তাত্বমর্জ্জুন॥"

হে অর্জ্জুন, নানাত্ব মল পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মময়তা লাভ কর। (চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে পারিলে পরমাত্মভাবে স্থিতি লাভ হয়) সেই অবস্থায় কার্য্যই হউক বা অকার্য্যই হউক, তুমি কর্ত্তা নহ।

আত্মজ্ঞানলাভের উপায়

মনোশাসন, যোগাভ্যাস ও প্রাণায়াম।

আত্মা স্বয়ং শুদ্ধ ও নির্ম্মল, প্রকৃতির কোন ক্লেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং"—পরমাত্মা বা ভগবানের নিজধামে মায়া আপন কুহক বিস্তারে সর্ব্বথা অসমর্থ। ভগবানের সেই স্বকীয় পরমধাম যাহা "শুদ্ধমত্যন্ত নির্ম্মলং" বুদ্ধির দ্বারা সেইটী বুঝিতে পারাই জ্ঞানালোচনার ফল। আত্মা দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেহ-প্রকৃতির সুখদুঃখাদি আপনার সুখদুঃখ বলিয়া অনুভব করেন। এই কল্পিত সুখদুঃখের অনুভূতির দ্বারাই আত্মা দেহে বদ্ধ হইয়া থাকেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ সুখ দুঃখ অনুভব করিতে করিতে আত্মা যেন দেহরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া অনুভব হয়। এই অবস্থা হইতে একই আত্মার দুইটী বিভাব প্রকাশ পায়, তখন একটীকে জীবাত্মা ও অন্যটিকে পরমাত্মা সংজ্ঞা দেওয়া হয়। জীবাত্মা প্রকৃতই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, কিন্তু তিনি যখন প্রকৃতির সহিত মিলিয়া যান, প্রকৃতির কার্য্যকে আপনার কার্য্য বলিয়া অভিমান করেন তখনই তাঁহার জীব সংজ্ঞা হয়। পরমাত্মা ঈশ্বর, সুখ দুঃখাদি জন্ম মরণের অতীত, কিন্তু জীব অনীশ, শোকে মোহে মুহ্যমান এবং জন্ম-মৃত্যুর নিয়ত অধীন। জীব কিন্তু আবার নিজ অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন শ্রুতিতে তাহার উপদেশ আছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনশীয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

(মুণ্ডক, তৃতীয়)

সর্ব্বদা সংযুক্ত তুল্য স্বভাব জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটী পক্ষী একই শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থিত রহিয়াছেন। সেই উভয়ের মধ্যে একটী (অর্থাৎ জীব) বিচিত্র স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে এবং অপরটী (নিত্যমুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন মাত্র। জীব একই দেহরূপ বৃক্ষে (ঈশ্বরের সহিত) অবস্থিত হইয়াও স্বীয় ঐশভাবের অজ্ঞতা বা বিস্মৃতি বশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগে ও অর্থাদির নাশে শোকাচ্ছন্ন হইয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে। সেই ভ্রান্ত জীবই বহুজন্ম পরে আবার যখন সদ্গুরূপদেশে সাধন লাভ করিয়া জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হয়, তখন জীবভাব হইতে বিলক্ষণ ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং তাঁহার মহিমা (ঐশ্বর্য্য) উপলব্ধি করে, অর্থাৎ ভিতর বাহির যা কিছু সমস্তই তাঁহার

প্রকাশ, তাঁহা হইতে পৃথক সত্তা আর কাহারও নাই এইটী সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তখন সে-ও সমাহিতচিত্ত হইয়া দুঃখাতীত অবস্থা লাভ করে।

মহাভারতেও এইরূপ আছে—"পরমাত্মা আমার পরমবন্ধু, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম, আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে ?"

এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য শাস্ত্র উপদেশ দিলেন—"প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদাঽনঘ।" হে অনঘ, "প্রকৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন" সর্ব্বদা এই বিচার কর। গীতাতে ভগবান এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩ অঃ
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৪ অঃ

শ্রীধর স্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রকৃতির অবিবেকবশতঃ পুরুষের এই সংসার, বস্তুতঃ পুরুষের সংসার নাই। প্রকৃতির কার্য্য দেহে অবস্থিত থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন। কারণ তিনি প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষীমাত্র, তিনি অনুমন্তা অর্থাৎ সন্নিধিমাত্রেই অনুগ্রাহক (নির্লিপ্তভাবে অনুমোদন করেন)। তিনি ভর্ত্তা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের সত্তাস্ফুরণ তাঁহা হইতেই হয়, তিনি না থাকিলে দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কাহারও পুষ্টি হয় না। তিনি ভোক্তা অর্থাৎ সুখদুঃখাদিরূপ বুদ্ধিবৃত্তির তিনি উপলব্ধি কর্ত্তা, তিনি না থাকিলে কোন কিছুরই অনুভব হইত না। তিনি মহেশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মার তিনিই মূল বলিয়া তিনিই পরমাত্মা। এই দেহে অবস্থিত যে পুরুষ তিনিই পর-পুরুষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। নানাপাত্রস্থিত জলে যেমন এক চন্দ্রেরই প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ নানাদেহ মধ্যে এক সত্য ব্রহ্মেরই সমস্ত জীবাত্মা প্রতিবিম্ব মাত্র। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতি এষ লোকপালঃ।" প্রকৃতির গুণসঙ্গহেতু সংসার বাহুল্য বর্ণন করিয়া এক্ষণে তদ্ব্যতিরেকে মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় বলিতেছেন—প্রকৃতিজ গুণ সমূহই বুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত হইয়া কর্ম্ম করে, গুণ হইতে ভিন্ন আত্মা সদা সাক্ষীস্বরূপ বলিয়া যিনি অবগত হন তিনি তখন আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

জানি না জীব নিজের সেই স্বরূপকে কিরূপে ভুলিয়া গিয়াছে ? যাহা হউক এখন আবার তাহার নিজস্বরূপের সহিত তাহার পরিচয় হওয়া আবশ্যক। নিজস্বরূপকে চিনিয়া লইবার যে প্রণালী তাহা ভগবান গীতার বহুস্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান

বলিয়াছেন— .

"ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"

এই জ্ঞান লাভ করিয়া যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সৃষ্টকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয় কালেও লয় প্রাপ্ত হন না।

এখন বুঝা গেল জন্ম মরণের দুঃখভোগই জীবত্ব, এই জীবত্ব ঘুচিবে কিরূপে ?

যোগমায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন জীব নিজ স্বরূপকে ভুলিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছে, তাই সে দীন হইয়া আতুর হইয়া কেবল আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এই পথহারা ভ্রান্ত পথিকের জন্যই ঋষিরা সাধন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীব যতদিন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে ততদিন তাহার উচ্চলক্ষ্য থাকে না, ততদিন সে পশুর মত জীবন যাপন করে। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইহাই জীবসাধারণের ধর্ম্ম। মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীব সকলেই সাধারণতঃ এই ধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হয়। সমস্ত জীবদেহ হইতে মনুষ্য দেহই সর্ব্বোত্তম দেহ। এই দেহ পাইয়াই জীব মুক্তির সোপান অন্বেষণে যত্নশীল হইতে পারে। মনুষ্যের মধ্যে এই ধর্ম্ম অনন্যসাধারণ। উহাই জ্ঞান। মনুষ্যের মধ্যে যে পশুভাব রহিয়াছে এই জ্ঞান দ্বারাই সে তাহার এই পশুভাব সংযত করিয়া দিব্যভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারে, ইহাই জীবের পরিত্রাণ। যাহারা মোক্ষের সোপানভূত সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ পাইয়া এই দেহমধ্যস্থ জীবকে পরিত্রাণের চেষ্টা না করে, তদপেক্ষা মহাপাপী আর কে হইতে পারে ?

"সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ॥" (কুলার্ণব)

পশুত্ব সংযমনের অধিকারী ভেদে ঋষিরা তিনটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্ম্ম (যোগ), ভক্তি ও জ্ঞান নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রাণ, মন, বুদ্ধিই যথাক্রমে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান লাভের সাধন। এই পথত্রয় দ্বারাই জীব পুনরায় নিজধামে প্রবেশ করিতে পারে। প্রাণ মন বুদ্ধির যাহা স্বাভাবিক গতি বা ধর্ম্ম তাহার ছন্দানুবর্ত্তনই জীব-ধর্ম্ম। কিন্তু মনুষ্য বুদ্ধির সাহায্যে উচ্চ বিচার দ্বারা এই ছন্দানুগমনের প্রতিরোধ করিতে পারে। যোগাভ্যাস, ভক্তি ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা মনুষ্য যখন আপনার সমস্ত শক্তিকে পরিচালনা করিতে উদ্যত হয় ও পরে কৃতকার্য্য হয় তখনই সে দেবত্বলাভ করিতে পারে। এইরূপ অনুশীলন বা ভগবদ্ভজনের জন্য পাপক্ষয় হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য জীবের মধ্যে সেরূপ আগ্রহ উৎপন্ন হয় না। তাহারাই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিতে পারে যাহাদের পাপক্ষয় হইয়া গিয়াছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥"

দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্ম্মুক্ত নহে বলিয়াই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিবার প্রবৃত্তি সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে তেমন প্রবল ভাবে আসে না। মনুষ্যের পাশবিক ধর্ম্মগুলিই উহার প্রধান

অন্তরায়। এই পশুভাবের উপরে উঠিতে না পারিলে জীবের মধ্যে যে একটী অসাধারণ শক্তি বা ধর্ম্ম রহিয়াছে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে না। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিতেছেন—

"কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহবৈরিণম্॥" গীতা, ৩য় অঃ

রজোগুণজাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং ক্রোধ—ইহাদিগকে মোক্ষমার্গের পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।

"আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেনানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥"

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিতে জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। ইন্দ্রিয় সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়। কাম ইহাদিগের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক এই পাপরূপ কামকে বিনাশ কর।

যতদিন এই সকল পশুবৃত্তি দমিত না হয় ততদিন প্রাণ, মন ও বুদ্ধির মধ্যে যে অলৌকিক শক্তি রহিয়াছে তাহার কোন সন্ধানই মনুষ্য পায় না। এই অলৌকিক শক্তি প্রস্ফুটিত করিবার উপায় ঋষিরা শাস্ত্রে বহুস্থানে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে দৈবীধর্ম্মের অনুকূলছন্দে পরিচালিত করিলেই আমাদের ধর্ম্মলাভ হয়, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যত উৎকর্ষতা লাভ করিবে ততই উহারা ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহাদের চরম উৎকর্ষতার দ্বারাই জীবের জীবত্ব মোচন হয়। প্রথমে প্রাণশক্তির বিষয় আলোচনা করা যাক। প্রাণশক্তিকে দৈবী সম্পদের অনুকূল ভাবে পরিচালনা করিতে না পারিলে এই প্রাণই ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইবার পক্ষে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। প্রাণশক্তির কার্য্য স্পন্দন।—প্রাণশক্তি দ্বারা স্পন্দিত হইয়াই ইন্দ্রিয়, দেহ, মন অনবরত বিষয়াভিমুখে ছুটিয়া যাইতেছে। প্রাণের গতিও যেমন অবিরামধারে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইন্দ্রিয়দের বিষয়গ্রহণ-স্পৃহাও তদনুরূপ বলবতী হইতেছে। এইজন্য প্রাণশক্তিকে যথেচ্ছ স্পন্দিত হইতে না দিয়া যাহাতে উহার গতি দৈবীসম্পদের অভিমুখে প্রসারিত হয়, সেই চেষ্টা করাই সাধকের প্রথম প্রয়োজন। যে বিদ্যা বা কৌশল দ্বারা প্রাণকে দৈবীভাবে অনুপ্রাণিত করা যায় ঋষিরা সেই বিদ্যাকেই যোগবিদ্যা বলিয়াছেন, উহার প্রধান অঙ্গই প্রাণায়াম।

প্রাণ যদি স্বচ্ছ বা নির্ম্মল হয় তবে তাহার গতির মধ্যে অতিরিক্ত বেগ থাকিতে পারে না এবং প্রাণশক্তিই মনরূপে কার্য্য করে বলিয়া প্রাণের স্পন্দন যত কমিতে থাকে মনও তদনুরূপ নিস্পন্দিত হইয়া যায়। সুতরাং সেই পরিমাণে মনের বিষয়গ্রহণ-স্পৃহাও কম হইতে থাকে। এইরূপে মনের ছুটাছুটি কমিয়া আসিলে মনও স্থির হইয়া আইসে। ইহাই মনের বিশুদ্ধি। কারণ সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারাই মন অশুচি হইয়া থাকে। মনের শুদ্ধি হইলে বুদ্ধিও নির্ম্মল এবং একমুখী হইয়া থাকে। বুদ্ধির একাগ্রতা বৃদ্ধিও এতদ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই একাগ্রতা যাহার যত অধিক তাহার তত বেশী ধ্যেয় বস্তুর প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা জন্মে। একটী বস্তুর প্রতি এইরূপ একাগ্রতা যে পরিমাণে স্থাপিত হইবে তত অধিক সেই বস্তুর প্রতি তাহার প্রীতি উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপে ধ্যেয় বস্তুকে ভাল লাগিতে লাগিতে মনের সেই ক্ষীণ স্পন্দনও আর যখন থাকিবে না, তখনই "নিরোধ" ভাব আসিবে। এই "নিরোধ বা অবরুদ্ধ"রূপই ভগবৎ স্বরূপ অর্থাৎ সেখানে মায়ার খেলা সমস্তই। দেহ ইন্দ্রিয়, মন প্রাণ সমস্ত প্রকৃতি-যন্ত্রেরই ক্রিয়া তথায় রুদ্ধ। এইখানে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা স্মরণ করুন— "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং"—ভগবানের স্বধামে মায়া চিরদিনের জন্য নিরস্ত। আত্মার বা ভগবানের স্বধামে পৌছিতে হইলে এই প্রাণ ক্রীড়ার গতি রোধ করিতে হইবে। প্রাণায়াম দ্বারাই প্রাণশক্তির গতি রুদ্ধ হয়। এই প্রাণস্পন্দন নিবৃত্ত না হইলে ধ্যান পূজা কিছুতেই আমাদের অধিকার হয় না। তাই সকল সাধকেরাই অবগত আছেন আমাদের সন্ধ্যা, পূজার্চ্চনার মধ্যে প্রথমেই কেন প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রাণায়াম ব্যতীত ভূতশুদ্ধি হয় না, এবং ভূতশুদ্ধি না হইলে পূজার্চ্চনার কোন বিশেষ ফলই লাভ হয় না। উপনিষদও তাই বলিতেছেন—

"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।" মুণ্ডক

যে শরীরে পঞ্চধা প্রাণ সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে সেই শরীরস্থিত আত্মা অতি সূক্ষ্ম ও চিদ্রূপ ; জ্ঞানের দ্বারাই এই আত্মাকে জানিতে হইবে।

"প্রাণো হ্যেষঃ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি"

যিনি সর্ব্বভূতস্থিত ঈশ্বর তিনিই প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

"উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বদেবা উপাসতে॥" কঠ

যিনি প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে এবং অপান বায়ুকে অধোদিকে রক্ষা করেন অর্থাৎ যখন যোগীর ভিতরের বায়ু ভিতরে থাকে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে থাকে অর্থাৎ প্রাণাপানের গতি যখন স্বাভাবিক ভাবে স্থির হয়—সেই স্থিরতার মধ্যে "বামনমাসীনং" বামনদেব রহিয়াছেন। বামন অর্থাৎ (বাম—বিপত্তি, ন—ছেদক) যিনি সমস্ত বিপত্তির ছেদক—তিনি ব্যক্তহন। জীব মাত্রেরই শ্বাসের গতি যখন বহির্দ্দিকে গমনাগমন করিতে থাকে ততদিন সংসার লীলার অবসান হয় না ; এবং এই জন্মযাতায়াতের মত বিপত্তি আর কিছুই নাই, সেই বিপত্তির ছেদন তখনই হয়, যখন

এই প্রাণ অন্তর্মুখ হইয়া স্থির হয়। ইহাই শিব সুন্দর ভাব। এই অবস্থার উপলব্ধি যাহার হয় তিনি বুঝিতে পারেন চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-দেবতাগণও তাঁহাদের স্ব স্ব বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সমীপে অবস্থান:করেন। ইহই পরম শান্তির অবস্থা।

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

কোন কোন বিবেকী পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া জীবদেহে প্রকটিত আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে উল্লম্ফনের ফলেই তাহারা মলাচ্ছাদিত হয়। এই মল বিদূরিত না হইলে ভগবদ্দর্শন বা মোক্ষলাভ হয় না। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়স্পৃহারূপ মল তখনই নষ্ট হয় যখন প্রাণকে নিগ্রহ করিতে পারা যায়। মনু বলিতেছেন—

"দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥"

ধাতুর মলাদি যেমন অগ্নিদ্বারাই ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণনিগ্রহের দ্বারাই ইন্দ্রিয়-দোষসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও প্রাণায়ামের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—

"প্রাণায়ামাদৃতে নান্তৎ তারকং নরকাদিব।
সংসারার্ণবমগ্নানাং তারকং প্রাণসংযমঃ॥"

প্রাণায়াম ব্যতীত নরক হইতে উদ্ধার করিবার অন্য কোন উপায় নাই। যাহারা সংসারসিন্ধুতে মগ্ন হইয়াছে তাহাদের পক্ষে প্রাণসংযমই (বা প্রাণায়ামই) একমাত্র তারক অর্থাৎ উদ্ধারকর্ত্তা।

যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।"

যোগাঙ্গের (যোগাঙ্গ=যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) অনুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে।

বাসনা ক্ষয় না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না। বাসনা, সঙ্কল্প প্রভৃতিই মনের অশুদ্ধি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাণের স্পন্দন হইতেই মনের বিক্ষেপ হয়। সুতরাং প্রাণবায়ুর সমতা সাধন করিতে পারিলে চিত্ত বৃত্তিশূন্য অবস্থায় আসিতে পারে। স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিস্থানে লক্ষ্য স্থির করিবার অভ্যাস করিলে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা জিতশ্বাস হইতে না পারিলে মনকে স্থির করা কঠিন। মন স্থির না হইলে সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হওয়া যায় না। সঙ্কল্প বিকল্পই বিচিত্র বাসনার জাল, এতদ্বারাই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে। অধ্যাত্মরামায়ণ বলিতেছেন—

"নিঃসঙ্কল্পো যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারপরো ভব।
ক্ষয়ে সঙ্কল্পজালস্য জীবো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥"

সঙ্কল্প জালের ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

"অভ্যাসাৎ হৃদিরূঢ়েন সত্যসম্বোধবহ্নিনা।
নির্দ্দগ্ধং বাসনাবীজং ন ভূয়ঃ পরিরোহতি॥"

অভ্যাসের দৃঢ়তা দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্জলিত কর, এবং বাসনাবীজ নিঃশেষে দগ্ধ কর, বীজ দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর জন্মিবে না।

"সমুদায় প্রাণীর শরীরে কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পঞ্চ দোষ রহিয়াছে। কামাদি প্রাকৃতিক গুণসমূহকে জয় করিতে পারিলেই জীবাত্মা দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হন। যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ এই পঞ্চ দোষ ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

অনেকে মনে করেন যোগাভ্যাসাদির মধ্যে যে প্রাণায়াম রহিয়াছে উহা অস্বাভাবিক। প্রাণায়াম বাস্তবিক অস্বাভাবিক হইলে ভগবান গীতার মধ্যে উহার উপদেশ দিতেন না। ভগবান যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিতে গিয়া প্রাণযজ্ঞের কথা বলিতেছেন—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥"

কেহ কেহ অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং কেহ বা প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হোম করেন। এইরূপে কেহ কেহ সংযতাহারী যোগী প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণাপানের উর্দ্ধ ও অধোগতি রোধ পূর্ব্বক কুম্ভকদ্বারা প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন।

"সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

এই সকল যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—"কুম্ভকে হি সর্ব্বে প্রাণা একী ভবন্তি। তত্রৈব লীয়মানেষু ইন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তি।" কুম্ভকে সর্ব্বপ্রাণ একীভূত হয়, এই স্তম্ভনরূপ কুম্ভক অত্যন্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সেই নিগৃহীত প্রাণবায়ুতে লয় করিয়া থাকেন। (শঙ্কর ভাষ্য)

গীতায় ভগবান আবার পঞ্চম অধ্যায়ে বলিতেছেন—

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥"

শ্রীধরস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"অথেদানীং ধ্যানযোগং সম্যগ্দর্শনস্য অন্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামি ইতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকান্ উপদিশতি স্ম।" যোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্ত হন ইহা বলিয়াছেন, সেই যোগই পুনরায় এই দুইটী শ্লোকদ্বারা সংক্ষেপে বলিতেছেন। রূপ

রসাদি বিষয় সকল চিন্তিত হইলেই তাহারা অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়। অতএব সেই চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক, চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া, এবং নাসারন্ধ্রে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধাধোগতি রোধপূর্ব্বক কুম্ভক করিবে। যাঁহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উক্ত উপায় দ্বারা সংযত হইয়াছে সেই মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য যে মুনি তিনি জীবিত থাকিলেও সদা মুক্ত।

যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বাণপ্রকরণে শ্রীমান্ ভূষণ্ডির এই উপদেশ দিয়াছেন :—

"যদিও প্রাণ ও অপান চঞ্চলস্বভাব তথাপি অভ্যাসের সামর্থ্যে উহারা নিশ্চল হইবে। যে পুরুষ নিজ অন্তরে এই সকল জ্ঞাত হইয়া অভ্যাসবান হন, সে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমান থাকে না। যাহারা প্রাণচিন্তায় রত সেই সকল পুরুষের চিত্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি লাভ করে না। অনেক মহাপুরুষ এই প্রাণচিন্তা দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থিতি, গতি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন সকল সময়েই এই লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে বন্ধনদশা বিনষ্ট হয়। যাহারা বোধ প্রাপ্ত তাহারাই প্রাণাপানের অনুসরণ করিয়া থাকে।"

প্রাণের বর্ত্তমান গতি যাহা শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে বহিতেছে, উহা তাহার স্বাভাবিক গতিপথ নহে, ইহাই উল্টা পথ। বিধিবৎ প্রাণসংযমের দ্বারা নাড়ী চক্র বিশোধিত হইলেই প্রাণবায়ু ইড়া পিঙ্গলার পথ ত্যাগ করিয়া সুষুম্নামুখ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার ফলে—

"সুষুম্নাবাহিনি প্রাণে শূন্যে বিশতি মানসে।
তদা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নির্মূলয়তি যোগবিৎ॥"

প্রাণ সুষুম্নাবাহী হইলে মন শূন্যেতে প্রবেশ করে, তখন যোগীর সমস্ত কর্ম্ম উন্মূলিত হইয়া যায়।

বোধসার গ্রন্থে আছে—"প্রাণায়ামে মনঃস্থৈর্য্যং স তু কস্য ন সম্মতম্"—প্রাণায়াম দ্বারা যখন মন স্থির হয় তখন সেই প্রাণায়াম করিতে সকলেরই সম্মতি আছে বুঝিতে হইবে।

সুষুম্নাই জ্ঞানপ্রবাহিকা নাড়ী। হৃদয়দেশে একশত একটী নাড়ী আছে, তাহাদিগের মধ্যে সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রের অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। মনুষ্য মৃত্যুকালে সেই ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্নার সাহায্যে ঊর্দ্ধলোক (ব্রহ্মলোক বা সহস্রারে) গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করে। নানাবিধ গতিদায়িনী অন্য যে একশত নাড়ী আছে, জীব মৃত্যুকালে যখন সেই সকল নাড়ীমুখে বহির্গত হয় তাহাতে জীবের বিভিন্ন লোকে গতি হয়। তথায় সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া আবার তাহাকে জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

"শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥"

(কঠোপনিষৎ)

এই নাড়ী দিয়া-উর্দ্ধগতি লাভের জন্য প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাধনার জন্য এই উপদেশ রহিয়াছে—

"প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥"

যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত বিদ্বান পুরুষ সংযুক্তচেষ্ট হইয়া সাবধানতার সহিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। রথের দুষ্টাশ্বকে যেমন সারথী সংযত করে, প্রাণকে সংযত করিয়া মনকে ধ্যেয়-বস্তুতে স্থাপন করিবে। কারণ প্রাণায়াম দ্বারা যাহার মনের মল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহারই মন ব্রহ্মে স্থিরতা লাভ করে।

এইজন্য দেখিতে পাই আমাদের সকল শাস্ত্রই—বিশেষ করিয়া তন্ত্র—সমস্ত সন্ধ্যা পূজার্চ্চনার পূর্ব্বেই প্রাণায়াম করিতে বলিয়াছেন। যে ভূতশুদ্ধি না হইলে আত্মদর্শন সুদূরপরাহত থাকিয়া যায়, সেই ভূতশুদ্ধির প্রধান উপকরণ যোগাঙ্গ প্রাণায়াম।

তাই যোগী গোরক্ষনাথ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"যাবন্নৈব প্রবিশতি চরণ্ মারুতো মধ্যমার্গে
যাবদ্বিন্দুর্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাত প্রবন্ধাৎ।
যাবৎ ধ্যানং সহজ সদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং
তাবজ্ জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যা প্রলাপঃ"

যতদিন প্রাণবায়ু সুষুম্নামার্গে প্রবেশ না করে, এবং প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া যতদিন বিন্দু স্থির না হয় এবং যতদিন ধ্যান দ্বারা তত্ত্বসমূহ সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন জ্ঞানের কথা বলা দাম্ভিকতা এবং মিথ্যা প্রলাপ মাত্র।

শ্রীমৎ শুকদেবও জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্যও যোগাভ্যাসের প্রয়োজন বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো
বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্যসুরন্ধিতাশয়ঃ।
স্বপার্ষ্ণিনাপীড্য গুদং ততোঽনিলং
স্থানেষু ষট্সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ॥"

ভাঃ, ২য় স্কঃ

শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা যাঁহার বিষয়বাসনা সকল বিদূরিত হইয়াছে এরূপ মুনি উপরত হইবেন, অতঃপর তিনি নিজের পাদদ্বারা মূলাধার পীড়ণ করিয়া প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে ষট্স্থানে (ষট্ চক্র) উন্নীত করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ১৯।২০।২১।২২ শ্লোক পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। পরে ত্রয়োত্রিংশ শ্লোকে বলিতেছেন—

"যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্ত-
র্ব্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।
ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্ ॥"

যাঁহাদের লিঙ্গশরীর বায়ুর মধ্যেই অবস্থান করে সেই শ্রেষ্ঠ যোগীদিগের গতি কর্ম্মিদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহে অর্থাৎ তাঁহারা ত্রিভুবনের অন্তরে বাহিরে বিচরণ করিতে পারেন। বিদ্যা উপাসনা, তপস্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস জনিত সমাধিজ জ্ঞান দ্বারা যে গতি লাভ হয় কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মিগণ সে গতি লাভ করিতে পারে না।

"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥"

যে যোগাভ্যাস দ্বারা ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ লাভ হইয়া থাকে সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি-গণের তদপেক্ষা অন্য কোন মঙ্গলময় পথ নাই।

পরিশিষ্ট

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব গীতার যে যোগাঙ্গ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে,—এই যোগাঙ্গ ব্যাখ্যা শাস্ত্রসম্মত। আমরা এখানে গরুড়-পুরাণান্তর্গত "গীতাসার" হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

শ্রীভগবানুবাচ

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জ্জুনায়োদিতং পুরা।
অষ্টাঙ্গযোগং মুক্ত্যর্থং সর্ব্ববেদান্তসারগম্॥

শ্রীভগবান কহিলেন; আমি গীতার সার বর্ণন করিব যাহা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলাম। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সারগর্ভ অষ্টাঙ্গযোগই গীতার্থসার॥

আত্মলাভঃ পরো নাস্য আত্মা দেহাদিবর্জ্জিতঃ।
রূপাদিমান্ হি দেহোঽতঃ করণত্বাদি লোচনম্॥

আত্মলাভই পরমলাভ, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আত্মা দেহবর্জ্জিত। যেহেতু দেহ রূপাদি গুণযুক্ত এবং লোচনাদি ইন্দ্রিয়গণও আত্মার করণ মাত্র॥

দেহ, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ কেহই আত্মা নহে, কিন্তু আত্মা "বিধূম ইব দীপ্তার্চ্চিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান"।

আত্মা ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান।

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞানি পশ্যতি।
খানাস্য মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যঙ্ নিযচ্ছতি॥
তদা প্রকাশতেহ্যাত্মা ঘটে দীপো জলন্নিব।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ॥

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী ক্ষেত্রজ্ঞই ইন্দ্রিয়গণকে দেখিতে পান। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়রশ্মিগুলি (সূর্য্য যেমন রশ্মির দ্বারা আমাদিগকে স্পর্শ করেন, ইন্দ্রিয়শক্তিও সেইরূপ বিষয়সমূহ স্পর্শ করে) সম্যক্ নিয়মিত হইলেই দীপে যেরূপ জ্বালা প্রকাশিত হয় আত্মাও সেইরূপ দেহঘটে প্রকাশিত হন। পাপকর্ম্মের ক্ষয় হইলেই জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি

যেমন দর্পণে নিজরূপ দর্শন করা যায় তদ্রূপ নির্ম্মল বুদ্ধিতে জীব ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয়, পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি এবং পুরুষকেও দর্শন করিয়া থাকে। তখন যে প্রসংখ্যান বা বিবেকজ্ঞান দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়া বন্ধন বিমুক্ত হইয়া পরমার্থ প্রাপ্ত হয়॥

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে।
বিদ্বাদশেভ্যঃ খ্যাতো যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
বিবেকাৎ কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি॥

তখন জীব "আমি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম" এইরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হয়। চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব হইতে পৃথক পঞ্চবিংশ রূপে যে প্রসিদ্ধ পুরুষ তিনিই বিবেক বিচার দ্বারা প্রকৃতি হইতে থক হইয়া কৈবল্য লাভ করেন এবং ষড়বিংশ তত্ত্ব স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে সাক্ষাৎকার রেন।

নবদ্বারমিদং গেহং ত্রিস্থূণং পঞ্চসাক্ষিকম্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ কবিঃ॥

যে বিদ্বান্ পঞ্চসাক্ষিক অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতযুক্ত, ত্রিস্থূণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণযুক্ত; বং ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারা অধিষ্ঠিত চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহকে জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বি বা জ্ঞানী।

শ্রীভগবানুবাচ।

যমাশ্চ নিয়মাঃ পার্থ আসনং প্রাণসংযমঃ।
প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জ্জুন সপ্তমী।
সমাধিরয়মষ্টাঙ্গো যোগ উক্ত বিমুক্তয়ে॥

শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ বিমুক্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে॥

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
শরীর-শোষণং বাপি কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিভিঃ॥

বেদান্ত শতরুদ্রীয় প্রণবাদি জপং বুধাঃ।
সত্ত্বশুদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষ্যতে॥

স্তুতি স্মরণ পূজাদি বাঙ্‌মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ।
সুনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বর চিন্তনম্॥

কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা সকল অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার মৈথুন ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা হইয়া থাকে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ ব্রতাদি দ্বারা যে দেহের শোষণ তাহাকেও তপস্যা বলে। বেদান্ত পাঠ, শত রুদ্রীয় পাঠ, বা প্রণবাদি জপকে পণ্ডিতগণ স্বাধ্যায় বলিয়া থাকেন। এই স্বাধ্যায় পুরুষের সত্ত্বশুদ্ধিকারক। বাক্য মন ও শরীরের কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের স্তব, স্মরণ ও পূজাদি দ্বারা যে হরিতে অচলা ভক্তি তাহাই ঈশ্বর চিন্তা।

মূর্ত্তামূর্ত্ত ব্রহ্মরূপ চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে।
যোগারম্ভে মূর্ত্ত হরিমমূর্ত্তমথ চিন্তয়েৎ ॥

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপ চিন্তনকে ধ্যান বলা হয়। যোগারম্ভ কালে মূর্ত্তিমান হরির এবং তদনন্তর অমূর্ত্ত ব্রহ্মের চিন্তন করিতে হইবে।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তীনাং সাক্ষী জীবঃ স চ স্মৃতঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদ্যৈর্ব্যতিরিক্তশ্চ নির্গুণঃ ॥
নির্গতাবয়বোৎসর্গো নিত্যশুদ্ধস্বভাবকঃ।
পরমাত্মৈব সজ্জাগ্রৎস্বপ্নাদৌ সন্নিধানতঃ ॥
অন্তঃকরণরাগৈশ্চ অন্তঃকরণসংস্থিতঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তীশ্চ পশ্যত্যবিকৃতঃ সদা ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থার সাক্ষীই জীব। সেই জীব যখন উক্ত অবস্থাত্রয় হইতে অতিরিক্ত হইয়া যায়, তখন তাহাকেই নির্গুণ বলে। যাঁহার অবয়বের বিনাশ নাই, যিনি নিত্যশুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট, সেই পরমাত্মাই জাগ্রত স্বপ্নাদি অবস্থায় সন্নিহিত থাকেন বলিয়া তাঁহাকে সৎ বলা হইয়া থাকে। অন্তঃকরণেই, অথচ অন্তঃকরণের বিষয় রাগের দ্বারা অবিকৃত সেই পরমাত্মাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তাদি অবস্থাত্রয় প্রত্যক্ষ করেন।

———

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ঋষিরুবাচ—

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ—

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥ ৪
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬

গীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ

শৌনক কহিলেন, হে সূত! পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে (নারায়ণক্ষেত্রে) মুনি ব্যাসদেব যে গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ আমার নিকট বল।১।

সূত বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা পরম গুহ্যতম। এই গীতামাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বলিতে কেই বা সমর্থ? ২। শ্রীকৃষ্ণই ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন; কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, বেদব্যাস ও তৎপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য এবং মিথিলাধিপতি জনক ইঁহারাও ইহার ফল কিঞ্চিৎমাত্র জানেন।৩। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তি সকল ইহার ফল শ্রবণ করিয়া ইহার মাহাত্ম্য লেশমাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমিও বেদব্যাসের মুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিয়াছি, অতএব তাহাই আপনার নিকট বলিতেছি।৪। সমস্ত উপনিষদ্‌গুলি যেন গাভীস্বরূপ, এবং সেই গাভীর দোগ্ধা গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং পার্থ এই গাভীর বৎস স্বরূপ (বৎস যেমন স্বীয় মাতার দুগ্ধ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, অর্জ্জুন এই উপদেশামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য তাঁহার ভবক্ষুধা মিটিয়া গিয়াছিল)। গীতারূপ অমৃতই এই উপনিষদ গাভীর সুস্বাদু দুগ্ধ, এবং এই গীতামৃতরূপ দুগ্ধ সুধীগণই পান করিয়া থাকেন।৫। যিনি প্রথমে অর্জ্জুনের সারথ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ এই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।৬। যে ব্যক্তি এই ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হন,

সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯
গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং চাথ নির্গুণম্॥ ১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মণি॥ ১১
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥ ১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥ ১৩
যস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥ ১৪
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তদ্গৃহাশ্রমম্॥ ১৫

তিনি এই গীতারূপ তরণী আশ্রয় করিলে অনায়াসে সংসার সাগরের পার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ৭। যে ব্যক্তি গীতাজ্ঞানের শ্রবণাভ্যাস করে নাই, অথচ সে যদি মোক্ষাভিলাষী হইয়া থাকে তবে সে বালকগণেরও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ৮। যাঁহারা গীতাশাস্ত্র অহর্নিশ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন, তাঁহারা দেবতাস্বরূপ, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ৯।

শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান উপদেশ দ্বারা অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে সগুণ ও নির্গুণ ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১০। ভুক্তি-মুক্তি-সমুচ্ছ্রিত-গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ অষ্টাদশ সোপান দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মে অধিকতর উন্নতিলাভ হইয়া থাকে। ১১। গীতারূপ সলিলে স্নান করিয়া সাধুদের সংসার-মালিন্য ধৌত হইয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধাহীন তাঁহাদের গীতাসলিলে অবগাহন হস্তীস্নানের ন্যায় বৃথা হইয়া থাকে। ১২। যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র পঠনপাঠন করিতে না জানে, মনুষ্যলোকে তাহার সমস্ত কার্য্যই বৃথা হইয়া থাকে। ১৩। যেহেতু, গীতাশাস্ত্রে যে অনভিজ্ঞ তদপেক্ষা নরাধম আর ইহজগতে কেহ নাই, তাহার মনুষ্য দেহ ধারণে, তাহার জ্ঞানে ও কুলশীলে ধিক্। ১৪। যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহ নাই, তাহার দেহে, কল্যাণে, শীলতায় এবং তাহার গৃহাশ্রম ও বৈভবাদিতে ধিক্। ১৫। গীতাশাস্ত্র

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ প্রালব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ॥ ১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্‌বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্॥ ১৮
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥ ১৯
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে॥ ২০
শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ॥ ২৩

যে অবগত নহে তদপেক্ষা অধম আর কেহই নাই, তাহার প্রারব্ধ কর্ম্ম, ও প্রতিষ্ঠায় ধিক্, তাহার পূজা, মান ও মহত্বে ধিক্। ১৬। গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই অর্থাৎ তাহাতে যাহার বুদ্ধি প্রবিষ্ট নহে তাহার সমস্তই নিষ্ফল, তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত নিষ্ঠা, তপস্যা ও যশকেও ধিক্। ১৭। যে ব্যক্তি গীতার্থ পঠন করে নাই, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই; এবং যে জ্ঞান গীতাশাস্ত্রে গীত হয় নাই, তাহাকে আসুর-জ্ঞান বলিয়া মানিবে। ১৮। এবং সে জ্ঞান একেবারেই নিষ্ফল ও তাহা ধর্ম্মবিরহিত এবং বেদবেদান্ত-বিনিন্দিত, অতএব ধর্ম্মময়ী গীতাকেই আশ্রয় করিবে, তাহা সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনী ও সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা, এবং গীতার ন্যায় বিশুদ্ধা আর অন্য কিছুই নাই বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা ইহারই বিশিষ্টতা জানিবে। ১৯। বিষ্ণুপর্ব্বে একাদশীতে যিনি গীতা পাঠ করেন তিনি নিদ্রা, জাগরণ, গমন, উপবেশন কোথাও কোন অবস্থাতেই শত্রু দ্বারা ত্রাসিত হন না। ২০। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার সমীপে, দেবালয়ে, শিবালয়ে, কোন তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ২১। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হয়েন, বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, তীর্থসেবা ও ব্রতাদি অনুষ্ঠান দ্বারাও তাদৃশ পরিতোষ প্রাপ্ত হন না। ২২। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্তচিত্তে গীতাধ্যয়ন করেন তাঁহার বেদশাস্ত্র পুরাণাদি পাঠের যে ফল তাহাই লাভ হইয়া থাকে। ২৩। যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম শিলার সম্মুখে, সজ্জন সভায়,

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ॥ ২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্॥ ২৬
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে॥ ২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে॥ ২৯
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ॥ ৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ॥ ৩২

যজ্ঞক্ষেত্রে কিংবা ভগবদ্ভক্তের নিকট যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ২৪। যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন তাঁহার সদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করা হইল বুঝিতে হইবে। ২৫। যিনি গীতার্থ শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, কিংবা পরকে শুনাইবার জন্য গীতা ব্যাখ্যা করেন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬। যিনি ভক্তি সহকারে বিধিপূর্ব্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক দান করেন তাঁহার ভার্য্যা প্রিয়া হন, এবং তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন ও তিনি স্নেহভাজনদিগের প্রিয় (দয়িতাপ্রিয়) হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২৭—২৮। যে গৃহে গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় অভিচার বা অভিশাপাদি জনিত কোনরূপ দুঃখই আসিতে পারে না। ২৯। পরন্তু তাপত্রয় সমুদ্ভূত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক-যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। তাঁহার দেহে বিস্ফোটকাদি বাধা উৎপন্ন হয় না, তিনি কৃষ্ণপদে দাস্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৩০—৩১। গীতাভ্যাসরত ব্যক্তির সমস্ত জীবের সহিত সখ্যতা লাভ হয়; এবং তাদৃশ ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ করিলেও তাঁহাকে মুক্ত ও সুখী বলা যাইতে পারে, কারণ কোন কর্ম্মের দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন না। গীতাধ্যায়ী মহাপাপ ও অতিপাপ করিলেও পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় সেই পাপ

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা॥ ৩৩
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ॥ ৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন॥ ৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা॥ ৩৭
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ ৪০
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ॥ ৪১

তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩২-৩৩। অনাচার জনিত ও অবাচ্যভাষণ জনিত পাপ সকল, অভক্ষ্য ভক্ষণ জনিত ও অস্পৃশ্য স্পর্শ জনিত দোষ সকল, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয় জনিত যে কোন দোষই হউক, গীতা পাঠের দ্বারা তৎ সমস্তই তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। ৩৪—৩৫। সর্ব্বত্র ভোজন ও সর্ব্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠকারীকে সেই সকল পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ৩৬। অবিহিত ভাবে (শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া) রত্নপূর্ণা পৃথিবী প্রতিহত করিয়াও একমাত্র গীতাপাঠ দ্বারাই সে বিধৌত-পাপ হইয়া স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৭। যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা গীতাতে রমমান থাকে, তিনিই সাগ্নিক, তিনিই জাপক, তিনিই উপাসক, তিনিই ক্রিয়াবান, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনবান, তিনিই যোগ্য, তিনিই জ্ঞানবান, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজক, তিনিই সর্ব্ব-বেদার্থদর্শী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ৩৮—৩৯।

গীতা যেখানে নিত্য পঠিত হয়, প্রয়াগাদি পৃথিবীর সমস্ত তীর্থই তথায় বর্ত্তমান থাকেন। ৪০। তাঁহার জীবনকালে এবং দেহাবসানের পরও সমস্ত দেবতারা, ঋষিরা, যোগীরা তাঁহার দেহরক্ষক হইয়া বাস করেন। ৪১। যাঁহার গৃহে নিত্য গীতা পাঠ হয়, বালকৃষ্ণ,

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ ॥ ৪৩

শ্রীভগবান উবাচ—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০

গোপাল, নারদ, ধ্রুব প্রভৃতি পার্ষদাদি সহ তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। ৪২। গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা যে স্থানে হয়, তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ পরমানন্দে বিরাজ করেন। ৪৩।

শ্রীভগবান বলিলেন—হে পার্থ, গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার সার সর্ব্বস্ব, গীতাই আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অব্যয় জ্ঞান রূপ। ৪৪। গীতাই আমার পরম উত্তম স্থান, গীতাই আমার পরমপদ, গীতাই আমার অতীব গুহ্য বস্তু এবং গীতাই আমার পরমগুরু। ৪৫। গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থিত এবং গীতাই আমার পরম গৃহ এবং গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করিয়া থাকি। ৪৬। গীতাই ব্রহ্মরূপা, অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপা, অনির্ব্বাচ্য পদাত্মিকা, পরমাবিদ্যারূপিণী। ৪৭। হে পাণ্ডব! গীতার গুহ্য নামসকল বলিতেছি শ্রবণ কর, যে নাম কীর্ত্তন করিলে পাপসকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৮। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী—এই কয়েকটী গীতার নাম। যে ব্যক্তি নিশ্চলচিত্তে এই নামগুলি নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞান ও

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণোভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯

সিদ্ধিলাভ করিয়া অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৪৯—৫১। যিনি সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ তিনি তাহার অর্দ্ধ পাঠ করিবেন, তাহাতেই তাঁহার নিঃসন্দেহে গোদান জনিত পুণ্যলাভ হইবে। ৫২। যিনি গীতার একতৃতীয়াংশ পাঠ করিবেন তিনি সোমযাগের ফললাভ করিয়া থাকেন এবং গীতার ষষ্ঠাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিবেন। ৫৩। যিনি প্রত্যহ দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি এক কল্পকাল ইন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৪। যে ব্যক্তি ভক্তি-সংযুক্ত হইয়া এক অধ্যায়ও পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোকে গণত্বপ্রাপ্ত হইয়া বহুকাল বাস করেন। ৫৫। যিনি অধ্যায়ের অর্দ্ধ বা একপাদ নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তর কাল রবিলোকে বাস করেন। ৫৬। যিনি গীতার দশটী, সাতটী, পাঁচটী, চারিটী তিনটী, দুইটী, একটী বা অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ ধরিয়া চন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৭। যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা একপাদ মাত্রের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৫৮। যিনি অন্তকালে গীতার্থ বা গীতাপাঠ শ্রবণ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯। যিনি গীতা-পুস্তকসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত

গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রযাতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্।
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ॥ ৬১
যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২
পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৩
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৪
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৫
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্॥ ৬৬
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৭
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬৮

পরমানন্দে বাস করেন। ৬০। গীতার এক অধ্যায় সমাযুক্ত হইয়াও যাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার আর নীচ-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না, তিনি পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া সেই দেহে গীতাভ্যাস করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, মৃত্যুকালে "গীতা" এই শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেও তাঁহার সদ্‌গতি লাভ হয়। ৬১। গীতাপাঠপূর্ব্বক যে যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, সেই সেই কর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়া পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। ৬২। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পঠিত হইলে তাঁহারা নিরয়ে থাকিলেও তথা হইতে আনন্দে স্বর্গে গমন করেন। ৬৩। শ্রাদ্ধতর্পিত পিতৃগণ গীতাপাঠে সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন। ৬৪। যিনি ধেনুপুচ্ছসংযুক্ত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি তদ্দিনেই সম্যক্‌রূপে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। ৬৫। যিনি স্বর্ণসংযুক্ত গীতাপুস্তক বিদ্বানবিপ্রকে দান করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৬৬। যিনি একশত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না। ৬৭।

গীতাদান প্রভাবে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া তিনি সপ্তকল্প কাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ৬৮। গীতার সম্যক্ অর্থ শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা পুস্তক দান

সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৬৯
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্তামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭০
জনঃ সংসারদুঃখার্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭

করেন তাঁহার প্রতি শ্রীভগবান প্রীত হইয়া তাঁহার মনের ইপ্সিত যাহা তাহাই দান করেন।৬৯। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে হস্তস্থিত অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে। ৭০। সংসার-দুঃখপীড়িত ব্যক্তি গীতা জ্ঞান লাভ করিলে এবং গীতামৃত পান করিলে ভক্তিলাভ করিয়া সুখী হইয়া থাকে। ৭১। জনকাদি বহু ভূপতিগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ৭২। কেহ গীতোক্ত শ্লোকই উচ্চারণ করুন বা কেহ গীতোক্ত জ্ঞানই লাভ করুন, তাহার মধ্যে ফলের ইতর বিশেষ নাই, কারণ ব্রহ্মস্বরূপিণী গীতা সকলের নিকটই সমভাবাপন্না। ৭৩। অহঙ্কৃত হইয়া যে মূঢ়াত্মা গীতার নিন্দা করে, সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। ৭৪। যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কার বশতঃ গীতার্থ জানিতে চায়. সে কল্পক্ষয় কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। ৭৫। নিকটেই গীতা পাঠ হইতেছে তাহা দেখিয়াও যে ব্যক্তি শ্রবণ না করে, সে ব্যক্তি বহুজন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৬। যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহাতে কোন ফল হয় না, ওরূপ ব্যক্তির গীতা পাঠ বৃথা হয়। ৭৭। যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করে নাই,

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যাবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান হরিঃ ॥ ৮০

সূত উবাচ—

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াং কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু তথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮১
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৪
ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

অথচ পরমার্থ লাভে যত্নশীল হয়, উন্মত্তের শ্রম যেমন নিষ্ফল, তাহার পরিশ্রমও সেইরূপ নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৭৮। গীতা শ্রবণ করিয়া স্বর্ণ, ভোজ্য, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি পরমাত্মার প্রীত্যর্থ নিবেদন করিবে। ৭৯। গীতার ব্যাখ্যাকর্ত্তাকে ভক্তিপূর্ব্বক নানাপ্রকার দ্রব্য ও বস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিলে ভগবান হরিকেই সন্তুষ্ট করা হয়। ৮০।

সূত কহিলেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতার এই মাহাত্ম্য গীতাপাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন তিনি যথোক্ত ফলভাগী হন। ৮১। গীতা পাঠ করিয়া যিনি গীতার মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাঁহার গীতা পাঠের ফললাভ হয় না, তাঁহার পরিশ্রমই সার হয়। ৮২। এই মাহাত্ম্য সংযুক্ত গীতা যিনি পাঠ করেন, অথবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮৩। যিনি অর্থের সহিত গীতা শ্রবণ করিয়া মাহাত্ম্যও শ্রবণ করেন, তাঁহারই স্বর্গসুখাবহ পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "বঙ্গভূমি অবনতাবস্থায়ও রত্ন-প্রসবিনী"। প্রতিভাশালী কবি ও সুলেখকের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ধর্ম্মবীরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয়। নিতান্ত দুরবস্থার সময়েও অকলঙ্ক ধর্ম্মবীরের জ্যোতিঃপ্রভায় ভারতবর্ষ নিরন্তর আলোকিত। ভারতবর্ষ যখন আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ধর্ম্মহীন, যখন ঐহিকতা, বিলাসিতা এবং আড়ম্বরপ্রিয়তায় ঘন কুজ্ঝটিকায় ধর্ম্মের আকাশ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, তখনও ভারতবর্ষে শান্তিপ্রিয়, তত্ত্বজ্ঞানী, ভগবৎপ্রাণ ভক্ত ও যোগীর অভাব হয় নাই। ইহা ভারতবর্ষের মাটীর গুণই বলিতে হইবে।

যাঁহাদের চরণস্পর্শে ধরণী পবিত্র হয় এইরূপ মহানুভব মহাপুরুষ অনেকগুলিই গত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতাকাশে সমুজ্জল নক্ষত্রের মত ফুটিয়া উঠিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের পরিচয় ও তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যোগিরাজ ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ীর নামও কম প্রসিদ্ধ নহে। উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মবীর মহাপুরুষ কতিপয় লোকসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও অনেকেই আবার অনাসক্তি, বৈরাগ্য ও শান্তি-প্রিয়তার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। কাশীর পরম শ্রদ্ধাস্পদ যোগীবর ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পার্থিবতাসর্বস্ব নাস্তিকবহুল মানবমণ্ডলীর মধ্যে কিরূপে এই অল্পভাষী, চাঞ্চল্যবিহীন, সত্যব্রত, নিত্যযোগমগ্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হইল তাহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

এই যোগীশ্বর পুরুষের কৃপাতেই আমরা গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গীতা মুদ্রিতাকারে প্রথম প্রচারিত হয়। তখনও ইহা সীমাবদ্ধ কতিপয় সাধকমণ্ডলীর মধ্যেই প্রচারিত ছিল। এখন সে সংস্করণখানি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, আবার তাহাকে তত্ত্বান্বেষীগণের দৃষ্টিগোচর করাই বর্ত্তমান সংস্করণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যে মহাপুরুষের কৃপায় এই আধ্যাত্মিক সম্পদ আমরা লাভ করিয়াছি তাঁহার সহিত পাঠকবর্গের পরিচয় করাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য, তাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনগাথা শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

যোগিবরের জন্ম সময় বা বৎসর ঠিক জানিতে পারি নাই। তাঁহার যে কয়েকখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জন্ম সন, মাস ও তারিখ থাকিলেও সেগুলির উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলাম না। কারণ তাঁহার বহুধা বিক্ষিপ্ত লেখার মধ্যে

একস্থানে তাঁহার নিজ হস্তের লিখিত খাতার মধ্যে দেখিতে পাইলাম—"Birth date exactly not known" সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি কিছুই আমার মন্তব্য দিতে পারিব না। যোগিবরের পৌত্রদ্বয় (শ্রীমান অভয়াচরণ লাহিড়ী ও শ্রীমান আনন্দমোহন লাহিড়ী) উভয়েই তাঁহার জন্ম সময় শকাব্দা ১৭৫০, সন ১২৩৫, ১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার অপর পক্ষীয় সপ্তমী তিথি বলিয়া (ইং ১৮২৮, ৩০শে সেপ্টেম্বর) নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমি একমত না হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ আমি মহাপুরুষের জীবনী লিখিতে বসি নাই, সুতরাং এস্থলে যুক্তি তর্ক দেখাইয়া জন্মসময় নির্ণয়ের সঙ্গতি অসঙ্গতি আমি দেখাইতে চাহি না, এবং তাহার কোন প্রয়োজনও নাই, শুধু গীতাপাঠকদের সহিত তাঁহার সামান্য পরিচয় করিয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাহাতে জন্ম সময়ের ২।৪ বৎসর পার্থক্যে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন কাল হইতেই বিদ্যা ও ধর্ম্মের দিক দিয়া বাঙ্গালা দেশের মধ্যে নবদ্বীপের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে। নদীয়া জেলা বঙ্গদেশের বহু প্রাচীন ও অধুনাতন অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের জন্মভূমি। বহু মনীষী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যোগীবর শ্যামাচরণও এই নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন ও সন্নিহিত জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীর তীরবর্ত্তী ঘুরণী নামক গ্রামে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ শিবচরণ সরকার এবং পিতা গৌরমোহন সরকার ধনে, প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন ঘুরণীর প্রসিদ্ধ লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন ; গৌরমোহনের দ্বিতীয়া পত্নী মুক্তকেশী দেবীই শ্যামাচরণ লাহিড়ী (সরকার) মহাশয়ের গর্ভধারিণী ছিলেন। ধর্ম্মকর্ম্মে পূজার্চ্চনায় এবং দানাদিতে এই বংশীয় লোকদিগের দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। খড়ে নদীর প্রবল বন্যাবেগে প্রাচীন সরকার বংশের বসতবাটী, শিবমন্দির প্রভৃতি ভূমিসাৎ হইয়া নদীগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, এখনও ধ্বংসাবশেষের চিহ্নস্বরূপ ইষ্টকাদি ইতস্ততঃ নদীতটে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শৈশব

শ্যামাচরণের পঞ্চবর্ষকাল এই ঘুরণী গ্রামেই অতিবাহিত হয়। শুনা যায় তখনও নাকি তিনি শিশুসুলভ চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া একান্তে একাকী পদ্মাসন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। জন্মান্তরীয় সংস্কার তাঁহার জীবনকে যে দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইবে তাহার সূচনা তাঁহার শিশুজীবনেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। শ্যামাচরণের পিতা ও পিতামহ মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে কাশীধামে গিয়া কিছু দিন ধরিয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৌরমোহন ভাগ্যবিপর্য্যয় হেতু সাংসারিক প্রয়োজন বশতঃ ঘুরণীর বসবাস উঠাইয়া দিয়া একেবারে কাশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য পরিবারবর্গ ও শিশু শ্যামাচরণকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীর মদনপুরা মহল্লায় সিমন চৌহাট্টার নিকট একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া তথায় সকলে বাস করিতে লাগিলেন। কাশী বহুদিন হইতেই প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের একটী আশ্রয় স্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ইংরাজরাজ্যের

প্রথমাবধিই বহু বাঙ্গালী এই পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া বাস করিতেন। এখন উহা বহু বাঙ্গালীর প্রবাস গৃহরূপে পরিণত হইয়াছে। যদিও দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বহু বাঙ্গালীর তথায় স্থায়ীভাবে বাস ছিল না কিন্তু তৎকালীন যে কয় ঘর বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়া কাশীতেই স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, শ্যামাচরণের পিতা তাঁহাদের অন্যতম। শৈশবেই শ্যামাচরণের মাতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু তাহা কাশীতে হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না।

বিদ্যারম্ভ

শ্যামাচরণের শৈশবেই তাঁহাদের সমস্ত পৈত্রিক ভূসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার পিতা গৌরমোহন কালের গতি চিন্তা করিয়া তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিবারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদিও গৌরমোহন সে কালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সংস্কৃত আরবী ফার্শী ও মাতৃভাষায় সুপরিচিত ছিলেন, তথাপি তিনি পুত্রকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য প্রসিদ্ধ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্থাপিত একটী ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন, পরে তিনি সম্ভবতঃ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অন্তর্গত ইংরাজি স্কুলে প্রবেশ করেন। তিনি কত দিন ধরিয়া ও কোন পর্য্যন্ত ইংরাজি বিদ্যা অধিকার করিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ জানা যায় না। তবে তিনি যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনে তিনি বহু ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার সুশিক্ষা লাভেরই পরিচায়ক। ইংরাজি, হিন্দী, উর্দ্দু ব্যতীত তিনি নাগভট্ট নামক তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃতভাষা শাস্ত্রগ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন।

বিবাহ ও পত্নীভাগ্য

কাশীতে সে কালে যে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী কাশীবাস করিবার জন্য দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন তন্মধ্যে পণ্ডিত দেবনারায়ণ বাচস্পতির নাম প্রসিদ্ধ। তিনি বড় নিষ্ঠাবান ও কর্ম্মী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কাশীর পণ্ডিত মহলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এই বাচস্পতি মহাশয়ের অষ্টম কিম্বা নবম বর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শ্রীমান অভয় লিখিয়াছেন "কাশীমণি চিরজীবন শান্ত ও সুশীলা ছিলেন এবং স্বামীর পারিবারিক অশান্তি ও অর্থকষ্টের দিনে তিনি পরম ধৈর্য্য সহকারে সকল দিক সামলাইয়া চলিয়াছিলেন। তিনি সুগৃহিণী ছিলেন, তাঁহার সুবিবেচনা ও ব্যবস্থার গুণে পতির সামান্য উপার্জ্জন হইতে বাড়ী ঘর সম্পত্তি করা সম্ভব হইয়াছিল। আমরা তাঁহার বৃদ্ধবয়সেও কখন অলসভাবে সময় কাটাইতে দেখি নাই। * * * প্রাতঃকালে সর্ব্বপ্রথম আগত ভিক্ষুককে তিনি স্বহস্তে ভিক্ষা দিতেন, পরে বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা অন্য ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে ভিখারী প্রবেশ করে না, তাই কোনও দিন ভিখারী আসিতে বিলম্ব হইলে তাঁহার দুশ্চিন্তার সীমা থাকিত না। এই পুণ্যবতী নারী সুদীর্ঘ জীবন ধর্ম্মপথে ও স্বামীর প্রদর্শিত যোগ পথে সাধনা করিয়া প্রায় ৯৪।৯৫ বৎসর বয়সে ১৩৩৭ সাল ১১ই চৈত্র সজ্ঞানে কাশীলাভ করেন। আয়ের স্বল্পতা হেতু গৃহকার্য্য সমস্তই তিনি স্বহস্তে করিতেন। প্রতিদিন

তাঁহাদের গৃহে অনেক অতিথি ও আগন্তুক আসিয়া ভোজন করিতেন, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। এজন্য তিনি দিবসে বড় বেশী সময় পাইতেন না, এই জন্য রাত্রিতে সকলকে ভোজন করাইয়া রাত্রি ১০টার পর হইতে ৩।৪ ঘণ্টা কাল প্রত্যহ সাধনায় মনোনিবেশ করিতেন।"

শ্রীমান আনন্দমোহন যোগিরাজের জীবনীতে লিখিয়াছেন "আনুমানিক ত্রয়োবিংশ বয়ঃক্রম কালে তিনি গাজিপুরে সরকারি চাকরী আরম্ভ করেন। মির্জ্জাপুর, বক্সর, কটুয়া, গোরখপুর, দানাপুর, রাণীক্ষেত, কাশী প্রভৃতি স্থানে তিনি যথাক্রমে বদলি হইয়া চাকরি করিয়াছিলেন। সরকারি পূর্ত্তবিভাগে (Public works department, Military Engineering Works) এ তিনি কাজ করিতেন। সৈন্য সামন্তদের রসদ দেওয়া এবং রাস্তাঘাট তৈয়ার করা তখন ইংরাজদের এই সামরিক বিভাগের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। এইজন্য তখন রাজকীয় পূর্ত্তকর্ম্ম বিশারদ (Royal Engineer) নিযুক্ত হইয়াছিল। এই বিভাগের অফিসে দানাপুরে তিনি দ্বিতীয় ক্লার্কের কাজ করিবার জন্য বদলি হইয়াছিলেন। ঐ অফিসের নাম আজকাল D. D. M. W. Office হইয়াছে (Deputy Director of Military Works Office) হইয়াছে। তিনি শেষ জীবনে তখনকার ব্যারাক মাষ্টার (আজকাল উহাকে S. D. O. বলে) হইয়াছিলেন।"

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ

যখন গাজীপুরে তিনি কর্ম্ম করিতেন, তখন তাঁহার বেতন খুব সামান্যই ছিল। তখন তিনি সেনাবিভাগের অফিসার সাহেবদিগকে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা শিখাইতেন, তাহাতে তাঁহার কিছু আয় হইত, তাহাতেই তিনি আপনার ও কাশীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উক্ত আফিস কাশীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনি কাশী বদলী হইয়া আসিলেন। ঐ বৎসর ৩১শে মে তাঁহার পিতৃদেব কাশীলাভ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল, অত্যন্ত অশান্তির জন্য তিনি তথায় থাকিতে না পারিয়া সিমন চৌহাট্টায় ঘরভাড়া করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গরুড়েশ্বরে বসতবাটী খরিদ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ; কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াও এই গৃহেই তিনি বাস করিতেন এবং এই গৃহেই তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার অবসান হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ৺দুকড়ি লাহিড়ী মহাশয় এই গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। এবং লাহিড়ী মহাশয়ের ভাগ্যবতী পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই গৃহেই দেহাবসান হইয়াছে।

পিতৃবিয়োগ ১৮৫২ খ্রীঃ ৩১শে মে

বাহ্যিক লোকহিতকর কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। অবশ্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও যথা সবজজ রামকালী চৌধুরী মহাশয়, মাননীয় গিরিশচন্দ্র দে, কাশীনাথ বিশ্বাস প্রভৃতিও এই কার্য্যে তাঁহার সহায়ক ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সমস্ত দিন চাকরী করিয়া ও গৃহশিক্ষকতার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এবং গৃহের বিবিধ কর্ম্মাদি করিয়া ক্লান্তদেহে আবার তিনি এই জনহিতকর

কার্য্যের জন্য বিপুল পরিশ্রম করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায় তিনি কিরূপ উদ্যমশীল ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। এত পরিশ্রমের পরও কর্ম্মক্লান্ত শরীরে আবার যে তিনি এই জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন ইহাতে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রমাণ করে। এবং এইরূপ দৃঢ়চিত্ততার জন্যই ভবিষ্যৎ জীবনে যোগাভ্যাসের বিপুল পরিশ্রম তাঁহাকে ক্লান্ত করিতে পারে নাই। এবং তিনি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, মনের এই দৃঢ়তা এবং পরিশ্রমের অনলস অক্লান্তিই যে তাহার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"—বীর্য্যবান পুরুষেরাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার জীবনে রহিয়াছে।

গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ

গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সর্ব্বপ্রধান আশ্চর্য্য ঘটনা। এইবার সেই কথাই বলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরও কয়েকটী কথা আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁহার দীক্ষা সম্বন্ধে আমি আমাদের একজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম এখানে তাহাই উল্লেখ করিব। এই ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তিনি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, তাঁহার গৃহেই ভোজনাদি করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট যে সব পত্রাদি আসিত তাঁহার আদেশ মত তিনি সেই সকল পত্রাদির উত্তর দিতেন। আমাদের এই গুরুভাইটীর নাম অমর বাবু, ইনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, নিজের জীবনের অনেক ঘটনা অকপটে সকলের নিকট বলিবার তাঁহার যথেষ্ট সৎ সাহস ছিল। পরে তাঁহার অমর নাথ ব্রহ্মচারী নাম হইয়াছিল। তিনি "অমিয়" নামক একখানি সুন্দর উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সাধকের ও সাধন সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা এবং হিমালয় প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা ছিল।

লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ এই সময় হিমালয়স্থ নৈনিতালের নিকটবর্ত্তী রাণীক্ষেত নামক স্থানে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময় সম্ভবতঃ তিনি দানাপুরের Royal Engineering officeএ ক্লার্কের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তখন বোধ হয় অক্টোবর কিম্বা নভেম্বর মাস। নিজ স্থান হইতে পাঁচশত মাইল দূরে সুদূর হিমালয়ের পর্ব্বতমালার ভিতর দিয়া তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে। তখনও রেলপথ হয় নাই, সুতরাং সেই সুদূর পথ তাঁহাকে অন্যরূপ যানবাহনাদির সাহায্যে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে যে সুমহদ্ ঘটনা ঘটিবে এবং জীবনযাত্রায় যে আমূল পরিবর্ত্তন আসিবে তাহার আভাস মাত্রও তখন তিনি অবগত নহেন। তখন তিনি যেন চাকরীর দায়েই স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মায়া কাটাইয়া বন্ধুবান্ধবহীন শীতবহুল ভারতের উত্তর দিকস্থ হিমালয়ের প্রান্তদেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীমান আনন্দমোহন যোগিরাজের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাণীক্ষেত পৌছিবার উল্লেখ আছে, তাহা হইলে তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর হয়। শ্রীমান অভয়াচরণ যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রাণীক্ষেতে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন এইরূপ উল্লেখ আছে,

এই হিসাবে তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৪০ হইয়াছিল। এই দুইটী বিবরণের মধ্যে কোনটী ঠিক তাহা আমি বলিতে পারিব না কারণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে সময়ের কথা তিনি কিছু বলিয়াছিলেন কিনা তাহা আমার মনে নাই।

এই সময় নৈনিতাল বা রাণীক্ষেত কোনটীই বর্ত্তমান কালের মত উন্নত নগর রূপে পরিণত হয় নাই। রাণীক্ষেত তখনও বৃক্ষ গুল্মাচ্ছাদিত অরণ্য মাত্রই ছিল; তখনও রাণীক্ষেত ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে ১৫।২০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বর্ত্তমান যুগের কোন সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইত না। লোকের তেমন ভীড় বসতি তো দূরের কথা, শৈল উপত্যকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতিপয় জীর্ণ ক্ষুদ্র বসত গৃহই তখন মনুষ্যবাসের চিহ্ন প্রকট করিত মাত্র, এবং আরও গোপনে দুই চারিটী ক্ষুদ্র কুটীয়া ও পর্ব্বতগুহাগুলি সাধুদের নির্জ্জন বাসের উপযুক্ত আশ্রয় ছিল মাত্র। আজ আর সে দিন নাই, এখন সহরের সমস্ত সমৃদ্ধি আসবাব আয়োজন রাণীক্ষেতের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইবে। ইংরাজ সরকারের সেনানিবাস এবং অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিগণের সুরম্য হর্ম্ম্য ও বিপণীশালায় সহরের বক্ষ পরিশোভিত রহিয়াছে। এখন আর সে স্থানে একটী সাধুরও বাস নাই, তপস্যার বিঘ্ন হইবার আশঙ্কায় বহুদিন পূর্ব্বে সে স্থান ছাড়িয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। সাধুদের পদসংযুক্ত পবিত্র ধূলিরাশি আর সেই সকল উপত্যকাকে পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত করে না।

এখানে একটী সেনানিবাস স্থাপিত হইবে তাই সরকারি এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্ম্মচারিগণ স্থানটীকে সেনাদিগের বাসোপযোগী করিবার জন্য জঙ্গল কাটাইয়া জমিটীকে সমতল করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এই কাজের জন্যই এখানে আসিয়াছিলেন। কাজ খুব বেশী ছিল না, এই সকল কার্য্যের পরিদর্শন ও ২।৪ খানা চিঠি লেখাই তাঁহার কার্য্যের অঙ্গ ছিল, সুতরাং স্বজন বান্ধবহীন একাকী এই নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার সময় যেন আর কাটিতে চাহিত না। এই সময় তাঁহার মাথায় এক খেয়াল আসিল। তিনি নিকটস্থ এক পাহাড়ীয়া চাপরাশিকে জিজ্ঞাসা করিলেন -"এখানে কোন সাধু মহাত্মা আছেন?" চাপরাশি আগ্রহের সহিত উত্তর করিল—"আছেন বৈকি"। লাহিড়ী মহাশয় আবার প্রশ্ন করিলেন "আমাকে দেখাইতে পার?" চাপরাশী বলিল "পারি বৈকি, আমাদের গ্রাম যে পাহাড়ের গায়ে, তাহারই উচ্চ শিখরে সাধুরা আছেন, তাঁহারা আমাদের বড় উপকার করেন, আমাদের রোগের ঔষধ, এবং ক্ষুধার অন্ন প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের নিকট হইতেই পাইয়া থাকি" ইত্যাদি। এইবার শ্যামাচরণ তাহাকে ধরিয়া বসিলেন "আমাকে সাধু দেখাইতে হইবে।" একটা দিন নির্দ্দিষ্ট হইল, অফিসের কাজ কর্ম্ম সারিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে থাকিতেই তাঁহারা পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, পরে তাঁহারা একটী অনতিউচ্চ পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইলেই চাপরাশি তাঁহাকে "এই পাহাড়ের শিখর দেশে সাধুরা থাকেন" বলিয়া পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন বন্ধুর পথ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গী চাপরাশী অদৃশ্য হইয়া গেল। পাহাড়ের গাত্র দিয়া যে পথ শিখর দেশে পৌছিয়াছে, এখন একাকী সেই পথ ধরিয়া শ্যামাচরণ চলিতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে শ্রান্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং কেনই বা সাধুদর্শনে যাইতেছেন, দেখিয়া

কি ফল হইবে, এ সব কথাও ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল, তথাপি নেশার ঝোঁকে পড়িয়া যেমন লোকে একটা অগম্য স্থানে পৌছিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ একটা নেশা শ্যামাচরণকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রবল অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে সেই গিরির শিখর দেশে উপনীত হইতে হইল। এখন সেই সব গিরি স্থান বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, সেখানে তেমন বৃক্ষ লতাদি আজকাল আর নাই, কিন্তু তখন সেরূপ ছিল না। যদিও পাহাড়টী তেমন উচ্চ নহে কিন্তু তাহার পথ তখন সেরূপ সুগম্য ছিল না। তিনি সেখানে পৌছিলেন বটে কিন্তু শরীর মন উভয়ই বড় ক্লান্ত। মনে ইহাও চিন্তা করিতেছিলেন "এখনই রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে গিরি ও পথ সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, পথ চিনিয়া তাঁবুতে ফিরিব কিরূপে ?" যাহা হউক তথায় একজন সাধুপুরুষকে তিনি দেখিতে পাইলেন, যেন সাধুটি তাঁহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। আসিয়া কাজ যে তিনি ভাল করেন নাই এই চিন্তাতেই তখন তিনি মগ্ন, সুতরাং সাধুকে দেখিয়া তিনি বিশেষ কোন সম্ভাষণ করিলেন না। সাধু কিন্তু বড় প্রসন্নচিত্ত, তাঁহাকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। একটু পরে সাধু তাঁহাকে জলপান করাইলেন, তখন তিনি একটু সুস্থ হইয়া সাধুর দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে সামান্যরূপ অভিবাদন করিলেন এবং কিরূপে বাসায় ফিরা যায় তাহাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক সাধু তাঁহার দিকে বিস্মিতভাবে তাকাইয়া বলিলেন—"আপনি এখানকার সাধু মহারাজকে দর্শন করিবেন না ?" শ্যামাচরণ উত্তর করিলেন "এই তো আপনাকে দেখিলাম, এই হইল, এখন নিজস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" সাধু বলিলেন "তাও কি হয়, আপনি সাধু দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ? তাঁহার বাহিরে আসিবার সময় প্রায় হইয়াছে।" দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে চলিল। দুইচারিটী নক্ষত্র ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শ্যামাচরণ কি করিবেন, কি যেন নেশার ঘোরে হতচেতন হইয়া সেখানে তিনি সাধুর আগমনের প্রতীক্ষা দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সত্য সত্যই সমুজ্জ্বলচক্ষু, হাস্যবদন, সুদৃঢ় বলিষ্ঠ একটী প্রৌঢ়বয়স্ক সাধুকে তিনি দেখিতে পাইলেন। সসম্ভ্রমে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সাধুকে অভিবাদন করিলেন। সাধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"শ্যামাচরণ তুমি এসেছ ? ভাল আছ তো ?" তিনি সাধুর কথার উত্তর দিবেন কি, সাধুর কথাগুলি তাঁহার মনে তখন এক বিষম চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করিল। ভাবিতে লাগিলেন সাধু তাঁহার নাম জানিলেন কিরূপে ? এ দেশে কেহই তো তাঁহার নাম জানে না। ডাকে দুই এক খানা তাঁহার নামযুক্ত পত্র আসে বটে, কিন্তু তাহা সাধুর জানিবার সম্ভাবনা কোথায় ? তবে কি ইহারা ঠক্ না দস্যু ? তবে কি কোন ভণ্ড প্রতারকের হাতে আসিয়া পড়িলেন ? এই সকল চিন্তায় যখন তাঁহার মন সচঞ্চল তখন তিনি সাধুর মুখে তাঁহার পিতারও নাম শুনিয়া বিস্ময়ে আরও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার চিত্ত এই অপরিচিত ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত, বরং ক্রমাগত বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল।

তখন সাধু বলিলেন—"শ্যামাচরণ, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, আমাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ ?" শ্যামাচরণ বলিলেন—"না, কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, কখনও আপনাকে দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না"। তখন সাধু ধীরে ধীরে তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। তাঁহার স্পর্শ পাইবামাত্র সমগ্র শরীরে একটা তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল, যেন অতীত জন্মের সব কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া সাধুর পা জড়াইয়া ধরিলেন, আনন্দের উচ্ছ্বাসে যেন তাঁহার গাত্র মন নৃত্য করিয়া উঠিল। বহুদিনের পরে আবার তিনি তাঁহার প্রেমময় গুরুর দর্শন পাইলেন। ঠিক সেই দিনেই কি না মনে নাই, কিন্তু তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল। এই দীক্ষা তো অনেকেরই হয়, কিন্তু তাঁহার দীক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। আজ শুধু তিনি দীক্ষিত হইলেন না, তাঁহার সহিত তাঁহার ভাবী শিষ্যদেরও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। জগতের বহুলোক যে সাধনার পথ পাইবে, অতীত কালের কত সাধক সাধনপথ পাইবার জন্য আবার যে তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবে, আবার ভারতের গৃহে গৃহে গীতা পঠিত হইবে, গীতাজ্ঞান প্রচারিত হইবে, যোগাভ্যাসের সুদুর্লভ ঋষিসেবিত প্রাচীন পন্থা আবার জনসমাজে সহজলভ্য হইয়া প্রচারিত হইবে—এই সমস্ত ভাবী কর্ম্মের সূচনা তাঁহার দীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাই তাঁহার দীক্ষার দিন একটি গণনীয় দিন, অনেকের ভাগ্য তাঁহার দীক্ষার সহিত জড়িত, আজ তাঁহার দীক্ষার সহিত জগতে সাধন সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

সাধনা।

এই সময় শ্যামাচরণ গুরুপদিষ্ট পথে তীব্র সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। স্বল্প দিনের মধ্যেই তিনি বহুদূর অগ্রসর হইলেন, অনেক দুর্ব্বোধ্য অজ্ঞাত বিষয় সহজেই তাঁহার বোধগম্য হইতে লাগিল। তিনি এখন সাধনায় ও গুরুপ্রেমে বিভোর আর সে স্থান ছাড়িয়া তাঁহার যাইতে মন সরে না, কি যেন এক অজ্ঞাত অনাস্বাদিত বস্তুর স্বাদ পাইলেন, তাঁহার মনঃ প্রাণ সেই বস্তুতত্ত্বে ডুবিয়া রহিল, আর সে মন যেন উঠিতে চাহে না। অত্যন্ত অনিচ্ছায় অফিসে যাইতে হয় তাই যাইলেন, কিন্তু প্রত্যহই তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া আবার গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইতেন। অতি অল্প কয়েক দিনেই তিনি সাধনার নেশায় আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন এবং এক অভিনব অজ্ঞাতপূর্ব্ব অবস্থায় তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। একদিন তাঁহার গুরু (ইঁহাকে আমরা বাবাজী বলিয়া জানি) জানাইলেন শীঘ্রই তাঁহাকে এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, যে কৌশলে তাঁহাকে এখানে আনা হইয়াছিল তাহা তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। এখানে অপর একটি ক্লার্কের আসিবার কথা হইয়াছিল, বাবাজীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সেই অপর ব্যক্তির স্থানে তাঁহাকেই কর্তৃপক্ষীয়েরা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এখন যে কার্য্য সাধনার জন্য তাঁহার এখানে আসা—তাহা হইয়া গেল, এইবার তাঁহার ফিরিয়া যাইবার সময় উপস্থিত, কিন্তু শ্রীগুরুচরণ ছাড়িয়া তাঁহার যে যাইতে মন উঠে না—গুরু বুঝাইয়া বলিলেন "তোমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে, দেশে না ফিরিলে চলিবে না, অনেক লোক তোমার অপেক্ষায়

হসিয়া আছে।" অগত্যা ব্যথিত অন্তঃকরণে তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন। গুরু বলিলেন—"তোমার ভয় নাই, চিন্তা করিও না, মধ্যে মধ্যে আমার দেখা তো পাইবেই, এবং তুমি যখনই দেখিতে চাহিবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে।"

এই সময় অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অনেক অদ্ভুত দৃশ্যের দর্শন, অনেক অসাধারণ সিদ্ধ সাধকদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ইত্যাদি বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। শ্রীমান অভয় লিখিয়াছেন—"১৮৭৯ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী তথা হইতে যাত্রা করিয়া মিরজাপুর অফিসের কাজে যোগদান করেন এবং ১লা জুন তারিখে পুনরায় কাশীস্থ অফিসে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খৃঃ আবার বদলী হইয়া দানাপুরে গেলেন।"

দীক্ষাদান

আমরা শুনিয়াছিলাম দীক্ষার পরেই কয়েকজন লোককে দেখাইয়া বাবাজী বলিলেন—"ইহাদিগকে তোমাকে দীক্ষা দিতে হইবে, তোমার জন্য ইহাদিগকে বহুদিন ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছি।" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "আমার জন্য কেন আটকাইয়া রাখিয়াছেন, আপনি যখন রহিয়াছেন আমার নিকট দীক্ষা লইবে কেন?" বাবাজী হাসিয়া বলিলেন "উহাদের সহিত আমার দেনা পাওনার সম্বন্ধ নাই, তোমার সহিতই আছে, তোমাকেই দীক্ষা দিতে হইবে"। বোধ হয় তাঁহাদের দীক্ষা হইয়া গেল। তাহার পর যাইবার প্রাক্কালে তিনি নিজ গুরুর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন এই সাধনা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট যেন প্রচার করিতে পারেন। বাবাজী তাহাতে প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই শুনিয়াছিলাম; পরে তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অগত্যা সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন। সেই নিয়মানুসারে শ্যামাচরণ সকলকে যোগদীক্ষায় দীক্ষিত করিতেন, সমগ্র জীবনে কখনও তাহার অন্যথা করেন নাই। এই সময় হইতেই তিনি লোক সকলকে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম দীক্ষা দান কোথায় আরম্ভ হইল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, তবে কাশীতে একজন মালীকেই প্রথম দীক্ষা দেন (পাহাড়ের সন্ন্যাসীগুলির কথা এখানে আলোচ্য নহে)। মালী কেদারেশ্বর মন্দিরের দ্বারে ফুলমালা বিক্রয় করিতেন। পরে বহুলোক তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভার্থ সমুপস্থিত হইতেন, এবং প্রায় সকলেই তাঁহার কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। মধু-গন্ধে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমরগণ যেমন পদ্মফুলের চতুর্দ্দিকে গুঞ্জন করিতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্য নানাজাতীয় লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে অস্পৃশ্য জাতীয় হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ এবং রাজা মহারাজা হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত হয় নাই। ১৮৮০ খৃঃ তিনি চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীতে নিজগৃহে বাস করিতে লাগিলেন, এই সময় তিনি কাশী-নরেশ ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহ ও তৎপুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহকে দীক্ষা দেন। পেন্সান লওয়ার পর কিছুদিন তিনি প্রভুনারায়ণ সিংহের অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহারা তাঁহার মহত্ব জানিতে পারিয়া পিতাপুত্রে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তিনি ষড়দর্শনের, কতকগুলি উপনিষদের এবং গীতা চরক মনু প্রভৃতি ২২ খানি গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেগুলি সাধারণের বোধগম্য না হইলেও সাধকদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহার পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থের বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার এইরূপ সাধন রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই।

শাস্ত্রগ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

এইরূপে প্রায় ১৫ বৎসর (১৮৮০—১৮৯৫ খ্রীঃ) ধরিয়া সাধারণের মধ্যে এই যোগধর্ম্ম প্রচার করিয়া এবং জিজ্ঞাসুবর্গের সন্দেহ নিদূরিত করিয়া ১৮৯৫ খৃঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৩২০ সনের ১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তাঁহার দেবদেহের অবসান হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় ও ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে পদ্মাসনে বসাইয়া তাঁহার পবিত্রদেহ পুষ্পমালা চন্দনে ভূষিত করিয়া মণিকর্ণিকা ঘাটে লইয়া গেলেন। চিতা শয্যায় শয়ন করাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যখন স্নান করানো হইতেছিল তখন সকলেই তাঁহাকে জীবিত বোধ করিয়া চমকিত হইয়াছিলেন।

মহাপ্রয়াণ

তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া যে ১৫ বৎসর শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই অতিবাহিত করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি কথা পর্য্যন্ত বেশী বলিতে পারিতেন না। কথা কহিতে কহিতে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইত তিনি কি বলিতেছেন, একটু অন্যমনস্ক হইলেই তিনি পূর্ব্বকথা ছাড়িয়া আবার মগ্ন হইয়া যাইতেন। সে আশ্চর্য্য অবস্থার কথা বর্ণনা করা অসাধ্য।

জীবনগ্রন্থের আলোচনা

তিনি নাম প্রতিষ্ঠার দিকে একবারেই লক্ষ্য রাখিতেন না, তাহার ফলে অতি অল্প লোকেই তাঁহার সহিত মিলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। অনেকে তাঁহার নামও শোনেন নাই, কিন্তু তাঁহার মত উচ্চাঙ্গের রাজযোগী বর্ত্তমানকালে কেন, সুদূর অতীত কালেও দুর্লভ ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যোগীর ও ভক্তের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে সে সকল লক্ষণ তাঁহাতে যেমন পরিস্ফুট আকারে দেখা যাইত এমন আর কাহাতেও দেখা গিয়াছে কি না জানি না। তাঁহার কথাবার্ত্তা বেশভূষা বা আচার ব্যবহারে আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। তিনি সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত ছিলেন না, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সংসার করিতেন, জীবিকার জন্য কর্ম্ম করিতেন, অথচ তাঁহাকে পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত দেখাইত, কোন দুঃখ কষ্ট বা কোন বিপদ তাঁহার মনের সে সুগভীর স্থিরতাকে স্পর্শ করিতে পারিত না—হৃদয়দেবতার সহিত নিগূঢ় মিলন জনিত অতুল আনন্দ তাঁহার মুখমণ্ডলকে সর্ব্বদা মধুর প্রভায় প্রদীপ্ত করিয়া রাখিত। কবি Goldsmith এর "Eternal sunshine over the mind" তাঁহাতেই অন্বর্থ হইয়াছিল। চারি পাশে শত কর্ম্মের ঝটিকা ও বজ্র বিদ্যুৎ, কিন্তু তাঁহার অন্তর অভ্রভেদী গিরিশিখরের ন্যায় জ্ঞানের প্রভায় ও শান্তির স্নিগ্ধ কিরণে নিরন্তর সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত।

অহঙ্কার বা আত্মগৌরবের লেশ মাত্র তাঁহাতে তো ছিলই না, পরন্তু এমন সুমধুর বিনয় বচন দ্বারা তিনি আপনাকে সতত আবৃত করিয়া রাখিতেন যে লোকে তাঁহার মহত্ত্বের বা অপূর্ব্ব যোগৈশ্বর্য্যের কোন সন্ধানই পাইত না। তিনি তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যকে এই উপদেশ দিতেন যে "আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মনে করিবে"। তিনি বড় স্বল্পভাষী ছিলেন, সাধনার কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই প্রায় বলিতেন না, এবং এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথায় যে টুকু আলোচনা করিতেন সেই সকল উপদেশ বাক্য তাঁহার অন্তর্নিহিত গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিত। তা ছাড়া তাঁহার সুতীক্ষ্ণ যুক্তিজাল ও সাধনার অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়া বিদ্বান ও সজ্জনগণ সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। এত অল্প কথায় জটিল প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া কূট-তার্কিকেরাও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইত। তাঁহার অপূর্ব্ব যোগপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমী জানিয়াও বহু দণ্ডী, পরমহংস, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট যোগদীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চাকরীর অবস্থাতেও বহুলোক তাঁহার সাধনলব্ধ প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন এই কলিযুগের প্রচণ্ড প্রভাবের মধ্যেও সাধন করিতে পারা যায় এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও অসম্ভব নহে।

মনুষ্যজাতির প্রতি তাঁহার প্রীতিও অনন্যসাধারণ ছিল। জীবসকল ত্রিতাপ জ্বালায় অবিরত জ্বলিতেছে দেখিয়া তাহাদের সেই দুঃখ নিবারণের জন্য তিনি সাধনার দ্বারা জাতি-নির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়া ছিলেন, নীচ জাতি উচ্চ জাতি শুদ্ধ ও পতিত কেহই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মের যাবতীয় অনুষ্ঠান যোগসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত, যোগাভ্যাস ব্যতীত আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া অসম্ভব। তন্ত্র পুরাণাদিতে এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্ত্তমান। সেই জন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল যেন ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণ অল্পাধিক যোগাভ্যাসে রত হয়। তিনি বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু কোন কালেই উৎকট বৈরাগ্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন প্রকৃত বৈরাগ্য বর্ত্তমান যুগে সকলের পক্ষে হওয়া সম্ভব নহে, এবং অনধিকারে বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে কপটাচারের আশ্রয় লইতে হইবে। তিনি কপটাচারকে একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন যথাসম্ভব সংযম রক্ষা করিয়া নিত্য নিয়মিত ভাবে যতটুকু পার অভ্যাস করিয়া চল, একদিন তুমি ঠিক জায়গায় আসিয়া পৌছিতে পারিবে।

কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরই অতিক্রুত প্রচার কার্য্যের আরম্ভ হয়। কিন্তু তিনি এজন্য হাটে বাটে কখন বক্তৃতা দান বা সংবাদপত্রে তাঁহার প্রচার কার্য্যের ঘোষণা করিতেন তাহা নহে। জীবনের শেষ দিকটা যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা জানিতেন সে মন লইয়া আর প্রচার কার্য্য চলে না। সে শুদ্ধ মৌন প্রশান্ততার ছবি যাহারা দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে তাহারা সে দৃশ্য কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে না। তাই গন্ধলোভে মুগ্ধ ভ্রমরের মত শত সহস্র গৃহী ও ত্যাগীরা আসিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়া আপনাদের

জীবনকে ধন্য মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহার সাধন পদ্ধতি বঙ্গদেশে ও বঙ্গের বাহিরে বহুলভাবে প্রচারিত হয়। এক্ষণে সুদূর আমেরিকায় ও ইংলণ্ডেও প্রচারিত হইতেছে। আধুনিক কালে গীতার মাহাত্ম্য প্রচারের তিনিই প্রধান পথপ্রদর্শক।

যোগপথ দুরূহ পথ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, সকলের সে পথে প্রবেশাধিকার নাই ইহাও সত্য, অথচ যোগপথ ব্যতীত শাস্ত্রের দুরবগাহ রহস্য ভেদ করা একেবারেই অসম্ভব। যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকেই অল্পবিস্তর এ পথে প্রবিষ্ট হইয়া জগতের গূঢ়রহস্য অবগত হইতে পারে ও নিরাময় স্থানে পৌঁছিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে, সেইজন্য নানা শ্রেণীতে বিভক্ত সমুদয় যোগবিদ্যাকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া সম্মিলিত আকারে ক্রমানুযায়ী অভ্যাস করিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। সাধনেচ্ছুগণের যোগ্যতা ও শ্রমের অনুযায়ী যাহাতে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নত লাভ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং যোগাঙ্গের বিবিধ সাধনার মধ্যে যেগুলি বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইবে তদনুরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাঁহার শিক্ষাগারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার আদিম বা সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর সাধনাভ্যাসটীও নিতান্ত দুর্ব্বল চিত্তের পক্ষেও উপযোগী। এই সকল সাধনার ক্রমগুলি সহজ হইলেও তাহার ফল অসাধারণ; সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর সাধকেরাও পরিশ্রম ও যত্ন করিলেই উচ্চ ফল লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার সাধন প্রণালীর মধ্যে এইরূপ সুব্যবস্থা থাকায় কাহাকেও নিরাশ হইতে হয় নাই, সামান্য ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেই সাধনা আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন আচার্য্য যোগাভ্যাসের নিগূঢ় পন্থাগুলি সকলের পক্ষে সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না জানি না, অবশ্য কিছু সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া না চলিলে যোগাভ্যাস বিড়ম্বনা মাত্র।

এরূপ উচ্চশ্রেণীর লোকশিক্ষকের মহনীয় চরিত্র, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান, আশ্চর্য্য যোগৈশ্বর্য্য এবং অপূর্ব্ব অনাসক্তি যে বিশেষভাবে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই ইহাকে আমি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ তিনি বাঙ্গালী ছিলেন।

তাঁহার শিষ্য সংখ্যা অবশ্য তৎকালোপযোগী কম ছিল না। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্য সংখ্যাও অনেক, এবং বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং সুদূর পাঞ্জাবেও তাঁহার শিষ্যগণ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। কিন্তু যে ভাস্কর সূর্য্যের কনককিরণে ইহাঁরা উদ্ভাসিত তাঁহার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নাই।

আজকাল পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য অবগত হইবার একটা সচেতন চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এই সময়ে এই লোকশিক্ষকের চরিত্র ও উপদেশ বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। কারণ তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন উহাই সেই ঋষিসেবিত পন্থা, ধর্ম্মের রহস্যকে অবগত হইবার জন্য তদপেক্ষা সুগমতর পন্থা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল তাঁহার দেবদেহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁহার স্মৃতি পূজা অনেক স্থানে নিত্য হইতেছে। বহুস্থানে তাঁহার সমাধি ও স্মৃতি মন্দির (পুরী, কাশী, হরিদ্বার, রাঁচি, বিষ্ণুপুর, দেওঘর) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাঁহার ভক্তগণ সেই সেই স্থানে নিত্য পূজা করিয়া আজিও তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

শ্লোক-সূচী

অ

আ

ই

দ

ধ

ন

প

র

ল

ব

শ

স

বিষয় সূচী

প্রথম খণ্ড

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঐ

ক

গ

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয় — পৃষ্ঠা

অ

আ

ঈ

উ

ক

গ

চ

জ

ত

দ

ধ

ন

বিষয় — পৃষ্ঠা

—:—

তৃতীয় খণ্ড

বিষয় — পৃষ্ঠা

প

ব

ভ

ম

য

ল

শ

স

ক্ষ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত।

আনন্দাশ্রম, বর্দ্ধমান, হইতে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

* * গীতাখানি কয়েক দিন ধরিয়া পাঠ করিলাম, দেখিলাম ইহা যতই প্রচারিত হইবে ততই দেশের মঙ্গল।

প্রতি শ্লোকের অন্বয়ের সহিত যে প্রতি কথার বাঙ্গলা অর্থ দিয়াছ, তাহাতে সাধারণের বুঝিবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। ইহা সকলের পক্ষে একটী অত্যাবশ্যকীয় নূতন জিনিষ হইল। মেয়েরাও শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিবে।

কাশীর বাবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাগুলি বহু যত্নে সংগ্রহ করিয়া তোমার গীতায় সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইয়াছ দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। ইহা সকলে বুঝিতে না পারিলেও কিছু কিছু বুঝিবার লোক আছে, এবং তোমার এই প্রচারের দ্বারা ঐ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইবে। যাঁহারা লাহিড়ী বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারাই তোমার এই অমরী কীর্ত্তি রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই। * * *

পুরী মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিত-সভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীআনন্দচন্দ্র মিশ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—

* * ইহাতে প্রত্যক্‌দৃষ্টিগম্য যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ বিদ্বৎপ্রবরের যে ভূমিকা লিখিত রহিয়াছে, ঐ উভয়ের মণিকাঞ্চন যোগ সুমধুর হইয়াছে। আরও আপনার অনবদ্য লেখনীপ্রসূত স্বচ্ছ ভাষাতে যে দীপিকা-দীপ্তি রহিয়াছে তাহাতে স্থূলদর্শীর পক্ষেও সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধান-সরণী পরিষ্কৃত হইয়াছে। * * *

"উদ্বোধন" বলেন :—

গ্রন্থকারের মতে শান্তনু—শান্ত পুরুষ। ইঁহার দুই প্রকৃতি—বিদ্যা ও অবিদ্যা—গঙ্গা ও সত্যবতী। গঙ্গার আট পুত্রের মধ্যে সাতটি গঙ্গা নিমজ্জিত করেন অর্থাৎ সুষুম্নার অন্তর্নিহিত সাতটি অনভিব্যক্ত অতীন্দ্রিয় শক্তি। গঙ্গার একটি মাত্র পুত্র ভীষ্ম জীবিত থাকিয়া কুরুকুল রক্ষা করেন, ইনিই আভাস চৈতন্য যাঁহার দ্বারা সংসার ক্রিয়া সাধিত হয়। অবিদ্যা সত্যবতী হইতে দুই পুত্র জন্মে—(১) এক চিত্রাঙ্গদ বা পঞ্চভূতাত্মক বিচিত্র দৃশ্য এবং (২) বিচিত্রবীর্য্য—

সুখদুঃখাদি বিচিত্র অনুভব শক্তি। বিচিত্রবীর্য্য হইতে ধৃতরাষ্ট্র বা সংকল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা পাণ্ডু জন্মে। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী (১) কুন্তী, যিনি দেব-ভাব-সকলকে আকর্ষণ করিতে পারেন এবং (২) মাদ্রী, যিনি বুদ্ধিকে মত্ত করেন। কুন্তী নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সুষুম্নামার্গ। তাঁহা হইতে তিন পুত্র জন্মিল—আকাশ তত্ত্ব বা যুধিষ্ঠির, বায়ু তত্ত্ব বা ভীম এবং তেজঃ তত্ত্ব বা অর্জ্জুন। কুন্তীর আকর্ষণী বিদ্যা যখন পাণ্ডু বা বুদ্ধি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া মাদ্রী বা সুষুম্নার অধঃভাগ মত্ততায় সঞ্জাত হয় তখন জলতত্ত্ব বা নকুল এবং ক্ষিতি তত্ত্ব বা সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা নিবৃত্তি পক্ষীয়, সেই জন্য ইঁহাদের স্থান দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ মেরুদণ্ডের মধ্যে।

পক্ষান্তরে, মন বা ধৃতরাষ্ট্রের প্রবৃত্তি পক্ষীয় বৃত্তিগুলি অর্থাৎ মনের বিষয়ে লোভ হেতু দশ দিকে এবং প্রত্যেক দিকে দশ প্রকার গতি হেতু একশত পুত্র, দেহের সামনের দিকে অবস্থিত। এই একশত প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম কি—তাহাও গ্রন্থ মধ্যে সন্নিহিত আছে। কুরু-ক্ষেত্র বা কর্ম্মক্ষেত্র দেহ—ইহা ধর্ম্মক্ষেত্রও বটে। পাণ্ডবেরা নিবৃত্তি পক্ষ, তাই তাঁহাদের সারথি জ্ঞান-তত্ত্ব বা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে দেহকে অবলম্বন করিয়া দেবাসুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে, গীতার এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাহারই প্রতিচ্ছবি। বেদের অনুকরণে প্রত্যেক নামের ধাতুগত অর্থের দ্বারা তত্ত্বার্থ নির্ণয় করা হইয়াছে।

কলিকাতা দর্শন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার ব্যাখ্যাতা যোগচর্য্যানিরত নির্ম্মলাশয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল মহাভাগ কর্তৃক প্রথম ষটক্ উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। * * * শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয়ের এই প্রথম ষটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ যোগাচার্য্য লাহিড়ী মহাশয়ের যোগানুভূত তত্ত্বাবলী পরিস্ফুট রহিয়াছে। অন্তর্জগতের তত্ত্বনিচয় অর্থাৎ যোগরহস্য বা মন্ত্র-শাস্ত্রের সারাংশ এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুশীলন না করিলে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সারাংশ বুঝিতে পারা যায় না। আমি উক্ত গীতার ১ম ষটক পড়িয়া অপার তৃপ্তি ও শান্তি পাইয়াছি। ইহার ভূমিকাও অতি মহার্ঘ হইয়াছে। এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুভব ও সাধনবলে মহর্ষিগণ ভূবলয় মধ্যে সুদীর্ঘায়ুঃ, আধিব্যাধিশূন্য অজর ও অমর হইয়াছিলেন। সেই তত্ত্ব হারাইয়া আজ আর্য্যগণ শক্তিহীন, জরা ব্যাধির কবলগ্রস্ত। ধর্ম্মসাহিত্যামৃত পিপাসুগণকে এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদিপূর্ণ গীতাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সকল সময়ে বাহিরের বহু তত্ত্বানুধাবন যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদের একবার অন্তর তত্ত্ব রত্নের অনুশীলন করাও অতি প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

		মূল্য
১।	দিনচর্য্যা ৪র্থ সংস্করণ	৵০
২।	আশ্রম চতুষ্টয়	॥০
৩।	অভ্যাসযোগ ২য় সংস্করণ	১৲, বাঁধা ১।০
৪।	দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব	।৵০
৫।	বিল্বদল	১॥০
৬।	আত্মানুসন্ধান ও আত্মানুভূতি	॥০
৭।	শতদল	৵০
৮।	শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রথম খণ্ড	৩৲
৯।	ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৩৲